ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

ঊনচত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫৮

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

শিল্পী—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা এম্‌-এ | মৃণাল-বলয় | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আষাঢ়—১৩৫৮

প্রথম খণ্ড — উনচত্বারিংশ বর্ষ —
প্রথম সংখ্যা

বাঙলা ছন্দের মুক্তি

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

ভাষার একটা গুণাভাষ প্রত্যেক দেশ এবং প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে আছে, যার দ্বারা গূঢ় অন্তঃদর্শন বা রসপরিবেশন করার পক্ষে সকল দেশের ভাষা অনুকূল বা প্রতিকূল হয়। আমরা তাই দেখি ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের সকল ভাষারই মূল সংস্কৃত হলেও মহারাষ্ট্র বা হিন্দী অপেক্ষা বাঙলা ভাষার সৌকুমার্য্য সকলেই উপলব্ধি করেন—বিশেষ ভাবে কাব্যরচনার মধ্যে। ভৌগোলিক পরিস্থিতি বা আদিকালে বিভিন্ন জাতির মানুষের সংমিশ্রণের ফলে এরূপ ঘটে থাকতে পারে। সমগ্র ভারতবর্ষে আদিযুগে, আর্য্য-অনার্য্যের সংঘর্ষে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষা বিভিন্ন রূপ পেয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রচলনের ফলে। তার গুণাভাষের পরিচয় পেতে হ'লে আমরা দেখব ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের অবসানে প্রাকৃত এবং পালিভাষার লালিত্য-সম্পদ বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সাহিত্যের যোগে তৎকালীন প্রচলিত বাঙলায় কতক পরিমাণে এসেছিল। আদি-দ্রাবিড়ী—অনার্য্য ভাষাও তার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে বাঙলার মাটিতে বাঙলাভাষা এত কমনীয় রূপ ধারণ করেছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তখনকার প্রচলিত সংস্কৃত দেবভাষার (আর্য্য ভাষার) প্রভাব উত্তর প্রদেশে—আর্য্যাবর্ত্তে সর্ব্বত্রই স্থাপিত হয়েছিল। ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা (Philologists) গবেষণার দ্বারা এবিষয় বহু তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

সামবেদ গানই ভারতবর্ষের সকল সাহিত্যের আদি কাব্য-গীতি থেকে নিয়ে দেশের স্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হয়ে নানাকালে নানাপ্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছিল কখনো বা সবেগে, কখনো বা ধীর-মন্থর গতিতে। মানুষের স্বাভাবিক সৃষ্টিগুণ এইভাবে প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী কাব্যরূপে ভাষার মধ্যে নানা ছন্দে নন্দিত হয়ে চলেছিল। মাত্রাবৃত্ত, যৌগিক, অক্ষর-বৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ যা' ছড়া প্রভৃতি রচনায় দেখা যায়, তারই মধ্যে চলেই কাব্যরচনা পর্য্যবসিত হয়নি। সব

আর্টই কোনো বাঁধা নিয়ম মেনে চ'লে অচল থাকতে পারেনা, তার গতি অবহত হয়। প্রগতির পথে যেতে হ'লে বাঁধা পথ ছেড়ে বহু পরীক্ষার পথ উত্তীর্ণ হ'তে হয়। অবশ্য এই পরীক্ষার পথ গভীর সাধনার পথ, দেশের অন্তরেই আছে। কোনো ভারতীয় যদি ইংলণ্ডের কোনো কবির অনুকরণে কবিতা লেখার ছলে ইংরাজি ভাষার এবং ভাবের বিশেষ গুণাভাষ (Spirit of the language) প্রকাশ করতে যান এবং ইংলণ্ডের শীতের দিনে ভোর বেলায় ঝির্ ঝিরে হাল্কা তুলোর মত বরফ-পাতের সঙ্গে রবিবারের গির্জ্জার ঘণ্টা-ধ্বনির কথা ভাবতে ভাবতে মশগুল হয়ে যান এবং সেই বিষয় নিয়ে কোনো কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁকে কেহই প্রকৃতিস্থ বলবেননা। এরূপ বিলাতি কাব্যের অনুকরণ সাময়িক ফ্যাসানেই পর্য্যবসিত হ'তে পারে। কাব্য পরিকল্পনার ভিত্তি যেখানে, সেখানে দেশের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যেই ভাষার গুণাভাষকে সহজে প্রকাশ করতে পারে। তাই বাল্মীকির পর কালিদাস এবং কালিদাসের পর রবীন্দ্রনাথ দেশেরই এক গুণাভাষকে বহুরূপ দিয়ে প্রকাশ করে গেছেন কাব্যকলায়।

অবশ্য এখন আমরা আধুনিক বিদেশী সাহিত্যের আবহাওয়াকে কৃত্রিম উপায়ে অবরোধ করার কথা বলচিনা। বিজ্ঞান-প্রধান পাশ্চাত্য-সাহিত্যকলাকেও মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের অবসরে নানাভাবে—পরীক্ষার কোঠায় নিয়ে চলেচেন আধুনিক কবিরা এবং তার পরিণতি যে কি, তার কথা বলার সময় এখনো হয়নি। এই সমস্যায় এতাবৎকাল বাঙলাদেশের কাব্য ছন্দ যে কী ভাবে প্রগতির পথে চলেচে তারই পর্য্যালোচনা এখন করব।

মধ্যযুগে আদি বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শন 'বৌদ্ধগাথা' বা দোহাগুলিতে মাত্রাবৃত্ত-ছন্দই পাওয়া যায়। "মাত্রাবৃত্ত"—অর্থাৎ ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে গুরু বা দ্বিমাত্রিক এবং অযুগ্ম-ধ্বনিকে লঘু বা একমাত্রা বোধে রচনা। সংস্কৃত পদ্ধতিতে স্বরবর্ণের হ্রস্বদীর্ঘ ভেদই এর প্রধান কারণ। বাঙলাভাষার স্বভাবের সঙ্গে এর মিল ছিল না, তাই উনবিংশ শতাব্দীতে হ'ল অচল। মধ্য যুগের কবিরা পয়ার (দ্বিপদী বা ত্রিপদী) ছাড়াও সংস্কৃতের অনুকরণে বহু ললিত কবিতাবলী—'ভুজঙ্গ-প্রয়াত', 'তোটক', 'গজগতি', 'একাবলী', 'কুসুম-বিচিত্রা', 'মাত্রাবৃত্ত ত্রিপদী' 'গীতিকা' ইত্যাদি বহুবিধ ছন্দে লিখতেন। এগুলির পঠন-কালে বিশেষ বিশেষ মাত্রায় ঝোঁক সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম অনুসারে দিতে হ'তো। যেমন 'কুসুম-বিচিত্রা' ছন্দের বাঙলা কবিতা পড়তে হ'লে, পড়তে হ'বে :—

"বিপিন বিহারে, জিনি রতি কাম।
যুগল কিশোরে, নিরখি নিকাম ॥
যত সব গোপী, পটু-পরিহাসে।
ব্রজ-কমলারে মৃদু মৃদু ভাষে ॥"

'মান্দরা' ছন্দ :—

"কোন ধনী হরি-রূপ বিলোকি মনোজ-রসে মজি গান করে
ইন্দ্র-শরাসন-রঞ্জিত বারিদতুল্য—শিরোরুহ বর্হ—ধরে,
আস্য কিবা মৃদু-হাস্য বিরাজিত নীলসরোরুহ-কান্তি-হরে,
কাঞ্চন-কুণ্ডল-মণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ড-যুগে শ্রম বারিঝরে !"

অবশ্য এইরূপ কাব্যের সঙ্গে আমরা এখন আর সুপরিচিত নহি। সেকালের কবিদের কথা মনে হ'লেই আমরা কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কথাই ভাবি। ভারতচন্দ্রও এই সংস্কৃত প্রভাবের মধ্যে থেকেও আশ্চর্য্য কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়েচেন। সুপণ্ডিত গুণ-গ্রাহী-মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর গুণের যথেষ্ট পুরস্কার দিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর সভাপণ্ডিতরূপে গ্রহণ ক'রে। 'ভুজঙ্গপ্রয়াত' ছন্দের নমুনা তাঁর কাব্যে আছে। যথা :—

অদূরে মহা রুদ্র ডাকে গভীরে
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে ॥

এই ভাবে সংস্কৃত কাব্য-ছন্দের দীর্ঘ স্বরান্ত ধ্বনির গুরুত্ব এবং অনুপ্রাসবহুল ঝংকার বাঙলা ভাষার বৈসুবাদনের অণুগুণত্বের সঙ্গে খাপ না খেলেও তখনকার কালে লাস্য-লালিত্য-লসিত করার অভিপ্রায়ে শব্দ চয়ন করা হ'ত বিশেষ ভাবে। তার দৃষ্টান্ত প্রাচীন কবিদের কাব্যে এবং কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যে বহু পাওয়া যায়। অন্নদা-মঙ্গল কাব্যে কালী স্তুতিতে আছে :—

"মাঁ কালিকে !"

কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে
চণ্ড-মণ্ডি মুণ্ড-খণ্ডি, খণ্ড মুণ্ড মালিকে ॥
লট্ট পট্ট দীর্ঘ-জট্ট মুণ্ড-কেশ-জালিকে ।
ধ্বক্ক-ধ্বক্ক-তক্ক তক্ক-অগ্নিচন্দ্রভালিকে ॥
লীহ লীহ লোল জীহ—লক্ক—লক্ক—সাজিকে ।
হক্ক ঢক্ক ভক্ক ভক্ক রক্তবাজিবাজিকে ।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোরহাস হাসিকে ।
মার মার ঘোর ঘার ছিন্ধি ভিন্ধি ভাসিকে ॥
ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক—পীতরক্তহালিকে ।
ধেই ধেই থেই থেই নৃত্য-গীততালিকে ॥

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতে ব্যবহৃত সংস্কৃত 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দের প্রসিদ্ধির জন্য তার অনুকরণে বাঙলাভাষায় বহু দূতিকাব্যও সেকালে রচিত হয়েছিল ; কিন্তু সংস্কৃতের ওজঃগুণ বাঙলা ভাষায় কমই দিতে পেরেছিলেন কবিরা এবং সেসকল কাব্যের খুদকুঁড়োও আজ বাকি নেই। বাঙলার শক্তিপূজক কবিরা এবং বৈষ্ণব কবিরা কখনো বা মাত্রাবৃত্ত সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ এবং কখনো বা অক্ষরবৃত্ত পয়ারে কবিতা রচনা ক'রে গেছেন। পয়ার বাঙলা কবিতার পদবন্ধনী, চার চরণে, চৌদ্দ অক্ষরের মিত্রাক্ষর ছন্দ। যথা :—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

—এই ছিল প্রধান ছন্দ বাঙলার প্রাচীন কবিদের। পাণ্ডিত্য এবং নতুনত্ব দেখাতে হলেই সংস্কৃত ছন্দের দ্বারস্থ হ'তে হ'ত তাঁদের। দীর্ঘ সমাসবহুল অতিদীর্ঘ শব্দ বাঙলা ভাষাকে সেকালে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিল। তখন কবিদের সংস্কৃত বোধ এবং শব্দচয়ন ক্ষমতার ছিল বিশেষ প্রয়োজন কাব্য রচনার জন্য। রস অপেক্ষা বাক্য বিন্যাসই বিশেষ ভাবে গৃহীত হ'তো। কবিকঙ্কন চণ্ডীর পয়ার তাই সচল ছিল ভারতচন্দ্রেরও কাব্যে। ছন্দের বিষয়ে তখনকার কালে কাব্য একটা বিশেষ ধারাতেই আবদ্ধ ছিল। কাব্য পাঠ করা হ'তো সুর ক'রে গান গেয়ে হিন্দী কবিতার মতই। ভারতচন্দ্রের পর প্রায় শতাব্দী-কাল তাঁরই আদর্শ কার্য্যকরী ছিল। তারপর এলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি বাঙলা কাব্যকে লৌকিক ছন্দে (Folkmetric) অর্থাৎ চলিত ভাষা ও ছড়ায় মুক্তি দিলেন সংস্কৃত ছন্দের আবেষ্টন থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভাষার বিষয় বলেচেন :—

"তাঁহার বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙলায়, এমন বাঙালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোনো বিকার নাই —ইংরাজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলেনা, টলেনা— সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙালীর বাংলা ঈশ্বরগুপ্ত ভিন্ন আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই।"

কবি ঈশ্বর গুপ্ত বেশীর ভাগ সাময়িক সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে চলিত কথায় কবিতা রচনা করতেন। বাঙলাদেশে পূর্ব্বে কবিদের মুখে মুখে চলিত ভাষায় রচিত যেরূপ তর্জ্জা গান হ'তো, এঁর ভাষা এবং ছন্দ ঠিক সেই প্রকারের ছিল। ছন্দের মুক্তি-যজ্ঞের ইনিও এই ভাবে একজন বিশেষ পুরোহিত ছিলেন প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে। নীলকরের অত্যাচারে লিখিত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা :—

"চোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা, ঘটে সর্ব্বনাশ।
কাল সাপ কি কোনো কালে দয়াতে ভেকে পালে
টপাটপ্ অম্নি করে গ্রাস।
বাঙালী তোমার কেনা, একথা জানে কেনা ?
হয়েছি চিরকালের দাস।
করি শুভ অভিলাষ :
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি সিংবাকানো।
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস।
যেন রাঙা আম্লা, তুলে মাম্লা
গামলা ভাঙে না।
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হ'ব
ঘুসি খেলে আর বাঁচব না।"

সেকালে টেকচাঁদ ঠাকুর যেমন তাঁর "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থে চলিত কথায় বাঙলা লিখে গেছেন সংস্কৃতের বাড়াবাড়ির যুগে, কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও সংস্কৃতের ছন্দ এবং ভাষার বেড়ি ভেঙে বাঙলা কাব্য রচনা করলেন চলিত

ভাষায় এবং লৌকিক ছন্দে। এই ধরণের কবিতার আরো একটি নমুনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দার্শনিক কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম :—

"দৌড়িয়া আসিছে কবি ছাতাটি বগলে।
সহাস্য বদনে সখা দুয়ার আগলে॥
বলে কবি : "বন্ধুর এমনি বটে কাজ।
হাসে আর কাষ্ঠ হাসি কষ্টে ঢাকি লাজ॥
চৌকাট ডিঙাবে যেই, খাইল হোঁচোট্।
'আরে' 'আরে' বলে সখা—লাগেনি ত চোট?

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অসাধারণ কবি প্রতিভা ছিল এবং তিনি সংস্কৃত ছন্দগুলকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছিলেন বটে, তথাপি বিষয় বস্তুর দিক থেকে এবং ভাব-সম্পদের দিক থেকে কাব্যকলার উচ্চস্তরে পৌছতে পারেননি। বাঙলা ভাষায় ভাব এবং ভাষার সম্মিলনে ঔজ্জ্বল্য সম্পদ লাভ ঘটেছিল ঠিক তাঁরই পরবর্ত্তী কালের কবি মধুসূদন দত্তের দ্বারা। চতুর্দ্দশ পদাবলী অর্থাৎ সনেটের অনুরূপ ছন্দে বাঙলা কবিতা মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতই বাঙলায় প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। এই ছন্দে চৌদ্দ পংক্তি এবং চৌদ্দ অক্ষর এবং মিলের বন্ধনও বজায় রেখে গেছেন। কবি বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, নবীন প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিরা তাঁরই ছন্দের উত্তরাধিকারী হন। মধুসূদন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারসেলস্ (Versailles)-এ থাকার কালে তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাক মহাশয়কে লিখেছিলেন :—

…আমি সম্প্রতি 'পেত্রাকার' ইটালীয় কবির কাব্য পড়ছিলাম এবং ঐ ধরণের 'সনেট' লিখে ফেলেছি।…আমার ইচ্ছা রাজেন্দ্রও এগুলি দেখেন, তিনি একজন ভাল সমজদার। এই নতুন পদ্ধতির কবিতার বিষয় তোমরা সকলে কি বিবেচনা কর আমাকে লিখবে। ভাই, আমার কথা বিশ্বাস কর, আমাদের বাঙলাভাষা অত্যন্ত সুন্দর এবং কেবল প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রয়োজন মার্জ্জিত ক'রে তোলার জন্য।*

মাইকেল কিন্তু আবার কবি ঈশ্বর গুপ্তের চলিত বাঙলার পথ ছেড়ে দিয়ে শব্দ অলংকারের পথে সংস্কৃত-ঘেঁষা এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুরূপ বাঙলারই শরণাপন্ন হলেন। ছন্দের দিকে, প্রচলিত পয়ার বা তর্জ্জাগানের লৌকিক ছন্দকে ছাড়িয়ে চল্লেন বিশ্বসাহিত্য থেকে ছন্দ কৌশল সংগ্রহার্থে। তিনি ছন্দের প্রণালী বিদেশ থেকে নিলেন বটে কিন্তু কাব্যের গুণাভাষ সম্পূর্ণ দেশের বিষয় বস্তু এবং ভাব থেকেই গ্রহণ করলেন পরিবেশনের জন্যে। তাঁর জীবিত-কালে খুব অল্প লোকেই বাঙলা কাব্যে তাঁর এই দান গ্রহণ করতে সমর্থ হলেন—তাঁকে চিনতে বেশ সময় লেগেছিল। তাঁর প্রবর্ত্তিত এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্যের প্রত্যেক অঙ্গে যে মাত্রা, বৃত্তি এবং যতি থাকে, তার অভিনব রূপে সংস্থাপনের দ্বারা কাব্যকলার নতুন পথ দেখালেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের গোড়ায় সরস্বতী বন্দনায় বলেছেন :—

"ডর তবে, উর দয়াময়ি!
বিশ্বরমে! গাইব মা বীর রসে ভাসি
মহাগীতি; উরি, দাসে দেহ পদ ছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত ফুলবনমধু
ল'য়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কবির কথা এখন সম্পূর্ণ হ'তে চলেছে। ক্রৌঞ্চ মিথুনের মধ্যে কামাসক্ত ক্রৌঞ্চকে নিষাদ নিহত করায় শোকাবেগে বাল্মীকির রসনাগ্রে প্রথম শ্লোক রূপে সরস্বতী যেমন অধিষ্ঠাতা হয়েছিলেন তেমনি মহাকবি মধুসূদনের প্রতিও অনুকম্পা প্রকাশ করেছিলেন। অতঃপর বাঙলা ভাষায় কাব্যের বীণা বাদনের জন্য মহাকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হ'ল। সারা পৃথিবীতে বাঙলা ভাষার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ইংলণ্ডের বহু কবিতে মিলে যেভাবে তাঁদের দেশের কাব্যকলাকে ছন্দে, ভাবে, ভাষায় উচ্চশিখরে নিয়ে গিয়েছিলেন, একা রবি সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে তেমনি বাঙলার কাব্যাঙ্গন আলোকিত ক'রে তুললেন। তাঁকে একবার এক লেখক আর্টের বিষয় একটি বিশেষ প্রশ্ন ক'রে পত্র লেখায় তিনি তার উত্তরে প্রতিভা-পরিচয়-বিষয় যা উপদেশ দিয়েছিলেন তা' এইরূপ। তিনি লিখেছিলেন :

---

* মূল ইংরাজি পত্র :—I have been lately reading Petrarca—the Italian Poet and scribbling some 'sonnets' after his manner....I should wish you to show these things to Rajendra also, for he is a good judge. Write to me what you all think of this new style of poetry. Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants man of genius to polish it up."

কল্যাণীয়েষু—তোর প্রশ্নের উত্তর দেবার শক্তি আমার নেই। প্রতিভার সাধনা কোন্ পথে চলে হঠাৎ বোঝা যায় না—প্রথমটা লাগে ধাঁধা, তারপর দেখা যায় একটা কোথাও পৌঁছে সে আপনার তাৎপর্য প্রকাশ করে। ইতিহাসে বারবার এ ঘটনা হয়েছে। প্রতিভার পাগলামী সৃষ্টি প্রণালীর অঙ্গ। যখন মনে করেছি বাঁধা পথ পাওয়া গেছে, সে-পথ ছাড়া গতি নেই—তখন হঠাৎ দেখি, উচ্চৈঃশ্রবা চার পা তুলে ছুটে চলেচে যে-দিকে আমরা হৈ হৈ চীৎকার করি, সহিসকে গাল পাড়ি, হাওয়ায় সাঁই সাঁই রবে চাবুক আস্ফালন করি, কিন্তু দেবতার ঘোড়া আপন চলার দ্বারা নতুন পথ বের করে, নতুন ঐশ্বর্য্যের পথ। সকল প্রকার সৃষ্টির ইতিহাস এই—অনাসৃষ্টির রাস্তা দিয়েই। তাই তাড়াতাড়ি কিছু বলতে সাহস হয় না। আমার কলম যখন প্রথম চলেছিল হেম বাঁড়ুয্যের পথ ডিঙিয়ে গেল—তার পরেও ক্ষণিকায় বলাকায়, বাঁক বদলাতে লাগল, আজও কি পাকা রাস্তা ঠিক করতে পেরেচি?—রবিদাদা।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ 'বলাকায়' প্রথম ডানা মেলে দিলেন ছন্দের মুক্তি দিতে। এতদিন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ গৈরীশ-নাটকীয় ভঙ্গিতে যেটুকু অগ্রসর হয়েছিল, তার মুক্তি পথের সন্ধান এনে দিলেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট সমিল প্রবহমান দীর্ঘপয়ার মুক্তকছন্দে। স্বাধীন প্রকৃতির মুক্তক ছন্দ এরই ফলে এল বাংলা কাব্যে। এখন আর সংস্কৃত, অসংস্কৃত বা কথিত ভাষার মুখাপেক্ষী হয়ে ছন্দ নেই। এখন যদি সত্যিকার বক্তব্য চিরন্তন সত্য কিছু বলবার থাকে তো কাব্যে প্রবহমান হ'তে পারবে সহজেই মুক্তকছন্দে শক্তিশালী কবির হাতে। রবীন্দ্র যুগে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বহু ভঙ্গীতে ছন্দের সাধনা ক'রে পথ আরো অবারিত এবং সুন্দর প্রসারিত ক'রে গেছেন। এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সংস্কৃত রত্নাবলী নাটককে কাব্যের রূপে রচনা কালে এবং বাল্মীকির রামায়ণের পদ্যানুবাদে অমিল প্রবহমান ছন্দের ব্যবহার করেচি। এতে বিরাম বা যতি-ভাগও অসমান। অনুপ্রাস বা শব্দ ঝঙ্কার ছাড়া মিল যা' যেখানে ঘটেচে তা' বাঁধা নিয়মে নয়। রত্নাবলীর পদ্যানুবাদ কালে স্বর্গীয় বন্ধু চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্কৃত ঘেঁষা পদ্যে অনূদিত রত্নাবলীর অনুসরণ করেচি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করলাম।

'বৎসরাজ্যে বসন্ত-উৎসব।
অবিরে প্রকীর্ণ;—কুঙ্কুমে পিঙ্গল;
রক্ত, পীত বর্ণ নব-রাগ
জাগাইবে অন্তর্জ্যোতি
উষায় সোহাগ!
আনন্দিত পুরনারী মন্দিরা-সংগীতে
রাজপথ করিছে মুখর!
কণাকৃতি পিচকারী-ধরি
মধুমত্ত কামিনীরা
সুরভিত বারির শীকরে
পৌরজনে করে সিক্ত;
তাড়নায়
নৃত্যরত নাগরিক
নৃত্য পরিহরি পলাইয়া যায়।
প্রমদা প্রমত্ত লাস্যে
বিকশিত বকুল সুরভি লভি
পূর্ণপ্রাণ,—
ফিরে তারা লুকায়িত সখার সন্ধানে
মদালসে মত্ত করী হেন।
ধারাযন্ত্র নির্মুক্ত প্রবাহে
পঙ্কিল সে পথ
সিন্দুর-বরণ;
করে বিচরণ অলক্তক-রাগধরি
চরণেতে সবে।
কুসুম-আয়ুধ প্রিয়দূত দক্ষিণ-পবন
সহকার মুকুলে বিকাশি
শোণিতাক্ত করি পলাশ পুষ্পেরে।
বিরহ-মধুর বিরহিণী-শ্বাস
বহি যায় রহিয়া রহিয়া'
নরনারী সবে, আত্মহারা
প্রমত্ত উৎসবে!
গৃহে গৃহে মৃদঙ্গের সুললিত গীতস্বন
পৌরজন-সুখ করিছে ঘোষণা।
যে আনন্দ তাদের অন্তরে
পায় নরনারী ঋতুরাজ আগমনে,
তাহারি কিঞ্চিৎভাব প্রকাশিছে সবে
মহোৎসবে মাতি!

টিয়ার-গ্যাস

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ড্যালহাউসির রাজপথে জনতার মিছিল; উদ্বেলিত জন-সমুদ্রে প্রাণ-চাঞ্চল্য। জিপিওর বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং ক'রে পাঁচটা বেজে গেল। ঘনায়মান শীতের অপরাহ্ণ ঘিরে জীবনের দ্যুতি জ্বলে ওঠে। জীবন-তরঙ্গে বুদ্বুদের ঢেউ লাগে। কেরাণীর মনে চাঞ্চল্য—একটি দিনের পরিপূর্ণতায়। যাত্রী বোঝাই ট্রাম বাস গুলি ছুটে চ'লেছে, জীবনের আয়ু যেন এখন ক্ষয়িষ্ণু ম্রিয়মান নয়। সাত ঘণ্টা অফিসে কলম পিষেও জীবনের চেতনা মৃত্যুমুখী নয়। ভিড়ে ভিড়াক্রান্ত বাসের বাম্পারগুলিতে পর্যন্ত যাত্রী লাফিয়ে ওঠে; ট্রামের পা-দানি ভ'রে যায় অগণিত যাত্রীর ভিড়ে।

অকস্মাৎ পুলিশের হুইসিল বেজে উঠলো, শান্তি-রক্ষাকারী শান্ত্রীদল ঘিরে ফেল্‌লে রাজপথ। কেরাণী মিছিলে ভাঙন ধরে, ত্রস্ত ভীত জনতা ছুটে চলেছে নিরাপত্তার আশ্রয়ে। লালনিশান-ধারী সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক মিছিল এগিয়ে আসে, পুলিশের রক্ষী বাহিনীর বেষ্টনীকে অতিক্রম ক'রে। একশো চুয়াল্লিশ ধারার বেড়াজালে বেঁধে রাখা হ'য়েছে ড্যালহাউসি স্কোয়ারের চতুষ্কোণকে। রাজনৈতিক অশান্তের দল সে বেড়া ভেঙে ফেলতে চায়, বেয়নেটের উদ্যত মুখেও তাদের উদ্দীপ্ত কণ্ঠ ক্ষান্ত হয় না। 'লাল ঝাণ্ডা উঁচা রহো,' ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'!

ওদিকে বোমা ফাটছে, টিয়ার গ্যাসে ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে ড্যালহাউসির জনপদ। ঘন ঘন হুইসিলে তলব করা হ'চ্ছে আরও শান্ত্রী দল। ভীত দিনের কেরাণী আশ্রয় নিয়েছিলাম লালদিঘীর নিরাপদ একটি বৃক্ষতলে। ক্রমে ক্রমে সে জায়গাও ভর্ত্তি হ'য়ে গেল ভীত পথচারীর পরিমণ্ডলে। টিয়ার গ্যাস এখানে এসেও পৌচেছে। অবিরত বিগলিত চোখের জলকে ধুয়ে ফেলি লাল দিঘীর জলে। উদ্যত সঙ্গীন্ আর ধরপাকড়ের ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মিছিল ভেঙে গেল।

—আঃ—বাঁচলুম! লঘু নারী কণ্ঠে স্বস্তির আশ্বাস ফুটে উঠলো।

পিছনের দিকে ঘাড় ফেরাতেই অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম উল্কাকে। চোখাচোখি হ'তেই উল্কা আমাকে চিনতে পারলো। অত্যন্ত পরিচিতের মত মৃদু হেসে ব'ললে—খুব বেঁচে গেলেন এ যাত্রা।

আমি ব'ললুম—হ্যাঁ।

—কি বিপদ দেখুন ত, রাস্তাঘাটে বেরুন মানেই জীবন বিপন্ন করা। এর নাম কি রাজনীতি? নিরীহ লোক-গুলোকে কেবল বিপদে ফেলা।

মৃদু হেসে উল্কার কথায় সম্মতি জানালুম।

উল্কা প্রশ্ন ক'রলে—কোথায় আছেন আজকাল, বাড়ীর খবর সব?

সংক্ষেপে ব'ল্‌লুম—ভালো। থাকি বাদুড় বাগানে।

ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে ছোট নোট্ বুক্‌টা বার ক'রে উল্কা প্রশ্ন ক'রলে—এ্যাড্‌রেশটা ব'লুন, লিখে নিই—একদিন যাবো আপনার ওখানে।

উল্কাকে ঠিকানা বলায় বিপত্তি অনেক। আর তাকে এখন আমি বিশেষ আমল দিতে ইচ্ছুক নই। তার প্রশ্নে তাই প্রমাদ গুণলাম। কিন্তু তার তাগিদে উত্তর দিলাম—১৭৩।৫ বি বাদুড় বাগান রো। মনে মনে আশ্বস্ত হ'লুম এই ভেবে যে এই নম্বরের কোন বাড়ীর অস্তিত্ব বাদুড় বাগান রোতে নেই।

উল্কা প্রশ্ন ক'রলে—কি করছেন আজকাল?

ব'ল্‌লুম—চাকরি।

—ঘর সংসার?

—চাকরির বনিয়াদের ভিত্তিতে বেড়ে চ'লেছে।

উল্কা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ক'রলে।

—কটা ইন্সিওর করিয়েছেন?

তার প্রশ্নের উত্তরে ব'ললুম—খরচের খাতাই বাড়িয়ে চ'লেছি।

উল্কা অভিযোগ জানালে—চিরটা কালই আপনি বে-হিসাবী, আগের কথা না হয় ছেড়ে দিলুম, কিন্তু বর্ত্তমানের দায়িত্বকে আপনাদের মত শিক্ষিত লোকেরাও

কি ভাবে এড়িয়ে চলেন এটা আমি বুঝতে পারিনে ; একটা ইন্সিওর করিয়ে ফেলুন।

উল্কার কথা শুনে যেন বোমার আতঙ্ককে অনুভব ক'রলুম। মনে মনে ভাবতে লাগলুম উল্কার আক্রমণ থেকে কেমন ক'রে রেহাই পাই। ব'ল্লুম—চ'লুন, ফেরা যাক্, রাস্তাঘাট এখন বিপন্মুক্ত।

উল্কা ব'ললে—আর একটু পরে, এখনও হয়ত ধরপাকড়ের ভয় আছে।

পরিচয়ের সূত্রটাকে টেনে রাখে উল্কা টুক্‌রো টুক্‌রো কথার জালে। উল্কার কথায় উত্তাপ নেই, কিন্তু স্ফুলিঙ্গ আছে ; ব'ললে—কই আমার কথা ত কিছুই জানতে চাইলেন না !

ব'ল্লুম—একদিনেই শেষ ক'রে লাভ কি ? আস্‌ছেন আমার বাড়ী ; সেইদিনই শোনা যাবে সব।

জি, পি, ওর ঘড়িটায় ঢং ঢং ক'রে ছটা বেজে গেল।

বল্লুম—অনেক দেরি হ'য়ে গেল। আপনি কোন দিকে যাবেন ?

—এসেছিলাম ত এই দিকেই। একটা মাড়োয়ারি ফার্মে মোটা টাকার কেস ছিল। বোমা আর টিয়ার গ্যাসে তা নষ্ট হ'ল। কি বিপদ ব'লুন তো ?

—কিসের কেস ?

ইন্‌সিওরেন্সের। উল্কার কণ্ঠে আক্ষেপের ধ্বনি ফুটে উঠলো—কুড়ি হাজার টাকার লাইফ পলিসি।

উল্কার কথায় ব্যথা পেলুম। এই দুর্দিনে এত বড় আর্থিক ক্ষতিকে আমি অন্তত হৃদয় দিয়ে অনুভব ক'রতে পারি।

উল্কার কথায় ধ্বনিত হ'ল কারুণ্যের সুর—অনেক বড় ফ্যামিলি মেন্‌টেন্ ক'রতে হয় জানেন। তারপর পাকিস্থান থেকে আত্মীয়-স্বজন সকলেই ঘাড়ে এসে চেপেছেন।

কিন্তু এ বিয়োগান্ত জীবন-নাটক শোনবার আগ্রহ আর এখন আমার নেই ; কারণ উল্কার মত মেয়েদের এখন আমি ভয় করি। ভয় করি বোমা আর টিয়ার গ্যাসের মতই।

সামনে এসে প'ড়েছে দু'নম্বর বাস। ভিড়ে ভিড়াক্রান্ত বাস খানিতে লাফিয়ে উঠে বলি—আচ্ছা, চলি তবে ; নমস্কার। একদিন আসবেন আমার বাসায়।

*   *   *

চলন্ত বাসের মধ্যে উল্কা জেগে ওঠে আমার মনের পাতায়। টক্‌টকে লাল শাড়িতে জল্-জলে মেয়ে উল্কা। নাম তার সবিতা। কিন্তু ব'লেছিলাম কাব্য ক'রে—তুমি প্রচণ্ডা ; তুমি হ'চ্ছ উল্কা। নেশার আবেশে খুশীর হাসিতে সবিতা তা গর্বভরে গ্রহণ করেছিল। সে আজ কতদিন আগের কথা। জীবনে তখন উত্তাপ ছিল ; ছিল রোমাঞ্চ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কল্যাণে শেয়ারের ফাট্‌কা বাজারে আমি তখন স্ফীত। দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর এড়িয়ে বুইকের সঞ্চারণশীল গতিতে জীবন তখন আমার উড়ে চ'লেছে। দুনিয়াকে তাচ্ছিল্য করার বয়সে পার্টি আর রেস্তোরাঁয় আমি তখন বিংশ শতাব্দীর সম্ভ্রান্ত নাগরিক। এমন দিনের বান্ধবী আমার উল্কা। দক্ষিণ কলিকাতার ফ্ল্যাটে ওদের ঘরে মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়েছি উল্কাকে জীবন-সঙ্গিনী ক'রবার মানসে। কিন্তু উল্কার মত মেয়েরা জীবন-বন্ধনে বাঁধা প'ড়েনা সহজে। কন্‌ট্রাক্‌টরীর ব্যবসায় মোটা রকমের লোকসান খেয়ে পড়তি শেয়ারের দলে সর্বস্বান্ত হ'য়ে যেদিন নিঃস্ব বেকার রাজপথে এসে দাঁড়ালুম—উল্কা তখন হারিয়ে গেছে। বড় বড় মোটর আর জর্জেট টিস্যুর ঔজ্জ্বল্যে আমার জ্যোতি ম্লান হ'য়ে গেছে। ওদের বাড়িতে আমার আর প্রবেশাধিকার নেই। জীবন-সংগ্রামের মেঘ-মলিন আকাশে উল্কার দুর্যোগ আর নেই। অভাবের বৃষ্টিতে জীবনের বন্ধুর ক্ষেতে তখন ফসল বোনার প্রয়াস চ'লেছে।

বাস এসে বীডন ষ্ট্রীটে থামলো।

ক্লান্ত কেরাণী নেমে পড়লাম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে। জীবনের দুষ্ট গ্রহ আজ আবার ঘিরে ফেলেছিল আমাকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—খুব রেহাই পেয়েছি আজ !

বাদুড় বাগানের বাড়ি চিনতে না পারলেও আমাকে চিনে বার ক'রতে উল্কার মোটেই বেগ পেতে হয় নি। অফিসের ছুটির পর একদিন ড্যালহাউসি স্কোয়ারের জি, পি, ওর সামনে উল্কা আমার পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো।

—খুব ঠকিয়েছেন আমাকে !

উল্কাকে দেখে আতঙ্কিত হ'লুম।

উল্কা বললে—চলুন, কফি হাউসে যাওয়া যাক্।

আপত্তি জানিয়ে বলি—বিশেষ জরুরি কাজ আছে কিন্তু। আজ থাক।

উল্কা কোন কথাই শুনলে না। রোজ রোজ ফাঁকি দেবেন—তা চ'লবে না। চ'লুন আগে কফি খাই; তারপর যাবো আপনার সঙ্গে—বৌদির সঙ্গে আলাপ ক'রবো।

প্রমাদ গুণলাম আমি। উল্কার এ প্রস্তাব গ্রহণ করবার সামর্থ্য এবং সাহস আমার নেই। স্পষ্টই ব'ললুম—আমার বাড়িতে অসুবিধে অনেক।

উল্কা ব'ললে—সুবিধের আশায় আমি যাচ্ছিনে। ভয় নেই আপনার বৌকে কেড়ে নিচ্ছিনা।

—না, সেজন্যে বলছি নে। কী জানেন, আমার স্ত্রী সেরকম সোশ্যাল নয়। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে!

আমার কথায় সহজ কণ্ঠে উল্কা ব'ললে—ও বুঝেছি, গৃহ-শান্তি নষ্ট হবে আপনার।

উল্কার এ কথায় কোন জবাব দিতে পারলুম না।

উল্কা ব'ললে—কিন্তু কফি হাউসে? সেখানে ত আপনার স্ত্রী নেই।

অগত্যা রাজি হ'তে হ'ল।

উল্কার ধোঁওয়াটে ফিকে শাড়িতে জীবন-মালিন্য ফুটে বেরুচ্ছে। সিঁথি মূলে সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখায় তাকে শীতের সন্ধ্যায় আরও করুণ দেখাচ্ছে যেন।

বললুম—বিয়ে ক'রলেন কবে?

সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে উল্কা ব'ললে—আমাকে আপনি ব'লছেন কেন? না, এতে কিন্তু আমি ভারি ব্যথা পাচ্ছি।

সংশোধন ক'রে নিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলুম—এখন কোথায় আছো উল্কা।

—টালিগঞ্জে। আমার মুখে 'উল্কা' সম্বোধন শুনে উল্কা মিনতি-ভরা কণ্ঠে ব'ললে—আমাকে আর ও নামে সম্বোধন ক'রবেন না। ওতে আমি কষ্ট পাই। আমাকে সবিতা ব'লবেন। আমি সবিতা।

কফির টেবিলে ধোঁওয়াটে শাড়ির ধূসরতায় সবিতা কারুণ্য বিস্তার ক'রলেও মনে যেন মোহ জাগে। জীবনে এ মুহূর্তকে অনেকদিন আগে হারিয়ে ফেলেছি। ঘর, সংসার, অফিস, অভাব আর অনটনের মাঝে দৈনন্দিন জীবনে এ মুহূর্ত আর আসে না। কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে এই উল্কা—না, সবিতা। টকটকে লাল শাড়িতে জীবন প্রখরতায় যে নারী বহু পুরুষের জীবনে উত্তাপের সঞ্চার ক'রেছে—ধূসর স্তিমিত জীবনেও তার রেশটুকু এ মুহূর্তে উপেক্ষণীয় নয়।

সবিতা ব'লে যেতে লাগলো তার জীবন-ইতিহাস। সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সকরুণ!

বিয়ে সে ক'রেছে আজ পাঁচবছর। কিন্তু বিবাহিত জীবন তার বিড়ম্বিত। পাঁচবছরে তিনটে সন্তান-সন্ততির জন্ম দিয়ে স্বামী তার নিরুদ্দেশ। মোহ কেটে গেছে সবিতার। বহু পুরুষকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠ'কেছে সে। এখন ইন্‌সিওরেন্সের দালালি ক'রে নিজে এবং সন্তান-সন্ততির ভরণ পোষণ চালাতে হয়। এর পর পাকিস্থানের আত্মীয়-স্বজনের এক বিরাট বোঝা তার ঘাড়ে চেপেছে। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কেস চ'লেছে। পাঁচ-মাসের বাড়ি ভাড়া বাকী পড়ায় ইজেক্‌মেণ্টের স্যুট ফাইল্ ক'রেছে বাড়িওয়ালা। এ আশ্রয়টুকু হারিয়ে শীঘ্রই তাকে রাজপথে দাঁড়াতে হবে। ইন্‌সিওরেন্সের কেসও আর পাওয়া যায় না, অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়।

—জীবনে অনেক আশা ছিল সমীরদা—সবিতার চোখ দু'টি ছল ছল ক'রে ওঠে!

বেদনা পাই তার কথা শুনে।

সবিতা ব্যাগের ভেতর থেকে প্রোপোজলের ফরম বার ক'রে অনুরোধ জানায়—অন্ততঃ দু'হাজার টাকার একটা কেস করুন আমার কাছে।

সমবেদনায় মন আমার ভ'রে গিয়েছিল। সবিতার সঙ্গে অনেক রূঢ় ব্যবহার করেছি। তবুও নিজের অবস্থাকে না ভুলে আপত্তি জানালুম।

সবিতা অনুনয় জানালে—অন্ততঃ একহাজার টাকার। সম্মতি জানিয়ে ফরম সই ক'রলুম প্রোপোজালের।

—ডাক্তারের পরীক্ষা?

ব'ললুম—আমার বাড়িতে নয়। অফিসেই তাঁকে নিয়ে এসো।

কফির বিল চুকিয়ে দু'জনে নেমে এলুম—শহরের রাজপথে। সবিতা ব'ললে—বড্ড কষ্টে প'ড়েছি সমীরদা। দু'একটা কেস পাইয়ে দেবেন।

সবিতা চ'লে গেল রাজপথ বেয়ে। তার ধূসর রঙের

শাড়িটা দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হ'লে কেন জানি নে আমারও চোখ দু'টি অশ্রু-সজল হ'য়ে উঠলো।

একবছর পরের কথা।

উল্কা কিংবা সবিতার কথা ভুলে গেছি জীবনের কোলাহল-সমুদ্রে। তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি কোনদিন এর মাঝে। অফিস থেকে ফিরবার পথে ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে বাস থেমে গেল। লাল নিশানধারী বিরাট উদ্বাস্তু মিছিল এগিয়ে আসছে জল তরঙ্গের বন্যায়। 'ধুবু'লিয়া আশ্রয়-শিবির অত্যাচারের প্রতিকার চাই', 'বাস্তু মোদের দিতেই হবে', 'বাস্তুহারা বাঁচতে চায়।'

মিছিলের পুরোভাগে মহিলাদের মধ্যে লাল টক্‌টকে শাড়ির রক্ত-ঔজ্জ্বল্যে যে মেয়েটিকে নিশান বহন ক'রে নিয়ে যেতে দেখলুম—তাকে ওই জনতার মাঝে ও চিনতে আমার কষ্ট হ'ল না। সে হ'চ্ছে উল্কা।

সবিতার ফিকে শাড়িতে যে জীবন-মালিন্যকে লক্ষ্য ক'রেছিলুম—টক্‌টকে লাল শাড়িতে দৃপ্তপদে আজ তার চিহ্নমাত্র আর নেই।

উদ্বেলিত কণ্ঠ তরঙ্গ ইথারে ভর ক'রে চার পাশের জনমণ্ডলীতে যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ ক'রছে। 'অত্যাচারের প্রতিকার চাই।'

ক্ষেপে ওঠে মানুষের দল। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই। গৃহহীন দুর্ভিক্ষ কণ্টকিত ক্ষয়িষ্ণু মুমূর্ষুর দল আজ প্রাণ-ধারণের দাবী নিয়ে এগিয়ে চলেছে রণক্ষেত্রে বীর যোদ্ধার ভাবে। আর তাদের পুরোভাগে রয়েছে সবিতা—উল্কার প্রচণ্ড তেজ আজ তার জীবনে। ধোঁওয়াটে শাড়িতে জীবন আজ আর তার ধূসর নয়।

কিন্তু কিসের সংগ্রাম? এবং কার সঙ্গেই বা বিরোধ? সে যুক্তি মুহূর্তের উত্তেজনায় স্থান পায় না। বিচার-বুদ্ধির অবকাশ নেই। শান্তিকামী পথচারির দল নিরাপত্তার আশ্রয়ে ছুটে চ'লেছে। শান্তিরক্ষাকারী শান্ত্রীদল এগিয়ে আসছে। লম্বা মিছিলকে ঘিরে রাখা হল।

বোমা ফাটছে; টিয়ার গ্যাসের বারুদে বাতাস ঝল্‌সে উঠছে।

কিন্তু এ উত্তেজনাও প্রশমিত হ'ল—পুলিশ আর শান্ত্রী দলের তৎপরতায়। ধরপাকড় সুরু হ'তেই আর টিয়ার-গ্যাস ছড়াতেই রাস্তার উত্তেজিত জনমণ্ডলী স'রে গেল।

মিছিলের পাশ কাটিয়ে বাস ছুটে চললো। উত্তেজিত কণ্ঠের স্তিমিত ধ্বনি ক্রমশঃ মিলিয়ে যেতে লাগলো—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

বাসের শান্তিপ্রিয় যাত্রীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো—কি বিপদ! রাস্তাঘাটে আর চলতে দেবে না—হুজুগের দল। আর একদল খেঁকিয়ে উঠলো এ কথায়।—থামুন মশায়! মাছের তেলে মাছ ভেজে দিব্যি আছেন—বুঝবেন কী তাদের কথা; যারা যথাসর্বস্ব খুইয়ে আজ হুজুগের দলে ভিড়েছে।

বাসের মধ্যেই একটা সংঘর্ষ বাধবার উপক্রম।

বাসের ঘণ্টা টেনে নেমে পড়ি, আমার চোখে টিয়ারগ্যাস লেগেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে জ্বালাময় চোখ দু'টি ব'য়ে হুহু ক'রে নেমে আসে বিষাক্ত অশ্রু। উল্কার কি হ'ল কে জানে!

দোটানা

শান্তশীল দাশ

ঊর্ধ্বে দেবতা ডাক দেয় বারে বারে,
নিম্নে ডাকিছে দেবরিপু শয়তান;
দু'য়ের আঘাত লাগে মানুষের দ্বারে;
এ-মানুষ শোনে দু'জনার আহ্বান।
দেবতার ডাকে মন তার ছুটে যায়;
স্বর্গের সুখ শত কামনার ধন;
সে-পথ লভ্য দুঃখের সাধনায়,
তবু চলে তার পাথেয় অন্বেষণ।

শয়তান এসে বলে তার কানে কানে,
মিথ্যার পিছে ছুটে কর কালক্ষয়;
দুঃখ শুধুই দুঃখের পথে টানে,
কাম্য তোমার দেবে মোর সঞ্চয়।
এমনি ক'রেই দেবতা ও শয়তান
বারে বারে ডাক দেয় মানুষের দ্বারে;
কখনো সে শোনে দেবতার আহ্বান,
শয়তান কভু টেনে নিয়ে যায় তারে।

দেবতার অর্ঘ্য

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

নববর্ষের উজ্জ্বল উষা। মনের মাঝে গুঞ্জরিছে অতৃপ্তির বেদনা-গীতির রেশ

ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত্ত-আঘাতে
উড়ে হক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।
অন্তরে জাগিছে নবীন আশা—
হে নূতন, এস তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে
ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তূপে॥

অকস্মাৎ কানে গেল পুরাতন পূজার সঙ্গীত, শিশুকণ্ঠের মাধুরী, ব্রতচারিণী কুমারী কণ্ঠে উচ্চারিত মন্ত্র—

আকন্দ ফুল বিল্বিপত্তর তোলা গঙ্গাজল
তাই পেয়ে তুষ্ট হন ভোলা মহেশ্বর।

না অসম্ভব!

নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সে কথা যে ভুলে যাই। পুরাতনের সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যে জীবন পূর্ণ। কে সফল কে নিষ্ফল সে তর্কের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। নানা স্বার্থ, বাসনার নব নব রূপ পুঞ্জীভূত করে—ধূলার পরে ধূলা তৃণের পরে তৃণ।

কুমারীর সরল মন্ত্র। দেবতার পূজার অর্ঘ্য নিশ্চয়ই তুষ্ট করে ভোলা মহেশ্বরকে। কিন্তু সকল দেবতা তো আশুতোষের মত অল্পে সন্তুষ্ট হন না। আর ঐ শিশু নব নব বর্ষে বেড়ে উঠবে। তখন নানা নূতন উপকরণে নৈবেদ্য সাজিয়ে দেবতার বেদীতে অর্ঘ্য দেবে। একদিন হয়তো প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় কালীঘাটে জোড়া ছাগের মানত করবে, হয়তো একদিন্ প্রিয় পুত্রের আরোগ্য কামনায় দেবী-পীঠে বুক চিরে রক্ত দেবে।

সমাজের শিশুকাল হতে চিরকাল মানুষের প্রাণে উদ্বুদ্ধ বহু নব আশা। তাই সে সদাই সচেষ্ট নতুন নতুন শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। এ অনুপ্রেরণা চিত্তের গভীরে সংস্কাররূপে চির-বিদ্যমান। কিন্তু এই বিজয়-অভিযানের প্রতিবন্ধক জড় প্রকৃতির অজ্ঞাত অন্ধ-শক্তি, হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ এবং অন্য শক্তিমান মানবের বল ও বুদ্ধি। প্রকৃতির উপর আধিপত্য করবার জন্য আদি যুগের মানুষ গাছ কাটে, কিন্তু গাছ গজায় নবীন ভঙ্গিতে; নরের শত্রু বন্য জন্তুর গোপন আবাস স্থল হয়। যেদিন সে কৃষি বিদ্যা অর্জন করলে, সেদিনও কৃষকের বিপদ ও বিরক্তি সঞ্চার করলে স্বচ্ছন্দ-জাত তৃণগুল্ম এবং শস্য ভোজী পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গ। এরা যেন কোন্ শক্তিশালী গোপন শত্রুর অভিযান-তৎপর লুটেরা সৈন্য।

মনের কুহেলিকার মাঝে আভাস এলো অপার্থিব শক্তির। সেই অপরিচিতের কাছে মাথা হেঁট করলে সংঘশক্তি। সমাজ-নায়কের তুষ্টির উপায় নিজের পরিশ্রম-লব্ধ ফল ও শস্যের অংশ দান; শিকারে নিহত বরাহ, হরিণ, বন্য-মহিস ও সুস্বাদু পক্ষীর দেহের কতকটা নিবেদন। তাতে সর্দার তুষ্ট থাকে, দাতার জীবন প্রবাহ বহে ভালো। ক্রমে সে নেতৃত্বের আসনের দিকে অগ্রসর হয়। লুকানো শক্তিকে তুষ্ট করতে হ'লে মানুষের পক্ষে তো সেই পথই সরল। সে সরল পথ অবলম্বন করলে মানুষ। কতকটা শূকরের মাংস, হরিণের দেহ, মেষের মেধ এবং নিহত পক্ষী অজানা দেবতার ভোগে নিবেদন ক'রে আদি নর আত্ম-প্রসাদ লাভ করলে, মনে বল পেলে, মানত করলে সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সাথে সাথে আরও উপহারে সাজাবে অর্ঘ্যের ডালি। তার বংশধর আজিও সে প্রক্রিয়া পাকে প্রকারে, নূতন নামে, সূক্ষ্ম ভাবের অন্তরালে অনুবর্ত্তন করছে। ক্রমে পূজার উপকরণ সম্বন্ধে প্রজ্ঞাপন মানুষ বুঝলে—

জগতটা যে মায়ের গড়া পোড়া মন তুমি কি তাও জাননা।
মায়ের পূজায় দাও তুমি মন আলো চাল আর ছাগলছানা॥

মানুষ বিশ্ব-বিমোহন বিশ্ব-স্রষ্টাকে স্তবে তুষ্ট করবার অনুপ্রেরণা বোধ করলে চিত্তে। কিন্তু সে ছন্দের আখ্যান বস্তুর মাঝে সসীম মনের ভাব তরঙ্গে রহিল—মানবের উৎকণ্ঠার মান। তাই বাল্মীকির কাব্য-প্রেরণার উৎসে কবি দেখেছিলেন আদর্শ—

দেবতার স্তব-গীতে দেবেরে মানব করি আনে
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।

তাই পূজার উপকরণের আলোচনায় দেখি এক সনাতন শাশ্বত নীতির স্ফুরণ—মানবেরে যাহা দিতে পারি তাই দিই দেবতারে।

সত্যই তো ভক্তির ডালায় কি বস্তু, কি ভাব, কি স্তব, কি স্তুতি, অর্ঘ্য রূপে সাজাবার সময়, পদে পদে মানুষ উপলব্ধি করে—আর কোথা পাব? যদযদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টায় কল্পয়েৎ।

প্রত্যেক সমাজে যুগে যুগে অবতার, মহা-মানব, দার্শনিক ও ধর্মোপদেশক ভগবানের বেদীতে আত্ম-নিবেদন প্রকৃষ্ট নৈবেদ্য ব'লে নির্দেশ করেছেন। সমন্বয়ের অবতার, ভাব-গ্রাহী জনার্দন নর-রূপে অবতীর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-নিবেদনের সূক্ষ্ম নীতি বিবৃত করেও মেনে নিয়েছিলেন যে দ্রব্য-যজ্ঞ ছাড়তে পারবে না সংসারের জীব। তিনি মাত্র বেদের কর্মকাণ্ডের গোলক-ধাঁধায় প্রবেশ ক'রে আত্ম-বিস্মৃতি হ'তে মুক্তি লাভের জন্য ভক্তকে সাবধান করেছিলেন। কিন্তু সকল মানুষের মনের দেবতা বাসুদেব বুঝেছিলেন নর-চিত্তের গতি। তাই তিনি বলেছিলেন—পত্র,

পুষ্প, ফল ও জল ভক্তি ভরে যে কেহ আমাকে নিবেদন করে, আমি সাদরে সে উপহার গ্রহণ করি।

পৃথিবীর ইতিহাসে দ্রব্য যজ্ঞের কথা স্মরণ করলে দুটা কথা না মানবার উপায় নাই। প্রথমতঃ আস্তিক্য বুদ্ধি আপনি স্ফুরণ হ'য়েছে মানুষের মনে এবং দ্বিতীয়তঃ নিজের পার্থিব স্বার্থের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মানুষ সেই অজানা দৈব-শক্তির বেদীতে নিজের প্রবৃত্তি অনুরূপ অর্ঘ্য-দান করেছে, এবং করবে চিরদিন। এই পূজার উপকরণের মধ্যে মাধুরীও আছে, বিভীষিকাও আছে। ব্রত-চারিণী কুমারীর আকন্দ ফুল বিল্ব পত্রের অভিব্যক্তি হ'য়েছে দুর্লভ মনুষ্য জীবের রক্ত-মাংসের নৈবেদ্য হ'তে। আজ দেবতার প্রীতির জন্য নর বলির কথা শুনলে বা ভাবলে, প্রাণ শিহরে ওঠে। কিন্তু ধীর ভাবে বিচার করলে বুঝি—নর বলির বিভীষিকা এবং নৃশংসতা হ'তে আজিও মনুষ্য-সমাজ মুক্ত নয়। শব্দের চাতুরী দেবতার নাম পালটে দিয়েছে—কিন্তু অর্ঘ্য-রূপে অভাগার ফলং নরকং রূপ অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়নি।

সকল সমাজই একদিন না একদিন দেবতার নামে ধর্মের নামে, নরবলি দিত। আর সে প্রত্যেক হত্যাটির মূলে বৃষ-কেতু বলি বা এব্রাহিম কর্ত্তৃক ইস্মাইলের কোরবাণীর মহত্ব বিদ্যমান থাকতো না। প্রাক্-কালের নর-বলির অন্তে কোথাও ছিল ধর্মান্ধতার মূঢ় অপচয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ নিষ্ঠুরতার মূলে অবশ্য ছিল পাশব-হিংসা-বৃত্তি বা রাষ্ট্র-নীতির চালবাজি। সংঘ-নায়ক দেবতার বেদীতে প্রতাপবান প্রতিদ্বন্দ্বীর উচ্ছেদে নিজের আসন নিরাপদ করত। নিজের দলস্থ লোকের প্রসাদ-লাভ ও ভিন্ন সংঘের শত্রু নিপাতেরও উপায় ছিল নর-হত্যা—অবশ্য পূজার অভিনয়ে। তার নিষ্ঠুরতার তীব্রতা প্রশমনের জন্য দেব-মন্দিরে ঢাক-ঢোল্ বাজতো, তাণ্ডব-নৃত্য হ'ত, পূজারী ভক্ত-বৃন্দের ললাটে নর-রক্তের তিলক দিত। রাষ্ট্র দেবতারে বেদীতে রোমক অর্ঘ্য দিয়েছিল একদিন জুলিয়াস সিজারের বুকের উষ্ণ রক্তে। তেমনি ইংলণ্ড নিবেদন করেছিল রাজা চার্লসের মুণ্ড বৃটেনিয়া দেবীর বেদী-মূলে। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দেবতার গিলোটিন যূপ-কাষ্ঠে ফরাসী রাজা, রাণী, রাজকুমারের সঙ্গে কত শত নর-নারী গর্দান দিয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। আমাদের যুগে সোভিয়েট দেবতার বেদী-মূল রঞ্জিত হয়েছে বহু ভিন্ন পন্থীর শোণিতে। যে রাজনীতি প্রাণ-নাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করে সে স্বদেশ-দেবতার কল্যাণের অজুহাতে বিপক্ষ পক্ষের লোককে কারারুদ্ধ করে। অবশ্য কংস ছিল সেকালের দুর্বৃত্ত শাসক—ইন্টারণবাদী নবীন আদর্শের পুরোহিত। প্রভু যীশু ও মহাত্মা গান্ধীর প্রাণ-নাশের মূলেও অল্প বিস্তর নর-বলির বৃত্তি বিকসিত।

মানুষের ভাব-ধারা এক একবার তুঙ্গে ওঠে আবার গড়িয়ে পড়ে। কারণ আজিও আমরা যত জোর গলায় বলি—সব মানুষ সমান—ততই দেখি মানুষ হ'তে মানুষে জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি ও দৈহিক বলের পার্থক্য। ভারতে অপৌরুষেয় শ্রুতি যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণ করেছে, কোনো যুগে, কোনো দেশে, কোনো মানব সে সত্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু ঋগ্বেদেই পুরুষ-মেধ, অশ্ব-মেধ প্রভৃতি হিংসাত্মক বহু যজ্ঞের বর্ণনা আছে। কর্ম-ক্ষেত্রে নরমেধের দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু বহু নৃপতি যে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং পরকালে রক্তমাখা চরণে ইন্দ্রের নন্দন কাননে বিরজা-কূলে পরিভ্রমণের অধিকার লাভ করেছিলেন, সে কথা বহুধা শ্রুত—পুরাণে ও কাব্যে। সোম-রস পান প্রাচীনের দেহে এবং মনে বলসঞ্চার করেছে।

তন্ত্রশাস্ত্রের পশু বধের ব্যবস্থা হিন্দু আজিও মানে। শাক্ত ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বিদ্যমান ভাগবতধর্ম, শ্রীচৈতন্যের প্রেম ধর্ম প্রভৃতি। আচার্য্যেরা বহু চেষ্টা করেছেন, জীমূত মন্দ্রে গেয়েছেন—জীবে দয়া নামে রুচির সার্থকতা—কিন্তু জাতির কণ্ঠে সমস্বরে ধ্বনিত হয়নি পঞ্চ-শীলের প্রথম শীলের প্রতিজ্ঞা—পানাতিপাত বেরমণি শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি—জীব হিংসা হ'তে বিরামলাভ করাই আমি শিক্ষার সোপান করব।'

এ বিষয়ে আরও কিছু বলবার পূর্বে আমি একটা কথা বলি। তান্ত্রিক প্রমাণ করিতে পারেন কালীঘাটে ছাগ বলি—ছাগের, পূজারীর, ভক্তের এবং ঘাতকের মুক্তির উপায়। সে তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার বলবার জ্ঞান বা অধিকার নাই! আমি স্বীকার করছি তার বিশ্বাস। আমার নিজের মনে হয়—আবার বলি এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত মত—যে মহা-নির্বাণ মন্ত্রে পশু-বলি ও সুরাপানের যে কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ হ'য়েছে, তার উদ্দেশ্য বৃথা জীব হিংসা এবং সুরাপান বন্ধ করা। আমি ঐতিহাসিক সত্য বর্ণনা করছি এ প্রবন্ধে। তান্ত্রিক যোগী বা সন্ন্যাসীর কথা বলছি না বা কারও অশ্রদ্ধা করবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমাদের মত সাধারণের জীবনে যা ঘটে তা হ'তে বোঝা যায় পূজার মণ্ডপে যেভাবে আমরা খণ্ডিত-শির ছাগ-দেহ কাঁধে করে নৃত্য করি, তাতে মনে হয় বনের পশু বধ হয়, কিন্তু মনের পশু পুষ্টিলাভ করে।

আমি অজ্ঞ, জানিনা সকল তান্ত্রিক স্বীকার করবেন কিনা—পঞ্চমকার রূপক—নামগুলা যাই হক—প্রক্রিয়া হিংসা বা কামাচার বর্জ্জিত। আগম সার সেগুলির এইরূপ বর্ণনা করেছেন—

মদ্য—ব্রহ্ম রন্ধ্র হ'তে যে অমৃতধারা ক্ষরণ হয়—তার পানে আনন্দ। মদ্যসাধনার এই তত্ত্ব।

মাংস তত্ত্ব—মা শব্দে রসনা, তার অংশ রসনাপ্রিয়। সুতরাং যে বাক্য-সংযমী—সেই মাংসাসী সাধক।

মৎস্য-সাধনা—গঙ্গা-যমুনার মধ্যে মৎস্য বিচরণ করে। ঈড়া পিঙ্গলা—গঙ্গা-যমুনা—প্রাণায়ম সাধনাই মৎস্য সাধনা।

মৈথুন-সাধনা—ব্রহ্মে বিলীন—যোগের ক্রিয়া। এ সাধনা—আত্মাতেই রমণ। যিনি আত্মাতে রমণ করেন তিনি আত্মা রাম—অতএব রাম নাম তারক ব্রহ্ম নিশ্চিত।

মুদ্রা—বহু-প্রকার প্রক্রিয়া। অবশ্য এ-সব গুরুর মুখে শিক্ষণীয়।

প্রকাশ্য ধর্ম-পালনে পশুবলি সবাই বিদিত। ছাগ, মেষ, মহিষ ব্যতীত পাহাড়ে শূকর, পায়রা, হাঁস, মোরগ প্রভৃতির অর্ঘ্য প্রচলিত। গুহ্যতান্ত্রিক, কাপালিক প্রভৃতির ধর্মাচরণে নাকি নর হ'তে ছাগল শিশু অবধি যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিত। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় এক ধর্মঠাকুরের মন্দিরের পরিচয় দিয়েছেন। সেথায় হাজারটি ছাগ বলি হ'ত, শূকর, কুক্কুট [illegible]। ধর্মঠাকুর নাকি ভগবান বুদ্ধের তান্ত্রিক

সংস্করণ। আমার মনে হয় যখন বৌদ্ধ ধর্মের উচ্ছেদের প্রয়োজন হল, ধর্মকে অনাচারের সঙ্গে মিলিয়ে ঐ রকম অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছিল। এসব দুরভিসন্ধি। শাস্ত্রী মশায় জানবাজারের এক মন্দিরে ধর্মঠাকুর এবং পঞ্চানন্দকে একত্র দেখেছিলেন। ধর্ম পূজায় নৈবেদ্যে দুবর্ণীয় পদার্থ ছিল না। কিন্তু পঞ্চানন্দকে নিত্য অন্ততঃ এক বোতল মদ দিতে হ'ত। একদিন সুরা বিহীন নৈবেদ্য দেখে ঠাকুর পালিয়েছিলেন। পরে তার পাথর মূর্তি এক মদের দোকানের সুরা-ভাণ্ডের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল।

এক পুঁথিতে হয় মাংস, গোমাংস প্রভৃতি অর্ঘ্যের কথা আছে। পণ্ডিত মশায় সে পুঁথিটি অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের তন্ত্র বলে নির্দেশ করেছেন। গুহ্য-তন্ত্রের কোথাও দেবতার নাম বোধ বা বুদ্ধ বা ধর্ম থাকলেই সে ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ বলা বিচক্ষণ বিবেচনা হবে না। সেই পুঁথিতে যৌন কদাচারের পাশবিকতার এমন বর্ণনা আছে যে শাস্ত্রী মহাশয় দণ্ডবিধির ভয়ে সে সব কুৎসিত ব্যাপার বর্ণনা করতে পারেন নি।

মোট কথা আমাদের দেশে হিন্দু সমাজের কোনো কোনো স্তরে শোণিত ও মাংস নৈবেদ্যের প্রচলন ছিল এবং আজিও আছে। লোক-সংখ্যা অনুপাতে তেমন আনুষ্ঠানিকের পরিমাণ অতি অল্প। প্রেমধর্ম-ধৌত বাংলাদেশে কিন্তু পশু-বলির বাহুল্যের কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

শিলঙের খাসিয়াদের মধ্যে থেদ সর্পের পূজার বেদীতে নর-শোণিত অর্ঘ্যের কথা পাঁচিশ বৎসর পূর্বেও শোনা গেছে। চার বৎসর পূর্বে শুনে এসেছিলাম যে বাগে পেলে স্নাংগ্‌পো মদ্যপান ক'রে উৎথার বা অর্থাসীকে লগুড়াঘাতে হত্যা ক'রে তার নাক থেকে রক্ত নিয়ে বাস্তুসাপ থেদের ভোগ দেয়। আমার মনে হয় আধুনিক দিনে কথাটা অলীক এবং ভীতি-প্রসূত।

শ্রীকৃষ্ণ দ্রব্যময় যজ্ঞ হ'তে জ্ঞান যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায়! তথায় জৈব নৈবেদ্যের উল্লেখ নাই। ভগবান বুদ্ধের পঞ্চশীলের নিয়মের প্রথম শিক্ষাপদ— জীব হিংসার বিরুদ্ধে। পরেশনাথ, মহাবীর প্রভৃতি তীর্থঙ্কর মহর্ষিরা অহিংসা পরমোধর্ম নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। প্রভু যীশু বল্লেন—তুমি হত্যা করতে পারবে না। বল্লেন, এক গালে চড় মারলে অন্য গাল পেতে দেবে। বলির জন্য যারা য়িহুদী মন্দিরে ঘুঘু বিক্রয় করত, তিনি তাদের প্রাঙ্গণ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। মহাপ্রভু বল্লেন—মেরেছ বোক্‌নোর কানা তা' বলে কি প্রেম দেব না। তথাপি

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য-নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ।

য়িহুদী সিনেগগে জিহোভার বেদীতে জীব-বলি আজিও প্রচলিত ওল্ড টেস্টামেন্টের লেভিটিকাস অংশে কাঁচা রক্ত-মাংস এবং পোড়া মাংসের অর্ঘ্যের খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে। কোন্ সিদ্ধির জন্য বলীবর্দ্দ মিধন, কোন্ সুফলের জন্য ছাগ বা মেষ বা ঘুঘুর নৈবেদ্য প্রশস্ত, সে সব সমাচার তথায় লিপিবদ্ধ আছে। [illegible] গো-[illegible]সের অর্ঘ্য দিতে হলে কিরূপে মাংস ধুতে হবে যাতে [illegible] ঊর্দ্ধপথে স্বর্গের দিকে উড়তে পারে, সে বর্ণনা নৈষ্ঠিকের কর্তব্য-পথ নির্দেশ করেছে।

ঐ দেশেই যীশু প্রার্থনা ও আত্মোৎসর্গের পথ দেখালেন। এদেশে বুদ্ধ অষ্টমার্গ, পঞ্চশীল প্রভৃতি শুদ্ধির উপায় নির্ণয় করলেন। কিন্তু ভক্ত কি পারে, শ্রদ্ধায় তাঁদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য না দিয়ে? বলেছি এ সংস্কার, এ মানবিকতা। অর্ঘ্যের ডালি আসে আমাদের চিত্তের গভীর হতে। শ্রীকৃষ্ণ চতুর। তিনি নিষেধ করেননি পত্র পুষ্পের অর্ঘ্য। ক্যাথলিক খৃষ্টান ফুলে সাজায় গির্জার বেদী, মানসিক করে ভগবানের কাছে, খৃষ্টের নামে। মাস্ প্রার্থনায় রুটি ও মদ দেয় খৃষ্টের দেহ ও রক্তের প্রতীক রূপে। প্রটেষ্টাণ্ট সুবিধা পেলে ফুল দেয় অন্ততঃ পিতৃ-সমাধিতে। বৌদ্ধ মন্দিরে ফল, ফুল, গন্ধ-দ্রব্য, খাদ্য অবধি নিবেদন করে মহিলারা। বর্মার সোয়ে দাগন পাগোডায় ভক্তি উপহারের একটা প্রকাণ্ড সংগ্রহ-শালা আছে। আমি দেখেছি সেথায় এক ছাত্র খেলায় পাওয়া একটি রূপার কাপ প্রভু বুদ্ধের চরণে অর্পণ করেছে। শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে একেবার অন্ধকার কোণে দেখেছিলাম এক বাঙ্গালী জননী একেলা বসে সম্মুখে কতকগুলি ফল রেখে বলছেন—গোবিন্দজী খাও বাবা। তুমি যে গোপাল, আমি যে মা। খাও বাবা। আমরা চোখের জল মুছতে মুছতে মন্দির থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে এসেছিলাম।

ওঁরা তো চিত্ত-নিবেদনের উপদেশ দিলেন। ঋষিরা শিব-রূপে পরমাত্মাকে ভজনা করতে শিক্ষা দিলেন—আমাদের মনের পটে আঁকতে চাহিলেন তাঁর শ্মশান-নিবাস, তাঁর বিরাট বৈরাগ্য, নিরৈশ্বর্য্য মহাত্যাগের আদর্শ। সেন্টপল হিব্রুদের বলেছিলেন—মুসা তাঁবুর মন্দিরে শুদ্ধ আত্মা ঈশ্বরকে অভিষেক করেছিলেন—ছাগ এবং গো-বৎসের রক্তে ও মাংসে। কিন্তু যীশু স্বর্গের ব্যবস্থা করেছেন—নিজের রক্তে।

এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্ঘ্যে সাংসারিক ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য ত্যাগের পরিচয় দিয়েছে চিরদিন। হয়তো সে দানে যশের বা সৌভাগ্যের লোভ আছে কিন্তু তা হলেও সে ত্যাগ ধর্ম্মের নামে, দেব-সেবার জন্য। আমি বলছি মন্দির, গির্জা, স্তূপ, দাগোবা চোরতেন এবং মসজিদের কথা। শ্মশানবাসী মহাযোগী মহাদেবের মন্দির বারাণসীর শিল্প-শোভা—বিশ্ব-বিশ্রুত-অধুনা সোমনাথের নব-মন্দির রাজনীতি প্রণোদিত। যিনি গোঠে মাঠে গরু চরাতেন, তাঁর দৃষ্টি-শোভন পাথরের মন্দির মথুরা বৃন্দাবনকে সমৃদ্ধ করেছে। যিনি বোধি-দ্রুমতলে তৃষ্ণার অবসান করেছিলেন, এসিয়ার বহু গগনস্পর্শী সৌধ তাঁর মহিমার স্মৃতি-ক্ষেত্র। ধীবর সহচর সন্ন্যাসী যীশু, দীন অপরাধীর মত ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য তাঁর স্মরণার্থ প্রার্থনা গৃহ। পাশ্চাত্যের সংগ্রহ-শালা পরিভ্রমণ করলে মনে হয় যীশু আর মাতা মেরীকে কেন্দ্র করে শিল্পের উৎকৃষ্ট বিকাশ। ইসলামের প্রথম মসজিদের আজানের স্থান ছিল খেজুর গাছের তৈরী—তার তুলনায় জুমা মসজিদ, মোতি মসজিদ কী মূল্যবান ও সুন্দর। তাই বলছিলাম অর্ঘ্য নিবেদনের প্রবৃত্তি মানুষের সংস্কার-মূলক।

বহু প্রাচীন জাতির পরিচয় পাওয়া যায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের পরিশ্রম ও অনুশীলনের ফলে কিন্তু মৃত জাতি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা নির্ভুল হতে পারবে না—[illegible] বিভিন্নতার জন্য। কারণ ব্যাখ্যা করেন পণ্ডিত

নিজের জাতীয় কৃষ্টির মানে। অন্ততঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ব্যাখ্যায় বহু কৃতবিদ্য প্রথিতযশ পণ্ডিতের দৃষ্টির বক্রতা উপলব্ধি করেছি।

পুরাতত্ত্ব-বিশারদদের সমাচার হতে বোঝা যায় প্রাচীন মিশর আসিরিয়া, ব্যাবিলনে জীব-বলি প্রচলিত ছিল। নরবলির প্রথা ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ তা' বন্ধ হয়েছিল। অবশ্য বৃষ প্রভৃতির মাংস দেব-ভোগ্য ছিল এবং প্রাচীনেরা প্রসাদ ভক্ষণ ক'রে কৃতার্থ হ'ত। অনেক উৎকীর্ণ শিলা চিত্র হতেও সে ধারণা হয়। কিন্তু মিশরে এপিস ষণ্ড ছিল আমাদের ধর্মের ষাঁড়ের মত আদরের জীব। তা সত্বেও মিশরবাসী ষণ্ড বলি দিত। প্রাচীন জাতি এবং অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য সমাজে যে জীব টাবু সে অবধ্য। ফিলিপাইন প্রভৃতি দ্বীপে তথা আমেরিকার টোটেম খুঁটিতে যে সব জীবের চিত্র থাকে সে সব জীব সেই সেই সমাজে সম্মানিত, সুতরাং বলির বাহিরে। প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে নরবলির পর্য্যাপ্ত প্রমাণ বিদ্যমান। তবে এখন বন্ধ হয়েছে।

গ্রীক ও রোমানদের নিজস্ব ইতিহাস আছে। সুতরাং সংবাদ পাওয়া যায় যে মদ্য, মাংস, শস্য প্রভৃতি ছিল দেব-ভোগ্য। গ্রীকদের মধ্যে শব-সমাধির প্রথা ছিল। ভারতের বৈদিক যুগে সমাধি হ'ত মৃতদেহের। আমরা যেমন চিতায় স্বর্ণ ও ভোজ্য দিই, গ্রীকরা কবরে ভোজ্য দিত। মিশর প্রভৃতি দেশেও ভক্ষ, বস্ত্র প্রভৃতি শবাধারে শোকার্ত আত্মীয়ের অবস্থানুসারে রক্ষিত হ'ত। গ্রীসে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে নির্ণয় হল—যখন আত্মীয়ের আত্মার গতি উর্দ্ধে, তখন পিণ্ড ভূগর্ভে পুঁতে রাখা অযুক্তিকর। তাই হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত পিতৃ-পিণ্ড।

গ্রীসে প্রত্যেক দেবতার বিশেষ অর্ঘ্য ছিল—দেবতার কল্পিত রুচি অনুসারে। তাই দেবতাদের বিশেষ বিশেষ বিশেষণ ছিল—ছাগ-খাদক, মেষ-ভোক্তা প্রভৃতি। দায়নৈসসের প্রিয় ছিল কাঁচা নর-মাংস। নর-মেধ যজ্ঞ তারই প্রীত্যর্থে হ'ত। রোমে হাড্রিয়ান সম্রাটের সময় অবধি নরবলি হ'ত মনে করেন ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা। উৎসবের উত্তেজনায় কেহ কেহ নর-রক্ত পান করত।

হজরত মোহাম্মদের ধর্ম-বিহিত কোরবাণীর কথা আমরা জানি। গরু, ভেড়া, ছাগল, উট প্রভৃতি ঈদোপলক্ষে নিহত হয় মুস্লিম জগতে। শূকর ইসলামের অস্পৃশ্য জীব। দৈনন্দিন জীবনে মুসলমান আল্লার নামে জবাই না করে মাংস খায় না। য়াহুদীও জিহোভার নাম নিয়ে নিত্য-ভোজ্য জীবের গলা কাটে।

কিন্তু ইসলামের পূর্বে আরবে রক্ত-অর্ঘ্য ও রক্ত-প্রসাদ পানের ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীন পারস্য, গ্রীক এবং হিন্দু আর্য্যদের অনুরূপ বহু অনুষ্ঠান কত্ত। কিন্তু জরথুষ্ট্রের আবির্ভাবের পর পূজা ও নেবেদ্যের রীতি আমূল পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। পারসিক হোমের বিধানে পশুমেধের কথা নাই। পূর্বে অশোকের প্রচারে বৌদ্ধধম প্রাক্তনস্থান আফগানিস্থান প্রভৃতিতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ঐ অঞ্চল বৌদ্ধ বিহারে পূর্ণ ছিল। এখনও সর্বাপেক্ষা বড় উৎকীর্ণ বুদ্ধ-মূর্ত্তি পাওয়া যায় আফগান পাহাড়ে। এ মূর্ত্তি মহীশূরের গোমত-রায় এবং মিশরের আবু সিম্বেলের মূর্ত্তি অপেক্ষা বৃহৎ। সুতরাং একথা ধরা যায় যে ধর্মের নামে নর-হত্যা ঐ প্রদেশে বৌদ্ধযুগের পর বন্ধ হয়েছিল। পারসিদের ধর্মানুষ্ঠানে হবন হয় বড় নিষ্ঠার সাথে।

পৃথিবীর অপর এক প্রাচীন সুসভ্য জাতি ছিল মেক্সিকোর আজতেক। মায়া সভ্যতার সমাচার যাদের মারফত ব্যাখ্যা হয়েছে তাদের স্বার্থ ছিল সে সভ্যতাকে দারুণ বর্বরতা প্রতিপন্ন করবার। স্পেনীয়দের বর্ণনা অনেকে অতিরঞ্জিত ভাবেন, কিন্তু মোটের ওপর বিজিত শত্রুকে বলি দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড মন্দিরে বৃহৎ পাত্রে পুড়িয়ে দেবতার অর্ঘ্যে দেওয়ার কথা অনেকে বিশ্বাস করেন। বহু মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল মন্দির-গুলির মাঝে। মনে হয় সেগুলি নর-বলির কল্যাণে সংগৃহীত।

এক বর্ণনা বলে এক প্রকাণ্ড অগ্নির চিতার ধারে বন্দীদের মন্ত্রপূত করে আগুনে আহুতি দেওয়া হ'ত। তারপর চিতাভস্মের ভিতর হতে তাদের দেহ উদ্ধার করা হ'ত। অগ্নিতে নিক্ষেপ করবার পূর্বে বন্দীদের মুখে গাঁজার গুঁড়া মাখিয়ে তাদের ঘিরে লোকে নৃত্য করত। অর্দ্ধদগ্ধ দেহ পুরোহিতেরা আঁকশী দিয়ে টেনে বার করে তাদের হৃদ্‌পিণ্ড সংগ্রহ করত।

তেজকাট্‌লিপোকা দেবতার উদ্দেশে যে নরহত্যা হ'ত সে আরও বীভৎস। আহুতির এক বৎসর পূর্বে পুরোহিতরা বলির নির্দিষ্ট মানুষকে রাজসম্মান দিয়ে রাজার হালে বসবাস করতে দিত। মৃত্যুর একমাস পূর্বে তাকে চারটি সুন্দরী দিত সেবা ও উপভোগের জন্য। মৃত্যুর দিন তার চারটি স্ত্রীর নিকট বিদায় নিয়ে সে শোভাযাত্রায় যোগ দিত। রাজসম্মানে বাজনা বাজিয়ে তাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়ে তার হৃদ্‌পিণ্ড যজ্ঞ পাত্রে আহুতি দেওয়া হ'ত।

অবশ্য মানুষের পক্ষে সকলই সম্ভবপর। কিন্তু চিত্র এবং মাথার খুলি দেখে এমন বর্ণনা বিশ্বাস করা না করা পাঠকের ইচ্ছা।

খৃষ্টীয় মিশনরীদের মতে মেক্সিকোবাসীদের অপেক্ষা ইনকাদের মধ্যে নরবলির প্রথা কম ছিল। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ইনকাদের দেশ। এরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সভ্যতার চরমে উঠেছিল। এদের রাজার রোগে নাকি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলি দেওয়া হয়েছিল, রাণীরা সহমরণে যেতেন—জীবন্ত সমাধি। অবশ্য এসব কাণ্ড দেবতার গ্রাস নয়।

চীন দেশ বহুদিনের সভ্যতার গর্ব করে। কিন্তু অত-বড় চীনদেশে নানা ধর্মের প্রচলন ছিল—অবশ্য কম্যুনিষ্ট অধিকারের পূর্বে। ভারতের মত চীনেরও বহিরাগত মতবাদকে নিজস্ব করবার শক্তি অসামান্য। ভারত-বর্ষ একদিন ইশলামকেও আপনার করে নিয়েছিল। কিন্তু শেষে ইংরাজের এবং সার্থপর ভারতীয়ের অনুগ্রহে তাকে পরিপাক করতে পারলে না। চীন দেশ কিন্তু-পুরাতন চীনা ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম কনফিউ-সসের ধর্ম, লাওজীর দাশনিক মতবাদ, মেনসিউসের নীতিবাদ তার সঙ্গে তুর্কীস্থানের ইশলাম অবধি নির্বিবাদে এক হারে গেঁথে নিয়েছিল। অবশ্য মণিগুলা ভিন্ন—সূত্র এক।

পুরাতন চীনাদের প্রধান পূজা ছিল—পিতৃদেবতাদের। ক্রমে পিতৃ-পূজা, স্রষ্টার পূজা, নানা দেবদেবীর পূজা মিলে মিশে এক উৎসবের অঙ্গ

হ'য়েছিল। চীনা অতি উত্তম নাগরিক। তার শান্তি-শৃঙ্খলা, সংযম এবং প্রতিবেশীর প্রতি সৌজন্য আধুনিক ইংরাজ নাগরিক সদ্‌গুণ অপেক্ষা কম নয়। নিয়মানুবর্ত্তিতা চীনা আচরণের এক উজ্জ্বল অংশ। তার চরিত্রের একদিকটা বুদ্ধ ও কনফিউসিয়সের নীতির ছাঁচে গড়া।

পূজা-পদ্ধতির নিয়মের এক প্রধান পুস্তক লীকী। এতে পুরাতন ধর্মের নিয়ম অবশ্য লিপিবদ্ধ। লীকীতে লিপিবদ্ধ নিয়মে দেখা যায় বলির ব্যবস্থা প্রচুর। ধর্ব্বণীশ্বর চীনা সম্রাট স্বর্গেশ্বরের পুত্র পরিগণিত হ'ত। ধরণীর কল্যাণে তাঁকে অন্ততঃ বাৎসরিক পাঁচটি পার্বণ যজ্ঞে পশুবলি দিতে হ'ত। তাঁর অধীনস্থ সামন্ত রাজন্যবর্গ এবং সরকারী কর্মচারীদেরও নিজ নিজ পদমর্য্যাদা অনুসারে যজ্ঞের পৌরোহিত্য করতে হ'ত। সম্রাটের বলি—নিখুঁত একরঙা ষাঁড়। সামন্ত রাজার বলি—মোটা বৃষ। বড় কর্মচারীর অর্ঘ্যও বৃষ। তারপর পদানুসারে কেহ মেষ, কেহ শূকর, কেহ মোরগ। হরিণ এবং শশক বলিরও প্রথা ছিল। অর্থাৎ সেই সনাতন রীতি—প্রসাদ হিসাবে যে জীবের মাংস খাওয়া যায়, সেই জীবই নিহত হ'ত মন্দিরের যূপে। মানবেরে যাহা দিতে পারি তাহা দিই দেবতারে।

সাম্রাজ্যের দিনের চীনা অনুশাসন লীকী। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের দিনে চীনের জীবনধারা নীতি-মূলক বুদ্ধ, কনফিউসস, লাওজী প্রভৃতি ঘিরে। আমি দেশ বিদেশে বহু চীনা মন্দির দেখেছি। তথায় বলির কোনো অনুষ্ঠান নাই। কাগজের লণ্ঠন ও ধূপ চীনা অর্ঘ্যের বিশেষত্ব। এখানেও মহা-বোধি মন্দিরে চীনা মহিলারা ধূপ ও বাতি জ্বালে। উৎসবে ফানুস নিয়ে মূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করে।

বলেছি প্রাচীন মিশরে বৃষ বলি খুব সাধারণ ছিল। তা ছাড়া সকল রকম বনচর হরিণ, হাঁস, বন্য হাঁস প্রভৃতি অর্ঘ্য দিত প্রাচীন মিশরীয়। কিন্তু সেথায় মেষ বলি নিষিদ্ধ ছিল। পশুর দক্ষিণ স্কন্ধ বেদীতে রাখা হ'ত। সকল যজ্ঞে রাজা উপস্থিত থাকত। তাকে পুরোহিতেরা রাজ-কর্ত্তব্য শিক্ষা দিত এবং কর্ত্তব্য-বিমুখ রাজার নরকের চিত্র বর্ণনা করত।

স্বীকার করতে হয় যে দেবতার অর্ঘ্যের সঙ্গে মানুষের শরণ-প্রবৃত্তি এবং নানা স্তরের ভক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু নরমেধ প্রভৃতির মধ্যে আমরা স্পর্দ্ধা এবং পাশব রাজসিকতারই বিকাশ দেখি। তন্ত্রের মন্ত্রের নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম ক'রে পশুঘাত ক'জন করে? মাংস-লোলুপতা এবং উৎসবময় বলিদানেও রাজসিক এবং তামসিক কুহেলিকা মিশ্রিত। পত্র, পুষ্প, ফল, জল, ধূপ ধূনা শুদ্ধ ভক্তির এক স্তরের নিবেদন। এ প্রকার অর্ঘ্যের মূলে দেবতার সঙ্গে আদান-প্রদানের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত। বৈষ্ণব, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টভক্ত—শরণং গচ্ছামি মন্ত্রের সাধক। মামেব শরণং গত, বৌদ্ধং শরণং গচ্ছামি ও রেজিগ্‌নেশন—এক মনোভাবের বিকাশ। সুতরাং মানবেরে যাহা দিতে পারি—এই ইচ্ছার মূলে আছে ধূপ ধূনা ফল ফুলের অর্ঘ্য। তার উপরের ভাব—শেষ শুদ্ধির কথা—মহাপুরুষের। তন্‌হার নিবৃত্তি—বিষয় হ'তে চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ বা শিবায় শান্তায় পরমাত্মনে নিবেদয়ামি চাত্মানং কঃ প্রভু গতিরন্যথা।' দাই কিংডাম কাম—এ সব শেষ কথা।

দেবতার নামে নিবেদন নয়—নিজে দেবতা অর্থে যা বুঝি, পূজার যে পদ্ধতি অনুসরণ করি—মন্ত্রের যে বীজ আমার তার ভিন্নপন্থীর উচ্ছেদ—বর্ব্বরের নর বলি হ'তে আরও বীভৎস। ভারতবর্ষ তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে এবং বহু জ্বালা সহ্য করেছে। এক গালে চড় মারলে অন্য গাল পেতে দেওয়া যে মহাত্মার নির্দেশ—তাঁর নামে ধর্ম্মদ্বেষিতা য়ুরোপে কী বিভীষিকাময় অভিনয় করেছে তা ভাবলে মনুষ্যচরিত্রে শ্রদ্ধা থাকে না। দু'একটা স্মরণ পথে আসছে।

১২০০ খৃষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট—আলবিজেনসিয়ানদের বিরুদ্ধে ক্রসেড বা জেহাদ ঘোষণা করলেন। তার ফলে রোম উপত্যকার এক সভ্যজাতি ও তাদের সংস্কৃতি ধরাপৃষ্ঠ হ'তে বিদায় গ্রহণ করলে।

১২১৫ সালে হোলি ইনকুইজিসন প্রবর্ত্তিত হ'ল। এই পবিত্র অনুষ্ঠান ডোমিনিয়ন ক্যাথলিকরা গ্রহণ ক'রে স্পেনে মুসলমান ও য়ীহুদিদের পবিত্র করবার মানস করলেন। ১৪৮১ হ'তে ৩৫,০০০ ভ্রান্ত-পন্থী অগ্নি পরীক্ষার ফলে দগ্ধ হ'য়েও মতবাদ ছাড়লে না।

১৫৭২ সালে সেণ্টবার থোলোমিউর দিনে, ৫০,০০০ ফরাসী প্রটেষ্টাণ্ট নিহত হয়েছিল। সে নৃশংসতায় ইতিহাস বীভৎস। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে চতুর্থ হেনরি এডিক্ট অফ্ ন্যাণ্টস্ ঘোষণা করে হত্যা বন্ধ করেছিলেন। প্রায় এক শতক পরে আবার ফরাসী ক্যাথলিকের ধর্মপ্রবণতার লক্ষণ দেখে চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ প্রটেষ্টাণ্ট ফ্রান্স ছেড়ে অন্যত্র শরণার্থী হ'ল। ফলে ফরাসী শ্রমশিল্পের গতি মন্দ হ'ল। ১৫৬৭-১৫৬৮ সালে ফ্রান্স এবং হলাণ্ড হ'তে বহু সহস্র লোক ইংলণ্ডে পালিয়ে এলো। ১৭৮৭ সালে এডিক্ট অফ টলারেসান হত্যা বন্ধ করলে, তারপর এলো বিপ্লব। তার ফলে রাষ্ট্র দেবতার নামে ম্যারাট ড্যাণ্টন প্রভৃতির নরবলির আচরণ সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা দিয়েছিল অভাগা ফরাসী দেশে।

ইংলণ্ডে অষ্টম হেনরী মোনাস্টারী ভেঙ্গে দিয়ে ক্যাথলিক নিগ্রহ করেছিল। মেরীর নাম হ'য়েছিল ব্লাডী মেরী। তবে নাকি য়ুরোপের মহাদেশের তুলনায় ইংলণ্ডের লোকের হিংসা অতি অল্প।

অবশ্য আধুনিক যুগের কুক্লুক্স ক্ল্যান চামড়া-দেবতার নিরাময়তার উদ্দেশে নর-বলি।

গত মহাযুদ্ধের উন্মত্ততা প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধ। তার উদ্দেশে কবি বলেছিলেন—

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি
ছিন্ন করিবে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাটানি তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্ত পঙ্কে ধরার অঙ্গ লেপে।

পৃথিবীর সকল যুগের সকল দেশের, তথা-কথিত সভ্য অসভ্য সকল মানব-গোষ্ঠীর আচরণ পর্য্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে দেবতার অর্ঘ্য আস্তিক্য বুদ্ধির অনুগামী। মানস-পূজা, ধ্যান-ধারণা, নিরাকার উপাসনা, আত্ম-নিবেদন—উচ্চাঙ্গের সাধনা, অনুশীলনের ফলে মানুষ এ

অবস্থায় আপনাকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা বলে প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে যে ব্যক্তি আকন্দ ফুল বিল্বপত্র আর ঘোলা গঙ্গা-জল দিয়ে শিব-পূজা করে মনের একাগ্রতা এবং তন্ময়তা থাকলে সে কি ভগবদ-সান্নিধ্য পায় না? পরমহংস দেব বলতেন চিনি হয়ে চিনি খাওয়াও চিদানন্দের আস্বাদন। মহাপ্রভু পুরীতে জগন্নাথ দেবের পূজা করতেন, দুবাহু তুলে নাচতেন, প্রেম ও প্রেমিকের একতার পরিচয় দিতেন।

মানুষ ক্রমে সিদ্ধ হয়, জ্ঞান ও ভক্তির প্রসাদে। ভক্তি চায় অর্ঘ্য দিতে, অর্ঘ্যের উপকরণ স্থির করে জ্ঞান। মহাদেব যে ত্রিকাল—ত্রিকালজ্ঞ—তাই ত্রিনয়ন। তিনি যে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের সমাধান। নটরাজের নাচের দোলায় বাঁধন ছেঁড়ে, বাধন পরায়। তাই ঋষি নির্দেশ করলেন তিন-পাতা একত্র সমাবিষ্ট বিল্বপত্রে শিব-পূজার। এ ত্রিপুটির স্মারক। বনমালি শ্রীকৃষ্ণ যে চেতন অচেতন সারা প্রকৃতির কর্ষণের প্রতীক। তিনি বনে বনে গো-চারণ করতেন। তাই ভক্ত বনফুল হারে গোপালকে সাজায়। অনন্তের প্রতীক নীল কলেবর চন্দন-চর্চ্চিত করে।

মহা-নির্বাণ তন্ত্র মানসোপচারে ব্রহ্ম পূজার পদ্ধতিতেও মনে মনে উপচার নিবেদন পরিত্যাগ করতে পারেনি। প্রথা অতি মনোরম, জ্ঞানোদ্দীপক।—ভূতত্ত্বকে গন্ধরূপে কল্পনা করে ব্রহ্মে সমর্পণ করবে,আকাশ তত্ত্বরূপে পুষ্প, বায়ুতত্ত্বরূপে ধূপ, তেজ স্বরূপ দীপ তোয়ক্ষিতিতত্ত্ব নৈবেদ্য। পূজার তত্ত্ব সত্যই রসাত্মক এবং উচ্চাঙ্গের। পঞ্চ তন্মাত্র হতেই অহং জ্ঞান—যদি তা ব্রহ্মে সমর্পণ করতে পারি—সৃষ্ট মায়ার আবরণ যদি তাঁকে প্রত্যর্পণ করি তা হলে বৌদ্ধ মতে নির্বাণ, হিন্দু শাস্ত্রের ব্রহ্ম নির্বাণ। শ্রীমদ্ভাগবদগীতার কথা মহা-নির্বাণ-তন্ত্র উল্লেখ করেছেন এবং ইহাই তার ব্যাখ্যা। ধ্যান রত হ'য়ে সমর্পণের সাধনা—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা।

কেবল আমাদের মধ্যে কেন—খৃষ্টীয় কি ইউকেরিষ্টের ভোজে রুটি ও মদের ব্যবহার করেন। প্রতীকরূপে? ক্যাথলিকের মাসে বা সংঘ-পূজায় প্রভুর রক্ত ও মাংসের নিসানারূপে ভোগের দ্বারা অর্ঘ্যকে পবিত্র ক'রে, রুটি ও মদ্য প্রসাদ পায়।

ধূপ, ধুনা লোবানের ব্যবহার সকল ধর্মস্থলে। আমাদের ষোড়শোপ-চার—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, তর্পণ ও নমস্কার বসন, ভূষণ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, অমৃত, তাম্বুল। তাই মনে হয় অর্ঘ্য চিরদিন নিবেদন করবে মানুষ। ক্রমে শুদ্ধ হয়ে নৈবেদ্যকেও রক্ত মাংস বিহীন করবে। তাই তথাগতের শরণাপন্ন হ'য়ে কবি গেয়ে ছিলেন—

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অমৃত বাণী।

এ দেশে যুগে যুগে অবতার মহামানব, ঋষি ও মহাত্মা এই আশা পোষণ করেছেন। কিন্তু মানুষ কি জানি কবে অন্ততঃ দেবতার পূজায় হিংসা ছাড়বে।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

প্রবন্ধের বিষয়-নির্বাচনের স্বাধীনতা আমায় দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা মাত্রেই নানা ঝঞ্ঝাটের আকর। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে তা তো আমরা সবাই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। প্রবন্ধপাঠ শুনে আপনারাও হাড়ে হাড়ে বুঝবেন, এটিও মূর্তিমান্ ঝঞ্ঝাট। কিন্তু দোষ দেওয়া চলবে না। কারণ সমস্ত পৃথিবী আজ ঝঞ্ঝাটের ঝটিকা-কেন্দ্র; দু-দণ্ড যে শান্তিতে থাকা যাবে এমন একটি গৃহকোণও আজ বিরল। অনেক হিসাব করে দেখেছি আমরা আয় হতে যে পরিমাণে ট্যাক্স দিই এবং পরের জন্যে যে-পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করি, তাতে নিজের আর কিছু থাকে না। তার চেয়ে জেলখাটা ভাল, কারণ সেখানে দেনার চেয়ে পাওনা বেশী। জীবনযাত্রার জন্যে উপকরণ চাই, উপকরণের জন্যে চাই শ্রমিক আর মালিক। উপনিষদের মৈত্রেয়ী দেবী সোজা মেয়ে ছিলেন না। তাঁর উপকরণ-বিতৃষ্ণার নিগূঢ় হেতুটি আজ আমরা অনেক ঠেকে শিখ্ছি। শ্রমিক-মালিকের তর্জন-গর্জন আর যাই করুক, অমৃতত্বের সন্ধান দেয় না। কিন্তু উপকরণ-বর্জন সম্ভব নয়, তাহলে বনবাসে যেতে হয়। বনবাসে যে যাবেন তারি বা উপায় কই?—বনই তো নেই। বন যদি থাকত তাহলে সরকারকে কষ্ট ক'রে আর aforestation করতে হ'ত কি? সুতরাং বনবাসের পথও বন্ধ। সব দিক দিয়ে আমরা বেঁধে মার খাচ্ছিই যখন, তখন প্রবন্ধটি শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে হলে আর বিশেষ আপত্তিই বা থাকে কেন?

প্রাক্-স্বাধীন যুগে শ্রমিক-মালিক সমস্যা আমাদের দেশে ছিল না তা নয়, গৌণভাবে ছিল। ধর্মও ছিল, আপোষ-নিষ্পত্তিও ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর

হতেই এ সমস্যা এমন মারমুখী হয়ে দেখা দিল কেন? তার কারণ, পেয়াদার যেমন শ্বশুরালয় থেকেও নেই, পরাধীন জাতের তেমনি শ্রমিক-সমস্যা থেকেও ছিল না। আজ চাকা ঘুরেছে। শ্রমিক আমাদের স্বাধীতার দিকে চোখরাঙিয়ে বলছে "যে-স্বাধীনতা আমাদের দুঃখ ঘোচাতে পারছে না সে স্বাধীনতা রাজনৈতিক নয়, লাঙ্গনৈতিক।" শ্রমিকের এই চ্যালেঞ্জকে আমাদের রাষ্ট্র নেতারা অবজ্ঞা করেন নি, উপেক্ষা করেন নি—পরম বেদনায়, আপন অন্তরের দুঃখ দিয়ে শ্রমিকের দুঃখ তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। একদা সমগ্র জাতির পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করবার জন্যে তাঁরা হোমের হুতাশন প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, সে হোমাগ্নিতে তাঁদের যা-কিছু প্রিয়, সমস্তই দিয়েছিলেন আহুতি। সেই তপস্বীদের সাধনায় এল আমাদের স্বাধীনতা। আজ বহুমুখী চিন্তা ও কর্মধারা এসে মিলছে এই বিপুল সমস্যার সমাধানে, কত বিনিদ্র রজনীর পরিশ্রম ক্রমশঃ রূপায়িত হয়ে উঠছে শ্রমিক-কল্যাণ-সাধন ব্রতে—তা.কে অস্বীকার করতে পারে এক স্বভাব-নিন্দুক ছাড়া? তাই ব'লে নিন্দুকের নিন্দা করছি না। তাঁরও প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। তিনি নিরবচ্ছিন্ন চীৎকারের দ্বারা কেবলই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, ব্রত এখনও সাঙ্গ হয় নি। তিনি রাষ্ট্রের ব্রত-অসমাপ্তির চৌকিদার। আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রমিক-মালিক সমস্যা মানুষের অপরাপর বিরাট সমস্যার মতো বহু-কারণ-প্রসূত। এ শুধু কোনো এক বিশেষ দেশের বা বিশেষ জাতির সমস্যাও নয়। এ সমস্যা পৃথিবী-ব্যাপী। এ সমস্যার এক একটি কারণকে এক এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে—এক এক বিভিন্ন সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌছতে হবে। সেই সব সিদ্ধান্তকে যাঁরা আংশিক সত্যমাত্র এ কথা ভুলে গিয়ে অন্ধের হস্তীদর্শন-ন্যায়ের মতো একমাত্র সত্যসিদ্ধান্ত বলে মনে করেন, তাঁদের বিভিন্ন মতের লড়াইয়ে বিগত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর চিত্ত বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। শুধু মতের লড়াই। এক এক বিশিষ্ট মতের পোষকতায় এক একটি বিশিষ্ট রাষ্ট্র গড়ে উঠল, আর তারা কামানের গোলা দিয়ে তাদের মতবাদের প্রতিষ্ঠায় লেগে গেল। মানুষ মানুষকে এতদিন মরণাস্ত্র নিয়ে তাড়া করেছে বিষয়-সম্পত্তির প্রতিষ্ঠায়। আজ তার যুদ্ধোদ্যম প্রধানতঃ আইডিয়ার প্রতিষ্ঠায়।

আমাদের তরুণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য এই যে শ্রমিক-মালিক সমস্যা-মূলক কোনো একটি বিশেষ মতবাদকে সে একমাত্র সত্য এবং এ ছাড়া আর সত্য নেই—এই ব'লে মেনে নেয় নি। এই সঙ্কীর্ণতা হ'তে সে আপনাকে মুক্ত রাখতে পেরেছে, এ তার কম সংযমের পরিচয় নয়। তাকে অসংযমের পথে পরিচালিত করার ছিল বহু প্রলোভন, বহু করতালিও মিলত। কিন্তু এই প্রলোভনের পথ সে সযত্নে পরিহার করেছে। তাই যখনি প্রয়োজন বুঝেছে তখনি ব্যক্তিত্বের মালিকানা অপসারিত ক'রে নির্যৌক্তিক রাষ্ট্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে সে দ্বিধা করে নি। কিন্তু তাই ব'লে সে ব্যক্তির মালিকানাকে বর্জন করে নি—তার মধ্যে যা-কিছু গলদ দেখেছে, যা-কিছু অশুভ, অমঙ্গলকর—আইনের সম্মার্জনী দিয়ে তাকে ঝাঁটিয়ে ফেলবার ব্রত নিয়েছে। আমাদের রাষ্ট্র আজ অনেক পথের অনেক মতের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে। জাতির কল্যাণ-বিধানের পণ নিয়ে, অন্তরের সহানুভূতি নিয়ে বুদ্ধির দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা সে ধীর অথচ দৃঢ় পদে এগিয়ে যাবে সেই পথেই, যা কোনো সঙ্কীর্ণতার পথ নয়, যাতে সকলেরই স্থান আছে। যিনি সঙ্কীর্ণপথ-যাত্রী, যিনি চান পথে শুধু তাঁরই স্থান থাকবে আর কারো নয়, তিনি স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ হবেন, কিন্তু ভারতের জনগণ-মনের অধিনায়ক যিনি, যিনি এই বিশাল দেশের সকলকে বিধৃত ক'রে আছেন তাঁর প্রসন্ন মুখের হাসি এই তরুণ রাষ্ট্রের উদার গতিপথ আলোকিত করবে।

শ্রমিক ও মালিকের বিরোধভঞ্জনের জন্যে যে-সব আইন কানুনের দরকার, শ্রমিক-সংহতির আইন তাদের মধ্যে অন্যতম। ভারতের পার্লামেণ্টে এই আইন পরিবর্তনের খসড়া অপেক্ষমান। শ্রমিক সংহতি সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের সমকক্ষতা সম্ভব হয় না। শ্রমিকের একতা এই সংহতির মূলমন্ত্র। বাংলার দুর্ভাগ্য এই, শ্রমিক সংহতির মধ্যে দলাদলি ঢুকেছে। অন্যান্য প্রদেশেও ঢুকেছে, শুধু বাংলায় নয়, তবে বাংলাতেই যেন কিছু বেশি বেশি। হয়তো নৈকট্যের কারণে এ দলাদলিকে অপেক্ষাকৃত বেশি দেখাচ্ছে—এও হ'তে পারে। তবে বাঙালী জাতির দলাদলিতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। মড়া পোড়াতে গিয়েও বাঙালী

"আমার মড়া, আমার মড়া" বলে দলাদলি করে—শোনা গেছে। রায়গুণাকরের কবিতার সামান্য একটু অদলবদল করলে অমর কবির আশ্চর্য ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যাবে—

> "পাটনী কহিছে মাগো বুঝিনু সকল,
> যেখানে বাঙালী জাতি সেখানে কোন্দল।"

আমার মনে হয় বাঙ্গালীর এই ভারত-বিশ্রুত অসদ্‌গুণ, যার জন্যে আমরা নিরন্তর তিরস্কৃত—সেটি আসলে একটি প্রচ্ছন্ন মহৎগুণেরি লক্ষণ। বাঙালী মজ্জায় মজ্জায় ডেমোক্র্যাটিক। সে সকল রকম বাধ্যতা-মূলক বিধানের ওপর হাড়ে চটা। সে কাকেও মানে না—এক আপনাকে ছাড়া। বৈদিক সভ্যতা, যাজ্ঞিক কর্মকাণ্ড, প্রচণ্ড হিন্দুয়ানি, মোগল-পাঠান, রাজা-রাজড়া, কর্ণেল কাপ্তেন—সে কারো তোয়াক্কা করে নি। আজও তার সেই মনোভাব। এমন বাঙালী-মজলিশ কি কেউ দেখেছেন যেখানে রাষ্ট্র নেতাদের প্রাত্যহিক মুণ্ডপাত না ঘটছে। কাজেই কোনোদিন যদি এমন ব্যবস্থা হয় যে বাঙালী তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে পারবে না, নিন্দা বিদ্রূপ একেবারেই বন্ধ, রাষ্ট্র নেতা বা ঐ ধরণের কারো বিরুদ্ধে একটি কথা বলেছ কি মরেছ—যেমন নাৎসী বা কম্যুনিষ্ট শাসনে চল্—তাহলে বাঙালীরা পেটফুলে মারা যাবে এ কথা নিঃসন্দেহ। কাজেই মুখে যিনি যতই আস্ফালন করুন, বাঙালী কোনোদিন যে কম্যুনিষ্ট হবে অথবা নাৎসী হবে এমন সম্ভাবনা বিরল।

বর্তমান যুগ হল রেশন আর-কন্ট্রোলের যুগ। এতদিন আমরা ভাত-ডাল ফেলে ছড়িয়ে খেয়েছি, আমাদের নিমন্ত্রণ খাওয়ার ব্যাপার ছিল যেন শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই। আজ এসেছে রেশনিং-এর সংযত যুগ। দলাদলির প্রবৃত্তিকেও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চালালে আর চলবে না, কেন না তাতে আমাদের মঙ্গল ব্যাহত হবে। ডেমোক্র্যাটিক মনোভাব উত্তম সন্দেহ নেই, কিন্তু তা নিয়ে মাতামাতি ভাল নয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক সংহতির মধ্যে দলাদলির ইষ্টানিষ্ট বিচার ক'রে দেখতে হবে। এ দলাদলি অনেক ক্ষেত্রে পোলিটিক্যাল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত। এতে শ্রমিকের কল্যাণ সাধন হচ্ছে না, শ্রমিকের দুর্বলতা বা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে দলগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির নির্লজ্জ প্রয়াস হচ্ছে—এই কথা আজ স্পষ্টাক্ষরে তীব্র ভাষায় বলবার দিন এসেছে। ডেমোক্র্যাটিক্ রাষ্ট্রের আইন-কানুন যখন পোলিটিক্যাল দল-নিরপেক্ষ বা ব্যক্তি-নিরপক্ষ হতে বাধ্য, তখন আইন দিয়ে এই দলাদলি নিবারণের আশা দুরাশা। দলাদলি নিবারণের উপায় রয়েছে শ্রমিকদের নিজের হাতে। যেদিন তারা বুঝবে শ্রমিক-সংহতির মধ্যে পোলিটিকাল বা ব্যক্তিগত দলাদলি তাদের নিজের স্বার্থের প্রতিকূল—সেদিন হতে দলাদলিকে বিদায় নিতে হবে। আমার মনে হয় সেদিনের আর দেরি নেই।

মানুষের গুহা এবং অরণ্যবাসের যুগে কোনো বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে যে-যার লাঠি লগুড় তীর ধনুক বর্শা নিয়ে আসত—তারপর মাথা ফাটিয়ে হাড়-গোড় গুঁড়িয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি ক'রে নিত। আজ পাহারাওয়ালা শাসিত এই যুগে বাস করেও অনেকের সেই বন্যযুগের লাঠি-সড়কির জন্যে মন কাঁদে। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ বাঁধলে আইন কখনো একথা বলে না, 'যাও তোমরা ল'ড়ে নাওগে যাও।'

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজও অনেক সভ্যদেশে—যেমন আমাদের দেশে—শ্রমিক-মালিকের বিরোধ ঘটলে তারা strike-lock-out অস্ত্রের সাহায্যে নিজেরাই বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে, রাষ্ট্রের তাতে বিশেষ বাধা নেই। আমাদের আইনে কেবল কয়েকটি স্থলে strike-lock-out নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যুক্তরাজ্যেও প্রায় তাই। এই অবাধ ক্ষমতার সম্পর্কে মণীষীদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। যাঁরা এর পক্ষপাতী, তাঁরা বলেন—বিবদমান উভয়পক্ষের শক্তি-পরীক্ষা হওয়া ভাল, পরস্পর পরস্পরের সমূল ক্ষতি করতে পারে এই জ্ঞান উভয়পক্ষের থাকলে ভবিষ্যতে কেউ কারো অনিষ্ট করতে সাহস করবে না, শান্তি থাকবে। যাঁরা এই অবাধ ক্ষমতার পক্ষপাতী ন'ন তাঁরা বলেন—আমরা যখন আর সব রকম বিরোধের বেলায় হাতাহাতি ও মারা-মারির বন্য ইচ্ছা পাহারাওয়ালা-বাবাজীর শ্রীচরণ তলে সমর্পণ করেছি, তখন শ্রমিক-মালিক বিরোধের বেলায় তার ব্যতিক্রম কেন? শ্রমিক-মালিককে কি সভ্যতার গণ্ডীর বাইরেই ধরতে হবে।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে শ্রমিক-মালিকের বিরোধ-ভঞ্জনের পদ্ধতিটা যেমন হওয়া উচিত মনে করা যায়,

আসলে সেটা তেমন সহজ নয়। তারা একই ছাদের নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস করে, তারা অনেকটা যেন একই পরিবার-ভুক্ত। তাছাড়া একটি তৃতীয় পক্ষ আছে—জনসাধারণ। শ্রমিক-মালিকের বিরোধের ফলে দ্রব্যোৎপাদন ব্যাহত হয়, জন-সাধারণ অল্পবিস্তর অসুবিধা, কষ্ট, দুঃখ ভোগ করে। রাষ্ট্রেরও ক্ষতি হয়। দুই বিবদমান মামলাবাজ আমড়া গাছ নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট করলে শুধু তাদের নিজেদের সংসারেই ক্ষতি। মামলার সময় তাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ থাকলেই পাড়ার লোকের সুবিধা। কিন্তু শ্রমিক্-মালিকের মামলা হলে দ্রব্যক্রেতা জনসাধারণও ফল ভোগ করে। মামলার ফলে শ্রমিকের বেতনবৃদ্ধি হলে মালিক সেই অতিরিক্ত ব্যয়-ভার দ্রব্যক্রেতা জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেন। মামলা যতদিন চলে ততদিন একই ছাদের নিচে অবস্থিত শ্রমিক মালিকের সম্পর্কটা চণ্ডীদাসের সাপের মাথায় ভেকের নাচনকেই স্মরণ করায়।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই শ্রমিক-মালিক সঙ্ঘর্ষ নিবারণের দুটি প্রধান উপায় আছে—একটি হচ্ছে উভয়ের মধ্যে আপোষ মীমাংসা, অপরটি হচ্ছে রাষ্ট্র কর্তৃক মীমাংসা। আমাদের অনেকের ভুল ধারণা আছে, রাষ্ট্রিক মীমাংসা বুঝি ইউরোপ হ'তে আমদানী। আমাদের ধারণা ইউরোপের রাষ্ট্র হল উগ্রকর্মা—আর আমাদের রাষ্ট্র নিষ্কর্মা। আমরা মনে করি ইউরোপের রাষ্ট্র স্বামীস্ত্রীর প্রণয়ালাপেও কান পেতে রাখে, আর আমাদের রাষ্ট্র চৌকিদারি টেক্স আদায় করেই বিদূষক নিয়ে মৃগয়া করতে যায়। এ সব ধারণা একেবারেই ভুল। রাষ্ট্রিক শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসার জন্য দায়ী কৌটিল্য। তাঁর অর্থশাস্ত্রই এ বিষয়ের প্রাচীনতম বিধি। কৌটিল্যের Tribunal Judge দের নাম ছিল "কুশল"। তাঁরা শ্রমিক মালিকের বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন। তাই থেকে গ্রীকরা শিখল, গ্রীকদের কাছ থেকে ইউরোপ শিখল। কৌটিল্য-মুনির তীক্ষ্ণ প্রতিভা শ্রমিকের সংজ্ঞা নির্ণয়ে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করে নি। তাই বিদূষক এবং চিকিৎসক, কুম্ভকার এবং পুরোহিত মশাই সবাই পড়েছেন এক পর্য্যায়ে। আজ বিদূষক এবং চিকিৎসককে এক categoryতে ফেলবে এমন দুঃসাহসী কে আছে? পুরোহিত মহাশয়কে "শ্রমিক" বললে তিনি অর্দ্ধকলা কম্পিত ক'রে তেড়ে আসবেন। চাণক্য পণ্ডিতের সময় strike ছিল, lock-out ছিল, এমন কি অল্পবিস্তর "go-slow" tacticsও ছিল—তার পরিচয় তাঁর অর্থশাস্ত্রে মেলে। অথচ আমরা আধুনিকেরা ভাবি, আমরা অতিশয় চালাক লোক—আমরাই এ সব আবিষ্কার করেছি!

আমাদের দেশে আজকের দিনে যে আইন প্রচলিত, তাতে আপোষ-মীমাংসা এবং রাষ্ট্রিক মীমাংসা উভয়েরই ব্যবস্থা আছে। আমরা যে conciliation ক'রে থাকি সেটা আসলে আপোষ-মীমাংসা। উভয় পক্ষের মত যদি মিলল তবেই রফা হল, নইলে আমাদের এমন কোনো আইনের ক্ষমতা নেই যে একটা মন-গড়া রফা উভয় দলের অনিচ্ছুক স্কন্ধদেশে চাপিয়ে দিতে পারি। তবু কোনো সমালোচকের মতে এ নাকি আপোষ মীমাংসা মোটেই নয়, আমরা নাকি মজুর-মালিকের খাস মহলে আমাদের রাষ্ট্রিক নাসিকা প্রবিষ্ট ক'রে থাকি। এর উত্তর এই যে, আমাদের যে নাসিকা আছে তাকে রাষ্ট্রিক নাসিকা বললে রাষ্ট্রকে খুবই খাটো করা হয়, কারণ আমরা রাষ্ট্রের একটি বালখিল্য সম্প্রদায় মাত্র। শ্রমিক-মালিকের বিরোধ যাতে বেশীদূর না গড়ায়, শান্তি যাতে যথাসম্ভব শীঘ্র ফিরে আসে, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা উভয়ের মধ্যে মিল ঘটাইবার প্রয়াস করি। প্রথম অবস্থায় উভয় পক্ষই থাকেন অত্যুগ্রভাবে চ'টে এবং অসৌজন্যের ভাষা অনেক সময় বর্ষিত হয় নিরপেক্ষ আমাদেরই উপরে—ঠিক শ্রাবণের ধারার মতো। কিন্তু আমাদের ধৈর্য্য হারালে চলে না এবং এমন আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে যে অন্তরের উদ্বেগ যে-পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, মুখের হাসি ঠিক সেই পরিমাণেই ফুটে ওঠে। মনোবিকলনে আমাদের হাতে-কলমে শিক্ষা। উভয় পক্ষের দুর্বলতা কোথায় তা আমাদের জানা এবং সেটাতেই ঘা দিয়ে থাকি। তবে নিজেদের সদ্গুণের তালিকা আর বাড়াতে চাই না, আমাদের কি বিনয় নেই ভেবেছেন? যাঁরা প্রথম প্রথম আমাদের এ কাজে আসেন, তাঁদের সহ্য শক্তিটা কম, শ্রমিকরা গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়ালে তাঁরা মনে মনে একটু চটেন এবং দু-একটা কথা-কাটাকাটি হলেই ধৈর্য্য হারান। কিন্তু সে প্রথম অবস্থায়। বিবদমান উভয় পক্ষ রণশ্রান্ত হয়ে এলেই আপোষ-মীমাংসার পথ খোঁজে। অভিজ্ঞ মৎস-শিকারী জানেন মাছটা খেলেই বঁড়শি টেনে

নিয়ে যায়। তখন টান করলে চলবে না, তাকে ঢিল দিতে হবে। অনেকক্ষণ খেলিয়ে যখন সে ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে, তখনি তাকে কায়দা ক'রে ডাঙায় তুলতে হয়। শ্রমিক-মালিককে এমনি ক'রে যখন আমরা ডাঙায় তুলি, তারা তখন আপোষ করে, আর আমরা শান্তির জল বর্ষণ করি।

কিন্তু যে-বিরোধ না মেটে, গভর্ণমেন্টে তার রিপোর্ট যায়। গভর্ণমেণ্ট যদি সমীচীন মনে করেন, সে-বিরোধ ট্রাইবুন্যালে পাঠান। ট্রাইবুন্যালের বিচারকেরা আইন-অভিজ্ঞ এবং জেলাজজ পদবীর লোক। তাঁরা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে উভয় পক্ষের বিবাদ মীমাংসা ক'রে দেন। উভয় পক্ষ সে-মীমাংসা সুনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মানতে বাধ্য, না মানলে আইনানুসারে দণ্ড হয়। মালিকপক্ষ না মানলে তার দেয় টাকা আদায় ক'রে নেবার জন্য আইনে নতুন ব্যবস্থা হয়েছে।

ট্রাইবুন্যালের প্রতি আমাদের শ্রমিকদের খুব আস্থা—তার কারণ শ্রমিকদের দাবী ট্রাইবুন্যাল অনেক সময়েই পুরোপুরি বা অংশতঃ গ্রাহ্য করেন। অনেক মালিক ঠিক সেই কারণেই ট্রাইবুন্যালের ওপর খুব প্রসন্ন ন'ন। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। ট্রাইবুন্যালের প্রতি মালিক-মনোভাব-ব্যঞ্জক লেবরের এক চমৎকার সংজ্ঞা শুনেছি এক আলাপ-চক্রে। শ্রমিকরা যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান, ট্রাইবুন্যাল জিজ্ঞেস করলেন, "ক্যা মাংতা?" শ্রমিকরা তখন তাদের দাবীদাওয়ার সুদীর্ঘ ফিরিস্তি দাখিল করল। ট্রাইবুন্যাল বললেন, "লে বর"—অর্থাৎ বর নাও। তাই থেকে হল লেবার।

শ্রমিক-মালিক আইন সম্বন্ধে মোটামুটি যা বলা হল তার বেশি বললে আপনাদের ধৈর্য্য নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্টে দুটি আইনের খসড়া আইন হবার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাতে বর্তমান আইনের বহুধা পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে শ্রমিক-মালিক বিরোধের কি স্থায়ী সমাধান সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর আর একটি প্রশ্ন দিয়ে করা চলে, মানুষে মানুষে স্বার্থের সঙ্ঘাত কবে থামবে? আমার মনে হয় আমাদের দেশে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমস্যা দেখা দেবে, তাছাড়া অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, জড়ত্বভাবাপন্ন যে বিপুল মানব-বাহিনীকে এতদিন রোদে পুড়ে জলে ভিজে অবহেলিত অর্দ্ধপরিত্যক্ত ভাবে দিন কাটাতে হয়েছে, তাকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দেবার সময় এসেছে। এ তো বড় কম সমস্যা নয়! যে কর্ত্তব্য শতাব্দী ধরে অসম্পন্ন, সে আজ আর রেহাই দেবে না, ধৈর্য্য মানবে না, স্তোকবাক্যে ভুলবে না। কতবড় অগ্নিপরীক্ষা আজ আমাদের দেশের সামনে—একথা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে যাঁদের হাতে আজ রাষ্ট্র পরিচালনার ভার তাঁরা দাবী করেছেন আমাদের প্রত্যেকের প্রাণপণ সাহায্য, কারণ এই পরীক্ষা ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীর পরীক্ষা। যদি তারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সে আমাদেরি আপ্রাণ চেষ্টার ফলে, আর যদি না হন সে কেবল আমরা আমাদের সর্বোত্তম চিন্তা, সবশ্রেষ্ঠ ত্যাগ, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম আমাদের দেশকে নিবেদন করি নি বলেই। যখন আমরা কর্তৃপক্ষের সমালোচনায় মসগুল হই, তখন এই কথাগুলি যেন মনে রাখি।

আমাদের মনের বল যেন অটুট থাকে। ভৈরবগর্জন সমুদ্রের মতো সমস্যা-সঙ্কুল ভবিষ্যৎ সম্মুখে তরঙ্গায়িত হোক, আমরা ভয় করব না। সমস্যা যতই দুরূহ হবে, সমাধান-শক্তি ততই তীক্ষ্ণ, কর্ম-ক্ষমতা ততই বিকশিত, প্রতিভা ততই প্রোজ্জ্বল হবে। ভুল ভ্রান্তি তো আছেই। ভ্রান্তির ধাপে ধাপে দেশ সত্য সমাধানের উঁচু বেদীতে উঠবে। সমস্যার শেষ হবে না কোনোদিন, সমাধানও হবে অনন্ত বিস্তারি। এই তো জীবন।

আগের যুগের মহা আরামের, মহা নিশ্চিন্ততার, পরাধীনতার স্বর্ণ-পিঞ্জরবাস ঘুচল ব'লে এত খেদ কেন? আজকের এই আরামহীন বিরামহীন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অস্থির জীবনের মহা গৌরব আমাদের পূর্বপুরুষদের ক'জনের ছিল? আমরা মিথ্যার ঘোর কাটিয়ে এসেছি, চলেছি সত্যের সন্ধানে—যেখানে পদে পদে পরাজয়, পদে পদে লাঞ্ছনা অপমান, যেখানে কপট বন্ধুর মুখের মুখোশ খুলে পড়ে, যেখানে ভণ্ড প্রেম বিদ্রূপের কষাঘাত করে। এ পথকেই বলে—ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া। তাই এ পথে চলতে পারাটাই মহা গৌরবের,এ পথে চলাটাই এর চরম পুরস্কার।

ফ্রেডারিক নিৎসে

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গণতন্ত্রের অর্থ স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া। ইহার অর্থ দেশের প্রত্যেক অঙ্গকে তাহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবার স্বাধীনতা দেওয়া; বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য, পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার বিনাশ এবং স্বতন্ত্রতা ও অরাজকতার রাজত্ব। গণতন্ত্রের অর্থ উৎকর্ষের প্রতি ঘৃণা, এবং অনুৎকৃষ্টের উপাসনা। ইহার ফল মহত্ত্বের আবির্ভাবের অসম্ভাব্যতা। মহৎ লোক নির্বাচনের অপমান সহ্য করিতে অক্ষম। নির্বাচনে তাহাদের সফলতালাভের আশা বা কোথায়? গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অতিমানুষের উদ্ভব অসম্ভব। যে জাতি তাহার শ্রেষ্ঠতম লোকদিগের সেবা হইতে বঞ্চিত, যাহার শ্রেষ্ঠতম লোকদিগের সংবাদ কেহ রাখে না, তাহার বড় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সে জাতির আদর্শ শ্রেষ্ঠ মানুষ নহে, সাধারণ মানুষ, সেখানে ক্রমে সকলেই সকলের সমান হইয়া যায়, পুরুষ নারী হয়, নারী পুরুষ হয়। গণতন্ত্র এবং খৃষ্টধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি স্বাধীনতায়। পুরুষত্বের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মেয়েরা পুরুষত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা করে। যে নিজে পুরুষ, সেই নারীর নারীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হইয়া নারী তাহার শক্তি ও মর্য্যাদা হারাইয়াছে। বুরবনদিগের কালে নারীর যে মর্য্যাদা ছিল, তাহা আজ কোথায়? নর ও নারীর মধ্যে সাম্য অসম্ভব, কেননা তাহাদের মধ্যে সংগ্রাম চিরস্থায়ী। এক পক্ষের জয় ভিন্ন উভয়ের মধ্যে শান্তি অসম্ভব। স্ত্রীলোককে সমান অধিকার দেওয়া বিপদ-জনক। সমান অধিকারে সে সন্তুষ্ট হইবে না। পুরুষ যদি পুরুষ হয়, তাহা হইলে অধীনতাতেই নারী সন্তুষ্ট থাকিবে। নারীর সম্পূর্ণতা ও মুক্তি তাহার মাতৃত্বে। পূর্ণ নারী পূর্ণ নর অপেক্ষা মনুষ্যত্বের উচ্চতর রূপ এবং তাহা অপেক্ষা দুর্লভতর।

স্ত্রী-স্বাধীনতার সহিত আসে সাম্যবাদ ও নৈরাজ্যবাদ। সর্ব্বত্রই গণতন্ত্রের সন্তান। সমান রাজনৈতিক অধিকার যদি ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহা হইলে সমান অর্থনৈতিক অধিকারই বা ন্যায়সঙ্গত নহে কেন? নেতা? নেতারই বা প্রয়োজন কি? কিন্তু মানুষ সকলে সমান নহে। প্রকৃতি সাম্য ঘৃণা করে। প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও শ্রেণী ভালবাসে। সাম্যবাদ প্রাণ-বিজ্ঞানের বিরোধী। অভিব্যক্তিতে উৎকৃষ্টতর জাতি শ্রেণী অথবা ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিকৃষ্টতর জাতি, শ্রেণী অথবা ব্যক্তি উৎকৃষ্টতরের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক প্রাণী অন্য প্রাণীকে স্বকীয় স্বার্থে ব্যবহার করে। বড় মাছ ছোট মাছ খাইয়া জীবন রক্ষা করে, ইহাই জীবনের মৌলিক সত্য। সাম্যবাদ ঈর্ষাপ্রসূত। এই আন্দোলনের নেতাদিগকে ভীত করা কঠিন নহে। তাহাদিগকে ভয় করিবার কারণ নাই। কিন্তু যাহারা নীচে, তাহারা মনে করে তাহাদের অযোগ্যতা এবং আলস্যের স্বাভাবিক ফল যে অধীনতা—বিপ্লবদ্বারা তাহা হইতে তাহারা মুক্ত হইতে পারিবে।

কিন্তু এই দাসগণ তাহাদের প্রভুদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তাহাদের প্রভুরাও দাস—ব্যবসায়ের দাস। নূতন কিছু শিখিবার তাঁহাদের সময় নাই। চিন্তা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। জ্ঞানের আনন্দ তাহাদের অনধিগম্য। এই জন্যই সুখের অবাধ অনুসন্ধান, এইজন্যই বড় বড় প্রাসাদ। রুচিহীন বিলাস, "মৌলিক" (original) চিত্রের গ্যালারী (প্রত্যেক চিত্রের নিম্নে তাহার মূল্য লিখিত), দৈহিক আমোদ-প্রমোদ। "অতিরিক্ত" (Superfluous) অর্থ সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা ইহারা দরিদ্রতর হয়, আভিজাত্যের যাবতীয় বন্ধন স্বীকার করিয়াও তাহারা মনের রাজ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। এই সকল লোকের অর্থ থাকিয়া কোনও লাভ নাই, কেননা অর্থের সদ্ব্যবহার তাহারা জানে না। ইহারা ক্রমাগতই অর্থের পশ্চাতে ধাবমান হয়। বর্ত্তমানে সকল জাতিই যতটা পারে, অর্থ সঞ্চয়ের জন্য পাগল। অবশেষে মানুষ শিকারী পক্ষীতে পরিণত হয়। বর্ত্তমান বাণিজ্যনীতি দস্যুদিগের নীতির উন্নততর সংস্করণ মাত্র। বণিকেরা সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা বাজারে ক্রয় করে এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ বাজারে বিক্রয় করে। তাহারা আবার বলে, বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিও না (laissez faire)—যাহাদিগকে শাসনে রাখা প্রয়োজন, তাহারাই এই কথা বলে। সাম্যবাদ 'বিপদ জনক' হইলেও জীবনে কিয়ৎ পরিমাণে তাহার প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য। যেসকল ব্যবসায় হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থলাভ হয়, তাহাদিগকে এবং যানবাহন পরিচালনা রাষ্ট্রায়ত্ত করা কর্ত্তব্য। যাহারা অতিরিক্ত পরিমাণ সম্পত্তির অধিকারী, তাহাদিগকে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া গণ্য করা উচিত।

সৈনিকের কর্ম্ম গৌরবজনক। যে মালিক লাভের জন্য শ্রমিকদিগকে ব্যবহার করে, তাহা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে যে সেনানী সৈন্যদিগকে ব্যবহার করেন, তিনি মহত্তর। লোকে আনন্দের সহিত কারখানা ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যায়। নেপোলিয়ন নরহন্তা ছিলেন না; তিনি লোকের হিতচিকীর্ষু ছিলেন। আর্থিক সংঘর্ষে না মরিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গৌরবের সহিত মরিবার সুযোগদান করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান এমন এক জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহাতে যোদ্ধা বণিক অপেক্ষা অধিক সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। যে জাতি বিলাসী ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, যুদ্ধ তাহাদের ঔষধ। শান্তিতে যে সকল প্রবৃত্তি অব্যবহৃত থাকে, যুদ্ধ তাহাদের উত্তেজিত করে। গণতান্ত্রিক পৌরুষহীনতার প্রতিষেধক বাধ্যতামূলক সৈন্যবৃত্তি। যখন কোন জাতি সহজাত প্রবৃত্তির বশে যুদ্ধ ও রাজ্যজয় বর্জ্জন করে, তখন তাহার জীর্ণদশা।

তখন গণতন্ত্রও বণিকের রাজত্বের জন্য সে জাতি প্রস্তুত হইয়াছে। তবু বলিতে হয় বর্ত্তমানকালে যে সকল কারণে যুদ্ধ হয়, তাহা মহৎ নহে। বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিবাদ-জনিত যুদ্ধ অপেক্ষা বিভিন্ন বংশের মধ্যে রাজ্যলোভে যুদ্ধ অথবা ধর্ম্মসংক্রান্ত যুদ্ধ ভালো ছিল। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ইয়োরোপের বিভিন্ন গবর্ণমেন্ট বাণিজ্যের ক্ষেত্রের জন্য ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু হয়তো সেই যুদ্ধ হইতেই ইউরোপ একীভূত হইবে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য বাণিজ্যগত যুদ্ধও তাহার অতিরিক্ত মূল্য হইবে না। কেননা একীকৃত ইয়োরোপেই উন্নত আভিজাত্যের উদ্ভব সম্ভবপর।

আদর্শ সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত হওয়া উচিত; উৎপাদক (কৃষক, শ্রমিক ও বণিক), কর্ম্মচারী (সৈনিক এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী) এবং শাসক। শাসকেরা শাসন করিবে, আদেশ প্রচার করিবে, কিন্তু শাসনের দৈনিক কার্য্য করিবে না।—সেকালে নিকৃষ্ট-শাসকেরা হইবে দার্শনিক রাজনৈতিক। লোকের বিশ্বাস এবং সৈন্যদিগের উপরই তাহাদের ক্ষমতা নির্ভর করিবে। প্লেটো ঠিকই বলিয়াছিলেন। দার্শনিকেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শাসকেরা হইবেন সংস্কৃতিবান সাহসী পুরুষ, একাধারে পণ্ডিত ও সেনাপতি।

এই শাসকশ্রেণী বংশগত জাতি হইবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে নিৎসে বলিয়াছিলেন, প্রধানতঃ তাহাই হইবে। তবে মধ্যে মধ্যে নূতন রক্ত প্রবেশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিম্নশ্রেণীর ধনীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনদ্বারা আভিজাত্যের গুরুতর অনিষ্ট হয়। ইংরেজদিগের মধ্যে তাহা চলিত আছে। ইহা দ্বারাই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসক-সম্প্রদায়—রোমের অভিজাত সেনেট ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জন্ম আকস্মিক নহে। প্রত্যেক শিশুর জন্মই তাহার পিতামাতার বিবাহ সম্বন্ধে প্রকৃতির অভিমত ব্যক্ত করে। বহুপুরুষব্যাপী নির্ব্বাচন এবং প্রস্তুতির ফলস্বরূপে পূর্ণ মানুষের জন্ম হয়। প্রত্যেক মানুষেরই পূর্ব্ব-পুরুষগণ তাহার মূল্য দান করিয়াছে। যেসকল জাতি এইমত সত্য করিতে পারে না, তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। যাহারা ইহার সম্মান করিবে, তাহারাই পৃথিবী জয় করিবে। এতাদৃশ অভিজাত সম্প্রদায়েই সমগ্র ইয়োরোপকে এক জাতিতে পরিণত করিবার সাহস ও দূরদৃষ্টি থাকা সম্ভবপর। ইহারাই মূর্খতাপ্রসূত জাতীয়তাবাদ ও তুচ্ছ স্বদেশাভিমান বিদূরিত করিতে সমর্থ। নেপোলিয়ন, গেটে, বিটোভেন, সোপেনহরের ও হেইনের মত আমরা খাঁটি ইয়োরোপীয় জীব। বহুদিন আমরা বিভক্ত হইয়া আছি। স্বদেশাভিমান এবং প্রাদেশিকতার মধ্যে মহতী সংস্কৃতি কিরূপে জন্মলাভ করিবে? কবে নূতন জাতি ও নূতন নেতৃগণ আবির্ভূত হইবে? ইয়োরোপের জন্ম হইবে কবে?

নিৎসের "অনাদি পুনরাবর্ত্তন"বাদ অনুসারে সমস্ত বস্তুই ফিরিয়া আসিবে; যাহা বিনষ্ট হইতেছে বলিয়া আজ প্রতীতি হইতেছে—তাহা একদিন ফিরিবে, যেরূপ ছিল, ঠিক সেই রূপেই ফিরিবে। একবার মাত্র যে ফিরিবে তাহা নহে, বারবার ফিরিয়া আসিবে। নিৎসে নিজে অনেক বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াছেন। এই মত নিৎসের উদ্ভাবিত নহে; স্টোয়িকগণ ইহার প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। সৃষ্টি প্রবাহ চক্র গতিতে চলিয়াছে, অনাদিকাল হইতে এক এক কল্পে যাহা ঘটিতেছে, পরবর্ত্তী সকল কল্পে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে। নিয়তিবাদ (determinism) যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই মতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অসম্ভব নহে। কাল আদি-অন্তহীন। সৃষ্টির আদিতে জগতের উপাদান-পুঞ্জের যে সংস্থান ছিল, একদিন আবার সেই সংস্থানে তাহাদিগকে আসিতেই হইবে। এবং তাহার ফলে অতীতে সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে।

সমালোচনা

নিৎসের Thus Spake Zarathustra সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সমস্ত গ্রন্থ সম্বন্ধেই তাহা সত্য। তাহার সুন্দর কাব্য, তাহার শৈলী মনোহারীও চমকপ্রদ, কিন্তু তাহাতে যুক্তির প্রাধান্য নাই। অতিরঞ্জন, অতিরিক্ত আত্মশ্লাঘা, প্রচলিত সংস্কারের বিরোধিতা, যাহাই সদ্গুণ বলিয়া পরিগণিত, তাহার প্রতি দ্বেষ, যাহা অসৎ তাহার গুণকীর্ত্তন —এই সমস্ত তাহার রচনার আকর্ষণের কারণ। চরিত্র-নীতির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে, লেখকের পক্ষে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজসাধ্য হয়। নিৎসের গ্রন্থ প্রথমে পাঠককে চমৎকৃত করিলেও অচিরেই তাহার প্রতি বিরক্তি উৎপন্ন হয় এবং লেখকের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। নিৎসে নিজের মত কেবল জোরের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, পয়গম্বরদিগের মতো; কিন্তু কোথাও তাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা করেন নাই। Will Durant বলিয়াছেন :

"নিৎসে রোমান্টিক আন্দোলনের সন্তান, রোমান্টিক ভাবে তিনি সর্ব্বদা নিমজ্জিত হইয়া থাকিতেন। তাহার "অতি মানব" সোপেনহরের "প্রতিভাবান ব্যক্তি" অথবা কারলাইলের "বীর" (Hero) নহে। শব্দটি তিনি পাইয়াছিলেন দ্বিতীয় গেটের নিকট হইতে, কিন্তু গেটেকে তিনি ঘৃণা করিতেন। সহজাত প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির উপরে, ব্যক্তিকে সমাজের উপরে এবং ডায়োনিশাসকে এপোলোর উপর স্থাপনের মধ্যে তাহার রোমান্টিক মনোবৃত্তি প্রকাশিত। সোপেনহর যে "ইচ্ছা" এবং "প্রতিভার" জয়গান করিয়াছিলেন, নিৎসে তাহাকে যাবতীয় সামাজিক সংযম হইতে মুক্ত করিয়া তাহার উলঙ্গরূপ প্রকাশিত করিয়াছেন। এইজন্য কেহ কেহ তাহাকে রুসোর সহিত তুলিত করিয়াছেন।

নিৎসের Birth of Tragedy গ্রন্থ পণ্ডিতদিগের নিকট উপহাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ওয়াগনারকে এস্কাইলাসের সঙ্গে তুলিত করিবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না। ধর্ম্ম সংস্কারকে (Reformation) ডায়োনিসীয় অর্থাৎ নীতিহীন, অসংযত এবং সুরামত্ত বলিয়া বর্ণনা করিবার, এবং রেনেসাঁকে তাহার বিপরীত বলিয়া বর্ণনা করিবারও কোনও হেতু ছিল না। সক্রেটিসের প্রতি তাহার আক্রমণ তাহার ওকালতের প্রতি ঘৃণার ফল।

"প্রাক্‌ সক্রেটিস যুগ যে গ্রীসের গৌরবের যুগ ছিল, তাহা সত্য। কিন্তু সক্রেটিস কি কেবল সমালোচনাই করিয়াছিলেন? দার্শনিক

তর্ক যুগ এবং নৈতিক অধোগতিদ্বারা ধ্বংস-প্রাপ্ত গ্রীক সমাজকে তিনি রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই? যাহাদিগের নিকট নিৎসে ঋণী ছিলেন, তাহাদের সকলকেই তিনি আক্রমণ করিয়াছেন। প্লেটোর নিকট তিনি বহুপরিমাণে ঋণী হইয়াও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। Thrasyamachus এর চরিত্রনীতি (প্লেটোর গ্রন্থে বর্ণিত) এবং প্লেটোর রাজনীতি ভিন্ন নিৎসের দর্শনে আর কি আছে?"

নিৎসে এক দিকে, স্বার্থবাদ (Egoism) প্রচার করিয়াছেন, স্বার্থপরতার প্রশংসা করিয়াছেন; আবার অতিমানুষের ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য স্বার্থত্যাগেরও উপদেশ দিয়াছেন। এদুয় উপদেশের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

নিৎসে সকলকে নিষ্ঠুর হইতে ও ধ্বংসকরর পাপ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার সার্থকতা নাই। বর্তমানে বিনয়ের এত প্রাচুর্য নাই, যে তাহার দমনের জন্য উপদেশের প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি যে ক্ষমতাভিমুখী ইচ্ছার কথা বলিয়াছেন সর্বত্র তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানবচরিত্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারতবর্ষে ও চীন দেশে "ক্ষমতার ইচ্ছার" প্রকাশ হয় নাই। নিৎসে মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থপর প্রবৃত্তিদিগকে উত্তেজিত করিতে চাহিয়াছেন। সামাজিক প্রবৃত্তির মূল্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সামাজিক প্রবৃত্তিসকলের উদ্ভব না হইলে, ধরাপৃষ্ঠ হইতে মানুষ যে বিলুপ্ত হইয়া যাইত না, তাহা কে বলিবে!' এটিলা, চেঙ্গিসখাঁ, তৈমুরলঙ্গ ক্ষমতা-লোভে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করিয়াছিল; তাহাদের শক্তির মধ্যে সৌন্দর্য্য কোথায়? শক্তি-লোভে ইয়োরোপে Inquisition দ্বারা যে নৃশংস কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বীভৎসতা ভিন্ন আর কি ছিল? দেশরক্ষার জন্য কোনও মহান আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য যুদ্ধ প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল যুদ্ধের গৌরবগান করিবার মধ্যে যুক্তি কোথায়? যুদ্ধে যাহারা লিপ্ত, তাহাদের চরিত্রের অনেক উন্নতি হয়, তাহায় চরিত্রের দৃঢ়তাও নির্দ্ধারিত হয়, ইহা সত্য। কিন্তু ইহার জন্য যে মূল্য প্রদান করিতে হয়, তাহা ভীষণ। এই ভীষণতাই নিৎসের চিত্তাকর্ষক! কিন্তু ইহা মানবচিত্তের সৌন্দর্য্যবোধের হানিকর।

প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিতে যে বলবান্, সে দুর্ব্বলকে পরাস্ত করিয়া বাঁচিয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি বুদ্ধির উদ্ভাবন করিয়া দৈহিক শক্তির গুরুত্ব হ্রাস করিয়াছে; বুদ্ধির সহিত দয়া, পরার্থপরতা প্রভৃতি সামাজিক প্রবৃত্তি অভিব্যক্ত হইলেও, তাহারা এখন পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্যকরী হয় নাই। জগতে বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষের আবির্ভাবের মধ্যে এই সমস্ত সামাজিক প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করিবার জন্য প্রকৃতির প্রচেষ্টা নাই, তাহা কে বলিবে? এই সমস্ত গুণের ফলে মানব-জীবন যে সম্পদলাভ করিয়াছে, যে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে, আনন্দপূর্ণ ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার জ্যোতির নিকট নিৎসের "অতিমানব" খদ্যোতের জ্যোতির মতো ম্লান হইয়া পড়ে।

নিৎসের রাজনৈতিক মত অনেকের লক্ষ্য আকর্ষণ করিতে পারে। বর্ত্তমান বড় বড় রাষ্ট্রে প্রকৃত গণতন্ত্র নাই। প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা একরূপ অসম্ভব বলিলে চলে। এথেন্সে প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল; কিন্তু তাহার আচরণে প্লেটো ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। গণতন্ত্র অপেক্ষা অভিজাততন্ত্র উৎকৃষ্ট। কিন্তু এই অভিজাততন্ত্রকে সফল করিতে হইলে অভিজাত শাসনকর্ত্তাদিগের যে যে গুণ থাকা উচিত, কোন উপায় অবলম্বন করিলে, তাহাদিগকে সেই সকল গুণে মণ্ডিত করা যায়, ইহাই সমস্যা। প্লেটো যে উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, নিৎসেও অনেকটা তাঁহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষমতালোভী স্বার্থপর জনগণ তাহা স্বীকার করিয়া লইবে না, ইহা নিশ্চিত। হয়তো বলপ্রয়োগদ্বারা দেশ বিশেষে অভিজাত শাসনের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু শাসনকর্তাগণ প্লেটোর ব্যবস্থা মানিয়া লইতে সম্মত হইবে কি?

কতটুকু

শ্রীপ্রভাত ঘোষ

আকাশের পানে আজি তাকালাম।
মিটি মিটি তারাগুলি জ্বলছে
হাওয়া যেন কার কথা বলছে;
ঠিক নেই কত হবে এর দাম!

পথচারী আজ আর নেই কেউ;
থেমে গেছে সময়ের তাড়না—
কতখানি বেড়ে গেছে ধারণা!
কেন জানি হৃদয়েতে এত ঢেউ?

কতটুকু তুমি আজ জেনেছ,
পৃথিবীর সীমারেখা ছাড়িয়ে—
প্রগতির এত দূরে দাঁড়িয়ে
সে কথা কী একবার জেনেছ?

সতী বেদবতী

স্বামী ভূমানন্দ

সত্য যুগে হংসধ্বজ নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ। তাঁহারা উভয়েই পরম বৈষ্ণব ছিলেন ; কিন্তু সূর্য্যদেবের অভিসম্পাতে উভয়েই রাজ্যভ্রষ্ট ও হতশ্রী হইয়া পড়েন। কালে তাঁহারা অত্যুগ্র তপস্যা অবলম্বন করিয়া ভগবতী মহালক্ষ্মীর আরাধনা করেন এবং দেবীর বরে উভয়েই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধনবান ও যথাকালে পুত্রবান হন। রাজা কুশধ্বজের স্ত্রীর নাম মালাবতী। কালে রাণী মালাবতীর গর্ভে লক্ষ্মীর অংশে কুশধ্বজের এক অপূর্ব্বরূপলাবণ্যবতী কন্যা জন্মে। কন্যা সূতিকা গৃহে ভূমিষ্ঠ হইয়াই সুস্পষ্টভাবে বেদ ধ্বনি করিতে থাকেন। সকলেই কন্যার এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হন ও তাঁহার নাম করণ করেন—"বেদবতী"—

> বেদধ্বনিং সা চকার জাতমাত্রেণ কন্যকা
> তস্মাৎ তাঞ্চ বেদবতীং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ২।১৪।৬৫

লক্ষ্মী স্বরূপিনী বেদবতী জন্মমাত্রই বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ হইলেন ও স্নান করিয়া নারায়ণকে লাভ করিবার অভিপ্রায়ে পুষ্কর তীর্থে গমন করিয়া উগ্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুকাল তপস্যানিরত থাকিলেও তিনি অনুমাত্র ক্লিষ্ট বা অবসন্ন হইলেন না। কিছুকাল এইভাবে অবস্থান করার পর, একদিন এক আকাশ-বাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল—"জন্মান্তরে স্বয়ং ভগবান হরি তোমার পতি হইবেন"—

> জন্মান্তরে তেভর্ত্তা চ ভবিষ্যতি হরিঃ স্বয়ং
> ব্রহ্মাদিভিদুর্রারাধ্যং পতিং লপ্স্যসি সুন্দরি ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ।২।১৪।৬৯

বর্ত্তমান-জন্মে নারায়ণ-লাভ হইবে না জানিয়া বেদবতী অতিশয় দুঃখিত ও রুষ্ট হইলেন এবং পুষ্কর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়ের গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিয়া অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানে উগ্রতর তপস্যা করিতে লাগিলেন—

> ইতি শ্রুত্বা তু সা রুষ্টা চকার চ পুনস্তপঃ
> অতীবনির্জ্জন স্থানে পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ।২।১৪।৭০

ব্রহ্মার মানস-পুত্র মহর্ষি পুলস্ত্য হিমালয়ে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। রাজর্ষি-কন্যা ও তাঁহার সখীগণ মধ্যে মধ্যে নৃত্যগীতাদি করিয়া মহর্ষির তপস্যার বিঘ্ন করিতেন। একদিন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—"তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আমাকে ভবিষ্যতে দর্শন করিবে সে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হইবে।" কন্যাগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিল। দৈবযোগে রাজকন্যা সে সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি শাপ-বৃত্তান্ত না জানায় সখীগণকে অন্বেষণ করিতে করিতে বেদপাঠনিরত মহর্ষিকে দর্শন করেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়। কন্যা ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পিতার নিকট গমন করেন। তিনি ধ্যানবলে শাপ-বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং কন্যাকে সঙ্গে লইয়া মহর্ষির আশ্রমে আগমন করতঃ মহর্ষির সেবার জন্য কন্যাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মহর্ষি কন্যাকে গ্রহণ করিলেন। কালে কন্যার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মহর্ষি একদিন তাঁহাকে বলিলেন—"তোমাকে পৌলস্ত্য নামক একটি পুত্র প্রদান করিব। তুমি আমার বেদাধ্যয়ন শ্রবণ করিয়াছিলে বলিয়া উহার অপর এক নাম হইবে "বিশ্রবা"—

> যস্মাত্তু বিশ্রুতো বেদস্ত্বয়েহাধ্যায়তো মম
> তস্মাৎ স বিশ্রবা নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥

রামায়ণ ৭।২।২৯

যথাকালে বিশ্রবা জন্ম-গ্রহণ করিলেন এবং পিতার ন্যায় ব্রতাচার-পরায়ণ হইয়া তপস্যানিরত হইলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ, বিশ্রবার গুণ ও তপস্যা-প্রভাব অবগত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় কন্যা প্রদান করিলেন। কালে তাঁহাদিগের এক পুত্র সন্তান জন্মিল এবং মহর্ষি পুলস্ত্য পৌত্রের নামকরণ করিলেন "বৈশ্রবণ"। এই বৈশ্রবণেরই অপর নাম কুবের, ধনদ, যক্ষরাজ, ধনেশ প্রভৃতি। বৈশ্রবণের তীব্র তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে নানাবিধ বর ও কামগ পুষ্পকবিমান প্রদান করিলেন। বৈশ্রবণ পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বর-লাভ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং নিজের বাসের নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান প্রার্থনা করিলেন। বিশ্রবা তাঁহাকে বলিলেন—"পূর্ব্বে রাক্ষসদিগের জন্য সমুদ্র মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কা নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; রাক্ষসগণ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিষ্ণুর ভয়ে পাতালে বাস করিতেছে ; তুমি এক্ষণে সেই জন-শূন্য লঙ্কায় গিয়া বাস কর।" পিতার আদেশে বৈশ্রবণ লঙ্কায় গিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই লঙ্কা মহানগরীতে পরিণত হইল।

কিছুকাল অতীত হইলে রাক্ষসরাজ সুমালী, কন্যা নৈকষীর সহিত পাতাল হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, বৈশ্রবণ পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত পুষ্পকরথে আকাশ-মার্গে গমন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সুমালী চিন্তা করিলেন, রাক্ষস-বংশের উন্নতির নিমিত্ত বৈশ্রবণের ন্যায় তেজস্বী পুত্রের প্রয়োজন এবং স্বীয় কন্যা নৈকষীকে বিশ্রবার হস্তে সম্প্রদান করিতে সংকল্প করিলেন। সুমালী কন্যার নিকট স্বকীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে বিশ্রবার নিকট গমন করিতে বলিলেন। পিতার আদেশানুসারে নৈকষী হিমালয়ে গমন করিলেন এবং বিশ্রবার আশ্রমে

উপস্থিত হইলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল; মহর্ষি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তপোধন ধ্যানবলে নৈকষীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিলেন—"তুমি অত্যন্ত দারুণ সময়ে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, অতএব তোমার সন্তানগণ ভয়ঙ্কর ক্রূরাচারসম্পন্ন হইবে।" নৈকষী এবম্বিধ অনভিপ্রেত বরে ভীত হইয়া মহর্ষির স্তবস্তুতি করিলেন; ইহাতে মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার বংশানুরূপ ধর্ম্মাচারপরায়ণ হইবে—

পশ্চিমো যস্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে
মম বংশানুরূপঃ স ধর্ম্মাচারো ন সংশয়ঃ॥ রামায়ণ ৭।৯।২৫

কিছুকাল পরেই নৈকষী বিভৎসাকার দশমুণ্ডবিশিষ্ট এক রাক্ষস প্রসব করিলেন ও পরে যথাক্রমে কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ জন্মগ্রহণ করিলেন। পুত্রকন্যাগণ হিমালয় প্রদেশেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। একদিন বৈশ্রবণ লঙ্কা হইতে পুষ্পকরথে পিতৃসন্নিধানে আগমন করিতে-ছিলেন; নৈকষী দশগ্রীবকে উহা দেখাইয়া বলিলেন—"তুমি তোমার জ্যেষ্ঠের ন্যায় তেজস্বী হইতে চেষ্টা কর।" দশগ্রীব মাতৃবাক্যে গোকর্ণে গমন করিয়া উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে দেব, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির অবধ্য বলিয়া বর প্রদান করিলেন। নর ও অন্যান্য প্রাণী ভক্ষ্য বলিয়া রাবণ তাহাদিগের সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না।

দশগ্রীবের বরপ্রাপ্তির বিষয় অবগত হইয়া মাতামহ সুমালী সহচরবর্গসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা সদলবলে লঙ্কা আক্রমণ করিলেন। বৈশ্রবণ পিতার আদেশে লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন ও যক্ষদিগের অধিপতি হইয়া অলকায় বাস করিতে লাগিলেন। লঙ্কায় স্বরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দশস্কন্ধ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন এবং বৈশ্রবণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার পুষ্পকরথ অধিকার করিলেন। পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া হিমালয় অতিক্রম করিতে গিয়া, সহসা রথের গতি প্রতিরুদ্ধ হয়, কিন্তু দশগ্রীব ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া অনুসন্ধান করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে শিবানুচর নন্দী আসিয়া তাঁহাকে বলেন যে, পর্ব্বতাগ্রে হর-পার্ব্বতী ক্রীড়া করিতেছেন; উহা দেবতাদিগেরও অগম্য। রাবণ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিমান হইতে অবতরণ করতঃ পর্ব্বতটি সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য বিংশতি হস্তদ্বারা উহার মূলদেশ গ্রহণ করিয়া উত্তোলিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সমগ্র হস্ত স্তম্ভিত ও পর্ব্বতগাত্রে আবদ্ধ হইয়া যায়। দশানন বহু চেষ্টা করিয়াও হস্ত মুক্ত করিতে না পারায় এবং অত্যন্ত যাতনা অনুভব করায় উৎকট চীৎকার করিতে থাকেন। তখন সমভিব্যাহারী মারীচ প্রভৃতি মন্ত্রিগণের উপদেশে তিনি ভগবান ভবানীপতির স্তবস্তুতি করেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন ও দশগ্রীবের বিকট চিৎকার (রাব) শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোক সন্ত্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নামকরণ করেন—"রাবণ"—

যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ্রাবিতং ভয়মাগতম্
তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম্না খ্যাতিং রাজন্ গমিষ্যসি॥
রামায়ণ।৭।১৬।৩১

পরে রাবণ বহু ক্ষত্রিয় নরপতিকে স্ববশে আনয়ন করেন ও তাঁহাদিগের স্ত্রীকন্যাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতঃপর একদিন হিমালয় পর্ব্বতের বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে রাবণ সহসা কৃষ্ণাজিন-পরিহিতা ও জটাধারিণী এক পরমাসুন্দরী দেবীরূপিণী তপস্বিনী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। দুরভিসন্ধিপূর্ণ রাবণ কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তপস্বিনী প্রথমে রাবণের যথোচিত আতিথ্যসৎকার করিলেন ও পরে উত্তরে বলিলেন—"আমি রাজর্ষি কুশধ্বজের কন্যা, আমার নাম বেদবতী। দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্বাদি অনেকেই আমার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে প্রার্থনা করেন; কিন্তু পিতা তাহাদিগের কাহারও প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; কারণ তাঁহার ইচ্ছা ছিল ভগবান বিষ্ণু তাঁহার জামাতা হন। দৈত্যরাজ শম্ভু, পিতার এই সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে হত্যা করেন; মাতা পিতার মৃত দেহ আলিঙ্গন করিয়া চিতায় প্রবেশ করেন। পিতার ইচ্ছানুসারে আমারও দৃঢ় সংকল্প, আমি নারায়ণ ভিন্ন অপর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না"—

নারায়ণং পতির্মেঽস্তু ন চান্যো মানুষোত্তমঃ
আশ্রিতাং চাপি মাং বিদ্ধি নারায়ণপরায়ণাম্॥
রামায়ণ। ৭।১৭।১৮

বেদবতী আরও বলিলেন—"আমি তপস্যা-প্রভাবে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, আপনি পৌলস্ত্যকুলজাত।"

কামোন্মত্ত রাবণ বেদবতীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ধর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু বেদবতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তপঃশক্তি-প্রভাবে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিলেন; রাবণের সমগ্র দেহ নিস্পন্দ হইয়া রহিল এবং তিনি বাক্য-প্রয়োগ করিতেও সমর্থ হইলেন না—

সা সতী কোপ-দৃষ্ট্যা চ স্তম্ভিতং তং চকার হ
স জড়ো হস্তপাদাভ্যাং কিয়ৎকর্তুং ন চ ক্ষমঃ
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।২।১৪।১৬

রাবণ ভীত হইয়া মনে মনে দেবীর স্তবস্তুতি করিলেন, এবং তিনি স্তম্ভন প্রত্যাহার করিয়া রাবণকে বলিলেন—তুমি আমার দেহ স্পর্শ করিয়াছ, অতএব তোমার সমক্ষেই আমি এই অপবিত্র দেহ পরিত্যাগ করিব। এই বলিয়া বেদবতী অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন ও রাবণকে বলিলেন—"আমি তোমার বধের নিমিত্ত পুনরায় অযোনিজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিব"—

(ক) যস্মাত্তু ধর্ষিতা তেঽহমেকেত্যবমতা বনে।
তস্মাৎ তব বধার্থায় সমুৎপৎস্যাম্যহং পুনঃ॥

যদি ত্বস্তি ময়া কিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং হুতংতথা
তেন হ্যযোনিজা সাধ্বী ভবেয়ং ধর্ম্মিণঃ সুতা ॥

রামায়ণ ।৭।১৭।২৭, ২৯,

(খ) শশাপ চ মদর্থে ত্বং বিনঙ্ক্ষ্যসি সবান্ধবঃ
স্পৃষ্টাহঞ্চ ত্বয়া কায়ং বিসৃজাম্যবলোকয় ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ।২।১৪।১৮

রাবণকে এবম্বিধ অভিসম্পাত করিয়া বেদবতী দেহত্যাগ করিলেন।

পরবর্তী কালে ত্রেতাযুগে বেদবতী লঙ্কানগরীতেই একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম মধ্যে কমলপ্রভা কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। রাবণ ঐ কন্যাকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় গৃহে আনয়ন করেন এবং লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রীদিগের সহিত ঐ কন্যাসম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহারা তাঁহাকে বলেন, গৃহস্থের পক্ষে ঐ কন্যাকে গ্রহণ করা উচিত নয়। এই কথা শুনিয়া রাবণ কন্যাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তরঙ্গাঘাতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হইতে হইতে, কালে ঐ কন্যা রাজা জনকের যজ্ঞোদ্যানের নিকটে নিক্ষিপ্ত হন এবং ক্রমে মৃত্তিকাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকেন। একদা যজ্ঞভূমিকর্ষণ কালে রাজর্ষির হলের অগ্রভাগে আকৃষ্ট ঐ কন্যা ভূ পৃষ্ঠে উন্নীতা হন। জনক তাঁহাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়া লালন পালন করিতে থাকেন এবং হলাগ্র (সীতা) হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার নাম রাখেন "সীতা"—

সৈষা বেদবতী নাম পূর্ব্বমাসীৎ কৃতে যুগে
সীতোৎপন্নতি সীতা সা মানবৈঃ পুনরুচ্যতে ॥

রামায়ণ ।৭।১৭।৩৮

ইহার পর যথাকালে স্বয়ম্বর সভায় হরধনু ভঙ্গ করিয়া, অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্র নারায়ণাংশে অবতীর্ণ শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করিলেন। বেদবতীর পূর্ব্বজন্মের দৈববাণী সফল হইল। কিছুকাল পরেই রাম পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য লক্ষ্মণের সহিত বন গমন করেন এবং সীতাও তাঁহার অনুগামিনী হন। ইতিমধ্যে রাজা দশরথ পুত্র-বিরহে মুহ্যমান হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহারা প্রথমে চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করেন ও পরে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন। গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীতে অবস্থান কালে, রাবণকর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হন। পরে কিষ্কিন্ধ্যায় ঋষ্যমূখ পর্ব্বতস্থিত বানর-রাজ সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিত্রতা জন্মে। তাঁহার সহায়তায় সমুদ্রের উপর সেতুনির্ম্মাণ করিয়া রাম লঙ্কা অবরোধ করেন এবং যুদ্ধে রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করেন। সীতার অগ্নি-পরীক্ষার পর রাম সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ পিতৃ-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য পালন করিতে থাকেন। কালে প্রজানুরঞ্জনের নিমিত্ত রাম গর্ভবতী সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে নির্ব্বাসিত করেন। কিছুকাল পরে বাল্মীকি, সীতা কর্তৃক তদীয় আশ্রমে প্রসূত রাম সীতার তনয়-যুগল লব ও কুশকে লইয়া অযোধ্যা নগরীতে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞে আগমন করেন। কিন্তু পুনরায় অগ্নি-পরীক্ষার প্রস্তাব শুনিয়া সীতাদেবী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া মাতা বসুমতীকে স্মরণ করিলেন। সকলের সমক্ষে সহসা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল। ধরণী দেবী বাহু দ্বারা সীতাকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। সীতা সেই অবস্থায়ই ধীরে ধীরে রসাতলে প্রবেশ করিলেন। তখন, তাঁহার উপর স্বর্গ হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল—

ভূতলং ভিত্ত্বা সহসা সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥
তস্মিংস্তু ধরণী দেবী সীতামাদায় বাহুনা
স্বাগতং তে তথোক্ত্বা তামাসনে সংন্যবেশয়ৎ ॥
তমাসনগতাং দেবীং প্রবিশন্তীং রসাতলম্
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥

রামায়ণ। ৭।১০৪।১৫—১৮

লক্ষ্মী-নারায়ণের এই বিচিত্র নরলীলা ভূতলে অমর হইয়া আছে। অদ্যাপিও আমাদিগের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁহাদিগের জন্ম কর্ম্মের অলৌকিক কাহিনী উজ্জ্বল আদর্শ হইয়া রহিয়াছে এবং প্রতি পাদক্ষেপে আমাদিগকে সত্যানুসরণে উদ্দীপ্ত করিতেছে—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতা, রাম ॥

যে চন্দনচর্চ্চিত নীলাকাশতলে কল্পনার সহিত চার্ব্বাকের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল সে চন্দনচর্চ্চিত নীলাকাশ চিরকালের মতো হারাইয়া গিয়াছে। সেদিন জ্যোৎস্না-মণ্ডিত লঘু মেঘ-খণ্ড-গুলিকে মেঘ বলিয়া মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল যেন কোনও অদৃশ্য নিপুণ হস্ত আকাশ-প্রাঙ্গণে চন্দনের আল্পনা আঁকিয়া দিয়াছে। যে কুঞ্জে তাহাদের আলাপ হইয়াছিল তাহাও মনে হইতেছিল যেন পারিজাত-কুঞ্জ। মর্ত্ত্যলোকেই সেদিন সহসা যেন অমর্ত্ত্যলোকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। চার্ব্বাক নিজেই বিস্ময় বোধ করিতেছিল। তাহার বারম্বার মনে হইতেছিল যে রূপসী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়াছে সে মানবী তো নিশ্চয়ই —স্বপ্ন মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছে—এ জাতীয় কবিত্বের প্রশ্রয় আর যেই দিক চার্ব্বাক দিবে না—কিন্তু আজ সমস্ত প্রকৃতিই এমন অপ্রকৃতিস্থ কেন, অতি সাধারণ ঝুমকো লতাকেই পারিজাত বলিয়া মনে হইবার কারণ কি। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতেই চার্ব্বাক নির্জ্জন প্রান্তরে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল। ভাবিতেছিল সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্ত্তা মহেশ্বরকে লইয়া কত অদ্ভুত জল্পনা যে কত লোককে বিভ্রান্ত করিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক কার্য্যেরই সঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য কেহই সচেষ্ট নহে, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আজগুবি একটা জল্পনার উপর চক্ষু বুজিয়া নির্ভর করিবার জন্যই সকলে উন্মুখ···তাহার চিন্তাধারাকে ব্যাহত করিয়া সহসা এই তন্বী রূপসী কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বানও করিল। তাহার পর হইতেই যাবতীয় পার্থিব বস্তু অপার্থিব মনে হইতেছে ইহা বড়ই বিস্ময়কর।

"আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন ?"

বিস্মিত চার্ব্বাক প্রশ্ন করিয়া কল্পনার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"আমি ? কই না"

কল্পনার অধরের আকম্পনে যাহা সূচিত হইল তাহা ব্যঙ্গ না আমন্ত্রণ তাহা চার্ব্বাক ঠিক বুঝিতে পারিল না।

"মনে হল আপনি যেন ডাকলেন আমাকে"

"ও তাই না কি। তাহলে আসুন একটু আলাপ করা যাক"

"আলাপ ? ও, আচ্ছা, বেশ তো"

চার্ব্বাকের মুখে ঈষৎ ইতস্ততভাব দেখিয়া কল্পনার অধরপ্রান্তে অতি মধুর একটি হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল।

"আপনার যদি অবসর না থাকে তাহলে—"

"না, না অবসর আছে। আমি কেবল একটা বিশেষ বিষয়ে চিন্তা করবার জন্যে নির্জ্জনে এসেছিলাম। তা সে পরে হলেও ক্ষতি নেই"

"যদি আপনার আপত্তি না থাকে আমিও আপনার চিন্তার অংশ নিতে পারি। নিঃশব্দ চিন্তার চেয়ে সশব্দ চিন্তা অনেক সময় বেশী ফলপ্রদ হয়। দুজনে মিলে যদি চিন্তার জট ছাড়াতে থাকি তাহলে—"

কল্পনার ইন্দিবর নয়নের দিকে চাহিয়া চার্ব্বাক বলিল, "সুবিধা হয়, যদি দুজনেরই চিন্তার পদ্ধতি একরকম হয়। আমি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। আমাদের ধারণা পিতামহই সৃষ্টিকর্ত্তা—"

কল্পনার অধরে আবার হাসি ফুটিল।

"আমার ধারণা তা নয়। আমার ধারণা পিতামহকে খতম করতে না পারলে সৃষ্টি রক্ষা পাবে না। পিতামহ আছেন, কিন্তু তাঁকে হত্যা করতে হবে"

"আছেন ?"

"নিশ্চয়ই"

"কোথায়"

"আপনার মনে, আমার মনে। তাছাড়া সশরীরেও আছেন চতুর্ম্মুখ। আমার জীবনের একটা লক্ষ্য চতুর্ম্মুখকে সম্পূর্ণ নির্মুখ করা. তাঁকে ধ্বংস করতে না পারলে জগতের মঙ্গল নেই"

চার্ব্বাক রোমাঞ্চিত হইল। এই রূপসীর সহিত এমন মতের মিল হইয়া যাইবে তাহা সে প্রত্যাশা করে নাই। "নারীদের সহিত প্রায়শই মতের মিল হয় না, প্রয়োজনের খাতিরে ভাণ করিতে হয় যে মতের মিল হইয়াছে" ইহাই চার্ব্বাকের ধারণা, এক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনা ঘটাতে, বিশেষত নারীটি রূপসী হওয়াতে, চার্ব্বাকের স্বভাব-সুলভ অবিশ্বাস পুলক-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। চার্ব্বাক স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল তাহা প্রকৃতই চার্ব্বাকীয়। জ্যোৎস্না মনোহারিণী হইয়া উঠিয়াছে, ঝুমকো লতাকে পারিজাত বলিয়া ভ্রম হইতেছে, মর্ত্ত্যলোকে অমর্ত্ত্যলোকের সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, রূপসী তরুণীটিও অপরূপা, এই লক্ষণ-পরম্পরা প্রণিধান করিয়া চার্ব্বাকের মনে হইল সহসা আত্মসমর্পণ করা অনুচিত হইবে। অবিশ্বাস নিকষে যাচাই না করিলে সত্যের স্বরূপ উদঘাটিত হয় না। রমণীর সহিত কৌশলে আলাপ করিতে হইবে, একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িলে চলিবে না।

"আপনার চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যে চমকিত হয়েছি। আপনার এই বিদ্রোহ-বলিষ্ঠ ধারণার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য কিন্তু গ্রহণ করতে পারছি না। পিতামহের শারীরিক অস্তিত্বও আপনি কল্পনা করেন ?"

"কল্পনা করি না, বিশ্বাস করি, জানি"

"জানেন ? আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন ?"

"এই মুহূর্ত্তে"

চার্ব্বাকের ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়ে ঈষৎ বিস্ফারিত হইয়া গেল। কল্পনার চক্ষুর্দ্বয়ে কৌতুক নাচিতে লাগিল।

"চক্ষু বিস্ফারিত করলে পিতামহকে দেখতে পাবেন না। চক্ষু বুজুন। বুজলেই দেখবেন পিতামহ চতুর্ম্মুখ আপনার মানসপটে ফুটে উঠেছেন"

"কিন্তু তার দ্বারাই কি শারীরিক অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় ?"

"ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আমরা সংশয় অপনোদন করে' থাকি। অনেক পণ্ডিত বলেন, মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পিতামহকে দেখে যদি আপনার তৃপ্তি না হয় অন্য কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে অনুভব করতে চান বলুন ? তাঁকে চাক্ষুষ দেখতে চান ? তাঁর বাক্য শ্রবণ করলে কি আপনার প্রত্যয় হবে ? না, তাঁকে স্পর্শ করতে আপনি উৎসুক ? তাঁকে আঘ্রাণও করা যেতে পারে, এমন কি রসনা দ্বারা—"

চার্ব্বাক বলিলেন—"আপনার বক্তব্য আমি বুঝেছি বিস্তারিত করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনার শারীরিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি যেমন নিঃসংশয় পিতামহের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও আমি সেইরূপ নিঃসংশয় হতে চাই"

"আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনি কি নিঃসংশয় ?"

"ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যতটুকু নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব ততটুকু নিঃসংশয় বই কি। সন্দেহ নিরসনের যে নিরিন্দ্রিয় উপায় ঋষিরা বর্ণনা করে' থাকেন, তা আয়ত্ত করবার চেষ্টা আমি কখনও করি নি। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকেই আমি চরম বলে' মানব। তবে মন নামক যে ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আপনি এখনই করলেন, তার একক সাক্ষ্যকে গ্রাহ্য করা বিপজ্জনক বলেই তা গ্রাহ্য আমি করব না। কারণ আমি জানি মন কল্পনা-প্রবণ, এমন অনেক অলীক বস্তু সে কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি করে যার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। সুতরাং তার উপলব্ধি অন্তত আর একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। আপনাকে যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছি পিতামহকেও যদি তেমনি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করতে পারি তবেই তার অস্তিত্ব স্বীকার করব"

কল্পনার মুখ মণ্ডলে যে জ্যোতি প্রতিভাত হইল তাহার উৎস যে গভীর আত্মপ্রত্যয় তাহাতে চার্ব্বাকের কোনও সন্দেহ রহিল না। হর্ষ কণ্টকিত হইয়া সে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যাশা করিতে লাগিল এই সহসা-আবির্ভূতা সৌন্দর্য্য-প্রতিমা হয়তো সত্যই তাহার সন্দেহ নিরসন করিতে পারিবে। বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে সে কল্পনার অপরূপ মুখ-শোভার দিকে চাহিয়া রহিল। কল্পনা বলিল, "আপনি পিতামহকে চাক্ষুষই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। কিন্তু তার জন্য একটি বিশেষ প্রক্রিয়া করতে হবে। আর একটি প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে আমাকে"

"কি প্রক্রিয়া ? কি প্রতিশ্রুতি ? বলুন। যদি অসম্ভব না হয়—"

"মোটেই অসম্ভব নয়। প্রক্রিয়াটি অতীব সহজ। আমার কোলের উপর মাথা রেখে শুতে হবে, তারপর চোখ বুজতে হবে। আমি যতক্ষণ না বলি ততক্ষণ আপনি চোখ

খুলতে পারেন না। আমি আপনাকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাব। ব্রহ্মলোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে আমি আপনাকে চোখ খুলতে বলব, তখন আপনি পিতামহ ব্রহ্মাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। হয়তো তাঁর কথাও শুনতে পাবেন"

যুবতীর ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিয়া জ্যোৎস্নালোকিত নির্জ্জন প্রান্তরে শয়ন করিতে চার্ব্বাকের আপত্তি ছিল না কিন্তু তাহার যুক্তিবাদী মন প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিল। সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল—"এরকম করবার অর্থ কি ?"

"অর্থ খুবই প্রাঞ্জল। সত্যকে সহজে পাওয়া যায় না। নানাবিধ প্রক্রিয়ার জটিল পথে ভ্রমণ করে' তবে সত্যের সমীপবর্ত্তী হ'তে হয়। কেউ যোগাসনে বসে' প্রাণায়াম করেন, কেউ বিজ্ঞানাগারে ব'সে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চক্ষু লগ্ন করে' বসে থাকেন, রসায়ন শাস্ত্রের গভীর অরণ্যে দিশাহারা হয়ে পড়েন কেউ বা। সত্যের সন্ধানে বহু জ্ঞানী বহু প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হয়েছেন। আপনাকেও হতে হবে। আমি যে প্রক্রিয়ার কথা বললাম তা কঠিনও নয়—"

"কঠিন তো নয়ই, বরং কোমল। হয় তো অতি-কোমল, সেই জন্য আশঙ্কা হচ্ছে হয় তো অভিভূত হয়ে পড়ব"

"পড়লেই বা"

"অভিভূত চেতনা দিয়ে কি সত্যকে ঠিক মতো দেখতে পাব ?"

"অভিভূত না হলে সত্যকে দেখাই যায় না। একটা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েই তো লোকে সত্যের সন্ধান করে এবং সেই ভাবের আলোকেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করে। যাঁরা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সত্যকে দেখতে চান তাঁরাও 'আমি সর্ব্ব সংস্কারমুক্ত' এই সংস্কারের অধীনতা স্বীকার করেন, যদিও সব সময়ে সেটা বুঝতে পারেন না। সুতরাং অভিভূত হতে ভয় পাবেন না, বরং কামনা করুন যাতে অভিভূত হ'তে পারেন—"

চার্ব্বাক তখন অনুভব করিল যে তরুণীর ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিবার পূর্ব্বেই সে অভিভূত হইয়াছে। ইহাও সে বুঝিতে পারিল যে এই মায়াবিনী তরুণীর সহিত বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়া কোন লাভ নাই। ইহার ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিলে পিতামহের সাক্ষাৎ মিলিবে এ বিশ্বাস চার্ব্বাকের ছিল না, কিন্তু ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিলে যে ক্রোড়েই মস্তক ন্যস্ত হইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল। চার্ব্বাকীয় নীতি অনুসারে সুতরাং সে আর অসম্মতি প্রকাশ করিল না।

"বেশ, তবে তাই হোক। আপনি বসুন"

"একটি প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে"

"কি বলুন—"

"মন থেকে অবিশ্বাস দূর করতে হবে। অবিশ্বাস জিনিসটা ধোঁয়ার মত, দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট করে' দেয়—"

"কিন্তু আমি জানি অবিশ্বাসটাই আলো। অবিশ্বাসের আলো দিয়েই সত্যের সত্যতা দেখা যায়—"

"ওটা আপনার ভুল ধারণা। আলো দিয়ে সব জিনিস দেখাই যায় না—"

"যেমন ?"

"অন্ধকার"

কল্পনার বিম্বাধর হাস্যরঞ্জিত হইল। চার্ব্বাকের দিকে চাহিয়া গ্রীবাভঙ্গী করত সে প্রশ্ন করিল "আমাকেও কি আপনি অবিশ্বাস করছেন ?"

"মোটেই না"

"তবে যা বলছি তা করুন। পিতামহকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবেন এই আকাঙ্ক্ষা আপনার সর্ব্ববিধ অবিশ্বাসকে দূর করুক। আপনি বিশ্বাস করুন যে পিতামহ আছেন, তাঁকে আপনি দেখতে পাবেন। চোখ খুলে না রাখলে দেখতে পাবেন কি করে ? বিশ্বাসই আমাদের চক্ষু। বাইরের চক্ষু বন্ধ করে' সেই চক্ষু খুলে রাখুন—"

কল্পনার দিকে চাহিয়া চার্ব্বাকের সর্বাঙ্গ আবার রোমাঞ্চিত হইল, সে যেন অনুভব করিল যে ফল যাহাই হউক আপাতত এই মনোরমার নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সহসা তাহার মনে একটা প্রশ্ন জাগিল।

"বেশ তাই হবে। আমি মনে কোনও অবিশ্বাস রাখব না। কিন্তু একটা কথা, সত্যই পিতামহ যদি থাকেন তাঁকে ধ্বংস করার সার্থকতা কি—আর কি করেই বা তা সম্ভব হতে পারে ?"

"খুবই সঙ্গত প্রশ্ন করেছেন আপনি এবার। পিতামহকে ধ্বংস করা প্রয়োজন, কারণ তাঁকে ধ্বংস না করলে তাঁর

নবতম সৃষ্টি আমাদেরই ধ্বংস করে' ফেলবে। তিনি এবার সৃষ্টি করছেন মারণ-অস্ত্র। সে অস্ত্র এমনই মারাত্মক যে তার সামান্যতম প্রহারে নিখিল বিশ্ব লোপ পেয়ে যাবে"

"তাই না কি"

"আর সবচেয়ে ভয়ানক কথা—সে অস্ত্র সশরীরে কোথাও বর্ত্তমান নেই, অর্থাৎ তা বস্তু নয়। পিতামহের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ক্ষুদ্রতম ভাব-রূপে ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করছে তাঁর অবচেতন লোকে, এখনও তা অমূর্ত্ত, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তা মূর্ত্ত হবে সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের মৃত্যু। সেই জন্যই পিতামহকে যত শীঘ্র সম্ভব ধ্বংস করা প্রয়োজন"

চার্ব্বাক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার বিস্ময় শুধু যে সীমা অতিক্রম করিয়াছিল তাহা নয়, তাহা আর বিস্ময় ছিল না, তাহা অবিশ্বাস আতঙ্ক প্রভৃতি অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে অপরূপ একটা উপলব্ধিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অন্তরতম সত্তা এই পরম উপলব্ধিকে প্রশ্ন দ্বারা বিক্ষত করিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু চার্ব্বাকের চার্ব্বাকীয় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় নাই। সুতরাং পুনরায় সে প্রশ্ন করিল—"এই অদ্ভুত খবর আপনি পেলেন কি করে ?"

"তা যদি বলতে পারতাম, অর্থাৎ তা যদি বর্ণনীয় হত তাহলে এত ভনিতা করতাম না, বলে ফেলতাম। এই অদ্ভুত খবর আমি যে উপায়ে পেয়েছি আপনাকেও ঠিক সেই উপায়েই পেতে হবে। আমার কোলে মাথা রেখে শুতে হবে—"

"আপনি কার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন জানতে পারি কি ?"

"জানাতে আমার আপত্তি নেই। তিনি একজন পুরুষ, পরম পুরুষ—"

"কি করে' তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন ?"

"আপনি যেভাবে আমার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সেদিনও জ্যোৎস্না এমনই মনোহারিণী ছিল, সেদিনও আকাশ-পটে ঠিক এমনই সমারোহ ছিল শুভ্র মেঘমালার। আমিও সেদিন ঠিক আপনারই মতো প্রশ্নাকুল চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এমনই এক নির্জ্জন প্রান্তরে—"

"এমন সময় হঠাৎ তিনি আবির্ভূত হলেন ?"

"মনে হল যেন আমার ভিতর থেকেই বেরিয়ে এলেন। আমার সম্বন্ধে আপনার ঠিক এরকম মনে হয়েছে কি না জানি না, তাঁর সম্বন্ধে আমার কিন্তু হয়েছিল"

ক্ষণকাল হতবাক থাকিয়া চার্ব্বাক বলিল—"পিতামহকে দেখেছেন আপনি ?"

"দেখেছি। আপনিও দেখবেন। তাঁকে ধ্বংস করবার ভারও নিতে হবে আপনাকে। আপনাকে সেই মহৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আপনি যে আজ এখানে আসবেন তা আমি আগে থাকতেই জানতাম। পরম পুরুষের নির্দ্দেশ মতোই আমি এখানে অপেক্ষা করছি আপনার জন্য"

"তিনি নিজে এলেও তো পারতেন"—চার্ব্বাক সপ্রতিভ হইবার চেষ্টা করিল।

"সম্ভব হলে আসতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি আপনার নাগাল পাবেন না, আপনার বোধ-শক্তির সীমায় আসবার মতো স্থূলতা তাঁর নেই, তাই তিনি আমার সাহায্য নিয়েছেন। আমাকে প্ররোচিত করেছেন তিনি, আমি করছি আপনাকে। তাঁকে কে প্ররোচিত করেছিল জানি না। তবে এইটুকু শুধু জানি—পিতামহকে হত্যা করবার জন্যে অনাদিকাল থেকে যে ষড়যন্ত্র খড়্গ প্রস্তুত হচ্ছে আমি তার একটি অংশ, আর তার সঙ্গে আপনাকে সংযুক্ত করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য"

চার্ব্বাকের সহসা মনে হইল বৈকালে দুই পাত্র মাধ্বী সুরা পান করিয়াছিলাম এই সকল অলীক ঘটনা পরম্পরা তাহারই ফল নয় তো! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কল্পনার কলহাস্য তাহাকে আত্মস্থ করিল।

"মাত্র দু পাত্র মাধ্বী সুরা চার্ব্বাককে বিচলিত করতে পারে নি। আপনি যা প্রত্যক্ষ করছেন তা অলীক নয়, সত্য"

চার্ব্বাক বিস্মিত হইল। যাদুকরী না কি ? (ক্রমশঃ)

বিস্ময়ের দেশ তিব্বত

শ্রীসুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর দেশ তিব্বত। ইহা বৌদ্ধদের দেশ, ইহা শান্তির দেশ। পৃথিবীর আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন, বহু জাতির উত্থান-পতন এবং বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ কোনদিন তিব্বতের গায়ে এতটুকু আঘাত করিতে পারে নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া সে তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সে তাহার বলিষ্ঠ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে এবং বাহিরের কোন বিশেষ প্রভাবে সে আপনার পথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে চীনের মাঞ্চুরাজবংশ তিব্বতে কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের ফলে সে চীনের শাসনকর্তৃত্বের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাজ্যের মর্য্যাদা পাইয়াছে। আজিকার চীনের নবজাগ্রত শক্তি পুনরায় তিব্বতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট চীন ঘোষণা করিয়াছে যে চীনেরই অংশ বিশেষ তিব্বতের মুক্তিসাধনকল্পে তাহাদের সৈন্যবাহিনী তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছে।

যদিও বহির্জগতের সহিত তিব্বতের কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি আজ সে কম্যুনিষ্ট আক্রমণের সম্মুখীন। দলাইলামা দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। দলাইলামার রাজধানী লাসা। লাসা আধ্যাত্মিক ভূমি এবং তথায় প্রায় ২০ হাজার বৌদ্ধভিক্ষু বাস করেন। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিন জন বৌদ্ধভিক্ষু এখানে বাস করেন। এই তিনজনের সমবেত প্রার্থনার সময়ে হাজার হাজার ভিক্ষু সমবেত হয়। সম্প্রতি এক প্রার্থনা-সভায় দলাইলামার পরামর্শদাতৃগণ তাঁহার কোষ্ঠী বিচার করিতে যাইয়া তিব্বতে এক বিদেশী জাতির উপস্থিতির আভাস পান। কিছু দিন পূর্ব্বে চীনের গৃহযুদ্ধের সময় তিব্বতীয়গণ কম্যুনিষ্টদের পরাজয় কামনা করিয়া তিন দিবস ব্যাপী এক প্রার্থনানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছিল। কম্যুনিষ্টদের সহিত যুদ্ধার্থে তাহারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিল। আজ পর্য্যন্তও তিব্বতে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ আছে। গত আগষ্ট মাসে তিব্বত সীমান্তে কম্যুনিষ্ট বাহিনীর উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া তরুণ দলাইলামা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন এবং কম্যুনিষ্ট সন্দেহে ভারতীয়দের প্রতি বহিষ্কারের আদেশ দিলেন। ত্রিশ লক্ষ তিব্বতীর সর্ব্বময় কর্ত্তা দলাইলামা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে তিন হাজার বৌদ্ধ ছাত্র দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিব্বতীয়দের জাগ্রত করিতে সমগ্রদেশে ছড়াইয়া পড়েন। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে তিব্বতের এই জাগ্রত সত্তা বিশ্বের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করিবে। তিব্বতীয়গণই যে এশিয়ায় সাম্যবাদ স্রোতের গতি বৃদ্ধি করিতে বা রোধ করিতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি চেষ্টা করিয়াছি।

পৃথিবীতে এমন স্থান খুব কমই আছে, যেখানে শ্বেতজাতি আধিপত্য বিস্তার করে নাই। উত্তর হইতে দক্ষিণ মেরু, আমেরিকা হইতে আফ্রিকা, গ্রীণল্যাণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া—প্রত্যেক স্থানেই শ্বেতজাতির পতাকা সগর্ব্বে উড়িতেছে। ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহারাও তেমনিই সর্ব্বত্র আধুনিক সভ্যতার স্রোত বহাইয়া দিয়াছে; কিন্তু একমাত্র তিব্বতই ইহার ব্যতিক্রম।

হিমালয় পর্ব্বতমালা ভারতবর্ষকে এশিয়ার অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। যদিও তিব্বত ঠিক হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত, তথাপি আমরা তিব্বতের সম্বন্ধে অল্পই জানি। বিখ্যাত বাঙ্গালী-বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর (শ্রীজ্ঞান) সর্ব্বপ্রথম তিব্বতে জ্ঞানের দীপবর্ত্তিকা জ্বালিয়াছিলেন। দীপঙ্কর তাঁহার আসন তিব্বতীয়দের মনে চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। দীপঙ্করের পর ভারতবাসীদের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী শরৎচন্দ্র দাসই সর্ব্বপ্রথম তিব্বতে পদার্পণ করেন। ইহা বাঙালীদের নিকট অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। শরৎচন্দ্র দাস যখন ১৮৭৪ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে নৃতত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি দার্জ্জিলিংস্থ ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। তিনি তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করেন এবং ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৮৮ সালের মধ্যে কয়েকবার তিব্বতের রাজধানী লাসা ও তালি সাম্পো ভ্রমণ করেন। ১৮৭৯ সালে কতিপয় বিজ্ঞানের ছাত্র লইয়া তিনি তিব্বতে পদার্পণ করেন। যদিও তিনি বৌদ্ধ পুরোহিতের ছদ্মবেশে ছিলেন, তথাপি তিব্বতে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহাকে প্রথম বহুবিধ বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। পরে তাহার মুখে তিব্বতী ও নেপালী ভাষার উচ্চারণ শুনিয়া তিব্বতের সীমান্তরক্ষীরা তাঁহাকে নেপালী সন্ন্যাসী মনে করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেয়। কিষাণ সিং নামে আর একজন ভারতীয়ও পুরোহিতের ছদ্মবেশে তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র মধ্য এশিয়ার ধ্বংসস্থান আবিষ্কার করিয়া সভ্য জগতের জ্ঞান বিস্তার করেন এবং এইভাবে তিনি তিব্বতের বিখ্যাত হ্রদটি ও আবিষ্কার করেন।

১৯০৫ সালে কয়েকজন ইংরেজ লাসায় গিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বে ২১৩ জন শ্বেতকায় তিব্বতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের পর য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীরা সাধারণতঃ তিব্বতে প্রবেশ করিতে ইতস্তত করিতেন।

তিব্বতের এক অংশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এবং আর এক অংশ শীতের অত্যধিক প্রকোপে একেবারে রুক্ষ ও নির্জ্জন। সিকিম ও ভুটানের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ গিরিপথই ভারত হইতে তিব্বতে যাওয়ার পথ, কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহা বহির্বিশ্বের নিকট রুদ্ধ ছিল।

শতাব্দীর সভ্যতার জয়ধ্বজা বহন করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর অপর পার্শ্বের মানুষ পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্ধকারময় কুসংস্কারের অতলে তলাইয়া রহিয়াছে? এই গিরিপথের একপার্শ্বে স্কুল, কলেজ, সংবাদপত্র, রেলগাড়ী, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিমান এবং আরও কত আধুনিক সভ্যতার উপাদানের বিস্তৃতি, আর এক পার্শ্বে অবস্থিত তমসাবৃত দেশ। সেখানকার সংস্কারাবদ্ধ মানুষ দলাইলামাকেই তাহাদের দেবতা বলিয়া জানে। সেখানে একটি মাত্র কর্ম্মপদ্ধতিই আছে—যে কি উপায়ে গতিহীন ভাবে মানুষকে পূজারী করিয়া তুলিতে হয়। সেখানে যন্ত্রের মত মানুষের দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ ও পূজা করানোটাই দলাই লামার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রতি মে মাসে তিব্বতের পরিবেশের একটা বিরাট পরিবর্ত্তন হয়। সেই সময় যাতু উপত্যকার সৌন্দর্য্য অপরূপ। সমগ্র উপত্যকায় বসন্ত কুসুম প্রস্ফুটিত হয় এবং সমগ্র পার্ব্বত্য অঞ্চল রক্তবর্ণ 'রডোডেন্‌ড্রন' পুষ্পগুচ্ছে শোভা পাইতে থাকে। পার্ব্বত্য ঝরণাগুলি তরতর বেগে সবুজবর্ণ ক্ষেতের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, আর তাহা দর্শকমাত্র মন এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় রসে অভিষিক্ত হয়।

দক্ষিণ তিব্বতের গিনা চু উপত্যকায় সামান্য কিছু কৃষিকার্য্য হয়। ইহা ছাড়া আর যে সমস্ত মাঠ ক্ষেত আছে তাহা বনশূন্য। এইস্থানে 'সানডাক' নামে অভিহিত একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে, এই হ্রদের জল কোন্ কোন্ পথে প্রবাহিত হয়, তাহা কেহই জানে না। এমন কি শ্বেতকায় জাতিও এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। তিব্বতের রাজধানী লাসায় যাইতে হইলে এই হ্রদের তীর ধরিয়াই যাইতে হয়। এই রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটা বিরাট বাঁক দৃষ্টিগোচর হয়। এই বাঁকের নিম্ন দিয়া একটি প্রকাণ্ড নদী পর্ব্বত প্রান্তকূলতা প্রান্তহত করিয়া তীব্রবেগে বহিয়া চলিয়াছে। এই নদীটির নাম 'সানপো' ইহার সমস্ত শাখাপ্রশাখার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা কিছুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে 'সানপো' ব্রহ্মপুত্রেরই একটি শাখা। তিব্বতের অধিকাংশ লোক 'সানপো' বা তাহার শাখা প্রশাখার তীরে বাস করে। তিব্বতের সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই নদীগুলির তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। চুম্‌সানের নিকটে এই নদী ১৮০ গজ বিস্তৃত এবং এখানে একটি খেয়া নৌকা পারাপারের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। তিব্বতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দলাই লামার পরেই তাসি লামার স্থান। তাসি লামা শিক্ষা এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করেন এবং দলাইলামা সমস্ত রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্বের অধিকারী।

প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত। চুম্‌সান হইতে লাসা তিন দিনের পথ এবং পথ অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল।

এই পথের শেষ প্রান্তে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত সহরের কোন দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল সামান্য কিছু দূর হইতে দোতালা প্রাসাদের গম্বুজ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ইহাই ভ্রমণকারীদের একমাত্র। উপত্যকার মধ্যস্থলে তুঙ্গ পর্ব্বতের উপরে দলাইলামার প্রাসাদ অবস্থিত। অপর একটি পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে হরিদ্রাভ দুর্গ 'ছাগপোরি' অবস্থিত। তিব্বতের মেডিকেল কলেজ এই দুর্গের নিম্নে অবস্থিত।

লাসার পথসমূহ অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন এবং পথের দুই পার্শ্বেই দূষিত জল। কিন্তু দলাইলামার প্রাসাদটি সত্যই রোমাঞ্চকর। তাঁহার প্রাসাদটি পাহাড়ের উপরে নির্ম্মিত বটে কিন্তু সাধারণতঃ মনে হয়, যেন সমগ্র পাহাড়টিই একটি প্রাসাদ। সমগ্র পাহাড়টি এই প্রাসাদের ভিত্তি ভূমি এবং এই পাহাড়ের আদি অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই প্রাসাদের স্বর্ণনির্ম্মিত চূড়াটি মানুষের চক্ষুকে ধাঁধাইয়া দেয়। এখানকার অন্যান্য বাসগৃহসমূহ এমন ভাবে গাছের আড়ালে তৈয়ারী যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃটিশ, চীন ও রাশিয়ার গুপ্তচরগণ এখানে সদা সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং ইহাই তাহাদের কূটনৈতিকতার প্রধান কেন্দ্র।

সপ্তদশ শতাব্দীতে তিব্বত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে চীনের মাঞ্চুরাজবংশ এখানে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে তিব্বতীগণ তিব্বত হইতে চীনাদের বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় এবং এইসময়ে এখানে বৃটিশ সরকারের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাহার পর কয়েকটি কারণে বৃটিশ সরকার তিব্বতীদের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হন। বৃটিশ সরকার মনে করিয়াছিলেন যে, চীন ও রাশিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত তিব্বতের সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী হওয়া উচিত। তখন তিব্বতে কোন পুলিশের ব্যবস্থা ছিল না। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সৈন্যদের শিক্ষিত করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। এই দেশের সমস্ত সমৃদ্ধি সন্ন্যাসী ও জমির মালিকদের করতলগত এবং সমস্ত অর্থই পূজাদির ব্যাপারে ব্যয় হয়। সুতরাং সৈন্যবাহিনীর শিক্ষাকল্পে কোন অর্থই সঞ্চিত থাকে না। ১৯১৮ সালের যুদ্ধে তিব্বত চীনকে পরাজিত করে এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে চীনের কম্যুনিষ্টগণ আবার তিব্বত অধিকারের জন্য যুদ্ধার্থে [illegible] হইতেছে এবং আজ সমগ্র বিশ্ব উদ্বিগ্নচিত্তে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছে।

অভিযান

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আঁধারের যবনিকা তুল্‌বো,
অজানার গুণ্ঠন খুল্‌বো।
মৃত্যু—সে দুই পায়ে দল্‌বে,
শ্মশানের চুল্লীটা জ্বল্‌বে,
মড়া ছেলে কোলে নিয়ে কাঁদবো—
তবুও কি ফের নীড় বাঁধবো—
সুখ-নীড় কবরের ধূলিতে?
তোমরা সবাই বলো ভুলিতে
মৃত্যুরে—আমি তাহা পারি কই?
আমি দেখি জল করে থই থই—
চারিদিকে মরণের কালো জল!
তারই মাঝে তরী করে টলমল্‌ —
জীবনের ভাঙা তরী। কেউ কয়,
মৃত্যুরে কেন এত করো ভয়?
খাও-দাও ফূর্তিসে গান গাও,
তারপর মহাসুখে ঘুম যাও।

আমি তো পারিনে, ভাই, ঘুমাতে,
সংসার-পিঞ্জরে ঝিমাতে
পায়ে বাঁধা মৃত্যুর শৃঙ্খল।
আমি দেখি জ্বলে মোর চিতানল—
যার থেকে কারো নেই নিস্তার।
আমি দেখি দুখের বিস্তার—
বেদনার সমুদ্র দুলছে।
পতিহীনা শাঁখা তার খুলছে,
মুছিতেছে ললাটের সিন্দুর।
আমি দেখি শৈব্যারে—শোকাতুর,
ছেলে কোলে—মহাশোকে নিশ্চল।
আমি দেখি, বিচ্ছেদ-হলাহল
বিষাইছে মিলনের অনুক্ষণ।
দুনিয়াটা কি বিরাট প্রহসন!

পাগলের কথা যেন—বোঝা দায়।
আমি দেখি ফোটা ফুল ঝরে যায়

মৃত্যুর বিষদাঁত ভাঙবো;
জীবনের দিগন্ত রাঙবো
নব-আশা-অরুণের কিরণে।
কোনো নেয়ে যায় নাই জীবনে
যে অকূলে—তারই মোরা যাত্রী।
সম্মুখে ঝটিকার রাত্রি।
কূল-রেখা পিছে প'ড়ে থাক্‌না,
তরী যদি ডুবে যায়—যাক্‌না,
নিজেরাও ডুবি যদি কিবা ভয়?
আমরা কলম্বাস দুর্জয়
অজানার প্রেমে সদা মস্‌গুল্‌।
অচেনার আহ্বানে ছাড়ি কূল।
পশ্চাতে পড়ে থাকে বন্দর—
ছায়া-ঢাকা ঘরখানি সুন্দর।

মৃত্যুতে জীবনের শেষ নয়—
কে দেয় প্রাণের মাঝে বরাভয়!
কবরখানার হিম-নিঃশ্বাস—
এর মাঝে কখনই নয় বাস!
অন্তরে দুর্বহ ক্লান্তি!
আমি চাই শাশ্বত শান্তি।
কোন্‌খানে দেখা তার পাইরে?
অন্তর-সমুদ্রে বাইরে
একা একা তরীখানি। নিশ্চয়
একদিন পেয়ে যাবো পরিচয়
সত্যের পৌঁছাবো লক্ষ্যে।
শান্তি আসিবে নেমে বক্ষে।
চক্ষে আনন্দের দীপ্তি—
অন্তরে প্রাপ্তির তৃপ্তি!

দেবীপ্রসাদ

ঝর্ণা দাশগুপ্তা

জীবনের শেষধাপে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রুশ দেশের অভিনব সৃজনীশক্তি প্রত্যক্ষ করে একদিন বলেছিলেন, এখানে না এলে, "এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।" আর আজ দেশ বিদেশের যে যেখান থেকেই মাদ্রাজে আসুন না কেন, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর শিল্প ও ভাস্কর্য্য দেখলে তাঁদেরকেও ঠিক ওই কথাটি বলতে শোনা যায়—এ না দেখলে ভারত-তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থেকে যেত।

কেন এমন হয়?

রুশ দেশে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, সংগঠনের কাজে সেখানকার জনগণের সৎ-সাহস, প্রত্যক্ষ করেছিলেন সৃজন-শীল অভ্যুদয়। তিনি ১৯৩০ সালে রুশিয়ায় যান। সেদেশের শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসম্ভব সাহস তাঁকে কেবল মুগ্ধই করেনি, চিন্তারও খোরাক যোগায়, তারই প্রকাশে কবি আমাদের জানান—"মরুভূমিতে শক্তি নেই, শক্তির যথার্থ রূপ দেখা যায় সেইখানেই যেখানে বসন্তের রূপ-হিল্লোলে হিমাচলের গাম্ভীর্য মনোহর হয়ে ওঠে। বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষ থেকে শক শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কালিদাসকে নিষেধ করেননি মেঘদূত লিখতে।" এ যেন এদেশের শিল্পীদের কাছে অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরে ভবিষ্যতের পথনির্দ্দেশ।

কিন্তু এই পথ-নির্দ্দেশের অনেক আগে থেকেই দেবীপ্রসাদ কলাসাধনায় অসম্ভব সাহসের পরিচয় দিতে সুরু করেছিলেন। তাঁর চিত্র-শিল্প "বসন্তের রূপহিল্লোলে হিমাচলের গাম্ভীর্য" নিয়ে মনোমুগ্ধকর স্বরূপে নিত্য নিত্য নতুন সৃষ্টির উৎসব সুরু করেছিল ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রাক পর্বেই। সে উৎসব ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আজ মহোৎসবে উজ্জ্বলতর যদি না হয়ে উঠবে—রসজ্ঞ মাত্রেই রায়চৌধুরীর ষ্টুডিওকে ভারতের সেরা শিল্পতীর্থের আসন দেবে কেন?

রায়চৌধুরীর ষ্টুডিওতে ঢুকলেই মনটা সহসা খুসীতে ভরে ওঠে, প্রথম বিস্ময় কেটে উঠতে বেশ বিলম্ব হয়। বিস্ময়ের পর বিস্ময় যেন কেটেও কাটতে চায় না। প্রত্যেক
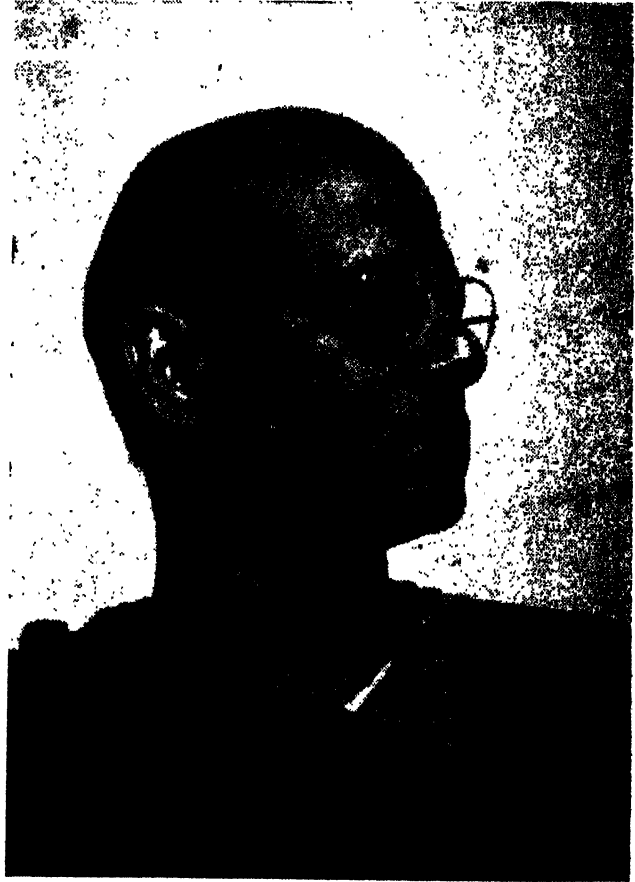
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (শিল্পী)

ছবিখানি, প্রতিটি প্রতিমূর্তি এমনভাবে সাজানো, সারা ঘরে যেন ঐন্দ্রজালিক প্রভাববিস্তারে নতুন নতুন বিস্ময় নিয়ে দর্শককে অভ্যর্থনা করে, চোখের ছাড়া অন্য কারো ভাবাই থাকে না। ওই ছবি আর এই চোখ···পর মুহূর্ত্তে চোখের

ভাষাও ফুরিয়ে যায়, জেগে থাকে শুধু এক বিস্ময়-ভরা ব্যঞ্জনা।

অনেকক্ষণ বসলে পরে ছবির বিচারের প্রশ্ন ওঠে, ধীরে ধীরে অনুভূতি এবং ইতিহাসের এক আশ্চর্যজনক সমন্বয় সারা অন্তরকে রসচেতনায় পরিপ্লুত করে তোলে। ছবির প্রতিটি বলিষ্ঠ অথবা সূক্ষ্ম রেখায়, রঙের ব্যঞ্জনায়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির গভীরতাকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন কি শিল্পী—নইলে ছবিও মূর্তিতে এমন কাব্যমুখরতা যে অসম্ভব।

কালিদাস মেঘদুত লিখেছেন কোন অতীতে, সদ্য অতীতে কৃষণ চন্দর লিখেছেন, "অন্নদাতা", এরই মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথের লিরিক-কবিতা ও মননশীল কাব্যের যুগ এসেছে। কালিদাস থেকে আধুনিক প্রগতিশীল শক্তিমান সাহিত্যিক কৃষণ চন্দর, এ দুয়ের ব্যবধান অনেকখানি, দুই সেতুমুখ দু'পাশে উধাও বল্লেও ভুল হবে না। কিন্তু কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ এবং আজকের কৃষণ চন্দর—বিক্রমাদিত্যের কাল থেকে—মেঘদূতের বিরহ থেকে পঞ্চাশের তুফান পর্য্যন্ত একক সেতু যদি দেখতে হয়, তারও আগে যদি এগিয়ে যেতে হয়—সে সম্ভবপর সাহিত্যে নয়—শিল্পেই হতে পারে একমাত্র। আর তারই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় দেবীপ্রসাদের শিল্পভাস্কর্যে।

এখানে মহাকবি কালিদাসের অতুলন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, বিরহের বিহ্বল বেদনা-বিদ্ধ-রূপ ঐতিহ্যের স্বচ্ছ স্রোতে এসে নব-বিন্যাসে ধরা দিয়েছে রঙ ও রেখায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লিরিক মুহূর্ত বন্দী হয়েছে নব কলেবরে তুলির কোনো-ইসারায়; কিন্তু ডেকাডেণ্ট ধারায় নয়—একালের রূঢ় ইতিহাস আশ্চর্য্য বলিষ্ঠতায় রূপ নিয়েছে দেবীপ্রসাদের ভাস্কর্যে, আগামী কালের সম্ভাবনাময় ইঙ্গিতেও সে ভরপুর, প্রাণধর্মী!

কথাটা আরো একটু খুলে বলা প্রয়োজন। শিল্পীর কাজকে প্রভাবান্বিত করে ঐতিহ্য, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে শিল্পীর মনে প্রেরণা জোগায় সমকালীন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর প্রভাব। যে শিল্পী ঐতিহ্য মানে না, সে জীবনের রসের মূল উৎস থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য। আবার শুধু যে "আর্যতেজ গর্ব" নিয়ে "সবই ব্যাদে আছে", বলে মরুর উঠের মতো বালুতে মুখ গুজে পড়ে থাকে তারও কিন্তু ভবিষ্যত মৃত। তাই সৃজনশীল শিল্পী যিনি তাকে যেমন অতীত ঐতিহ্য থেকে রসের সঞ্চয় ছাঁকতে হয়, তেমনি বর্ত্তমানের সমাজ-প্রভাব-প্রতিফলন দ্বারাই শুধু নয়—এ সমাজের চোরা বালির ভিতরে কেটে নতুন কঠিন ভিত্তি স্থাপনে অগ্রণী হতে হয়। এ কাজটি বলতে যত সোজা শোনায়, আসলে তা তত সোজা মোটেই নয়। ঐতিহ্যের মোহ যেমন মানুষকে পেয়ে বসে—তেমনি নতুন পথে অভিযাত্রী হওয়ার বিপদও অনেক সময় পেছনে টানে, সমস্যা হয় ভাঙা গড়ার। ভাঙতে হয়, গড়তে হয়। একটুখানি পেতে অনেক সময় অনেকখানিই ছাড়তে বাধ্য করে জীবনের প্রতি বাস্তব ভালবাসা। প্রাণটাকে বাঁচাতে অনেক সময় জখম পা-দুখানাকে কেটেই যেমন বাদ দিতে হয়, জীবন্ত সার্জারিতে।

শ্রমের জয়যাত্রা ভাস্কর—দেবীপ্রসাদ (মাদ্রাজ)

সে না হয় হোলো—কিন্তু সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার দৈনন্দিন জীবন থেকে যে প্রেরণা—বর্ত্তমান সমাজে সেই প্রেরণার গতি কোন দিকে? কঠিন সমস্যা সেইখানেই।

এ যেন শিল্পীর অগ্নিপরীক্ষা। বর্তমান সমাজ মানেই ঘোরতর দুর্দিন, দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি দুর্নীতি; ব্যাভিচার কুৎসিত বর্বরতার তাণ্ডব। একদিকে একদল মনুষ্যত্ববান মানুষের সৎপ্রচেষ্টার সঙ্গে মানব সমাজের মংগল কামনার ওপরে পুনঃ পুনঃ অপঘাত পড়ছে, অন্যদিকে অসৎ অমানুষিক জঘন্য জীবনের চলছে দিগ্বিজয়। একদিকে অনশন—অন্যদিকে সেবা দাসত্বের পুরস্কার; উচ্ছিষ্ট বিলাসী আয়েসী জীবন যাপন। এই দুইয়ের বিরোধিতায় শিল্পী-মনের স্ববিরোধীতাকে অস্বীকার করবে কে? তাহলে কি কোনো উপায়ই নেই? নিশ্চয় আছে। সে উপায় হচ্ছে সহজ ভাবে জীবনকে বুকভরে ভালবাসা—মানুষের ভালবাসাকে. তার মৃত্যুঞ্জয় জীবন দর্শনকে জীবন পণে ফুটিয়ে যাওয়ায়। তা মৃত্যু যে প্রকারে আসে আসুক।

জীবনকে বুকভরে যাঁরা ভালবাসতে পেরেছেন সে জঘন্য অসৎ জীবনের আয়েসী হাতছানিতে শিল্পী সত্তার আত্মহত্যায় কখনো নামতে পারেননি। প্রয়োজন পড়লে সাহসী মৃত্যুও বরণ করেছেন। সদ্য সদ্য বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক শহিদ রোঁমা রোল্যাই এ সত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক। এ প্রসংগ এখানেই রেখে, দেবীপ্রসাদের শিল্প সম্বন্ধে বলতে গর্ব বোধ হয় যে, দেবীপ্রসাদের সৃজনশীল শিল্প ভাস্কর্যের কোথাও এমন একটি রেখার দেখা পাই না, যা মানুষকে বাঁচতে শিখায় না, বা মনুষ্যত্ব থেকে টেনে নরকে নামায়। অথচ ঐতিহ্য মেনেও ঐতিহ্য ভেঙে এগিয়ে চলায় তার জুড়ি নেই। এদেশে অন্য কোন সমকক্ষ নেই, তাঁর সংগে সমানে প্রগতির পথে প্রকৃষ্টগতিতে অগ্রণী হবার। যে প্রকৃষ্টগতি বলতে মহত্তর জীবনের অঙ্গীকার বোঝায়। এই মহত্তর জীবনের অঙ্গীকার-পুষ্ট যে সর্বোত্তম কলা-সৃষ্টির মালা গেথে চলেছেন দেবীপ্রসাদ—এর মূলেও অলক্ষে কাজ করে চলেছে শিল্পীর মহৎ প্রেরণা: জীবনকে বুকভরে ভালবাসা...মানুষের এগিয়ে চলার পথকে আলোকিত করার সংগ্রাম।

কে না জানে—এ জীবন ইথারে নিরলম্ব নয়, মানুষ মাত্রেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে মাটিতে, স্নেহের স্পর্শ পেয়েছে মায়ের, আত্মীয়স্বজন প্রিয়পরিজনের। স্নেহ পেয়েছে বলেই স্নেহ ভালবাসা বিতরণেও তার স্বাভাবিক বিকাশ দেখা দিয়েছে, এই বিকাশের ধারায় আনন্দ আছে—আঘাতও আছে। প্রাপ্তি আছে, অপ্রাপ্তির অপ্রত্যাশিত আঘাতের আন্তরিকতারও অদর্শন নেই, কাজেই প্রেম ও ঘৃণা যমজ জন্ম যদি নিয়েই থাকে, তাকে অস্বীকার করব কেন? এই যে চিত্র—এ যেমন ব্যক্তিগত জীবনের, তেমনি ব্যক্তি আবার সমষ্টিরই একটি অচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং সমষ্টির চিত্রও তো এ বটে। কিন্তু সমষ্টিকে নিয়েই সমাজ—তাই এ প্রেম ঘৃণা, ভাঙা গড়া সমাজের তপ্তকটাহের উৎসর্জন। তারই প্রতিফলন-শিল্প। এ যেন এক নতুনতর মূল্য বোধের রসমুগ্ধ রূপায়ন।

দেবীপ্রসাদের ষ্টুডিও'র একাংশ 'রসের কথা' ও শীত-মূর্তি দেখা যাইতেছে

দেবীপ্রসাদের স্টুডিওতে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর অর্দ্ধ

ভাগের ছবি ও মূর্ত্তি অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই ইতিহাসের স্রষ্টা মানুষ,...অর্দ্ধ শতাব্দীর মানুষের উত্থান পতনের খণ্ড কাব্যদের নিয়ে স্টুডিও যেন একটি মহাকাব্য। প্রত্যেকটি ছবি ও মূর্তির প্রতি সুবিচার করতে হলে পর্বে পর্বে মহাভারত লিখতে হয়। কিন্তু যৎসামান্য কয়েকটি ছবি ও মূর্তির আংশিক উপস্থিতিই যদি সম্ভবপর করে তুলতে পারা যায়, শিশু প্রচেষ্টার সে নবজাতক দেবীপ্রসাদের শিল্পের দিকে হয়তো কালে সাহসী সমালোচকদের টেনে আনবে। দেশের সেরা শিল্পীর যথার্থ সমালোচনার ক্ষমাহীন কার্পণ্য দূর একদিন হবেই।

তার অনাগত আনন্দকে কোথাও প্রতিরোধ করবার প্রচেষ্টা নেই—এমনি তার কম্পোজিসন, এমনি তার অঙ্কন—উজ্জলতার বাস্তববাদী বলিষ্ঠতা।

তবে রইস-জীবনের রোমান্সেই তিনি থেমে নেই, নারীর রূপলাবণ্য লালন করে রইসি-রোমান্সের স্রোতেই কেবল দেবীপ্রসাদের চিত্র চৌহদ্দি ভরাট হয়ে ওঠেনি। নিজের জন্মগত-কৌলিন্য-পরিবেশের গণ্ডী ভেঙ্গে তিনি সমাজের অন্ত্যজ জীবনকে তীর্যক দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাদের দুঃখ বেদনা, আশা নিরাশা সমাজের তলানী পাকের সংগে যেমন মাখামাখি করে ছিন্ন-বস্ত্রে মাথা তুলেছে—

দেবীপ্রসাদের স্টুডিও'র অন্য একটি অংশ 'পথভ্রষ্টা' কুয়ার ধারে ও স্নানের পরে

দেবীপ্রসাদের প্রথম যৌবনের ছবি কত আবেগে যে ভরপুর.. কিন্তু আবেগ প্রকাশে গভীর সংযম এবং দৃপ্তভংগী, রেখার বলিষ্ঠতা, রঙের গরীমা যেন জীবন অভিজ্ঞতার স্তরে স্তরে বেড়েই চলেছে। রইস-সমাজে তিনি জন্মেছিলেন, রইস-জীবনের রোমান্স তাঁর চিত্রে বারে বারে আত্মপ্রকাশ করেছে—কিন্তু সে নির্ব্বাক শরের-আত্মপ্রকাশ নয়, সে যেন দর্শককে ভাবিয়ে তুলছে, আলোড়িত করে তুলতে চাইছে। আরো আশ্চর্য রইস-সমাজের বাইরে যে বৃহত্তর জনজীবন

সে দৃশ্যে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে এলে-ও শিল্পী দেবীপ্রসাদ ওদেরই মধ্যে বাঁচবার প্রাণান্ত প্রচেষ্টার আভাষ পেয়েছেন, এক নবজন্মের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুত্থান তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। পৃথিবীর বুকে বারে বারে ঝড় এসেছে—ঝড়ের সংগে লড়ে সংগ্রামী মানুষেরা চলতে চেয়েছে—চলবেও—এই যে মৃত্যুঞ্জয়-অভিযান মানব-সমাজের—এরই বাস্তব রূপটি তার সমগ্র উজ্জলতায় বাস্তব হয়ে উঠেছে—"দুর্যোগ"-এ।

ছবিখানি সাধারণ দৃশ্যজ। অমন কত ঝড় জল আমরা দেখি—কিন্তু শিল্পীর আবেগতপ্ত উপলব্ধি সাধারণ দৃশ্যকে অসাধারণত্বে উন্নীত করেছে—মহত্তর পটভূমিকা ইমেজে এসে গেছে। দেখলেই মনে হয় এ দুর্যোগ দুনিয়ার। এখানে এ দেশের কয়েকটি মানুষ বিশ্বের সাধারণ মানুষের সংগে ঝড়ের এক উত্তাল পরিপ্রেক্ষিতে একাত্মায় মিশে গেছে। ঝড়-তাড়িত মানুষ যেন প্রচণ্ড প্রয়াসে দুর্যোগ পথের তীর্থযাত্রীতে রূপান্তরিত!

শিল্পী করেছেন—সে যেন রইসি-যুগাবসানের বিস্ময়কর শেষ দীর্ঘশ্বাস। এ চিত্র দর্শনে দর্শকের অন্তর্লোকের ঔৎসুক্য কোথায় যেন কোন অতল গভীরে ডুবে যায়। পাথর চাপা দীর্ঘশ্বাসের ভারে কেমন একটা অব্যক্ত বেদনা গাঢ় অনুভূতি জাগায়। কিন্তু এসকল চিত্রের চৌহদ্দি দেবীপ্রসাদের বলিষ্ঠতার তুলনায় অতি ছোট। এতে যেন শিল্পীর জয়োদ্ধত তুলি স্বাভাবিক প্রাণোন্মাদনায় আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পেয়ে ওঠে না। তাই সম্প্রতি চিত্র-

দেবীপ্রসাদের ষ্টুডিওতে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের আসবাব-পত্র দর্শনীয়

তবে "হারানো দিন"—ওয়াটার কলারের ছবি। কিন্তু দেখলেই মনে হয় অয়েলের ভেপ্ন। যে কার্পেটের ওপরে উপবিষ্ট রইস নিজের অন্তর্লোক অঙ্কন করে চলেছেন নিষ্ঠুর নির্ব্বাকতায়—ওই কি ভাস্বর আশ্চর্যজনক বাঙ্ময়। আর কার্পেটখানিও আভিজাত্যের বলিষ্ঠ রূপ—সস্তায় বাবুগিরির চাল নয়। একখানি অত্যুজ্জ্বল কার্পেট একটি বিদ্রীর কাজকরা জার্সী ও একজন রইস নিয়ে যে চিত্র বস্তুর সংস্থান

চরমোৎকর্ষের এক অপূর্ব বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন, "রসের কথা" যার সামনে দাঁড়াতে কাপুরুষের—অরসিকের বুক কেঁপে যায়।

চিত্রশিল্পী দেবীপ্রসাদ ভাস্কর্যবিদরূপে যেন আরো বলিষ্ঠ বাস্তববাদী। তার ভাস্কর্য এক একটি অমরত্বের দাবীদার। মৃত্যুঞ্জয় মানুষের বলিষ্ঠতার বিপুল আধার—এরা বাঁচবার অঙ্গীকার আদায় করে নিতে এমন অপূর্ব ভংগীতে

জেগে উঠেছে যে ভাস্কর্যবিদের দৃষ্টি যে ঐতিহাসিক, তা নিঃসন্দেহে ঘোষণা করা চলে।

বিগত কয়েক বছরে এদেশের বুকের উপর দিয়ে দুর্যোগের ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে বিদেশী বনিক শাসন—শোষণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সীমাহীনদারিদ্র্যদুর্ভিক্ষ মহামন্বন্তরের কাল বৈশাখী এসে দেশটাকে পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত করে দেবার চেষ্টার কোন ত্রুটিই করেনি। কিন্তু দেবীপ্রসাদ ভাস্কর্যের সৃষ্টিতে সংসারকে জানিয়েছেন—মন্বন্তরে মরেও অমর মানুষের এদেশ মরণবিজয়ী। তার পর এসেছে তাঁর "লাঞ্ছিত-মানবতা"—মাত্র পাচ ঘণ্টায় সৃষ্টি করা ভাস্কর্য।

ভাস্কর্যবিদ এর নামকরণ করেছিলেন "শীত", কিন্তু প্রতি মুহূর্তের আলোকচিত্র দেখেই একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের মুখ দিয়ে বিস্ময়ে বেরিয়ে এলো—"লাঞ্ছিত-মানবতা"। সত্যিই এই মূর্তিতে সামগ্রিকভাবে বর্তমান কালের মানবতাকেই যেন রূপায়িত করে তোলা হয়েছে। দুনিয়ার চারপাশের সজীব বাস্তবের সংগে, ভাস্কর্যবিদ নাড়ীতে নাড়ীতে জড়িয়ে গেছেন যেন, মহাস্থবিরের সর্বাঙ্গে, বিশেষরূপে মুখাবয়বে ও কপোলে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ক্ষতবিক্ষত সহস্রকুঞ্চিত অভিব্যক্তি অপূর্ব গরীমায় একটি অমরসত্বা সৃষ্টি করেছে। এ সত্বাকে একজন মাত্র মানুষের পৃথক সত্বা হিসাবে কল্পনা করার প্রচেষ্টাও অসম্ভব রূপে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এমনি গভীরভাবে ঘটেছে "লাঞ্ছিত মানবতায়" দেবীপ্রসাদের অনুভূতির সংগে গণমানবের জীবনযোগ।

শীতে বুড়ো স্থবির কাঁপছে—আশঙ্কা হচ্ছে "শীত" ওকে মেরে ফেল্বে—ফেলবেই। কিন্তু তা সম্ভবপর নয়। কে মারবে মানবতাকে। কত সর্বগ্রাসী হিংস্রতায় গ্লেসিয়ারের স্খলন নিজের বুকের আগুনেও গলিয়ে ছেড়েছে—জীবনের কত ঝড়, জল, তুষার-তুফান, ঠেলে বারে বারে মৃত্যুকে পরাজিত করে জয়ী মানবতা চিরকাল। আজিও তার অন্তরে অনির্বাণ সেই প্রচণ্ড ভলক্যানো—জলছে।

কিন্তু শুধু জললে কি হবে; জলা নয়, সৃষ্টি হোক—হোক জীবনের পরিমাপ। সভ্যতার এই চিরন্তন হাহাকারকে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন দেবীপ্রসাদ। তিনি সৃষ্টি করেছেন "পথস্রষ্টা"। এ পথস্রষ্টা রইস নয়; শ্রমজীবী, সংঘবদ্ধ সংগ্রামে পাথরকে যারা নড়িয়েছে—পাহাড়কে ধ্বসিয়ে দিতে তারা প্রস্তুত। শ্রমজীবী শ্রেণীর Elementery শক্তিকে বাস্তবে এভাবে রূপায়িত যে ভাস্কর্যবিদ করেছেন—"লাঞ্ছিত-মানবতার" আগামী স্বপ্ন যার সৃষ্টিতে গভীরতম যৌথ-অনুভূতিতে এমন বিস্ময়কর রূপান্তর গ্রহণ করেছে—তার কলাসাধনা বিপ্লবাত্মক সূক্ষ্মশীলতার অপূর্ব নিখুঁত নিদর্শন হিসাবে নিঃসন্দেহে সমগ্র মানব সমাজের এক অমূল্য সম্পদ।

সাধারণতান্ত্রিক আয়ার্লণ্ড

শ্রীভবানীপ্রসাদ বাগচী এম-এ

আয়ার্লণ্ড দেশটি ছোট, কিন্তু অনেক সুন্দর নদী, ঝর্ণা ও পর্বতদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় স্বাভাবিক সৌন্দর্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ব্রোন্‌জ যুগে আয়ার্লণ্ড স্কটলণ্ডে পার্বত্যজাতির বাসভূমি ছিল এবং দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হোত পাঁচটি বিশিষ্ট রাষ্ট্রসমষ্টি দ্বারা—যার পরিণতি হোয়েছে আলস্টার, উত্তর ও দক্ষিণ লীনস্টার, মানস্টার ও কনট—বর্তমানের এই পাঁচটি প্রদেশে। দেশের অধিবাসীরা ফ্রান্স দেশীয় "বিটন্" প্রদেশের আইন দ্বারা শাসিত হোত এবং প্রধানতঃ "ড্রুইড" অর্থাৎ শাস্ত্র ও জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী কেল্টদিগের পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল।

৩০০ খৃষ্টাব্দে কনটের রাজন্যবৃন্দ 'তারা' অধিকার করে, আয়ার্লণ্ডের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে। ৪৩২ খৃষ্টাব্দে আয়ার্লণ্ডবাসীদের স্বর্গদূত সেন্ট পেট্রিক আয়ার্লণ্ডে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে আয়ার্লণ্ডে লাটিন বিদ্যার প্রচারের সংগে সংগে বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন কাজ প্রাধান্য লাভ করে এবং এই সময়ে আয়ার্লণ্ডের সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিকদের মতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মাণীতে লাটিন সভ্যতা বিস্তারের জন্য রেনেস্যাঁ আন্দোলনের সময় আয়ার্লণ্ড বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

৮০৭ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্ক ও প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভিয়াবাসী জলদস্যুরা আয়ার্লণ্ডের সমুদ্রের উপকূলে ভয়ানক ভাবে লুঠতরাজ করতে আরম্ভ করে এবং শেষে ব্যবসার সুবিধার জন্য ডাবলিন্, ওয়েক্সফোর্ড, ওয়াটারফোর্ড, কর্ক ও লিমারিক নামে কয়টি সহরের পত্তনি করে। অবশেষে ১০১৪ সালে গুড্ ফ্রাইডের দিন ডেনমার্কদেশীয়দের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যায়

এবং ক্রমশঃ ডাব্লিন্ সহর তাদের সহরের পরিবর্তে সমৃদ্ধ হোয়ে উঠতে থাকে।

নর্মাণ্ডীদের দ্বারা আয়ার্লণ্ড আক্রমণের পর থেকেই সেখানে ইংলণ্ডের সম্রাটের প্রাধান্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং অষ্টম হেন্‌রী প্রথম "আয়ার্লণ্ডের রাজা" এই উপাধি গ্রহণ করেন। এর পরের কয়েক শতাব্দী ইংরাজদের সংগে আয়ার্লণ্ডবাসীদের মোটেই সদ্ভাব ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম মেরী "বাজেয়াপ্ত করা" ও "নূতন উপনিবেশ স্থাপন করা"র নীতি অনুসরণ করে স্কটল্যাণ্ডবাসী প্রোটেসটাণ্টদের মধ্যে অনেক সম্পত্তি বিতরণ করেন—তার ফলে আল্‌ষ্টার প্রদেশে ক্রমশঃ ইংরাজ প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করে। ১৬৯১ থেকে ১৭১৫ সালের মধ্যে দণ্ড-সম্বন্ধীয় যে আইনগুলি চালু হয়, তাতে আয়ার্লণ্ডের অধিবাসীদের দাসত্বের পর্য্যায়ে এনে ফেলে। সাধারণ ব্যবসা ও চাকরী করা, অস্ত্র সংগে রাখা, ঘোড়া রাখা, এমন কি ভোট দেবার ক্ষমতা থেকেও ক্যাথলিকদের বঞ্চিত করা হয় এবং মাত্র ⅛ অংশ জমি আয়ার্লণ্ডের পুরাতন অধিবাসীদের হাতে থাকে। ১৭১৯ সালে ইংলণ্ডের আইন পরিষদ আয়ার্লণ্ডের জন্য আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা গ্রহণ করায় ডাব্লিন্ আইন পরিষদের হাতে আর কোন ক্ষমতাই থাকে না।

১৭৬০ সালে আয়ার্লণ্ডে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের কাছ থেকে দেশবাসীরা কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে সক্ষম হয়। ১৭৮২ সালের শাসনতন্ত্রে আয়ার্লণ্ডের আইনপরিষদের হাতে কিছু ক্ষমতা আসে। ১৭৯৩ সালে ক্যাথলিকরা ভোট দেবার অধিকার লাভ করে কিন্তু আইনপরিষদের উন্নতির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। ১৮০৫ সালে ড্যানিয়েল ওকনেলের নেতৃত্বে ক্যাথলিক সংঘ স্থাপিত হয়, সংগে সংগে এই সংঘের উদ্দেশ্য বিফল করার জন্য অরেঞ্জ সোসাইটি স্থাপিত হয়—যার পরিসমাপ্তি হোয়েছে বর্তমানের উত্তর আয়ার্লণ্ডের শাসনব্যবস্থায়। আয়ার্লণ্ডের লোক সংখ্যা—১৭০০ সালে ১২½ লক্ষ, ১৮০০ সালে ৪৪ লক্ষ, ১৮৪১ সালে ৮০ লক্ষ, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ৪২ লক্ষ ছিল। ১৮৪৬ থেকে ১৮৪৭ সালে আয়ার্লণ্ডে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় তার ফলে প্রায় ২১,০০০ লোক না খেতে পেয়ে মারা যায়, ১৮৫১ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ লোক মারা যায়, এবং ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষ আয়ার্লণ্ডের অধিবাসী আমেরিকায় চলে যেতে বাধ্য হয়।

এই সময় থেকে আয়ার্লণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে এবং সীনফীন্ প্রভৃতি অনেক গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি হয় ও কয়েকটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহ হয়। জেম্‌স লারকিন্ ও জেম্‌স কনোলী ডাব্লিনের শ্রমিকদের নিয়ে একটি সৈন্যদল গঠন করেন এবং ১৯১৬ সালের "ইষ্টার মনডের" দিন যে জাতীয় অভ্যুত্থান হয় তাতে এই সৈন্যদল প্রভূত সাহায্য করে। প্রায় এক হাজার স্বদেশপ্রেমিক ডাব্লিনের বড় ডাকঘর অধিকার করেন, কিন্তু পাঁচদিন যুদ্ধ ও গোলাবর্ষণের পর ইংরাজরা সেটা আবার অধিকার করে; —পরে জেম্‌স কনোলী ও পনের জন নেতার প্রাণদণ্ড হয় এবং বহু-লোককে নির্বাসিত করা হয়। তারপর বাংলা দেশের ভূতপূর্ব ছোটলাট সার জন্ এণ্ডারসন্ আয়ার্লণ্ডে ইংরাজদের দমননীতি নির্মম ভাবে পালন করেন।

১৯২০ সালে দেশব্যাপী স্থানীয় নির্বাচনে আয়ার্লণ্ডের একতা প্রমাণিত হয়, কিন্তু স্থানীয় সংখ্যালঘুসম্প্রদায় জাতীয় ইচ্ছা মেনে নিতে অস্বীকার করায় এবং ইংলণ্ডের টোরীদলের আয়ার্লণ্ডের উত্তর-পূর্ব কোণে কয়েকজন সমর্থক পাবার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ আয়ার্লণ্ডবাসীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ইংলণ্ডের আইনপরিষদের একটি আইনের সাহায্যে (Home Rule Act of 1920) আয়ার্লণ্ডের বত্রিশটি প্রদেশ থেকে ছয়টি প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই বিভক্ত অংশকে আল্‌ষ্টার বা উত্তর আয়ার্লণ্ড এবং বাকী অংশকে দক্ষিণ আয়ার্লণ্ড বা এয়ার (Eire) নাম দেওয়া হয়। এই সময় হাউস্ অফ্ কমন্‌সে আয়ার্লণ্ডের সদস্যদের কোন ভোট দিতে দেওয়া হয় নি। ৩০০ মাইল লম্বা দেশের প্রায় ২৭০ মাইল নিয়ে এই বিভাগের সীমারেখা টানা হোয়েছে—যার ফলে পাহাড়, নদী, গ্রাম, রাস্তা, এমন কি বাড়ী পর্য্যন্ত বিভক্ত হোয়েছে। এই বিভাগের পক্ষে কোন ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা অন্য কোনরূপ যুক্তি দেখা যায় না। সমগ্র আয়ার্লণ্ড ও উত্তর আয়ার্লণ্ডের ভাষা মূলে এক এবং দুজায়গাতে ক্যাথলিকের সংখ্যা বেশী, যদিও অনেকের ভুল ধারণা আছে যে উত্তর আয়ার্লণ্ডে প্রধানত প্রোটেস্টাণ্টদের বাস বেশী। সরকারী বিবরণী থেকে জানা যায় উত্তর আয়ার্লণ্ডে ক্যাথলিক—৪,২৮,২৯০ জন, প্রেসবাইটেরিয়ানস,—৩,৯০,৩৯ জন, চার্চ অফ্ আয়ার্লণ্ড—৩,৪৫,৪৭৮ জন, মেথডিস্ট—৫৫,১৩৫ জন এবং অন্যান্য—৫৯,৯১৫ জন লোকের বাস।

বিভক্ত অংশের অধিবাসীরা এই বিভাগের সমর্থন করেন বলে প্রচার করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এয়ারার সংলগ্ন ফারমাঘ্, টাইরন্, দক্ষিণ আরামাঘ্, দক্ষিণ ও পূর্ব ডাউন্ প্রদেশ এবং ডেরী সহরের অধিকাংশ অধিবাসী অর্থাৎ উত্তর আয়ার্লণ্ডের প্রায় অর্ধেক অধিবাসী এই বিভাগের বিরোধী এবং এয়ারার সংগে যুক্ত হবার পক্ষে, তবে এন্‌ট্রিম্ ও বেলফাস্টে (উত্তর-পূর্ব অঞ্চল) অধিকাংশ অধিবাসী এই বিভাগের সমর্থন করেন।

নির্বাচন বিষয়ে উত্তর আয়ার্লণ্ডে এমন ব্যবস্থা সংখ্যালঘুদলের হাতে বেশী ভোট দেবার ক্ষমতা থাকে। ফারমানাগ্ প্রদেশ নির্বাচনের জন্য এমন ভাবে ভাগ করা হোয়েছে যে দেশবিভাগের বিরোধী সংখ্যাগুরুদল বেলফাস্ট আইনপরিষদে মাত্র একজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন, কিন্তু দেশ বিভাগের সমর্থক সংখ্যালঘুদল দুইজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন। এইভাবে নির্বাচনের জন্য বিভক্ত বড় অঞ্চলগুলিতে জাতীয়তাবাদীর সংখ্যা অনেক বেশী এবং দেশ বিভাগের সমর্থকদের সংখ্যা অনেক কম করে আইনপরিষদে একজন করে সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হোয়েছে এবং ছোট ছোট অঞ্চলগুলি এমন ভাবে সৃষ্টি করা হোয়েছে যাতে সজাতীয়তাবাদীদের সংখ্যাধিক্য থাকে—তার ফলে মোটামুটি দেশ বিভাগে বিরোধী জাতীয়তাবাদীরা যে কজন সদস্য উত্তর আয়ার্লণ্ডের বেলফাস্ট আইনপরিষদে নির্বাচন করে পাঠাতে পারেন, সেই কজন সদস্য নির্বাচিত হোতে পারে—তার অর্ধেক সজাতীয়তাবাদী অর্থাৎ দেশ বিভাগে সমর্থকগণের দ্বারা।

অধ্যয়নের, ঋক, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব বেদ শিখাইলেন। পৈল ঋগ্বেদকে দুই ভাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি এবং বাস্কল নামক দুই শিষ্যকে দুই সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। বাস্কল তাহার অধীত শাখাকে চারি শাখায় বিভক্ত করিয়া বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য এবং পরাশর নামক চারি শিষ্যকে পৃথক পৃথক অধ্যয়ন করাইলেন। ইন্দ্রপ্রমতিও তাহার অধীত অংশ সম্পূর্ণ মাণ্ডুকেয়কে দান করিলেন। শিষ্য প্রশিষ্যের দ্বারা এই শাখা বিস্তার লাভ করিল। পরে বেদমিত্র নামক একজন বিচক্ষণ ধীমান্ শিষ্য শাকল্য উক্ত সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন এবং পঞ্চ শিষ্যের দ্বারা পাঁচখানি সংহিতা প্রচার করিলেন।

ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপূর্ণি অধীত ঋককে বিভক্ত করিয়া তিনখানি সংহিতা রচনা করিলেন এবং ক্রৌঞ্চ, বৈতালিক এবং মহামতি বলাক নামক তিন শিষ্যের দ্বারা এই সব সংহিতা প্রচার করাইলেন।

> সংহিতাত্রিতয়ং চক্রে শাকপূর্ণিরথেতরম্।
> নিরুক্তমকরোৎ তদ্বৎ চতুর্থং মুনিসত্তম ॥ বিষ্ণু ৩।৪।২৩ বঙ্গবাসী

বেদবেদাঙ্গপারগ এই শাকপূর্ণি নিরুক্তকৃৎ। শাকপূণি ইঁহারই অপর নাম। বিষ্ণুপুরাণে উদ্ধৃত এই শ্লোক হইতে ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে নিরুক্তকৃৎ শাকপূর্ণি অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

যাস্কের দশম অধ্যায় অষ্টম খণ্ডে আগ্রায়ণ এবং ঔপমন্যব নামক দুইজন নিরুক্তকারের কথা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া নানাস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে নিম্নলিখিত নিরুক্তকৃৎ শাস্ত্রীর নাম পাওয়া যায়—আচার্য্য, ঐতিহাসিক, ঔদুম্বরায়ণ, ঔর্ণবাভ, কাঠক, কৌৎস, ক্রৌষ্টুকি, গার্গ্য, গালব, চর্ম্মশিরা, তৈটিকি, নৈদান, বার্ষ্যায়ণি, মৌদ্গল্য, শাকটায়ন, শাকল্য, স্থৌলাষ্ঠীবি হারিদ্রবিক।

যাস্কের রচনা কতটুকু তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। নিরুক্ত বস্তুত দুই অংশে বিভক্ত—এক অংশ যাহাকে ভাষ্য হইতে পৃথক ভাবে বুঝাইবার জন্য নিঘণ্ট, বলা হয়, ইহাতে কেবল একার্থক শব্দরাশির সমন্বয় থাকে। আর দ্বিতীয় অংশ ভাষ্যস্বরূপ—ইহাতে শব্দাদির ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। অনেকে অনুমান করেন যে নিঘণ্ট পূর্ব্ব প্রচলিত—যাস্ক তাহার উপর ভাষ্য রচনা করেন। তাহার ভাষ্যের সঙ্গে নিঘণ্ট, এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে পরে উভয় অংশই যাস্কের নামে নিরুক্ত বলিয়া কথিত হয়।

পূর্ব্বে বৈদিক ভাষা দুর্ব্বোধ্য ছিল, সমুদ্রের গর্জ্জনের মত তাহা ছিল বোধাতীত। ইন্দ্র ধাতু, প্রত্যয় প্রভৃতি বিভাগ করিয়া এই অব্যাকৃতকে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একসপ্ততি সূক্তে মন্ত্র আছে :—

> বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
> যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎ প্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ ॥১
>
> অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি ॥
>
> যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্।
> তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্ত রেভা অভি সং নবন্তে ॥৩
>
> উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
> উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥৪

বৃহস্পতি, যখন মানুষেরা বস্তুর নাম দিয়া বাক্যকে প্রথম প্রেরণ করিয়া পাঠাইয়াছিল, তখন হইতে ইহাদের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা অনিন্দিত ছিল তাহা ইহাদের ভালবাসার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

ধীর ব্যক্তিগণ মনের দ্বারা বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—যেমন করিয়া চালনি দিয়া শস্য পরিশুদ্ধ করে, তেমনই মনও বাক্যকে সংস্কৃত করে। বন্ধুরা সখ্যকে জানে এই মানে, বাক্যের মাঝেই তাহাদের ভদ্রতা এবং কল্যাণ নিহিত থাকে।

যজ্ঞের দ্বারা তাহারা বাক্যের পথ অনুসরণ করিয়াছিল এবং ঋষিগণের অন্তরে তাহাকে প্রবিষ্ট দেখিয়াছিল, তাহাকে আনিয়া তাহারা নানাস্থানে প্রকাশ করিয়াছিল, সপ্তগায়কেরা তাহাকে ঐক্যতানে প্রকাশ করে।

কেহ বাক্যকে কখনও দেখে নাই, অথচ তাহাকে দেখিতে পায়, কেহ তাহাকে কখন শোনে নাই, অথচ তাহাকে শুনিতে পায়। যেমন সুবাসা জায়া প্রিয়তম পতিকে আপন রূপলাবণ্য দেখায়, তেমনই বাক্ আপনার মহিমা ও জ্যোতি রসবিদগ্ধ ভাগ্যবান্ কাহারও কাহারও কাছে আপন সৌন্দর্য্য দেখায়।

মানুষের সাধনায় বাক্যের আবির্ভাব, প্রকাশ ও বিসর্জ্জন এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। এই কবিতায় ঋষি সেই অপরূপ বিস্ময়কে প্রকাশ করিয়াছেন।

শব্দকল্পদ্রুম নিরুক্তের অর্থ বুঝাইবার জন্য কাশিকা বৃত্তির একটা বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে—তাহা এই —

> বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
> ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্ ॥
> ভবেদ্বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহো বর্ণবিপর্যয়াৎ।
> গূঢ়াত্মা বর্ণবিকৃতের্বর্ণনাশাৎ পৃষোদরঃ ॥

নিরুক্ত পঞ্চবিধ— বর্ণের আগমন, বর্ণের বিপর্যয়, বর্ণের বিকৃতি, বর্ণনাশ এবং ধাতুর নাশ অর্থ হইতে একটা অর্থের বিশেষ প্রয়োগ। হংস কথাটিতে বর্ণের আগমন আছে সিংহ কথাটিতে বর্ণ ওলট পালট হইয়াছে, গূঢ়াত্মা কথাটিতে বর্ণের বিকার হইয়াছে এবং পৃষোদর কথাটিতে বর্ণনাশ হইয়াছে।

সায়ণ নিরুক্তের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার পণ্ডিত মোক্ষমূলর কর্তৃক অনুবাদ নীচে তুলিতেছি। বিষয়টি কঠিন বলিয়া ইহার প্রয়োজন আছে—

Nirukta is a work where a number of words is given, in that are intention to connect them in a

পটভূমিকাকে নিদর্শন মাত্র মনে করিয়া যাস্কের ব্যাখ্যা অনুসরণ করা কর্ত্তব্য এবং যেখানে যাস্কের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এবং যাস্কের বিরোধী নহে তাহাই গ্রহণ করা উচিত। এই Synthetic method অর্থাৎ সর্ব্বসমন্বয়কারী পন্থাই বেদ বুঝিবার সর্ব্বোত্তম পন্থা।

যাস্কাচার্য্যের নিরুক্তেই বেদ ব্যাখ্যাতৃগণের নানা সম্প্রদায়ের নাম আছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বযাজ্ঞিক, ঐতিহাসিক, নৈদান, সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যার সহিত যাস্কের ব্যাখ্যা তুলনা করা উচিত। যাস্ক অবশ্য শব্দতত্ব এবং শব্দবিজ্ঞানের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। যাস্কের ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিযোগিতার অন্যান্য নিরুক্তকে পরাস্ত করিয়া কালজয়ী প্রতিভার সাক্ষ্যস্বরূপ আমাদিগকে চমৎকৃত করে।

যাস্কের ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক ঋজুতা এবং সুসমঞ্জস নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য নীচের অনুচ্ছেদটি তুলিতেছি :—

তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেন্দ্রো বান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাদ্যথা হোতাধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মোদ্গাতেতি। অপ্যেকস্য সতোঽপিবা পৃথগেবস্যুঃ পৃথগ্ঘিস্তুতয়ো ভবন্তি তথাভিধানানি। যথো এতৎকর্ম্মপৃথক্ত্বাদিতি বহবোঽপি বিভজ্য কর্ম্মাণি কুর্য্যুঃ। তত্র সংস্থানৈকত্বম্। সম্ভোগৈকত্বং চ দৃশ্যতে যথা পৃথিব্যাঃ পর্জ্জন্যেস চ বায়্বাদিত্যাভ্যাঞ্চ সম্ভোগোঽগ্নিনা চেতরস্য লোকস্য, তত্রৈতন্নররাষ্ট্রমিব ॥ ৭।৫ নৈরুক্তবাদীরা বলেন দেবতারা তিনশ্রেণীর—ভূলোকের, দ্যুলোকের ও অন্তরীক্ষ লোকের। অগ্নি পৃথিবীর দেবতা, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষের দেবতা, সূর্য্য দ্যুলোকের দেবতা। এইসব দেবতাগণ মহা ঐশ্বর্য্যময়, তাহাদের একই মহিমা হেতু তাহাদের নানা বিচিত্র নাম আছে। কর্ম্ম পৃথক থাকার নিমিত্ত যেমন এক পুরোহিতেরই চারিটি নাম—হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা—অথবা পৃথক পৃথক হওয়ার সম্ভব, সেইজন্য স্তোত্রও পৃথক পৃথক আছে এবং নামও পৃথক পৃথক আছে। যেহেতু ইহাদের কর্ম্ম পৃথক সেইজন্য ইহারা বহু হইয়াও নানা কর্ম্ম বিভাগ করিয়া করিতে পারে। একত্র সংস্থান হেতু ইহা সম্ভব নয়। তাহাদের একত্র সম্ভোগও দেখা যায়, পৃথিবী আর মেঘের সম্ভোগ হয়, বায়ু আর সূর্য্যের, অগ্নির সহিত দ্যুলোকের সম্ভোগ দেখা যায়, এই সম্মেলন নররাষ্ট্রের মিলনের মত দেবরাষ্ট্রেও ঘটিয়া থাকে।

যাস্ক কি ভাবে এবং কি প্রণালীতে বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার একটী সুন্দর উদাহরণ নিম্নে দিতেছি। প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ সূক্তটি হিরণ্যস্তূপ আদিমের রচনা। ইহা তিনি ইন্দ্রের কীর্ত্তিগাথা গাহিয়া তাহাকে প্রশস্তি দিতেছেন। এই ইন্দ্রদেবতার প্রশংসা সূচক স্তোত্রটির দশম ঋক এই :—

অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাম মধ্যে নিহিত শরীরং
বৃত্রস্য তস্যা বিচরংত্যাপো দীর্ঘং মোশয়দিন্দ্রশত্রুঃ ।১।৩২।১০

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় যাস্ক নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

অতিষ্ঠন্তীনামনিবিশমানানামিত্যস্থাবরণাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং মেঘঃ। শরীরং শৃণাতে শম্নাতের্বা। বৃত্রস্য নিণ্যং নির্ণামং বিপরিবিজানন্ত্যাপ ইতি। দীর্ঘং দ্রাঘতেঃ। তমস্তনোতেঃ। আশয়দাশেতের্ইন্দ্রশত্রুরিন্দ্রোঽস্য শময়িতা বা শাতয়িতা বা তস্মাদিন্দ্রশত্রুঃ। তত্র কো বৃত্র মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ ত্বষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ অপাং চ জ্যোতিষশ্চ মিশ্রীভাবকর্ম্মনেক বর্ষকর্ম জায়তে তত্রোপমার্থেন যুদ্ধবর্ণা ভবন্তি অহিবত্তু খলু মন্ত্রবর্ণানাং ব্রাহ্মণবাদশ্চ। বিবৃদ্ধ্যা শরীরস্য স্রোতাংসি নিবারয়াংচকার। তস্মিন্ হতে প্রসস্যন্দির আপঃ। তদভিবাদিন্যেষর্গ্ভবতি ॥

অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশমানানাম্ ইহার অর্থ অস্থাবর কাষ্ঠের মধ্যে নিহিত শরীর মেঘ। শরীর হিংসার্থক দুইটি ধাতু হইতে উৎপন্ন। বৃত্রস্য নিণ্য নির্ণাক অর্থাৎ নামহীন স্বরূপকে দীর্ঘ অর্থাৎ যাহা বিস্তৃত হয় তম অর্থ ও তাহাই আশয়ৎ প্রবেশ করিয়াছিল শুইয়াছিল ইন্দ্রশত্রু অর্থ ইন্দ্রের নিধনকারী বা দমনকারী। বৃত্রকে—নিরুক্তকারেরা বলেন—বৃত্র মেঘ, ঐতিহাসিকেরা বলেন বৃত্র ত্বষ্টার পুত্র অসুর। জলের অর্থ জ্যোতি বা বিদ্যুৎ মেঘ এবং বিদ্যুতের সমাবেশে বর্ষা হয় ইহাই ভাবার্থ। উপমার্থে যুদ্ধ বর্ণনা করা হইয়াছে ইহা বাস্তব যুদ্ধ নহে—পরস্পরের সংঘর্ষে বিদ্যুতের উৎপত্তি কথাই ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধের রূপকে বলা হইয়াছে। বৃত্রের মত অহি ও ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী—অহি শব্দের সহিত মন্ত্রবর্ণ এবং ব্রাহ্মণবাদ আছে। বৃত্র শরীরকে বাড়াইয়া জলস্রোত নিবারণ করিয়াছিল, তাহার মৃত্যুতে প্রচুর জল বাহির হইয়া পড়িল। এই অর্থ বুঝাইবার জন্য এই ঋক রচিত। যাস্কের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সমস্ত বেদপাঠক নিরুক্ত হইতে যাস্কের রচনা প্রণালী বুঝাইবার জন্য একটি ব্যাখ্যা তুলিতেছি :

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥ যদিদং কিংচ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণু স্ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যৌর্ণবাভঃ। সমূঢ়মস্য পাংসুরে প্যায়নেঽন্তরিক্ষে পদদং ন দৃশ্যতে। অপি বোপমার্থে স্যাৎসমূঢ়মস্য পাংসুল ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি। পাংশবঃ পাদৈ সূয়ন্ত ইতি বা, পন্নাঃ শেরত ইতি বা পংসনীয়া ভবন্তীতি বা ॥

পদাংশটী ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তে আছে। সূক্তটি রচনা করেন মেধাতিথি ঋষি। এই ঋকটীর ব্যাখ্যা লইয়া নানা মতভেদ আছে। জগতে যাহা কিছু সকলই বিষ্ণু পরিক্রমণ করেন, ত্রিপাদ বিক্রম বিষ্ণু তিন পদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যৌ ব্যাপ্ত করেন ইহাই শাকপূণির মত। ঔর্ণনাভ বলেন বিষ্ণুর তিন পদ—তার উদয়াচল আরোহণ, মধ্যাকাশে জ্যোতির্মণ্ডলের শীর্ষারোহণ এবং অস্তাচলগমন সময়ে গয়াশিরে পদার্পণ। ধুলিজীবন বৃদ্ধি হওয়ায় অন্তরীক্ষ হইতে উহার পদ দেখা যায় না। আর "পাংশুর" কথাটি উপমাভাবে ব্যবহৃত হইলে ধুলিধূসর ইহার পদ দেখা যায় না। পাংশব কথাটির অর্থ যাহা পা দিয়া উৎপন্ন হয় তাহা অর্থাৎ ধূলি, পায়ে শয়ন করে এই ভাবেও ধূলি অর্থ হয়, অথবা ধূলিময় হয় এই অর্থে কথাটির অর্থ ধূলি।

যাস্ক পাণিনির বহুপূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার

সঠিক কালনির্ণয় সম্ভব নয়। যাস্কের পর এবং সায়নের আবির্ভাবের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক টীকাকার এবং ভাষ্যকার জন্মিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের কাহারও রচনা বাঁচিয়া নাই।

বেদ ব্যাখ্যানের পক্ষে যাস্কের স্থান অত্যুচ্চ। সায়নাচার্য্যের সম্পূর্ণ বেদভাষ্য আছে, কিন্তু সায়ন অর্ব্বাচীন। যাস্কের পুস্তক হইতেই জানি, তাহারই যুগে বেদ এত প্রাচীন হইয়া গিয়াছে যে কোনও কোনও আচার্য্য বেদের ব্যাখ্যা সম্ভব হয়, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাস্কের আর একটী মাত্র ব্যাখ্যা তুলি। অগ্নিদ্যোতক বৈশ্বানর শব্দটি ঋগ্বেদে বারংবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ শুধু অগ্নি ধরিয়া লইলে এই কবিত্বময় ভাবময় রসময় শব্দটির ব্যঞ্জনা এবং মাধুর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব না।

বৈশ্বানর: কস্মাদ্বিশ্বান্নরান্ এর্য়তি বিশ্ব এনং নরা নয়ন্তীতি বা বিশ্বাকর এব স্যাৎ প্রত্যৃতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি তস্য বৈশ্বানরস্তস্যৈষা ভবতি।

৭।২১

বৈশ্বানর কি কারণে বলা হয়? যিনি বিশ্ব মানবকে লইয়া যান তিনিই বৈশ্বানর—(সকল মানুষকে যিনি কর্ম্মের, সত্যের জ্ঞানের, পুলক এবং আনন্দের পথে লইয়া যান তিনিই বৈশ্বানর) অথবা ইহার অর্থ সমস্ত মনুষ্য যাহাকে লইয়া গড়ায় তিনিই বৈশ্বানর—অথবা বিশ্ব নরকে, শুধু নরকেই নয়, যিনি সর্ব্ব ভূতকে সত্যে পৌঁছাইয়া দেন তিনিই বৈশ্বানর—এই অর্থেই এই শব্দ ব্যবহার হয়।

যাস্কের যতটুকু পরিচয় দিলাম, তাহা হইতে এই কথা বলিতে পারি যে বেদ বুঝিতে যাস্কের নির্বচন মানিয়া লইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা যথার্থ অর্থ জানিতে পারিব। ঋগ্বেদের যে সব ভাষ্য পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে সায়ন স্বয়ম্পূর্ণ। স্কন্দ স্বামী, মাধবভট্ট এবং সায়নের ব্যাখ্যা হইতে যাস্কের ব্যাখ্যা পুরাতন। তাহা শব্দতত্ত্বানুযায়ী এইজন্য যাস্কের ব্যাখ্যাই লওয়া-বেদ বুঝিবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়।

দৈবত কাণ্ডের চতুর্থ সূত্রে বলিয়াছেন :—

যৎ কামা ঋষি যস্যাং দেবতায়াং অর্থে পত্যম্ ইচ্ছন্
স্তুতিং প্রযুঙ্ক্তে তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি॥

ঋষি প্রার্থনা করেন—সে প্রার্থনা কামনা সঞ্জাত—দেবতার নিকট অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তাহাই দৈবত এবং সেই স্তুতিই মন্ত্র।

আসুন যাস্ককে অনুসরণ করিয়া নূতন কালে নূতন প্রার্থনা করি—যে প্রার্থনা ঋষিদের যুগে স্বপ্ন ছিল, তাহা আজ বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত মানুষের যিনি দেবতা, সেই বৈশ্বানরের নূতন অর্চনা করি—তাহারই প্রসাদে বিশ্বমানবের মন এক হউক, প্রাণ এক হউক।

বিশ্ব মৈত্রী অসম্ভব নয়, বিশ্বকল্যাণ স্বাভাবিক। আসুন, সেই বিশ্ব-যজ্ঞে নিজেরা প্রবৃত্ত হইয়া জগতে শান্তি, শ্রী ও আনন্দকে ফিরাইয়া আনি। পৃথিবীতে সুন্দরের আবির্ভাবে মহোৎসব আরম্ভ হউক।

বেদ অমৃত বিদ্যা—যাস্ক সেই অমৃত বিদ্যার মন্দিরের দ্বারী। তাহারই পরিচালনায় অমৃত উপলব্ধি করিতে পারি, অতএব সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষকে শ্রদ্ধায় বন্দনা করি।

যাস্কের হৃদয় বিশাল। উদারচিত্ত যাস্ক বেদ বিদ্যায় বিশ্বাসী—তিনি নৈরুক্ত কিন্তু যাজ্ঞিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি আচার্য্যদের মতভেদ দেখাইতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই, বিনা সঙ্কোচে পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মতবিরোধ প্রকটিত করিয়াছেন—যেখানে বুঝিতে পারেন নাই, সেখানে অবলীলাক্রমে লিখিয়াছেন এই মন্ত্রার্থ সংশোধক হয়। ব্রাহ্মণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের গৌণকল্পনা দিয়া মন্ত্রের স্বত্বাধ্য ভুলিতে বারণ করিয়াছেন। বেদার্থ জ্ঞানের কঠিনতা ও দুর্জ্ঞেয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছেন।

যাস্কের বৈজ্ঞানিক নির্বাণ পন্থা অনুসরণ করিয়া অখিল ধর্ম্মমূল বেদের পঠন ও কঠিন, নিত্য স্বাধ্যায় যদি দেশে ফেরে তবে আমরা অভ্যুদয় ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিব। মহামুনি উদারপ্রাণ যাস্কাচার্য্যের নিকট সেই প্রার্থনাই জানাইয়া তাহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করি।

এখানে ধূসর ছায়া

বটকৃষ্ণ দে

এখানে ধূসর ছায়া—ওপারেতে অনেক সবুজ
অলস আবেশ মাখা ছলো-ছলো অবাধ অবুঝ
ওখানে সকাল বেলা কাঁচা রোদ শিশিরের বুকে
হাসে যেনো ঝলোমলো স্বপ্নে-নীল জীবনের সুখে।
করুণ বিকেল নামে তার পর আবছা গোধূলি
তারার জোনাকী-জ্বলা আকাশের বাতায়নগুলি
ভেসে ওঠে চোখে-চোখে। ছায়া-ছায়া সেই নীল দেশে
চাঁদের আঁচল ছুঁয়ে সাদা মেঘ-দল আসে ভেসে।

ওখানে রাতের মায়া—এখানে চকিত বিভীষিকা,
এপারে সবুজ-হীন মাঠে যেন আগুনের শিখা।
জলের হরফ হ'য়ে যেন সব ধুয়ে-মুছে গেছে,
বিদায়ের বাণী বুঝি কেউ তারে শুনিয়ে গিয়েছে
এখানে আকাশ সে তো সাগরেতে নয় অবনত,
দিগন্ত-অবধি হেথা ধূ ধূ করে রুক্ষ রাঙা পথ।
তারার চোখের জল ঝরেনাকো কখনো হেথায়,
তৃষায় কাতর হাওয়া সবি হায় শুষে নিয়ে যায়।

ওখানে ঘুমালু চোখে নামে যবে স্বপনের মায়া—
এখানে নিশুতি রাতে ছায়াগুলো রূপ ধরে কায়া।

তিন

যে-সঙ্কল্পটা নিয়ে পুল থেকে উঠে এসেছিল তাতে বাধা পড়ল। ডাক্তারী বিবেকটা ক্ষুণ্ণ হ'ল, তবে বেশি নয়, কেননা এও তো সেই কাজই—বহুর জায়গায় না হয় এক-জনকে নিয়েই, কিন্তু সেই একজনের মধ্যে ট্র্যাজেডিটা তো কম ঘনীভূত হয়ে ওঠে নি—এযে বেঁচেও ম'রে থাকা। বিবেককে এই বলে সান্ত্বনা দিলে যে এই রকমই বোধ হয় দৈবের ইচ্ছাও, নৈলে এমন করে এইখানেই টেনে নিয়ে এলেন কেন? ঐদিকে যাবার জন্যেই তো উঠেছিল।

ট্রেণটা হটে এসে আপনিই দাঁড়াল। দু'খানা গাড়ি নিয়ে তৈরি, ভেতরের একজন লোকের সঙ্গে হন্টম্যানের কথাবার্তা হোল, দুর্ঘটনাটা কত দূরে কি বৃত্তান্ত এই সব নিয়ে। কয়েকটা মিনিট উৎকট দ্বিধার মধ্যে দিয়ে কাটল সুকুমারের। দু'জনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ও এক একবার ঘুরে চাইছেও গাড়িটার পানে, পা'টা যেন আপনিই উঠে পড়তে চায়, তারপরেই সরমার মুখের পানে গিয়ে দৃষ্টিটা পড়ছে; সে যেন মরণ-বাঁচনের রায় শুনবে এখনি।... গাড়িটা ছেড়ে যেতে একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

সুকুমার আর অত ভাবাভাবির মধ্যে না গিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করে দিলে, বললে—"আপনার একটু ঘুম দরকার আগে।...আর কিছু নয়, একটু-আধটু ধাক্কা-ধাক্কি তো লেগেছেই এখানে-সেখানে—এখন বুঝতে পারছেন না—ঘুমুলে সেটুকু ঠিক হয়ে যাবে।...কিন্তু কথা হচ্ছে, শোবেন কোথায়?"

নিজের প্রশ্নের প্রচ্ছন্ন উত্তর হিসাবেই দড়ির খাটটার দিকে একবার অপাঙ্গে চাইলে।

সরমাও বললে—"কেন, ঐতো রয়েছে, এখানে আর কত বিচার করতে যাব?...কিন্তু একটা কথা, নাইবা ঘুমু-লাম, কতটুকুইবা রাত আর?"

সুকুমার অনুরোধের মধ্যে একটু আদেশ ফুটিয়েই বললে—"না, ঘুমটা আপনার দরকার।...আর, আমি যাব না জায়গাটা ছেড়ে, ভয় নেই।"

বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠল সরমা; বোধ হয় লজ্জাটাকে চাপা দেবার জন্যেই খুবরিটার দিকে পা বাড়ালে, কিন্তু আবার মুখ ফিরিয়ে বললে—"না, ও লোকটার আপত্তি হ'তে পারে খাটটা নেশিক্ষণের জন্যে ছেড়ে দিতে, তাই বলছিলাম।"

উত্তর হোল—"যে এমন অবস্থার মধ্যেও বসে রামায়ণ পাঠ করতে পারে, সে রাজপাট ছেড়েও বনে বাস করবার লোক—খাট তো তুচ্ছ; আপনি নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোন গিয়ে; আমি কাছেই আছি।"

খানিকটা সরে গিয়ে একটা পাথরের ওপর বসল আবার রাত্রির সামনা-সামনি হয়ে। একটা টিলার খানিকটা চেঁচে ফেলে সেইখানে হন্টটা বসানো হয়েছে; টিলা চিরে রেলের লাইনটা দুদিকে ঢালু নেয়ে গেছে বেরিয়ে। পুলের সামনেই সেই বিরাট অরণ্যটা গেছে আড়ালে পড়ে। দুর্গতদের আর্তনাদটাও গেছে চাপা পড়ে, নিশ্চয় অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে, যেটুকু আছে, টিলার গায়ে প্রতিহত হয়ে ওদিকেই ফিরে যাচ্ছে। আওয়াজের মধ্যে হন্টম্যানের একসুরে রামায়ণ পাঠ।

সুকুমার আকাশ-পাতাল ভাবছে বসে বসে, এ আবার কী নূতন সমস্যার মধ্যে পড়ল? একে নিয়ে এখন করে কি—কোথায় গিয়ে ওঠে—কোথায় রাখে? এর অতীত নেই, বিধাতার সৃষ্টির যেন একটা ব্যতিক্রম, জীবনের মাঝ-খান থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে উঠেছে; সংসারের মধ্যে একে কি করে কোনখানটিতে বসায়?...অতীত যে নেই একেবারে তাও তো নয়; সব থেকেও নেই, সেই খানেই তো সমস্যা আরও জটিল।

আজকের অভিনব অভিজ্ঞতার মধ্যে চিন্তার ক্ষমতাটা নিশ্চয় একটু কমে এসেছে। তবুও মাঝে মাঝে বুদ্ধির

একটু স্ফুরণ হচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রশ্ন এসে আবার সব এলোমেলো করে দিচ্ছে।···একটা সমাধান মনে এসেছে—বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে কাগজে কাগজে।···বেশ, কিন্তু যতদিন না উত্তর আসছে রাখবে কোথায়? বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখা চলবে না—রেল দুর্ঘটনার মধ্যে পরিচয়—এ কথাটা অনেকে হয়তো বিশ্বাস করতে পারতো, কিন্তু ঐ যে পূর্ব জীবনের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে এইটেই বিশ্বাসে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এ ব্যাধিটা অসাধারণ, এমন কি অন্য ব্যাধির মতো পরীক্ষায়ও ধরা পড়বার নয়; লোকের মনে করতে একটুও সঙ্কোচ হবে না যে এটা দু'জনের মাথা ঘামিয়ে একটা মন-গড়া ব্যবস্থা—যাতে অতীত সম্বন্ধে সব কৌতূহল নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।···মনে পড়ল কলকাতায় সম্প্রতি কয়েকটি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাগার হয়েছে,এ্যাসাইলাম, কিন্তু সেখানে কি চাইবে থাকতে? এ যা ব্যাধি, তাতে মনের একটা অংশ একেবারে সুস্থ, অবস্থ; জীবনে একটা কিছু যে হয়েছে সে সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। ঐ রকম জায়গায় নিয়ে গেলে সুস্থ অংশটাও আতঙ্কে—নিরাশায় বিকৃত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা নেই কি?···বড় শক্ত প্রশ্ন সব, সুকুমারের মনটা শুধু ব্যথাতুর করে তুলছে। আর ঠিক যে সেবা, চিকিৎসা, পরোপকার, নিজের জীবনকে নতুন পথে চালিত করা—এ সব নয়; এই দুর্ঘটনা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দু'জন এক জায়গাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে, সমবেদনায় মনটি উঠছে ভরে; রাত্রিটিও এমন, সমাবেশও এমন যে আর সব খেয়াল থেকেই মুক্ত হয়ে মানুষকে, শুধু মানুষ বলেই বুকের কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করছে: কত অসহায়, কতই যে ক্ষণ-ভঙ্গুর, দেখা গেল!

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল—সুকুমারের নিজের বাড়িতে খবর দিতে হবে! মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে পাঁচটা চিন্তার মাঝখানে পড়ে। কাল ভোর না হ'তে ডিরেলমেণ্টের খবরটা সহরময় দেশময় ছড়িয়ে পড়বে, যতশীঘ্র সম্ভব এখবরটাও পৌছানো দরকার যে সুকুমার ভালো আছে। কি উপায় হতে পারে? মনে পড়ে গেল হল্টে টেলিফোন আছে। এখনই তো এ কথা মেয়েটিকে বলেছিল, আর গাড়িটা যে এল—সেও তো টেলিফোনে খবর পেয়েই।···আজ ক্রমাগতই এত ভুল হয়ে যাচ্ছে।

উঠে হন হন করে এগিয়ে গিয়ে "পাঁড়েজী" বলে ডাক দিতে যাবে, একটা অদ্ভুত কথা মনে হতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।—তার নিজের অতীতকেও যদি মুছে ফেলা যায় তো কেমন হয়? মেয়েটির গেছে দৈবের হাতে মুছে, সুকুমার মুছে ফেলবে নিজের হাতে।···উত্তেজনায় সুকুমারের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।···চমৎকার হয়, অত বড় দুর্ঘটনা হয়ে গেল, তারপর আর খবর পাওয়া গেল না সুকুমারের—বিনা আয়াসেই লোকে এ থেকে একটি মাত্র সিদ্ধান্ত যা হয় তাই করবে—অর্থাৎ সুকুমার আর নেই। কোন প্রশ্ন উঠবে না, কিছু না। জীবনের মধ্যেই চমৎকার একটি মৃত্যু। পুরাণো পৃথিবীটাতে সে আর নেই; সেইখান থেকেই নূতন পৃথিবীটা গড়ে তুলুক না। সুকুমার ধীরে ধীরে এসে আবার শিলাখণ্ডের ওপর বসল।···একটা কান্নার রোল উঠবে বাড়িতে। উঠুক; মা নেই, তা ভিন্ন সবচেয়ে যা নির্ভাবনার কথা—কারুর সীমন্তের সিঁদুর মুছবে না তার বিলুপ্তিতে। জীবনের ওপর তার একটা অভিমান আছে—বাবা, সৎ-মা···যে ছবিটা ফুটে উঠতে চায় সেটাকে জোর করে চেপে রাখে সুকুমার; বেশ আনন্দের স্মৃতি তো নয়! কিন্তু পুরাতন এত অল্পে ছাড়তেও তো চায় না; বলে—ফিরেই এসো, ছোট বড় বৈষম্য-মিটিয়ে এর মধ্যেই তো আবার নূতন করে আনন্দ সৃষ্টি করে নিচ্ছে মানুষে, তুমিই বা না পারবে কেন?—সম্পত্তি রয়েছে, সহায় রয়েছে, ভবিষ্যৎ—তাও অনুজ্জ্বলই বা কিসে?···

অস্বীকার করে না সুকুমার, তবু যেন একটা নবজন্মের জন্যই মনটা আবেগময় হয়ে ওঠে।

তার আহ্বানই আপাততঃ হয়ে ওঠে প্রবল।···আর, নিরুপায়ও তো সুকুমার;—যখন সে কর্তব্যের-সঙ্কল্প নিয়ে পা বাড়িয়েছিল ঠিক সেই লগ্নটিতে, পুরাতনের পথ যেন রুদ্ধ করেই ভগবান সে রহস্যের আকারে এই কঠিন কর্তব্যতার হাতের-কাছে এনে দিলেন, এর অমর্যাদাই বা কি ব'লে করে সে?

টেলিফোন করার মতো চিন্তাও আপাতত রইল বন্ধ। অবস্থাই ঠেলে নিয়ে চলল ওর জীবনকে।

উত্তরের দিকে মুখ করে বসেছিল, একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে ফিরে দেখে সরমা কখন এসে পেছনটিতে দাঁড়িয়েছে। পূর্বাকাশে উষার আলোও একটু একটু দিয়েছে দেখা।

বললে—"হচ্ছে না ঘুম।"

উত্তর হোল—"হবার কথা তো নয়, চেষ্টা করতে বলেছিলাম মাত্র। বসুন ঐ পাথরটার ওপর।"

একটু চুপ করে বসে রইল, তার কারণ সমস্ত মন দিয়ে অনুভব করছে নূতন জীবনটাই হোল যেন আরম্ভ এই নব প্রভাত থেকেই। সব কিছুই হয়ে উঠছে অপরূপ—আকাশ, পাহাড়, অনাবিষ্কৃত এই বনভূমি, ঐ রকমই অনাবিষ্কৃত সামনের এই নারীমূর্তি···

সরমা গিয়ে সামনে একটা পাথরের ওপর বসল, পূর্বমুখী হয়ে। সুকুমার একটু পরে বললে—"সকাল হয়ে আসছে, একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হবে তো? খানিকক্ষণ পরে রিলিফ ট্রেণটা ফিরবে। স্টেশনে ফিরে যাই, তারপর সেখান থেকে কলকাতা, কি বলেন?"

সুরমা স্থিরভাবে কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা ক'রে ক'রে শুনছিল, আয়াসে বড় বড় চোখ দুটি একটু কুঁচকে গিয়েছে; প্রশ্ন করলে—"সে কোথায়?"

সুকুমার স্তম্ভিত হয়ে একটু চেয়ে রইল। অবশ্য কলকাতা যাওয়া চলবে না; সরমার মন বোঝবার জন্যেই কথাটা বলেছিল, কিন্তু মুছে যাওয়া মানে এমনভাবে যে মুছে যাওয়া সে ভাবতে পারেনি। একটা ভয়ও হোল—নবজাত শিশুর মতোই একে একেবারে গোড়া থেকে আবার সব শিখতে হবে নাকি? সেইটে পরীক্ষা করবার জন্য একটু বিস্তারিত ভাবে বললে—"কলকাতা সহর—যেখান থেকে আমরা আসছি। গঙ্গার এ-পারে হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িটা ছাড়ল তো কাল রাত্তিরে, তারপর এখানে এসেই এই দুর্ঘটনা, মনে পড়ছে?"

সরমা সেইরকম বিহ্বল ভাবেই একটু চেয়ে রইল, তারপর বাঁ-হাতটা কপালে চেপে ওপরে তুলতে তুলতে বললে—"একটু একটু মনে পড়ছে যেন, আর এটা তো রাত্তিরেই দেখলাম—ছিলামও গাড়িটাতে।"

"চলুন সেখানে।"

"কেন?"

"আপনার যাঁরা আছেন, খুঁজে বের করতে হবে তো?"

"কারা আছেন?"

সুকুমার বুঝলে নিজের জীবনকে কেন্দ্র করে যেটুকু—সেইটুকুই গেছে শুধু বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে, আর সবের সম্বন্ধে একটা আবছায়া গোছের ধারণা আছে, না হলে তো কথাবার্তাই বুঝতে পারত না। যাক্ মনস্তত্ত্বের এ জটিলতা পরে উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করবে, এখন বর্তমান নিয়েই পড়ল সুকুমার—

"আমি হচ্ছি একা মানুষ···মুস্কিল ঐখানে।"

"কিসের মুস্কিল?"

খানিকটা স্পষ্ট করতে হোল—

"আপনি মেয়েছেলে···তাই কোন স্ত্রীলোক আমার বাড়িতে থাকলে সুবিধে হোত।"

এবার অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সরমা। শান্ত, একেবারেই অসঙ্কোচ-দৃষ্টি চোখ, তার ওপর নূতন প্রভাতের আলো এসে পড়েছে; এত মুক্ত, এত নিষ্কলঙ্ক আর কিছু দেখেনি জীবনে সুকুমার, তারও চেয়ে থাকতে দৃষ্টি একটু কুণ্ঠিত হোল না। একটু পরে, যেন সুদূরতম স্মৃতি থেকে সামান্য কিছু সংগ্রহ করতে পারবার পর সরমা বললে—"না হয় কাউকে রেখে নেবেন—কোনও মেয়েছেলে···তদ্দিন···"

"তদ্দিন মানে?"

"আমি কাজ জানি।"

"পড়াশোনা আছে?···কতদূর?"

আবার দৃষ্টি স্থির হয়ে মুখের ওপর এসে পড়ল। এমন সময় রেলে আবার একটা মৃদু সন-সন আওয়াজ উঠল। হন্টম্যান এসে বললে—"মোটরট্রলি আসছে বাবু, ডিরেলের তরফ থেকে; জগহ্ আছে, সাহেবকে বলিয়ে দেখবেন টিশনে নিয়ে যেতে?"

ট্রলিটা এসে পড়ল। একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, সঙ্গে হাপপ্যান্ট আর টুপি পরা একজন দেশীয় সহকারী। সুকুমার তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রেলের মাঝখানেই হাত তুলে দাঁড়াল মনের উত্তেজনায়।

সঙ্গে স্ত্রীলোক, সুতরাং জায়গা পাওয়া গেল।

সমস্ত পথের মধ্যে কথাবার্তা হোল খুব কমই, সবাই নিজের মনের চিন্তা নিয়ে রইল। সরমার চিন্তার কথা সেই জানে, সুকুমার ভাবছে কোথায় গিয়ে তাদের এই নূতন জীবন আরম্ভ করবে। কলকাতা দক্ষ, বাংলা বা

বিহার—যুক্তপ্রদেশের কোন সহর সম্বন্ধেও সেই কথা, কতদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে? বিশেষ করে ইচ্ছা যখন—কর্মের মধ্যে দিয়ে নবভাবে জীবনটাকে গড়ে তুলি, গায়ে ছাই মেখে বৃক্ষতল আশ্রয় করা নয়তো। বাকি থাকে একেবারে বহু—বহুদূরে কোথাও গিয়ে গোড়া-পত্তন করা—তা সে কোথায়? কি. ভাবে? চিন্তার মধ্যে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা যদিবা পায় দেখতে তো সঙ্গের সাথীর ছায়াটুকু এসে পড়ে তার ওপর, চিন্তা এগোয় না।

ঝাঝায় যখন পৌছুল, বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। ট্রলি এই পর্যন্তই; ওরা নেমে ওয়েটিংরুমে চলে গেল। কৌতূহলীর দল তখনও খুব বেশি পুষ্ট হয়নি, যারা জুটেছিল দরজা বন্ধ করে—সুকুমার বাইরে এসেই তাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করলে। সরমাকে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে ইজিচেয়ারে একটু বিশ্রাম করতে বলে স্টেশন মাস্টারের ঘরে গেল, খবর পেলে কলকাতার দিকে যাবার রাস্তা তো বন্ধই, পশ্চিমে যাবার গাড়িও আপাতত কোন নেই, রিলিফ ট্রেণ যেখানা ঘটনা স্থলে গেছে সেখানা ফিরলে তবে ওদিকে যাওয়া যাবে। ট্রলি করে ওভারসিয়ার যিনি ফিরে এসেছেন তাঁর রিপোর্ট রিলিফ ট্রেণ ফিরতে এখনও অন্তত ঘণ্টা চার দেরি, তার মানে বেলা দশটার এদিকে নয়। সুকুমার দুর্ঘটনার মধ্যে থেকেই এসেছে জেনে কিছু প্রশ্নাদি করবার পর জিজ্ঞাসা করলেন—কিছু সাহায্য করতে পারেন কিনা। সাহায্য মানেই খানিকটা জানাজানি হওয়া, যা চায় না সুকুমার; ধন্যবাদ জানিয়ে বললে—একেবারে পিছনের গাড়িতে থাকায় তারা দুজনে সম্পূর্ণ অক্ষতই আছে, ক্ষতিও বিশেষ কিছু হয়নি, তবে তার সঙ্গের আত্মীয়া মহিলাটির একটু আরাম প্রয়োজন, মহিলাদের ওয়েটিং-রুমটি যদি একেবারেই তাদের দুজনকে ছেড়ে দেবার হুকুম দেন স্টেশন-মাস্টার তো বিশেষ উপকার হয়। তারপর কিউলের দিকে যাবার একটু ব্যবস্থা। রিলিফ ট্রেণের অত বিলম্ব, তাও অনিশ্চিত, ওদিকে জামালপুরে তার বিশেষ এক প্রয়োজন রয়েছে॥

খালাসিকে ডেকে স্টেশনমাস্টার মহিলাদের ওয়েটিং রুমের চাবিটাই সুকুমারের হাতে দিয়ে দিলেন, যাবার সময় সে যেন শুধু মনে করে দিয়ে যায়। কিউলে যাবার কিন্তু কোন বন্দোবস্তই চোখে পড়ে না, সবই এখন ওলট-পালট, রিলিফ ট্রেণ না আসা পর্যন্ত কোন উপায়ই নেই। ইতিমধ্যে অন্য কোন রকম দরকার পড়লে সুকুমার যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানায়; কোন বাঙালী পরিবারের সাহায্যও যদি দরকার হয় তারও ব্যবস্থা হ'তে পারে।

সুকুমারের ঐটেই ভয়। বললে—"অনুগ্রহ করে ঐদিকটাই একটু নজর রাখবেন, বাঙালী একজন বিপর্যস্ত হয়ে স্টেশনে আশ্রয়ে রয়েছে কেউ যেন না টের পায়, তাহলে রেল কলোনির বাঙালী অধিবাসীদের সহানুভূতিই একটা অত্যাচার হয়ে দাঁড়াবে। আমরা খানিকটা আরাম করে রিলিফ ট্রেণেই ফিরে যাব।"

বিপদের গুরুত্বটা হাল্কা করে ফেলবার জন্যে একটু হেসে বললে—"জীবনই যাচ্ছিল, না হয় দেরির জন্যে কাজের একটু ক্ষতি হবে, তবু লাভেই থাকব মোটের ওপর।"

কথাগুলো বলে বেরিয়ে আসবে, একটি ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে স্টেশন মাস্টারকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন—"ভেতরে আসতে পারি কি?"

উত্তর হোল—"আসুন।"

বেশ দীর্ঘ গঠন সুপুরুষ। দোরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সুকুমারকে থেমে যেতে হল। ভদ্রলোক ভেতরে আসতে আসতে ষ্টেশনমাস্টারকে বললেন—"আমি একটা বিষম বিপদে পড়েছি, আপনি যদি কোন সাহায্য করতে পারেন···"

দরজা খালি পেয়ে সুকুমার এক পা বাড়িয়েছিল, আপনি আপনিই থেমে গেল, অনুচিত হোল জেনেও।

স্টেশন মাষ্টার প্রশ্ন করলেন—"বিপদটা কি?"

"আমার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন···হয়ে পড়ছেন ঘন ঘন, সকাল থেকে এই চারবার হোল—আমরা ওয়েটিংরুমে রয়েছি।"

সুকুমার ঘাড় ফিরিয়েছে; স্টেশনমাস্টার একবার তার দিকে চেয়ে নিয়ে ভদ্রলোককেই প্রশ্ন করলেন—"কোন্ ওয়েটিং রুমে?"

"বেটা ছেলেদের···এই আমার কার্ড···ব্যাপারখানা হচ্ছে, যে ট্রেনটা ডিরেল হয়েছে তাইতে আমাদের ছেলে আসছিল···কিছুদিন হোল নতুন বিবাহ হয়েছে, তার স্ত্রীকে নিয়েই আসছিল···আমরা তাদের নিয়ে যাব, আমার

স্ত্রী আর আমি সকালে এসে পৌঁচেছি স্টেশনে, এসেই খবর পেলাম ডিরেলমেণ্ট হয়েছে···তারপর থেকেই তাঁকে নিয়ে এই উল্টো বিপদ।···"

কার্ডটা দেখেই স্টেশনমাস্টার বসতে অনুরোধ করেন, মনের উদ্বেগের জন্য ভদ্রলোক না বসায় নিজেই দাঁড়িয়ে উঠেছেন, কথাগুলা শুনে একটু এগিয়ে বললেন—"হাঁসপাতালের ডাক্তার···আসুন, তাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছি···"

"তাঁর খোঁজ আগেই নিয়েছি···সঙ্গে লোক আছে আমার···তিনি নেই, এক্সিডেণ্টের জায়গায়···"

"ও, হ্যাঁ, খেয়াল ছিলনা, তিনি তো সেখানেই গেছেন, কম্পাউণ্ডার সুদ্ধ্য···তাহলে ?"

সুকুমার এগিয়ে এল, বললে—"আমি হচ্ছি ডাক্তার, কিন্তু ওষুধপত্র তো চাই। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু তবুও দু'একটা ওষুধ হলে ভালো হোত···দরকার···"

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে দুহাতে সুকুমারের ডান হাতটা ধরে ফেললেন, বললেন—"আপনি চলুন, ওষুধ না পেলেও অনেকটা সাহস পাব।···মুখে জল ছিটিয়ে হাওয়া করে বার তিন সজ্ঞান করে তুলেছি, এবারেও তাই করতে বলে আমি চলে এসেছি···আপনি চলুন, শীগ্‌গির···"

একরকম টেনেই নিয়ে যাচ্ছিলেন, সুকুমার ঘুরে স্টেশন-মাস্টারকে বললে—"আপনাদের তো ফার্স্ট এডের (first Aid) বাক্স থাকা সম্ভব স্টেশনে ?"

"আছে।"

"সেইটে পাঠিয়ে দিন ওয়েটিংরুমে, আমি এগুচ্ছি।"

একেবারে চৈতন্য না হলেও ভদ্রমহিলার চোখের পাতা একটু একটু কাঁপতে আরম্ভ করেছে, এরা গিয়ে উপস্থিত হোল। ফার্স্ট এডের বাক্সটাও এসে পড়ল, দু'একটা ওষুধ বেছে নিয়ে সুকুমার অচিরেই চাঙ্গা করে তুললে। স্টেশন-মাস্টার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, খবরটা পেয়ে চলে গেলেন। সুকুমারও বেরিয়ে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক অনুরোধ করলেন—"আপনি অনুগ্রহ করে বসুন, তাহলে একটু সাহস পাই।"

খুবই যে সম্ভ্রান্ত পরিবার তার পরিচয় রয়েছে, তার ওপর অ-বাঙালী; সম্ভবত বেহারীই, সুকুমার কুণ্ঠিতভাবে বললে—"বাইরে—দরজার পাশেই অপেক্ষা করছি আমি···"

"আপনার সঙ্কোচের কারণ বুঝেছি, কিন্তু একেবারেই তার দরকার নেই। আমাদের মোটে পর্দার বালাই নেই, তা ভিন্ন আপনি তো ডাক্তারই; তারও ওপর একটা কথা, আমিও একটু সঙ্গ চাই, মনটা বড় অস্থির হয়ে রয়েছে—বুঝতেই পারেন।"

বসেই রইল সুকুমার, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের মনে কি ভাবতে লাগল, বোধ হয় দুর্ঘটনার প্রসঙ্গটা তুলে কোনও ভরসায় কথা বলতে পারে কিনা—ঠিক হবে কিনা বলা। তার আগে ভদ্রলোক নিজেই কথা পাড়লেন, বোধহয় আলাপ জুড়ে দিয়ে ধরে রাখবার জন্যই; প্রশ্ন করলেন—"তা আপনি কোথা থেকে এসে পড়লেন এখানে ?—আমাদের কাছে তো ঈশ্বর-প্রেরিত বলেই মনে হচ্ছে।"

একবার মনে হোল লুকিয়ে কথাটা, রোগিনীর কাছে দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ তোলা হবে না ঠিক, তার পরেই কিন্তু খেয়াল হোল একজন সেখান থেকে বেঁচে এসেছে প্রত্যক্ষ করলে ফলটা ভালোই হবে। বললে—"আমি ঐখান থেকেই আসছি।"

ঘরটার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল; ভদ্রলোক তো সচকিত হয়ে উঠলেনই, তাঁর স্ত্রী বেঞ্চে শুয়ে ছিলেন, তিনিও ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে পড়বার চেষ্টা করলেন। সুকুমার উদ্বিগ্ন ভাবে ভদ্রলোককেই বললে—"ওঁকে শুয়েই থাকতে বলুন। ভয়ের তেমন কিছু নেই, এই দেখুন না, আমিই তো বেরিয়ে এসেছি—একেবারে অক্ষত—সুতরাং···"

এমন একটা সকরুণ বিশ্বাস আর আশা ফুটে উঠেছে দুজনার দৃষ্টিতে যে সুকুমারকে যেতেই হোল থেমে। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কথা মনে পড়ে গেল, বললে—"তাঁরা নিশ্চয় সেকেণ্ড বা ফার্ষ্ট ক্লাসে ছিলেন ?"

"ফার্ষ্ট ক্লাসে।"

"তাহলে তো···আমিও ছিলাম সেকেণ্ড ক্লাসে—পাশেই···"

আটকে যাচ্ছে কথাগুলা, ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাস বগির চেহারাটা পড়ছে মনে—সেকেণ্ড ক্লাসে ছ'জনার মধ্যে সে একলা পেলে নিষ্কৃতি।···এখনই রিলিফ ট্রেণ এসে পড়লে যে-সত্য নিজের নগ্নতায় প্রকাশ হয়ে পড়বে, এইটুকুর জন্য তাকে ঢেকে রাখতে কেমন যেন সায় দিচ্ছেনা মন। একটা

পশুপক্ষী, মৎস্য এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের সঙ্গে মনুষ্যজাতির কশেরু-সম্বন্ধীয় অস্থাদির সংগঠন প্রণালীর তারতম্য নির্দ্ধারণ করা। ফ্রোএবল ছিলেন বিবর্ত্তনবাদী। সর্ব্বপ্রকার প্রাণী ও জীবের মধ্যে তিনি লাভ করেছিলেন এক পরম ঐক্যের সন্ধান। তিনি কায়মনোবাক্যে পৃথিবীর সেন্দ্রিয় বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস করতেন। অধ্যাপক ব্যাট্‌স্ তাঁকে আরও শিক্ষা দিলেন যে, কোষের সঙ্গে কোষের এবং অংশের সহিত অংশ বিশেষের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, এক কথায় যাকে বলে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' দুর্ভাগ্যবশতঃ, জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ফ্রোএবলের মধ্যে ব্রহ্মকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন না। ঋণ পরিশোধ না করার অভিযোগে নয়, সপ্তাহ কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাগৃহে আটক থাকার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভে এইখানে ঘটলো ইতি।

১৭৯৯ হ'তে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ অবধি ফ্রোএবল ছিলেন একজন দশকর্ম্মান্বিত ব্যক্তি। জার্ম্মান সাহিত্য থেকে স্থাপত্যবিদ্যা—সবকিছুরই তিনি চর্চ্চা করেছিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে তাঁকে কার্য্যোপলক্ষে ফ্রাঙ্কফার্টে গমন করতে হয়। সেখানে গুষ্টাভ এ্যান্টন গ্রুনার (১৭৭৮-১৮৪৪) নামক জনৈক পেষ্টালজিপন্থী শিক্ষকের সহায়তায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে তিনবৎসরের জন্য চুক্তিক্রমে তিনি অধ্যাপনা করেন। হার্ব্বার্টের ন্যায় ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ফ্রাঙ্কফার্টের এক ধনী পরিবারে ফ্রোএবলও তাঁদের তিনটী শিশুসন্তানের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ তাঁর সুনাম সুগন্ধি কর্পূরের মতো চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ইতিপূর্ব্বেই পেষ্টালজির সহিত তাঁর পরিচয় হয়েছিল জেভারডনে। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সুইটজারল্যাণ্ডে তাঁর ছাত্রছাত্রী তিনটীকে নিয়ে উপস্থিত হওয়ামাত্রই পেষ্টালজি তাঁকে ধরে বসলেন ও জেভারডনে প্রতিষ্ঠিত তাঁর বিদ্যালয়ে ভূগোলশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদটী ফ্রোএবলকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। ফ্রোএবল ইতিপূর্ব্বেই তাঁর কর্ম্মপন্থা স্থির করে রেখেছিলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ আদর্শ ছিল স্বাধীনভাবে মনোমত একটী শিশু-শিক্ষাভবনের ভিত্তিস্থাপন করা। সুতরাং তিনি পেষ্টালজির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

ঢেঁকি কিন্তু স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙ্গার কাজ হতে অব্যাহতি পায় না। একটী দুইটী করে সুইটজারল্যাণ্ডেও ফ্রোএবলের বহু ছাত্রছাত্রী জুটে গেল। তাদের নিয়ে গৃহেই তিনি নানাবিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। জেভারডনে এই সময় নায়েগেলি ও ফাইফার নামে দুইজন সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। শিশুদের সঙ্গীত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তাঁরা একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের লিখিত গ্রন্থখানি পাঠ করে ফ্রোএবলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সঙ্গীত, অঙ্গভঙ্গী এবং ভাষা—এই তিনটী হচ্ছে অভিব্যক্তি প্রকাশের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। তাঁর গৃহবিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী হ'তে চিত্রানুশীলন, কুটিরশিল্প ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়গুলিও বাদ গেল না। কিন্তু সাধারণতঃ, ঘটনা সমষ্টিবদ্ধ ভাবে প্রবাহিত হয়। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদেবার জন্য তাঁর বিদ্যালয়ে ফ্রোএবল যে দুই একজন অধ্যাপককে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হ'লো। নিজের পড়াশুনোয় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ছিলেন বলে ফ্রোএবল কিছুই লক্ষ্য করলেন না।

যুদ্ধ এবং সখ্য : 'কাইলহাউ' : কিণ্ডারগার্ডেনের সৃষ্টি ও বিস্তার

১৮১২ খৃষ্টাব্দে, গ্রীষ্মঋতুর মাঝামাঝি, ফ্রোএবল গটিংগেন পরিত্যাগ করে বার্লিন শহরে গমন করেন। সমগ্র ইউরোপে তখন সমরবহ্নি জাজ্বল্যমান। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বিশ্বগ্রাসী বিজয়াকাঙ্ক্ষার দুর্ব্বার স্রোত রোধ করবার আশায় জার্ম্মানীও উদ্যোগ-আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। জাতে প্রুশিয়াবাসী না হলেও ফ্রোএবল ছিলেন জার্ম্মানীর সন্তান। কাজে-কাজেই তাঁকেও *সৈন্যদলে যোগদান করতে হল। সৈন্যদলে* তাঁকে জার্ম্মানীর বিখ্যাত যুযুৎসু-শিক্ষক ফাদার জাহানের সঙ্গে এক সাথে পরিশ্রম করতে হয়। উভয়ে পরস্পরের সহিত বহুপূর্ব্বেই পরিচিত হয়েছিলেন। যুদ্ধের মধ্যস্থতায় তাঁদের বন্ধুত্ব ক্রমশঃই অধিকতর নিবিড় হয়ে ওঠে। একদিন হাৎজেনহাইড্ নামক স্থানে জাহান, উইলিয়াম, মিডেনডর্ফ নামক তাঁর এক শিষ্যের নিকট ফ্রোএবলের গুণকীর্ত্তন করেন। ফ্রোএবলের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য মিডেনডর্ফ উৎসুক চিত্তে বহুকাল হ'তে অপেক্ষা করছিলেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কর্তৃপক্ষ তাঁদের বর-তরফ করলেন। ফ্রোএবল বার্লিনে অধ্যাপক ভাইসের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

ইতিমধ্যে ফ্রোএবলের (সহোদর) ভ্রাতা ক্রিষ্টোফের মৃত্যু হল। তাঁর তিনটী শিশুপুত্র ও আরো দুটী ভ্রাতৃব্য—এবং হেনরী ল্যাঙ্গেথল্ নামক একজন সমব্যবসায়ীর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে একত্রে সংগ্রহ করে তিনি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গ্রিসহাইমে ১৩ই নভেম্বর একটী স্বাধীন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ফ্রোএবল তাঁর শৈশবের লীলাভূমি কাইলহাউ নামক স্থানে কার্য্যক্ষেত্র স্থানান্তরিত করেন।

কাইলহাউর শিশু বিদ্যালয় শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে লাগ্‌লো। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রথমে অল্প ছিল বটে, কিন্তু পরে, স্থানাভাবহেতু ফ্রোএবলকে তাঁর বিদ্যালয়ে আরও বালকবালিকা ভর্ত্তি করা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখ্‌তে হয়। এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "মানুষের শিক্ষা" রচনা করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী পরিদর্শক তাঁর বিদ্যালয় তদারক করতে আসেন। গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে যে অভিমত পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত সন্তোষজনক। এই সময় উইলহেলমাইন হফমাইষ্টার নামক জনৈকা সুন্দরী ধনী-দুহিতার সঙ্গে ফ্রোএবলের বিবাহ হয়। উইলিয়াম মিডেনডর্ফ, হেনরী ল্যাঙ্গেথল এবং ফ্রোএবল-দম্পতীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাইলহাউর শিশু শিক্ষাসদন দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছিলো, এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় সমগ্র থুরিঞ্জিয়ায় আরম্ভ হোলো এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সুযোগ বুঝে একজন বিশ্বাসঘাতক স্কুল-শিক্ষক অসন্তোষের বহ্নি প্রধূমিত করতে প্রয়াস পেলেন। বিদ্যালয়ে ধনী দরিদ্র দুই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীই ছিল। কাইলহাউর স্থাপিত নিয়মানুসারে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকেই একজাতীয়

খাদ্য দেওয়া হোত। তাঁর প্ররোচনায় কতিপয় বালক অপেক্ষাকৃত উচ্চ-শ্রেণীয় খাদ্য দাবী করাতে ফ্রোএবল তাদের শাস্তি দিলেন। ফলে, তারা বিদ্যালয় ত্যাগ করলে। উক্ত শিক্ষক মহাশয়ও তাঁদের ও অন্যান্য গুটিকতক ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে ফ্রোএবলের বিদ্যালয়ের অপর পার্শ্বে একটা স্বতন্ত্র শিক্ষা গৃহের পত্তন করেন। বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। যদিও অবিলম্বে ব্যারপ নামক জনৈক তরুণ শিক্ষক এই সময় ফ্রোএবলকে প্রচুর অর্থ দিয়ে না সাহায্য করতেন, তাহলে যে তাঁকে সপরিবারে দেউলিয়াত্ব গ্রহণ করতে হোত এবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির জন্ম হয় এই সময়-ফ্রোএবলের 'হেল্‌বা পরিকল্পনা' থেকে। মাইনিঙ্গেনের ডিউক বহু পূর্ব্বেই হেল্‌বা নামক স্থানে ফ্রোএবলকে এমন একটা বিদ্যালয় স্থাপন করতে অনুরোধ করেছিলেন যেখানে অল্পবয়স্ক বালকবালিকা এবং অশিক্ষিতা ও অনাথা স্ত্রীলোকদের সমযোগে শিক্ষিত এবং কর্মনিপুণ করে তোলা যেতে পারে। চিত্রবিদ্যা, কুটিরশিল্প, কাষ্ঠে খোদা ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হ'লেও, 'ইউটিলি-টারিয়ান' পন্থায় শিক্ষার অনুসরণ করা ফ্রোএবল কোন দিনই যুক্তি বলে মনে করেন নি। পত্রে একদা তিনি ডিউক পুঙ্গবকে লিখেছিলেন, "শিক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী হওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। বিদ্যালয় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করবে, পেশাদার 'ট্রেনিং স্কুল' হবে না।' তাঁর সদ্য সংস্থাপিত বিদ্যালয়ের ভ্রূণটীকে তিনি প্রথমেই 'কিণ্ডার গার্টেন' নামে অভিহিত করেন নি। তাঁর নিজের ভাষায় সেটী ছিল "শিশু মনের সক্রিয় উৎপ্রেরণা পরিচালিত শিক্ষায়তন।" এই বিদ্যালয়ের প্রধান নির্ঘণ্টপত্র ছিল, হাতে-কলমে "সৃষ্টিমূলক কার্য্যাবলী" সম্বন্ধে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদান করা। এর তর্কঘটিত এবং কার্য্যঘটিত দুটো দিকই ফ্রোএবল উত্তমরূপে পূর্ব্বাহ্নে বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন। উপযুক্ত সাহায্য হ'তে বঞ্চিত না হ'লে, সম্ভবতঃ ফ্রোএবলের 'হেল্‌বা পরিকল্পনা' আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হোতো। কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষ মণ্ডলীর প্ররোচনায় মাইনিঙ্গেনের ডিউক মহোদয় ফ্রোএবলের প্রতি অসন্তুষ্ট হ'লেন। অনর্থক বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায় ফ্রোএবল "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনাৎ' নীতি অবলম্বন করলেন। এই ঘটনার পর আমরা তাঁকে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে বার্গডফ জিলার একটি নর্ম্মাল স্কুলের* পরিচালক হিসাবে দেখ্‌তে পাই।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রোএবল্‌ সুইট্‌জারল্যাণ্ড ত্যাগ করে জার্ম্মানীর বিভিন্ন শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন ক'রে বেড়ান। তাঁর অনুপস্থিতিতে মিডেনডফ ও ফ্রোএবলের ভ্রাতুষ্পুত্র কার্ডিনাণ্ড্‌ উইলিসাউএর শিশু-বিদ্যালয়টী দেখা শুনো করেন। দীর্ঘকাল ভ্রমণ করে ফ্রোএবলের ধারণা হয় যে, এই শ্রেণীর শিশু শিক্ষায়তনগুলি—গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা জননীদের তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের দুরন্তপনার হাত থেকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যেই বিশেষ করে সুগঠিত করা হয়েছে। নিরাশচিত্তে তিনি পুনরায় তাঁর জন্মস্থান থুরিঙ্গিয়ার অন্তর্ভুক্ত ব্ল্যাকনবার্গ নামক গ্রামে ফিরে এলেন। এই থুরিঙ্গিয়াই হোলো তাঁর মনোমত কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর শৈশব ক্রীড়াভূমি।

বরাবরই ফ্রেডারিক ফ্রোএবলের আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি সম্পূর্ণাঙ্গ নির্দোষ শিশু বিদ্যালয়ের সংস্থাপন করা। [illegible] পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই তাঁর মনঃপূত হয়নি। তিনি কামনা করেছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত একাধিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্ততঃ যে কোন একটিও শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ, বোধ শক্তি আত্ম প্রতীতি এবং আত্ম-অভিব্যক্তি প্রভৃতি প্রবৃত্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির যথোপযোগী উৎকর্ষ সাধনে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হবে। শিশুদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিক উদারতাই হচ্ছে, ফ্রোএবলের মতে, "শান্ত, পবিত্র এবং অখণ্ডিত" প্রাণশক্তির প্রতীক। এ হেন বিদ্যালয়ের কি নাম দেওয়া যেতে পারে, তাই নিয়ে ফ্রোএবল যারপর নাই চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লেন। তাঁর পূর্ব্বের "শিশু মনের সক্রিয় উৎপ্রেরণা পরিচালিত শিক্ষায়তন" নামটী অনাবশ্যক ভাবে দীর্ঘ ও আড়ম্বরপূর্ণ বলে মনে হলো। তিনি অন্বেষণ করতে লাগলেন একটি অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ-বোধ্য সংজ্ঞার। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, ১লা মে এক পর্ব্বতে আরোহণ করার কালে সহসা তিনি "পেয়েছি, পেয়েছি। আমার নূতন বিদ্যালয়ের নাম হবে কিণ্ডার গার্টেন" বলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন। এখন ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই এই প্রণালী প্রচলিত ও সমাদৃত। প্রাচীন গ্রীসের বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ আর্কিমিডিস্‌ ও আমাদের দেশের মহাকবি বাল্মীকির পার্শ্বে ঋষি ফ্রেডারিক ফ্রোএবলের অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তি ও মৌলিকত্বের স্থান চিরদিনই স্থায়ীভাবে উজ্জ্বল হয়ে থাক্‌বে।

ফ্রোএবলের পদ্ধতি অনুসারে শিশুদের ক্রীড়ার সামগ্রীগুলিকে যথাক্রমে তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—(১) গোলক, (২) ত্রিকোণাকৃতি ঘনক্ষেত্র ও (৩) নল, চোঙ্গা ইত্যাদি। বল খেলা, ত্রিকোণাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা নকল গৃহ-শ্রেণী অথবা রথ্যাপরিবেষ্টিত নগরাদির নির্ম্মাণ করা এবং বর্দ্ধিষ্ণু অথবা গতিশীল প্রকৃতিবিশেষের মধ্যস্থলে সংযোগ-স্থাপনার্থ নানাআকারবিশিষ্ট ফাঁপা চুঙ্গী জাতীয় পদার্থ প্রভৃতি ব্যবহার করা তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলে নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলতেন, প্রকৃতি এবং শিল্প-কর্ম্ম হচ্ছে একত্রে এক মহান্‌ অখণ্ডতার প্রতীক এবং স্বয়ং পরমেশ্বর সেই অখণ্ডতার উচ্চতম আদর্শ। যতদূর মনে হয়, এর পূর্ব্বে সম্ভবতঃ কোন মনীষীই মনুষ্য মনের উপর মাত্র এই প্রকার কয়েকটী তুচ্ছ বস্তুর সাহায্যে তাঁর পরিকল্পনাকে এমন সুন্দরভাব স্থায়ী করে রাখতে সমর্থ হন নি। বর্ত্তমান বৈষয়িক শিক্ষা ক্ষেত্রে ঈশ্বর দর্শন-বাদের স্থান অতি নিম্নে। আধুনিক কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী বলতে আমরা যা বুঝি তা ফ্রোএবল-প্রবর্ত্তিত প্রণালীর বিকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশমাত্র।*

* যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা অধ্যাপনা কার্য্য শিক্ষা করেন। তুলনীয়: অধুনা গুরু-ট্রেনিং, টিচার্স ট্রেনিং ইত্যাদি শিক্ষা বিভাগ সমূহ।

* দ্রষ্টব্য, Susan E. Blow লিখিত Educational Issues in the Kindergarten (Appleton, 1908, pp. 52-53).

৭ই অগাষ্ট, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে, প্রশিয়ার রাজসরকার এক ইস্তাহারের দ্বারা জার্ম্মানীর সমস্ত কিণ্ডারগার্টেন স্কুল ও কলেজ বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন। গভর্ণমেণ্টের সন্দেহ হয় যে, শিক্ষার নাম করে ফ্রোএবল হয়ত দেশের রাজার বিরুদ্ধে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রমণ্ডলীকে নিয়ে তাঁদের অজ্ঞাতসারে কোনও রাজনৈতিক দল গড়ে তুলছেন। এর কারণও ছিল। ফ্রোএবলের ভ্রাতুষ্পুত্র কার্ল ইদানীং সমাজতন্ত্রবাদী হয়ে উঠেছিলেন এবং ফ্রোএবল ও তাঁর বিদ্যালয়ে সাম্যবাদী প্রথায় শিক্ষা দেওয়ার মাত্রাটা কথঞ্চিৎ বৰ্দ্ধিত করে তোলেন। যাই হোক, ফ্রোএবল ও তাঁর বহু প্রতিপন্ন আত্মীয়বন্ধুর শত প্রচেষ্টাতেও সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলেন না। রাজার নিকট আবেদন করা গেল বটে, কিন্তু সে আবেদনও অগ্রাহ্য হোল। তার পরের বৎসর ফ্রোএবলের মৃত্যু হয়। এই নিদারুণ আঘাতের ফলে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেও, সরকারের দমন-নীতিই যে তাঁকে পরিণামে হত্যা করে, এমত উক্তি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সরকার দণ্ডাজ্ঞা বাতিল করে দেন। কেবল জার্ম্মানীর মধ্যে নয়, ইউরোপের নানা অংশে এইবার কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি বিস্তৃত হয়ে পড়লো। এর জন্য সমস্ত প্রশংসা বার্থা ফন্ মারেন হোলৎজ্—বুইলো নাম্নী জনৈকা ভদ্রমহিলার প্রাপ্য।* মারেন হোলৎজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীযুক্তা রঙ্গে (লণ্ডন, Prince Albert's Exposition), ইসিনর হিয়ারভর্ত্ত (আন্তর্জ্জাতিক কিণ্ডারগার্টেন সংসদের উদ্যোক্তা), আডেল ফন্ পর্ত্তুগাল (ম্যাঞ্চেষ্টার), এলিজাবেথ পিবডি (ফ্লোরেন্স) প্রমুখ নারীবৃন্দ ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, লোজান, জেনেভা, হলণ্ড, বেলজিয়াম ও ইতালীর সকল স্থানে কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর প্রচার করেন। জগৎপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স্ (দ্রষ্টব্য, তৎ-সম্পাদিত Houschold words পত্রিকা, ১৮৫৫), ঐতিহাসিক (ফরাসী) মিশেলে, সম্পাদক জঁরিয়েৎ ব্রেম্যাঁ ও গ্যারিবলদীর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণও একবাক্যে এর উপকারিতা সমর্থন করেন।

ক্রমোন্নতি অনুসারে, কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত কুলজিটীর সাহায্যে আলোচনা করা গেল :—
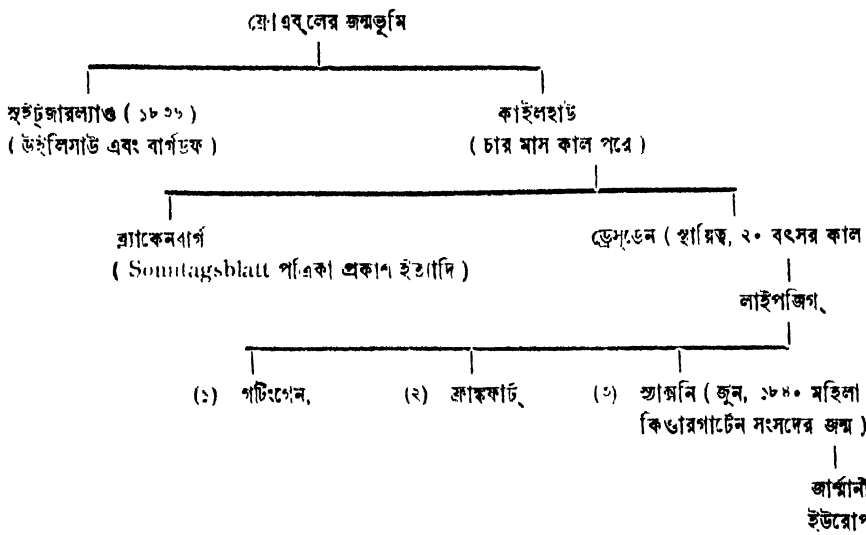
ফ্রোএবলের মনোবিজ্ঞান : শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রীড়ার গুরুত্ব : 'নার্শারী স্কুল' বা শিশু-লালন-প্রকোষ্ঠ :—

ফ্রোএবল বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে শিশু-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন নি। প্রয়োজনানুরূপ অভিজ্ঞতা ও রীতি—সম্মত জ্ঞান ও তাঁর ছিল না। রুশো, পেষ্টালজি ও টিডম্যান্ (১৭৮৭) তাঁদের স্ব স্ব সন্তান-সন্ততির মানসিক বাড়বৃদ্ধির দৈনিক খতেন রাখবার প্রয়াস পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু একমাত্র ডারউইন ভিন্ন উক্ত পরিকল্পনাকে আর কেউ কাযতঃ ফলপ্রসূ করে তুলতে সক্ষম হ'ন নি।

মনস্তাত্ত্বিক না হ'লেও ফ্রোএব্‌লের যে একটা নির্দ্দিষ্ট মতবাদ ছিল, তত্ত্বজ্ঞানের দিক থেকে তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর দর্শনশাস্ত্রানুসারে, প্রত্যেক শিশুই এক একটী সেন্দ্রিয় জৈব শক্তির প্রতীক। ব্যক্তিবিশেষ যেমন সমগ্র মানব জাতির অঙ্গ, শরীরের বিভিন্ন অংশও তেমন মনুষ্য দেহের অন্তর্বিধ প্রতিনিধি ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সম্পূর্ণতাবোধই …মানবজীবনে আনয়ন করে ভূমারি সন্ধান—যাঁর চরম পরিণতি হচ্ছেন ঈশ্বর স্বয়ং। অসম্পূর্ণতার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে কালক্রমে আমরা আপন আপন সত্ত্বাকে উপলব্ধি করি। বাল্যকাল বা শৈশবাবস্থা সেই আত্মোপলব্ধির প্রথম সোপান—কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব তার অন্যান্য তিনটী ক্রমোন্নতি মাত্র। শিশুমন স্বভাবতঃই কল্পনাপ্রবণ ও প্রকৃতি-সিদ্ধ-

---

* ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রোএবলের সংস্পর্শে আসেন। উচ্চশিক্ষিতা অশেষ গুণসম্পন্না নারী। তাঁর লিখিত Reminiscences of Friedrich Froebel নামক গ্রন্থ সর্ব্বজনসমাদৃত ও বহুপঠিত। শ্রীযুক্তা হোরেস ম্যান গ্রন্থখানি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

ভাবে অপরিণামদর্শী। কবির ভাষায়, তার সদা-সক্রিয়মন একটাকিছু করতে হবে বলেই করে। জলে জাল নিক্ষেপ করলে মৎস্য উঠবে কিনা সে সম্বন্ধে সে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত নয়। কথামালার 'অনধিকার চর্চ্চাকারী বানরের মতো' জাল নিয়ে নাড়াচাড়া করাতেই তার উল্লাস। 'নহি-কশ্চিৎ বালকঃ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ'। শৈশবকালের এই পরমচাঞ্চল্যই তার পরবর্ত্তী জীবনে মহাজ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়। এই মহাজ্ঞানই কর্ম্মলব্ধ ফল।*

এক কথায় 'ক্রীড়া' বলতে সাধারণতঃ আমরা কি বুঝি, তার সম্যক ব্যাখ্যা করা সত্যই কঠিন। স্থূলতঃ ক্রীড়া অর্থে মানব-জীবনের স্বতস্ফূর্ত্ত গতিবিধিকে সূচিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু ক্রীড়ামাত্রই নির্দ্দোষ হয় না, এবং সকল প্রকার ক্রীড়াই আনন্দদায়ক নয়। শৈশবকালে বালক-বালিকাগণ অনেক স্থলে বয়স্ক ব্যক্তিদের কার্য্যকলাপ অনুকরণ করে। তাতে তারা পায় আমোদ ও কৌতুক। এও একজাতের ক্রীড়া। আবার বৃদ্ধ-বয়সে নর-নারী বিশেষ শিশুবৎ আচরণ করে পুলকিত বোধ করেন। এই শ্রেণীর প্রত্যাবৃত্ত কার্য্যকলাপও ক্রীড়া ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। ফ্রোএবলের মতে শিশুদের ক্রীড়া হচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ মহত্তর জীবনের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও জটিল সমস্যার প্রারম্ভ ঊর্দ্ধাধঃ-স্থাপিত ধাপমাত্র। কবি স্কিলেয়র বলেছেন, 'ক্রীড়ার জন্ম নিরলস্ কল্পনার ক্রোড়ে। সিংহ যখন ক্ষুধা বোধ করে না অথবা যখন অন্য কোনও পশু বা শিকারী তাকে আক্রমণ করে না, তখন সে কেবলমাত্র অবিশ্রাম গর্জ্জন করেই খুসী হয়।'† ঔপন্যাসিক জীনপল রিক্‌টারের মতে, 'ক্রীড়া হচ্ছে মানুষের অপরিমিত মানসিক ও দৈহিক শক্তির বাঁধ-ভাঙ্গা অভিব্যক্তি।'* হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারও তাঁর সঙ্গে একমত।† বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মরিট্‌জ্ ল্যাজারাস্ লিখেছেন, 'আমরা শ্রান্ত বা ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমাদের হৃত উৎসাহকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার জন্যে তামাসা কৌতুকের প্রয়োজন হয়। একেই বলে ক্রীড়া।' ডাঃ কার্ল গ্রুসের মতানুযায়ী, ক্রীড়া শিশুর পরবর্ত্তী বয়স্ক-জীবনের বিভিন্ন গতিবিধির পূর্ব্বাভিনয়। বয়সের অনুপাতে তা থাকে অনলঙ্কৃত ও অকৃত্রিম; বয়োবৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি হয় তার নৈপুণ্য এবং দক্ষতা। জীব জন্তুর ন্যায় শিশুও উদ্দেশ্য না বুঝে প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়ে কাজ করে। ক্রীড়া বলতে এই জাতীয় প্রবৃত্তিমূলক কার্য্যাবলীকেই বুঝিয়ে থাকে। ষ্টান্‌লি হল ডাঃ গ্রুসকেই সমর্থন করে বলেছেন, যে ক্রীড়াকালে শিশু তার অজ্ঞাতসারে কেবলমাত্র মানবজাতির আদিমাবস্থার পৃথক পৃথক ধর্ম্মের সংক্ষেপে পুনরুক্তি করে থাকে। উইলহেল্‌ম্ অগাষ্ট ফ্রোএবল কিন্তু ক্রীড়ার বিবৃতি দিয়েছেন সম্পূর্ণ অন্যভাবে। তিনি বলেছেন ক্রীড়া শিশু মনের চেতনাশক্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গীয় আবেগসমূহের প্রকাশ পথ। সেই কারণে শিশুর নিত্য নূতন সঙ্গী, ক্রীড়ার উপাদান এবং উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের আবশ্যক। ক্রীড়া ও শিক্ষা-মূলক কার্য্যের মধ্যে যে কোনরূপ প্রভেদ থাকুক, এ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। শিশুর মূল্যবান অব্যক্ত অন্তর্বল যাতে নিরর্থক না ব্যয়িত হয় সেই উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষার মধ্য দিয়ে ক্রীড়ার নয়, ক্রীড়ার মধ্য দিয়ে যাতে শিক্ষার প্রসার হয় তার প্রচেষ্টা করেছিলেন।

* হার্ব্বার্ট, লক, ডারউইন এবং জন ডিউই প্রভৃতির মনস্তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিশ্লেষণমূলক ও বিজ্ঞানসম্মত। ফ্রোএব্‌লের অধ্যাত্মবাদ তাঁরা সমর্থন করেন নি।

† Letters (on aesthetics) ২৭ নং।

* Levana (১৮০৭)

† Principles of Psychology.

বহুরূপী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নতুন উর্দ্দিপরা পুলিশ-সার্জ্জেণ্ট আকুমেনাফ বাজারে টহল দিচ্ছে···তার বগলে এক-তাড়া কাগজপত্র···পিছনে একজন কনষ্টেবল। কনষ্টেবলের হাতে একটা পাত্র···পাত্রে একরাশ গুজরেরি···পথে বসে কোন্ ফিরিওয়ালা বিক্রী করছিল···রাস্তাবন্ধীর অপরাধে পুলিশ ওগুলো নেছে কেড়ে।

বাজার নিঝুম নিস্তব্ধ···জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই পথে। শান্তিরক্ষীরা শান্তি রক্ষায় নেমেছে।···একটা ভিখারীকে পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বাড়ী ঘর দোকান···নীরবে দাঁড়িয়ে আছে···যেন ভগবানের উদ্দেশ্যে বিচার প্রার্থনা করছে মৌন স্তব্ধ ধ্যানীর মতো।

হঠাৎ ওদিকে একটা চীৎকার···হুঁ—হুঁ—হুঁ···কামড়াবি ···কামড়াবি আমায়।···না, না, না ছেলেরা, ওকে ছেড়োনা ···ছেড়োনা। পথের লোককে কুকুরে কামড়ালে আইনে এখন আর ছাড়ান নেই। ধরো···ধরো···

সার্জ্জেণ্ট উৎকর্ণ···উদগ্রীব···একটা কুকুরের চীৎকার শুনলো কানে···চেয়ে দেখে পিঙগিণের কাঠের গোলা থেকে একটা কুকুর আসছে ছুটে, আর তার পিছনে একজন জোয়ান লোক···কুকুরটিকে ধরবে বলে তাড়া করে আসছে। লোকটার জামার বোতাম খোলা···ঘর্ম্মাক্ত দেহ···লোকটা ধড়াস্ করে গেল পড়ে···সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের পিছনের পাখানা ধরেছে চেপে···মুখে আক্রোশ করে বলছে—তোমাকে ছাড়ছিনা···আমাকে কামড়ানো···হতভাগা কুকুর!

সার্জ্জেণ্ট এলো সামনে, বললে—ব্যাপার কি?

লোকটি বললে—ছাখোনা, সার্জেণ্ট-সাহেব···আমার আঙুল কামড়ে দেছে···রক্তারক্তি!

লোকটি দেখালো তার আঙুল···রক্ত ঝরছে···

সার্জেণ্ট বললে—কি করে কামড়ালো?

লোকটি বললে—আমার ঐ কাঠের গোলা···গোলায় সেঁধিয়েছিল···যেমন আমাকে দেখা, তেড়ে এসে আমার আঙুলে কামড়!···কাঠ কেটে দিন গুজরাণ করি সার্জেণ্ট-সাহেব···এখন বলো তো···আমার যে আঙুল গেল আমার দিন চলবে কি করে?

—হুঁ। সার্জেণ্ট বললে—কার কুকুর?

কাঠওয়ালা বললে—কি করে জানবো! বলো, এমন করে যে কুকুর ছেড়ে দেছে··মানুষকে কামড়ে বেড়াবে···তাও আমার নিজের হাতায়···এর খেশারৎ নেই! কুকুরের মালিকের সাজা নেই?

—নিশ্চয়। মালিকের জরিমানা হবে। তোমাকেও দিতে হবে খেশারৎ···কনষ্টেবল্, সন্ধান নাও···কার কুকুর···তার নামে কেশ হবে···কুকুরটা পাগলা মনে হচ্ছে···ওকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে।

তখন বাজারে বেশ ভিড় জমেছে···ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন বলে উঠলো—ও তো জেনারেল-সাহেবের কুকুর।

—বটে! কথাটা শুনে সার্জেণ্ট তার উর্দ্দি খুলে কনষ্টবলের হাতে দিলে, বললে—ভারী গরম লাগছে।···কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছিনা···

সার্জেণ্ট তাকালো কাঠওয়ালার পানে···বললে—তোমাকে এ কুকুর হঠাৎ কেন কামড়াবে! বড় লোকের কুকুর···সহবৎ জানে। নিশ্চয় তুমি খোঁচা দিয়েছিলে! তাছাড়া ছোট কুকুর···তোমার আঙুলের নাগাল পেলো কি করে যে কামড়ালো! তোমার ফন্দীবাজী···বড় লোকের কুকুরকে দিয়ে আঙুল কামড়িয়ে টাকা আদায় করতে চাও! খেশারতী। হুঁ!···ছোটলোক ব্যাটাদের হাডহদ্দ তো আমার জানতে বাকী নেই।

ভিড়ের ভিতর থেকে আর একজন বললে—সত্যি কথা···বড়লোকের কুকুর···সে কি কামড়াতে জানে!···নিশ্চয় ওর গায়ে জলন্ত সিগারেটের ছ্যাকা-ট্যাকা দিয়েছিল, তাই···

কাঠওয়ালা বললে—চুপ করো, মিথ্যাবাদী কোথাকার। তুমি দেখেচো···আমি ওকে ছ্যাকা দিয়েছি!···সিগারেট কোথায় আমার হাতে, এ্যাঁ! শোনো সার্জেণ্ট-সাহেব···এই আমার কামড়ানো আঙুল···আর ঐ কুকুর···তুমি কোর্টে চলো—হাকিম বিচার করে যা হয়···এখন আইনের চোখে আমরা সকলে সমান···ধনী-গরীব বলে তফাৎ নেই···স্বাধীন গণতন্ত্র···আইনের চোখে সকলে এক···সকলে সমান! তাছাড়া আমি কাঠের কারবার করলেও আমার এক ভাই করে পুলিশে চাকরি···কনষ্টেবলের চাকরি!

সার্জেণ্ট দিলে ধমক—চুপ রহো!

কনষ্টেবল বললে—না সার্জেণ্ট-সাহেব, এ কুকুর তো জেনারেল সাহেবের কুকুর নয়! এ জাতের কুকুর নেই তাঁর মোটে!

সার্জেণ্ট বললে—ঠিক জানো?

—ঠিক জানি আমি।

সার্জেণ্ট বললে—আমিও জানি। জেনারেল সাহেবের সব দামী-দামী কুকুর···ইয়া বড় বড়···ভালো জাতের কুকুর সেগুলো।···এটা তো নেড়িকুত্তা। গলায় দেখছি বগলশ···তাহলে বেওয়ারিশ নয়। সহরের পথে এমন কুকুর যে ছেড়ে দেয় তার সাজা হওয়া উচিত।···আইনে বলছে—কেউ পথে কুকুর ছাড়বে না···ছাড়লে সাজা হবে।

কাঠওয়ালার পানে চেয়ে সার্জেণ্ট বললে—থাক—এসো···তুমি না পার···কেস্ লিখিয়ে এখনি আমি মালিককে করবো গ্রেফতার।

কনষ্টেবল বললে—কিন্তু এ কুকুর জেনারেল সাহেবের কি না···সঠিক খবর না নিয়ে···

ভিড়ের ভিতর থেকে দু'চার জন লোক একসঙ্গে বলে উঠলো—নিশ্চয় এ জেনারেল সাহেবের কুকুর···আমরা জানি।···

সার্জেণ্টের বুকখানা ধড়াশ করে উঠলো।···যখন কথা উঠেছে···সঠিক খবর না নিয়ে কেস লেখানো···

শেষে চাকরি খোয়াবে!

সার্জেণ্ট বললে কনষ্টেবলকে—আমার উর্দ্দি দাও। তুমি এক কাজ করো—কুকুর নিয়ে জেনারেল সাহেবের বাড়ী যাও আগে···যদি তাঁর কুকুর হয় বলো, পথে ঘুরছিল

আমরা দেখে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর চাকরবাকরদের বলে দিয়ো…কুকুরকে যেন আটকে রাখে…পথে না বেরিয়ে আসে। দামী কুকুর…চুরি যেতে পারে! তাছাড়া কেউ যদি মারেধরে…কুকুরটা মরে যাবে। যাও…

কাঠওয়ালা বললে—আমার আঙুল?

সার্জেণ্ট তাকে দিলে একটি গুঁতো…গুঁতো দিয়ে বললে—বদমাস…কুকুরকে খোঁচা দেবে…আর কুকুর তোমাকে কামড়াবে না—? মুখে চুমু খাবে!

পথে আসছিল জেনারেল সাহেবের বাড়ীর বাবুর্চি…কে একজন বলে উঠলো—এই তো জেনারেল সাহেবের বাবুর্চি—ওকে জিজ্ঞাসা করলেই তো চুকে যায়।

বাবুর্চিকে ডাকা হলো—বাবুর্চির নাম প্রোখোর। সার্জেণ্ট বললে—তোমাদের কুকুর এটা?

কপাল কুঁচকে অবজ্ঞা ভরে বাবুর্চি বললে—কস্মিন কালে নয়। জন্মে এ কুকুর আমরা দেখিনি।

সার্জেণ্ট বললে—আমি গোড়া থেকে বলচি, নেড়িকুত্তো …কোন্ বেটা ভিখিরী হয়তো পুষেছে…

বাবুর্চি বললে—এটা গ্রেহাউণ্ড…আমাদের সাহেবের গ্রেহাউণ্ড নেই, তাঁর ভাইয়ের আছে বটে গ্রেহাউণ্ড! হুঁ…এ আমাদের সাহেবের ভাইয়ের কুকুর। আজই সকালে তিনি আমাদের ওখানে এসেছেন যে।

সার্জেণ্ট বললে—তিনি এসেছেন!…

—হুঁ…ইন্‌সপেকশনে!

—বটে! তাই বলো! এ কুকুর বড় জাতের… বোনেদী কুকুর…দেখলেই চেনা যায়। সার্জেণ্ট বললে—কাঁপছে দেখছো…ভয়ে। আহাহা…অবোলা জীব। ওকে বেশ পীড়ন করেছে এই কাঠওয়ালা বেটা…

দু চোখে অগ্নিবর্ষণ করে সার্জেণ্ট তাকালো কাঠওয়ালার পানে, বললে—ভাগ!…খেশারৎ আদায় করবি! উঁ…বেটা…মিথ্যা নালিশের দায়ে তোমাকে আসামী বানিয়ে কোর্টে দেবো চালান…শায়েস্তা হবে। চলো প্রোখোর…কুকুর আমি নিজে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের ওখানে…সাহেবের ভাইকে অমনি সেখানে জানিয়ে আসবো।…

(রুশ গল্প : শেকভ)

মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিত্ব

শ্রীশান্তশীল বিশ্বাস

ব্যক্তিত্ব কি? এ নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে ও দর্শনক্ষেত্রে এক ধরণের আলোচনা হয়েছে, মনস্তাত্বিকেরা এ নিয়ে গবেষণা করেছেন যথেষ্ট।

সাধারণতঃ আমরা ব্যক্তিত্ব কথাটি যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যেমন রাজনীতি সাহিত্য ইত্যাদিতে—বড় হয়েছেন শুধু তাঁদের প্রতিই আরোপ করি; যেমন বলি গান্ধিজীর ছিল ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। কিন্তু মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখি ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি মাত্রেরই আছে। যদিও এর আসল সংজ্ঞা কি হবে তা বলা খুবই শক্ত। যাই হোক সমাজ মনস্তাত্বিক-প্রবক্তা ফ্লইড, হেন্‌রী এলপোর্ট যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাকেই শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা বলে মেনে নিত হয় এবং তাঁর বিশ্লেষণকেও শ্রেষ্ঠ বলে মানতে হয়।

এলপোর্টের মতে ব্যক্তিত্বের অর্থ ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক প্রেরণোদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার বিশেষ ভঙ্গিমা এবং তার সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতার পরিমাপ।

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে দেখা যায় যে ব্যক্তিত্ব সমাজগত বিচার ও সম্বন্ধের সঙ্গে জড়িত। যে কোনও ব্যক্তি সমাজস্থ না হলে তার ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন ওঠে না এবং তার ব্যক্তিত্বের বিচার ঠিক 'নীরব কবি' কথাটির মতই অর্থহীন; শুধু তাই নয় ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপেই সামাজিক প্রতিক্রিয়ারই ফলাফল তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিত্বের প্রদর্শন ও বিচারের কথা ছেড়ে দিলেও তার জন্মোত্তর বিকাশ ও প্রসার দায়ী সম্পূর্ণভাবে তার সামাজিক সমাবেশের ওপর। আজকের দিনের 'মনঃসমীক্ষণ' ব্যক্তির আশৈশব প্রভাবের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে।

এখন দেখা যাক ব্যক্তিত্ব কিসের ওপর নির্ভরশীল। প্রধানতঃ ব্যক্তিত্বের উৎসকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে, (ক) জন্মপ্রাপ্ত দৈহিক কারণ এবং (খ) পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মারফত অভ্যাসগত বিকাশ।

অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে এ দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ব্যক্তিত্ব উভয়েরই মিশ্রণফল।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো (ক) এর অন্তর্গত।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা, স্নায়ুতন্ত্রের নমনীয়তা, শরীরতাত্বিক বিশেষত্ব যেমন কর্ম্ম ক্ষমতার গতিবেগ ও সমন্বয়, বিভিন্ন গ্রাণ্ডের হরমন নিস্কাশণ ক্রিয়া, দেহের গঠন বৈশিষ্ট—স্থূলতা, সৌন্দর্য্য অথবা বিকলতা, বর্ণ ইত্যাদি। ইহারা ব্যক্তিত্বের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে।

আর (খ) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে—

(১) বুদ্ধি—স্থূলভাবে বিচার করলে বুদ্ধির অর্থ—যে কোনও সমস্যা যা প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে আসে, তার সমাধানের পথ খুঁজে বার করবার ক্ষমতা। অবশ্য এই 'বুদ্ধি' ক্ষমতার মধ্যে আরও নানা ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সেইজন্য স্পিয়ারম্যান একে সাধারণ ক্ষমতা ('G' Factor) বলে বর্ণনা করেছেন। আবার এই বুদ্ধির প্রকার ভেদ নিয়েও অনেক মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের অবতারণা হয়েছে। সে যাই হোক, বুদ্ধি যে ব্যক্তিত্বের একটা মোটা পুঁজি এতে সন্দেহমাত্র নেই।

(২) গতি উৎপাদক শক্তি— অর্থাৎ গতিসঞ্চালক বৈশিষ্ট্য, কার্য্যের গতি, মনের উত্তেজনা ও সংযম। এই সব গুণের পরিচয় পাওয়া যায় অনেক ব্যক্তির কার্যাভঙ্গিমা ও কার্য্য সম্পাদনের মধ্যে; আবার অনেকে আছেন যাঁরা ঠিক এর বিপরীত ধরণের; প্রায় সব কাজেই দেখা যায় তাঁরা অতিধীরগতি, কার্য্যক্ষমতা বায়ে তাঁদের কার্পণ্য ও সামান্য বাধা বিপত্তিতেই তাঁরা হয়ে পড়েন ম্রিয়মান। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গুণশালী ব্যক্তিরা রাখেন—যে কোনও বাধাকে ঠেলে ফেলার দুর্জয় সাহস ও প্রচেষ্টা। এই সব গুণ অনেক জননেতার মধ্যে দেখা যায় এবং এই সব গুণ তাঁদের ব্যক্তিত্বকে দেয় গুরুত্ব ও করে প্রসারিত। এই সব গুণের বিচার করা যায় আরও কতগুলো দিক থেকে, যেমন, (ক) কোনও বিশেষ কার্য্যের গুণগত ও পরিমাপগত পারদর্শিতা যদিও জন্মগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল অনেকখানি—তবুও অভ্যাস, সমন্বয়-ক্ষমতা ও গতিসংযম দ্বারাই বৈশিষ্ট্যলাভ করে। (খ) ব্যক্তিগত ভঙ্গিমা—বাক্যপ্রকাশের ও কার্য্য সম্পাদনের নিজস্ব ভঙ্গিমা—শৈশবকাল থেকে যা গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে থাকে।

(৩) ব্যক্তির প্রকৃতি অর্থাৎ তার ভাবাবেগ ও অনুভূতির বিশেষ ধরণ যা মানসিক গঠনধারাকে প্রভাবান্বিত করে ব্যক্তিত্বের ওপর আরোপিত হয়। অবশ্য এই ভাবাবেগ ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্যকে বিচার করার নানা দিক আছে, যেমন অনুভূতির ও ভাবাবেগের স্থায়িত্ব, পরিবর্তন, দৃঢ়তা ও প্রস্তুতি ইত্যাদি।

(৪) আত্মপ্রকাশ—নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা ব্যক্তিমাত্রেরই চিরন্তন স্বভাব, এই আত্মপ্রকাশের চেষ্টাকে দু ধারাতে ভাগ করা যায়। এক হচ্ছে মানুষের অনুভূতির প্রকাশ, আর হচ্ছে নিজের নাম, গরিমা ও নিজের অস্তিত্ব ও বিস্তৃতির প্রকাশ (Expansion of Ego)। এই আত্মানুভূতির প্রকাশ প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছে মানুষের কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীত। সম্রাট অশোক তাঁর অহিংসা ও প্রেমানুভূতিকে করতে চেয়েছিলেন মানুষের মনে বিস্তৃত, তাই তিনি পাঠিয়েছিলেন নানা দেশে ও প্রদেশে প্রচারক দল—গড়েছিলেন স্তম্ভ, প্রস্তরফলক। 'কালের কপোলতলে শুভ্রসমুজ্জ্বল এ তাজমহল' প্রেমানুভূতির প্রতীক হয়ে চিরতরে বেঁচে থাকে এই ছিল মোঘল সম্রাট সাহাজাহানের অন্তরে, এমন ত কত সাক্ষ্য মেলে ইতিহাসের পাতায়। অতি সাধারণভাবে দৃষ্টিপাত করলেও এই আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টার পরিচয় যত্রতত্রই মেলে, যেমন কোনও দ্রষ্টব্য স্থানে দেখা যায় নিজের নাম, ধাম, ঠিকানা লেখার ছড়াছড়ি; এ সবই ত 'আমাকে জান' মানুষের এই চিরন্তন স্বভাবেরই অভিব্যক্তি। যাই হোক ব্যক্তিত্বের দিক থেকে এই কথা বলার আছে যে সমাজের মনে এই আত্মপ্রকাশের প্রতিফলন হয়ে ব্যক্তিত্বকে দেয় বৈশিষ্ট্য ও অনেক সময়ে করে উজ্জ্বলতর। এই আত্মপ্রকাশ প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত কয়েকপ্রকার মানসিক বৈশিষ্ট্যের বিন্যাস এখানে প্রয়োজন, বহির্বৃত্তি—অন্তর্বৃত্তি: (Extroversion—Introversion) (ডাঃ ইয়ুঙ্গের নামকরণ)। এক প্রকার মানুষ আছেন যাঁরা বাইরের জাগতিক ঘটনাতেই লিপ্ত ও মনোযোগী হন বেশী। নিজের মানসিক সুখ দুঃখকে তাঁরা বেশী ঠাঁই দেন না, আবার আর একরকম মানুষ আছেন যাঁরা নিজের মানবতা নিয়েই থাকেন বেশী ব্যস্ত, বাইরের ঘটনাপ্রবাহ তাঁদের কম স্পর্শ করে। এঁদের চিন্তাধারা থাকে মনগড়া ঘেরাটোপেই সীমাবদ্ধ।

অন্তদৃষ্টি: (Insight) নিজেকে যিনি যত বেশী জানেন, নিজের আসলরূপকে ভাল করে প্রকাশ করতে পারার সম্ভাবনা তাঁরই তত বেশী। কিন্তু এই অন্তদৃষ্টির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় মনের ভুয়ো যুক্ত্যাভাস (Rationalisation)। এই যুক্ত্যাভাস থেকে যে হতে পারে মুক্ত, তার অন্তদৃষ্টি হয় তত স্বচ্ছ, এর জন্য প্রয়োজন আত্মপ্রবঞ্চনাকে সরিয়ে 'আত্ম বিশ্লেষণ'।

নেতৃত্বভাব—অনুগমনবৃত্তি: (Ascendance—Submission) কেউ কেউ আছেন যাঁরা স্বভাবতই, 'নেতা' হয়ে বসেন সব জায়গাতেই—আর তাঁর পার্শ্বস্থ সবাই তাঁকে অনুকরণ ও অনুগমন করতে থাকেন। আর একরকম মানুষ আছেন যাঁরা সব সময় অন্যকে অনুগমন করে চলতে চান মাত্র।

ক্ষতিপূরণ: (Compensation)—পৃথিবীতে সবাই ত আর সব গুণের অধিকারী হয়ে আসেন না। কারো কারো থাকে কোনও কোনও দিকে হীনতা, তিনি তাকে পূরণ করে নিতে চান অন্যগুণের বিকাশে। যেমন দেখা যায় যিনি খর্ব্বাকৃতি তিনি হয়ত চান স্থূলাকার হতে। এই রকম ক্ষতিপূরণের সব চাইতে বড় ঐতিহ্য রেখে গেছেন বোধ হয় গ্রীক বাগ্মীশ্রেষ্ঠ ডেমসথেনিস, তাঁর বাগজড়তাই দিয়েছিল তাঁকে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হবার প্রেরণা।

বিস্তৃতি—সঙ্কুচন: (Expansion—Reclusion) কেউ কেউ আছেন যাঁরা চান সর্ব্বদাই নিজেকে জাহির করতে, তাঁদের কথাবার্ত্তায় 'আমি' আধিক্য থাকে অতি মাত্রায়। গল্প আছে—একজন বক্তা তাঁর বক্তৃতাতে 'I' শব্দটা এত বেশীবার ব্যবহার করেছিলেন যে তাঁর বক্তৃতা সংবাদপত্রে না ছাপার কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তারা বলেছিল যে তাদের তাঁর বক্তৃতাতে ব্যবহৃত অতগুলো 'I' অক্ষর নেই। আবার আর এক রকম ব্যক্তি আছেন যাঁরা এর ঠিক উল্টো ধরণের। তাঁরা অনেক বড় বড় কাজ করেও নিজেকে রাখতে চান সঙ্কুচিত করে লোকচক্ষুর অন্তরালে; যেমন দেখি অলিভার গোল্ডস্মিথের লেখা চৈনিক দার্শনিক 'Man in black'এর চরিত্র।

(৫) সামাজিকতা: (Sociality) সমাজের সঙ্গে জড়িত, একীভূত না হলে ব্যক্তিত্ব হয় না ব্যাপ্ত, পরিস্ফুট ও বিচার্য্য। তাই সমাজের সঙ্গে

মিশবার ক্ষমতাও ব্যক্তিত্বের একটা দিক। জননেতা অথবা ডিপ্লম্যাট হতে গেলে ব্যক্তিত্বের এই গুণ থাকা একান্তই প্রয়োজন।

এবার আসা যাক্ ব্যক্তিত্বের পরিমাপে। গোড়ার দিককার মনস্তাত্ত্বিকরা (গ্রীস দেশীয়) ব্যক্তিত্বকে বিশেষ বিশেষ প্রকারভেদ করে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন—যেমন ফ্লাগমেটিক, কলেরিক, স্যানগুইন ও মেলানকলিক ইত্যাদি চার রকম ব্যক্তিত্ব হতে পারে বলে তখনকার দিনের মনস্তাত্ত্বিকেরা জোর দিতেন।

তারপর ক্রেসমার (Krestchmer) চেষ্টা করেছিলেন দেহ গঠন ভঙ্গিমার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ বার করে প্রকার ভেদ করতে। তারপর দেখি ডাঃ ইয়ুঙ্গকে—তিনি মোটামুটি দুইভাগে ব্যক্তিত্বকে ভাগ করে গেছেন—বহির্বৃত্তি ও অন্তর্বৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

আরও কেউ কেউ অন্যান্য ভাবে প্রকার ভেদ করে শ্রেণীগত ভাবে ব্যক্তিত্বকে বিচার করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা দেখলেন যে এভাবে শ্রেণীগত ভাবে পুরোপুরি ব্যক্তিত্ব বিচার হয় না বা সব রকম ব্যক্তিত্বকেই শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব নয়। তাই বর্ত্তমান মনস্তাত্ত্বিকদের ঝোঁক দেখা গেল গুণগতভাবে (according to traits) ব্যক্তিত্বকে বিচার করার দিকে এবং এই ভাবে বিচার করাটাই আরও বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণ হল। বর্ত্তমানে যে কোনও ব্যক্তির 'ব্যক্তিত্ব' বিচার করতে গেলেই তার প্রতিটি প্রয়োজনীয় গুণ কতটা পরিমাণে আছে অর্থাৎ প্রতিটি বিচার্য্য গুণ পাঁচ ধাপ (যেমন অতি উত্তম, উত্তম, মধ্যম, অধম, অতি অধম) বা দশ ধাপ মানের কোথায় স্থানলাভ করেছে তা আবিষ্কার করে নিয়ে নির্দ্দেশ (chart) গঠন করে ব্যক্তিত্বকে বিচার করা হল রেওয়াজ। এই ভাবে কোনও ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ গুণের স্থান নির্ধারণ করার জন্য সাধারণত দুরকম প্রণালী অনুসরণ করা হয়। এক হচ্ছে রেটিং মেথড অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক তার নিজের দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষার্থীর (Subject) ব্যবহারিক কায়দা, চলন, বলনের ভঙ্গিমা লক্ষ্য করে যে ধারণা হয়, সম্ভব হলে সেই ধারণাকে পরীক্ষার্থীর অতি পরিচিত সঙ্গীসাথী বা পরিবারজন যাঁরা অধিক সময় তার সঙ্গে মেশা-মেশির সুযোগ পান তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবরাখবরের সঙ্গে বা তাদের ধারণার সঙ্গে যাচাই করে নিয়ে পরীক্ষার্থীর বিচার্য্যগুণের মাপ (Measurement) কতখানি তা নির্ধারণ করেন। আর একরকম প্রণালী হচ্ছে গুণনির্ধারক প্রশ্নমালা প্রয়োগ করে উত্তরপ্রাপ্ত হয়ে সেই অনুপাতে অঙ্কদান (Score) করে তারপর তার স্থান নির্ধারণ করা। এই প্রণালীতে ব্যক্তিত্বের গুণবিচার করাটা অনেকটা সহজ এতে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া মোটামুটি ভাবে ব্যক্তিত্বের গঠন ধারাকে বিচার করার আরও নানা প্রণালী আজকের ফলিত মনস্তত্ত্বের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। কোন ব্যক্তি অনেকটা সমস্যাপূর্ণ বাস্তব অবস্থাতে কতখানি অবিচলিত থেকে সমাধান করতে সক্ষম হয়, তা গবেষণাগারেই কতকগুলো কৃত্রিম বাস্তব অবস্থাতে ফেলে দিয়ে তার বিচার করা যেতে পারে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সৈন্যবিভাগীয় নিয়োগ-কর্ত্তৃপক্ষ উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্ম্মচারী নিয়োগের সময় 'ব্যক্তিত্ব গঠন' বিচারের জন্য এই প্রণালীই অবলম্বন করে থাকেন।

কিন্তু শুধু উপরোক্ত প্রণালীগুলো দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিচার করা সম্ভব হলেও ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিচার করতে গেলে নির্জ্ঞান মনের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য ও গঠনও জানা প্রয়োজন কারণ নির্জ্ঞান মন অন্তরালে থেকেও ব্যক্তিত্বকে পুরোপুরি প্রভাবান্বিত করে। তাই ব্যক্তিত্ব বিচারের জন্য মনের এই নির্জ্ঞান দিকটার পরিচয় নেবার কতকগুলো মনস্তাত্ত্বিক প্রণালী আবিষ্কৃত হল। যেমন ইয়ুঙ্গ আবিষ্কৃত Word association test, Thematic apperception test, Inkblot or Rorschach test ইত্যাদি। এই অভীক্ষাগুলোর (Test) প্রয়োগ প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে নিয়ে আলোচিত হল। Word association test—ইহা প্রয়োগ করবার সময় পরীক্ষার্থীকে আরামপ্রদ ভাবে শুতে বলা হয় এবং পরীক্ষার কক্ষটি নির্জ্জন এবং ঈষৎ অন্ধকার হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ তা হলে পরীক্ষার্থীর মনকে কেন্দ্রীভূত করার সুবিধা হয়। তারপর একে একে পর পর সাধারণত একশটি শব্দ বলা হয়। পরীক্ষার্থীকে নির্দ্দেশ দেওয়া থাকে—প্রতিবারই শব্দ শোনামাত্র যে শব্দ বা চিন্তা মনে এলো, তা জোরে উচ্চারণ করবে, এবং সে তা করলে, লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এই রকম প্রতিক্রিয়া করতে যে সময় অতিবাহিত হয় তাও প্রতিবারই ষ্টপ ওয়াচে ধরে লিপিবদ্ধ করা হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিক্রিয়া করবার জন্য তাকে চিন্তাশীল হবার সুযোগ দেওয়া হয় না। যে শব্দগুলো দেওয়া হয় সেগুলো বহুল পরীক্ষাতে ও গবেষণাতে ঠিক উপযোগী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং প্রতিক্রিয়া শব্দেরও সম্ভব হিসাব মনস্তাত্ত্বিকরা সংগ্রহ করেছেন এবং এর মধ্যে কোন্ প্রতিক্রিয়া শব্দগুলো দ্বন্দ্বমূলক ও জটিলতা হেতু (due to complex) তা মনস্তাত্ত্বিকরা চিনে নিতে পারেন। এর জন্য প্রতিক্রিয়া কালের দৈর্ঘ্যও বিচার করা হয়। অবশ্য এ বিচারের জন্য মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকা প্রয়োজন।

Thematic apperception test: ইহা প্রয়োগ করা হয় কতকগুলো ছবির মারফত। এই ছবিগুলো পরীক্ষার্থীর সামনে পর পর দেওয়া হয় এবং প্রতিটি ছবির জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীকে ছোটগল্প বা রচনা লিখতে বলা হয়। এইভাবে সমস্ত ছবির ওপরই গল্প বা রচনা লেখা শেষ হলে সমস্ত লেখাগুলোর মধ্যে দিয়ে যে চিন্তাধারার ইঙ্গিত থাকে, অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক অনায়াসেই তা থেকে মানসিক গঠন বৈশিষ্ট্যকে চিনে নিতে পারেন। কিন্তু এই অভীক্ষার একটা অসুবিধা দেখা যায় যে ছবিগুলো বাস্তব কোনও ঘটনার প্রতিচ্ছবি হওয়ার দরুণ পরীক্ষার্থীর গল্পে বা রচনাতে বিষয়গত ছাপ কিছুটা থেকে যায়—যদিও ঐ বিষয়গত ছাপটাকে বিচার থেকে বাদ দেবার চেষ্টা সব সময়েই করা হয়ে থাকে।

এই অসুবিধাকে কাটিয়ে উঠার তাগিদেই এলো Rorschach test. এই অভীক্ষাতে পরিষ্কার বিষয়গত অর্থবোধক ছবি বাদ দিয়ে কতকগুলো অস্পষ্ট রূপ ও অর্থহীন কিম্ভূত কিমাকারে নানা বর্ণমিশ্রিত ছবি প্রয়োগ করা হয় এবং এই থেকে যে চিন্তার উদয় পরীক্ষার্থীর মনে হয় তা তাকে

বর্ণনা করতে বলা হয়। এতে যে চিন্তাধারা ও মানসিক বৈশিষ্ট্য প্রক্ষেপিত হয় তাতে বিষয়গত ছাপ অনেক পরিমাণে কম থাকে।

এ সকল প্রণালী ছাড়াও আজকাল বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষাগুলো নেওয়ার সঙ্গে যাতে মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিকটাও ধরা যায় সেইভাবে অভীক্ষা প্রস্তুত করবার চেষ্টা হচ্ছে এবং অতি আধুনিক Weschler Bellve test আমেরিকাতে খুবই কার্য্যকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। Matrices tist দিয়েও বুদ্ধি পরিমাপের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের কোনও কোনও দিক ধরা পড়ে।

ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন ও অবস্থার প্রভাব: ব্যক্তিত্বের কোনও রকম পরিবর্ত্তন হয় কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে কোনটাই ঠিক্ ভাবে বলা যায় না। কারণ অনেক ব্যক্তিকে তার জীবনের গোড়ার দিকে হয়ত একরকম বলে দেখা গেছে, হয়ত তাকে দেখা গেছে অত্যন্ত অন্তর্বৃত্তিসম্পন্ন, লাজুক ও অসামাজিক। কিন্তু তারপরে আবার সেই ব্যক্তিই হয়ে গেছেন এর বিপরীত ধর্ম্মী—খুবই সামাজিক, লজ্জাহীন ও বহির্বৃত্তিসম্পন্ন মানুষ—যেমন দেখি শ্রীজওহরলাল নেহেরুকে; তাঁর আত্মজীবনীতে যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে তিনি যে অন্তর্বৃত্তিসম্পন্ন ও লাজুকপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন তা বোঝা যায়। কিন্তু আজকের জওহরলালকে আমরা এর বিপরীত ধরণের মানুষই দেখি। অবশ্য এরকম পরিবর্ত্তন সব ক্ষেত্রেই ঘটে না। অনেক 'ব্যক্তিত্বই' দেখা যায় চিরকাল অপরিবর্ত্তিত থাকতে। আবার আর একরকম দেখা যায়—একই ব্যক্তি হঠাৎ আর একরকম 'ব্যক্তিত্ব' অবলম্বন করলেন এবং এই দুই রকম ব্যক্তিত্বের কোনও সামঞ্জস্যই থাকে না। এমনও দেখা যায়, একই ব্যক্তিকে একদিনের মধ্যেই কয়েকরকম সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন ব্যক্তিত্ব ধারণ করতে। এরকম ঘটবার একমাত্র কারণ নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্ব (conflict)—যেমন দেখা যায় 'ফিউগ' ইত্যাদি ধরণের মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বেলাতে। অনেক সময় কোনও কোনও প্রকার হিষ্টিরিয়া রোগীদেরও অল্প সময়ের মধ্যে বা অল্প সময়ের জন্য বিভিন্নধরণের ব্যবহারসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ধারণ করতে দেখা যায়। অনেক সময় এই ধরণের হিষ্টিরিয়া ফিটের আক্রমণ সময় ঐ সব ব্যক্তি অনেক রকম ক্রিয়াকলাপ, ভবিষ্যতবাণী ইত্যাদি করতে থাকেন; সাধারণ লোকে যাকে 'ভর' ওঠা বলে থাকে এবং ঐ ফিটের সময় ব্যক্তিত্বের এমন কতকগুলো দিক প্রকাশিত হয় যাতে সাধারণ লোকের মনে একটা 'সংবেশন প্রভাব' (Hypnotic effect) সৃষ্টি করে, তার অলৌকিক ক্ষমতাতেও ভবিষ্যতবাণীর সফলতাতে বিশ্বাসী করে থাকে।

আবার জনতার (Crowd) মাঝে মিশে অনেক ব্যক্তিত্বেরই হঠাৎ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কোনও কোনও সময় সাধিত হয়ে থাকে, এই পরিবর্ত্তনের প্রধানত দুটো লক্ষণ বিন্যাস করা যেতে পারে, প্রথমত জনতার সঙ্গে নিজেকে একীভূত করে ব্যক্তিবিশেষ হয়ে পড়েন অত্যন্ত ভাবাবেগী (Emotional)—আর দ্বিতীয়ত বুদ্ধিও যাঁর অনেক পরিমাণে কমে, তাই এমনি জনতার মাঝ থেকে অতি বিচক্ষণ লোকও অনেক সময় করে বসেন এমনি কাণ্ড, যা তাঁর নিজের কাছেও সাধারণ অবস্থাতে অসম্ভব, এমন কি হয়ত চিন্তারও বাইরে। একে কেউ কেউ 'ক্রাউড নিউরোসিস' বলেন, এ সবের কারণ নির্ধারণের স্থান এখানে নয়; অনুধাবন করবার শুধু এই যে এমনি ভাবেও ব্যক্তিত্বের ক্ষণস্থায়ী পরিবর্ত্তন হতে পারে; এ ছাড়াও অবশ্য অন্যান্য কারণেও ভাবাবেগ ও উত্তেজনার আধিক্যের ফলে ব্যক্তিত্বের কাঠামোর ক্ষণস্থায়ী পরিবর্ত্তন হতে দেখা যায়—যেমন একজন হয়ত ক্রুদ্ধ হলে যা করে বসেন যার সঙ্গে তার 'ব্যক্তিত্বের' সামঞ্জস্য কম। এ নিয়ে পূর্ব্বেও উল্লেখ করেছি। আর মানসিক রোগাক্রান্ত হলে ত ব্যক্তিত্বের সব কিছু নষ্ট হয়ে যেতে পারে—বিশেষ করে 'সাইকোসিস' শ্রেণীভুক্ত রোগে; নিউরোসিস শ্রেণীর রোগেও অনেকটা ব্যক্তিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কোনও ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে সর্ব্বত্রই একরকম হবে তা হয় না, যেমন আমরা দেখি নেতৃত্বের বেলাতে। নেতা হবার উপযোগী ব্যক্তিত্ব না থাকলে নেতা হওয়া যায় না কোনও ক্ষেত্রেই, তা হলেও এ রকম সব সময়েই দেখা যায়—যে ব্যক্তিত্ব একস্থানে সাধারণ জনের মনে বিশ্বাস, আদর্শ ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে নেতৃত্বপদ লাভ করেছেন, তিনিই হয় ত অন্যস্থানে বা অন্যক্ষেত্রে জনতার একজন ছাড়া বেশী কিছুই হতে পারেন না। অবশ্য এর কারণ নেতৃত্ব জিনিষটি শুধু 'নেতা' দিয়ে গড়া নয়, তার ওপর যাঁদের তিনি নেতৃত্ব করবেন তাঁদের মনের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া (Interaction) ব্যতিরেকে হতে পারে না। তাই আজকে যিনি নেতা কালকে তিনি নেতা আর নাও থাকতে পারেন; এর অনেকখানিই নির্ভর করে ঐ মিথষ্ক্রিয়ার ওপর যা দেশ, কাল, পাত্র, পরিবেশের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।

এ ছাড়া সংবেশন (Hypnosis) দ্বারা যে ব্যক্তিত্বের ক্ষণস্থায়ী পরিবর্ত্তন আনা যায় তা যাঁরা যাদুবিদ্যার প্রদর্শন দেখেছেন তাঁরা সবাই অনুধাবন করেছেন। যাকে যাদুকর সংবেশিত করে, সে সেই অবস্থাতে থাকার সময়ে যাদুকরের একান্ত অনুগত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই সংবেশন প্রভাব একান্তই ক্ষণস্থায়ী এবং ব্যক্তিত্বের ওপর এর প্রভাবও ষোলআনা নয়; অনেকেরই ধারণা আছে যে এই রকম সংবেশিত করে যাদুকর তাকে দিয়ে যা খুশী করিয়ে নিতে পারে কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। কারণ তার ওপর যাদুকরের প্রভাবের সীমা থাকে, যতদূর তার নৈতিকগঠনকে (Moral Sense) স্পর্শ না করে, যাদুকরের সে ঐ অবস্থাতে যত অনুগতই হোক না কেন, সে কখনই তার নীতিবিরুদ্ধ কাজ করবে না। তা হলেও অভিভাবের (suggestion) যে একটা প্রভাব ব্যক্তিত্বের ওপর আছে তা অস্বীকার করা যায় না—যেমন প্রচারের ফলে অথবা কোনও জিনিষ যা কারো ব্যক্তিত্বের একান্ত পরিপন্থী ছিল তার সপক্ষে অধিকবার শুনতে শুনতে শেষে সেইপক্ষেই মত বা মানসিকধারা গঠিত হয়। এই অভিভাব দেবার কৌশল এক একজনের এত বেশী পরিমাণে থাকে যে তাঁদের সান্নিধ্যে যাঁরাই আসেন তাঁদেরই ব্যক্তিত্ব অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত করতে পারেন।

এবার অবস্থার প্রভাব ব্যক্তিত্বের ওপর আছে কিনা বিচার করা যাক্। ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'Position makes a man'। এই

কথাটির প্রমাণ চাইলে অনেকক্ষেত্রেই খেটে গেছে দেখা যেতে পারে, তা বলে একথা ঠিক নয় যে, যে কোনও ব্যক্তিত্বেরই পরিবর্ত্তন এমনই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে হয়ে থাকে ; যাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন অবস্থার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে হয়ে থাকে তাঁদের ব্যক্তিত্বের কোনও কোনও দিক আগে না পাওয়া গেলেও একটা গোড়াপত্তন থাকা প্রয়োজন—যা সুযোগ পেয়ে বিকাশলাভ করতে পেরেছে। আবার আর একটা কারণও পাওয়া যায়, অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ তাঁর পরিবেশ ইত্যাদির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাঁর 'সামাজিক আত্মানুভূতি' (Social Self) এরও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যার ফলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন অবস্থার পরিবর্ত্তনের সাথে হয়ে থাকে ; কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে হীন অবস্থা থেকে বড় অবস্থাতে এসে কোনও ব্যক্তিত্বের নিন্দনীয় পরিবর্ত্তন হয়েছে—এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ পাওয়া যায় ব্যক্তির নিজ্ঞানমনের হীনতাভাবের দ্বন্দ্ব (Inferiority conflict) ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবস্থার ভেদে ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ব্যক্তিত্ব বিচারের দিক থেকে একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটা হচ্ছে 'হ্যালো এফেক্ট' অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির রূপলাবণ্য ইত্যাদি বা বিশেষ কোনও গুণও অনেক সময় তার অন্য সব সামান্যগুণকে সাধারণের কাছে উজ্জ্বলতর বলে প্রতিপন্ন করায়। ব্যক্তিত্ব বিচারের সময় এই 'হ্যালো এফেক্ট'কে কাটিয়ে ওঠা অনেক সময় অনেকের কাছেই শক্ত হয় এবং এই ভাবেও কোনও কোনও ব্যক্তিত্ব অবস্থাভেদে তার আসল পরিচয় থেকেও উন্নত বলে বিবেচিত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

কবির অভাব হতেই পারে না

ক্যাপ্টেন্ রামেন্দু দত্ত

'অভাব' 'অভাব' ভাবনা কেবল স্বভাবের দোষ জেনো।
হে কবি-বনিতা এ নহে ভণিতা, গরীবের কথা মেনো॥

* * * *

কিসের অভাব ? 'চাল' নাই ? বেশ, দেখাবো ভীষণ 'চাল'
বাঁকায়ে বিঁড়িটা দাঁতে চেপে নিলে হয়ে যাবে 'বানচাল' !
চিবায়ে চিবায়ে কথা কয়ে যাবো, কোঁচাটা কুঁচায়ে ধ'রে
যে দেখিবে, ক'বে—"কী চাল্ !
আর কি অভাব কহ তা' মোরে।
'ডাল' নাই ? হের, গাছে গাছে ডাল ! এবং কতনা
গাছ !
'মাছের ডেপুটি' পাশের বাড়ীতে,
নাই বা রহিল মাছ ?
'মশলা' ? দেখ এ দেয়ালে সুরকী-চুণ-মশলার ঢেলা ;
'কয়লা ও ঘুঁটে' ? এক্ষুণি উঠে ইন্ধন দিব মেলা—
চাকুরীর দরখাস্ত 'ফাইল্' মোটা কবিতার খাতা
ভালোই জ্বলিবে, ধোঁয়ার তোমার ধরিবেনা আর মাথা॥
তরকারী চাও ? উপরে তাকাও—ঝুলিছে সজিনা গাছে !
বারোমাস ফুলে, শাকে ও ডাঁটায় "শোভাঞ্জন"-টি আছে !

* * * *

ছোট খুকীটার দুধ নাই ? হায় কবির কাছে, কও
দোল-পূর্ণিমা, দুধের বন্যা, খানিকটা দুয়ে লও !
কবি কন্যার আত্মা ও মন ছুঁয়েরেই মিটিবে ক্ষুধা
চায়ের অভাব ? দু'জনে দু'কাপ খাবো জোছনারই সুধা !
ভাবনা কি প্রিয়ে ? যাবো নাকি নিয়ে কাগজ কলম গুলো
হাজারে হাজারে আঁখর মেলাবো তাহারি ছন্দে দুলো
দোলন ছন্দে বুঁদ হ'য়ে সব দুঃখ ভুলিয়া যাবো
চিনি নাই ? তুমি পাশে ত রয়েছ ? 'র' (raw)
জোছনাই খাবো !
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের পয়সা কড়ি ?
কবির অ-'ভাব'-বিরোধী স্বভাব ; সস্তা কলসী দড়ি !

* * * *

সারাটা ভূতলে 'কন্ট্রোল্' চলে রোদ বায়ু জলে বাদ
সে গুলো যে দিন ল'বে সরকার, সেই দিন পরমাদ।
কন্টোল হীন দরকারী যাহা, কুহু ও জ্যোৎস্না ধারা—
সত্ত খুশী পা'বে ডি, এফ্, ও'র লেখা পারমিট্ কার্ড ছাড়া !
রোদে রোদে ঘুরে, হাওয়া পেটে পুরে, পিয়ে পুকুরের জল
এ শরীরে যদি ক'মে থাকে কিছু আধিভৌতিক বল
আধ্যাত্মিক উন্নতি তরে সেটা প্রশস্ত প্রিয়ে
কলমের কালি ফুরায়েছে ? বেশ, লিখিব রক্ত দিয়ে !
অসুখ ক'রেছে ? ঐ ত রয়েছে হোমিওপ্যাথিক্ শিশি
স্বজনাত্মীয় নেই ? কেন, ঐ সরকারী পদীপিসী ?
কত 'দাদা' আর কত 'জ্যাঠা' খুড়ো' তুমি আমি
ছেলে মেয়ে,
আপদে-বিপদে প্রতি জনপদে ধন্য হয়েছি পেয়ে !
তার পর সেই ভাগ্য বিধাতা, সকল সময় জেনো !
যা' করেন তাহা ভালোর জন্য 'ভালো-ভগবানে' মেনো !
অভাব অভাব কোরোনা স্বভাব, ভাবের অভাব হ'লে
সত্য অভাব ঘটিবে কবির—
বুলবুলু যাবে চ'লে !

(চিত্রনাট্য)

ভূমিকা

"পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ"—চাণক্যশ্লোক

"Property is theft"—Proudhon

কালে কালে আদর্শের পরিবর্তন হয়; নীতিশাস্ত্রের সকল বাণী চিরন্তনী নয়। তাই মনুষ্যসমাজ যুগে যুগে পুরাতন আদর্শগুলিকে নূতনের আগুনে ঝালাইয়া লয়। সকল আদর্শ এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যাহারা টিঁকিয়া যায় তাহারা পুনর্জীবন লাভ করে।

আমার এই কাহিনীতে একটি পুরাতন নীতি-বাক্যকে নূতনের আলোকে পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পরীক্ষার ফল সকলের মনোমত হইবে এরূপ আশা করি না। কিন্তু পরীক্ষার যে প্রয়োজন হইয়াছে তাহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন।

ফেড্ ইন্।

রাত্রির কলিকাতা। মহানগরীর পথে পথে বিদ্যুদ্দীপালী। অনন্ত চক্ষু মোটরের ছুটাছুটি। উচ্চাঙ্গের বিলাসী হোটেলে যৌথ নৃত্য। রেডিও যন্ত্রে গগনভেদী সঙ্গীত। কোনও নবাগত দর্শক দেখিয়া শুনিয়া মনে করিতে পারেন না যে নগরের একটা অন্ধকার দিকও আছে।

আকাশে শুক্লা তিথির চাঁদ; তাহারও অর্ধেক উজ্জ্বল, অর্ধেক অন্ধকার।

কলিকাতার পথে-বিপথে সঞ্চরণ করিয়া শেষে একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন অভিজাত পল্লীতে আসিয়া উপনীত হওয়া যায়। এ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক বাড়ী পাঁচিল দিয়া ঘেরা, আপন আপন ঐশ্বর্যবোধের গর্বে পরস্পর হইতে দূরে দূরে অবস্থিত।

একটি পাঁচিল-ঘেরা বাড়ীর ফটক। ফটক না বলিয়া সিংহদরজা বলিলেই ভাল হয়। লোহার গরাদযুক্ত উচ্চ দরজার সম্মুখে গুর্খা দরোয়ান গাদা বন্দুক কাঁধে তুলিয়া ধীর গম্ভীর পদে পায়চারি করিতেছে। গরাদের ফাঁক দিয়া অভ্যন্তরের বৃহৎ দ্বিতল বাড়ী দেখা যাইতেছে; বাড়ী ও ফটকের মধ্যবর্তী স্থান নানা জাতীয় ফুলগাছ ও বিলাতী পাতাবাহারের ঝোপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ। একটি কঙ্করাকীর্ণ পথ ফটক হইতে গাড়ীবারান্দা পর্যন্ত গিয়া আবার চক্রাকারে ফিরিয়া আসিয়াছে।

ফটকের একটি স্তম্ভে পিতলের ফলকে খোদিত আছে—

শ্রীযদুনাথ চৌধুরী

জমিদার—হুতুমগঞ্জ

সিংদরজা উত্তীর্ণ হইয়া বাড়ীর সম্মুখীন হইলে দেখা যায়, গাড়ী-বারান্দার নীচে ভারী এবং মজবুত সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ রহিয়াছে।

কাট্।

সদর দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে সম্মুখেই পড়ে একটি আলোকোজ্জ্বল বড় হল-ঘর। ঘরের মধ্যস্থলে একটি গোল টেবিল; তাহার উপর টেলিফোন। টেবিলের চারিদিকে কয়েকটি চেয়ার। সম্মুখের দেয়ালে একটি বৃহৎ 'ঠাকুর্দা-ঘড়ি'। তাছাড়া অন্যান্য আসবাব-পত্রও আছে।

বাঁ দিকের দেয়ালে সারি সারি তিনটি ঘরের দ্বার। প্রথমটি ভোজন-কক্ষ, দ্বিতীয়টি গৃহস্বামীর শয়নকক্ষ; তৃতীয়টি ঠাকুর ঘর। ডান দিকে দুইটি ঘর; লাইব্রেরী ও ড্রয়িংরুম। পিছনের দেয়াল ঘেঁষিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি।

হল-ঘরে কেহ নাই। কিন্তু ভোজনকক্ষ হইতে মানুষের কণ্ঠস্বর আসিতেছে। সুতরাং সেদিকে যাওয়া যাইতে পারে।

ভোজন কক্ষ। দেশী প্রথায় মেঝেয় আসন পাতিয়া ভোজনের ব্যবস্থা। কিন্তু ঘরে একটি বড় ফ্রিজিডেয়ার ও কয়েকটি কাচের দ্বারযুক্ত আলমারী আছে। মেঝেয় পাশাপাশি তিনটি আসন পাতা। মাঝের আসনটিতে বসিয়া বাড়ীর কর্তা যদুনাথবাবু আহার করিতেছেন। দুই দিকের আসন দুইটি খালি; তবে আসনের সম্মুখে থালায় খাদ্যদ্রব্যাদি সাজানো রহিয়াছে।

যদুনাথের অনূঢ়া নাতিনী নন্দা সম্মুখে বসিয়া আহার পরিদর্শন করিতেছে এবং মাঝে মাঝে কোনও বিশেষ ব্যঞ্জনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সেই সঙ্গে দুই চারিটি কথা হইতেছে। বাড়ীর সাবেক ভৃত্য সেবকরাম এক ঝারি জল ও তোয়ালে লইয়া দ্বারের কাছে বসিয়া আছে। সেও কথাবার্তায় যোগ দিতেছে।

যদুনাথবাবুর বয়স অনুমান সত্তর ; আকৃতি শীর্ণ এবং কঠোর ; সহজ কথাও রুক্ষ ভাবে বলেন। একদিকে যেমন ঘোর নীতিপরায়ণ, অন্যদিকে তেমনি ছেলেমানুষ ; তাই তাঁহার ব্যবহার কখনও সম্ভ্রম উৎপাদন করে, আবার কখনও হাস্যরসের উদ্রেক করে। শরীর বাতে পঙ্গু তাই সচরাচর লাঠি ধরিয়া চলাফেরা করেন। বর্তমানে লাঠি তাঁহার আসনের পাশে শয়ান রহিয়াছে।

নন্দার বয়স আঠারো উনিশ। সে একাধারে সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী ও তেজস্বিনী। বাড়িতে পড়িয়া আই-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই নাতিনী ও এক নাতি ছাড়া যদুনাথের সংসারে আর কেহ নাই।

সেবক বয়সে বৃদ্ধ ; সম্ভবত যদুনাথের সমবয়স্ক। কিন্তু তাহার ছোট-খাটো ক্ষীণ দেহটি পঞ্চাশ বছরে আসিয়া আটকাইয়া গিয়াছে, আর অধিক পরিণতি লাভ করে নাই।

ছাড়া ছাড়া কথাবার্তা চলিতেছে।

নন্দা : দাদু, অন্য জিনিস খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলো না, আমি নিজের হাতে তোমার জন্যে পুডিং তৈরি করেছি।

যদুনাথ গলার মধ্যে একটা শব্দ করিলেন। নন্দা গিয়া ফ্রিজিডেয়ার হইতে পুডিংএর পাত্রটি আনিয়া আবার বসিল।

সেবক : বাবু, ছ্যাকড়াগাড়ী বাবুকে তাড়িয়ে দিলে কেন ? কী করেছিলেন তিনি ?

নন্দা : হাঁ, ভুবনবাবুকে ছাড়িয়ে দিলে কেন দাদু ? সেক্রেটারীর কাজ তো ভালই করছিলেন।

যদুনাথ কিছুক্ষণ নীরবে আহার করিয়া চক্ষুযুগল তুলিলেন।

যদুনাথ : ভুবন মিছে কথা বলেছিল। আমার কাছে মিছে কথা! হতভাগা! ভেবেছিল আমার চোখে ধুলো দেবে।

যদুনাথ আবার আহারে মন দিলেন। নন্দা ও সেবক একবার চকিত-শঙ্কিত দৃষ্টি বিনিময় করিল। সেবকের মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে মনে মনে বলিতেছে—কর্তা যদি আমাদের মিছে কথা জানতে পারেন তাহলে কি করবেন! নন্দা অস্বস্তিপূর্ণ মুখে একটু হাসিবার চেষ্টা করিল।

নন্দা : তা একটু-আধটু মিছে কথা কে না বলে ? ভুবনবাবু কি—টাকাকড়ি গোলমাল করেছিলেন ?

যদুনাথ : না, কিন্তু ক'রতে কতক্ষণ ? যে-লোক মিছে কথা বলতে পারে, সে চুরিও করতে পারে। এরকম লোককে বাড়ীতে রাখা যেতে পারেনা। যদি আমার স্যমন্তমণি চুরি করে ! তখন আমি কি করব ?

নন্দা : কী যে বল দাদু ! ঠাকুর ঘরের তালা ভেঙে স্যমন্তমণি চুরি করবে এত সাহস কারুর নেই।

যদুনাথ : তবু সাবধানের মার নেই। চুরিই বলো আর মিথ্যে কথাই বলো, সব এক জাতের। যার মিথ্যে কথা একবার ধরা পড়েছে, আমার বাড়ীতে তার ঠাঁই নেই।

নন্দা : সে যেন হ'ল। কিন্তু তোমার তো একজন সেক্রেটারী না হ'লে চলবে না। তার কি হবে ?

যদুনাথ : এবার খুব দেখে শুনে বাছাই ক'রে সেক্রেটারী রাখব।

নন্দা : বাছাই ক'রে— ?

যদুনাথ : হ্যাঁ, এবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেব—'ঠিকুজি-কুষ্টি সহ আবেদন করহ।' যারা দেখা করতে আসবে তাদের ঠিকুজি আনতে হবে। ঠিকুজি পরীক্ষা ক'রে যদি দেখি লোকটা ভাল, চোর-বাটপাড় নয়, মিথ্যেবাদী নয়, তবেই তাকে রাখব। আর চালাকি চলবে না।

নন্দার ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। সেবক গলা খাকারি দিল।

সেবক : ঠিকুজি কুষ্টির কথায় মনে পড়ল, আমাদের দিদিমণির ঠিকুজি কুষ্টি কী বলে ? আর কতদিন বই পড়বে ? ওনার বিয়ে-থা কি হবেনা ?

নন্দা ঠোঁটের উপর আঁচল চাপা দিল।

যদুনাথ : নন্দার কুষ্টি অনেকদিন দেখিনি, কাল দেখব।—নন্দা, তুই খেতে বসলি না ?

নন্দা : আমার তাড়া নেই। দাদা আসুক, দু'জনে একসঙ্গে খাব।

যদুনাথ পাশের আসনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ তুলিলেন।

যদুনাথ : মন্মথ এখনও ফেরেনি ?

এই সময় পাশের হল্ ঘরে ঠং ঠং করিয়া ন'টা বাজিতে আরম্ভ করিল।

নন্দা : (হাল্কা ভাবে) এই তো সবে ন'টা বাজল। দাদা দশটার আগেই ফিরবে।

যদুনাথ কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন চক্ষে নন্দার পানে চাহিয়া রহিলেন।

যদুনাথ: আমি ন'টার সময় শুয়ে পড়ি, ডাক্তারের হুকুম; মন্মথ কখন বাড়ী ফেরে জানতে পারিনা। ঠিক দশটার আগে ফেরে তো? দশটার পর আমার বাড়ীর কেউ বাইরে থাকে আমি পছন্দ করিনা।

নন্দার সহিত সেবকের আর একবার চকিত দৃষ্টি বিনিময় হইল।

সেবক: আজ্ঞে বাবু, কোনও দিন দাদাবাবুর দশটা বেজে এক মিনিট হয়না, ঠিক দশটার আগে এসে হাজির হয়।

যদুনাথ: হুঁ। কিন্তু এত রাত্রি পর্যন্ত থাকে কোথায়, করে কি?

নন্দা: কী আর করবে, বন্ধুদের সঙ্গে ব্রিজ খ্যালে, না হয় ক্লাবে গিয়ে বিলিয়ার্ড খ্যালে—এই আর কি!

যদুনাথ: তা তাস পাশা খ্যালে খেলুক। বিয়ের ছ'মাস যেতে না যেতে নাৎ-বৌ মারা গেলেন, ওর মনে খুবই লেগেছে; তাই আমি আর বেশি কড়াকড়ি করিনা। খেলা-ধুলোয় যদি মন ভাল থাকে তো থাক। কিন্তু রাত্রি দশটার পর বাড়ীর বাইরে থাকার কোনও ওজুহাতই থাকতে পারেনা। যারা বাইরে থাকে তারা বজ্জাৎ দুশ্চরিত্র।

নন্দা: না দাদু, দাদা ঠিক সময়ে বাড়ী ফেরে।

সেবক: ঘরে বৌ থাকলে আরও সকাল সকাল বাড়ী ফিরত। কথায় বলে ঘর না ঘরণী। বাবু, এবার তাড়াতাড়ি দাদাবাবুর নতুন বিয়ে দাও; দেখবে ঘর ছেড়ে আর বেরুবে না।

যদুনাথ: আমার কি অনিচ্ছে! কিন্তু একটা বছর না কাটলে লোকে বলবে কি!—দে, হাতে জল দে।

সেবক হাতে জল ঢালিয়া দিল, যদুনাথ ভোজন পাত্রের উপরেই মুখ প্রক্ষালন করিয়া লাঠি হাতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যদুনাথ: সেবক, বাড়ীর দোর-জান্‌লা সব বন্ধ হয়েছে কি না ভাল ক'রে দেখে নিবি।

সেবক: আজ্ঞে—

ভোজন কক্ষ হইতে হল্-ঘরে প্রবেশ করিয়া যদুনাথ ঠাকুর ঘরের দিকে চলিলেন; নন্দা ও সেবক তাঁহার পিছনে চলিল। ঠাকুর ঘরের দ্বারে একটি বড় তালা ঝুলিতেছিল, যদুনাথ কোমর হইতে চাবির থোলো লইয়া দ্বার খুলিলেন।

দেখা গেল ঠাকুর-ঘরে দুইটি ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছে। ঘরের মধ্য-স্থলে রূপার সিংহাসনের উপর একটি সোনার থালা খাড়া ভাবে রাখা রহিয়াছে; থালার মাঝখানে টাকার নাভিকেন্দ্রের মত একটি প্রকাণ্ড মাণিক্য আরক্ত প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে। ইহাই অমূল্য সূর্যমণি; ইহাই যদুনাথের বংশানুক্রমিক গৃহ-দেবতা।

যদুনাথ দ্বারের সম্মুখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন।

যদুনাথ: জাবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্।

যদুনাথের পশ্চাতে নন্দা ও সেবক যুক্ত কর কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর যদুনাথ আবার দ্বারে তালা লাগাইলেন।

শয়নকক্ষের দ্বার পর্যন্ত ফিরিয়া আসিয়া যদুনাথ সেবককে বলিলেন—

যদুনাথ: সেবক, লাইব্রেরীতে 'উড়ুদায় প্রদীপ' বইখানা আছে, এনে দে—বিছানায় শুয়ে পড়ব।

যদুনাথ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেবক নন্দার মুখের পানে চাহিয়া কয়েকবার চক্ষু মিটমিটি করিল।

সেবক: উড়ু উড়ু পিদ্দিম—সে আবার কি বই দিদিমণি?

নন্দা: (হাসিয়া) উড়ুদায় প্রদীপ—একখানা জ্যোতিষের বই। আয়, দেখিয়ে দিচ্ছি।

দুইজনে হল্‌ঘরের অপর প্রান্তে লাইব্রেরীর দিকে চলিল।

লাইব্রেরী ঘর। একটি বড় টেবিল, কয়েকটি গদি মোড়া চেয়ার। অনেকগুলি আলমারীতে অসংখ্য পুস্তক সাজানো। নন্দা টেবিলের উপর হইতে উড়ুদায় প্রদীপ লইয়া সেবককে দিল।

নন্দা: এই নে।—আর ছাখ সেবক, দাদার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দে, বাবু যে কখন ফিরবেন তার তো কিছু ঠিক নেই, এগারোটাও হ'তে পারে—বারোটাও হ'তে পারে।

সেবক: হুঁ। এদিকে কর্তার কাছে মিছে কথা ব'লে ব'লে আমাদের জিভ তেউড়ে গেল। কোথায় যায় বল দিকি? কি করে এত রাত অব্দি?

নন্দা। জানিনে বাপু। ভাবতেও ভাল লাগেনা। দাদু যদি জানতে পারেন অনর্থ হ'বে। কিন্তু সে হুঁস কি দাদার আছে?—যাক গে ও কথা, সেবক—তোকে আর একটা কাজ করতে হবে। তুই নিজের খাওয়া দাওয়া সেরে আমার খাবার ওপরে আমার ঘরে দিয়ে আসিস,

টি। এখন খেলে ঘুম পাবে, পড়াশুনো হবে না। ক শিয়রে সংক্রান্তি, একজামিন এসে পড়েছে।

সেবক : ঐ তো! রাত জেগে জেগে বই পড়ছ, ক বিয়ের নামটি নেই। ধুবড়ো মেয়ে দু'চক্ষে দেখতে না।

নন্দা : (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) আচ্ছা—হয়েছে—?

জনে লাইব্রেরী হইতে বাহির হইল। নন্দা সিঁড়ি দিয়া উপরে সেবক বই লইয়া যদুনাথের ঘরের দিকে গেল।

।

ড়ীর দ্বিতল। একটি লম্বা বারান্দার দুই পাশে দুই সারি ঘর। ঘর নন্দার; তাহার সম্মুখেরটি মন্মথর। অন্য ঘরগুলি প্রয়োজন রে ব্যবহৃত হয়।

দা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল এবং নিজের ঘরে প্রবেশ। তাহার ঘরটি বেশ বড়, একটু লম্বাটে ধরণের। এক দিকে বিছানা; অন্যদিকে পড়ার টেবিল, বই রাখার চর্কি আলমারী। মাঝখানে একটি আয়নার কবাটযুক্ত বড় ওয়ার্ডরোব। ঘরটি হাতের নিপুণতার সহিত পরিপাটি ভাবে সাজানো।

দা প্রথমে গিয়া বাহিরের দিকের জানালা খুলিয়া দিল। দ্বিতলের , তাই গরাদ নাই। বাহিরের অস্ফুট জ্যোৎস্না ঘরে প্রবেশ। নন্দা জানালায় দাঁড়াইয়া অলস হস্তে কানের দুল খুলিতে। তারপর দুল দুটি ওয়ার্ডরোবে রাখিয়া দিয়া সে পড়ার টেবিলের আসিয়া দাঁড়াইল; টেবিলের উপর একটি পড়ার আলো ছিল, জ্বালিয়া দিল।

টেবিলে একটি বই খোলা অবস্থায় উপুড় করা ছিল; মলাটের উপর নাম দেখা গেল—রঘুবংশম্। নন্দা চেয়ারে বসিল; ছোট একটি ফেলিয়া বইটি তুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

শুভ.।

থ ঘরের ঘড়িতে দশটা বাজিতে পাঁচ মিনিট। ঘরের আলো ; মাত্র একটা বাল্ব জ্বলিতেছে।

যদুনাথ শয্যায় শয়ন করিয়া বই পড়িতেছিলেন, আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন। চাবির গোছা তাঁহার বালিশের পাশে ছিল, তাঁহার একটা হাত তাহার উপর ন্যস্ত হইল।

কাট্।

নন্দা নিজের ঘরে বসিয়া রঘুবংশ পড়িতেছে।

নন্দা : সা দুষ্প্রধর্ষা মনসাপি হিংস্রৈঃ—

ভেজানো দরজার বাহির হইতে সেবকের কণ্ঠস্বর আসিল—

সেবক : দিদিমণি, তোমার খাবার এনেছি—

নন্দা : নিয়ে আয়।

সেবক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং চর্কি আলমারীর উপর খাবারের থালা রাখিল।

সেবক : দশটা বাজল, এখনও ছোট কর্তার দেখা নেই! আচ্ছা, রোজ রোজ এ কি ব্যাপার দিদিমণি? তুমি কিছু বলতে পার না?

নন্দা : হাজার বার বলেছি। রোজই বলে—আজ আর দেরী হবে না। কি করব বল?

সেবক : হুঁ। যাই, দোরের কাছে বসে থাকিগে। দোর খুলে দিতে হবে তো। কিন্তু এসব ভাল কথা নয়, মোটে ভাল কথা নয়—

দ্বার ভেজাইয়া দিয়া সেবক চলিয়া গেল। নন্দা কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন চক্ষে শূন্যে তাকাইয়া রহিল, তারপর বই টানিয়া লইয়া আবার পড়ায় মন দিল।

কাট্।

সেবক নীচে নামিয়া আসিয়া ভোজনকক্ষে গেল। আসনের সম্মুখে থালায় খাবার সাজানো ছিল, সেবক একটা জালের ঢাকনি দিয়া তাহা ঢাকা দিয়া রাখিল। হল্-ঘরে ফিরিয়া সদর দরজা সন্তর্পণে খুলিয়া একবার বাহিরে উঁকি মারিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া দরজা ভেজাইয়া দরজায় পিঠ দিয়া বসিল। (ক্রমশঃ)

দুর্ভিক্ষ—

যদিও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন—দুর্ভিক্ষ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ভারত রাষ্ট্রে তাহা এখনও দেখা যায় নাই, তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাহার ছায়া লক্ষিত হইতেছে। ছায়া অবশ্য পূর্ব্ব-গামিনী। কিন্তু দুর্ভিক্ষ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা কি? দুর্ভিক্ষ বলিতে আমরা বুঝি—মূল্য দিলেও খাদ্য অপ্রাপ্য বা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত অধিক যে ধনী ব্যতীত আর কেহ তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না। সম্প্রতি দুর্ভিক্ষপীড়িত উত্তর বিহারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দিল্লী "স্কুল অব ইকনমিকস্" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তথায় কেবল যে খাদ্য শস্যের অভাব তাহাই নহে, পরন্তু ভূমিশূন্য শ্রমিক ও বহু স্বল্পভূমি-সম্পন্ন কৃষকের খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করিবার মত অর্থও নাই। সুতরাং দেশে দুর্ভিক্ষ নাই—এ কথা কিছুতেই বলা যায় না।

যদিও দেশে দুর্ভিক্ষ লক্ষিত হইতেছে, তথাপি ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে হিসাব দিয়া দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রাম করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সে হিসাবে কেবল কুজ্ঝটিকারই সৃষ্টি হইতেছে। পার্লামেণ্টের সদস্য মিষ্টার সিদ্ধ প্রধান মন্ত্রীকে লিখিয়াছেন—খাদ্যোপকরণের অভাব যেরূপ তীব্র প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে এবং সে অভাবের সহিত সরকারী হিসাবের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব নহে। যদি উৎ-পাদন ও ব্যবহারের প্রকৃত হিসাব বিবেচনা না করিয়া আমদানীর প্রয়োজন হিসাব ধরা হয়, তবে কোন দিনই অভাবের অবসান হইবে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গের বিষয় বিবেচনা করিব। শ্রীরাজাগোপালাচারী পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, এ বার পশ্চিমবঙ্গে হৈমন্তিক চাউলের আনুমাণিক পরিমাণ—৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার টন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাবেও তাহাই দেখা যায়, অর্থাৎ মোট উৎপন্ন—প্রায় ১০ কোটি মণ। অবশ্য ইহা ব্যতীত কিছু আশু ধান্যের ও কিছু বোরো ধান্যের চাউল আছে এবং কেন্দ্রী সরকার ৪ লক্ষ টন দিতেছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও ১০ কোটি মণ চাউলে পশ্চিমবঙ্গে অন্নাভাব হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারেনা। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ৫০ লক্ষ শিশু ও বালকবালিকা—প্রাপ্তবয়স্কের মত আহার করে না। ধরা যায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ লোকের পূর্ণাহার প্রয়োজন; তাহাদিগের মধ্যে এক দল আবার আটা ও ময়দা আহার করে। বর্ত্তমানে রেশনে দেওয়া হয় মাথা পিছু এক সের ৫ ছটাক চাউল ও ১১ ছটাক আটা—মোট সপ্তাহে ২ সের। রেশন হ্রাসের পূর্ব্বে দেওয়া হইতে সপ্তাহে ২ সের ১১¾ সের। শেষোক্ত হিসাবে একজন প্রাপ্তবয়স্কের বৎসরে প্রয়োজন—৩ মণ ১৫ সের। যদি সকলে কেবল ভাতই খায় তবে শেষোক্ত হিসাবেও ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের জন্য বৎসরে প্রয়োজন ৭ কোটি ৬০ লক্ষ মণ। তাহা হইলে কেবল হৈমন্তিক ধান্যের চাউল হইতেও কিছু অবশিষ্ট থাকে।

যদি বলা হয়, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ধান্য বলিতে ভুল করিয়া চাউল বলিয়াছেন, তাহা হইলেও অভাবের কারণ থাকে না। কারণ ১০ কোটি মণ ধান্যে ৭ কোটি মণ চাউল পাওয়া যাইবে। ইহার সহিত আশু ধান্যের ও বোরো ধান্যের চাউল যোগ করিতে হইবে। আর কতক লোক যে আটা বা ময়দা ব্যবহার করে, তাহাও বিবেচ্য।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে বিপুল ব্যয়সাধ্য খাদ্য বিভাগ ও রেশনিং ব্যবস্থা রাখিয়া যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা কি অপচয়ের পর্য্যায়ভুক্ত বলা যায় না?

অথচ আমাদিগকে বলা হইতেছে—এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯শে মে পর্য্যন্ত ২৭৬,১৮৫ টন চাউল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন এবং গত বৎসর এই সময় পর্য্যন্ত সংগৃহীত চাউলের পরিমাণ ৩৩৩,৫৯৮ টন ছিল। এবার সংগ্রহ কার্য্যে নানা স্থানে যে সকল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে কোন কোন স্থানে কৃষকরা বলিতেছে, তাহারা আর ধান্যের চাষ করিবে না—পাটের চাষ করিবে এবং তাহাতে আয়ও অধিক হইবে।

যদি তাহাই হয়, তবে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে?

বিসমার্কের রাজনীতির সহিত যাঁহার বাহুবল যুক্ত না হইলে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠিত হইতে পারিত না, সেই মলকে বলিয়াছিলেন :—

"জার্ম্মানীর কৃষি যদি নষ্ট হয় তবে বিনা অস্ত্রাঘাতে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইবে!"

রুম্‌কার সেই কথাই বুঝাইয়াছিলেন—

"জার্ম্মানী যদি তাহার অধিবাসিগণের খাদ্যোপকরণ যোগাইতে না পারে, তবে জলে ও স্থলে তাহার সমরসজ্জা ও তাহার শিল্প বাণিজ্য সবই ব্যর্থ হইবে।"

এই কথা ভারত রাষ্ট্র সম্বন্ধে কিরূপ প্রযোজ্য তাহা বলা বাহুল্য।

ভারত রাষ্ট্রকে আজও কি ভাবে খাদ্যোপকরণের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে, তাহার প্রমাণ, বর্ত্তমান বৎসর ইহার মধ্যে—

গত বৎসর যে খাদ্যোপকরণ আনয়ন করা সম্ভব হয় নাই, তাহা হিসাবে ধরিয়া ক্রয় করা হইয়াছে—৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ টন। ইহার মধ্যে গম ও আটা—১৯ লক্ষ ৮ হাজার টন, চাউল—৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টন; মাইলো—৬ লক্ষ ৯৭ হাজার টন।

নিম্নলিখিত দেশসমূহ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ চাউল পাওয়া যাইতেছে :—

থাইল্যাণ্ড (শ্যাম)	...	৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টন
ব্রহ্ম	...	৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টন
মিশর	...	৩ হাজার ৫ শত টন
চীন	...	৮০ হাজার টন
পাকিস্তান	...	২ লক্ষ ১৭ হাজার টন

নিম্নলিখিত দেশসমূহ গম সরবরাহ করিতেছে—

অষ্ট্রেলিয়া
আর্জ্জেণ্টিনা
নরওয়ে
কানাডা
রুশিয়া

আমেরিকা, চীন ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাইলো পাওয়া যাইতেছে।

আনিবার ব্যয়সহ মূল্য পড়িবে—

গম—	১৪ টাকা ১৪ আনা মণ
ময়দা—	২০ টাকা ৪ আনা মণ
চাউল (মিহি)—	২৫ টাকা ১২ আনা মণ
" (মোটা)—	২১ টাকা ১৫ আনা মণ
" (ভাঙ্গা)—	১৮ টাকা ১০ আনা মণ
মাইলো—	১০ টাকা ৮ আনা মণ

ভারতরাষ্ট্র অ্যাংলো-আমেরিকান দলভুক্ত হইলেও আমেরিকা ভারতকে খাদ্যোপকরণ দিতে যেরূপ বিলম্ব ও সর্ত্ত করিতেছে, তাহাতে তাহার প্রীতির পরিচয় নাই, আছে ব্যবসাবুদ্ধির ও স্বার্থরক্ষার চেষ্টার পূর্ণ পরিচয়। আমেরিকা বিনিময়ে যে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য চাহিতেছে, তাহা আণবিক শক্তির জন্য প্রয়োজন। ভারত সরকার তাহা দিলে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা জটিল হইতেও পারে। রুশিয়া ও চীন তাহাদিগের প্রয়োজনে চালের বিনিময়ে পাট চাহিতেছে। কিন্তু ভারত সরকারকে পাকিস্তান হইতে পাট কিনিয়া দিতে হইবে এবং সে জন্য মুদ্রামূল্যের পরিবর্ত্তনে ভারত সরকারকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

এইরূপে বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করিতে ভারতরাষ্ট্রকে যদি রক্তমোক্ষণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হয়, তবে তাহার ভবিষ্যৎ যে বিপজ্জনক তাহা বলা বাহুল্য। এই অবস্থার প্রতীকারের একমাত্র উপায়—খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে রাষ্ট্রকে স্বাবলম্বী করা। সে কাজ যে দুঃসাধ্য নহে, তাহাতে আমাদিগের সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু সেজন্য যে আগ্রহ, নিষ্ঠা ও আয়োজন প্রয়োজন, ভারত সরকারে আমরা যে তাহারই অভাব লক্ষ্য করিতে পারিতেছি, তাহাই বিশেষ দুঃখের বিষয়। ইহা অযোগ্যতা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্যতার সহিত যে আপনাদিগের ক্ষমতার অতিরঞ্জিত অধিক বিশ্বাস যুক্ত হইতে পারে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধি—

গত ২২শে মে ভারত সরকারের খাদ্য মন্ত্রী মিষ্টার মুন্সী যখন বলিয়াছিলেন, মে হইতে আগষ্ট এই ৪ মাস ভারতরাষ্ট্র বিদেশ হইতে মাসে প্রায় ৫ লক্ষ টন খাদ্য শস্য আমদানী করিবে, তখন কি তিনি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন, খাদ্য বিষয়ে যে দেশ এইরূপ পরমুখাপেক্ষী তাহার বিপদের সম্ভাবনা কত অধিক? এই বিপুল পরিমাণ বিদেশী সরবরাহ যে পাওয়া যাইবেই, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তার অভাব অনিবার্য এবং ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে দেশের প্রাণান্ত হইতেছে। আর তিনিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—দেশের যে সকল স্থানে অন্নাভাব সে সকল স্থানে লোকের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় এবং তাহারা উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের অভাবে জীবিত থাকিলেও জীবন্মৃত হইতেছে।

এইরূপ শোচনীয় অবস্থার প্রকৃত প্রতীকার—দেশে খাদ্যোপকরণ বর্দ্ধিত করা। সে সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাসে আলোচনা করিয়াছি এবং দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সে বিষয়ে আবশ্যক ব্যবস্থা হইতেছে না।

"পতিত" জমীতে চাষের কথাই ধরা যাউক। যে উপায়ে ভারত সরকার "পতিত" জমীতে চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার ব্যয় প্রধানতঃ আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত ঋণে নির্ব্বাহিত হইতেছে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ঐ ব্যাঙ্ক হইতে ভারত সরকার এক কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করিয়া প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশস্থ "পতিত" জমীতে চাষের জন্য—কাশপূর্ণ জমী চাষের উপযোগী করিবার জন্য যন্ত্রাদিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং বন পরিষ্কার জন্য "বুলডোজার" ও "ট্রাকটার" ক্রয় করিবেন, স্থির করেন। সত্ত ৭ বৎসরে ঐ ঋণ শোধ করিতে হইবে এবং ঋণের জন্য শতকরা আড়াই টাকা সুদ ও শতকরা এক টাকা কমিশন বা বাট্টা দিতে হইবে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে ঋণ শোধের ব্যবস্থা করা হইবে। যে ভাবে কাজ অগ্রসর হইতেছে ব্যাঙ্ক তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কারণ, ৭ বৎসরে কাজ শেষ হইবার সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না! সেই কারণে ভারত সরকারের সহিত বিষয়টির আলোচনা জন্য ব্যাঙ্ক ৩ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেছেন।

দেখা যাইতেছে, কেন্দ্রী ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠানের কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই। মিষ্টার মুন্সী বলিয়াছেন, ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য যে ৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, প্রায় সেই মূল্যের খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি অবশ্য কৈফিয়ৎ দিতে দ্বিধানুভব করেন নাই। তিনি বলেন, যদিও ৩৭৫টি ট্রাকটার আমদানী করার কথা ছিল, তথাপি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত মাত্র ১৮০টি পাওয়া গিয়াছিল; কাজেই ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দেও ১ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমী "উঠিত" করিবার কথা ছিল, তাহার মাত্র ৪০ হাজার একর "উঠিত" করা সম্ভব হয়! আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের

টাকায় যে সকল ট্রাকটার ক্রয় করা হয়, সে সকল আসিবার পূর্ব্বে "ডিস্‌পোশালের" অর্থাৎ যুদ্ধের সময় ত্যক্ত ২৮০টি ট্রাকটার লইয়াই কাজ করিতে হইয়াছিল এবং সেগুলিও কোন কোন অংশের অভাবে সকল সময় কার্য্যকরী থাকিত না! আবার যখন নূতন ট্রাকটার আসিল, তখন দেখা গেল, সে যন্ত্র ব্যবহারের জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন তাহাতে শিক্ষিত লোকের একান্ত অভাব! অতি অল্প দিন পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশে সরকার লোককে সে বিষয়ে আবশ্যক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিবেচনা না করিয়াই ভারত সরকার ঋণ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মিষ্টার মুন্সী যে সকল অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল দূর না হইলে আশানুরূপ ফললাভ সম্ভব হইবে না। অথচ কেবল উত্তর প্রদেশে ও মধ্য প্রদেশেই নহে, পঞ্জাবে ও মাদ্রাজেও বহু "পতিত" জমী রহিয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গেও সেরূপ জমীর অভাব নাই। চাষের ব্যবস্থা হইলে মাদ্রাজে ও পশ্চিমবঙ্গে কেবল যে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বর্দ্ধিত হইবে, তাহাই নহে—ম্যালেরিয়াও দূর হইবে। বিশাখাপত্তন অঞ্চলে যেমন মালাবারের ওয়াইনাদ অঞ্চলেও তেমনই এই বিষয়ে চেষ্টা হইতেছে। মহীশূরের যে স্থানে, সরকার পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগকে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে অঞ্চলেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জমী "পতিত" হইয়াছে ও হইয়া আছে। ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি মিষ্টার কেলোয়স এ বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তাহাতে উপকারের সম্ভাবনা থাকিবে, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

আমেরিকা হইতে যে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করা হইয়াছিল, তিনি মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যে জমীতে চাষ হইতেছে তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাই প্রথমে করিতে হইবে—অন্যান্য উপায়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় আশুফললাভ হইবে না।

খাদ্যশস্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতরাষ্ট্রকে যে তুলার ও পাটের উৎপাদনও বর্দ্ধিত করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই—নহিলে তুলা ও পাট সম্বন্ধেও তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে।

সর্ব্বাগ্রে দেশের অন্ন-সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী হ্রাস না হইলে অন্যান্য কাজের জন্য অর্থাভাব ঘুচিবে না এবং জাতির আত্মসম্মানও যেমন অনেকক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে, তেমনই তাহার ক্ষতিও অসাধারণ হইবে।

বিদেশ হইতে আমদানী শস্যে লোককে কোনরূপে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে—এ সংবাদে দেশের লোক আনন্দলাভ করিতে পারে না—নিশ্চিন্ত হওয়া ত পরের কথা। অথচ এখনও অনেক "পতিত" জমী ট্রাকটার ব্যতীত ও চাষ হইতে পারে এবং সেচের ও জলনিকাশের ব্যবস্থা হইলে অনেক জমী এখনই চাষের যোগ্য করা যাইতে পারে। সেদিকে অধিক মনোযোগদান যে কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের আশু কর্ত্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতরাষ্ট্র রুশিয়ার মত সমাজতন্ত্রশাসন প্রবর্ত্তিত করে নাই। এদেশে কৃষকের সহিত সহযোগই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। সেই উপায় সরকারের দ্বারা যথাযথরূপে অবলম্বিত হইতেছে কি? কৃষককে পরামর্শ, উৎকৃষ্ট বীজ, সার, সেচ-ব্যবস্থা দিয়া এবং তাহার জমীতে, প্রয়োজনে জলনিকাশের ব্যবস্থা করা হইতেছে কি? কেবল বক্তৃতায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। দেশের শস্য-সংগ্রহনীতিতেও যে স্থানে স্থানে বিক্ষোভ খণ্ডবিদ্রোহে পরিণতি লাভ করিতেছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। কৃষকের নিকট হইতে শস্য সংগ্রহে সরকার যে নীতি অবলম্বন করিতেছেন, তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে "না-দলিল, না-উকীল, না-আপীল" মনে হওয়ায় কৃষকরা খাদ্যশস্য চাষের স্থানে পাট চাষ করিবার সঙ্কল্পও যে করিতেছে, তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। কৃষক যদি ধান্য চাষ করিতে অসম্মত হয়, তবে সরকার কি করিবেন? সহানুভূতি ব্যতীত সহযোগ আকৃষ্ট করিবার উপায় নাই। সেই সহানুভূতির কি পরিচয় আজ ভারতরাষ্ট্রের বিরাট কৃষক সম্প্রদায় সরকারের নিকট পাইতেছে, তাহা দেখিবার বিষয়। কৃষিকার্যে উন্নতি সাধনের কি সাহায্য কৃষকগণ সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছে ও পাইতেছে? কোন্ অঞ্চলে কি ফশলের ফলন ভাল হয়, তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন—"মুড়ী মিছরীর এক দর" ধরিয়া সর্ববিধ ধান্যের এক দাম প্রদান অসঙ্গত—লোকের অভাব নিদ্ধারণ করিয়া তাহাকে শস্য দিতে নির্দ্দেশদান ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

আর যত শীঘ্র সম্ভব শস্য-সংগ্রহ ও রেশনিং কণ্ট্রোল বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। কারণ, সরকার উৎপাদনের ও বর্জ্জনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন না—অথচ তাঁহারা ব্যয়বহুল বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাই করিয়া আসিতেছেন।

বস্ত্রাভাব—

একই দিনে কলিকাতার দুইখানি সংবাদপত্রে দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে:—

(১) "পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য্যের নিকট বীরভূম জিলার সদস্য শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় এক পত্রে তিনি যে কেন গত ২০শে মে তারিখে উক্ত সমিতির কার্য্য-নির্বাহক সদস্যদের সভায় যোগদানের জন্য কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই তাহা জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'অতি আক্ষেপের সহিত জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, একমাত্র পরিধের বস্ত্রের অভাবে অধিবেশনে যোগদান করিতে অক্ষম হইলাম। আমার পরিবারে বারজন পোষ্য। গত ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাস হইতে অদ্য পর্যন্ত আমার কোটায় মাত্র ৬ গজ মার্কিণ এবং কোটার বাহিরে ডিফেকটিভ ষ্টক হইতে বহু অনুনয় বিনয়ের পর একখানি শাড়ী ব্যতীত অন্য কিছু পাই নাই। * * সত্বর ইহার সুব্যবস্থা না হইলে গ্রীষ্মাবকাশের পর অধিকাংশ শিক্ষকের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিতে হইবে।"

(২) "পশ্চিমবাঙ্গালায় কাপড়ের অভাবে মফঃস্বলে শিক্ষকরা

যখন স্কুলে যাইতে পারিতেছেন না, তখন সিঙ্গাপুরের বাজারে ভারতীয় কাপড় এই পরিমাণ জমা হইয়াছে যে, এখন সেগুলি পুনরপ্তানীর অনুমতি দিতে হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন গুদামে বর্ত্তমানে এক লক্ষ যাট হাজার গাঁইটের অধিক কাপড় জমিয়া গিয়াছে। আমাদের রপ্তানীনীতি কেমন তাহা এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। দেশের লোক যখন কাপড় পায় না, তখন সরকার অতিরিক্ত মুনাফা লুটিবার জন্য অনায়াসে বণিকদের বাহিরে বস্ত্র রপ্তানীর অনুমতি দান করিয়া চলিয়াছেন।"

আমাদিগের মনে হয়, এই সংবাদ দুইটি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক। দেশের প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করা বর্ত্তমানে সরকারের কর্ত্তব্য কিনা, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ থাকিতে পারে না।

পশ্চিম বঙ্গে আমরা দেখিতেছি, কৃষি সচিবের আমমোক্তাররূপে আর একজন সচিব সহসা তুলার চাষ বাড়াইবার কার্য্যে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইতেছেন। তুলার চাষ কর, চরকায় সূতা কাট, তাঁতে কাপড় বয়ন কর—সব অভাব দূর হইবে! এইরূপ উপদেশ কি দেশের লোককে বস্ত্রাভাব সহ্য করিতে প্রোৎসাহিত করিবে। আবার বলা হইতেছে, লোক যেন দেশের যে যজ্ঞ বর্ত্তমান শাসকরা করিতেছেন, তাহাতে আত্মাহুতি দিয়া মুক্তিলাভ করে।

এ সব কথায় লোক ভুলিতে পারে না। লোক আজ জিজ্ঞাসা করিতেছে, সরকারের আর্থিক অবস্থা কি এতই শোচনীয় বা তাঁহাদিগের ব্যবসায়ীদিগকে লাভবান করিবার আগ্রহ এতই অধিক যে তাঁহারা অনায়াসে বিদেশে বস্ত্র পাঠাইয়া দেশের লোককে নগ্ন রাখিতেও দ্বিধানুভব করেন না?

বস্ত্র বণ্টন ব্যাপারে যে অনাচার অনুসৃত হইতেছে, তাহাই দেশে বস্ত্রাভাবের জন্য বহু পরিমাণে দায়ী। অনেক সময় যে দেখা গিয়াছে—গুদামে বস্ত্রের অভাব নাই, কিন্তু লোক কাপড় পায় না এবং সচিবরা নির্লজ্জভাবে লোককে কখন হাফপ্যান্ট পরিধান করিতে, কখন বা কর্পূরবাসিত শীতল জল দিতে বলিতেছেন, তখন সচিবদিগের আন্তরিকতা, লোকের সহিত সহানুভূতি ও মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ ঘটে।

অনেকেরই বিশ্বাস—খাদ্যোপকরণেরই মত—বস্ত্রের অভাবও অতিরঞ্জিত বা ব্যবস্থার ত্রুটিহেতু উদ্ভূত। সে বিশ্বাস যে ভিত্তিহীন তাহাও প্রতিপন্ন হয় নাই।

দেশের লোকের প্রাথমিক অভাব যদি দূর করা না হয়, তবে দেশে অসন্তোষই প্রবল হইবে এবং দেশের যে উন্নতি সকলের কাম্য তাহা সংঘটিত হইবে না।

পাকিস্তানের মনোভাব—

পাকিস্তান কেবল যে কাশ্মীর লাভ করিবার জন্য সর্ব্ববিধ আয়োজন করিতেছে, তাহাই নহে—স্বরাষ্ট্রে ও বিদেশে ভারত সরকার সম্বন্ধে যে মিথ্যা প্রচার-কার্য্য পরিচালিত করিতেছে, তাহা পূর্ব্বে ইংরেজের ভারত-বিরোধী প্রচার কার্য্যও পরিম্লান করিয়াছে। তাহার তীব্র ও উগ্র মনোভাব আরও নানা ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রভাসতীর্থে মুসলমান কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত ও ভগ্ন সোমনাথের মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা যেন পাকিস্তানকে ক্ষিপ্ত করিয়াছে। বলা হইয়াছে, মুসলমানের ভূমিতে (?) হিন্দু মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ মুসলমানের নিকট অসহ্য। পাকিস্তান ঐ মন্দির প্রথম ভঙ্গকারীর জন্য "মামুদ দিবস" উদ্‌যাপন করিয়াছে এবং প্রস্তাব করিয়াছে, যে দিন সোমনাথের মন্দির পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়, সে দিন পাকিস্তানে যে সকল মুসলমান বালক প্রসূত হইবে, তাহাদিগের সকলেরই মামুদ নাম রাখা হইবে!

চট্টগ্রামে—আনন্দময়ী কালীবাড়ী, ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ী, রাধামাধব আখড়া ও জগদ্বন্ধু আশ্রম এই চারিটি হিন্দু ধর্ম্মস্থানের সম্পত্তি স্থায়ীভাবে সরকার কর্ত্তৃক গ্রহণ করিবার নোটিশ জারি করা হইয়াছে। এই সংবাদ কলিকাতায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে পূর্ব্ব বঙ্গ সরকার এক বিবৃতিতে বলেন—"সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা।" কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে, ঐ বিবৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অথচ পূর্ব্ব বঙ্গ সরকার ঐরূপ ভিত্তিহীন সংবাদ দিয়াছেন।

দিল্লী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পরে ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার এলাকাস্থ মিতারা গ্রামের যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সপরিবারে কলিকাতা হইতে গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। গত ৬ই মে রাত্রিকালে তিনি স্বগৃহে ৩।৪ জন দুর্ব্বৃত্ত দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আহত হ'ন এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটে। প্রকাশ, পুলিস অনিচ্ছাসত্ত্বে এজাহার লইলেও তদন্ত করে নাই এবং একজন পুলিস কর্ম্মচারী যতীন্দ্রনাথের গৃহে যাইয়া গৃহের লোককে পাকিস্তান ত্যাগ করিতে বলেন।

জলপাইগুড়ীতে মুসলমানরা পুনঃ পুনঃ ভারতরাষ্ট্রে অনধিকার প্রবেশ করিতেছে।

ঢাকায় কয়দিন পূর্ব্বেও কতকগুলি মুসলমান হিন্দুর গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া সেই সকল গৃহ অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার ব্যাপারটি অস্বীকার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করিয়া কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। যেরূপ কৈফিয়ৎ দিয়া তাঁহারা পাকিস্তানে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের অত্যাচার উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন, এই কৈফিয়ৎও সেইরূপ।

এই সকল ব্যাপারে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়—পাকিস্তান হিন্দুর ধন, প্রাণ ও সম্মান লইয়া বাস করিবার পক্ষে নিরাপদ বলা যায় না। মধ্যে মধ্যে যখনই অত্যাচার প্রবল হইতেছে, তখনই অবশিষ্ট হিন্দুরা পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া ভারত রাষ্ট্রে উপনীত হইতে থাকেন। ভারত রাষ্ট্রের সরকারের পক্ষে তাহা বিবেচনা করিয়া হিন্দুদিগের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

ভারত সরকার যে দীর্ঘকাল পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্য স্বীকার করিতে অসম্মতি জানাইয়া পরে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে হয়ত

পাকিস্তান মনে করিয়াছে—ভারত রাষ্ট্র দুর্ব্বল এবং তাহার নিকট নত হইতেছে। ইহা ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

এই প্রসঙ্গে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভারত সরকার পাকিস্থানী মুদ্রা ভারতীয় টাকশালে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন কি না? যদি ভারত সরকার তাহা করিয়া থাকেন, তবে সেজন্য পাকিস্তানের নিকট ভারত রাষ্ট্রের কত টাকা প্রাপ্য হইয়াছে এবং পাকিস্তান সে প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দিয়াছে কি?

জাতির আয়—

প্রত্যেক দেশ জাতির মোট আয় হিসাব করিয়া অধিবাসীর ব্যয় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতে ইংরেজ সরকার তাহার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করেন নাই—অনুমানের উপর ও অনির্ভরযোগ্য উপকরণের উপর নির্ভর করিয়া মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। সেই জন্যই দাদাভাই নৌরজীর যে হিসাব কংগ্রেস স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সহিত লর্ড কার্জ্জনের সরকারের হিসাবের সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। ভারত সরকার সে দিকে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সভাপতিত্বে জাতীয় আয় কমিটী সে বিষয়ে তাঁহাদিগের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই রিপোর্টও নির্ভুল বলা যায় না; কারণ, কোন কোন ক্ষেত্রে কমিটীকে যে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই, এমন নহে।

হিসাবে দেখা যায়—জাতির উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ কৃষি ও কৃষির সহিত সম্পর্কিত শিল্প হইতে পাওয়া যায়; খনি, কারখানা ও কুটীর শিল্পের উৎপাদন শতকরা ১৭ ভাগের কিঞ্চিৎ অধিক; বাণিজ্য, যানবাহন হইতে লব্ধ শতকরা ১৯ ভাগের কিছু অধিক। আর সব দিকের উৎপাদন শতকরা ১৬ ভাগ। কোন্ কাজে কত টাকা পাওয়া যায়, তাহার ও আনুমাণিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে।

কমিটীর বিবরণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—লোকের আর্থিক অবস্থা ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল তদপেক্ষা উন্নত হয় নাই—তবে ১৯৪০-৪৯ খৃষ্টাব্দের মোট আয়—৮৭১০০০০০ কোটি টাকা; ব্যক্তির আয়—২৫৫ টাকা।

১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে ব্যক্তির বার্ষিক আয় ছিল—৬৫ টাকা। বর্ত্তমানে দ্রব্য মূল্য হিসাব করিলে তাহা যদি ২৬০ টাকা হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, এখন আয় ৫ টাকা কমিয়াছে।

কমিটীর হিসাবে যে আয় ধরা হইয়াছে, তাহা যে লোকের অভাব পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে—তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সরকার এবং সরকারের অনুসরণে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যে কর্ম্মচারীদিগের বেতনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির জন্য ভাতা দিতে ও বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাতেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। সেই ভাতা যে অস্থায়ী হইতে ক্রমে স্থায়ী হইতে চলিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পণ্যের—বিশেষ খাদ্যশস্যের ও পরিধেয়ের মূল্য হ্রাস করিতে না পারিলে ভাতার পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া যে অস্বাভাবিক আয়-বৃদ্ধি দেখান হয়, তাহা অসত্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আয়ের সহিত যদি অনিবার্য্য ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত না হয়, তবে জাতির অর্থনীতিক অবস্থা সন্তোষজনক হয় না—জাতির উদ্বেগেরও অবসান হয় না।

জাতির আয়ের কতকটা নির্ভরযোগ্য হিসাব না থাকায় এতদিন সরকার আয় ব্যয়ের যে বাজেট প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছেন, তাহা অজস্র ত্রুটিপূর্ণ হইবারই কথা এবং তাহাই আনুমানিক ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় উভয়ের মধ্যে প্রবল প্রভেদের অন্যতম কারণ।

এবার যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ভিত্তি করিয়া সরকারকে বাজেট প্রস্তুত করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে—সঙ্গে সঙ্গে একান্ত প্রয়োজন—

পণ্য-মূল্য হ্রাস ও জাতির আয় বৃদ্ধি। পণ্যমূল্য হ্রাসের জন্য প্রয়োজন —উৎপাদন বৃদ্ধি ও বণ্টনের অব্যবস্থা নিবারণ। বণ্টন-নিয়ন্ত্রণ সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা হিসাবে যত বাঞ্ছনীয়ই কেন হউক না, তাহা সমাজতন্ত্রশীল রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোথাও সমাজের সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন হয় না এবং অন্য রাষ্ট্রে তাহা প্রয়োজনে প্রবর্ত্তিত হইলে যত শীঘ্র তাহার উচ্ছেদসাধন সম্ভব হয়, ততই ভাল।

অপ্রীতিকর প্রচার কার্য্য—

ভারত রাষ্ট্রের অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মন্ত্রী ডক্টর আম্বেদকার জীবনের অপরাহ্ণে স্বধর্ম্মত্যাগীর আগ্রহে হিন্দু ধর্ম্মের অযথা নিন্দায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারত রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসীর ধর্ম্মের গ্লানি প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

(১) হিন্দু ধর্ম্ম হিংসা, চতুর্ব্বর্ণ বিভাগে বিভেদ, প্রতিমা পূজা ও শাস্ত্রবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(২) হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এবং তাহাই দেশের পতনের ও দেশবাসীর হীনতার কারণ।

(৩) এ দেশের লোক দুর্নীতিদুষ্ট বলিয়াই সরকারে দুর্নীতি স্থান পাইয়াছে।

(৪) হিন্দু ধর্ম্মই এই দুর্নীতির কারণ, সে ধর্ম্ম কোন নৈতিক নীতি প্রচার করে না, কেবল দেবদেবীর পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজনের নির্দ্দেশ দেয়।

এইরূপ উক্তি যত আপত্তিকরই কেন হউক না, এ সকলে হিন্দু ধর্ম্মের কোন ক্ষতি হইবে না—কারণ, হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার যোগ্যতা যাহাদিগের নাই, তাহারা যাহা বলে তাহা অবজ্ঞা করাই ভাল। সিকাগোর ধর্ম্ম সম্মিলনে খৃষ্টানদিগের মুখে হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অবজ্ঞার ভাবেই বলিয়াছিলেন, যাহারা হিন্দুর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, তাহারা যে হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা করে, তাহা ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জড়বাদজর্জ্জরিত প্রাচী তাহার ইহকালসর্ব্বস্ব সভ্যতায় শান্তি ও সান্ত্বনা নাই বলিয়াই যে হিন্দু ধর্ম্ম বিততশতশাখ ন্যগ্রোধের মত ত্রিতাপতপ্ত

মানবকে যুগে যুগে অবারিত আশ্রয় ও স্নিগ্ধ শান্তি দিয়া আসিয়াছে তাহারই সন্ধান করিতেছে। সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—

"ভগবানের বিধানে আমরা হিন্দুরা আজ বিশেষ দায়িত্ব ভোগ করিতেছি। প্রতীচ্য জাতিরা আধ্যাত্মিক সাহায্যের জন্য আমাদিগের নিকট আসিতেছে।"

দীর্ঘকাল পরে অরবিন্দ বলিয়াছিলেন :—

"আজ যখন পৃথিবীর লোক আধ্যাত্মিক সাহায্য ও অন্ধকারে আলোকের সন্ধানে ভারতের দ্বারস্থ হইতেছে, তখন যদি আমরা আমাদিগের যে আধ্যাত্মিক সম্পদ আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি তাহা ত্যাগ করি তবে তাহা শোচনীয়ই হইবে।"

কেন যে হিন্দুরা অধিকারীভেদ স্বীকার করেন, তাহা ডক্টর আম্বেদকারের মত লোকের ধৃষ্ট উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

আজ ডক্টর আম্বেদকারের উক্তিতে বিজ্ঞবর প্লেটোর কথা আমাদিগের মনে পড়িতেছে—

"যে তাহার দেশের ধর্ম্মকে ঘৃণা করে, সে অত্যন্ত অপরাধী—মৃত্যুদণ্ডই তাহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড।"

হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে উগ্র উক্তি একবার গান্ধীজীও করিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন, বিহারের ভূমিকম্প আমাদিগের অস্পৃশ্যতা পাপের ফল। রবীন্দ্রনাথ সে উক্তি যুক্তিসহ নহে বলিয়া তাহার প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন, যাহারা অস্পৃশ্যতা মানে না, সেরূপ সম্প্রদায়ের লোকরা তবে কি পাপে ভূমিকম্পে প্রাণ বা সম্পত্তি হারাইল?

ডক্টর আম্বেদকার ভারত সরকারের মন্ত্রী—ভারতরাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক যে ধর্ম্ম জীবনে শান্তি ও মৃত্যুতে সান্ত্বনা বলিয়া মনে করে, সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐ সব উক্তি করিয়া হিন্দুর মনে বেদনাদানের পরেও কি তিনি ভারত সরকারে মন্ত্রী থাকিতে পারেন? ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠা লোকমতের উপর এবং এ রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক হিন্দু।

ডক্টর আম্বেদকার যদি সরকারের সহিত সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম বিরোধী প্রচার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন, তবে তাঁহার আন্তরিকতা বুঝা যাইবে এবং কেহ তাহাতে আপত্তি করিবে না। কিন্তু তিনি যে এইরূপ মতপ্রকাশের পর আর মন্ত্রী থাকিতে পারেন না, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব।

সোমনাথ—

সমারোহ সহকারে প্রভাস তীর্থে পুনরায় সোমনাথের মন্দির গঠিত ও তাহাতে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোমনাথের মন্দিরের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। একদিকে পরধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানের মন্দির ধ্বংসের কার্য্য, আর একদিকে হিন্দুর অবিচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস—সোমনাথে উভয়ের পরিচয় অন্ধকার ও আলোকের মত সপ্রকাশ ও সুপ্রকাশ। বারাণসীতে বিশ্বনাথের আদি মন্দির ভাঙ্গিয়া তথায় মসজেদ নির্ম্মাণ যেমন হিন্দুর হৃদয়ে বেদনাদায়ক—সোমনাথের মন্দির ধ্বংস তেমনই তাহার পক্ষে পীড়াদায়ক। সোমনাথের মন্দির—নীলোর্ম্মিময় সমুদ্রের কূলে হিন্দুস্থানের এই বৃহত্তম মন্দির হিন্দুর স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রতীক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হান্টার যে বলিয়াছেন—

"Hinduism was for a time submerged, but never drowned, by the tide of Muhammedan conquest."

সোমনাথ তাহারই প্রমাণ। ছয় বার এই মন্দির অপবিত্র করা হইয়াছে এবং ছয় বার ইহা বিপুল উৎসাহে পুনর্গঠিত হইয়াছিল। আজ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় এই মন্দির সপ্তম বার নির্ম্মিত হইল—তাই আজ লক্ষ ভক্তের কণ্ঠোত্থিত আনন্দরবে আকাশ বাতাস মুখরিত।

গজনীর মামুদ কর্ত্তৃক সোমনাথ মন্দির অপবিত্রীকরণ ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ—সে অধ্যায় হিন্দুর ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে অন্ধকার যুগের ইতিহাস—তাহা বর্ব্বরতার অভিযানের ইতিহাস। তাহার পূর্ব্বে ভারতের নানাদিগ্দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত নরনারী ভক্তির অর্ঘ্য ও মণিমাণিক্যাদি উপহার লইয়া প্রভাস তীর্থে আসিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিত। তখন সহস্র সেবক মন্দিরে পূজার্চনে নিযুক্ত থাকিতেন, দশ সহস্রাধিক গ্রামের রাজস্ব দেব-সেবায় ব্যয়িত হইত। পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও সেই অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে—মৌন গৌরবের স্মৃতি বহন করিতেছে।

ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার পরে যখন জুনাগড়ের নবাব জুনাগড় পাকিস্তানভুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন ভারত সরকারের পক্ষে সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল জুনাগড়ের চারিদিকে ভারতরাষ্ট্রে সেনা-সন্নিবেশ করেন এবং জুনাগড়ের প্রকৃতিপুঞ্জ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নবাব ভয়ে পলায়ন করেন এবং সর্দ্দারজী সমারোহসহকারে তথায় প্রবেশ করেন। সেই সময় তিনি যখন দুই ঘণ্টার জন্য প্রভাস পত্তনে গমন করেন, তখন তাঁহার সঙ্গী কাকাসাহেব গাডগীল বলেন, "সোমনাথের মন্দির পুনর্গঠিত করিলে হয় না?" সর্দ্দারজী সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং কাকাসাহেব ঘোষণা করেন—মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইবে।—এখন ধ্বংসের স্থান গঠন অধিকার করিবে—যাহা ধ্বংস করা হইয়াছে, তাহা পুনর্গঠিত হইবে। জয়ধ্বনির মধ্যে জামসাহেব ঐ কার্য্যের জন্য লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

১০২৫ খৃষ্টাব্দে মামুদ সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার পরে কয় বার মন্দির বিধ্বস্ত ও পুনরায় নির্ম্মিত হয়। গুর্জ্জরের সৌভাগ্যলোপের ফলে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাদল—প্রতারকের চেষ্টায় জয়ী হইয়া—বীর রাজপুতদিগকে নিহত করিয়া মন্দির ধ্বংস করে। ঔরঙ্গজেবের শাসনের পরে আর মন্দিরে দেবপ্রতীক ছিল না। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাণী অহল্যাবাঈ মন্দিরে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মন্দির তখন ভগ্নদশায়। সেই জন্য তিনি ষষ্ঠ মন্দিরটি নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন।

এইবার সপ্তম মন্দির নির্ম্মিত ও তাহাতে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারত সরকারই ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, সোমনাথ যখন ভারতবাসীর তখন ভারতবাসীরাই মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিবে।

ভারতরাষ্ট্রকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করা হইয়াছে। সেই জন্য নবনির্ম্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠোৎসবে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে রাজনীতিকোচিত সতর্কতার পরিচয় যত প্রকট, ভক্তির আবেগ তত সংযত এবং অনাচারের প্রতিবাদ তত দুর্ব্বল। তিনি সোমনাথের নবনির্ম্মিত মন্দিরে যাইয়া কিন্তু হিন্দুভারতের "অতীত-গৌরবকাহিনী" বাণী শ্রবণে বিরত হইতে পারেন নাই—সে বাণী শঙ্খকণ্ঠের জয়ধ্বনিতে সাগরকল্লোলের মত ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তথায় তাঁহার মানসপটে অতীত ভারতের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং সেদিনের সমৃদ্ধি আবার ফিরিবে তিনি সে স্বপ্নও দেখিয়াছিলেন। তিনি মানসচক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, সোমনাথের মন্দিরের মত ভারতে জনসাধারণের সমৃদ্ধির মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

আমরা কামনা করি, তাঁহার সেই স্বপ্ন সফল হউক। আনত ভারত আবার সুদর্শনধারী মুরারির আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়াছে। দেশমাতৃকা তাহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ভারতরাষ্ট্রে আবার দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশার স্থান পরিতোষ, প্রাচুর্য্য ও প্রফুল্লতা গ্রহণ করুক, রোগ, ভোগ, শোক দূর করিয়া স্বাস্থ্য, সুখ ও সন্তোষ বিরাজিত থাকুক।

সোমনাথ মন্দিরের সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দেহোৎসর্গ স্থানে স্মারক স্তম্ভ গঠিত হইবে। আমরা যেন যুদ্ধে যেমন শান্তিতে তেমনই—বিপদে যেমন সম্পদে তেমনই গীতামুখে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের অমর উপদেশ স্মরণ করিয়া সেই উপদেশানুসারে ব্যক্তির ও জাতির জীবন গঠিত করিতে পারি—ভারতভূমিকে আবার পুণ্য ভূমিতে পরিণত করিতে পারি।

কুচবিহার—

কুচবিহারে যে জটিল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরূপ যে ভাবে সপ্রকাশ হইয়াছে, তাহা দুঃখের ও আতঙ্কের বিষয়।

গত ১২ই মে ব্যবস্থা পরিষদের একজন সদস্য কয়জন সঙ্গী লইয়া দীনহাটা মহকুমার ভিটাগুড়ীতে সভা করিবার চেষ্টা করিলে শ্রোতারা বলে, তাঁহারা বাক্‌চাতুরী বর্জ্জন করিয়া লোককে খাইতে দিবার ব্যবস্থা করুন। সভা ভাঙ্গিয়া যায় এবং শেষে দুই দলে সঙ্ঘর্ষ ও কংগ্রেসীদল যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তথায় অগ্নিযোগ হয়। কাহারা হাঙ্গামার জন্য দায়ী তাহা বলা যায় না।

কুচবিহারে কিছুদিন হইতেই চাউল ৬০ টাকা মণ দর হওয়ায় লোক অভিযোগ করিতেছিল। কিন্তু কোন প্রতীকার হয় নাই। তাহার পরে গত ২১শে এপ্রিল জানা যায়, হাঙ্গামায় নিরস্ত্র জনতার পুলিসের আক্রমণফলে ৬ জন নিহত ও ৩৩ জন আহত হইয়াছে—নিহতদিগের মধ্যে ২ জন বালিকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘটনা সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাহার অনেক কথা ভিত্তিহীন বলিয়া স্থানীয় লোকরা বিবৃতি দিয়াছেন।

পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচার করেন—২১শে এপ্রিল, প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার ঘটনা সম্বন্ধে স্থানীয় তদন্ত করিবেন, আর কতকগুলি হিসাব দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হয়—চাউলের মূল্য ৬০।৭০ টাকা মণ হয় নাই!

বেসরকারী তদন্তের দাবী সরকার স্বীকার করেন না এবং ২৩শে কুচবিহারে যে হরতাল হয়, তাহাতে তথায় সব কাজকর্ম্ম বন্ধ হয় এবং লোক ঐ বিভাগীয় তদন্ত বর্জ্জন করিতে অস্বীকার করিলে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বিডন গার্ডনে পুলিসের লাঠি চালনার পর আহত ব্যক্তিদিগের সরকারী তদন্ত কমিটীতে অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে অস্বীকৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সে কথা, বোধ হয়, কেন্দ্রী মন্ত্রী রাজাগোপালাচারীর জানা ছিল। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথা উপেক্ষা করিয়া পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন—বিচারবিভাগীয় তদন্ত হইবে। অবশ্য তাঁহার ঘোষণা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠে কশাঘাতেরই মত।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক কুচবিহারের ঘটনা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলে ৩০শে এপ্রিল কমিটী মত প্রকাশ করেন—কুচবিহারে জনতার উপর গুলী চালাইবার কোন কারণ ছিল না।

তখনও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সকল কর্ম্মচারী গুলী চালনার জন্য দায়ী তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত না করায় অসন্তোষ আরও বর্দ্ধিত হয় এবং কুচবিহারবাসীরা এমন ভাবে পুলিসকে বর্জ্জন করে যে, কেহই কোন কাজে থানায় যাইতে বিরত থাকে এবং পুলিসকে খাদ্যোপকরণাদির জন্য পুলিস ফাঁড়ীতে স্বতন্ত্র দোকান খুলিতে হয়—পুলিস বাজারে আসিতে ভয় পাইতে থাকে। কুচবিহারে বয়কট যেরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় বরিশালে কেবল তেমনই হইয়াছিল।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানসচিব কুচবিহার যখন পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হয়, তখন সদলে কুচবিহারে যাইয়া অভিনন্দিত হইয়া আসিলেও এই শোচনীয় ঘটনার পরে কুচবিহারে গমন প্রয়োজন মনে করেন নাই। কেন্দ্রী মন্ত্রী রাজাগোপালাচারী বিচারবিভাগীয় তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিবার পরেও তিনি বলিয়াছিলেন, হাইকোর্টের জজই যে তদন্ত করিবেন, এমন কোন কথা নাই—সম্ভবতঃ কোন জিলা জজই সে কাজ করিবেন।

বিভাগীয় তদন্তে কুচবিহারবাসীরা কেহই উপস্থিত হ'ন নাই এবং নিহত ব্যক্তিদিগের স্বজনগণ যাঁহাদিগকে দোষী মনে করেন সেই সকল সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে সরকারের আদালতে বিচারপ্রার্থী হইবার অনুমতি চাহিলে সে অনুমতি প্রদান করা হয় নাই!

কমিশনার তাঁহার একতরফা তদন্ত শেষ করিয়া বিমানে দিল্লী যাত্রা করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানসচিব তখন তথায় ছিলেন।

ইহার পরে ঘোষণা করা হইয়াছে বটে যে, একজন হাইকোর্ট জজ তদন্ত করিবেন, কিন্তু "ক্ষুধার সময় বহে গেলে—ভাল লাগে কি সুধা দিলে?"

কমিশনারের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করাও বোধ হয় জিলা জজই বিচার বিভাগীয় তদন্ত করিবেন—প্রধান সচিবের এই উক্তি, নিহত ব্যক্তিদিগের স্বজনগণকে মামলা করিতে অনুমতি দান না করা, যে সকল কর্ম্মচারীকে লোক অপরাধী মনে করে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে

বিলম্ব, কোন সচিবের কুচবিহারে গমন না করা—এই সকল কারণে অসন্তোষ স্বতঃই প্রবল হইয়াছে।

চন্দননগরে ও অন্য কয়টি স্থানে পশ্চিম বঙ্গের সচিবদিগের সম্বন্ধে বিরূপ ভাব প্রদর্শনের সহিত কুচবিহারের ব্যাপারের যে সম্পর্ক নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

উল্লেখযোগ্য—

(১) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক বলিয়াছেন—গুলী চালনার কোন কারণ ছিল না।

(২) ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া কুচবিহারের ঘটনাকে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সহিত তুলিত করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য—অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হগবাজারের কাছে চাউল বিক্রয়কারিণী যে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয় এবং জনরব পুলিসের পদাঘাতই তাহার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ, তাহার মৃত্যু কি হত্যা—সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন তদন্ত করিয়াছেন কি?

শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন—

ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার পরে ভারত রাষ্ট্র গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল এবং নানাদেশের শাসনতন্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ভারতীয়গণ যে সকল রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সকলে মাল্য-রচনা গ্রথিত শাসনতন্ত্র রচনা করেন এবং প্রশংসা ও ঘোষণার মধ্যে তাহাই পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। কিন্তু সে দিন যাঁহারা সেই শাসনতন্ত্র লইয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন, বৎসর অতীত হইতে না হইতে তাঁহারাই বলিতেছেন—সে মালায় মণি, কাঞ্চন ও কাচ একত্র গ্রথিত হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন যে, ভুলিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান পার্লামেণ্ট স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশের অধিবাসীদিগের প্রতিনিধিদলে গঠিত নহে এবং নূতন নির্ব্বাচনের পরে যে পার্লামেণ্ট গঠিত হইবে, শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার—ন্যায়তঃ—তাহারই। সেই জন্যই লোক সন্দেহ না করিয়া পারিতেছে না, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়া ক্ষমতা আয়ত্তে রাখিবার জন্যই পরিবর্ত্তন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন—পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য জাতির কল্যাণ-সাধন নহে—আপনাদিগের স্বার্থসাধন।

শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনজন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও তাঁহার ব্যবস্থা-মন্ত্রী যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন, সে সকলের অসারত্ব সপ্রকাশ।

প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনসমূহের মধ্যে দুইটি প্রধান। একটি জমীদারী প্রথার উচ্ছেদসাধন। কংগ্রেস জমীদারী প্রথার বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু শাসনতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জমীদারী উচ্ছেদ করিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ করা যায় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ঘটিয়াছে। কোন হাইকোর্ট তাহা করা যায় বলিয়াছেন, কোন হাইকোর্ট ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপারটি যখন সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনাধীন তখন সুপ্রিম কোর্টের সুচিন্তিত মত প্রকাশের অপেক্ষা করিলে তাহাই সঙ্গত হইত। কিন্তু মন্ত্রীদিগের আর যেন বিলম্ব সহ্য হয় না। বোধ হয়, তাঁহারা নির্ব্বাচনী প্রচারকার্য্যে বলিতে চাহেন—তাঁহারা যদিও চোরা বাজার বন্ধ করিতে অক্ষম, যদিও দেশকে অন্নবস্ত্র সম্বন্ধে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিতে অসমর্থ, যদিও পাকিস্তান সম্বন্ধে তোষণ নীতি অবলম্বন করিয়া দেশের আর্থিক ক্ষতি ও সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা প্রজা-সাধারণকে জমীদারের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহাদিগের অযোগ্যতা ও অক্ষমতা ভুলিয়া লোক যেন তাঁহাদিগকেই ভোট দিয়া ক্ষমতার পদে কায়েম মোকাম করে।

প্রধান দ্বিতীয় প্রস্তাব যে কোন গণতন্ত্রশাসিত দেশের পক্ষে কলঙ্ক-জনক। তাহা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্কোচক। কেবল সেই প্রস্তাবের জন্যই লোক বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের পতন দাবী করিলে তাহা অসঙ্গত হয় না। এই প্রস্তাবের সমর্থনে পণ্ডিত জওহরলাল যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গণতান্ত্রিকের ছদ্মবেশ "খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মত," আর যে বিকট নগ্নরূপ দেখা গেল তাহা স্বৈর শাসন-বিলাসীর। সংবাদপত্রে শাসক-দিগের যে সকল দোষ ত্রুটি সমালোচিত হয় সে সকল গোপন করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত এবং সেই জন্য তাঁহারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিতে ব্যস্ত হইয়া যে কলঙ্ক লাভ করিলেন, তাহা সপ্ত সিন্ধুর সম্মিলিত সলিলেও প্রক্ষালিত হইতে পারে না।

পার্লামেণ্টেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, জওহরলাল একদিন বলিয়াছিলেন, যত ত্রুটিই কেন থাকুক না, তিনি সংবাদপত্রের ও বক্তৃতার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে আগ্রহশীল। একজন সদস্য স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কোন জওহরলাল সাচ্চা—আর কোন জওহরলাল ঝুঠা? তাহার সদুত্তর পাওয়া যায় নাই।

সিলেক্ট কমিটী প্রস্তাবে যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে কিছুই হইতে পারে না। যাহা ত্যাজ্য, পরিবর্ত্তনের দ্বারা তাহা গ্রহণযোগ্য করা যায় না।

পার্লামেণ্টে যাঁহারা এই সব প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ দীর্ঘ-কাল ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাভাজন কর্ম্মী। তিনি শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিদিগের সহকর্ম্মী এবং স্থিরবুদ্ধি বলিয়া পরিচিত।

এই আলোচনায় শ্যামাপ্রসাদ যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। তিনি বলিয়াছেন:—

(১) শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যেরূপ যুক্তি উপস্থাপিত করা প্রয়োজন, সরকার পক্ষ সেরূপ যুক্তি দিতে পারেন নাই।

(২) যে সকল আইন বে-আইনী, সে সকল বর্জ্জন না করিয়া সরকার জনগণের প্রাথমিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া সেই সকল আইন-সঙ্গত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শ্যামাপ্রসাদ অকাট্য যুক্তি দিয়া তাঁহার উক্তি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সমগ্র রাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহ যে প্রস্তাবের নিন্দা করিয়াছেন, সরকার সেই প্রস্তাবেই অবিচলিত থাকিয়া যে মনোভাবের পরিচয় প্রকট করিয়া-

ছেন, তাহাতে সংবাদপত্রসমূহ যদি একযোগে মন্ত্রীদিগের সহিত সহযোগে বিরত হইয়া স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষায় অবহিত হ'ন এবং মন্ত্রিমণ্ডলকে বর্জ্জন করিয়া স্বাধীনতা-সঙ্কোচকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হ'ন, তবে তাহা কখনই অসঙ্গত হইবে না।

বিজ্ঞবর বার্ক বলিয়াছিলেন :—

"I have seen persons in the rank of statesmen with the conception and character of pedlars."

মতপ্রকাশের ও সমালোচনার স্বাধীনতাকে যে সরকার ভয় করেন, সে সরকার কখন গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না। যে সরকার শাসনতন্ত্র রচনা ও গ্রহণের পর বর্ষকাল অতীত হইতে না হইতে তাহার পরিবর্ত্তন করেন, সে সরকার লোকের শ্রদ্ধা ও আস্থা দাবী করিতে পারেন না।

পণ্ডিত হৃদয়নাথ বলিয়াছেন—যুদ্ধের সময় সংবাদপত্রের সংবাদ নিয়ন্ত্রণ ও পূর্ব্ব-পরীক্ষা স্বাধীনতা সঙ্কোচক ব্যবস্থা ভারত রক্ষা নিয়মের বলে সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে লোকের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় সে রাষ্ট্রের সরকার এরূপ ব্যবস্থাও ব্যবহার করিতে পারেন নাই। অথচ আজ ভারতে সেই সকল ব্যবস্থা ব্যবহারের ক্ষমতা "জাতীয়" সরকার অনায়াসে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন—তাহাতে কোনরূপ লজ্জানুভব করিতেছেন না। বাস্তবিক ইংরেজের আমলেও সরকার যে সকল ক্ষমতা ব্যবহার করেন নাই আজ ভারত সরকার সেই সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিবার অধিকার লইতেছেন। তাহার অপব্যবহারের সম্ভাবনা যে অত্যন্ত অধিক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে মন্ত্রিমণ্ডল দেশের লোকের মতপ্রকাশ-স্বাধীনতা সঙ্কুচিত না করিয়া আপনাদিগকে ক্ষমতার আসনে নিরাপদ মনে করিতে অক্ষম, সে মন্ত্রিমণ্ডলের ক্ষমতার আসনে আসীন থাকিবার অধিকার আছে কি না, তাহাও যেমন সন্দেহস্থল—তাঁহাদিগকে ক্ষমতার আসনে আসীন রাখা দেশবাসীর কর্ত্তব্যচ্যুতি কি না, তাহাও তেমনই সন্দেহস্থল। আজ দেশের লোককে সে বিষয়ে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কি তাহা বিশেষভাবেই বিবেচনা করিতে হইবে।

কোরিয়া ও চীন—

কোরিয়ার যুদ্ধ শেষ হইতেছে না এবং তাহার বিশ্বযুদ্ধে পরিণতির সম্ভাবনারও অবসান দেখা যাইতেছে না। কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে আপাততঃ যে চীনের পরাজয় ঘটিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আমেরিকা যত প্রবলই কেন হউক না, তাহার জয় যে স্থায়ী না-ও হইতে পারে, তাহা বলা অসঙ্গত নহে। যে কোন সময়ে রুশিয়া চীনের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতে পারে মনে করিয়াই আমরা এ কথা বলিতেছি না। সে সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কিন্তু তদপেক্ষাও মনে রাখিবার বিষয়—দেশবাসীর মনোবল। দেশের জনগণ যখন বিরূপ হয়, তখন কোন শক্তির পক্ষে—মারণাস্ত্রবিশারদ হইলেও—সে দেশে ক্ষমতা-পরিচালন আর সম্ভব হয় না। গত বিশ্বযুদ্ধে প্রাচীর নানা দেশে ইহাই দেখা গিয়াছে।

কোরিয়ায় যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে সাম্রাজ্যবাদেরও শক্তিপরীক্ষা হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে, এখন সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদ আর কেবল অঙ্গাঙ্গীভাবে বিদ্যমান বা অগ্রসর হয় না, পরন্তু এখন একের সহিত অপর এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে অভিন্ন বলিলে তাহা অসঙ্গত হয় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে—প্রতীচীর দেশসমূহ আর স্বতন্ত্রভাবে প্রাচীর উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করিতে পারিতেছে না দেখিয়া ও পারিবে না বুঝিয়া এখন যৌথভাবে প্রাচীতে অধিকার রক্ষার এবং শাসন না হইলেও শোষণ অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। সে জন্য প্রাচীর দেশসমূহকেও, প্রয়োজন হইলে একযোগে কাজ করিতে হবে।

পারস্য—

পারস্য তাহার তৈল সম্পদ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। যে কোম্পানী পারস্যে তৈল ব্যবসায়ের অধিকারী তাহাতে ইংরেজের স্বার্থ অল্প নহে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরেজ পারস্যে তৈল সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ছাড় লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন এবং ৮ বৎসর পরে সেই ছাড়ের বলে অ্যাংলো-পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানী গঠিত হয়। কাশর-ই-সেরিনের পরে আওয়াজে পেট্রল পাওয়া যায় এবং পারস্যোপসাগরের সান্নিধ্যে আবাদানে কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার ঐ কোম্পানীর ৩ কোটি টাকার শেয়ার কিনিলে কারখানার বিস্তার সাধন করা হয়। এখন পারস্যসরকার জাতীয় সম্পদ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করায় বৃটেন তাহার স্বার্থ রক্ষার্থ ব্যস্ত হইয়াছে। সে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটির মীমাংসার চেষ্টাও করিতেছে। পারস্য কিন্তু কাহারও মাতব্বরী অর্থাৎ মধ্যস্থতা মানিতে অসম্মত। সে বলিয়াছে, এখন কাহারও নিকট নিরপেক্ষতার আশা করা যায় না। সে এমন অভিযোগও উপস্থাপিত করিয়াছে যে, কোম্পানী হিসাবে তঞ্চকতা করিয়া পারস্য সরকারকে তাহার প্রাপ্য বহু অর্থে বঞ্চিত করিয়াছে।

ঐ অভিযোগের গুরুত্ব অসাধারণ হইলেও তাহা অসম্ভব বলা যায় না। ক্লাইবের জাল করার বিষয় সকলেই অবগত আছেন।

প্রাচী আর বিদেশের প্রভুত্ব কোনরূপেই সহ্য করিতে অসম্মত। পারস্য যদি তাহার তৈল সম্পদ জাতীয় সম্পত্তি করিতে চাহে, তবে তাহা একান্তই স্বাভাবিক বলিতে হইবে। এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অবস্থা জটিল হইয়া উঠিতে পারে, সন্দেহ নাই।

তিব্বত—

তিব্বতে চীনের অধিকার বৃটেনও অস্বীকার করিতে পারে নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন লিখিয়াছিলেন, 'চীন সে অধিকার মূল্যবান বলিয়া মনে করে। এতদিন পরে পুনর্গঠিত চীন সেই অধিকার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চীন প্রথমেই শান্তিপূর্ণভাবে তিব্বতকে মুক্তি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছে—তাহাকে স্বায়ত্ত-শাসনশীল রাজ্যাংশে পরিণত করিতেছে। ইহা চীনের পক্ষে যেমন গৌরবজনক, তিব্বতের পক্ষে তেমনই কল্যাণকর। তিব্বত এতদিন রহস্যরাজ্য ছিল এবং সে তাহার রহস্য ভেদের পথ রুদ্ধ রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। সেই জন্য তাহার উন্নতির সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত ছিল। এখন, বোধহয়, সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। (১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮)

(পূর্বানুবৃত্তি)

—এটা আবার কি পুতুল রে। এটা?

দারোগো দরবারী হালদার হাতের ছড়ি বাড়াইয়া বলিল—এগুলো কি করেছিস? এ্যাঁ?

গাজনের মেলায় কবিগান চলিতেছে। গানটা খুব জমিয়াছে। পাচ সাত হাজার লোক গিস্‌গিস্ করিতেছে। রাত্রি প্রায় এগারটা। দরবারী হালদার মেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মেলার খেলার কাণ্ড—কোথায় কখন কি ঘটে কে বলিতে পারে! এ ছাড়া চোর ডাকাত বে-আইনী আবগারী কারবার এ সব তো আছেই।

নলিনের দোকানে বেশ লোক জমিয়াছে। নলিনের ভাগ্য ভাল। জোর বেচাকেনা চলিয়াছে। এবার ওই নতুন পুতুল—তপস্বিনীই হোক—আর পূজারিণীই হোক—ওটার চাহিদা খুব। নলিন ওটার নাম দিয়াছে—ঠাকরুণ-পুতুল। ইতিমধ্যেই গোটা চল্লিশেক বিক্রী করিয়াছে—আর গোটা দশেক মাত্র আছে, তাহার কোনটা একটু ভাঙা—কোনটার রঙ চটা—কোনটা পোড়াইবার বা শুকাইবার সময় অল্প স্বল্প বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছে। তবে যে রকম চাহিদা তাহাতে ও কয়টাও আর পড়িয়া থাকিবে না। তাহার আফশোষ হইতেছে, আরও শত খানেক অন্তত পঞ্চাশটাও কেন সে গড়ে নাই!

গড়ে নাই অবশ্য ভয়ে। এ পর্য্যন্ত যত পুতুল সে গড়িয়াছে—সেগুলা আসলে বাজার চলতি পুতুলেরই নকল। বাজার চলতি চিনামাটি, স্যালুলয়েডের পুতুল কিনিয়া সেইগুলি সামনে রাখিয়া খানিকটা এদিক-ওদিক করিয়া সে পুতুল গড়িত। তাহার পর সেগুলি হইতে ছাঁচ তৈয়ারী করিয়া লইত। স্বাধীন কল্পনায় পুতুল তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা তাহার অনেক দিন হইতেই হইয়াছে কিন্তু সাহস হয় নাই। এ বিষয়ে দেবু মাষ্টার তাহার দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছিল। পরিকল্পনা জোগাইয়া—ছবি দেখাইয়া সে তাহাকে দিয়া পোষ্টার আঁকাইয়া লইত। একবার তাহাকে বলিয়াছিল—মনে কর খুব একটা বড় জোয়ান—কিন্তু খেতে না-পেয়ে পাঁজরায় হাড় বেরিয়েছে—তাকে কেউ শেকল দিয়ে বেঁধেছে, সে কিন্তু বাঁধা থাকবে না, ছিঁড়বে শেকল। আঁক।

তবুও নলিনের কল্পনা ভাল খেলে নাই। তখন দেবু বলিয়াছিল—ভল্লা দিগে—পুলিশের বেঁধে নিয়ে যাওয়া মনে আছে? মনে কর রামভল্লাকে শেকল দিয়ে বেঁধেছে—রাম—ছিঁড়ে পালিয়ে আসবে। আঁক।

এবার তাহার মনে ছবিটা আসিয়াছিল। বেশ ভালই হইয়াছিল সে-ছবিখানা।

আর একখানা ছবির কল্পনা দিয়াছিল এই ভাবে। বলিয়াছিল—রামভরোসা পিঠে বস্তা বয় দেখেছিস তো? তাই আঁক—কিন্তু বস্তাটা—বস্তা হবে না—হবে একজন শেঠ। বুঝলি না, ওই যে—বড় শেঠের সেজ ছেলেটা—দেখেছিস তো—কি মোটা, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি;—ওই ওকেই চাপিয়ে দে। পিঠের বস্তাটার একদিকে ওর মুখ এঁকে দে, একদিকে ছোট ছোট কিন্তু মোটা মোটা দুটো পা!

এই ভাবেই তাহার স্বাধীন কল্পনার বিকাশ হইয়াছিল। একদিন একটা হনুমানের ছাঁচ তৈয়ারী করিতে করিতে মনে হইয়াছিল—এমনি একটি শেঠ মূর্ত্তি তৈয়ারী করিলে কি হয়। প্রকাণ্ড ভুঁড়ির উপর ছোট একটি মুণ্ড—তাহার উপর প্রকাণ্ড পাগড়ী, খাটো মোটা পায়ে এই বড় নাগরা—এই কল্পনায় ছোট পুতুল তৈরী করিলে সে কি এই বুড়া বা হনুমান বা সার্কাসের ক্লাউন এ সব পুতুলের চেয়ে কম কৌতুককর হইবে? কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া সাহস হয় নাই। শেঠেরা দেখিলে—মহা বিপদ ঘটিবে। এখানে ব্যবসার পাট উঠাইয়া পলাইতে হইবে। একবার ইচ্ছা হইয়াছিল—গলাকাটা দরবারী হালদারের মত মুখ, আর

ভূতের মত হাত-পা করিয়া যমদূত পুতুল তৈরী করে। কিন্তু সেও সাহস হয় নাই।

এবার এ মূর্ত্তিটি গড়িতে ভয়ের কিছু তাহার মন বা হাতকে পঙ্গু করিয়া দেয় নাই। শুধু খানিকটা লজ্জা অনুভব করিয়াছিল। তাহার পর একটা ঘটনায় তাহার এ লজ্জা কাটিয়া যায়। কল্পনাটার বীজ অবশ্য অরুণাই বটে; যেদিন তিনি প্রথম বিধবার বেশে একাদশীর উপবাস ক্লিষ্ট মুখে ট্রেণ হইতে নামিতেই পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া থানায় লইয়া যায়—সেই দিন তাহার মনে এ বীজ ঝরিয়া পড়িয়াছিল। তারপর তাঁহার আচারে-আচরণের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে করিতে একদিন সে বীজ ফাটিল। একদিন যে অরুণা দিদি জমিদারের ছেলের বাড়ানো হাতের সম্মুখ হইতে পুতুলটা ছোঁ দিয়া তুলিয়া লইয়াছিলেন—সেই অরুণা দিদির এই ঘোর পরিবর্ত্তনে সে শুধু বিস্মিতই হয় নাই—মুগ্ধ হইয়াও গিয়াছিল। ইচ্ছা হইয়াছিল একখানি ছবি আঁকে। কিন্তু লজ্জা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল—লোকে কে কি বলিবে! এখানকার লোকের রীতি চরিত্র তো তাহার অজানা নয়! আর অরুণা দিদিও হয় তো বিরক্ত হইতে পারেন। এই সব ভাবিয়াই সে মনের ইচ্ছা মনেই রাখিয়াছিল। ইহার পর অজয়ের সন্ধান লইয়া তাহার সঙ্গে অরুণার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট হইয়া উঠিল। মনের ইচ্ছা দিন দিন সতেজ অঙ্কুরের মত মাথা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন একখানা মাসিকপত্র তাহার হাতে পড়িল। সুরপতিবাবুদের পাড়া হইতে একখানা ছেঁড়া মাসিকপত্র বাবুদের পাড়ার একটা চাকরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিল সে। চাকরটা ওটাকে সংগ্রহ করিয়াছিল—একখানা রঙীন নগ্নপ্রায় তরুণী মূর্ত্তির ছবির জন্য। ছবিটা ছিঁড়িয়া লইয়া সে বইখানা নলিনকে দান করিয়া দিল; নলিন তাহাকে বিনিময়ে চা-সিগারেট খাওয়াইল। নলিন এই ভাবে বই পাইলে—ছবি দেখে, পড়ে। বেশ লাগে তাহার। ওই বইখানার মধ্যেই ছিল—শ্রী মায়ের ছবি। নলিন মুগ্ধ হইয়া গেল। দিন দুয়ের মধ্যেই তাহার শিল্পী মানসে—দুইটি ছবি মিশিয়া একটি নূতন ছবি জাগিয়া উঠিল। তুলিতে পটে সে ছবিটি প্রথম আঁকিয়া অতি যত্নে একটি পুতুল গড়িল। তার পর ছাঁচ গড়িল। এই হইল ছবির মূল রহস্য। এই ছোট পুতুলের মধ্যেও কেমন করিয়া যে দেহ গঠনের কৃশ ভঙ্গি এবং মুখাবয়বের মধ্যে অরুণার সঙ্গে একটি ক্ষীণ সাদৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সে নিজেও তাহা সঠিক জানে না। তবে আসিয়াছে এটা ঠিক। সেটা অবশ্য তাঁহার চোখ এড়ায় নাই, কিন্তু এই ক্ষীণ সাদৃশ্য কাহারও চোখে ঠেকিবে এটা সে ভাবে নাই। কিন্তু রামভরার চোখে কি করিয়া যেন ঠেকিয়া গেল এবং ওই ..টা ওই হাঁকিয়ে ডাকিয়ে মানুষটি হাঁক ডাক করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। তাহার ফলে ক্ষীণ সাদৃশ্যটুকু প্রবল এবং অসামান্য হইয়া লোকের চোখে পড়িল—না—লোকেরা নিজেরাই প্রভাবিত দৃষ্টিতে এমন প্রবল ও অসামান্য করিয়া দেখিল—সেটা নলিন ঠিক বুঝিল না। বুঝিতেও চাহিল না। শুধু ভয় ছিল—যদি কেহ কোন কুৎসিৎ বা অমর্য্যাদাকর মন্তব্য করে। কিন্তু আশ্চর্য্য—তাহাও কেহ করিল না।

নলিন খুসী হইল। মনে মনে তাহার একটি গভীর আত্মতৃপ্তিও জাগিয়া উঠিল। নিজে নির্জ্জন অবসরে পুতুল লইয়া বারবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। দেখিল—মূর্তিটিতে যার সাদৃশ্যই থাকুক—যে সুষমা—মূর্তিটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে সে কাহারও নয়—সে একান্তভাবে তাহার হাতের পুতুলেরই নিজস্ব। নিজের হাতের এমন কৃতিত্বে সে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু একটা আশঙ্কা তাহার আছে। অরুণা দিদিমণি—কি বলিবেন?

দেবু ও স্বর্ণ আসিয়াছিল একদিন। দেবু তারিফ করিয়াছে। উৎসাহ দিয়া বলিয়াছে—এইবার—আরও নতুন নতুন গড়। যা ভাল লাগবে গড়ে যা।

স্বর্ণ একটু হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল—বেশ হয়েছে!

রাত্রে দরবারী হালদার আসিয়া দোকানের সামনে দাঁড়াইল। রাত্রি প্রায় এগারটা। দোকানের সামনে এখন আর ভিড় নাই। ভিড় এখন—কবিগানের আসরের চারিদিকে। আর ভিড় আসা যাওয়ার। কতক খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিতেছে, কতক বাড়ী ফিরিতেছে। নলিন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—আঃ—আরও শত-খানেক—অন্তত—গোটা পঞ্চাশেক পুতুলও সে যদি গড়িত। মেলার মধ্যে আর গড়িয়া ফেলা সম্ভবপর হইবে

! যাক্। আবার মাসখানেক পরে ধর্ম্মরাজ পূজার টিথাটো মেলা আছে। এবার বেশী করিয়া গড়িবে। র ভাবিতেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি আসিতেছে, রপতিবাবুদের পাড়ার ছেলেরা আজ তাহাকে বলিয়া য়াছে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেখিয়া একটি বেশ বড় র্ত্তি গড়িয়া দিতে হইবে। পুতুল গড়িলে কি হয়? গান্ধী জার পুতুলও গড়িলে বেশ বিক্রী হয়!

ঠিক এই সময় দরবারী হালদার কবি আসরের দিকে ইবার পথে—দোকানের সামনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল! জের ছড়িটা দিয়া দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এটা বার কি পুতুল রে? এগুলো কি করেছিস? এঁ্যা?

নলিন চমকিয়া উঠিল—আজ্ঞে?

দরবারী হালদার চটিয়া গেল। তাহার মেজাজই ওই কম। লোকটি প্রকৃতিতে যত রুক্ষ—ব্যবহারেও তত , তাহার উপর সামন্ত সাহেবের দক্ষিণ হস্ত সে। প্রশ্রয় াইয়া পাইয়া লোকটা দুর্বিনীত হইয়া উঠিয়াছে। সে ায়ের জুতার ডগা দিয়া একটা পুতুলকে ফুটবলের মত ক্ করিয়া দিয়া বলিল—এটা? এটা? এটা আবার ক পুতুল?

পুতুল ভাঙিয়া তো গেলই এবং ভাঙা একটা টুকরা টিয়া গিয়া নলিনের কপালে গিয়া লাগিল। কপালটা ানিকটা কাটিয়াও গেল। ভয়ে নলিনের বুকটা গুর গুর রিয়া উঠিল। দরবারী দারোগার প্রতাপ তাহার অজানা য়, ইহার পর দারোগা কি করিবে সে ভাবিয়া আতঙ্কিত ইয়া উঠিল। যদি সমস্ত পুতুলগুলাই ভাঙিয়া চুরমার রিয়া দেয়!

হালদার কিন্তু তাহা করিল না। সে এবার একটা তুল তুলিয়া লইয়া ভাল করিয়া দেখিল—দেখিয়া বলিল— । বলিহারি, বলিহারি। তোর হাত তো ভাল রে! নেকটা এনেছিস তো। অনেকটা এসেছে! তা'—ওই য়েটাকে এমন করে ঠাকুর বানালি কেন? ওটা তো— কটা—। একটা কুৎসিত কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল।

নলিন চুপ করিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। আশ-াশে কতকগুলি লোক ইহারই মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, ারোগার ভয়ে একটু দূরে-দূরে ছড়াইয়া ছিল, এইবার তাহারা আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

—কি নলিন, কি হয়েছে ভাই?

নলিন চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল। উত্তর দিতে সাহস হইল না। একজন প্রত্যক্ষদর্শী চুপি-চুপিই বলিল— ওই পুতুল—।

—কোন পুতুল?

—এই যে—নতুন ঠাকরুণ-পুতুল গড়েছে এবার; ওই দেখে একবারে চটেমটে লাল। লাথি মেরে একটা পুতুলকে ভেঙে—

—কি হয়েছে? কি হয়েছে ভাই? কি ব্যাপার?

নলিন এবার প্রমাদ গণিল। লোক জমিতেছে। ব্যাপারটা লইয়া হৈ-চৈ শুরু হইবে; হয় তো হল্লা করিবে; তাহার পর মরণ হইবে তাহার। আবার আসিবে হালদার দারোগা, ইহারা সকলে যে যেদিক খোলা পাইবে পালাইবে। দারোগা তাহাকে লইয়া পড়িবে। সে এবার বলিল—কিছু হয় নাই ভাই, কিছু হয় নাই! যাও যাও ভাই আপন আপন পথে যাও। আমি দোকান বন্ধ করব। সর—ভাই—সর।

—কিছু হয় নি তো তোমার কপাল কাটল কি ক'রে? একটি ছেলে আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া সামনে দাঁড়াইল। ছেলেটি গৌরের অনুচর। খবরের কাগজ ফিরি করিয়া বেড়ায়। সে কথাবার্ত্তা ঠিক শুনিতে পায় নাই—বেশ খানিকটা দূরেই ছিল, কিন্তু দারোগার লাথি মারিয়া পুতুল ভাঙা দেখিয়াছিল। কাছে থাকিলে সে প্রতিবাদ করিত, কিন্তু আসিতে আসিতেই দারোগা চলিয়া গিয়াছে। নলিন গৌরের চেলাকে দেখিয়া ভড়কাইয়া গেল। ছেলেটি বলিল—আমি দারোগার লাথি মারা স্বচক্ষে দেখেছি। দূরে ছিলাম—ঠিক ব্যাপারটা কি জানি না। নলিন তোমাকে বলতে হবে, তুমি বল কি হয়েছে।

এবার প্রত্যক্ষদর্শীটি উৎসাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে বলিল—নলিন না বলুক—আমি বলছি। আমি সব দেখেছি—সব শুনেছি। এই—এইখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমিও ওই পুতুল দেখছিলাম কি না—! দারোগা এসে দাঁড়াল, আমি আর এগুতে পারলাম না। পাশের ওই দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। ভাবলাম— দারোগা চলে যাক—

অসহিষ্ণু দর্শকের দলের মধ্য হইতে কে বলিল—কি হয়েছিল তাই বলহে বাপু। এত ভনিতা শুনব না আমরা।

লোকটি এবার আনুপূর্ব্বিক ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া গেল। বেশ একটু উত্তেজনাভরেই সে সমস্ত কথা বলিয়া গেল। শেষে বলিল—যাবার সময় যে গাল দিয়ে গেল, বলে গেল—

—কি? কি বলেছে—বল?

—বললে—। বললে একটা খারাপ মেয়েকে নিয়ে ঠাকুর তৈরী করেছে। বললে—তুই বেটাও মজছিস না কি?

জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং জনতাও তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। প্রায় শতখানেক লোক জমিয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়—এদিক ওদিক হইতে—আরও লোক এই জনতা লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

—কি?—কি? ব্যাপার কি?

—এ তো বড় অন্যায়! এ যে অত্যাচার! অরাজক না কি?

কতক লোক সংবাদটা শুনিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

—কি? কি হয়েছে? সর, সর সব। হটো—হটো।

সুরপতি এবং জীবন দে আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।—কি হয়েছে? সুরপতি জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—যাও—যাও সব। সরে যাও লক্ষ্মীরা সব। আমি এসেছি—জীবন এসেছে। আমরা সব শুনে যা' হয় করছি। যাও তোমরা, যাও! ভিড় করো না। ভিড় করো না।

জীবন ডাকিল—নলিন!

নলিন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কিছু বা কাহাকেও দেখিতেছে। স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে—দৃষ্টিতে প্রশ্ন—ভ্রূর কুঞ্চন রেখায় জিজ্ঞাসা চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—নলিন! এই!

নলিন চমকিয়া উঠিল।—আজ্ঞে?

—কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

—ব্যাপার আর কি শুনবেন? ওই সব যা বলছে—তাই সত্যি।

—না। তোর মুখ থেকে শুনব। চল, ভেতরে চল বসতে দে। সুরপতিদা!

—যাই।

ভিড় তখন সরিতে সুরু করিয়াছে। সুরপতি আবার বলিল—তোমরা যাও ভাই—কবিগান শোন গিয়ে। আমাদের ওপর ভরসা রাখ। আমরা প্রতিকার করব। নিশ্চয় করব। অন্যায় করলে, দারোগাই হোক আর হাকিমই হোক—আমরা ছাড়ব না। যাও, যাও।

সুরপতি এবং জীবনের অনুচরের দল—তাহারাই মেলার ভলেন্টিয়ার—তাহারাও জনকয়েক জুটিয়াছিল—তাহারা লোকজনদের ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

সুরপতিও ভিতরে আসিয়া বসিল।—বল তো নলিন—কি হয়েছে। সত্যি বলবি বাবা। কিন্তু—

সচকিত হইয়া সুরপতি বলিল—ঘটনার সময় যারা ছিল—তারা—মানে তাদের চিনিস তো তুই? এঃ—এঃ বড্ড ভুল হয়ে গেল! তাদের—

জীবন বলিল—তুই এমন করে কি দেখছিস বল তো?

নলিন বলিল—ভিড়ের মধ্যে মনে হল—

কথা তাহার শেষ হইল না; পর পর একটা দুইটা তিনটা পটকার আওয়াজের মত শব্দ উঠিল; কিন্তু পটকার আওয়াজ নয়।

সুরপতি সর্ব্বাগ্রে চমকিয়া উঠিল।—পিস্তল? কি হ'ল? দরবারী—হালদার—?

ওদিকে মেলার আসরে প্রচণ্ড কোলাহল উঠিল; লোকজন ছুটিয়া পলাইতেছে।

—কি হ'ল?

জীবন এবং সুরপতি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।—কি হল?

—দারোগাকে গুলি করেছে।

—দারোগাকে গুলি করেছে কে?

—একটি ছেলে।

—ছেলে?

—হাঁ। চীৎকার করে বললে—আমার মাকে তুমি অসতী বলেছ—

তাহার কথার উপরেই নলিন বলিয়া উঠিল—আমি দেখেছি—আমি দেখেছি। আমি যে তাকেই খুঁজছিলাম। ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল। বিশু দাদাঠাকুরের ছেলে! চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল—।

সুরপতি ও জীবন ছুটিয়া গেল আসরের দিকে।

(ক্রমশঃ)

ামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির—

গত ১১ই মে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্মতিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মহংস দেবের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুর ৱামকৃষ্ণের জন্মস্থানে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মিত ামকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়াছে। রামকৃষ্ণ ানের সহ-সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দ শুভ উদ্বোধন উৎসব াদন করেন। খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু মন্দিরের ৱকল্পনা প্রস্তুত করেন। লাল বেলে-পাথর ও মার্বেলে

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি-মন্দির—কামারপুকুর

ন্দির মণ্ডিত হইয়াছে। ঠিক যে স্থানে বাড়ীর ঢেঁকি-লে ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল, তথায় মন্দির নির্মিত হইয়াছে মন্দিরে ঠাকুরের এক সুন্দর মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। ন্দির গাত্রে স্থান-পরিচয় হিসাবে একটি ঢেঁকি অঙ্কিত ইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৫০ হাজার ক তথায় ঐ দিন সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ দিন ালে স্বামী শঙ্করানন্দের নেতৃত্বে একটি মিছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি লইয়া ভজন ও কীর্তন গান করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। শিবপুরনিবাসী শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ মন্দির নির্মাণের অধিকাংশ ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। সুদূর গ্রামে এই

ভগবান রামকৃষ্ণের মর্ম্মর-মূর্তি

মন্দির প্রতিষ্ঠার ফলে লোকের ঐ তীর্থক্ষেত্র দর্শনের সুবিধা হইবে। বাংলার খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কয়দিন তথায় বাস করিয়া সকল বন্দোবস্তের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়—

৫০ বৎসর পূর্বে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরের মাঠে ৫জন মাত্র ছাত্র লইয়া (তন্মধ্যে ১জন তাঁহার নিজের পুত্র) যে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আজ ভারতের কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে ও কেন্দ্রীয় সরকার তাহার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলেও

বিশ্বভারতী সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত হইবে না—নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বভারতীর সকল বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইবে। ১৯০৪ সালে ঐ বিদ্যালয়ের আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দ্বিজ-বংশীয় বালকগণ যে ভাবে, যে প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্তমান প্রচলিত পাঠ্য বিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরু শিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্বক শুদ্ধ শুচি সংযত শ্রদ্ধাবান হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবে, এই আমার সংকল্প ছিল।" ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে তিনি বলিয়াছিলেন —"এই আশ্রমে প্রাণ সম্মেলনের যে কল্যাণকর সুন্দর রূপ জেগে উঠেছে, সেটিকে প্রকাশ করাই আমার কাজ। * * গ্রামের অব্যক্ত বেদনা যেখানে প্রকাশ খুঁজে ব্যাকুল, আমি তার মধ্যে। * * এই ধুলো মাটি ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ঔষধির মধ্যে।" আমাদের বিশ্বাস, নূতন বিধানের পরও রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ যাহাতে বজায় থাকে, সকলে সে বিষয়ে সর্বদা জাগ্রত মনোভাব লইয়া কাজ করিবেন।

ডাঃ স্নেহময় দত্ত

গত মাসে ইঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিয়োগের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি পরলোকগত

বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ফটো—ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক

বিরাট দান—

কলিকাতা হাইকোর্টের তরুণ ব্যারিষ্টার রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীনির্মলকুমার দে সম্প্রতি তাঁহার প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার সমুদয় সম্পত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়া সস্ত্রীক নিজে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতে গিয়াছেন। ঐ টাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের রহড়াস্থ (২৪পরগণা) বালকাশ্রম ও রাঁচীস্থ যক্ষ্মা-চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য ব্যয়িত হয়—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। জাতীয় কল্যাণের জন্য এরূপ দান চিরদিনই লোক শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। ব্যারিষ্টার নির্মলবাবুর এই অসাধারণ দান তাঁহাকে অমরত্ব দান করিবে।

শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ—

১০ই এপ্রিল শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বহুদিন সহকারী সেক্রেটারীর কাজ করিতেছিলেন। ১৯০৬ সালের মে মাসে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯৩০ সালে এম-এ পাশ করেন ও মেদিনীপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ সালে বিপ্লববাদী

বলিয়া তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলা হইতে নির্বাসিত করা হয়। ১৯৩৪ সাল হইতে তিনি কর্পোরেশনে কাজ করিতেছেন। ১৯৪১ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি ভারত রক্ষা আইনে কারারুদ্ধ ছিলেন।

মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস—

কলিকাতা ৭নং চৌরঙ্গী রোডের মেসার্স হোয়াইট-ওয়ে লেড্‌ল'র বিরাট অট্টালিকা সম্প্রতি মেট্রপলিটান ইন্সিওরেন্স কোং ক্রয় করিয়া গত ১২ই মে তথায় নূতন অফিসের উদ্বোধন করিয়াছেন। অফিসের জন্য নির্দিষ্ট অংশের নাম 'মেট্রপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস' ও আবাসিক অংশের নাম 'সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স' রাখা হইয়াছে। ২০ বৎসর পূর্বে স্বর্গত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য ঐ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কোম্পানীর বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সেদিন উৎসবে সকলকে অভ্যর্থনা করেন ও কোম্পানীর ইতিহাস বিবৃত করেন। উৎসবে সহরের গণ্যমান্য বহু ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীঅনন্ত আচার্য্য মিলন উৎসব—

গত ৬ই মে ২৪পরগণা বারুইপুরের নিকটস্থ আটিসারা গ্রামে শ্রীঅনন্ত আচার্য্যের সহিত মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের মিলন তিথি উপলক্ষে আচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে এক উৎসব হইয়াছিল। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন ও কবি শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সভার উদ্বোধন করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু যখন পুরীধামে গমন করেন, সেই সময় তিনি আটিসারা গ্রামে আচার্য্যের গৃহে অতিথি হইয়া এক রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। ঐ পুণ্য তিথিকে স্মরণ করিবার জন্যই সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী তথায় উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সেকস্‌পীয়র পরিষদ—

বাঙ্গালা দেশে সেকস্‌পীয়রের নাটকের আলোচনা ও পাঠ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া কলিকাতায় বঙ্গীয় সেকস্‌পীয়র পরিষদ গঠিত হইয়াছে। শ্রীঋষিদাস, অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসু, অধ্যক্ষ প্রফুল্লকুমার গুহ, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেন, অধ্যাপক মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া সেজন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালার সাংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার এই চেষ্টা সর্বথা প্রশংসনীয়।

নৃত্যশিল্পী কুমারী অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়—

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত, নৃত্যশিল্পী কুমারী অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে ছাপা হইয়াছে—"সর্বাপেক্ষা বয়ঃ-কনিষ্ঠা বলিয়া বিচারকগণ তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীর

নৃত্যশিল্পী কুমারী অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিব নৃত্যের ভঙ্গিমায়

সম্মান দান করিয়াছেন। ইহা ভুল।—পরীক্ষায় অর্পিতার সকল নৃত্যের সাফল্যাঙ্কের যোগফল সকল বিভাগের প্রতিযোগিনীদের অপেক্ষা অধিক হওয়ায় পরীক্ষকগণ তাহাকে ঐ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর (Best dancer) সম্মান দান করিয়াছিলেন।

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মুরলীধর গার্লস কলেজে গীতিকা সঙ্গীত প্রতিযোগিতার তৃতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে কুমারী অর্পিতা 'খ' বিভাগে কথাকলি, মণিপুরী ও আধুনিক

নৃত্যে—পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনটি পুরস্কার পাইয়াছে। এই সঙ্গে তাহার শিব নৃত্যের একটি ছবি প্রকাশিত হইল।

আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতিপ্রচার—

আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের জন্য পরমহংস যোগানন্দ গত ৮ই এপ্রিল কালিফোনিয়ার লস্ এঞ্জেলস

আমেরিকায় স্বামী যোগানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'ভারত ভবন'—গত ৮ই এপ্রিল 'ভারত ভবন' প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় আমেরিকায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম

'ভারত ভবন' প্রতিষ্ঠা দিবসে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ—উপবিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, কালিফোর্নিয়ার গভর্ণর প্রভৃতি এবং মধ্যভাগে স্বামী যোগানন্দ বক্তৃতারত

সহরে 'ইণ্ডিয়া হাউস' নাম দিয়া একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কালিফোর্নিয়ার লেপ্টেনান্ট গভর্ণর মিঃ নাইট উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং ভারতীয় কন্সাল জেনারেল শ্রীএম-আর-আহুজা সানফ্রান্সিস্কো হইতে যাইয়া উৎসবে যোগদান করেন। ইণ্ডিয়া হাউসে 'মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি পাঠাগার' নামে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ও যোগানন্দের ভ্রাতার অঙ্কিত মহাত্মার এক তৈল চিত্র সভাগৃহে স্থাপিত হইয়াছে। ঐ দিন তথায় প্রায় ৮শত ভক্তকে এক ভোজে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল।

কাপগাড়ীতে সেবাভারতী—

ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর) কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীপবিত্রকুমার সেন ও বিশ্বভারতী বিনয় ভবনের বুনিয়াদী শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅনিলমোহন গুপ্তের পরিচালনায় মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার জাম্বনী থানার কাপগাড়ী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ১৫০ বিঘা জমীর উপর জনশিক্ষাকেন্দ্র সেবাভারতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার ১১৯ বিঘা জমী চিল্‌কীগড়ের রাজা বিনা সেলামীতে জমা দিয়াছেন। উহা তৈয়ারী জমী নহে—বহুকালের পতিত ডাঙ্গা জমী। তথায় ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে ঘরবাড়ী, কুয়া, বিদ্যালয় প্রভৃতি করা হইয়াছে। একটি ন্যাস সমিতির উপর প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভার প্রদত্ত হইয়াছে। সংযম ও সেবার ভিত্তিতে গঠিত বিকেন্দ্রিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, শোষণহীন সমাজ গড়িয়া তোলাই সেবা-ভারতীর উদ্দেশ্য। তথায় জীবনকেন্দ্রিক কর্মপ্রধান শিক্ষাধারার মধ্য দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাদান করা হইতেছে। তথায় শিক্ষণ-শিক্ষা, উত্তর বুনিয়াদি ও উচ্চতর শিক্ষা বিভাগগুলি আবাসিক শিক্ষালয় হইবে। কৃষিই সেবা-ভারতীর মূল ভিত্তি, কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া সেবা-ভারতীর বিভিন্ন পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিবে।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব—

হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া থানার খন্নান গ্রামের ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব হইয়া মুক্তি সংগ্রামে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গলাভের প্রায় ৪৪ বৎসর পরে গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার সন্ধ্যায় তাঁহার জন্মস্থানে মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের সভাপতিত্বে এক সভায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। গ্রামের যে স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় এখন আর কোন ঘরবাড়ী নাই—জঙ্গলে পূর্ণ স্থান।

সেখানে ঐ দিন একটি বেদী প্রস্তুত করিয়া তাহা পত্রপুষ্পে সাজান হইয়াছিল। বাংলার মুক্তি আন্দোলনে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের দান অবিস্মরণীয়। তাঁহার গ্রামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইলে দেশবাসী তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিবেন।

পরলোকে নিশীথচন্দ্র সেন—

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র, খ্যাতনামা দেশসেবক ও ব্যারিষ্টার নিশীথচন্দ্র সেন গত ১৫ই মে ৭১

নিশীথচন্দ্র সেন

বৎসর বয়সে তাঁহার বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা স্বর্গত চণ্ডীচরণ সেন সে যুগে 'ঝান্সীর রাণী', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'অযোধ্যার বেগম' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গতা মহিলা কবি কামিনী রায় নিশীথচন্দ্রের ভগিনী ছিলেন। তিনি সারাজীবন অর্থ চিন্তা না করিয়াই নির্য্যাতীত রাজনীতিক কর্ম্মী ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হিন্দুদের পক্ষ সমর্থন করিতেন। এক সময়ে তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে ও শ্রমিক কল্যাণকার্য্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্বামী বিরজানন্দ—

১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার সকাল ৭টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সভাপতি স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ ৭৮ বৎসর বয়সে মঠ-ভবনে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি মঠের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ ছিলেন ও ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাস হইতে অধ্যক্ষের কাজ করিতেছিলেন। ১৮৯৮ সাল হইতে তাঁহার পূর্ব পর্য্যন্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামী বিরজানন্দের নাম ছিল কালীকৃষ্ণ

স্বামী বিরজানন্দ

বসু। ১৮৭৩ সালের ১০ই জুন কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়—পূর্ব কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ত্রৈলোক্যনাথ বসু তাঁহার পিতা। ১৮৯১ সালে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বরাহনগর মঠে যোগদান করেন এবং ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করেন ও তাঁহার নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের দেহান্তরের সময় তিনি হিমালয়ে বাস করিতেন ও মায়াবতী আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে ইংরাজি মাসিক 'প্রবন্ধ ভারত' সম্পাদন করিতেন। ১৯১৫ সালে

হিমালয়ের সামলাতালে তিনি নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সাল হইতে ৪ বৎসর তিনি মিশনের সেক্রেটারীর কাজ করেন ও পরে সভাপতি হন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সুবৃহৎ জীবনী রচনা করেন এবং স্বামীজির গ্রন্থসমূহ সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু রচনা একত্র হইয়া পুস্তকাকারে ইংরাজি, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মধ্যে একাধারে জ্ঞান ও কর্মযোগের সমন্বয় হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধী পুরস্কার—

নিখিল ভারত রাষ্ট্র ভাষা প্রচার সমিতি আচার্য্য শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেনকে 'মহাত্মা গান্ধী' পুরস্কার দান

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

করিয়াছেন। ইহার পরিমাণ ১৫০০ টাকা এবং ইহাই সমিতির প্রথম পুরস্কার। সাধারণ ভাবে হিন্দি সাহিত্যে আচার্য্য সেনের অমূল্য অবদানের জন্য ও বিশেষ করিয়া তাঁহার 'সংস্কৃতি সঙ্গম' নামক গ্রন্থের জন্য এই পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। আচার্য্য সেনের পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়—

খ্যাতনামা বাংলা সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগের সেক্রেটারীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অতঃপর নিজেকে শুধু সাহিত্য সাধনায় নিযুক্ত রাখিবেন। তাঁহার সাহিত্য সাধনা জয়যুক্ত হউক আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

সাহিত্যিক বৃত্তি—

মুশিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারনিবাসী খ্যাতনামা প্রবীণ কবি শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট মাসিক ৫০ টাকা সাহিত্যিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোলপুর শান্তিনিকেতন নিবাসী বাংলা অভিধান প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কেও মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। উভয়েই যোগ্য ব্যক্তি—তাঁহাদের প্রতি এই ব্যবহারে বাঙ্গালী সাহিত্যিক মাত্রই আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

কেদারনাথ মন্দির—

গত ২৫শে মে হাওড়ায় 'হাওড়া হোম্‌স' নামক সেবা প্রতিষ্ঠানে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় 'কেদারনাথ' শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। হরিদ্বারস্থ ভোলানন্দ গিরি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ উৎসবে নেতৃত্ব করেন। শ্রীরামনিবাস ঝুনঝুনওয়ালা মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সকল ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। মন্দির সংলগ্ন ঝিলের নাম 'মন্দাকিনী সরোবর' রাখা হইয়াছে। হোম্‌সে যে সকল বালক বালিকা বাস করিয়া শিক্ষালাভ করে' তাহাদের ধর্মপ্রাণ করিবার জন্য এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—

পশ্চিম বাংলার অন্যতম মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ সুইজারল্যাণ্ড গমন করিয়াছেন। তিনি স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ৬মাস কাল তথায় বাস করিবেন। বিমলচন্দ্র বয়সে তরুণ হইলেও সুপণ্ডিত ও কর্মকুশল। তিনি সত্বর নিরাময় হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যে যোগদান করুন, দেশবাসী সকলেই ইহা কামনা করে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব্ব-ভারত টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে ইডেন গার্ডেনে নব-নির্ম্মিত ইন-ডোর ষ্টেডিয়ামে পূর্ব্ব-ভারত টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ৩য় বার্ষিক অনুষ্ঠান বিপুল উদ্দীপনার

মাইকেল হেগনেয়ার

মধ্যে শেষ হয়েছে। আলোচ্য বছরের পৃথিবীর এক নম্বর টেবল টেনিস খেলোয়াড় ইংলণ্ডের জনি লীচ ষ্টেটে সেটে ফ্রান্সের একনম্বর খেলোয়াড় হেগনেয়ারের কাছে হেরে গিয়ে দর্শকমহলকে বিস্ময়ান্বিত করেন। খ্যাতনামা মহিলা খেলোয়াড় কুমারী সৈয়দ সুলতানা মহিলাদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলসে বিজয়িনী হয়ে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন। ভারতীয় এক নম্বর খেলোয়াড় কল্যাণ জয়ন্ত ১০-২১, ২১-১৫, ১৫-২১, ২১-১৬, ২১-১৮ গেমে মাইকেল হেগনায়ারের কাছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর হেরে যান। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে ভারতীয় ২য়

কুমারী সৈয়দ সুলতানা

নম্বর খেলোয়াড় থিরু ভেঙ্কটম পরাজয় স্বীকার করেন জনি লীচের কাছে।

পুরুষদের সিঙ্গলস (ফাইনাল) : মাইকেল হেগনেয়ার (ফ্রান্স) ২১-১৬, ২১-১৪, ২১-১৮ পয়েন্টে জনি লীচকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস (ফাইনাল) : কুমারী সৈয়দ
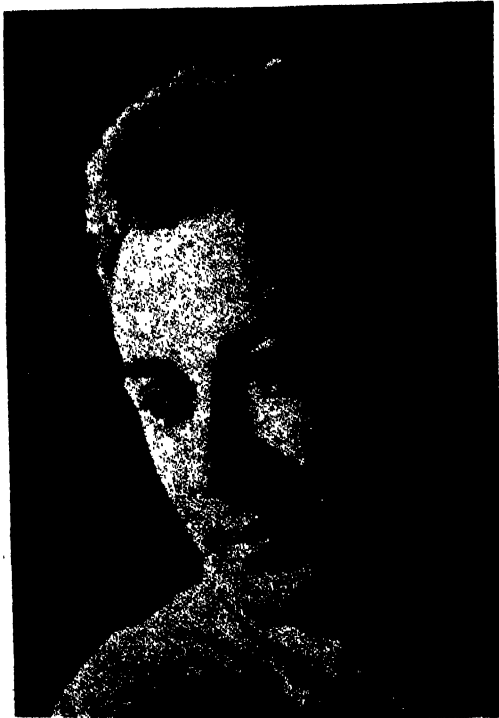
সুলতানা (হায়দ্রাবাদ) ২১-১৪, ২১-১৩, ২১-১৮ পয়েণ্টে শ্রীমতী গুলনাসিকওয়ালাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস (ফাইনাল): জনি লীচ এবং হেগনেয়ার ১৪-২১, ২১-১০, ১৮-২১, ২১-১৪, ২১-১৮ পয়েণ্টে জয়ন্ত এবং ভাণ্ডারীকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস (ফাইনাল): সুলতানা (হায়দ্রাবাদ) এবং রাজাগোপালন (দিল্লী) ২১-১৭, ২১-১৩, ২৩-২১ পয়েণ্টে রুক্মিণী (মাদ্রাজ) এবং ম্যাডানকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস (ফাইনাল): সুলতানা এবং ভাণ্ডারী ১৮-২১, ২১-১৩, ২১-১৫, ২১-১৬ পয়েণ্টে নাসিকওয়ালা এবং জয়ন্ত দেকে পরাজিত করেন।

মান নির্দ্ধারক (ফাইনাল): থিরুভেঙ্গাডাম (মাদ্রাজ) ২১-১১, ১৭-২১, ১৩-৯ (নির্দ্দিষ্ট সময়), ১২-২১, ৯-৩ নির্দ্দিষ্ট সময়) পয়েণ্টে ভি ভিঠলকে (মহীশূর) পরাজিত করেন।

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খেলা ঃ

সিঙ্গলস: (১) লীচ (ইউরোপ) ২১-১২, ২১-১৪ পয়েণ্টে জয়ন্তকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

(২) হেগনেয়ার (ইউরোপ) ২১-১১, ১০-২১, ২১-১৮ পয়েণ্টে থিরুভেঙ্গাডামকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

ডবলস: লীচ এবং হেগনেয়ার (ইউরোপ) ২১-১৩, ২১-১৫ পয়েণ্টে জয়ন্ত এবং ভাণ্ডারীকে (ভারতবর্ষ) পরাজিত করেন।

ফুটবল মরশুম ঃ

বহু প্রত্যাশিত বাংলার ফুটবল মরশুম মে মাস থেকে আরম্ভ হয়ে গেছে। অন্যান্য বৎসরের মত এ বৎসরও বাংলার বাইর থেকে কয়েকজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ক'লকাতার ফুটবল মাঠে কয়েকটি স্থানীয় দলের পক্ষে খেলতে নেমেছেন। একমাত্র দলগত সাফল্যের উদ্দেশ্যে খেলোয়াড় আমদানী করা স্থানীয় খেলোয়াড়দের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ। আমরা একথা পূর্ব্বেও বলেছি, এখনও বলছি। একথা সকল ক্লাবের পক্ষেই প্রযোজ্য, কোন ক্লাব বিশেষের পক্ষে নয়। যে ক্ষেত্রে ছোট ছোট ক্লাবগুলি স্থানীয় খেলোয়াড় নিয়ে বহিরাগত খেলোয়াড়-পুষ্ট শক্তিশালী দলের সঙ্গে খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস পায় এবং সময়ে সময়ে খেলা ড্র করে কিম্বা জয়ী হয় সেক্ষেত্রে খ্যাতনামা ক্লাবগুলির পক্ষে স্থানীয় খেলোয়াড়দের দলভুক্ত ক'রে তাদের খেলায় সুযোগ সুবিধা দান করা নৈতিক কর্ত্তব্য নয় কি ?

প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান দল অপরাজেয় অবস্থায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। এ পর্য্যন্ত ৮টা খেলেছে, খেলা ড্র করেছে ২টো—পুলিস এবং ভবানীপুরের সঙ্গে—পয়েণ্ট করেছে ১৪। লীগের প্রথম চ্যারিটি ম্যাচে মোহন-বাগান ৩-০ গোলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে দেয়। লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের এই প্রথম পরাজয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অপরাজেয় থেকে লীগ এবং শীল্ড বিজয়ী হয়েছিলো। লীগের খেলায় মোহনবাগানের সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। লীগের প্রথম খেলাতেই পুলিসের সঙ্গে ড্র করে। খেলায় প্রভূত উন্নতি দেখা দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে খেলার দিন থেকে। ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে লীগের পরবর্ত্তী অপরাজেয় ই আই আর দলকে ২-০ গোলে পরাজিত ক'রে লীগের কোঠায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

বাঙ্গালোর থেকে নবাগত সেণ্টার ফরওয়ার্ড বাখার দলে যোগদান করায় সেণ্টার ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়ের সমস্যা আগের থেকে অনেকটা সমাধান হয়েছে। বাখার ৪টে ম্যাচ খেলেছেন এবং প্রথম দিন থেকেই পর পর ৩টে খেলায় ১টা ক'রে গোল দিয়েছেন। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে সত্তারই শ্রেষ্ঠ। রক্ষণভাগে শৈলেন মান্না। রতন সেন, টি আও এবং অভয় ঘোষ এই তিনজন হাফ-ব্যাক আত্মরক্ষায় এবং আক্রমণে যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে খেলছেন। জয়লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা সকল খেলোয়াড়দের খেলায় পরিস্ফুট। 'match temperament এবং team spirit মোহনবাগানের খেলায় বর্ত্তমানে যে পরিমাণ দেখা যাচ্ছে তা শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলে মোহনবাগান তার অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পারবে। লীগের খেলা অনুসারে মোহনবাগানের

পর ই আই আর দলের স্থান। তাঁরা ৯টা খেলায় অর্থাৎ মোহনবাগানের থেকে একটা বেশী খেলে মোহনবাগানের সমান ১৪ পয়েন্ট করেছে। মাত্র ১টা খেলায় হেরেছে, মোহনবাগানের কাছে ২-০ গোলে। খেলায় জয় ৬টা, ড্র ২টো। এর পর বি এন আর, ১০টা খেলায় ১৪ পয়েন্ট। গত বছরের লীগ-শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৮টা খেলায় ১২ পয়েন্ট করেছে। হার মাত্র ১টা, মোহনবাগানের কাছে ০-৩ গোলে, ড্র ২টো, পুলিস এবং রাজস্থানের সঙ্গে।

লীগ তালিকার সর্ব্বনিম্নে আছে ক্যালকাটা গ্যারিসন। ৯টা খেলায় একটা পয়েন্টও করতে পারেনি। ৩১টা গোল খেয়েছে, গোল দিয়েছে মাত্র ১টা—মহমেডান স্পোর্টিংকে। ইস্টবেঙ্গল এবং রাজস্থান উভয়েই ৬-০ গোলে গ্যারিসন দলকে হারিয়ে এবছরের ১ম বিভাগের লীগের খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গোল দেওয়ার রেকর্ড করেছে। এ রেকর্ড এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে। খেলায় হ্যাট-ট্রিক করেছেন রসিদ (ভবানীপুর) এবং ম্যাসি (রাজস্থান) গ্যারিসন দলের বিপক্ষে, এবং টেম্পলটন (পুলিস) এবং ডি ঘোষ (বি এন আর) ডালহৌসীর বিপক্ষে। পুলিস দলের খেলা নিয়ে ইতিমধ্যে ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পাল্লায় পুলিস দল না আসতে পারলেও তারা যে শক্তিশালী দলগুলিকে বিশেষ বেগ দিয়ে খেলায় অঘটন ঘটাবে তার নমুনা আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। মোহনবাগান, ই আই আর, ইস্টবেঙ্গল এবং রাজস্থানের মত শক্তিশালী চারটি দলের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে পুলিস দর্শকমহলকে ঘাবড়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় বিভাগের লীগের খেলায় ক্যালকাটা ক্লাব প্রথম যাচ্ছে, ৮টা খেলায় পুরো ১৬ পয়েন্ট ক'রে। ১৮টা গোল দিয়ে মাত্র ২টো গোল খেয়েছে।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ঃ

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় উপর্য্যুপরি তিন বছর (১৯৪৯-৫১) চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে পূর্ব্বপাঞ্জাব দল ভারতীয় হকি খেলার ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপন করেছে। ইতিপূর্ব্বে কোন দলই উপর্য্যুপরি তিনবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করতে সক্ষম হয়নি। উপর্য্যুপরি দু'বার চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে বাঙ্গলা (১৯৩৬ এবং ১৯৩৮) এবং অবিভক্ত ভারতবর্ষে পাঞ্জাবদল (১৯৪৬-৪৭)। মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এ বছরের প্রতিযোগিতার ফাইনালে পূর্ব্বপাঞ্জাব ১-০ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত ক'রে সর্ব্বপ্রথম ৺এস রঙ্গস্বামী স্মৃতি রৌপ্যকাপ জয়ী হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব্বাপর বৎসরে চ্যাম্পিয়ান দলকে মৌরী শীল্ড (Maori Shield) উপহার দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৬ সালে বিশ্ববিশ্রুত হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে ভারতীয় হকিদল নিউজিল্যাণ্ড সফরে গিয়ে নিউজিল্যাণ্ড কর্ত্তৃক এই সুদৃশ্য শীল্ডটি পুরস্কৃত হয়। পরবর্ত্তীকালে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান দলকে এই চ্যালেঞ্জ শীল্ডটি উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। দেশ বিভাগের ফলে এই শীল্ডটি পাকিস্থানে অবস্থান করছে, সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সত্বেও শীল্ডটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই শীল্ডটির বিকল্প স্বরূপ মাদ্রাজের বিখ্যাত হিন্দুপত্রিকার সত্বাধিকারী এস রঙ্গস্বামীর নামে রৌপ্যকাপটি দান করেছেন। স্বর্গীয় এস রঙ্গস্বামী ছিলেন একজন কৃতি হকি খেলোয়াড় এবং হিন্দুপত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক।

সার্ভিসেস দল প্রতিযোগিতার রানার্স-আপ্ হিসাবে Uberoi Trbphy লাভ করেছে।

পেনাল্টি বুলির সাহায্যে ফাইনাল খেলায় জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয়। খেলাটিও খুব উচ্চাঙ্গের হয়নি। পূর্ব্বপাঞ্জাবদল সৌভাগ্যবশতঃ জয়ী হয়েছে বলা অন্যায় হবেনা। সার্ভিসেস দলের এই পরাজয়ের জন্য দলের অধিনায়ক প্রবীণ খেলোয়াড় মান্না সিংয়ের ক্রটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। খেলার শেষ সময় দিকে সার্কেলের ঠিক ওপরে বলটি পেয়ে তিনি যখন তাঁর সাধারণ অভ্যাসমত ডান হাত দিয়ে বলের উপর ষ্টীকটি রেখে বাঁ হাত দিয়ে বলটি পাঠাবার সঙ্কেত নিজ দলের খেলোয়াড়দের দিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বপাঞ্জাব দলের একজন খেলোয়াড় দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে বলটি ডানদিকে পাশ করে। এই নিয়ে সেখানে একটা জটলার সৃষ্টি হয় এবং যখন বলবীর সিং বলটি সজোরে সট করেন তখন মান্না সিং গোলরক্ষকের ভঙ্গিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক বলটির উপর পা দিয়ে লাথি মারেন। রেফারীর পেনাল্টি বুলির নির্দ্দেশে বলবীর সিং মান্না সিংকে পরাভূত ক'রে জয়সূচক গোলটি দেন। ফাইনালে সার্ভিসেস দল অন্যান্য দিনের তুলনায় খুবই ভাল খেলেছিল। কেবল ফাইনাল খেলায় নয় সেমি-ফাইনালেও ভাগ্যদেবী পূর্ব্ব পাঞ্জাবদলের প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন। দু'দিন সেমি-ফাইনাল খেলার পর তৃতীয় দিনের অতিরিক্ত সময়ে পূর্ব্বপাঞ্জাব দল ২-১ গোলে বাঙ্গলা দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। প্রথম দিনের সেমি-ফাইনালে বাঙ্গলা দল দুর্ভাগ্যক্রমে জয়ী হয়নি। খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। বাঙ্গলা দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা গোল দেওয়ার একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করে। অতিরিক্ত সময় খেলা সত্বেও দ্বিতীয় দিনের সেমি-ফাইনাল খেলাটিও গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যায়। বাঙ্গলা দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড গুরুংয়ের খেলার দোষেই বাঙ্গলা দল একটি নিশ্চিত গোল করার সুযোগ নষ্ট করে। তৃতীয় দিনে বাঙ্গলা দল পূর্ব্বপাঞ্জাব দলের তুলনায় গোল দেওয়ার বেশী সুযোগ পায় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। পূর্ব্বপাঞ্জাব দল প্রথম গোল ক'রে। বাঙ্গলা দলের লেফ্ট-আউট দুবে গোলটি শোধ ক'রেন। প্রথমার্দ্ধের খেলাতে গুরুং একটি চমৎকার গোল দেন

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা 'ষ্টিকের' অজুহাতে গোলটি নাকচ হয়। উভয়পক্ষে ১-১ গোল হওয়ায় অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়। ১৯ মিনিট সময় পর্য্যন্ত কোন পক্ষেই আর গোল হয়নি। খেলা শেষের কয়েক সেকেণ্ড থাকতে পাঞ্জাবদলের লেফ্‌ট-আউট রামস্বরূপ জয়সূচক গোলটি করেন। আম্পায়ারিং ভাল হয়নি, বাঙ্গলা দলকে এর জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

খ্যাতনামা ক্রীড়া-সাংবাদিক শ্রীযুক্ত এস গুরুনাথন বাংলার খেলা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন 'It was by a miracle that Punjab defeated Bengal by 2-1 on an evening when Bengal had most of the scoring opportunities. Sheer bad luck prevented Bengal from winning the match. It was a greater miracle how Punjab survived on the first day when Bengal were all over them." (Sport & Pastime—June 5, 1951)

খেলার ফলাফল
(১৯৫১ সাল)

১ম রাউণ্ড	২য় রাউণ্ড	৩য় রাউণ্ড	সেমি-ফাইনাল	ফাইনাল
রাজপুতানা-৩				
বরোদা-২	রাজপুতানা-১	পূর্ব্ব পাঞ্জাব-১	পূর্ব্বপাঞ্জাব	
মাদ্রাজ-৯	মাদ্রাজ ২	মাদ্রাজ ০	-০ ০ ২	
উড়িষ্যা-০				পূর্ব্বপাঞ্জাব
মহীশূর-০-৩	মহীশূর-০-১	মহীশূর-০	বাংলা	—১
দিল্লী-০-১	ভারতীয় রেল -০-০	বাংলা ১	-০-০-১	
হায়দ্রাবাদ-২	হায়দ্রাবাদ-১	বোম্বাই ১	বোম্বাই	
পেপসু-১	উত্তরপ্রদেশ-২	উত্তরপ্রদেশ-০	-১-১	
সার্ভিসেস-০-২	সার্ভিসেস ২	সার্ভিসেস ৫	সার্ভিসেস	সার্ভিসেস —০
মধ্যপ্রদেশ-০-০				
মহারাষ্ট্র ১	মহারাষ্ট্র-০	ভূপাল-০	১-২	
গোয়ালিয়র ০				

সাহিত্য-সংবাদ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "স্বাধীনতার স্বাদ"—৪৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী "ভগৎ সিং"—॥০
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মোহনের রণ-হুঙ্কার"—২৲,
"অতিকায়ের দ্বীপে স্বপন"—২৲, "অসাধ্য-সাধনে মোহন"—২৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নিষ্কৃতি" (১৩শ সং)—১৷০,
"বিপ্রদাস" (১২শ সং)—৪৲, "স্বামী" (২৪শ সং)—১৷০,
"হরিলক্ষ্মী" (৬ষ্ঠ সং)—১॥০
শ্রীরমেশ গোস্বামী প্রণীত নাটক "কেদার রায়" (৯ম সং)—২॥০
শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"—৫৲
শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মহামানব শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথের মহা-নির্বাণ"—৷০
অসিতনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত "আফগানিস্তানের শিনওয়ারী বিদ্রোহ"—৩৲
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "গীতায় স্বরাজ"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী — শ্রী দেবী প্রসাদ রায়চৌধুরী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

শ্রাবণ—১৩৫৮

প্রথম খণ্ড | উনচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

আমাদের দেশে জ্ঞানবাদের সহিত ভক্তিবাদের একটা বিরোধ—কয়েক শত বৎসর ধরিয়া লাগিয়াই আছে। এই বিরোধই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

মুখবন্ধেই বলা আবশ্যক যে, আমি জ্ঞানবাদীও নহি, ভক্তিবাদীও নহি বা কোনও পক্ষের উকিলও নহি, কিংবা স্বয়ংবৃত মীমাংসকের ভূমিকা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বা স্পর্দ্ধাও রাখি না। ইংরাজীতে যাহাকে বলে man in the street—রাস্তার লোক—অর্থাৎ অবিশেষজ্ঞ সাধারণ দ্রষ্টা, ঠিক সেইভাবে আমি এই বিষয়টি যেরূপ দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি তাহাই বলিব। বিশেষজ্ঞগণ এবং পক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

জ্ঞানবাদের তুলনায় ভক্তিবাদ অনেকটাই আধুনিক। আমি ভক্তিবাদের কথা বলিতেছি, ভক্তির কথা বলিতেছি না। উপাস্যকে ব্যক্তিরূপে ভাবনা করিয়া—তাহার সহিত একটা প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ (তাহা সেব্যসেবক, পিতাপুত্র ইত্যাদি যে ভাবেরই হউক) স্থাপনপূর্ব্বক তদনুরূপ আচরণ ও ভাবপোষণ হইতেছে ভক্তির মূলসূত্র। ইহা অবশ্যই হিন্দুধর্ম্মের সকল শাখায় চিরকালই আছে। ভক্তি ছাড়া ভজন হয় না। বেদে বিশেষতঃ ঋগ্বেদের সূক্তসমূহে ভক্তির পরিচয় বিশেষ নাই—এইরূপ কথা কেহ কেহ বলিয়াছেন; তাহার উত্তররূপে অন্য পণ্ডিতগণ বিশেষ করিয়া—বরুণ-দেবতার স্তুতিগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রায় সকল সূক্তের মূলেই ভক্তি বর্ত্তমান, একথা বলিলে বোধ করি খুব ভুল হয় না। তবে যে সকল সূক্ত স্পষ্টতঃ ভজনার্থ বা প্রার্থনার্থ নহে, তৎসমুদয়ে ভক্তির প্রকাশ আশা করা অযৌক্তিক। উপনিষদেও নানা স্থানে উপাসনার প্রসঙ্গ আছে; উপাসনা অবশ্যই ভক্তিমূলক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে ব্যক্তিবোধ সম্ভব নহে বলিয়া তৎপ্রতিপাদ্য

শ্রুতিতে ভক্তির প্রকাশ (আমাদের ধৃত অর্থে) কিরূপে আশা করা যায়? সগুণব্রহ্মে ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি অর্জন করিয়া জ্ঞানপথে নির্গুণ আশ্রয়—জ্ঞানবাদীদিগের অভিমত। পক্ষান্তরে ভক্তিবাদীদিগের মত এই যে, ভক্তিই সব; কেবল ভক্তিদ্বারাই পরমপদ প্রাপ্য—এমন কি সুলভ; তাহাতে জ্ঞানের কোনও অপেক্ষা নাই; জ্ঞানে "বহু দূর"। নির্গুণব্রহ্ম অবস্তু, একটা কথার কথা মাত্র; সেই জন্য জ্ঞান তুচ্ছ, ভক্তি উচ্চ। ইহাই মোটের উপর বিরোধের স্থল।

বলিয়াছি ভক্তির প্রমাণ বেদে (সংহিতায়) ও উপনিষদেও আছে। যেখানে ভজন, সেখানেই ভক্তি। কিন্তু ভক্তিধর্ম্ম বলিতে (বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে) যাহা বুঝায় অর্থাৎ কীর্ত্তননৃত্যাদি সংযোগে ভগবানের আরাধনা, তাহা মূলে আর্য্যজাতির ধর্ম্ম ছিল না। উহা হইতেছে দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড় জাতির দান। তামিলভাষী আলোয়ারগণের মধ্যে উহার প্রচলন প্রথম লক্ষিত হয়। ভাগবত পুরাণে অবশ্য আছে—যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈ যজন্তি হি সুমেধসঃ—সুমেধা ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন প্রচুর—ভজন-বিশেষ দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন—এবং

> এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
> জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
> হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
> ত্যুন্মত্তবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

—প্রিয়নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অনুরাগ উৎপন্ন হইলে চিত্ত দ্রবীভূত হয়, তখন ভক্ত লোকরীতির বাহিরে গিয়া উন্মত্তবৎ হাসে, কাঁদে, চীৎকার করে, গায় ও নৃত্য করে। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভাগবত খুব প্রাচীন পুরাণ নয় এবং উহার উদ্ভব দাক্ষিণাত্যেই হইয়াছিল। ভাবপ্রবণ চিত্ত উক্তরূপ ভক্তিধর্ম্ম দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। উহার ঐ মনোরম মাদকতাই দাক্ষিণাত্য হইতে ক্রমে গৌড়াদি দেশে উহার বিস্তৃতির হেতু। আরও একটা কথা, ভক্তিধর্ম্ম সাধারণতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম। শৈব, শাক্ত ইত্যাদি ধর্ম্ম উহার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

দর্শনশাস্ত্রে ভক্তিবাদের প্রবেশ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের পরে হইয়াছে। শঙ্কর একদিকে বৌদ্ধগণের সঙ্গে এবং অন্যদিকে বৈদিক কর্ম্মবাদী মীমাংসকগণের সঙ্গে লড়াই করিয়া উভয়ের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মবাদিগণের মতে কর্ম্মই সব; তাঁহারা নিরীশ্বর না হইলেও, ঈশ্বরে তাঁহাদের প্রয়োজন অল্প। শঙ্কর কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন বলেন নাই; উহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, তাহার আর আর কর্ম্মের প্রয়োজন থাকে না। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অর্থাৎ যুগপৎ অনুষ্ঠান তাঁহার স্বীকৃত নয়। ইহা তৎপ্রণীত সকল ভাষ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সময়ে ভক্তিবাদের উদ্ভব না হওয়ায়, জ্ঞান ও ভক্তির সমুচ্চয় ইত্যাদির প্রশ্ন উঠে নাই। গীতার ভাষ্যে তিনি ভক্তির শ্রেষ্ঠাবস্থাকে জ্ঞান বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। গীতায় ভক্তির কথা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, কিন্তু জ্ঞান বা কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তাহাকে একটা বাদে পরিণত করা হয় নাই। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান বিশেষভাবে বিবেচিত হইয়াছে। বৈদান্তিক-শিরোমণি মধুসূদন সরস্বতী উহাদের ঐরূপ বিন্যাসের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, যেহেতু কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে অত্যন্ত বিরোধী বর্ত্তমান, সেইজন্য ঐ দুইটিকে দুই প্রান্তে রাখিয়া উভয়ানুগতা বলিয়া ভগবদ্ভক্তিকে গীতার মধ্যভাগে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই মতেও ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বাদ নহে। ভক্তির প্রয়োজন কর্ম্মের দিকে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণের সহায়তাকরণে এবং জ্ঞানের দিকে তল্লাভে সাধকের যোগ্যতা সম্পাদনে। আধুনিক জ্ঞান-বাদিগণ (যথা মণ্ডলেশ্বর শ্রীমহাদেবানন্দ গিরি) বলেন, গীতায় ভগবান্ "জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং" বলিয়া মাত্র দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথাই বলিয়াছেন। ভক্তি বলিয়া তৃতীয়া ও স্বতন্ত্র নিষ্ঠার নামও করেন নাই।

আমরা যে ভক্তিধর্ম্মের সহিত বাঙ্গালা দেশে পরিচিত তাহা চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে এদেশে থাকিলেও (প্রমাণ—জয়দেব, চণ্ডীদাস) তেমন ব্যাপকভাবে ছিল না। ভক্তিধর্ম্ম দ্বৈতাশ্রয়ী, বাঙ্গালা চিরকাল অদ্বৈতবাদেরই দেশ *। চৈতন্য-

---

* Summarising shakta doctrine we may first affirm that it is Advaitavada or monism. This we might expect seeing that it flourished in Bengal, which as the old Gauda Desha, is the guru both of Advaitavada, and of Tantra Shastra. From Gauda came Gauda-padacharyya, Madhusudan Saraswati, author of the great Advaitasiddhi, Ramchandra Tirthabharati. Chit-

দেবের পূর্ব্বে এদেশে তান্ত্রিক মত, বিশেষতঃ শাক্তাগম, ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। শাক্তাগম অদ্বৈতবাদী। বৈদিক অদ্বৈতবাদও খুবই প্রচলিত ছিল; মাণ্ডুক্যকারিকার প্রণেতা এবং শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ (কিন্তু তাহা হইতে বহু প্রাচীন) গৌড়পাদাচার্য্য এই বাঙ্গালারই লোক। "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রণেতা মধুসূদন সরস্বতীও বাঙ্গালী, ইনি অদ্বৈত-বাদের সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিবন্ধকার ও প্রতিনিধি বলিয়া সম্মানিত। ইনি চৈতন্যদেবের পরে উদ্ভূত হন। তখনও অদ্বৈতবাদ এদেশে প্রবলভাবেই চলিতেছিল। বস্তুতঃ কথিত আছে, মধুসূদন পূর্ব্বে ভক্তিবাদী বৈষ্ণবই ছিলেন। প্রচলিত অদ্বৈতবাদ খণ্ডনোদ্দেশ্যে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অদ্বৈতবাদী হইয়া যান। সে যাহা হউক, বলিয়াছি ভক্তিধর্ম—দ্বৈতাশ্রয়ী; কিন্তু মনে হয় যেন বাঙ্গালার মাটির গুণে চৈতন্যদেব-প্রবাহিত ভক্তি-ধর্ম্মের বন্যাও, আচারে যাহাই থাকুক, শাস্ত্রের পাতায় —পূর্ণ দ্বৈতভাবের সমর্থক থাকে নাই। যদিও বৈষ্ণবগণ এককালে মাধ্বসম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেন, ক্রমে গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে বাদের সৃষ্টি করিলেন, তাহার নাম তাঁহারা দিলেন অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। "ভেদাভেদ" শব্দের অর্থ দ্বৈতাদ্বৈত। উহা মাধ্বসম্প্রদায়ের পূর্ণ ভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ নহে, অভেদ বা অদ্বৈত মিশ্র। আর "অচিন্ত্য" শব্দেও শঙ্করের অনির্ব্বচনীয়-বাদের— প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। "অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত" (চৈতন্য চরিতামৃত)। এই "পরিণত" শব্দটি শঙ্করের অনির্ব্বচনীয় বাদ হইতে গৌড়ীয় বাদের পৃথকতা রক্ষা করিতেছে।

সে যাহা হউক, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের মধ্যে ভক্তি-বাদ একটু অধিক সরব ও সমরোৎসুক, জ্ঞানবাদ বনিয়াদি চালে ঈষৎ ঘৃণামিশ্র উপেক্ষা প্রদর্শক। বাঙ্গালার ভক্তি-ধর্ম্মকে চৈতন্যদেবের সময় হইতেই জ্ঞানবাদকে—কোণ-ঠাসা করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎসুক দেখা যায়।—ইহাই স্বাভাবিক, নচেৎ নূতন কি প্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতনকে স্থানচ্যুত করিয়া—নিজের আসন স্থাপন করিবে? সেই জন্যই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রথম হইতেই জ্ঞান ও জ্ঞানবাদ অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। স্বয়ং মহাপ্রভু বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন নিজকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া নিন্দা করিয়া। তিনি শঙ্করাচার্য্যপ্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ভুক্ত কেশবভারতী হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু ঈশ্বরপুরী ও পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরীও দশনামী সম্প্রদায়ভু সন্ন্যাসী ছিলেন।* ইঁহারা কেহই মায়াবাদী ছিলেন না। মহাপ্রভু কোনও কালেই মায়াবাদী ছিলেন না, অথচ সন্ন্যাস নিয়াছিলেন। অতএব সন্ন্যাসীকে মায়াবাদী হইতেই হইবে বা বৈষ্ণব কখনও সন্ন্যাস নিবেন না, এ নিয়ম চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ছিল না। তাঁহার মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া আত্মনিন্দার ফলেই হউক, বা অন্য যে কারণেই হউক, তাঁহার পরে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে আর প্রায় কাহাকেও সন্ন্যাস নিতে দেখা যায় না। সংসারবিরক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসের পরিবর্ত্তে "ভেক" গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব সংসারত্যাগী সনাতনের গৃহস্থবেশ পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলেন, উহাই ভেকের সূচনা ও নজির। এইরূপে মায়াবাদ ও তৎসংসৃষ্ট সন্ন্যাস হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঐকান্তিক বিচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে।†

জ্ঞানবাদী বলেন "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—জীব

...akhacharyya and others. There seems to be a strong disposition in the Brahmaparayana Bengali temperament towards Advaitavada.

সার্ জন উড্রফ কৃত Shakti and Shakta.

* পরম বৈষ্ণব মাধবেন্দ্র পুরীর আরও দুইটি সন্ন্যাসী শিষ্যের নাম চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়—যথা, পরমানন্দ পুরী ও রামচন্দ্র পুরী।

† শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবই হইয়া যান। তৎপর তিনি কাশীতে হরিহরানন্দ সরস্বতী হইতে যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহার সন্ন্যাস-নাম অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর সরস্বতী উপাধিটি সন্ন্যাস গ্রহণের চিহ্ন কি না শুনি নাই। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গৌরগোবিন্দ ভাগবত স্বামীর "পরমহংস", "পরিব্রাজক" ও "স্বামী" এই উপাধিগুলিও সন্ন্যাসের চিহ্ন কি না জানি না। পরমহংস নাম সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠাবস্থাদ্যোতক, সন্ন্যাসীরাই প্রকৃত পরিব্রাজক, এবং সন্ন্যাসীদিগকেই সাধারণতঃ স্বামী বলা হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধ্যে "গোস্বামী" (গোঁসাই) নামই অধিক প্রচলিত; স্বামী নহে এবং ভেকগ্রহণের সহিত উহার বিশেষ সম্বন্ধও নাই।

স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে। * ভক্তিবাদী বলেন, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" জীবকে ব্রহ্ম বলা মহাপাপ। চৈতন্যচরিতামৃতকার নিম্নলিখিত কথাগুলি চৈতন্যদেবের মুখে দিয়াছেন :—

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি ক্ষুদ্র জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন॥
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি দূরে—যেই রুদ্র ব্রহ্মসম।
নারায়ণে মানে তার—পাষণ্ডীতে গণন॥

এটিও মায়াবাদেরই নিন্দা। অর্থ এই—শিব ব্রহ্মাকেও নারায়ণতুল্য মনে করিলেও পাপ হয়, জীবকে ব্রহ্ম (বিষ্ণু, নারায়ণ) বলা মহাপরাধ। (বস্তুতঃ আধুনিক বৈষ্ণবগণ শিবকে বৈষ্ণবই অর্থাৎ বিষ্ণু সেবক বলেন। গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে দক্ষযজ্ঞে সতী বৈষ্ণব নিন্দা শুনিয়াই দেহত্যাগ করেন।) রামানুজ মতে বিষ্ণুই পরমাত্মা, এবং শিব ও ব্রহ্মা তাহা হইতে অভিন্ন।

জ্ঞানবাদী বলেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই যে চতুর্ব্বর্গকে পুরুষার্থ বলা হয়, তন্মধ্যে চরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ, উহা জীবের স্বভাবসিদ্ধ, কেননা সে স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। কর্ম্মবশে মায়ার অধীন বলিয়া—সে স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না; মায়া কাটিয়া গেলেই স্বরূপ নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করে এবং তাহাতে পরিনিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান নিত্যবস্তু উহা উৎপাদ্য নহে; মায়ার আবরণ অপসারিত হইলেই উহার প্রকাশ হয়।

ভক্তিবাদ বলেন, ভক্তির তুলনায় মোক্ষ অতি তুচ্ছ বস্তু। পুরুষার্থ চারিটা নয়, পাঁচটা; ইহা প্রচলিত অভিধান-সম্মত না হইলেও শাস্ত্রসম্মত। পঞ্চম পুরুষার্থ হইতেছে ভক্তি। ভক্ত মোক্ষ চায় না, মোক্ষকে ঘৃণা করে, ভয় করে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবের সম্মুখে ভাগবতের এক শ্লোক (১০।১৪।৮) পড়িতে সেই শ্লোকের মধ্যে "মুক্তি-পদে" স্থলে "ভক্তিপদে" উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহাতে

প্রভু কহে মুক্তিপদে ইহো পাঠ হয়।
ভক্তিপদে কেন পড় কি তোমার আশয়॥
ভট্টাচার্য্য কহে মুক্তি নহে ভক্তিফল।
ভগবদ্‌ বিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥

* * *

মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণাত্রাস॥

যাহারা ঈশ্বরবিমুখ ঈশ্বর দণ্ডরূপে তাহাদিগকে মুক্তি দেন, ইহাই ভট্টাচার্য্যের ত্রাসের কারণ। (ক্রমশঃ)

* যে অর্থে বা যে যুক্তিবলে ইহা বলা হয় তাহার উল্লেখ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। কৌতূহলী পাঠক "বেদান্তসার" দেখিবেন।

চুনিদা

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

১৯৪৩, জানুয়ারি। চট্টগ্রাম শহরের অবস্থা শোচনীয়। আরাকানের পথে ব্রহ্মের আশ্রয়প্রার্থীর ভিড় এবং পতেঙ্গার বিমানঘাঁটিতে জাপানী বিমানের হানা পূর্বেই যথেষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। তারপর ডিসেম্বর মাসে শহরের উপর উপর্যুপরি বিমান আক্রমণে বোমাভীত শহরবাসীরা গ্রামাঞ্চলে পালিয়েছে। জীবজন্তুরা আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ের গভীর গহ্বরে। নন্দনকাননে পাখীর ডাক শোনা যায় না। শোনা যায় শুধু সাইরেণ—আসন্ন বিপদের সংকেত-ধ্বনি—বিমান আক্রমণের বেদনা-করুণ আগমনী। খালি বাড়ী সব একে একে মিলিটারীর দখলে গিয়ে পড়ছে। ছাত্রশূন্য স্কুল-কলেজগুলো দাঁড়িয়ে আছে প্রাণহীন পাষাণ-পুরীর মতো। চট্টেশ্বরীর মন্দিরে পূজারিণীর সমাগম নেই—সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে যায় নিঃসীম শূন্যে।

পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসন তখনও অব্যাহত। নিষ্প্রদীপে নিবিড় ছায়ায় ইউনিয়ন জ্যাক্ তখনও উড়ছে। সরকারী কর্মচারীরা নিরুপায়—চাকরির মায়া বড় মায়া। তাই এই জীবনমরণের সীমানায় যন্ত্রদানবের অট্টহাসির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমরা হতভাগ্য কয়েকজন। আমাদের মেলামেশা মুষ্টিমেয় বেসামরিক কর্মচারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরস্পরের সঙ্গলাভের জন্য

আমরা মিলিত হই বালির পাহাড়ে ও বিফল-প্রাচীরে ঘেরা এক ডাক্তার-বন্ধুর সুরক্ষিত গৃহে। আমাদের মজলিস চলে সন্ধ্যা ছ-টা থেকে রাত্রি ন-টা পর্যন্ত। তাই এর নাম 'সিক্স টু নাইন ক্লাব'। ক্লাবটি গল্প হাসির পাগলাঝোরা—বিশ্ববৃত্তান্ত আলোচনার পার্লামেন্ট—জ্যোতিষচর্চার পীঠস্থান। সভ্যদের মধ্যে কেউ বদলির ব্যাপার নিয়ে সব সময়েই থাকেন অন্যমনস্ক; কেউ অভাবনীয়ের আশায় স্বভাবের মাধুর্য রেখেছেন অক্ষুণ্ণ; কেউ বিরহবিধুর হয়েও মধুর-মিলনের স্বপ্ন দেখেন; কেউ আবার দুঃসহ দুঃখকে দূরে ঠেলে ক্ষণিক দিনের আলোকে ক্ষণকের গান গেয়ে যান। দুর্দিনের অন্ধকারে মানুষের ভালোবাসা ফুটে ওঠে। আমাদের মধ্যেও গড়ে উঠেছে অপরিমেয় ঘনিষ্ঠতা। বয়স আমাদের ভিতর কোনও ব্যবধান রাখেনি—তরুণ, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেরই সমান অধিকার। সামাজিক জীবনে গণতন্ত্রের এমন বাস্তবরূপ বুঝিবা আর কোথাও চোখে পড়েনি।

২৫শে জানুয়ারি। সেদিন ক্লাবের সান্ধ্য বৈঠক তেমন জমেনি। পূর্বদিন দুবার বোমাবর্ষণে সকলেই উদ্বিগ্ন; আমরা জনকয়েক বসে ঐ বিষয়েরই আলোচনা করছি। সহসা উপস্থিত হলেন শ্রীচুনিলাল চট্টোপাধ্যায়—আমাদের চুনিদা—একা নন, সঙ্গে কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক,বিছানা ও হাতে অন্যান্য জিনিষপত্র। ব্যাপার কি! ২৪শে রাত্রে চুনিদার পাড়ায় যখন বোমা পড়ে তখন তাঁর বাড়ীর মালিক প্রকম্পনের ফলে পালঙ্ক থেকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়ে শরীরে আঘাত পান। ভদ্রলোক বিভ্রান্ত অবস্থায় প্রভাতেই গ্রামের পথে রওনা হয়েছেন। চুনিদার চাকরটিও সরে পড়েছে। অগত্যা তিনি তল্পিতল্পা নিয়ে সরাসরি ক্লাবে হাজির। বিশৃঙ্খল অবস্থা, মুখে বিনিদ্র বিভাবরীর কালিমা, গৃহস্বামীর আচরণে দিশাহারা ভাব। এসেই বললেন—বেশ লোক আপনারা! বেঁচে আছি কি না একটা খবরও নিলেন না! আড্ডা আর আড্ডা! এতেই সব বিপদ কেটে যাবে?

ক্লাবের কর্ণধার ডাক্তার সেনকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন—আমার থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আজ থেকে আমি আপনার 'পেইং গেষ্ট'। কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম,—বেশ করেছেন চুনিদা। আপনার সঙ্গলাভের অধিকতর সুযোগ পেয়ে আমরা ধন্য হব। চুনিদার মুখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল; ঝড় উঠবে ভেবে আমরাও গম্ভীর হয়ে গেলাম। চুনিদার চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু স্বভাব জুড়ে আছে শিশুর অভিমান। তিনি আরাম কেদারায় শুয়ে আকাশ পানে চাইলেন। অন্তরীক্ষে পথহারা সন্ধ্যাতারা, আরাম কেদারায় গৃহহারা চুনিদা। ধরার দিকে চেয়ে আছে তারা, তারার দিকে চেয়ে আছেন চুনিদা। একের স্নিগ্ধ দীপ্তি, অপরের শান্ত উদ্বেগ। উভয়েই যাত্রী—অথচ উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! একের পথই সর্বস্ব, অপরের সর্বস্ব পথের শেষে। গমনবিলাসী তারা, আর বিরামপিয়াসী চুনিদা।

চুনিদা সাব-রেজিষ্টার। অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। কিছুতেই সন্তুষ্ট নন—কথায় কথায় রাগ, সামান্য কারণে বিরক্তি। তাঁর অভিযোগের অন্ত নেই—উপরওয়ালা লোক খারাপ, কেরাণীরা ফাঁকিবাজ, পিয়নগুলো কামাই করে, আরও কত কি। বিশ্ব সংসার যেন চুনিদার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র করেছে। বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস। চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিল। পূজার ছুটিতেই ব্যবস্থা করেছিলেন কলকাতা থেকে পরিবার অপসারণের। চুনিদার স্ত্রী ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকেন গ্রামে। তাঁর মনও পড়ে আছে সেখানেই। চিঠি চিঠি ক'রে ভদ্রলোক পাগল। আপিস থেকে ফিরে পোষাক ছেড়েই চিঠির খোঁজ করেন। চিঠি এলে মেজাজ বদলে যায়, সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলেন, কর্মের সমস্ত গ্লানি দূর হয়, সুখ স্বপ্নে রাত কাটে। চিঠি না এলে চোখে অন্ধকার দেখেন। চাকরের সঙ্গে বকাবকি। পিয়নের সঙ্গে রাগারাগি, জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা—আমরা চিঠি পেয়েছি কিনা। অন্য কারও চিঠি পাওয়ার সংবাদটা চোখের পলকে তাঁর মুখে তিমির তুলিকা বুলিয়ে দেয়। হঠাৎ তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেন। ক্লাবের অন্যতম সভ্য শ্যামলবাবুরও চিঠির সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে, কিন্তু সেটা আর এক রকমের। শ্যামলবাবু চিঠি দেওয়ার জন্য যতটা ব্যস্ত হন, চিঠি পাওয়ার জন্য ততটা ব্যস্ত হন না। পরিবারবর্গকে চিন্তা-বিমুক্ত করেই তিনি নিশ্চিন্ত। চুনিদার পাওয়ার ব্যগ্রতা দেওয়ার ব্যগ্রতাকে

ছাপিয়ে যায়। একজন আদর্শ 'ট্রান্সমিটার', আর একজন আদর্শ 'রিসিভার'। দুজনকে দিয়ে বেতার যন্ত্র তৈরি করলে সেটা হ'ত বিজ্ঞানের একটা অপূর্ব সৃষ্টি।

আমি অবিভক্ত পরিবারের গুঞ্জনমুখর আবহাওয়ায় মানুষ। একে পরিবারবিহীন অঞ্চলের শূন্যতা, তার উপর বিমান-সংগ্রামের গর্জন ও বর্ষণের পূর্ণতা। এ সব কোনদিন কল্পনাও করতে পারি নি। আকাশের উদাস নীরবতায় বিষণ্ণ হই, প্রচণ্ড উন্মত্ততায় বিপন্ন বোধ করি। মন চায় পরিচয়ের বাণী, প্রীতির পরশ—ঘুরে বেড়ায় 'ফুরিয়ে যাওয়ার ছায়া বনে, ভুলে যাওয়ার দেশে।' তাই চুনিদার প্রতি আমার একটা গোপন ও গভীর সহানুভূতি ছিল। তিনিও আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং অনেক সময় অন্তরালে ডেকে ঘরের কথা বলতেন। চুনিদার চিঠির বিষয়বস্তু জানবার জন্য মাঝে মাঝে কৌতূহল জাগত। ভাবতাম হয় তো আমাদের বৌদি বিদূষী, হয়তো তাঁর লেখার মধ্যে এমন কিছু রস আছে যা চুনিদার মনপ্রাণ আচ্ছন্ন ক'রে তাঁকে টেনে নিয়ে যায় এক অতীন্দ্রিয় আনন্দ-লোকে। একদিন নিতান্ত নির্মমভাবেই আমার ভুল গেল ভেঙে। চুনিদা আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বালিশের তলা থেকে একখানা চিঠি বার ক'রে আমার হাতে দিয়ে পড়তে বললেন। চিঠিতে লেখা ছিল :—

* * * * *

আমরা বেশ ভালো আছি। তুমি সাবধানে থাকবে। ভগবান মঙ্গল করবেন। পশ্চিমপাড়ার ঠাকুর-বাড়ীতে তোমার বদলির জন্য পূজা মেনেছি। খুকী বড় হচ্ছে—তার বিয়ের চেষ্টা করা দরকার। ছোট খোকা এক এক সময় তোমার কথা বলে। আমাদের বাড়ীর গাছটায় খুব কুল হয়েছে। মল্লিক পুকুরের জল এবার গরমে শুকিয়ে যাবে। হাটতলার নলকূপটা সারানো হয়েছে তাই রক্ষে। গাছ থেকে পড়ে মধু গোয়ালা পা ভেঙেছে—সে এখন ডাক্তারখানায়। বড়দিনের ছুটিতে গ্রামের ছেলেরা থিয়েটার করেছিল—আমার খুব ভালো লেগেছিল। দেশের একজন গণ্যমান্য নেতা (কি ছাই নাম মনে পড়ছে না) জেল থেকে বেরিয়ে কাটোয়ায় এসেছিলেন—তাঁকে দেখবার জন্য রথের ভিড় হয়েছিল। হ্যাঁ, বড় খোকা কি একটা রচনা লিখেছে। সেটা তোমার বন্ধুকে দেখিও। তিনি যেন ওকে একটু উৎসাহ দেন।

* * * * *

বুঝলাম, চুনিদার মতো মানুষের একক জীবনে মনোরমা-বৌদির চিঠি কী 'অক্সিজেন'-এর কাজ করে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র কয়েকটি ছত্র মনে পড়ল :—

'পাতা পোরাবার ছলে আজ যে যা কিছু বলে
তাই শুনে মন গলে চোখে আসে জল,
তারি লাগি কত ব্যথা, কত মনো ব্যাকুলতা,
দু-চারিটি তুচ্ছ কথা জীবন সম্বল।'

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি—মঙ্গলবার। সন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়ে চুনিদাকে বারান্দায় দেখতে পেলাম না। শুনলাম, তিনি চার পাঁচ দিন বাড়ীর চিঠি পান নি। সে দিন 'ক্যাজুয়াল লীভ' নিয়েছেন। সকালে পোষাক ঝেড়েছেন, জুতোয় কালি দিয়েছেন এবং এক ঘণ্টা ধ'রে দাড়ি কামিয়েছেন। সারা দুপুর নিভৃত কক্ষে নির্জন চিন্তায় কাটিয়েছেন। এখন বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ নিয়ে নাড়া চাড়া করছেন—কথাবার্ত্তা বলতে একান্ত অনিচ্ছুক।

বুধবারের পরিস্থিতি গুরুতর। চুনিদা 'হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক' করেছেন। সেদিন বৈঠক বসে চুনিদার ঘরে। আমরা কত বোঝাবার চেষ্টা করি—জোর 'সেন্সরশিপ' শুরু হয়েছে, কত চিঠি নিখোঁজ হচ্ছে, কত চিঠি এসে পৌছায় বিলম্বে, বিকৃত কলেবরে। চুনিদা সে কথায় কর্ণপাত করেন না। হয়তো ভাবেন, দেবতা তাঁর কঠিন অনশন ব্রতে সন্তুষ্ট হয়ে অচিরেই শুভ খবর আনিয়ে দেবেন। ডাক্তার সেন বলেন—গগনের গায় তারায় তারায় অসীমের অক্ষর ফুটে উঠেছে। বৌদির কালির অক্ষর ভুলে মুক্ত মহাকাশে আলোর অক্ষরের পানে চেয়ে দেখুন চুনিদা। ঐ পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়ে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। অরূপের কী রূপের খেলা! মনটাকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পাথারে ডুবিয়ে ফেলুন, শান্তি পাবেন।

অসহিষ্ণুভাবে চুনিদা বলেন—ডাক্তার সেন, মনে করবেন না আমি দলিল-দস্তাবেজ, জমি-জমা, বিষয়সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু বুঝিনে। সাহিত্যের স্বাদও পেয়েছি, রসবোধও কিছু আছে। কল্পনার জলছবি দিয়ে জীবনের

শাদাপাতাগুলো ভরে নিতে আমিও জানি। কিন্তু মৃত্যুর এই লীলাভূমিতে, বোমারু বিমানের মর্মভেদী হুংকার আর অসহায় মানুষের অভ্রভেদী হাহাকারের মধ্যে কাব্যের স্থান কোথায় ?

এর পর আর কথা চলে না। চট্টলের উপক্রুত অঞ্চল পার হয়ে চুনিদার মন ভেসে যায় পশ্চিম বাংলার নিরুপদ্রব এলাকায়। পূর্বস্থলীর উপরে ঘনিয়ে এসেছে শান্তিময়ী সন্ধ্যা। গোধূলির শেষ স্বর্ণলেখা বিদায় নিয়েছে তিমিরের তীরে। মনোরমা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে প্রিয়তমের মঙ্গল কামনা ক'রে প্রাণদেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানাচ্ছে। ছোট খোকা বুড়ীঝির কোলে শুয়ে সাগ্রহে শুনছে রাজপুত্র কোটালপুত্রের গল্প। খুকী রোয়াকের উপর মাদুর বিছিয়ে হারিকেনের আলোয় তন্ময় হয়ে পড়ছে বাংলার বাঘ আশুতোষের জীবন-কথা। দক্ষিণের বাঁশবন আলোছায়ায় রহস্যময়। খিড়কি পুকুরের ধারে বৈকুণ্ঠ বৈরাগী রামপ্রসাদী সুরে গাইছে—'মন কেন তুই ছন্নছাড়া !'

বৃহস্পতিবার—বেলা দশটা। কলেজ থেকে ফিরছি। তখনও পর্যন্ত সকালের দিকে সাইরেণ বাজেনি—তাই ঐ সময়টায় কলেজ বসত নামমাত্র। কমিশনারের পাহাড়ের বাঁকে ঝাউগাছটার নীচেই চুনিদার সঙ্গে দেখা। সেজেগুজে হাসিমুখে আপিস চলেছেন। ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না। চুনিদা বললেন—সকালের ডাকে চিঠি এসেছে, বাড়ীর খবর ভাল। দুদিন ছুটি নিয়েছিলাম, অনেক কাজ জমে আছে, তাড়াতাড়ি আপিস যাচ্ছি। সন্ধ্যায় দেখা হবে।

পান চিবোতে চিবোতে—গোঁফে তা দিতে দিতে—হন্ হন্ ক'রে চলে গেলেন চুনিদা। কর্ণফুলীর তীরে এমন আনন্দোজ্জ্বল প্রভাত আর কখনও হয় নি।

মার্চের প্রথম সপ্তাহ—রবিবার। শরীর অসুস্থ থাকায় সপ্তাহখানেক ক্লাবে যেতে পারিনি। অলস মধ্যাহ্ন। চারিদিক নিস্তব্ধ—কেবল দূরের ভাঙ্গা বাড়ীর ভিটেয় একটা ক্লান্ত ঘুঘু ডাকছে। কী বৈরাগ্যমাখা সুর ! নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠল। ক্লাবের দিকে ছুটলাম। চুনিদার ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। চুনিদার সেই বিরাট গোঁফ কোথায় গেল ! মৃদু হেসে চুনিদা বললেন—চিনতে পারছেন না বুঝি ? অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছেন যে ?

আমি বললাম—কিছুমাত্র দোষ নেই চুনিদা। ভারতের মানচিত্র থেকে হিমালয়টাকে বাদ দিলে চিনতে দেরি হয় বৈকি। ভালো করেন নি—আপনার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেল্লেন। তাছাড়া এতদিনের স্মৃতিচিহ্নটাকে না দেখে আমার কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। ব্যাপারটা খুলে বলবেন কি ?

চুনিদার হাসি-মুকুলিত মুখ—আমার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি—পাঁচ মিনিট বাক্যহারা বিরতি। তারপর স্বপ্নজড়িত কণ্ঠে চুনিদা বললেন—খবর আছে ভায়া, সুখবর ! দিন পনরোর মধ্যেই আপনাদের মায়া কাটাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানেন ? একেবারে স্বর্গপুরে—বুঝলেন না, আলিপুরে। এদেশে তো গঙ্গা নেই, তাই মুক্তিস্নানের অভাবে গোঁফটা কামিয়ে ফেলেছি।

চুনিদার ভবানীপুরে একখানা বাড়ী আছে। সেখানে ভাড়াটে উঠিয়ে নূতন সংসার পাতবার স্বপ্নে আজ তিনি বিভোর। কর্মস্থান হিসাবে কলকাতা চাকরিজীবীর একান্ত কাম্য হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের বাজারে গোয়ালটুলির এঁদো একতলা বাড়ীতে স্বর্গসুখ যে কোথায় বুঝে উঠতে পারলাম না। সে যাই হোক, আজকের চুনিদা যেন সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ। মসৃণ মুখমণ্ডলে অপূর্ব দীপ্তি, সারা অঙ্গে পুলকপ্রবাহ। কোথায় সেই রুক্ষ মেজাজ, গম্ভীর ভাব, নীরস কথাবার্তা ? চুনিদা আজ রসিক, কৌতুকপ্রিয়, উদার। জানিনা কোন্ নবাবিষ্কৃত কায়কল্পে যৌবন ফিরে পেয়েছেন চুনিদা !

কিছুদিন ধ'রে চুনিদার চিন্তাই মনটাকে নাড়া দিতে লাগল। তাঁর মান অভিমান, অনুরাগ বিরাগ, সুখদুঃখ, হাসি কান্নাই ক্লাবের আলোচনার সব চেয়ে বড় উপাদান। চুনিদাকে নইলে আমাদের দিন কাটে না। চুনিদা লড়াই করবেন কিন্তু ক্লাব ছাড়বেন না। তিনি সেই জাতের মানুষ —যাকে এক হাতে দূরে ঠেলে দিয়ে আর এক হাতে কাছে টানতে হয়। দুঃখের দিনে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এমনই নিবিড় ও মধুর হয়ে ওঠে—এ প্রীতি ক্ষণের নয়, চিরন্তনের।

চুনিদার যাত্রার দিন। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় চা পানের ব্যবস্থা। পার্টিতে সকলেই উপস্থিত হলেন—নানা কথা হতে লাগল। চুনিদা সারাক্ষণ বসে রইলেন অস্তরবির

ছবির দিকে চেয়ে—একটি কথাও বললেন না। আশ্চর্য! বদলির খবর আসার পর থেকে যে চুনিদা হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত মুখর, তিনি আজ একান্ত নীরব। মানুষের বিদায় বেলাটা সত্যিই বড় করুণ। এটা অভিনয়ের সময় নয়, অনুভূতির—একে উপভোগ করা যায় না, উপলব্ধি করতে হয়।

সন্ধ্যার পর চুনিদাকে চট্টগ্রাম মেলে তুলে দিতে স্টেশনে গেলাম। ট্রেণ ছাড়বার বাঁশী বাজল। গাড়ীর খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে করজোড়ে সজলচোখে চুনিদা বললেন—ভাই, তোমাদের ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। তোমরাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলে। আমার সব অপরাধ ক্ষমা ক'রো।

ট্রেণ ছাড়ল—প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে গেল—অন্ধকারের অতলে অদৃশ্য হল চুনিদার মুখ।

বছরের পর বছর কেটেছে। চলমান কাল জাতীয় ইতিহাসে এনেছে পরিবর্তনের পর পরিবর্তন। দুর্ভিক্ষ—দাঙ্গা—স্বাধীনতা—দেশবিভাগ। ব্যক্তিগত জীবনেও বিচিত্র পরিবেশ, বিচিত্র পরিচয়, বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কত পুরাতনকে ভুলেছি—কত নূতনকে পেয়েছি। চুনিদার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। কিন্তু কর্মময় সংসারের জনাকীর্ণ পথে তাঁর বিদায় বেলার জলভরা-আঁখি দুটি আজও হারায় নি।

কাঠুরিয়ার দলে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কাঠুরিয়াদের কুটীরেতে আমি
কাটেয়েছি কত রাতি,
দেখেছি শোভার ছড়াছড়ি আর
শ্বাপদের মাতামাতি।
মহুল শালের ভিড়,
তারি মাঝে মোর নীড়,
সঙ্গে সহরে বালক ভৃত্য
দুর্ব্বল এক সাথী।

২

কভু করাতের কর্কশ ধ্বনি,
কভু কুঠারের সাড়া।
শঙ্কিত করে বনস্থলীকে
তোলপাল করে পাড়া।
কভু ময়ূরের ঝাঁক,
আসিয়া লাগায় তাক
শশকের দল উপত্যকায়
রহে করি' কান খাড়া।

৩

সমীরে আসিত ব্যাঘ্রের ডাক,
বনফুল পরিমল,
আমারে ঘেরিয়া আলাপ করিত
আরণ্যকের দল।
বলিত' এখানে থাকো,
ঠাঁইটি কেমন দেখো,
ডাল কাঠ দিয়ে বানাইয়া দিব
তোমায় বাসস্থল।'

৪

ভাষা ভঙ্গীতে ধন্যবাদটা
দিতাম তাদিকে ঢের,
আনন্দ রস ভোগ করিতাম
নিত্য শ্রীবৎসের।
সমাজ কেন বা টানে?
রয়ে যাই এইখানে,
সভ্যতার যে শিক্ষা তাহা তো
বহুৎ পেয়েছি টের।

৫

ছাড়িয়া এসেছি ধূলা ধোঁয়া আর
মোটরের ঘর্ঘর,
সময় সময় মনে হ'ত এটা
বুঝি জন্মান্তর;
শোষণ করিত নিতি
মোরে সে পরিস্থিতি,
মহাভারতের রাজাদের আমি
যোগ্য বংশধর।

৬

সবল সরল বন্য জীবন
বিশুদ্ধ করে মন,
সুরভি মাতার পীযূষ স্তন্য
করায় আস্বাদন।
পাতার টোপর দানি'
হরে কিরীটের গ্লানি,
করে সমাজের পীড়ন সহার
যোগ্যতা অর্জ্জন।

ঝাড়গ্রাম কৃষি মহাবিদ্যালয় ও গবেষণামন্দির

শ্রীপবিত্রকুমার সেন

ঠিক দুই বৎসর পূর্বে ১৯৪৯ ইংরাজীর ৮ই মে তারিখে এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ইহার অদূরে অবস্থিত ঘন বনাকীর্ণ স্থানের অনুরূপই ছিল বিদ্যালয়ের জায়গাটাও। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া একদিকে কৃষিক্ষেত্র ও অপরদিকে বিদ্যাভবন ক্রমে যেভাবে গড়িয়া উঠিতেছে উহা যেন মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্তমান অর্থ ও যন্ত্রশক্তির দিনে হয়ত এই দুইএর অপ্রাচুর্য্য বশতঃ এই প্রতিকূলতাও যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে নিজেদের বা অপরের উপর জুলুম না করিয়া ক্ষুদ্র সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়াও ধীর অথচ সুনিশ্চিত পদক্ষেপে সকল কাজেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব। ক্রমবর্দ্ধমান এই বিদ্যামন্দিরের কার্য্য দেখিয়া স্বতঃই প্রতীতি হয় যে ইহা একদিন বহু খ্যাতিসম্পন্ন ভারতের ও বিশ্বের অপরাপর কৃষি মহাবিদ্যালয়ের সমতুল হইতে পারিবে এবং
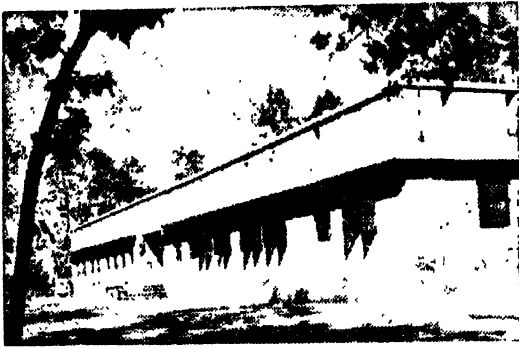
ঝাড়গ্রাম কৃষি-মহাবিদ্যালয় ভবনের সম্মুখভাগ (অসম্পূর্ণ)

ইহার শিক্ষায় ও অনুপ্রেরণায় এই অনগ্রসর বনভূমি অদূর ভবিষ্যতে শস্য-শ্যামল হইয়া উঠিবে। সুবিস্তীর্ণ ভূমিসম্পন্ন স্বল্প জনাকীর্ণ বাংলার এই পশ্চিমাঞ্চলকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিতে পারিলে বাঙ্গালীর সঙ্কটত্রাণ হইবে, খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে, বাসস্থানের অভাব ঘুচিবে, প্রাণ মান রক্ষা পাইবে।

কৃষিই সভ্যতার গোড়ার কথা। অন্নের প্রয়োজনেই মানুষ স্বীয় প্রতিভা ও পুরুষকার আবিষ্কার করে, অন্নের সংস্থান করিয়া তবেই সে তার সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হয়। উৎকর্ষের অহঙ্কারে মানুষ উল্টা বুঝিয়া তলস্থিত বুনিয়াদ অন্নসংস্থানের কথাই যেন আজ ভুলিয়া গিয়াছে, তাই যেন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই কৃষি কর্ম্মকে নীচ কর্ম্ম জ্ঞানে অবজ্ঞা করিতেছে। ফলে মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি শিল্পকুশলতার বহু উৎকর্ষ সাধন সত্ত্বেও দিন দিন অন্নাভাব বাড়িয়া চলিয়াছে—মানব সভ্যতার বুনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। এ হেন অবস্থায় কৃষি শিক্ষার প্রয়োজন যে কত জরুরী, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কোন কৃষিবিদ্যালয় ছিল না। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগের ফলে ঢাকায় অবস্থিত একমাত্র কৃষি বিদ্যালয়টিও পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পশ্চিম বাংলায় কৃষি শিক্ষার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থাই থাকে না। এমতাবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কৃষি বিদ্যামন্দির স্থাপনে তৎপর হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শুভপ্রচেষ্টায় কথা জানিতে পারিয়া দূরদর্শী, বিদ্যোৎসাহী ঝাড়গ্রামরাজ শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব, ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রয়োজনীয় ভূমি ও নগদ একলক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ঝাড়গ্রামে একটি প্রথমশ্রেণীর কৃষি মহাবিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করিতে আহ্বান করেন। এই সঙ্গে তিনি বাংলার এতদঞ্চলে কৃষি উন্নতির প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন এবং কৃষি মহাবিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের উপকারিতার কথাও বলেন। ইহাতে বিদ্যালয়ের
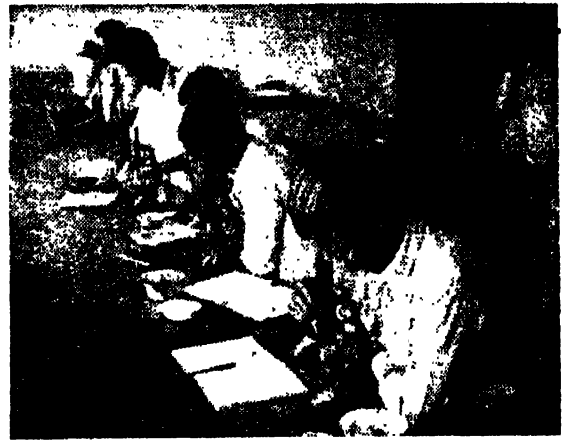
উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যা পরীক্ষা গৃহ—ঝাড়গ্রাম কৃষিমহাবিদ্যালয়

ব্যয় ভার লঘু হইবে, যে সকল বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে সাধারণ বিজ্ঞান ও কলা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ঐ সকলে অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে কৃষি বিভাগ যোগ করিয়া সহজে কৃষি শিক্ষার প্রচার ব্যবস্থার প্রচলন হইবে এবং সর্ব্বোপরি মহাবিদ্যালয়ের সকল বিভাগের ছাত্রগণই কৃষি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইতে পারিবে। ইহাতে দেশে এ বিষয়ে জ্ঞান ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ছয় মাস কাল বিচার বিবেচনার পর ঝাড়গ্রামরাজের এই প্রস্তাব যে সত্যই সুচিন্তিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ১৯৪৯ ইংরাজীর এপ্রিলমাসে এই বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা স্থির করেন। প্রস্তাবানুসারে ঝাড়গ্রামরাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে আনুমানিক ৪৫০ বিঘা ভূমি ও নগদ একলক্ষ টাকা দান করেন।

তদানীন্তন উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

৮ই মে তারিখে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঝাড়গ্রামরাজ ও বহু সুধীজন সমক্ষে এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তাই এই ৮ই মে তারিখটি আমাদের একটি স্মরণীয় দিন। প্রতি বৎসর এই তারিখে আমরা আমাদের বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবস উৎসব পালন করিতে স্থির করিয়াছি। দেশবাসী সকলের কাছে আমরা এই দিনে শুভেচ্ছা কামনা করি। আজ সভ্যতার এই সঙ্কটের দিনে বিদ্যার্থী ও বিদ্যানুরাগী আমাদের সকলের কৃষিবিষয়ে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করি।

এই পুণ্য দিনে পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের কথা স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে। ঝাড়গ্রাম রাজের সুযোগ্য ম্যানেজার ও রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেবের শিক্ষাগুরু এই উদ্যোগী পুরুষসিংহের কীর্ত্তি বহন করিতেছে ঝাড়গ্রামের প্রত্যেক শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। আর আমরা যারা জানি, কি অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি করিয়া গিয়াছেন এই মহাবিদ্যালয়ের জন্য, তাহারা ইহাকে নিঃসঙ্কোচে স্বর্গীয় দেবেন্দ্রমোহনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিতে পারি। সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে ৺দেবেন্দ্র-

রসায়ন পরীক্ষা গৃহ (ল্যাবরেটরী)

মোহনের কীর্ত্তির আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার ভার আজ দৃঢ় হস্তে ন্যস্ত। একাধারে তাঁহার গুণগ্রাহী ছাত্র ও প্রযোক্তা রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব ইহার পৃষ্ঠপোষক। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এই সকল পুণ্যকর্ম্মের বৃদ্ধি সাধন করুন; নিঃসন্দেহ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্যসরকার ও দেশবাসী জনগণ এই সুমহান প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তৎপর হইবেন, ৺দেবেন্দ্রমোহনের স্বর্গীয় আত্মা তৃপ্ত হইবেন।

১৯৪৯ সালের ৮ই মে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইলেও প্রয়োজন অনুযায়ী সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করিয়া এবং জলের ব্যবস্থা করিয়া বিদ্যালয় ভবন নির্ম্মাণের কাজ ঐ বৎসরের নভেম্বর মাসের পূর্ব্বে আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করিয়া স্থানীয় কুমুদ কুমারী বিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। ঐ বৎসরের ১২ই জুলাই হইতে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজও আরম্ভ করা হয়।

এই ক্ষুদ্র সহরে বাস স্থানের প্রাচুর্য্য নাই। বহুকষ্টে কতিপয় ভদ্রজনের সহযোগিতায় সাধারণ কয়েকটি বাসাবাড়ী ভাড়া করিয়া ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও দেশে কৃষিশিক্ষা লাভের এই প্রথম সুযোগ পাইয়া প্রায় ৫০০ ছাত্র ভর্ত্তির আবেদন করে। কিন্তু আমরা মাত্র

গো-শালার একাংশ

একশতজনকে মধ্যমান কৃষি শ্রেণীর প্রথমবর্ষে ভর্ত্তি করিতে সমর্থ হই। আরও প্রায় ৭৫জন ছাত্র বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের প্রথমবর্ষে ভর্ত্তি হয়।

প্রায় এক বৎসর পর ১৯৫০ ইংরাজীর ১৭ই জুলাই রথযাত্রার দিনে রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব মহাশয়ের পৌরোহিত্যে আমরা নবনির্ম্মিত বিদ্যাভবনে শুভপ্রবেশ করি। এই নব প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে ছাত্র, অধ্যাপকমণ্ডলী ও সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীগণ বহু ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন। আজিকার ঘনায়মান নিরাশা ও নিষ্ক্রিয়তার দিনে ঝাড়গ্রাম কৃষিমহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্ম্মীগণ যে কর্ম্মতৎপরতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন তাহাতে প্রমাণিত হয় যে যেখানেই আদর্শ আছে, সেখানেই প্রাণ আছে, সঞ্জীবতাও আছে। এই এই মহাবিদ্যালয়ের বহু অভাব আছে, কিন্তু ইঁহাদের সাধনার গুণে অচিরেই সকল অভাব দুরীভূত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

কুক্কুট পালন ক্ষেত্র

ছাত্রাবাসের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে না পারার দরুণ ১৯৫০ সালে কৃষি বিভাগে মাত্র ৯০ জন এবং বিজ্ঞান ও কলাবিভাগে ৩০ জন ছাত্র ভর্ত্তি করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরে এই মহাবিদ্যালয় হইতে মোট ৭৫

জন ছাত্র কৃষি, ৩১ জন বিজ্ঞান ও ১১ জন কলা বিষয়ে মধ্যমান পরীক্ষা দিয়াছে।

মধ্যমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ যাহাতে স্নাতকমান শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হয় সেইজন্য আগামী জুলাই হইতেই অন্ততঃ কৃষি বিষয়ে

ঝাড়গ্রাম কৃষি-মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনরত তদানীন্তন উপাচার্য শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৯-৮ই মে)

স্নাতক মানের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী খুলিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সুযোগ সাপেক্ষে সাধারণ কলা ও বিজ্ঞান বিষয়েও স্নাতকমান শিক্ষা-ব্যবস্থা যথাসত্বর করিবার প্রস্তাব রহিয়াছে।

ক্ষেত্রে কর্মরত ছাত্রগণ

প্রথম বৎসরে (১৯৪৯-৫০) এই মহাবিদ্যালয়ের দরুণ গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য ৪০,০০০৲ স্থায়ী ব্যয় ও প্রায় ২৫,০০০৲ পৌনঃপুনিক ব্যয় হয়। এই পৌনঃপুনিক ব্যয়ের প্রায় সমুদয় অংশই বিদ্যালয়ের আয় হইতে সঙ্কুলান হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থাৎ চলতি বৎসরের স্থায়ী ব্যয় বাবদ মোট ৭০,০০০৲ ও পৌনঃপুনিক ব্যয় ৫৬,০০০৲ ধার্য্য হইয়াছে। এই শেষোক্ত পৌনঃপুনিক ব্যয়ের বারোআনা অংশের অধিক বিদ্যালয়ের আয় হইতে সঙ্কুলান হইবে।
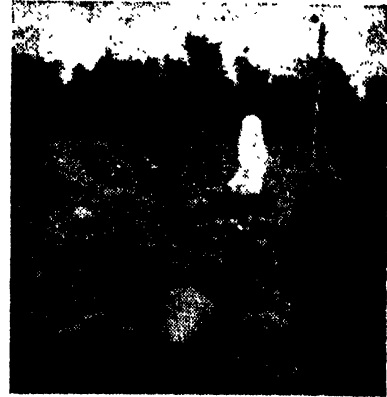
সবজী বাগানের একাংশ

আনুমানিক দশহাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে। অবশ্য ইহা ব্যতীত আরো প্রায় ১৪,০০০৲ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় কুমার গুরুপ্রসাদ সিং কৃষি-অধ্যাপক ও তাহার গবেষণা বিভাগের জন্য পৃথকব্যয় ধার্য্য করিয়াছেন। কুমার গুরুপ্রসাদ সিং অধ্যাপক আপন কাজের অতিরিক্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাজও করেন।

ছাত্রগণ আমন ধানের রোয়া লাগাইতেছে

এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্য্যারম্ভের পর ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে গান্ধীদর্শন-বিশারদ ওয়ার্দ্ধার সুপ্রসিদ্ধ সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জে, সি, কুমারাপ্পা আসেন। তারপর ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ফেব্রুয়ারী মাসে মহামান্য রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু, মে মাসে মাননীয় কৃষি-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, জুলাই মাসে অধ্যাপক কালিদাস নাগ ও অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নভেম্বর মাসে

পুনরায় মহামান্য রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু ও ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে মহামান্য রাজ্যপাল আবার এই মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং ১৫ই জানুয়ারী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আঞ্চলিক কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণ এই মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই বাংলায় কৃষি শিক্ষার এই সূচনা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন ও সর্ব্বতোভাবে ইহার উন্নতি কামনা করেন।

বর্ত্তমানে এই মহাবিদ্যালয়কে উপযুক্তভাবে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে, সরকার এই প্রতিষ্ঠান ও ইহার আদর্শের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাযথ সহযোগিতা করিবেন।

ব্রাড্‌লে

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(১৮৪৬-১৯২৪)

ফ্রান্সিস্ হারবার্ট ব্রাড্‌লে নব্য হেগেলিয়ান সম্প্রদায়ের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। হফ্‌ডিং তাঁহাকে সাম্প্রতিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত বলিয়াছেন। লর্ড হ্যালডেনের মতে ব্রাড্‌লে যে পদ্ধতিতে দার্শনিক আলোচনা করিয়াছেন, সূক্ষ্ম যুক্তি ও সম্পূর্ণতার দিক হইতে বর্ত্তমান যুগে তাহা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অধ্যাপক মিওরহেড তাঁহাকে আধুনিক কালের সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক লেখক এবং বৃটিশ দর্শনে—সম্ভবতঃ যে কোনও দেশের দর্শনেই—বর্ত্তমান কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। ১৮৪৬ সালে ব্রাড্‌লের জন্ম হয়। তিনি মার্লবরো এবং অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করেন। পাঠ্যাবস্থাতে তিনি হেগেল, লোট্‌জে এবং গ্রীণের রচনাদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অচিরেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। হেগেলের পরমবস্তু (absolute)—সম্বন্ধীয় মত তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত তাঁহার Appearance and Reality—(প্রতিভাস ও সৎবস্তু) গ্রন্থে তাঁহার দার্শনিক মত বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নব্য হেগেলিয় দর্শন সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাড্‌লে তাঁহার গ্রন্থে অন্য কোনও দার্শনিকের মতের প্রায়ই কোনও উল্লেখ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে আপনার মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্রাড্‌লে তাঁহার Appearance and Reality গ্রন্থের ভূমিকায় অতিপ্রাকৃত দর্শন (Metaphysics) সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "যাহা আমরা সহজাত-প্রকৃতিবশে বিশ্বাস করি, তাহার জন্য ভ্রান্ত যুক্তির অনুসন্ধানই অতি-প্রাকৃত দর্শন ; কিন্তু এবম্বিধ যুক্তির অনুসন্ধান ও সহজাত প্রবৃত্তির ফল।" গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, প্রতিভাস হইতে স্বতন্ত্রভাবে সৎকে জানিবার প্রচেষ্টাই অতি-প্রাকৃত দর্শন ; অথবা প্রথম তত্ত্বাবলী (first principles) বা চরম সত্যের অনুশীলন, অথবা বিশ্বকে খণ্ডশঃ না বুঝিয়া সমগ্রভাবে বুঝিবার প্রচেষ্টাই অতিপ্রাকৃত দর্শন। কিন্তু অনেক সময় আপত্তি ওঠে যে অতিপ্রাকৃত দর্শন যে জ্ঞানের সন্ধান করে তাহা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব, অথবা যদি আংশিকভাবে সম্ভবপরও হয়, তাহা হইলেও কার্য্যতঃ সে জ্ঞানের কোনও মূল্য নাই। কেহ কেহ ইহাও বলিতে পারেন যে প্রাচীন দর্শনে যাহা আছে, তাহার অধিক কিছুরই আমাদের প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে বলা যায়, যে যিনি বলেন—অতিপ্রাকৃত দার্শনিক জ্ঞান অসম্ভব, তাহার কথার কোনও উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কেননা তিনি নিজেই একজন অতিপ্রাকৃত দার্শনিক। সতের স্বরূপ এমন, যে তাহার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব—ইহা যিনি বলেন 'সৎ' এর স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহার নিজের জ্ঞান আছে বলিয়া তিনি দাবী করেন। সে জ্ঞান যদি তাঁহার না থাকে,তাহা হইলে 'সৎ' এর স্বরূপ যে অজ্ঞেয় তাহা তিনি বলেন কিরূপে? যাঁহাদের মতে অতিপ্রাকৃত দার্শনিক জ্ঞানের কোনও মূল্য নাই, তাহারা বলেন যে অতিপ্রাকৃত দর্শনে এক সমস্যাই চিরকাল আলোচিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু সমস্ত আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং এবম্বিধ আলোচনা বর্জন করাই ভালো। কিন্তু এতদিন এই সকল আলোচনা কোনও ফল প্রসব যদি নাও করিয়া থাকে, তাহা হইলেও ভবিষ্যতেও যে তাহা নিষ্ফল হইবে, তাহা বলা যায় না। ব্রাড্‌লে স্বীকার করিয়াছেন যে পরম বস্তুর সম্পূর্ণ জ্ঞান অসম্ভব, কিন্তু তাহার আংশিক জ্ঞান সম্ভবপর বলিয়াছেন। এই জ্ঞান পূর্ণ না হইলেও মূল্যহীন নহে। মানুষের স্বভাবই এই যে বিশ্ব-সম্বন্ধে চিন্তা হইতে সে বিরত হইতে পারে না। সাধারণ লোকের মনেও বিশ্ব-সম্বন্ধে বিস্ময়ের উদ্রেক হয় এবং তাহার রহস্য সম্বন্ধে সে চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। যখন কবিতা, কলা এবং ধর্ম্মের প্রতি মানুষের কোনও আকর্ষণ থাকিবে না, কেবল তখনই অতি প্রাকৃত দর্শন মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। মানুষের স্ব-ভাবের উপরই অতি-প্রাকৃত দর্শন প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিহীন কুসংস্কার হইতে আত্মরক্ষার জন্যও অতিপ্রাকৃত দর্শনের প্রয়োজন। এক দিকে দৃঢ় নিশ্চিত ধর্ম্মতত্ত্ব, অন্য দিকে অতি সাধারণ জড়বাদ, উভয়ই দর্শনের স্বাধীন সন্দেহাকুল আলোকের প্রভাবে অন্তর্হিত হয়। যিনি সংগতি-পূর্ণ ভাবে চিন্তা করিতে উৎসুক, কিন্তু কোনও মতের দাসত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহার জন্য এক আশ্রয়ের প্রয়োজন। অতি প্রাকৃত দর্শনে সেই আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে কখনও কখনও প্রাত্যহিক সাধারণ তথ্যের অতীত তথ্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়া থাকি,—

তখন দৃশ্যমান জগতের বাহিরে যাহা বর্তমান, তাহার দর্শনপ্রাপ্ত হই, এবং তাহা হইতে যেমন সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই, তেমনি আমাদের ক্ষুদ্রতাও অনুভব করি। বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্ব-রহস্য বুঝিবার চেষ্টাই কাহারও কাহারও নিকট ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার প্রধান উপায়। যাহার এই অনুভূতি কখনও হয় নাই, তাহার নিকট অতি-প্রাকৃত দর্শনের কোনও মূল্যই নাই। যাহার এই অনুভূতি হইয়াছে, তিনি দর্শনের সাহায্যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টিত হন।

জগৎ পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক যুগের মানুষের মানসিক অবস্থা পূর্ববর্তী যুগের মানুষের মানসিক অবস্থা হইতে ভিন্ন। সুতরাং পূর্ববর্তী যুগে লোকে যাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছে, পরবর্তী যুগে তাহাতে সন্তুষ্ট হয় না। এই জন্যই নূতন দর্শনের প্রয়োজন।

প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটি মিষ্টিক (mystic) অংশ আছে। সেই অংশকে তুষ্ট করিবার উপায় অতিপ্রাকৃত দর্শন: বুদ্ধিই যে আমাদের প্রকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট অংশ তাহা নহে,এবং জ্ঞান বাহো উন্নততর বিষয়ের গবেষণা যে অন্য বিষয়ের গবেষণা হইতে উন্নততর, তাহাও নহে। এক জনের জীবন অন্যের জীবন অপেক্ষা ঐশ্বরিকভাবে অধিকতরপূর্ণ হইতে পারে, অথবা তাহার ঈশ্বরানুভূতি অধিকতর গভীর হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট পৌঁছাইবার পথ একটি মাত্র নহে। দার্শনিক আলোচনার যে পথ, অন্য পথ হইতে তাহা যে উৎকৃষ্টতর তাহা নহে।

ব্রাডলের দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। A W Benn লিখিয়াছেন "ব্রাডলের দর্শন যদিও পরমবস্তু সম্বন্ধী (absolutist) বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাপি আমার নিকট হার্বার্ট স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদের সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই। হার্বার্ট স্পেনসারের দর্শন অপেক্ষা ইহা প্রচলিত ঈশ্বরবাদের অধিকতর প্রতিকূল।" তাই কেহ ব্রাডলেকে মিষ্টিক বলিয়াছেন, আবার কেহ কেহ তাহার দর্শনকে অদ্বৈত প্রত্যয়বাদ (Idealism) বলিয়াছেন। হেগেলীয় পদ্ধতি অবলম্বন না করিলেও ব্রাডলের দর্শনের সহিত হেগেলের দর্শনের যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রাডলেও হেগেলের নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। Absolute সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা হেগেলের ধারণারই অনুরূপ। কিন্তু হেগেলের মতো তিনি Absoluteএর মধ্যে সত্তের প্রত্যেক অংশের স্থান নির্দেশ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে সাধারণ চিন্তা এবং বিজ্ঞানের ও দর্শনের সামান্য প্রত্যয়দিগকে (concepts) সৎ বলিয়া যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উহারা স্ববিরোধে কণ্টকিত। তাহাদিগকে এক পরম সৎ বস্তুর সসীম প্রকাশ অথবা প্রতিভাসরূপে দেখিলেই তাহাদের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। এই পরম সৎ বস্তু ব্রাডলের মতে এক সর্বগ্রাহী অতি যৌক্তিক অভিজ্ঞতা (Suprarational Experience)। এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতা নহে। সকল অভিজ্ঞতা যাহার অন্তর্ভূত, ইহা সেই অভিজ্ঞতা। ইহা অবিভক্ত ও সর্বাধার, যাবতীয় বস্তু ইহার অন্তর্ভূত। এই অভিজ্ঞতা কেবল বিষয় নহে, কেবল বিষয়ীও নহে; যে সমগ্রের মধ্য হইতে বিষয় ও বিষয়ী উভয়েরই আবির্ভাব হয়, ইহা অনুভবে প্রাপ্ত সেই সমগ্র বস্তু। এই বিশ্ব অথবা পরম সত্তা এক অখণ্ড অভিজ্ঞতা; বিভিন্ন কেন্দ্রে ইহা আবির্ভূত, প্রত্যেক কেন্দ্রে ইহা অনুভূত। সকল কেন্দ্রের মধ্যে ইহা অনুভূত বলিয়াই, বিভিন্ন কেন্দ্র পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, এবং সকলেই সেই পরম সত্তের মধ্যে অবস্থিত। পরম সত্তার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, সত্তের উচ্চ ও নিম্নতর রূপ আছে, নিম্নতর রূপ অতিক্রম করিয়া উচ্চতরে উপনীত হইতে পারা যায়। কিন্তু পরম সত্তাকে অতিক্রম করা সম্ভবপর নহে। পরম সত্তার মধ্যে সমস্ত বিভাগ এবং ভেদ বর্তমান; পরম বস্তুর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া তাহারা একীভূত। বিভিন্ন প্রকারের আংশিক অভিজ্ঞতা ইহার মধ্যে একীভূত এবং সমঞ্জসীভূত এবং তাহাদের অপেক্ষা ইহা উচ্চতর অভিজ্ঞতা। ইহার অন্তর্গত কোনও বস্তুই নিরপেক্ষভাবে সৎ নহে। প্রত্যেক বস্তুই তাহার নির্দিষ্ট স্থানে আপেক্ষিক ভাবে সৎ। সেই পরম বস্তু কেবল চিন্তা নহে, ইহা ইচ্ছা এবং অনুভূতিও বটে। কিন্তু চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা সকলেই পরম বস্তুর বিভিন্ন রূপ রূপে সৎ, অন্য নিরপেক্ষ ভাবে সৎ নহে। ইহাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিপূরক। পরিবর্তন চরম সত্য নহে, পরম বস্তুর একটা নিম্নস্থ রূপ পরিবর্তন। পরম বস্তু অপরিণামী ও স্থাণু নহে। বুদ্ধিতে যে সকল ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও মায়িক নহে। সৎ বস্তু তাহাদের দ্বারা বিশোধিত। কিন্তু সমগ্রের বিশ্লেষণদ্বারা যে সকল বস্তু ও সম্বন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারাও চরম সত্য নহে। সর্বাধার সমগ্র অভিজ্ঞতা—যাহা চরম সত্য, তাহা—এই সকল রূপ ও তাহাদের সম্বন্ধ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ব্রাডলে সমগ্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। সমগ্রই তাহার মতে পরম মঙ্গল এবং সমগ্রের স্বরূপ বুঝিবার প্রচেষ্টাই metaphysics। সত্তার আংশিক দিক্ সকলের তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং পরম সত্তার মধ্যে কিরূপে তাহারা মিলিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল আংশিক রূপ পৃথক ভাবে দেখিলে, তাহার মধ্যে স্ববিরোধ দৃষ্ট হয়; পরম সত্তার অন্যান্য অংশের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই পরম সত্তা আমরা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি না; মোটামুটি তাহার একটা ধারণা করাই কেবল সম্ভবপর।

তথাকথিত মুখ্য ও গৌণ গুণের আলোচনা করিয়া ব্রাডলে দেখাইয়াছেন, যে তাহাদের দ্বারা বস্তুর ব্যাখ্যা করা যায় না। মুখ্য গুণ (Primary Qualities) বস্তুর অন্তর্গত ও প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-নিরপেক্ষ, এবং গৌণ গুণের ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই, ইহা বলা হইয়া থাকে। দেশে ব্যাপ্তি এবং দৈশিক সম্বন্ধ-সমূহই মুখ্য গুণ। কিন্তু বস্তুতঃ গৌণ গুণও (Secondary Qualities) যেমন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংস্পর্শের উপর নির্ভর করে, মুখ্যগণও তদ্রূপ। বর্ণের সঙ্গে যেমন চক্ষুর সম্বন্ধ, শব্দের সহিত কর্ণের সম্বন্ধ, তেমনি দেশে ব্যাপ্তিও ত্বগিন্দ্রিয় ও পেশীর অনুভূতির সহিত সম্বন্ধ। মুখ্য গুণ হইতে গৌণগুণাবলীকে পৃথক করাও সম্ভবপর নহে। গৌন গুণ হইতে বিপর্যস্ত মুখ্য গুণের ধারণা করাও যায় না। বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তির ধারণা অসম্ভব। প্রত্যেক গুণের স্বতন্ত্রভাবে ধারণা করা অসম্ভব। জড়বাদিগণ যে মুখ্য গুণে বস্তুত্ব আরোপ করে, তাহা অজ্ঞতা-প্রসূত। (ক্রমশঃ)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অতিরিক্ত ক্লান্তিতে সরমার চোখ বুজে এসেছিল বটে কিন্তু ঘুমুতে পারেনি, যে কারণে ট্রেনের মধ্যেও তার ঘুম হয়নি, অর্থাৎ বিপদের মধ্যে এই অবলম্বনটি হারাবার ভয়। খুঁজে বেড়াচ্ছিল সুকুমারকে, তাকে আবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরে আসতে মিনিট কয়েক লেগে গেল।

বীরেন্দ্র সিং একটু কুণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলেন—"একটু যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ডাক্তারবাবু ?"

"না, বিশেষ কিছু নয়।"

মুগ্ধ হোল ওর সীমাজ্ঞানে, গোপন করছে দেখে আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

তবে গোপন রইল না কথাটা, একটা সুযোগ সমস্যা হয়েই দেখা দিল, তাইতেই সব প্রকাশ করে ফেলতে হোল।

বীরেন্দ্র সিং অনুরোধ করে বসলেন সুকুমারকে—তাদের সঙ্গে যেতে হবে।

তার অনেক বিপদ; দীর্ঘপথ, স্ত্রী বার চারেক অচেতন হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তারপর ঈশ্বর না করুন তাদের ছেলে-বৌয়ের যদি কোন রকম আঘাত লেগে থাকে তো একজন ডাক্তার সঙ্গে থাকে তো, খুবই প্রয়োজন। আরও একটা আশঙ্কা ছিল, সেটার উল্লেখ না করে শঙ্কিত নীরব-দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন বীরেন্দ্র সিং, অর্থাৎ ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে কে জানে? এখন সবটাই তো মাত্র একটা আশা।

একটু জোরের সঙ্গেই অনুরোধ করলেন, সুকুমার যা ফি চায় দেবেন তিনি। ভগবানের দানের মতো এমন হাতের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দেবেন না সুকুমারকে।

কঠিন সমস্যা, অথচ এতবড় সুযোগও আশা করে নি সুকুমার, হাতছাড়া হতে দিতে পারছে না। পরিচিত লোকের দৃষ্টি পৌঁছুবে না, নতুন জীবন সম্বন্ধে ভাববার, ধ্যান করবার প্রচুর সময় পাবে। মাত্র সুযোগ নয়, একটা সৌভাগ্যই।

চুপ করে একটু ভাবলে, তারপর ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেললে। বললে—"আমার আপত্তি নেই, তবে বাধা আছে বীরেন্দ্রবাবু।"

"কি বাধা বলুন।"

"আমার স্ত্রী সঙ্গে আছেন।"

"স্ত্রী!! কৈ বলেন নি তো কথাটা!...কোথায় আছেন তিনি?"

দুজনে জড়াজড়ি করে বললেন কথাগুলা। চাকরটা একটু চকিত হয়ে উঠল।

"বলিনি তার কারণ আছে; আমি দুর্ঘটনায় যতটা ঠিক আছি, উনি ততটা নেই।...আছেন এই পাশেই লেডিজ ওয়েটিং রুমে..."

দুজনে অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভদ্র মহিলা যেন তাঁকে নিয়ে আসবার জন্যই ওঠবার ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে পড়লেন। সুকুমার বললে—"না, সেরকম ভয়ের কোন কারণ নেই, আপনারা ব্যস্ত হবেন না; তাহলে আমিই কি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকতে পারতাম? ওঁর বাইরে কোন আঘাতই লাগেনি, ভেতরে ভেতরে বোধহয় ভয়ের জন্যেই একটা শক পেয়েছেন।"

"তাহলে!..."

—বীরেন্দ্র সিংই প্রশ্নটা করলেন, কথাটার মধ্যে নিজের চিন্তাও আছে, সুকুমারের স্ত্রীর বিষয়েও চিন্তা আছে।

সুকুমার বললে—"আর কিছু নয়, আপনার ওখানে গেলেই বোধহয় ওঁর পক্ষে ভালো, যদি একটু নিরিবিলির ব্যবস্থা করতে পারেন। ব্রেণের শক, মাঝে মাঝে কথা একটু অসংলগ্ন হয়ে পড়ছে, স্মৃতিশক্তিও বেশ কাজ করছে না, অথচ আমরা যেখানে যাচ্ছিলাম সেখানে প্রশ্নে প্রশ্নে ওঁকে উদ্ব্যস্ত করে তুলবে, হাজার মানা করলেও।"

ওঁরা দুজনেই একটু যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন।

সুকুমারই একটু থেমে বললে—"এই জন্যেই ওঁকে আমি আপনাদের সামনে আনিনি, বড় লজ্জিতও এর জন্যে। আমায় ক্ষমা করবেন। সবই যখন জানলেন, এবার ডেকে নিয়ে আসি।"

সরমাকে অবস্থাটা বোঝাতে, শেখাতে-পড়াতে একটু দেরি হোল। পাতানো সম্বন্ধ নিয়ে একসঙ্গে থাকতে হলে এই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটাই যে সবচেয়ে নিরাপদ—সরমা এটা শেষ পর্য্যন্ত বুঝলে। অন্তত কিছু বললে না বিশেষ, বেশ বোঝা গেল চারিদিক দিয়ে ভালো করে কোন একটা জিনিষ খতিয়ে দেখবার ক্ষমতাটা হারিয়েছে, কতকটা যেন নির্বিকার ভাব।

বীরেন্দ্র সিং-এর স্ত্রী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন, একটি মৌন সকরুণ বিস্ময়ের সঙ্গে। পরিচয়ে সুকুমার শুধু আর একটু জুড়ে দিলে, একটু হেসে বললে —"আমরা কিন্তু ব্রাহ্ম, আধা-ক্রিশ্চান বলে অনেকে মনে করে, একেবারে অত কাছে বসালেন তাই বলছি।"

ভদ্র মহিলা এতক্ষণ অত লক্ষ্য করেন নাই, সরমার সিন্দুরহীন সিঁথির দিকে একবার চেয়ে দেখে বললেন— "ও, তাই!...তা বেশ, আরও ভালোই তো!"

সিঁথিটা দেখিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল সুকুমারের; একটা কুটিল সংশয়ের পথ বন্ধ হোল।

রিলিফ ট্রেণটা আন্দাজের খানিকটা আগেই এসে পড়ল। সুকুমারের পরামর্শে বীরেন্দ্র সিং একাই গেলেন দেখতে। কয়েকটা মিনিট তীব্র উৎকণ্ঠায় কাটল সবার, সুকুমার ভদ্রমহিলাকে কথাবার্তায় টেনে অন্যমনস্ক রাখবার বৃথাই চেষ্টা করলে। তারপর পুত্র আর পুত্রবধূকে নিয়ে বীরেন্দ্র সিং উৎফুল্লভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন।

পাঁচ

নিশ্চিন্তভাবে গল্পগুজব করতে করতে স্নানাহার সেরে বেরুতে দুপুর হয়ে গেল; মোটর এসে যখন বাড়ির গেটের মধ্যে প্রবেশ করলে, তখন বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একটার পর একটা পাহাড় টপকে, কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে, কোথাও পাশ কাটিয়ে রাস্তা; কোথাও ঘন বনের মধ্যে দিয়ে, কোথাও আবার কচ্ছপের পিঠের মতো টানা মাঠ। কয়েকটা পাহাড়ে নদী, একটা পেরুতে হোল নৌকায়, বাকিগুলা পায়ের-গোছ-ডোবা ঝিরঝিরে জলের স্রোত আর বালি ঠেলে মোটর আপনিই পেরিয়ে গেল; সেটাকে হালকা করে দেবার জন্যে সবাই নেমে হেঁটে-হেঁটেই পার হোল; মেয়েদের মধ্যে একটা ছেলেমানুষী কৌতুক-চঞ্চলতা—সরমার পর্য্যন্ত, বেটাছেলেরাও সেটাকে বেশ ভালোভাবে চেপে রেখে পুরাপুরি গম্ভীর হতে পারছে না।...আমাদের বয়স্কতা প্রকৃতি-মাকে ছেড়ে থাকবার জন্যে তাঁর অভিশাপ, কাছে এসে পড়লে সেটা তিনিও যান ভুলে, আমরাও যাই ভুলে।...চমৎকার কাটল পথটা।

বাড়ির এখানটা অন্যরকম। পাহাড় শ্রেণীগুলা দূরে দূরে সরে গেছে; আছে চারিদিকেই, তবে কোথাও মনে হয় মাইল দুয়েক দূরে, কোথাও চারপাঁচ মাইল, কোথাও আরও বেশী,—দশ-পনেরো বা তার চেয়েও বেশি। মাঝখানে একটা বেশ বিরাট চত্তর; একেবারে সমতল নয়, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কোথাও খানিকটা উঁচু, কোথাও আবার আস্তে আস্তে গড়িয়ে নেমে গেছে; চালের নৈবেদ্যের মতো। ছাড়া ছাড়া কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড় এখানে ওখানে ছড়ানো আছে; অনেক দূরে একটির ওপর ছোট একটি মন্দির, শ্বেত পাথরের না হয়তো শুধু চূণকাম করাই। চারিদিকের হালকা আর ঘন নীলিমার মধ্যে ঐ একটি মাত্র শ্বেত বিন্দু। সন্ধ্যার শেষ আলোটুকুতে চিক চিক করছে।

এই চত্তরের একদিকে গ্রামখানি। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় খুব স্পষ্ট নয়, তবে বেশ বড় বলেই মনে হয়, কোনখানে বাড়িঘর একটু ঘেঁষাঘেঁষি, কোনখানে বা ছাড়াছাড়া। বাবু বীরেন্দ্র সিং এর বাড়িখানি গ্রাম থেকে একটু আলাদা, একটা টিলার ওপর, এখান থেকে চারিদিকে জমিটা গেছে নেমে।

হালফ্যাশানের বাড়ি, খানিকটা দোতলা, খানিকটা একতলা।

ঢালুর গা কেটে কেটে চারিদিকে বাগান, একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে মোটরটা খানিকটা উঠল। তারপরই চমৎকার একটা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, গোটা দশবারো ধাপ; তাই বেয়ে সকলে বাড়িটাতে গিয়ে উপস্থিত হোল। ডায়নামো বসিয়ে বিজলী-বাতি আর ফ্যানের ব্যবস্থা। ভেতরে গিয়ে আসবাবপত্র দেখলেও

মনে হয় ভদ্রলোক প্রকৃতই শৌখীন। স্টেশন থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে পার্বত্য অঞ্চলের একেবারে মাঝখানে এই রকম একটি মুক্ত প্রাঙ্গণ আর একেবারেই আধুনিক প্রথায় সজ্জিত এই রকম একখানি বাড়ি,—সুকুমারের পথশ্রান্ত মনে একটি যেন কল্পলোকের স্বপ্ন জাগিয়ে তুললে। একটি বিস্মিত প্রশ্ন যেন মনের মধ্যে রুণরুণ করতে লাগল—এ কোথায় এলাম ·কি করেই বা?···

আয়োজন সব তোয়েরই ছিল, ক্লান্তি আর এই অভিনব পরিবেশের আচ্ছন্নতার মধ্যে গা-হাত ধুয়ে আহারাদি সেরে সে-রাত্রির মতো বিশ্রাম করতে গেল। সরমা রইল বীরেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে।

তার পরদিন উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল। সূর্যের আলোটা তখনও কিন্তু রাঙা, কালকের সন্ধ্যায় দেখা আবছায়া চিত্রটা সেই গোলাপী আলোয় ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। অপূর্ব! এ যেন পৃথিবীর বাইরে অন্য কোন্ এক লোক, যেদিকেই চায় চোখ ফেরাতে পারে না। দূরের কাছের পাহাড়ে, অনেক নিচে দূরের নদীটির বালুচরে, তার পাশের গ্রামখানিতে, প্রান্তরের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি ফুটো পুষ্পিত পলাশ গাছে, ঐ একই আলো কত বিচিত্র রঙের মায়া রচনা করে চলেছে! সমস্তর ওপর প্রভাতের একটি শান্ত নীরবতা,—সুকুমারের মনে হোল কোন কুশলী কারিগর ধ্যানমৌন হয়ে নিজের সৃষ্টিতে রয়েছে তন্ময়। মনে হোল, গত রজনীর সেই জায়গাটিই আজ রূপান্তরিত হয়ে উঠছে চোখের সামনে—অন্ধকারের জায়গায় এসেছে দিনের আলো, অরণ্য মুছে গিয়ে এসেছে মানব জীবনের স্পন্দন-বৈচিত্র্য, আর্তনাদের জায়গায় প্রভাতের-কলকাকলি।···পরশু রাতে সত্যই তার মৃত্যু হয়ে গেছে নাকি? ক্রমাগতই নূতন, ক্রমাগতই অসম্ভব,—এ কোন্ জগতে এসে পড়ল সে? কোন্ দেবতা এত মুক্ত দাক্ষিণ্যে তার প্রার্থনা করলেন পূর্ণ?

তাকে ঘর দেওয়া হয়েছে বাড়ির পূর্বদিকে। বারান্দায় পরেও খানিকটা খোলা রক, ভালো করে চারিদিকটা দেখবার জন্য বেরিয়ে খানিকটা গেছে, দেখে বীরেন্দ্র সিং এগিয়ে আসছেন এদিকে। আসতে আসতেই প্রশ্ন করলেন—"এত সকালে উঠেছেন আপনি? ভোরেই ওঠা অব্যেস নাকি?"

সুকুমার হেসে বললে—"অতিথিকে অপ্রিয় সত্য বলবেন না স্থির করেছেন নাকি? ভোর আর কোথায়? বরং আপশোষ হচ্ছিল আপনার এখানকার ভোর দেখা হোল না। আপনি যশ দিচ্ছেন, অথচ আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না।"

বীরেন্দ্র সিংও হাসলেন, বললেন—"আপনার যশ নয়, আমার অপযশের কথা ডাক্তারবাবু; আমার এই ভোর, নিজের অভিধানের ভাষাই ব্যবহার করব তো? শুনুন, একটু চক্কর দিয়ে আসবেন জায়গাটায়? আমি সেই জন্যেই উঠে এলাম, মনে হোল জিগ্যেস করি গিয়ে ডাক্তারবাবুকে।"

"আপনি আমার জন্যে কষ্ট করলেন—একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমনো যখন অব্যেস···"

"অমন একটা ভালো অব্যেস একটা দিনে যাবার ভয় নেই। না, কথা হচ্ছে পাহাড়ে জায়গা, এখানকার সকালটা যেমন ঠাণ্ডা থাকে, রোদ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তেমনি হুহু করে তেতে ওঠে; তখন আর বেরিয়ে আরাম হবে না।"

সুকুমার একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে বললে—"যাবো কিনা জিগ্যেস করাই ভুল, বীরেন্দ্রবাবু, তবে আপনাকে খানিকটা অসুবিধেয় ফেলছি···"

"আমার খানিকটা সুবিধেই হোল ডাক্তারবাবু, চক্কর আমায় একটা দিতেই হয়, আজ বরং ঠাণ্ডা থাকতেই হবে। থাক্ সে কথা, আপনি তোয়ের হয়ে নিন্। ঘণ্টাখানেক? —কি বলেন? স্নান পর্যন্ত সেরে নেওয়াই ভালো।··· আমিও তাহলে আসি তোয়ের হয়ে।"

একটি চাকর এসে সব ব্যবস্থা করে দিলে। তোয়ের হতে হতেই সুকুমারের মনে পড়ে গেল সরমার কথা, কি করে যে ভুলে ছিল নিজেই যেন বুঝতে পারলে না। বেড়াতে তো যাচ্ছে; কিন্তু সরমার কি হবে? সরমা যে কতবড় সমস্যা, চোখের আড়াল হতে সেটা আরও ভালো ভাবে উপলব্ধি করলে সুকুমার। কাল রাত্রে অসহ্য ক্লান্তিতে মনের বোধহয় সাড় ছিল না, তাই সরমাকে কাছ ছাড়া করেছিল, নয়তো চলে কি এক মুহূর্তের জন্য ওকে

চোখের আড়াল করা? ওযে কত অসহায় সে কথা নয়, যদিও সেটা একটা চিন্তার বিষয় তো বটেই, আসল কথা ওর একটা প্রশ্ন বা উত্তরের এদিক-ওদিকে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে, এত আদর অভ্যর্থনা এক মুহূর্তে যে কোথায় চলে যাবে তার কি ঠিক আছে?

ভয়ের ঢেউ যখন ভাঙতে থাকে, তখন একটার পর একটায় অভিভূত করে ফেলে। সুকুমার চঞ্চল হয়ে উঠল, ইতিমধ্যে বেফাঁস প্রশ্ন-উত্তরের ব্যাপার কিছু হয়েই যায়নি তো। বীরেন্দ্র সিং-এর কথাবার্তায়, ব্যবহারে কোন সংশয়ের কারণ দেখা যায় না, কিন্তু কাল রাত্রি থেকে আজ সকাল পর্যন্ত অন্দরমহলে কি কথাবার্তা হয়েছে তিনি তো নাও জানতে পারেন। বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল।

প্রাতরাশ ডুজনে একসঙ্গে বসে করলে, হলঘরের পাশে একটি সুসজ্জিত কক্ষে। সুকুমার অন্যমনস্ক হয়ে রইল কিন্তু বরাবর, সরমাকে ছেড়ে থাকা যে চলবে না এটা ঠিক করে ফেলেছে, কিন্তু কি ব্যবস্থাটা করবে সেইটেই মাথায় আসছে না। বীরেন্দ্র সিং ওর ভাবান্তরটাকে আহারে অরুচির লক্ষণ বলে ধরে নেওয়ায় এবং দোষটা খাদ্যের ওপর ফেলায় ওকে খেতে হোল বেশি করে। মোটর এসে সিঁড়ির নিচে দাঁড়াল।

বারান্দা পেরিয়ে রকের শেষাশেষি এসে বীরেন্দ্র সিং দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন—"সত্যি আপনার শরীর ভালো তো? বড় বেশি অন্যমনস্ক রয়েছেন।"

সুকুমার হাসবার চেষ্টা করে বললে—"খাওয়ার বহর দেখেও আপনার সন্দেহ যাচ্ছে না কেন?"

"খাওয়ার বহর দেখে সন্দেহটা বেড়েছে।...যদি খারাপই থাকে শরীরটা—তো না হয় অন্যসময় যাব; ওবেলা, ঠাণ্ডা পড়লে।"

সুকুমারের একবার মনে হোল সেই ভালো; কিন্তু যে-ব্যাপারটা আবার ঘুরে ফিরে আসবেই সে সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করে নেওয়াই ঠিক নয় কি?—এই যে একটু দ্বিধা হোল এর মধ্যেই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"বোধহয় আমার স্ত্রীও যেতে চাইতেন...মানে, তাঁর শরীরটা বিশেষ ভালো নেই তো...বলেইছি আপনাকে...পরিষ্কার হাওয়ায় যদি একটু ঘুরে আসতেন...আমার মনে হয়..."

—একে স্ত্রী নয় তাকে স্ত্রী বলা, তায় কারণ যা দেখালে সেটা আসল কারণ নয়, কথাগুলা জড়িয়ে যেতে লাগল।

বীরেন্দ্র সিং চাকরটাকে ডাকতে সে এসে উপস্থিত হোল, বললেন—"খবর নাও বাঙালী মাইজী যিনি এসেছেন, উঠেছেন কি না।...ও ঠিক, উঠেছেনই তো! তুমি শুধু খবর নিয়ে এস একটু বেড়িয়ে আসবেন কি না, আমরা যাচ্ছি—ডাক্তারবাবু, আমি..."

এর পরেই এল একটা নীরবতা। বীরেন্দ্র সিং যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন, কথাগুলা বলবার ভঙ্গিতেই বোঝা যায়। সেই জন্যই নিস্তব্ধতাটুকু আরও বেশি অস্বস্তিকর বলে বোধ হতে লাগল। চাকর এসে খবর দিলে—যাবেন, মিনিট দশেকের মধ্যেই আসছেন।

ডুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শেষে এর অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যেই সুকুমার বললে—"মাফ করবেন, এবার আমার রোগটা যেন আপনার ঘাড়ে চাপল—বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন।"

বীরেন্দ্র সিং একটু হাসবার চেষ্টা করে অল্প নড়ে চড়ে দাঁড়ালেন; একটা কথা বলা ঠিক হবে কিনা যেন বুঝে উঠতে পারছে না, তারপর বলেই ফেললেন, অবশ্য একটু গৌরচন্দ্রিকা করে—

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না ডাক্তারবাবু"

"নিঃসঙ্কোচেই করুন জিগ্যেস, কুণ্ঠিত হয়ে লজ্জা দিচ্ছেন।"

"আপনার স্ত্রীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, বাইরে হোক ভেতরে হোক তেমন কোন আঘাত লেগেছে কি না?"

একটু বিরতি দিয়ে নিজেই আবার বললেন—"এই জন্যে জিগ্যেস করছি যে ওঁর স্মৃতি শক্তিটা খুবই একটা নাড়া খেয়েছে, আমার স্ত্রী বলছিলেন আজ সকালেই। আপনি কাল বলছিলেন ভয়ে শক লেগেছে, তাতে কি এতটা হবে?...না, উনি খুঁচিয়ে বেশি বকাতে যান নি ওঁকে, আপনি বারণ করেছিলেন, আমিও খুব সাবধান করে দিয়েছিলাম; কিন্তু তবু কিছু না কিছু কথা হবেই তো?—কাল রাত্রেও হয়েছিল, আজও হয়েছে। আমার স্ত্রী ভোরে ওঠেন, ওঁরও শুনলাম সেই রকম অভ্যেস।"

মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

সুকুমার একটু দ্বিধায় যে না পড়ল এমন নয়, সেটা কিন্তু তখনই কাটিয়ে বললে—"আপনি কথাটা জিগ্যেস করে ভালোই করেছেন বাবু বীরেন্দ্র সিং, না হ'লে আমি খুলে বলতাম না। বলতাম না এইজন্যে যে একদিনের অতিথি, আপনাদের অযথা একটা বেদনার ভাগী করি কেন? এই রেল-দুর্ঘটনার আগের জীবনটা একেবারে গেছে মুছে আমার স্ত্রীর স্মৃতি থেকে। আঘাত বাইরে তো কিছু দেখছি না।"

"সে কি!! তাহলে চিকিৎসার ?"

"চিকিৎসা এর কি আমার জানা নেই; তবে কখনও কখনও দেখা যায় মস্তিষ্কের আহত কোষগুলা আপনি আপনি আবার সচেতন হয়ে ওঠে। সেই আশায় থাকতে হবে। দু'টো জিনিষ দরকার—প্রথমত দেখতে হবে উনি না বুঝতে পারেন যে ওঁর এই রকম একটা রোগ হয়েছে। দ্বিতীয়ত খুব ধীরে ধীরে ওঁর অভিজ্ঞতা বাড়ানো দরকার। এখন উনি অনেক বিষয়ে একেবারে শিশু। আমি যে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি তা এই কারণেই বীরেন্দ্রবাবু, ওঁর বিশেষ করে মানুষ আর তার জীবন পদ্ধতি দেখা দরকার। আপনাকে এতটা বলে চিন্তিত করব না বলেই কথাটা লুকিয়েছিলাম, মাফ করবেন।"

কথাগুলা বলে নিশ্চিন্ত হোল সুকুমার। ভেবে দেখলে না বলেই ভুল করছিল; সরমার বেফাঁস প্রশ্ন বা উত্তরে যে বিপদটা ছিল, এবার কেটে গেল বরং। এবার এই পরিবারটিও সরমাকে আগলে চলবে, সরমার গতিবিধি কথাবার্তাও এরই মধ্যে অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠবে, যেটা নিতান্ত দরকার; চারিদিকের সবাই যদি ক্রমাগত ওর দিকে স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তো বিপদটাকেই তুলবে বাড়িয়ে। এ ভালো হোল।

সরমা বেরিয়ে এল, বীরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। তিনি অবশ্য গেলেন না, তবে নেমে মোটর পর্যন্ত তুলে দিয়ে গেলেন।

ছয়

সরমা বেরিয়েই বীরেন্দ্র সিংকে করযোড়ে অভিবাদন করেছিল। এটা যে শুধু মিষ্ট লাগল সুকুমারের তাই নয়, কতকটা আশ্বস্তও হোল ওর এই সামাজিক চৈতন্যটুকুতে। আরও আশ্বস্ত হোল এইজন্য যে সুকুমারকে অভিবাদনটা করলে না, যাতে প্রমাণ হোল যে ওদের পরস্পরের মধ্যে নূতন ব্যবস্থাটা, স্বামী স্ত্রীর অভিনয়, বেশ মনে আছে সরমার। তাহলে নূতন শেখার, নূতনকে গ্রহণ করার ক্ষমতাটা নষ্ট হয়নি একেবারে।

বীরেন্দ্র সিং শফারকে পাশে বসিয়ে নিজে মোটরের ষ্টিয়ারিং ধরলেন।

এটা ওঁর শালীনতা, এতে সুকুমারের একটা বাড়তি সুবিধে এই হোল যে সরমাকে দেখাতে-বোঝাতে পারবে। কাল ষ্টেশন থেকে আসতে আসতে সুকুমারকে একটু একলা পেয়ে বীরেন্দ্র সিংএর পুত্র ও পুত্রবধূকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলে—"এরা কে?"

যা স্বাভাবিক, সুকুমার বীরেন্দ্র সিংএর সঙ্গে সম্বন্ধটাই জানিয়ে দিলে,—"ওঁর ছেলে, বৌ।"

বুঝলে কিনা ঠিক টের পাওয়া গেল না; আবার প্রশ্ন করলে—"ওরা দুজনে কে হয়?"

"স্বামী-স্ত্রী"

একটু চুপ করলে সরমা, দ্বিধার জন্যে কি চিন্তার জন্যে সেটা বোঝা গেল না। তারপর জিগ্যেস করলে—"যা আমরা?"

"ওদের বিবাহ হয়েছে। আমাদের তো···"

এইখানেই থেমে গেল সুকুমার, হঠাৎ খেয়াল হ'ল প্রবঞ্চনার কথাটা স্পষ্ট না করাই তো নিরাপদ। কিন্তু ও যে কত অজ্ঞ, আর সেই অজ্ঞতায় শিশুর মতোই যে কত শুদ্ধ,তাই দেখে ওর মনটা স্নেহ-বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই থেকে বুঝেছিল যে ওর কাজ কত কঠিন, সমস্যা কত জটিল।

(ক্রমশঃ)

বহির্ভারতে সাংস্কৃতিক অভিযান

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

আজ ১৭ই নভেম্বর ১৯৫০। আজই রাত্রে আমাদের জাহাজ কলম্বো পৌঁছিবে। প্রভাতে অরুণোদয়ের সাথে সাথেই দূরে তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হইল। অতি কষ্টে কেবিন হইতে বাহিরে আসিয়া শুইলাম। সিংহলের তীরদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ সিংহবাহুর নির্ব্বাসিত পুত্র কুমার বিজয়সিংহের কথা স্মরণ পথে উদিত হইল। সাতশত বঙ্গবীরের লঙ্কাবিজয়ের স্মৃতি হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করিল।

সারাদিন লঙ্কার তীর দিয়া চলিয়া সন্ধ্যার পরে জাহাজ কলম্বোর বন্দরে ভিড়িল। স্বামীজিরা তিনজনেই সহরে গেলেন, কিছু তরীতরকারী ঔষধ-পথ্যাদি খরিদের জন্য। কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায় দোকানপাট সবই প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাই অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক পাউণ্ড বিস্কুট লইয়া রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। জাহাজ হইতে আমার পথ্যস্বরূপ দুই টুকরা পাঁউরুটি দিয়া গিয়াছিলেন—তাহার আঘ্রাণেই আমার বমনেচ্ছা উদ্রেক হওয়ায় তাহা আর খাওয়া হয় নাই। দুই চারিখান বিস্কুট খাইয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

মধ্যরাত্রেই জাহাজ নোঙ্গর তুলিল। সকালে উঠিয়া দেখিলাম আমরা পুনরায় গভীর সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছি। চারিদিকেই দিগন্তপরিবৃত নীল জলরাশি, মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ উড়ন্ত মাছ (Flying fish)এর উপরে খণ্ড খণ্ড মেঘে ঢাকা আকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়নপথে পড়ে না। কখনও ঘনমেঘ করিয়া বৃষ্টি আসে, কখনও বেশ ঝড় শুরু হয়; আবার কখনও ঝকঝকে রৌদ্রের নীল জলের বুকে ঢেউয়ের তালে তালে আনন্দ নৃত্য। এইভাবে প্রকৃতির খামখেয়ালের সাথে আমাদের মনকে মিলাইয়া দিয়া ভারত মহাসাগরের বক্ষে ভাসিয়া চলিলাম।

দিন গণনা করিতেছি, কবে পুনরায় একটি বন্দরে পৌঁছিব। আমাদের যাওয়ার পথে আর মাত্র তিনটি বন্দরে জাহাজ থামিবে। প্রথমটি মরিসাসদ্বীপে, দ্বিতীয়টি দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট কেপ-টাউনে এবং তৃতীয়টি দক্ষিণ এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী বারবেদাস দ্বীপে।

২৫শে রাত্রি প্রায় ১০টায় আমাদের জাহাজ মরিসাস দ্বীপের রাজধানী 'পোর্টলুইস'এ পৌঁছিল। কিন্তু রাত্রি অধিক হওয়ায় 'পাইলট' বা 'ইমিগ্রেসন অফিসার' না আসায় 'বেটোয়া'কে বন্দর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে নোঙ্গর করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করা হইল। কেননা পাইলটের অনুমতি ব্যতীত বহিরাগত কোন জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না।

সকাল প্রায় ৮টায় পাইলটের লঞ্চ আসিলে আমাদের জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল। জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'ইমিগ্রেসন অফিসার' 'পুলিশের সুপার' আসিয়া পৌঁছিলেন। আমরা সকালে স্নানাহ্নিক এবং আহারাদি শেষ করিয়া তীরে অবতরণের জন্য প্রস্তুতই ছিলাম। ছোট ছোট অনেকগুলি নৌকা আসিয়া জাহাজে লাগিয়াছে—যাত্রীগণকে তীরে লইয়া যাইবার জন্য। তাহাদের মধ্যে দুই একখানিতে দুই একজন ভারতীয়কেও দেখিলাম। মাঝিরা নীচে হইতে চীৎকার দিয়া দুর্ব্বোধ্য ভাষায় এবং ইসারায় জিজ্ঞাসা করিল—আমরা তীরে যাইব কিনা? সহরে যাইবার ইচ্ছা আছে বলিতেই একজন লোক জাহাজে উঠিয়া আসিল। নীচের অপর একটি নৌকা হইতে একটি ভারতীয় যুবক হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল—"আপলোগোঁহি ভারতসে সাংস্কৃতিক মিশনমে ত্রিনিদাদ জা রহি হ্যায়?" (আপনারাই কি ভারত থেকে সাংস্কৃতিক মিশন নিয়ে ত্রিনিদাদ যাচ্ছেন?) আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপ কো ক্যায়সে পাতা চলা যো হাম্ সংস্কৃতি প্রচারকে লিয়ে ভারতসে ত্রিনিদাদ জা রহি হ্যায়" (আপনি কী ভাবে জানিতে পারিয়াছেন যে আমরা সংস্কৃতি প্রচারের জন্য ভারত থেকে ত্রিনিদাদ যাচ্ছি)। যুবকটি উত্তর দিল—"কাল সাম্‌কো ইঁহাকা সমাচার পত্রমে ইয়ে সন্দেশ ছাপা হুয়া থা" (কাল সন্ধ্যার সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল)। এই কথা শুনিয়া আমরা ভাবিলাম, 'সহরের লোকজন যখন জানিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আমাদিগকে সহরে লওয়ার জন্য আসিবেন। ঘটিলও তাহাই। অল্প সময়ের মধ্যেই সহরের কতিপয় ব্যক্তি শ্রীযুত এইচ-দাত্তে, শ্রীযুত এস-ভি-এ-চেট্টিয়ার প্রমুখ নেতৃগণের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, গতকালের সংবাদপত্র মারফতই আমরা জানিতে পারিয়াছি যে আপনাদের জাহাজ মরিসাস হইয়া যাইবে
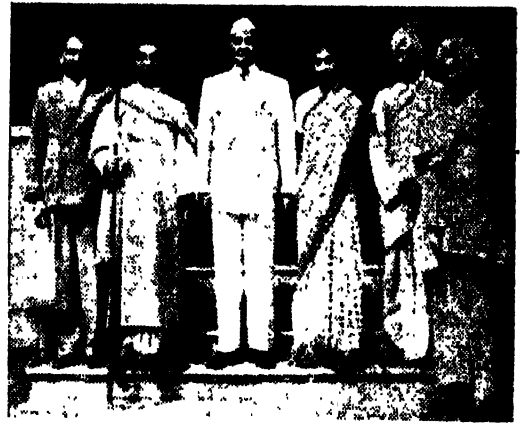
ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাংস্কৃতিক মিশনের সভ্যগণের সহিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ আমেরিকার গায়েনার ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সহায়

এবং একদিন বন্দরে থাকিবে। তাই এই একটা দিনের জন্যই আপনাদিগকে লইতে আসিয়াছি।" তাঁহাদের নিকটেই শুনিলাম—যে এখানকার ভারতীয় হাইকমিশনার এবং তাঁর সেক্রেটারী শ্রীযুত অবলাচরণ ভট্টাচার্য্য আমাদের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জাহাজের দেরী দেখিয়া অন্য কার্য্যে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

যাহা হউক আমরা অবতরণের জন্য তোড়জোড় করিতেছি ইতিমধ্যে দেখি, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সঙ্ঘের বিশেষ হিতৈষী শ্রীযুত কেসরাজ গঙ্গা তাঁহার পুত্রগণের সহিত আসিয়া উপস্থিত। শ্রীযুত গঙ্গার সহিত আমাদের মোম্বাসায় (পূর্ব্ব আফ্রিকায়) ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তিনি তখন তাঁহার মাতা, কাকীমাতা প্রভৃতিদের লইয়া ভারত হইতে মরিসাস প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। পূর্ব্ব আফ্রিকার কাজ শেষ করিয়া আমরা যখন মরিসাসের টিকিট খরিদ করিয়া মোম্বাসায় জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম—তখন শ্রীযুত গঙ্গা পত্রিকা মারফত তাহা জানিতে পারিয়া আমাদের প্রত্যহকার পূজা-আরতি এবং সভা সমিতিতে যোগদান করিতেন। মরিসাসে যাইব শুনিয়া তাঁহার যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। কিন্তু মরিসাসের জাহাজের কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ জানিতে না পারায় এবং আমাদের মিশনের অধিকাংশ সন্ন্যাসীই ভারত প্রত্যাবর্ত্তনে উৎসুক হইয়া পড়ায় বাধ্য হইয়া যেদিন আমাদের মরিসাসের টিকিট ফেরৎ দিয়াছিলাম—সেদিন শ্রীযুত গঙ্গা কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন—"মরিসাসবাসীর এমনই দুর্ভাগ্য যে সন্ন্যাসীর পদধূলি হইতে বঞ্চিত হইল। জানি না আবার কবে আমাদের আপনাদের দর্শনের সৌভাগ্য হইবে।" তখন কি আমরাই জানিতে পারিয়াছিলাম যে একটি দিনের জন্যও আমাদের মরিসাসে পদার্পণের সৌভাগ্য হইবে। পরমকারুণিক শ্রীশ্রীঠাকুর কী ভাবে যে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তাহা সেইদিনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম—যেদিন দেখিলাম যে শ্রীযুত গঙ্গার বাড়ীতেই শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা আমাদের নিত্যকৃত্য সমাপন করিতেছি। শ্রীযুত গঙ্গাও সেদিন আনন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণযুগলে বসিয়া আমাদের বলিয়াছিলেন—"একদিনের জন্যও যে আপনাদের আমার বাড়ীতে পাইব—তাহা মোম্বাসায় টিকিট প্রত্যর্পণের পর স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। মোম্বাসা হইতে বড় ব্যথিত প্রাণে দেশে ফিরিয়াছিলাম—আজ সে ব্যথা আমার ঘুচিয়াছে। জাহাজেই শুনিলাম যে কলিকাতায় প্রধান কার্য্যালয় হইতে পত্রযোগে তাঁহাকে আমাদের আগমনবার্ত্তা জানানো হইয়াছিল।

আমরা দুইখানি নৌকাযোগে তীরে অবতরণ করিলাম। সহরে 'গীতামহামণ্ডল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। তাহা শ্রীযুত গঙ্গার পূর্ব্বপুরুষ ৺রামাতন গঙ্গার শুভ প্রেরণা ও দানেই গড়িয়া উঠে। সেই গীতা ভবনে একটা সভার আয়োজন হইয়াছিল—তাই আমরা মোটরযোগে সেখানে পৌঁছিলাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানের কাজ সারিয়া সহর পরিদর্শনে বাহির হইলাম। বেশ সাজানো গোছানো সহর। ঘর বাড়ীগুলি সবই একরকমের; শুনিলাম শুধু সহরেই প্রায় ৭০ হাজার হিন্দুর বাস। প্রকৃতপক্ষে একটি যেন ভারতীয় সহরেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি মনে হইতে লাগিল। বাজারে মোটর হইতে অবতরণ করিতেই চীনা, ভারতীয়, দেশীয়, ইংরেজ প্রভৃতি সকলেই আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমরা তাহাদের সঙ্গে একটু আলাপ-আলোচনা করিয়া বাজারে প্রবেশ করিলাম। অল্প সময়ের জন্য আসিয়াছি—পত্রিকা মারফত সকলেই জানিতে পারিয়াছে—তাই রাস্তা ঘাটে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেই—আমাদের নিকট অনুতাপ করিতে লাগিল।

বাজারের ভিতরে গিয়া দেখি—'বাংলা দেশের বাজার',—আম, লিচু, কলা, কমলা প্রভৃতি ফল, লাউ কুমড়া করলা বেগুন প্রভৃতি তরকারীতে বাজার পরিপূর্ণ। যদিও আমরা কিছু ক্রয় করলাম না, তথাপি বাজারটি একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম। পুস্তকের দোকানে দেখি তুলসীদাসের রামায়ণ হইতে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা পর্য্যন্ত সাজানো। এখান হইতে শ্রীযুত গঙ্গার গ্রামাভিমুখে রওনা হইলাম।

শ্রীযুত গঙ্গা একজন জমিদার। তাঁর প্রপিতামহ বিহারের আরা জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি কৃষক হিসাবে এখানে আসিয়াছিলেন। তদবধি ইঁহাদের আর দেশে যাওয়া হয় নাই। পুরুষানুক্রমে এখানেই বসবাস করিতেছেন; মাত্র গত বৎসর শ্রীযুত গঙ্গা তাঁর মাতা এবং কাকীমাতাকে লইয়া ভারতে তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। নিজেদের অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের ফলে এখন ইঁহারা জমিদার।

মরিসাস ভারত মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। আয়তন—মাত্র ৭১৪ বর্গমাইল। ইহার দূরত্ব কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৩ শত মাইল। অধিবাসী প্রায় সাড়ে চার লক্ষ, তন্মধ্যে হিন্দুই প্রায় ২ লক্ষ ৬৯ হাজার। সেই কারণে মরিসাসকে "ছোট ভারত" বলা হয়। এখানের আদিম অধিবাসীদের 'ক্রিওল' এবং তাহাদের ভাষাকেও 'ক্রিওল' বলে। চেহারায় তাহারা আফ্রিকার নিগ্রো অপেক্ষা অনেকটা সুশ্রী। মাথার চুল কোঁকড়ানো হইলেও অনেকটা লম্বা, গায়ের রং ও কিছুটা ফর্সা। এখানের ক্রিওলেরা নিগ্রো অপেক্ষা বেশ শিক্ষিত, অধিকতর উন্নত এবং ধনী। ইঁহারা অনেক সুবৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন, অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত আইন-ব্যবসায়ী, জমিদার প্রভৃতিও আছেন।

শ্রীযুত গঙ্গার বাটি পোর্ট লুইস হইতে ২৫ মাইল দূরে—'নিউগ্রোভ' নামক একটি সমৃদ্ধশালী গ্রামে। ক্ষুদ্র দ্বীপের প্রত্যেকটি গ্রামই ভারতের ছোট ছোট সহরের মতো। ট্রেণ বাস প্রভৃতি যান বাহনের দ্বারা দ্বীপের প্রতিটি প্রান্ত এমনভাবে যুক্ত যে—যে কোন প্রান্ত হইতে এক ঘণ্টার মধ্যেই রাজধানীতে আগমন করা যায়। ইক্ষুর চাষই এখানের প্রধান চাষ। এই ইক্ষু চাষের জন্যই এখানের ইংরাজ সরকার ভারত হইতে শ্রমিকরূপে সহস্র সহস্র ভারতীয়কে আনয়ন করিয়াছিল। দ্বীপটি পার্ব্বত্য, অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৮০০ হইতে ৩০০০ হাজার ফুট উঁচু—তাই বেশ ঠাণ্ডা। শ্বেতাঙ্গ বা ধনী ভারতীয়গণ সকলেই এই উচ্চস্থানসমূহে বাস করেন এবং প্রত্যহই ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে 'পোর্ট লুইস'এ আসেন।

মরিসাস দ্বীপটির ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তদনুযায়ী দেখা

যায় যে ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিকগণ দ্বীপটি আবিষ্কার করে। তখন দ্বীপটিই একেবারেই জনশূন্য ছিল। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ আসিয়া দ্বীপটিতে উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে। পর্তুগীজগণের আবিষ্কারের পর এই দ্বীপটির নাম হয়—'সণ্ট্‌ অ্যাপোলোনিয়া'। ১৫১২ খৃঃ জনৈক পর্তুগীজ নাবিকের নামানুসারে ইহার নাম রাখা হয় "ম্যাস—ক্যারেণ।" আরও পরে এই দ্বীপকে "কারণি" বলিত। ১৫৯৮ খৃঃ ওলন্দাজ নাবিক এ্যাড্‌মিরাল ওয়ারউইক এই দ্বীপটির নাম পরিবর্তন করিয়া হল্যাণ্ডের যুবরাজের নামে ইহার নাম রাখেন—"মোরিস" ৪০ বৎসর পরে ওলন্দাজগণ যখন উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে তখন সিমনস্‌জ্‌ গুইয়ার গভর্ণর হইয়া আসেন। তাঁর সময়ে দ্বীপটিকে বাস তথা চাষোপযোগী করার চেষ্টা হয়। তিনি আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাস আনয়ন করিয়া কৃষি কাজ আরম্ভ করান। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওলন্দাজগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া প্রগতির পথে লওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া যাহা কিছু এই দ্বীপের উন্নতি কল্পে নিশ্মাণাদি করিয়াছিল তাহা জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ক্রীতদাসগণকে এই মরু সদৃশ জনশূন্য দ্বীপে ফেলিয়া ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তাহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণ এই দ্বীপে প্রবেশ করে, তখন এই দ্বীপটির নাম হয় 'লেডি ফ্রান্স'। বোরবণ এবং রেগোঁয়া নামক দ্বীপ হইতে দলে দলে ফরাসীগণ আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপনে তৎপর হইয়া উঠে। এই সময় হইতে প্রায় একশত বৎসর দ্বীপটি ফরাসীদের অধিকারে থাকে এবং ক্রমশঃ প্রগতি করিয়া একটি সুসভ্য অধিবাসী-সমন্বিত রাজ্যরূপে গড়িয়া উঠে। কিন্তু ইংরাজের বাণিজ্য তরণী তথা অভিযাত্রীবাহিনীসমূহ যখন ভারতে বাণিজ্য প্রসার তথা সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি হইতে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিও আত্মগোপন করিতে পারে নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ভারতগামী একটি নৌবহর এবং অভিযাত্রীদল দ্বীপটিকে অবরোধ করে এবং এক প্রান্ত অধিকারও করিয়া লয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে একটি চুক্তি অনুযায়ী দ্বীপটি বৃটিশ সরকারের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ীই দ্বীপটি বৃটিশের অধিকারে আসে এবং আজও তাহাদের অধীনে। এই চুক্তি অনুযায়ী এখনও ফরাসী ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে এখানে প্রচলিত। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ এই দ্বীপটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নাম রাখে "মরিসাস"।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আইনের দ্বারা সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধিত হইলে সরকার কিছুটা বিব্রত হইয়া পড়েন। কেননা এ পর্য্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যে কৃষক এবং শ্রমিক হিসাবে আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাস লওয়া হইত। এই সময় ভারতবর্ষ হইতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংগ্রহ করিয়া বৃটিশ সরকার পৃথিবীর দিকে দিকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করে। মরিসাস, ফিজি, কানাডা, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশে এই সময় হইতেই ভারতীয় শ্রমিক যাইতে থাকে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দেই সর্ব্বপ্রথম বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং মাদ্রাজ হইতে এই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (Indentured Labourers) মরিসাসে আসে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৮৩ হাজার এই জাতীয় শ্রমিক এখানে আসে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সরকার নিয়োজিত স্যান্ডারসন্‌ কমিটি (১) জনসংখ্যার বহুলতা (২) চাষোপযোগী জমির স্বল্পতা (৩) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের চাহিদার হ্রাসপ্রাপ্তি (৪) কলোনীর দারিদ্র্য এবং সর্ব্বোপরি (৫) শ্রমিকের সংখ্যাধিক্যে শ্রমবিমুখতার সম্ভাবনা, ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়া ভারত হইতে শ্রমিক আনয়ন বন্ধ করিতে সুপারিশ করে। ফলে কিছুদিন শ্রমিক আমদানী বন্ধ থাকে। কিন্তু আবার কয়েক বৎসর পরেই শ্রমিক আনা সুরু হয়, কিন্তু চুক্তিবদ্ধভাবে নহে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের বেতন, ভাতা, ৫ বৎসর পরে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনে ইচ্ছুক হইলে বিনামূল্যে তাহাকে ভারত-প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে সুবিধা দান করা হইত।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে ভারতের হাইকমিশনার শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সহায় বক্তৃতা রত

যাই হোক, মরিসাসের ইতিহাসে দেখা যায় যে এই ভারতীয় শ্রমিকগণেরই আপ্রাণ চেষ্টায় দ্বীপটি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। চাষের জমি বাড়িয়াছে, গ্রামের সংখ্যা বাড়িয়াছে—এই ভারতীয়গণের চেষ্টার ফলে। রেললাইন বসাইয়াছে পাহাড় কাটিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে, জংগল পরিষ্কার করিয়া সুন্দর সুন্দর সহরের ভিত্তি পত্তন করিয়াছে—এই ভারতীয়েরাই। তাই এককথায় বলিব—মরিসাস ভারতীয়গণেরই সৃষ্টি।

সেই কারণে এখানের শাসন পরিষদে গভর্ণরের উপদেষ্টা সমিতির ১০ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জনই ভারতীয়। ভারতীয়গণ এখানে বেশ মর্য্যাদায় সহিতই বসবাস করে। ইংরাজগণও ভারতীয়গণকে এখানে বেশ সম্মানের চক্ষে দেখেন। বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দীভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়। খৃষ্টান মিশনারীগণ এখানে ধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা হিন্দু বা ভারতীয়গণকে ধর্ম্মান্তরিত করিতে পারিবেন না সেইরূপ আইনও এখানে আছে। সেই একমাত্র কারণেই দেখা যায় যে এই দ্বীপটিতে ভারতীয় খৃষ্টানের সংখ্যা একেবারেই কম। * * *

চিরহরিত পার্ব্বত্যময় দ্বীপের প্রাকৃতিক তথা কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে আমরা "নিউগ্রোভ" অভিমুখে চলিয়াছি। কোথাও রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ আখের ক্ষেত, আবার কোথাও সবুজ বনরাজির অভ্যন্তরে সুন্দর সহর। প্রত্যেক সহরের সৌন্দর্য্য যেন কোন চিত্রকরের সুনিপুণ তুলিকা-সংস্পর্শে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রাস্তার দুই পার্শ্বেই 'বাংলো' প্যাটার্ণের ছোট ছোট বাড়ী; প্রশস্ত অঙ্গনে নানাপ্রকার নাম না-জানা রং বে-রংয়ের ফুল ও পাতাবাহারের গাছ। একপ্রকার ছোট—জীবন্ত সারিবদ্ধ বাঁশের ঝাড় দিয়ে প্রাঙ্গণ তথা বাংলোটি ঘেরা। এখানে বর্ণবৈষম্য না থাকায় যে কোন স্থানে ভারতীয়গণ বাস করতে পারে—তাই অনেক সহরেই শ্বেতাঙ্গগণ এবং ভারতীয়গণের পাশাপাশি বাংলো দেখিলাম। তবে শুনিলাম, যে শ্বেতাঙ্গগণের বাংলোর অনুরূপ ভারতীয়গণকেও 'বাংলো' করিতে হয়।

ঘণ্টাখানেকের পরই শ্রীযুত গঙ্গার বাড়ীতে পৌছিলাম। পূর্ব্ব হইতেই অনেক লোকজন আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কেহ "নমস্তে", কেহ "বন্দে", আবার কেহবা "জয়হিন্দ" বলিয়া আমাদের সম্ভাষণ জানাইল। আফ্রিকা হইতে যখন এইখানে প্রচারে আসার কথা হইয়াছিল—তখন শুনিয়াছিলাম—'মরিসাসের হিন্দু অধিবাসী হিন্দী বা ইংরাজী ভালভাবে জানে না—কেননা ফরাসী সেখানের রাষ্ট্রভাষা এবং ধর্ম্ম তথা সংস্কৃতির প্রতি উদাসীনতার ফলে তাহারা বহুলাংশে অভারতীয় হইয়া গিয়াছে। আজ এখানে আসিয়া আমাদের সেধারণা তিরোহিত হইল। আশ্চর্য্য হইলাম—এখানের জনতার সংস্কৃতবহুল হিন্দী ভাষা, মধুর ও বিনয় নম্র আলাপ, শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদনের আকুল আগ্রহ, এবং ভারত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসায় তীব্র আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাইয়া। সত্য বলিয়া সকলেই হয়তো গ্রহণ করিতে পারিবেন না তথাপি প্রকৃত ঘটনার একটু পরিচয় দিতেছি এখানে।

শিক্ষিত মধ্য-বয়সী কয়েকজন ব্যক্তি আমার সহিত একদিকে আলাপ-করিতেছেন—ভারতের রাষ্ট্র তথা সামাজিক ক্ষেত্রের অবস্থা বিষয়ে—যুবক-বৃন্দ আলাপ করিতেছেন—এত অল্প বয়সে কিরূপভাবে আমরা সন্ন্যাসী হইতে পারিয়াছি, ইত্যাদি বিষয়ে; অপর দিকে স্বামীজিদের সঙ্গে একদল আলাপ করিতেছেন—ধর্ম্মের গহন তত্ত্ব বিষয়ে, কেহ বা মনসংযম হইতে সুরু করিয়া সাংসারিক খুঁটি-নাটি সমস্যা পর্য্যন্ত সমাধানের উপায় জানিয়া নিতে চাহিতেছেন। ইতিমধ্যে একজন আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"স্বামীজি, আমাদের পণ্ডিত নেহরু কেমন আছেন"? সর্দ্দার প্যাটেল এবং ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের শরীর ভাল আছে তো?" আর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুভাষবাবু কবে পুনরায় ফিরিবেন?" ইত্যাদি ধরণের সরল প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে আমাদের এখানে। অর্থাৎ ভারত হইতে আমরা আসিতেছি সুতরাং ভারতের সমস্ত সংবাদ আমাদের নিকট হইতে জানিয়া লইতে চাহে এখানের জনসাধারণ।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত অল্পক্ষণ আলাপ-আলোচনার পরেই ২টি ঘটি করিয়া হস্ত পদ প্রক্ষালনের জল আসিল। তাহার পর আহারের আমন্ত্রণ—বাড়ীর ভিতর গেলাম।

ক্রমশঃ

ক্ষণিক স্পন্দন

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

রুদ্র মহাকাল-বহ্নি লেহি লেহি বিরাট অম্বর,
প্রচণ্ড দহনে দীপ্ত ধূলিকণা রুক্ষ জটাজালে,
হিংসা-জীর্ণ ধরণীর বুকভরা গভীর গহ্বর,
বিষ-বাষ্পে অন্ধকার জমে ওঠে দিক-চক্রবালে।
এরি মাঝে তবু কোথা ভেসে ওঠে অশ্রুত ঝঙ্কার,
মুমূর্ষু এ পৃথিবীর ব্যথা-শ্বাস মিলায় আকাশে,
লোভে ক্ষোভে জর্জ্জরিত মানুষের আর্ত্ত হাহাকার,
স্তব্ধ হ'য়ে আসে এই ক্ষণিকের পরম প্রকাশে।
জীবন-যাত্রার পথে বাধা-বিঘ্ন কত শত শত,
তারি মাঝে স্বর্গ-লোক মানুষেরই স্বপ্ন দিয়ে বোনা,
মুছে যায় পিছনের দুঃখ-দৈন্য শোক-তাপ যত,
নব ছন্দে মূর্ত্ত হয় জীবনের অমৃত সাধনা
স্বপ্ন আর কল্পনার বোঝা বয়ে খেয়াতরী চলে,
ক্ষণিকের আত্মদানে স্মৃতি শুধু দহে পলে পলে॥

(চিত্রনাট্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

ওয়াইপ।

লিলি নাম্নী এক নর্তকীর ড্রয়িং রুম।

লিলি আধুনিকা নর্তকী। বয়স আন্দাজ ত্রিশ, কিন্তু ঠাকঠমক ও প্রসাধনের চাকচিক্যে নবযৌবনের বিভ্রম এখনও বজায় রাখিয়াছে। আজ রাত্রি দশটার সময় সে পিয়ানোতে বসিয়া গান গাহিতেছে এবং মন্মথ গদগদ মুখে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে! মন্মথর বয়স ছাব্বিশ, বুদ্ধিশুদ্ধি বেশী নাই; সে বিলাতী পোষাক পরিতে এবং বড়মানুষী দেখাইতে ভালবাসে।

লিলি ও মন্মথ ছাড়া ঘরে আরও দুইটি লোক রহিয়াছে—দাশু এবং ফটিক। ইহারা লিলির দলের লোক। দাশু মোটা লম্বা, ফটিক রোগা বেঁটে; দু'জনেরই সাজপোষাক বাবুয়ানির পরিচায়ক, যেন তাহারাও বড়লোকের ছেলে। আসলে তাহারা ভদ্রবেশী জুয়াচোর; লিলির সাহায্যে বড়মানুষের ছেলে ফাঁসাইয়া শোষণ করা তাহাদের পেশা। বর্তমানে তাহারা যেন লিলির প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এবং মন্মথর প্রতিদ্বন্দ্বী—এইরূপ অভিনয় করিতেছে।

লিলি গাহিতেছে—

লিলি: কেন পোহায় বলো সুখ-ফাগুন-নিশা
বঁধু না মিটিতে বুকে প্রেমতৃষা।
নব-যৌবন টলমল গো
চল চঞ্চল গো
চ'লে যায়—রহে না—
তার ত্বর্ সহে না—
চোখে বিজলী হানে কালো-কাজল-দৃশা।
ফুলের বুকে আছে এখনও মধু,
আছে অরুণ হাসি অধরে, বঁধু।
এস ধরিয়া রাখি—তারে ধরিয়া রাখি
যেন পোহায় না গো সুখ-ফাগুন-নিশা।

গান শেষ হইলে মন্মথ সানন্দে করতালি দিয়া উঠিল।

মন্মথ: ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল!!

লিলি: ধন্যবাদ মন্মথবাবু। এই গানটা আমার নতুন নাচের সঙ্গে গাইব। ভাল হবে না?

মন্মথ: চমৎকার হবে। নাচও তৈরি করেছেন নাকি?

লিলি: হ্যাঁ। দেখবেন?

লিলি উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্মথ বক্রচক্ষে দাশু ও ফটিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

মন্মথ: আজ থাক। আর একদিন দেখব।

দাশু মুখ হইতে সিগার হাতে লইয়া হাসিল।

দাশু: হে হে—আমি আগেই দেখেছি।

ফটিক: আমিও—হে হে।

মন্মথ ভর্ৎসনা-ভরা চোখে লিলির পানে তাকাইল।

মন্মথ: ওঁদের আগেই দেখিয়েছেন! তা—বেশ। আমার দেখার দরকার? আমি নাচের কী বা বুঝি?

প্রস্থানোদ্যত মন্মথর হাত ধরিয়া লিলি থামাইল।

লিলি: রাগ করছেন কেন মন্মথবাবু? ওঁরা সেদিন জোর ক'রে ধরলেন, না দেখে ছাড়লেন না। নৈলে আপনাকেই তো আগে দেখাবার ইচ্ছে ছিল। বসুন, আজই আপনাকে নাচ দেখাব।

লিলি মন্মথকে ধরিয়া বসাইল। দাশু ফটিকের পানে চাহিয়া চোখ টিপিল। মন্মথ সন্তুষ্ট হইল বটে কিন্তু নিজের হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিত হইল।

মন্মথ : আজ! কিন্তু আজ বড় দেরী হয়ে গেছে—

লিলি : কোথায় দেরী, এই তো সবে দশটা। ফটিকবাবু, ঘরের মাঝখান থেকে টেবিল চেয়ারগুলো সরিয়ে দিন দিকি।

কিন্তু মন্মথ তথাপি ইতস্তত করিতে লাগিল।

মন্মথ : আজ যাক, মিস লিলি। কাল আমি সকাল-সকাল আসব। কাল হবে।

দাশু হাসিয়া উঠিল।

দাশু : ওঁকে আজ ছেড়েই দিন, মিস্ লিলি। বাড়ী ফিরতে দেরী হ'লে হয়তো ঠাকুর্দ্দার কাছে বকুনি খাবেন।

মন্মথ ক্রুদ্ধ চোখে তাহার পানে চাহিল।

মন্মথ : মোটেই না।—আসুন মিস্ লিলি, আজ আপনার নাচ দেখে বাড়ী যাব।

তখন দাশু ও ফটিক উঠিয়া আসবাবপত্র দেয়ালের দিকে সরাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, লিলি শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া নাচিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

লিলি : আপনাকে কিন্তু বাজাতে হবে মন্মথবাবু। সুরটা তো শুনলেন, ফলো করতে পারবেন ?

মন্মথ : নিশ্চয়।

সে মিউজিক টুলে গিয়া বসিল।

ডিজল্‌ভ্।

যদুনাথের হল ঘর। ঘড়িতে সওয়া এগারোটা বাজিয়াছে।

সেবক পূর্ববৎ দরজায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে, তাহার মাথাটি হাঁটুর উপর নত হইয়া পড়িয়াছে।

কাট্।

উপরের ঘরে নন্দা পড়িতেছে। তাহার চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিতেছে। সে একটা হাই তুলিল; তারপর ঈষৎ সজাগ হইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

নন্দা : অমুং পুরঃ পশ্যসি দেবদারুম্।

কাট্।

বাড়ীর ফটকের সম্মুখ। গুর্খা দরোয়ান এখন আর পায়চারি করিতেছে না, ফটকের পাশে একটি টুলের উপর খাড়া বসিয়া আছে; দুই হাঁটুর মধ্যে বন্দুক। কিন্তু তাহার চক্ষুদুটি মুদিত।

কাট্।

বাগানের অভ্যন্তর; অপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঈষদালোকিত।

একটি মানুষ বাহিরের দিক হইতে পাঁচিলের উপর উঠিয়া বসিল; সতর্কভাবে এদিক ওদিক তাকাইয়া বাগানের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। লোকটির চেহারা শীর্ণ, মুখে কয়েক দিনের গোঁফ-দাড়ি, গায়ে ছিন্ন-মলিন কামিজ। চেহারা ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে ছিঁচকে চোর বলিয়া মনে হয়।

লঘু ক্ষিপ্রপদে চোর বাড়ীর দিকে চলিল; আঁকা বাঁকা ভাবে এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপে গিয়া ছায়ামূর্তির মত সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইল। শেষে বাড়ীর গাড়ী বারাণ্ডার পাশে একটা জুঁই ফুলের ঝাড়ের পিছনে গিয়া লুকাইল।

কাট্।

হলঘরের ভিতরে সেবক দরজায় ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছে।

ঘড়িটা ঠং করিয়া বাজিয়া উঠিতেই সেবক চমকিয়া মাথা তুলিল। সাড়ে এগারোটা! সে উদ্বিগ্ন মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাট্।

দ্বারের বাহিরে চোর জুঁই ঝোপের আড়াল হইতে উঁকি মারিতেছিল, দ্বার খোলার শব্দে সে আবার লুকাইয়া পড়িল।

অর্ধ-উন্মুক্ত দ্বারপথে সেবকের মুণ্ড দেখা গেল। সে ফটকের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর মুণ্ড টানিয়া লইয়া আবার দ্বার ভেজাইয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে চোর ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল; নিঃশব্দে দ্বারের কাছে গিয়া কবাটে কান লাগাইয়া শুনিতে লাগিল।

কাট্।

দ্বারের অপর পারে সেবক চিন্তিতমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে—এখনও বাবুর ইয়ার্কি দেওয়া শেষ হইল না! গলার মধ্যে একটা শব্দ করিয়া সে দ্বারের হুড়কা লাগাইবার উদ্যোগ করিল, তারপর কি ভাবিয়া হুড়কা না লাগাইয়াই পা টানিয়া টানিয়া আবার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

সেবকের পদশব্দ উপরে মিলাইয়া গেলে, সদর দরজা বাহিরের চাপে একটু খুলিয়া গেল। চোরের মাথা সেই ফাঁক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্র চকিত দৃষ্টিতে একবার চারিদিক দেখিয়া লইল, তারপর চোরের শরীরও ভিতরে প্রবেশ করিল।

পিছনে দরজা ভেজাইয়া দিয়া চোর ক্ষণকাল সমস্ত শরীর শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর বিড়াল পদক্ষেপে যদুনাথের শয়নকক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।

যদুনাথের দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া চোর উৎকর্ণ ভাবে শুনিল; ভিতর হইতে যদুনাথের মন্দ্রগভীর নাসিকাধ্বনি আসিতেছে। চোর

তখন আরও কয়েক পা আগাইয়া গিয়া ঠাকুরঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল : ঝুঁকিয়া দেখিল দ্বারে ভারী তালা ঝুলিতেছে।

কাট্।

উপরে নন্দার দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া সেবক নন্দাকে বলিতেছে—

সেবক : তুমি আর কতক্ষণ জেগে থাকবে ? খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়।

নন্দা। এত দেরী তো দাদা কোনও দিন করে না! কী হ'ল আজ ? না, আমি জেগে থাকব। আজ ফিরুক না, খুব ব'কবো।

সেবক : ব'কে আর কি হবে দিদিমণি, চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। ও জানে আমরা তো আর ওকে কর্ত্তার কাছে ধরিয়ে দিতে পারব না, তাই ওর অত বুকের পাটা।

সেবক আবার নীচে নামিয়া আসিল।

কাট্।

নীচে চোর ঠাকুর ঘরের তালাটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া খাড়া হইল। সদর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছিবার আর সময় নাই, চোর ভোজন কক্ষের দ্বার খুলিয়া সুট করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

সেবক নীচে নামিয়া আসিয়া চোরকে দেখিতে পাইল না, কেবল দেখিল ভোজনকক্ষের দরজা একটু ফাঁক হইয়া আছে। সে ভাবিল, হয়তো বিড়াল ঢুকিয়াছে, কিম্বা মন্মথ তাহার অবর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিয়া আহারে বসিয়াছে। সে গিয়া দ্বারের নিকট হইতে ভিতরে উঁকি মারিল কিন্তু বিড়াল কিম্বা মন্মথকে দেখিতে পাইল না; মন্মথর খাবার যেমন ঢাকা ছিল তেমনি ঢাকা আছে। সেবক তখন দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিল, তারপর আবার সদর দরজার সম্মুখে গিয়া বসিল।

ভোজনকক্ষে চোর একটা আলমারীর পাশে লুকাইয়াছিল। শিকল লাগানোর শব্দ তাহার কানে গিয়াছিল, সে সশঙ্ক মুখে বাহির হইয়া আসিল ; সন্তর্পণে দ্বার টানিয়া দেখিল, নির্গমনের পথ বন্ধ, খাঁচার মধ্যে ইঁদুরের মত সে ধরা পড়িয়াছে। চোরের চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত হইল ; সে ছুটিয়া গিয়া জানালা খুলিল। কিন্তু জানালায় মোটা মোটা লোহার গরাদ লাগানো ; উপরন্তু ঘরের উজ্জ্বল আলো জানালা পথে বাহিরে যাইতেছে, কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। চোর তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিল ; তারপর হতাশ ভাবে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া ঝাঁক্ড়া চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে লাগিল।

কাট্।

আপন শয়ন কক্ষে নন্দা পড়িতে পড়িতে বইয়ের উপর ঢুলিয়া পড়িতেছিল। একবার বইয়ের উপর মাথা ঠুকিয়া যাইতে তাহার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। সে উঠিয়া দ্বারের কাছে গেল, দ্বার খুলিয়া কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিল। নীচে সাড়াশব্দ নাই। নন্দা তখন বইখানা তুলিয়া লইয়া পায়চারি করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিতে লাগিল।

নন্দা : একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বম্—

কাট্।

ভোজনকক্ষে চোর পূর্ব্ববৎ দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার হতাশ বিভ্রান্ত চক্ষু ইতস্তত ঘুরিতে ঘুরিতে মন্মথর খাবারের উপর গিয়া স্থির হইল। সে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর গিয়া ঢাকা খুলিয়া দেখিল।

খাবার দেখিয়া চোরের মুখে ক্লিষ্ট হাসির মতন একটা ভঙ্গিমা ফুটিয়া উঠিল। সে আসনে বসিল, গেলাস চল্‌কাইয়া হাত ধুইল, তারপর থালার দিকে হাত বাড়াইল। তাহার মনের ভাব, যদি ধরা পাড়তেই হয় শূন্য উদরে ধরা পড়িয়া লাভ কি ?

কাট্।

ফটকের সম্মুখ। গুর্খা দারোয়ান টুলের উপর খাড়া বসিয়া ঘুমাইতেছে। মন্মথ রাস্তার দিক হইতে আসিয়া তাহার কাঁধে টোকা মারিল। গুর্খা সটান উঠিয়া স্যালুট করিল, তারপর চাবি বাহির করিয়া ফটক খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

গুর্খা : ক' ঘড়ি বাজা হ্যায় সরকার ?

মন্মথ হাতের ঘড়ি দেখিবার ভাণ করিল।

মন্মথ : পৌণে দশটা।

গুর্খা : জি সরকার।

মন্মথ ভিতরে প্রবেশ করিল ; গুর্খা আবার ফটকে তালা লাগাইল।

কাট্।

হল্ ঘরে সেবক হাঁটুতে মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। সদর দরজায় মৃদু টোকা পড়িতেই সে উঠিয়া দ্বার অল্প খুলিল। মন্মথ পাশ কাটাইয়া প্রবেশ করিল।

সেবক কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া মন্মথর একটা হাত চাপিয়া ধরিল, চাপা গলায় বলিল—

সেবক : চল কর্ত্তার কাছে। তিনি জেগে ব'সে আছেন।

মন্মথ সভয়ে পিছু হটিল।

মন্মথ : অ্যাঁ—দাদু জেগে !—

সেবকের মুখে একটু হাসির আভাস দেখিয়া সে থামিয়া গেল ; বুঝিতে পারিল সেবক মিথ্যা ভয় দেখাইতেছে। সে বিরক্ত হইয়া বলিল—

মন্মথ: ছাখ সেবক, এত রাত্রে ইয়ার্কি ভাল লাগে না।—নে জুতো খোল—

সেবক নত হইয়া তাহার জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল ; মন্মথ ইতিমধ্যে কোট ও গলার টাই খুলিয়া ফেলিল।

সেবক: এবারটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ফের যদি দেরী করেছ—

সেবক উঠিয়া কোট ও টাই মন্মথর হাত হইতে লইল।

সেবক: যাও, খেয়ে নাও গে। শুধু ইয়ার্কিতে পেট ভরে না।

ঘরের এক কোণে একটা আলনা ছিল, সেবক জুতা কোট প্রভৃতি লইয়া সেই দিকে রাখিতে গেল। মন্মথ পা টিপিয়া টিপিয়া ভোজনকক্ষের দিকে চলিল।

ভোজনকক্ষে চোর আসনে বসিয়া আহার আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল। চোর চমকিয়া দেখিল এক ব্যক্তি দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া!

মন্মথও একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তাহার খাদ্য আত্মসাৎ করিতে দেখিয়া ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর চীৎকার করিয়া উঠিল—

মন্মথ: অ্যাঁ—কে! চোর—চোর—!

চোর তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া এক দিকে ছুটিল, মন্মথ 'চোর চোর' চেঁচাইতে চেঁচাইতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। ঘরের মধ্যে এক পাক ঘুরিয়া চোর সাঁ করিয়া দ্বার দিয়া বাহির হইল ; মন্মথও তাহার পিছনে বাহির হইল।

হল্ ঘরে সেবক মন্মথর চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি ভোজনকক্ষের দিকে আসিতেছিল, চোর বিদ্যুৎবেগে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঘরের অন্য দিকে পলায়ন করিল। কিন্তু মন্মথ সেবককে এড়াইতে পারিল না ; সবেগে ঠোকাঠুকি হইয়া দু'জনেই ভূমিসাৎ হইল এবং তারস্বরে 'চোর চোর' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

যদুনাথবাবুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনি ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া প্রথমেই চাবির গোছাটা মুঠিতে চাপিয়া ধরিলেন, তারপর খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হল ঘরে বাহির হইয়া আসিলেন।

ওদিকে নন্দাও অপ্রত্যাশিত সোরগোল শুনিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিল।

চোর এতক্ষণ ড্রয়িংরুমের দ্বারের কাছে পর্দার আড়ালে লুকাইয়া ছিল ; নন্দা নামিয়া আসিবার পর সে সরীসৃপের মত নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া উপরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যদুনাথ ও নন্দা যখন ভূপতিত মন্মথ ও সেবকের কাছে উপস্থিত হইলেন। তখন তাহারা পরস্পর ধরাধরি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

যদুনাথ: কি হয়েছে, এত চেঁচামেচি কিসের?

মন্মথ ও সেবক: চোর চোর—

নন্দা: কৈ—কোথায় চোর?

নন্দা চারিদিকে তাকাইল। যদুনাথ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

যদুনাথ: অ্যাঁ—চোর! আমার সূর্যমণি—

তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া ঠাকুর ঘরের দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন সূর্যমণি যথাস্থানে আছে, চুরি যায় নাই।

যদুনাথ: যাক্, আছে—

তিনি আবার ঠাকুর ঘরে তালা লাগাইলেন। ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর দিক হইতে আরও তিন চার জন ভৃত্য উপস্থিত হইয়াছিল।

মন্মথ: বাড়ীতে চোর ঢুকেছে। খোঁজো তোমরা—ওপরে নীচে চারিদিকে খুঁজে ছাখো—যাও—

চাকরেরা ইতি-উতি চাহিতে লাগিল, তারপর ভয়ে ভয়ে এদিকে ওদিকে প্রস্থান করিল।

যদুনাথ: (মন্মথকে) কোথায় ছিল চোর? কে দেখ্‌লে তাকে?

মন্মথ একটু থতমত খাইয়া বলিল—

মন্মথ: আমি খাবার জন্যে নীচে নেমে এসে দেখি—

যদুনাথ: (সন্দিগ্ধভাবে) খাবার জন্যে? এত রাত্রে—?

মন্মথ: আমি—পৌনে দশটার সময় বাড়ী ফিরেছি—কিন্তু ক্ষিদে ছিলনা তাই নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। তারপর এই মিনিট পাচেক আগে নেমে এসে খাবার ঘরে ঢুকে দেখি—

যদুনাথ: ও—কি দেখলে?

মন্মথ: দেখি একটা লোক আমার আসনে ব'সে ব'সে খাচ্ছে—

যদুনাথ: খাচ্ছে—

মন্মথ: হ্যাঁ, টপাটপ খাচ্ছে।

নন্দা: আহা বেচারা! হয়তো পেটের জ্বালাতেই চুরি করতে ঢুকেছিল—হয়তো কতদিন খেতে পায়নি!

মন্মথ: তা জানিনা। কিন্তু এদিকে আমার যে নাড়ী জ্ব'লে যাচ্ছে।

নন্দা: এস তোমাকে খেতে দিই। আল্‌মারিতে খাবার আছে।

তাহারা ভোজনকক্ষে গেল ; যদুনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। চাকরেরা বিভিন্ন দিক হইতে ফিরিয়া আসিল।

জনৈক ভৃত্য : বাড়ীতে চোর নেই বাবু, ওপর নীচে আতি-পাতি ক'রে খুঁজেছি।

যদুনাথ : নেই তো গেল কোথায় ? এই ছিল এই নেই—একি, ভেল্‌কি বাজি নাকি !—সদর দরজা খোলা রয়েছে, সেবক কৈ ?

এই সময় একজোড়া ছেঁড়া জুতা দুই হাতে আস্ফালন করিতে করিতে সেবক দরজা দিয়া প্রবেশ করিল।

সেবক : পেয়েছি ! পেয়েছি !—এই দ্যাখো—

সেবক দুর্গন্ধ জুতাজোড়া যদুনাথের নাকের সম্মুখে ধরিল। যদুনাথ দ্রুত নাক সরাইয়া লইলেন।

যদুনাথ : আ গেল যা ! কি পেয়েছিস ?

সেবক : জুতো গো বাবু—জুতো। জুঁই ঝাড়ের পেছনে জুতো খুলে রেখে চোর বাড়ীতে ঢুকেছিল—

যদুনাথ জুতার ছিন্ন গলিত অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন।

যদুনাথ : হুঁ, সত্যিই ছিঁচকে চোর, খাবার লোভে বাড়ীতে ঢুকেছিল।—যা, রাস্তায় ফেলে দিগে যা।

সেবক। এঁ: ! ফেলে দেব ! পুলিসকে দিতে হবে না ?

যদুনাথ : পুলিস ! (চিন্তা করিয়া) হাঁ, পুলিসকে খবর দেওয়া দরকার। কিছু বলা যায় না।—

ওদিকে ভোজনকক্ষে মন্মথ ও নন্দা মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ছিল ; মন্মথ একটা রেকাবি হাতে লইয়া আহার করিতেছিল। নন্দা ভৎ'সনা পূর্ণ চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া ছিল।

মন্মথ। চোরে খাবার খেয়ে গেল—হুঁ: !

নন্দা : যেমন কর্ম তেমনি ফল। খাবেই তো চোর। আরও দেরী ক'রে এসো !

মন্মথ : হুঁ:।

হল্ ঘরে যদুনাথ চাকরদের বলিতেছেন—

যদুনাথ : চোরটা পালিয়েছে যখন তখন আর কি হবে। তোরা যা, সাবধানে ঘুমোবি। আর সেবক, তুই ঠাকুর ঘরের সামনে শুয়ে থাক। আজ অনেক রাত হয়েছে, কাল সকালে পুলিস ডাকব।—

অন্য ভৃত্যেরা চলিয়া গেল। সেবক চোরের জুতাজোড়া বগলে করিয়া বলিল—

সেবক : ঠাকুর ঘরের সামনেই শোব। কিন্তু জুতো ছাড়ছি না। কাল সকালে পুলিস এলেই বলব, এই ন্যাও জুতো !

ইতিমধ্যে মন্মথ ও নন্দা ফিরিয়া আসিয়াছে।

নন্দা : জুতো ! কি হবে জুতো ?

সেবক : কী আর হবে ? চোরের জুতো পেয়েছি, আজ রাত্তিরে মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকব। তারপর কাল সকালে দেখো।

মন্মথ : মাথা খারাপ।

যদুনাথ : (নন্দা ও মন্মথকে) তোমরা শুয়ে পড় গিয়ে। রাত হয়েছে।

যদুনাথ নিজ-কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। নন্দা ও মন্মথ সিঁড়ি দিয়া উপরে চলিল। সেবক জুতাজোড়া বালিশের মত মাথায় দিয়া ঠাকুর ঘরের সম্মুখে শয়নের উদ্যোগ করিল।

কাট্।

(ক্রমশ)

বস্ত্র-হরণ

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

লজ্জাহীনেরা দেখে লাঞ্ছনা কুলস্ত্রী পাঞ্চালীর,
হাসে উল্লাসে ক্রূর কৌরব-দল।
বৃথা ঝরি পড়ে অঝোর অশ্রু মাধব-বান্ধবীর
দেখিছে যতেক ঘৃণ্য কপট খল।
কাঁদে লজ্জায় গুরু বেদনায় কন্যা, জননী, জায়া
নীরব ভাষায় বারে বারে দেয় ধিক
অনাগত এক অকল্যাণের কুটিল কৃষ্ণ ছায়া
অদূরে দেখিয়া কাঁদে যত ধার্মিক।

হইতে পাবে না এ অবমাননা, বাঁচিবে নারীর মান
লুটাবে ধূলায় অসহ দুঃশাসন
যে নখে চিরিয়া বক্ষ তাহার করিবে রক্তপান
গ্রহণ করিছে আজি সে কঠিন পণ।
দম্ভের ভরে দেখিতে পায় না, আজিকে কৌরবেরা
হবে হবে জয় যেথায় জনার্দন।
অন্ধ তামস আবরণে আজ নয়ন তাদের ঘেরা
তাই ত সভায় করিছে আস্ফালন।

শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

শ্রীকৃষ্ণ—অর্থাৎ নারায়ণ।

বৈষ্ণব দিগের মতে শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ—

যথা :—ভাগবতে (১।৩।২৮)

এতে চাংশকলা পুংস : কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।

ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

ইহারা (অন্যান্য অবতারগণ) (পরম) পুরুষের অংশ কলা। কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান। (অবতারগণ) ইন্দ্রারি (অসুর) গণ দ্বারা ব্যাকুল লোক সমূহকে যুগে যুগে সুখযুক্ত করেন।

এবং—ব্রহ্মসংহিতায়—৫মঅ ১ শ্লোক।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণ কারণম্॥

অম্বু :—কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দ দেহ যুক্ত। গোবিন্দ অনাদি হইলেও আদি পুরুষ। তিনি সর্ব্বকারণেরও কারণ।

টীকা: পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মমতে ঈশ্বরের তিন গুণ। তিনি সৎ স্বরূপ (good)। তিনি চিন্ময় (intelligent)। তিনি আনন্দময় (beautiful)। একটু বিশ্লেষণ করিলে প্রতীত হইবে গীতার কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—সৎ চিৎ আনন্দের সহিত সংপৃক্ত। সৎকর্ম্ম ব্যতীত সৎগুণ বা goodness থাকিতে পারেনা। জ্ঞান—চিৎ বা intelligence। যাহা আনন্দ দেয় তাহাই সুন্দর beautiful। যাহা আমাদের ভাল লাগে তাহাকেই আমরা ভালবাসি, ভক্তি করি বা প্রেম করি।

বৈষ্ণব দিগের সুবিদিত মন্ত্র :—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

অর্থাৎ যিনি হরি তিনি কৃষ্ণ এবং যিনিই কৃষ্ণ তিনিই হরি ও যিনি হরি তিনি রাম এবং যিনিই রাম তিনিই হরি।

রাম কৃষ্ণ হরি অভেদ ভাবিতে হইবে।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ (নারায়ণের) বুদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনী পুরাণ ও মহাভারত হইতে চয়নিত হইতেছে।

ভাগবতে সমুদ্র মন্থন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুর স্তব করিলেন। প্রভু তুমি অন্তর্যামী, আমাদের অন্তরের কথা তুমি বিদিত আছ। আমাদের শ্রেয়োবিধানকর। ভগবান বলিলেন—তোমরা সমুদ্র মন্থন কর। এই কার্য্য হইতেই তোমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে। এই দুষ্কর কার্য্য তোমরা একা পারিবে না। অসুরগণের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য সম্পাদন কর। শত্রুর সহিত সব সময় সমর না করিয়া সামের দ্বারাই সুফল লাভ হয়। সমুদ্র মন্থনে নানা দিব্য বস্তুর উদ্ভব হইবে। সর্ব্বশেষ অমৃতের উৎপত্তি। দেবতারা অসুরগণের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তাহারা প্রথমত ইতস্তত করিলেন। পরে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, অমৃত উৎপন্ন হইলে তাহা নিজেরা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবেন।

দেবাসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। নানাবিধ ঔষধি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইল। মন্দর পর্ব্বত মন্থনদণ্ড হইল। নাগরাজ বাসুকি মন্থনরজ্জু হইল। বিষ্ণু দেবগণকে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রেই বাসুকির মুখের দিক ধারণ করিলেন। দেবগণ দ্রুত তাহার অনুকরণ করিয়া সর্পরাজের মুখের দিক ধারণ করিল। কৃষ্ণ ইহার পরিণাম ফল কি হইবে তাহা জানিতেন। অসুরগণ চটিয়া গেল। তাহারা বলিল, আমাদিগকে ধরিতে হইবে নাগের পশ্চাৎ দিক—এ অপমান আমরা সহ্য করিব না। বিষ্ণুর ইঙ্গিতে দেবগণ মুখ ভাগ ছাড়িয়া পশ্চাৎভাগ ধারণ করিলেন। দেবগণের অপমানে অসুরগণ তুষ্ট হইল। তাহারা আনন্দে সর্প রাজের মস্তক দিক ধরিয়া মন্থন রজ্জু টানিতে লাগিল।

এই মন্থন কার্য্য দারুণ কার্য্য। দেবগণ ক্লান্ত হইলেন। অসুরগণ ক্লান্ত হইল। উভয়ের টানে বাসুকীও ক্লান্ত হইলেন। এই দুর্য্যোগে মন্দার পর্ব্বত নিজ ভারে ডুবিতে আরম্ভ করিল। ভগবান কমঠ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মন্দারকে পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন।

জয়দেবের :—কেশবধৃত কূর্ম্মশরীরঃ জয় জগদীশ হরে।

আবার মন্থন কার্য্য চলিতে লাগিল। ক্লিষ্ট বাসুকির নাসারন্ধ্র হইতে ঘন ঘন উগ্রশ্বাস বহিতে লাগিল। বিষ মিশ্র সেই বায়ুর উগ্রতায় অসুরগণ অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন। কিন্তু এখন কোনও উপায় নাই। দেবতারাইত প্রথম মুখের দিকে গিয়াছিলেন। তাহারাই না উঁহাদিগকে তাড়াইয়া পশ্চাৎভাগে দিয়াছে।

ক্রমশ মন্থনের ফল ফলিতে লাগিল। নানা রত্নরাজি উঠিল। উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল উঠিল। অসুরগণ তাহা গ্রহণ করিল। উৎকৃষ্ট হস্তী সকল উঠিল। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। কৌস্তুভমণি উঠিল, কৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইল। অপরূপ শ্রী সম্পন্ন শ্রীনারায়ণকে পতিত্বে বরণ করিলেন। ভিষকশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরীর আবির্ভাব হইল।

শেষ অমৃতের উৎপত্তি। তাহার পূর্ব্বে ভীষণ ব্যাপার ঘটিল। বিষের উৎপত্তি হইল। বিষের জ্বালায় বিশ্ববাসীগণ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। বিষ্ণু মহাদেবের স্তব করিলেন। বলিলেন—শম্ভো আপনি ব্যতীত এই বিষ হইতে জগত্রাণ করিতে পারে এমন শক্তিমান কাহাকেও দেখিতেছি না। আপনি ইহার প্রতিকার করুন। তবে তুষ্ট আশুতোষ জগদ্ধিতার্থে সেই বিষপান করিলেন। লোকে নিস্তার পাইল।

তারপর সর্ব্বলোকাকাঙ্ক্ষিত অমৃতের উৎপত্তি। দেবাসুরগণ সকলেই অমৃত পাইবার জন্য উৎসুক হইল। কিন্তু অসুরগণ বলপূর্ব্বক উহা অপহরণ করিল। দেবগণ বিষণ্ণ হইলেন। নারায়ণ তাহাদিগকে ইঙ্গিতে অভয় দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তিধারণ

শ্রীকৃষ্ণ এক অলৌকিক রূপলাবণ্যশালিনী ললনা মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিলেন। উক্তা রূপসী এক কন্দুক লইয়া অপরূপ ভঙ্গিতে নৃত্য সহকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ভাগবতে মোহিনীর আবির্ভাব বর্ণনা :—

এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুঃ সর্ব্বোপায়বিদীশ্বরঃ।
যোষিদ্রূপমনির্দ্দেশ্যং দধার পরমাদ্ভুতম্॥
প্রেক্ষণীয়োৎপলশ্যামং সর্ব্বাবয়ব সুন্দরম্।
সমানকর্ণাভরণং সুকপোলোন্নসাননম্॥
নবযৌবননির্বৃত্তস্তনভার কৃশোদরম্।
মুখামোদানুরক্তালি—ঝঙ্কারোদ্বিগ্নলোচনম্॥
বিভ্রৎসুকেশ ভারেণ মালামুৎফুল্লমল্লিকাম্।
সুগ্রীবকণ্ঠাভরণং সুভুজাঙ্গদভূষিতম্॥
বিরজাম্বরসংবীত নিতম্বদ্বীপশোভয়া।
কাঞ্চ্যা প্রবিলসদ্বল্গু চলচ্চরণনূপুরম॥
সব্রীড়স্মিত বিক্ষিপ্ত ভ্রূবিলাসাবলোকনৈঃ।
দৈত্যযূথপচেতঃসু কামমুদ্দীপয়ন্মুহুঃ।

অনুবাদঃ—এই অবসরে সর্ব্ব উপায়বিৎ ঈশ্বর বিষ্ণু পরম অদ্ভুত, অনির্দ্দেশ্য যোষিৎরূপ ধারণ করিলেন। তাহার বর্ণ দর্শনীয় নীলপদ্মের মত শ্যাম। তাহার সর্ব্ব অবয়ব সুন্দর। তাহার সমান কর্ণদ্বয় আভরণ যুক্ত। তাহার মুখ, গণ্ডস্থল ও নাসা সুন্দর। নবযৌবন বশত তাহার স্তনভার পূর্ণ। তাহার উদর দেশ কৃশ। মুখসৌরভে আকৃষ্ট অলিকুলের ঝংকারে তাহার নয়ন যুগল উদ্বিগ্ন। প্রচুর সুন্দর কেশরাশি উৎফুল্লমল্লিকার মালা ধারণ করিয়াছে। সুন্দর গ্রীবাদেশে কণ্ঠাভরণ। সুন্দর বাহু অঙ্গদ দ্বারা বিভূষিত। তাহার বিরজ বসনাবৃত নিতম্বদেশ শোভা করিয়া কাঞ্চী (চন্দ্রহার, গোট) বিলসমান। তাহার চরণ নূপুর মনোহর। ব্রীড়া ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত ভ্রূভঙ্গি ও দৃষ্টিপাত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তিনি মুহুর্মুহুঃ দৈত্য যুথপতিদিগের কাম উদ্দীপন করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে দৈত্যদিগের নিজেদের মধ্যে অমৃতভাণ্ডের অধিকারীত্ব লইয়া বিবাদ বাধিয়া গেল। তাহারা পরস্পরের প্রতি সুহৃদ্ভাব পরিত্যাগ করিয়া দস্যুধর্ম্মী হইয়া পড়িল। এমন সময়ে তাহারা অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী মোহিনীকে দেখিল। দৈত্যগণ বলিল—কি ইহার রূপ, কি ইহার জ্যোতি, কি ইহার নূতন বয়স। তাহারা মোহিনীকে বলিল—হে সুন্দরী আপনি কে, কি অভিপ্রায়েই বা এখানে আসিয়া আমাদের মনকে উন্মথিত করিতেছেন। করুণ বিধাতা কি শরীরী দিগের সর্ব্বেন্দ্রিয় ও মনের প্রীতি বিধান করিবার জন্যই আপনাকে পাঠাইয়াছেন। আমরা দৈত্যেরা কশ্যপের সন্তান। অমৃতের বিভাগের জন্য আমাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি এই অমৃতের যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

মোহিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া রুচির অপাঙ্গছায়া তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন :—হে কশ্যপ সন্তানগণ তোমরা কেন পুংশ্চলী আমার অনুসরণ করিতেছ। পণ্ডিতগণ শৃগালাদির মত স্বৈরিণী স্ত্রীলোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করেন। নিত্য নূতন অন্বেষণকারী এরূপ স্ত্রীলোকের সখ্য একান্তই অনিত্য।

তাহার এই বাক্যের ফল বিপরীত হইল। তাহার প্রতি অসুরগণের বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইল। তাহারা আশ্বস্ত হইয়া অমৃতভাণ্ড তাহার করে বন্টনার্থ অর্পণ করিল।

তখন মোহিনী বলিলেন :—তবে আমার কৃতকর্ম্ম সাধুই বা অসাধুই হউক যদি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হও তাহা হইলে আমি বিভাগ করিব।

অসুরগণ সম্মত হইলেন।

মোহিনীর ব্যবস্থামত দেবাসুরগণ অমৃত পান করিবার জন্য শুদ্ধভাবে ধূপামোদিত ও মাল্যশোভিত বিশাল গৃহে ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে উপবেশন করিল। অসুরগণ নিকটস্থ স্থান গ্রহণ করায় দেবগণকে দূরে বসিতে হইল। ভাগবতে তাহাদের মধ্যে মোহিনীর আবির্ভাব বর্ণনা :—

তস্যাং নরেন্দ্র করভোরুরুশদ্দুকুল
—শ্রোণীতটালসগতির্মদবিহ্বলাক্ষী।
সা কূজতী কনক নূপুর শিঞ্জিতেন
কুম্ভস্তনী কলসপাণিরথাবিবেশ॥
তাং শ্রীসখীং কনক কুণ্ডলচারুকর্ণ—
নাসাকপোলবদনাং পরদেবতাখ্যাম্।
সংবীক্ষ্য সম্মুমুহুরুৎস্মিত বীক্ষণেন
দেবাসুরা বিগলিত স্তনপট্টিকান্তাম্॥

অনুবাদ :—হে নরেন্দ্র (পরীক্ষিৎ) তাহাদের মধ্যে মোহিনী প্রবেশ করিলেন। বালহস্তী শুণ্ডবৎ তাহার উরুদেশ। কমনীয় বসন তাহার পরিধানে। শ্রোণী তটের জন্য তাহার গতি ভঙ্গী অলস। নয়ন তাহার মদবিহ্বল। কুম্ভের ন্যায় তাহার স্তন। তাহার হস্তে অমৃত কলস। কনক নূপুর সঞ্চালন দ্বারা তিনি মধুর ধ্বনি করিতেছেন। তাহার চারু কর্ণে কনক কুণ্ডল শোভিতেছে। তাহার নাসা, গণ্ডদেশ, ও বদন সুন্দর। মাঝে মাঝে তাহার স্তনপট্টিকা বিগলিত হইতেছে। পরদেবতা যাহার আখ্যা সেই শ্রীসখীকে দেবাসুরগণ উল্লসিত নয়নে দর্শন করিয়া পুন পুন মোহিত হইতে লাগিলেন।

মোহিনী ভাবিলেন ক্রূরকর্ম্মা অসুরদিগকে অমৃত পান করান সর্পকে দুগ্ধ পান করানরই মত। তিনি নিজ মায়ায় অসুরদিগকে মোহিত রাখিয়া দূরস্থ দেবগণকেই অমৃত পান করাইলেন। তার পর তিনি স্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন ও অন্তর্হিত হইলেন।

অতপর বঞ্চিত অসুরগণ দেবগণকে আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে শেষে অসুরদিগেরই পরাজয় হইল। অমৃত পানে সুদীপ্তপরাক্রম দেবগণের বীর্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া অসুরগণ পলায়ন করিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কুমারী সরলা বেন

শ্রীমনোরঞ্জন সেন

মহাত্মাজীর আশ্রমে তাঁহার অনুগত শিষ্যারূপেই একদা কুমারী সরলা বেন ভারতীয়গণের সহিত আপন হৃদয়ের যোগ-সূত্র স্থাপন করিবার প্রথম সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। এই অ-ভারতীয় মহিলা অবশেষে আপন সুকোমল চিত্তের মধু বর্ষণ করিয়া এবং সেবাপরায়ণ হস্তের প্রেম-স্নিগ্ধ স্পর্শ দান করিয়া হতভাগ্য ভারতের বুকে এক আনন্দ ও কল্যাণের ছায়া রচনা করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভারতের জল-

কুমারী সরলা বেনের আশ্রম-ভবন—কণৌলী

বায়ু এবং শ্যামস্নিগ্ধ মৃত্তিকা তাঁহাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল যে তিনি তাঁহার সাগর-পারের আনন্দ-পূর্ণ মাতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া অবলীলাক্রমে কঠোর সংগ্রামপূর্ণ ভারতীয় জীবন-স্রোতে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন।

ইংরেজ মাতা ও সুইস-ইংরেজ পিতার আদরে প্রতিপালিত হইয়াও কিরূপে ভারতের জন্য এমন অকৃত্রিম সুধা তিনি আপন হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে সত্যিই আমরা অবাক হইয়া যাই। ইংলণ্ডে

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেষ্টিত আশ্রম ভবনের অপর অংশ

শিক্ষাগ্রহণের সময় তিনি বহু ভারতীয় ছাত্রের সহিত পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন এবং এই পরিচয়ের
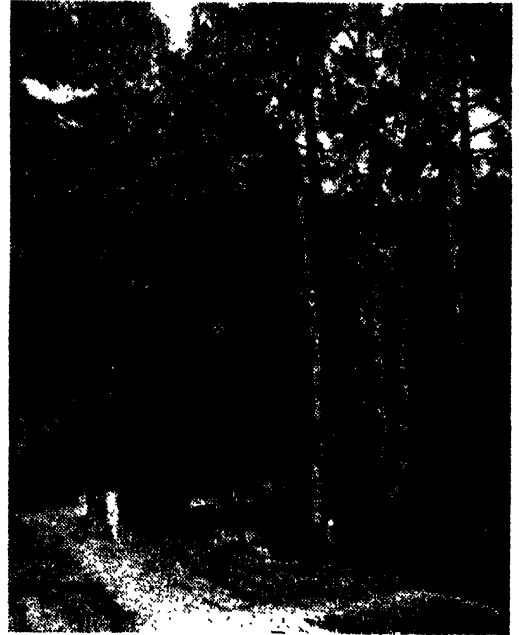
পাইন বনের মধ্য দিয়া আশ্রমের পথ

ফলে ভারতীয় ভাবধারার প্রতি তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৯৩২ খৃঃ ভারতে পদার্পণ করে সরলা বেন

মহাত্মাজীর পবিত্র স্নেহ-ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করেন। তিনিই তাঁহার পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তন করিয়া "সরলা বেন" নামে তাহাকে ভূষিত করেন। আমাদের নিকট আজ তিনি এই নামেই পরিচিত।

সবরমতীর মহাপ্রাণ মানবের স্নেহচ্ছায়ায় বাস করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই এই অনন্যসাধারণ মহিলা ভারতের দুঃখকষ্ট এমনভাবে আপন হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারত-সেবার যে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনি অপরদিকে তথাকার অধিবাসীদিগের চরম দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাত্রার পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার সুকোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি এই সকল ভগ্নপ্রাণ দরিদ্রের সেবা সংকল্প গ্রহণ করিয়া কুমায়ুনের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঔষধ বিতরণ, কস্তুরিবাই স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং অশিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাদান এই সময়ে তাহার জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইল।

আশ্রম হইতে দূরে গরুড় উপত্যকার দৃশ্য

ক্রীড়ারত আশ্রমের বালিকারা

ীব্র আকাঙ্ক্ষা এই পরমক্ষণে তাঁহার অন্তরে উদ্দীপিত ইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে নিরক্ষর, অশিক্ষিত রতীয় নারীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য উন্মুখ রিয়া তুলিয়াছিল।

১৯৪২ খৃঃ তিনি অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই ময় গান্ধীজীর উপদেশে তিনি আলমোড়া জিলার কৌশানী মক একটি গ্রামে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন। লাবাসের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য যেমন একদিকে তাঁহাকে

এত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত তিনি এই সকল ক করিতে আরম্ভ করিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের কৃপাকটা শীঘ্রই তাহার উপর পতিত হইল। দুইবার তাঁহা অন্তরীণে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু দুইবার তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বৎসরকা কারাবাসের সময়ে তাঁহাকে শীতকালে আলমোড়ায় রা হইয়াছিল এবং গ্রীষ্মকালে লক্ষ্ণৌ কারাগারে স্থানান্তরি করা হইয়াছিল। পরবর্তী জীবনে ব্রিটিশ সরকারের এ

সুনিশ্চিত ব্যবস্থার কাহিনী তিনিই হাসি-গল্পের ছলে ব্যক্ত করিয়াছেন।

পুরাণ-প্রসিদ্ধ সোমেশ্বর এবং গাবর উপত্যকা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া যে গিরিপৃষ্ঠ দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহারই উন্নত চূড়ায় কশৌলী নামক গ্রামখানি আপন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব আভায় মণ্ডিত হইয়া সুকুমার পুষ্প-স্তবকের মত অনায়াস আনন্দে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। স্নিগ্ধ আবহাওয়া এবং গগনস্পর্শী পাইন বৃক্ষ এই স্থানটিকে জনসমাজে সুপরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। নন্দকোট চূড়া এবং তুষারাবৃত ত্রিশূলের অপূর্ব্ব মহিমা এই স্থান হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। কোশী বৈদ্যনাথের পথে, কোশী হইতে ১৪ মাইল দূরে এই গ্রামটী অবস্থিত। কোশী-বৈদ্যনাথের পথে সংবৎসর যাত্রী-বাহী বাস গমনাগমন করিয়া থাকে। গ্রামটিতে যদিও লোকসংখ্যা অধিক নহে, তবুও শীতের সময় পশম ইত্যাদি বহন করিয়া বহু ভুটিয়া ব্যবসায়ী এই স্থানে যাতায়াত করে। এই স্থানে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য দুইটি মনোরম ডাকবাংলা রহিয়াছে।

কুমারী সরলা বেন যে কুটীরটিতে বাস করিতেন সেই কুটীর হইতে সোমেশ্বরের বিরাট উপত্যকা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত এই আবাস-স্থলটি তিনি ১৯৪৬ খৃঃ হইতে শিশুদিগের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন। এই সৎকার্যে ব্যবহার করিবার জন্য আরো জমি এবং ফলের বাগান তিনি ক্রমাগত দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইতেছেন এবং শিশুদিগের সুবিধার জন্য একটি রান্নাঘর ও একটি শয়নাগার নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই আশ্রমে উনিশটি শিশু প্রতিপালিত হইতেছে; এবং ষাটটি শিশুর ব্যবস্থা করিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে বলিয়া নির্ম্মাণ কার্য্য এখনও পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। কুমারী সরলা বেন সাহায্যলাভের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন এবং উত্তর প্রদেশ সরকার তাঁহাকে এই জনহিতকর কাজে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

সরলা দেবী ভারতীয় নারীকে বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাপ্রদানের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে এইরূপ শিক্ষা ভারতীয় নারীকে কেবল পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রার অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত করিয়া তোলে। ফলে তাহারা ভারতবর্ষীয় ধরণে ভারতের মৃত্তিকায় শান্তিপূর্ণ গৃহ রচনার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। কোন বিদ্যালয়ে অত্যধিক সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রী গ্রহণ করাও তাহার অভিমত নহে; কারণ ঐরূপাবস্থায় ছাত্রছাত্রীর সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্রকে আদর্শানুযায়ী গঠন করিবার পরিকল্পনাটি একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়।

সন্ধ্যার সহর

শ্রীসুধীর গুপ্ত

শব্দ-শ্রান্ত সহরের তাপ-দগ্ধ পথে,—
কঙ্করে বন্ধুর কোথা, পীচেতে মসৃণ,
সুরকীর রক্ত-রাগে কোথাও রঞ্জিত,
ক্ষয়িষ্ণু 'খোয়ায়' রুক্ষ, রিক্ত—বিসর্পিত,
ধুলা-বালি-কালি-ধূমে বিষণ্ণ মলিন,
'ভিস্তি' গঙ্গাজল ঢেলে গেছে কোনমতে।

ঘোলা জল,—তৃষার্ত্তের তবু শান্তি-বারি;
বাষ্পে পরিণত হয়ে ধরাতল ছাড়ি'
বৃত্তাকারে উঠিতেছে অসীম অম্বরে।
পড়ন্ত রবির আলো ধূসর সহরে
শ্লথ বিরামের কোন আসন্ন আভাস
ঘনাইয়া আনে যেন দূরান্তর হ'তে।

জৈব-যুদ্ধ বুঝি সারা;—হেরিলাম পথে
কাকেরা সিনান করে; নিথর আকাশ।

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির

বর্ত্তমান ভারত সরকার পুরাকীর্ত্তি সংরক্ষণে যে প্রশংসনীয় আগ্রহের পরিচয় দিতেছেন, তাহারই প্ররোচনায় বৃন্দাবনের বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর ভগ্ন ও ত্যক্ত মন্দিরের পুনর্গঠন ও সংস্কারের আবেদন জানাইয়াছেন। তিনি সে সম্বন্ধে ভারত সরকারকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে ত্রিবিধ কার্য্য করিতে বলা হইয়াছে :—

(১) মন্দিরের ভগ্নাংশের পুনর্গঠন ও মন্দির সংস্কার ;

(২) বর্ত্তমানে জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আদি বিগ্রহ এই মন্দিরে আনয়ন ;

(৩) মন্দিরের ও দেব-সেবার ভার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রদান।

বলা বাহুল্য, জয়পুরের মহারাজা মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির হইতে যখন হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষী সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দ্বারা অপবিত্র হইবার ভয়ে গোবিন্দজীর বিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত করিয়া রক্ষা করা হইয়াছিল এবং জয়পুরের মহারাজা গোবিন্দজীর জন্য নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে দেব-সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বংশধরের সম্মতি ব্যতীত বিগ্রহ পুনরায় বৃন্দাবনে আনয়নে আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু মন্দিরের ভগ্ন অংশের পুনর্গঠন ও মন্দির সংস্কার সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ থাকিতে পারে না।

মন্দিরের প্রাচীরের বহির্দ্দেশে যে লিপি আছে, তাহাতে মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে জানা যায়—

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে যে বৎসর প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার চতুঃত্রিংশ বর্ষে মহারাণা পৃথ্বীরাজের বংশীয় মহারাজা ভগবানদাসের পুত্র শ্রীমহারাজা মানসিংহ দেব কর্ত্তৃক পবিত্র বৃন্দাবন ধামে গোবিন্দদেবের এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার কর্ম্মীদিগের প্রধান—কল্যাণ দাস ; সহকারী পরিদর্শক—মাণিক চাঁদ চোপরা ; স্থপতি—দিল্লীর গোবিন্দদাস ; শিল্পী—গোরক্ষদাস।

লিপিটি এইরূপ :—

"সংবৎ ৩৪ শ্রীশকবন্ধ আকবর সাহ রাজশ্রী কর্ম্মকুল শ্রীপৃথ্বীরাজাধিরাজবংশ মহারাজ শ্রীভগবন্তদাসসুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহদেব শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠ স্থান মন্দির বনাও শ্রীগোবিন্দ দেবকো কাম উপরি শ্রীকল্যাণ দাস আকারী মাণিক চংদ চোঁপও শিলপকারি গোবিন্দ দাস দিলবলী কারিগর। দঃ গণেশ দাস বিমবল"

গণেশ দাস বিমবল, বোধ হয়, মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক রাজকর্ম্মচারী এবং সেই জন্য তাঁহার দঃ অর্থাৎ দস্তখতের উল্লেখ দেখা যায়।

ভারতের তৃতীয় মোগল সম্রাট আকবর বৈরাম খাঁর সেনাপতিত্বে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাভূত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া—পিতার মৃত্যুতে—কয় মাস পরেই সেই রাজ্য লাভ করেন এবং ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে অভিভাবক বৈরাম খাঁর নিকট হইতে প্রভুত্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বয়ং শাসনকার্য্য আরম্ভ করেন। সাধারণতঃ এইরূপ লিপিতে যে অতিরঞ্জনের বাহুল্য থাকে এই লিপিতে তাহা না থাকিলেও মন্দির-নির্ম্মাণের ও ইহাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় নিঃসন্দেহে বুঝা যায় না।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যে যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই হিন্দু এবং স্থপতি, দিল্লীর তৎকালীন স্থপতিদিগের অন্যতম।

স্থাপত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ফার্গুশন এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

প্রথমে যে সকল পাঠান ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পরধর্ম্মদ্বেষহেতু তাঁহাদিগের অধিকৃত কোন নগরে হিন্দুদিগের পক্ষে কোন

ভিত্তি বিন্যাস
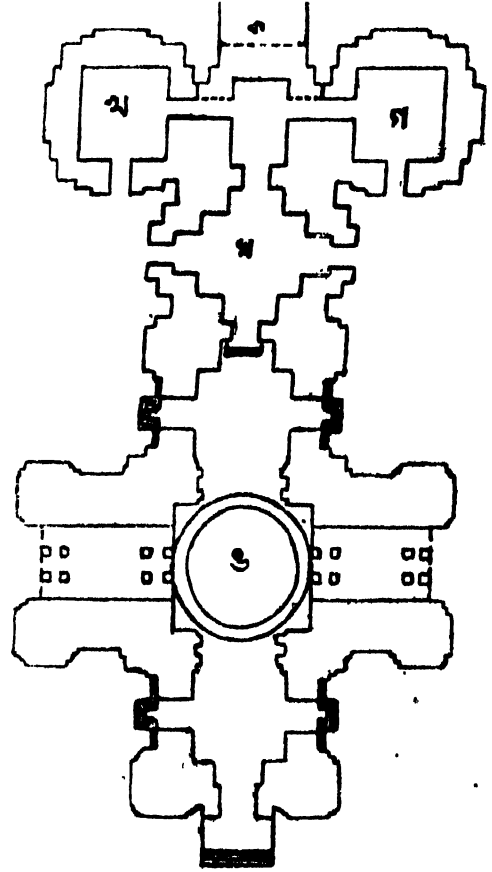
বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ সম্ভব হয় নাই। উদার ও পরমতসহিষ্ণু আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ) নিগৃহীত প্রজাদিগের পক্ষে নবযুগের আবির্ভাব হয়। * * * সেই কারণে তাঁহার হর্ম্ম্যে যেমন হিন্দু শিল্পরীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমনই হিন্দুদিগের নির্ম্মিত গৃহাদিতে মুসলমান শিল্পরীতির সমধিক মিশ্রণ দেখা যায়। শেষে মন্দিরাদি ধর্ম্ম সম্পর্কিত গৃহে এই মিশ্রণ অধিক

রক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু অন্যান্য গৃহে তাহা আদৃত হইয়াছিল এবং উভয় শিল্পরীতির মিশ্রণে যে শিল্পরীতির উদ্ভব হয়, তাহা বোধ হয়, উভয় রীতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

"জয়পুরের মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনের মন্দির এই মিশ্রণের প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ আকৃষ্টকারী নিদর্শন। * * এই মন্দিরের প্রবেশ গৃহের তুলনা ভারতে আর কুত্রাপি নাই। ইহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।"

এই মন্দির দক্ষিণ ভারতের মন্দির সমূহের মত বিরাট নহে বটে, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য অসাধারণ এবং যে সকল বিদেশী বিশেষজ্ঞ

গুণানন্দ নির্ম্মিত মদনমোহনজীর পুরাতন মন্দির

য়ুরোপীয় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাই করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও ইহার পরিকল্পনার, সৌন্দর্য্যের, গঠন সামঞ্জস্যের ও স্থাপত্য-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। এমন কি ফার্গুশন এমন কথাও বলিয়াছেন যে, গোবিন্দজীর মন্দির ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর মন্দিরসমূহের অন্যতম এবং বোধ হয়, কেবল এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হইতে য়ুরোপীয় স্থপতিরা কোন কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

মন্দিরের বহির্ভাগের পরিকল্পনা মৌলিকত্বে অসাধারণ এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিকল্পিত। অলঙ্কারে অর্থাৎ কারুকার্য্যে ইহা ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা হীনপ্রভ। কারণ, ভুবনেশ্বরের মন্দিরে কারুকার্য্যের বাহুল্য পীড়াদায়ক হওয়ায় সৌন্দর্য্যহানি করে, গোবিন্দজীর মন্দিরে সে বাহুল্য নাই—সৌধের সৌন্দর্য্য অলঙ্কারনিরপেক্ষ।

আকবরাব্দের ৩৪ বৎসরে নির্ম্মিত এই মন্দির আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের (১৬০৫ হইতে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ) ও তাঁহার পৌত্র সাহজাহানের (১৬২৮ হইতে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে লক্ষ লক্ষ ভক্ত হিন্দু নরনারীর আগমনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল—ভক্তের কোলাহলে মুখরিত থাকিত। তাহার পরে ঔরঙ্গজেবের অভ্যুদয় ভারতের আকাশে ধূমকেতুর মত বিপদের কারণ হয়। তিনি পিতাকে বন্দী করিয়া ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে আপনাকে সম্রাট ঘোষণা করিয়া ভ্রাতৃত্রয়ের নিধন সাধন করিয়া সিংহাসনে স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে নির্ভয় হইয়াছিলেন এবং ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে যখন আপনার অনুসৃত নীতির ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া—চারিদিকে ষড়যন্ত্রের মধ্যে মোগল সাম্রাজ্যের আসন্ন ধ্বংস অনিবার্য্য দেখিয়া—"যাহা হয় হউক, আমি তরঙ্গের উপরে আপনার তরী ভাসাইয়াছি। বিদায়! বিদায়! বিদায়!" বলিয়া জীর্ণ দেহ রক্ষা করেন, তখন পর্য্যন্ত হিন্দুর সম্বন্ধে অত্যাচারেই আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে মন্দির অপবিত্র করিয়া গিয়াছেন, হিন্দুর তীর্থস্থানে মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বপ্রযত্নে হিন্দুর নাগরিক ও ধর্ম্মাচরণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ, নিকেতন,
রাখিল মহীতে—কলঙ্কমণ্ডিত
কাশী, গয়াক্ষেত্র, চণ্ডাল-ঘৃণিত,
(শরীরে কালিমা—দীনতা প্রতিমা)
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল।"

তিনি ভারতের তীর্থস্থানসমূহের সর্ব্বাঙ্গে "রাহুগ্রাস চিহ্ন" লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন।

এখনও বারাণসীতে বিশ্বনাথের পুরাতন মন্দির ভঙ্গ করিয়া নির্ম্মিত ঔরঙ্গজেবের মসজেদ হিন্দুর মনে বেদনা প্রদান করে।

ঔরঙ্গজেব হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। তিনি যে সকল মন্দির অপবিত্র করেন, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দির সে সকলের অন্যতম।

যদিও ঔরঙ্গজেব হিন্দুদিগকে নানা কার্য্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন তথাপি, আগ্রা হইতে অদূরবর্ত্তী বৃন্দাবনে তাঁহার মন্দির অপবিত্র করিবার সঙ্কল্প গোপন থাকে নাই। সেইজন্য গোবিন্দজীর বিগ্রহ গোপনে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা মানসিংহের রাজ্য জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

পুরাতত্ত্বের, হিন্দু স্থাপত্যের ও সৌন্দর্য্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই মন্দিরের গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধ হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে, লর্ড কার্জ্জনের

দ্বারা, পুরাকীর্ত্তি রক্ষার্থে যে আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহার ফলে এই মন্দির "সংরক্ষিত মন্দির" বলিয়া পরিগৃহীত। কিন্তু ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পরে, ইহার সংস্কার সাধিত হয় নাই! অর্থাৎ এ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমনই ইহা উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

গ্রাউস তাঁহার 'মথুরা' গ্রন্থে এই অতুলনীয় মন্দিরের সংস্কার হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি উদ্যোগী হইয়া ইহার সংস্কার-চেষ্টা করিয়া হিন্দুর ও শিল্পরসিকদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। জয়পুরের তৎকালীন মহারাজার দরবার হইতে সেই কার্য্যের জন্য ৫ হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল—ব্যয়িত ৩৮ হাজার টাকার অবশিষ্টাংশ গ্রাউসের চেষ্টায় সরকার দিয়াছিলেন।

ফার্গুশন মন্দির সংস্কারে গ্রাউসের ত্রুটির জন্য তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছেন। গ্রাউস পণ্ডিত হইলেও স্থাপত্যবিশেষজ্ঞ না থাকিলেও তাঁহার এই মন্দিরের সংস্কার চেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

ফার্গুশন এই মন্দিরের সৌন্দর্য্যে ও বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন:—

"মন্দিরের পুনর্গঠন প্রয়াস যেন কখন না হয়। কিন্তু যদি তাহা হয়, তবে যেন বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি হইতেই ইহার মূল রূপ আবিষ্কারের চেষ্টা হয়। আর কোথাও এইভাবে মুসলমান রচনারীতি হিন্দু মন্দির নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয় নাই, সুতরাং অন্যান্য স্থানের আদর্শ এই মন্দিরে ব্যবহৃত হইতে পারে না।"

লর্ড কার্জ্জনও এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পুরাকীর্ত্তি সংরক্ষণ বিধি বিধিবদ্ধ করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, মন্দিরের সংস্কার বা পুনর্গঠনকালে মূল আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন প্রয়োজন—যেন যাহা ছিল না তাহা আরোপিত অর্থাৎ নূতন কিছু সংযুক্ত না হয়। যাহা ছিল, তাহাই পুনর্গঠিত বা সংস্কৃত করা কর্ত্তব্য।

ফার্গুশন পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কিন্তু বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। কারণ তিনিই অন্য পুস্তকে বলিয়াছেন, যে প্রভাবে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই প্রভাবেই বৃন্দাবন অঞ্চলে ঐরূপ আরও মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল; তবে আর কোনটি গোবিন্দজীর মন্দিরের মত বিরাট বা সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নহে।

সেই সকল মন্দিরের বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করিয়া নিপুণ শিল্পী গোবিন্দজীর মন্দিরের ভগ্নাংশের পুনর্গঠন করিতে পারেন। ফার্গুশন স্বয়ং ও কণারকে ভগ্ন মন্দির কিরূপ ছিল তাহার আনুমানিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

এখন কেবল মন্দিরের জগমোহন ও নাটমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নাটমন্দিরটি দ্বিতল—উপরে তিন দিকে অলিন্দ আছে—বোধ হয় তাহা মহিলাদিগের ব্যবহার জন্য। অলিন্দ ও ছাত পর্য্যন্ত যাইবার সোপানশ্রেণী আছে। নাটমন্দিরের বাহির দিকেও কারুকার্য্য-সুন্দর বারান্দা আছে। তথা হইতে বৃন্দাবনের শোভা দেখিতে পাওয়া যায়।

দেখিয়া মনে হয়, মন্দিরের পাঁচটি চূড়া ছিল। জনশ্রুতি সেগুলি মুসলমানদিগের দ্বারা ভঙ্গ করার স্মৃতি প্রচার করে।

এই "পঞ্চরত্ন" (অর্থাৎ পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট) মন্দির যে উত্তর ভারতে হিন্দুদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। পুনর্গঠিত হইলে ইহা মন্দিরক্ষেত্র বৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হইবে, সন্দেহ নাই।

মুসলমান ঔরঙ্গজেবের আদেশে মন্দির ধ্বংসের বা অপবিত্র করার সম্বন্ধে কোন কোন ইংরেজ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু গোপীনাথের ও মদনমোহনের ত্যক্ত মন্দিরের বিষয় বিবেচনা করিলে আর সে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সেগুলিও মুসলমানের দৌরাত্ম্য-হেতু অব্যবহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। আদিত্যটিলা স্তূপের উপর নির্ম্মিত মদনমোহনের ত্যক্ত মন্দির বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দিরের ভিত্তিবিন্যাস কিরূপ ছিল, তাহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় বৃন্দাবনে যাইয়া—বিশেষ লক্ষ্য করিয়া যে ভিত্তিবিন্যাস ছিল বলেন, আমরা তাহাই সমর্থনযোগ্য মনে করি। কারণ, ফার্গুসন ও কোল—কেহই বিধর্ম্মী বলিয়া—মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ এমন কি মন্দিরের বহির্ভাগে পশ্চিমপ্রান্ত স্পর্শ করিতে পারেন নাই। পুলিনবাবুর প্রদত্ত ভিত্তিবিন্যাস এইরূপ।

(ক) মূলমন্দির এই স্থানে ছিল। এখন এইস্থানে রত্নাবতী রাণীর ছত্রীমধ্যে চরণ চিহ্ন রক্ষিত হইয়াছে।

(খ) যোগপীঠ

(গ) বৃন্দাদেবীর মন্দির

(ঘ) জগমোহন

(ঙ) নাটমন্দির।

পূর্ব্বে এই পাঁচটি স্থানের উপরে পাঁচটি চূড়া ছিল।

সংস্কারকালে যখন পরবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত গৃহাদি অপসারিত করা হইবে, তখন হয়ত পুরাতন ভিত্তি পাওয়া যাইবে।

গোবিন্দজীর মন্দির রক্ষিত হইলে উত্তর ভারতের সর্ব্বপ্রধান প্রাচীন মন্দির ধ্বংস হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং হিন্দু স্থাপত্যের সমুন্নতি সময়ের কীর্ত্তি লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবে।

(পূর্বানুসরণ)

বিস্ফারিত চক্ষে চার্বাক কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল নর্ত্তকী সুরঙ্গমাকে। সুরঙ্গমার চোখের দৃষ্টিতেও এমনই মোহিনী শক্তি ছিল। সুরঙ্গমা এখন কোথায়? কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে সে বহুকাল পূর্ব্বে মৃগয়ায় গিয়াছিল, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। মধ্য-প্রদেশের অরণ্যে অরণ্যে সে এখনও হয়তো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চিন্তাধারাকে সংযত করিয়া চার্বাক পুনরায় প্রশ্ন করিল।

"পিতামহকে খড়্গাঘাতে হত্যা করতে হবে? কোথায় পাব সে খড়্গ?"

"আপনাকেই আবিষ্কার করতে হবে সেটা। আগে পিতামহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হোন, আসুন—"

চার্বাক এ আমন্ত্রণ আর অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, সেই সুরভিত নিকুঞ্জ মধ্যে শ্যাম তৃণাস্তরণের উপর কল্পনা উপবেশন করিতেই তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নয়নদ্বয় নিমীলিত করিল। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিল সে। কল্পনার মুখের দিকে উদ্ভাসিত নয়নে চাহিয়া বলিল, "খড়্গের স্বরূপ আবিষ্কার করেছি"

"ও, করেছেন না কি? কি রকম সেটা?"

"সত্য। সত্যকে লাভ করলেই সৃষ্টিতত্ত্ব জানা যাবে এবং তা জানা গেলে পিতামহ—সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যাবেন। তাকে চাক্ষুষ করবার তো প্রয়োজন নেই—"

কল্পনার নয়নযুগল হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"সত্যকে লাভ করবার কি উপায় আপনি অবলম্বন করবেন?"

"বৈজ্ঞানিক—"

"সত্যের সন্ধানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি বারম্বার পথপরিবর্ত্তন করে কিন্তু"

"আমিও করব। নিজের বুদ্ধিকে অনুসরণ করা ছাড়া আর তো কিছু করতে শিখিনি"

"বেশ, তাহলে আমি চললাম"

"না, আপনি যাবেন না। ভাগ্যবশে আজ আপনার দর্শন পেয়েছি, ঘটনাচক্রে আকাশে বাতাসে আজ মাদকতা সঞ্চারিত হয়েছে, আপনার কণ্ঠস্বরের মূর্চ্ছনায় আমার সমস্ত চেতনা আজ সম্মোহিত, আপনি যাবেন না!"

"বেশ, বসছি তাহলে—"

চার্বাক মুগ্ধনয়নে কল্পনার দিকে চাহিয়া রহিল।

"আর বেশীক্ষণ কিন্তু আমাকে দেখতে পাবেন না, ওই দেখুন—"

চার্বাক দেখিল, বিরাট একটা কৃষ্ণমেঘ দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিল, চন্দ্রমা অন্তর্হিত হইল, কল্পনাকে আর দেখা গেল না। ক্ষণকাল পরে চার্বাকের আকুল কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"ভদ্রে, আপনার পরিচয় দিন, বলুন আপনি কে"

"আমি আপনার প্রেরণা।"

২

অন্ধকারে ঝটিকা-বেগে বিভ্রান্ত হইয়া চার্বাক কোথায় যে নীত হইয়াছিল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। কেবল একটা কথা তাহার মনে হইতেছিল, যেন কোনও অদৃশ্য শক্তি তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। সে শক্তির অমিত প্রাবল্যকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। খরস্রোতে তৃণখণ্ডের মতো সে ঘটনা স্রোতে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সেই তন্বী রূপসীর কথা কিন্তু সে নিমেষের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। তাহার শেষ কথাগুলি দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় তাহার চিত্তলোকে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

"চার্ব্বাক, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অন্ধকারের মধ্যেই তোমার যাত্রা শুরু হল। আমার কোলে ক্ষণিকের জন্যও তুমি মাথা রেখেছিলে, সত্যের পথ তাই আজ উন্মুক্ত হয়েছে। এর ভয়ঙ্কর ঝটিকাক্ষুব্ধ মূর্ত্তি দেখে তুমি ভয় পেও না। অগ্রসর হও—"

চার্ব্বাক অগ্রসর হইতেছিল না, বাহিত হইতেছিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সে স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতেছিল বটে, কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তি বা যুক্তি প্রয়োগ করিবার অবসর পাইতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে অজ্ঞান হইয়া গেল। নিজের গতির উপর যতটুকু নিয়ন্ত্রণশক্তি তাহার ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইল। অবলুপ্ত হইবামাত্র কিন্তু আশ্বস্ত হইল সে। তাহার চতুর্দ্দিক আর ভয়ঙ্কর রহিল না, সে যেন নতন পরিবেশে নীত হইল। শুধু তাহাই নয়—তাহার দৃষ্টিগোচর হইল সে আর একক নহে, অদূরে একব্যক্তি তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। অজ্ঞান অবস্থায় নব-পরিবেশে চার্ব্বাক নতন জীবন লাভ করিল, সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

...অদূরে যে ব্যক্তিটি বসিয়াছিল তাহার দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া চার্ব্বাক উপলব্ধি করিল ব্যক্তিটি অদূরে নাই, বহুদূরে আছে। বহুক্ষণ হাঁটিবার পর চার্ব্বাক তাহার সমীপবর্ত্তী হইল। হাঁটিতে হাঁটিতে চার্ব্বাক লক্ষ্য করিল চতুর্দ্দিকে শ্যামলতার কোনও চিহ্ন নাই, আকাশে সূর্য্যও নাই, চন্দ্রও নাই, অন্ধকারও নাই। অদ্ভুত একটা স্বচ্ছ আলোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। আকাশ নির্ম্মেঘ, আকাশের বর্ণ নীল নহে, রক্তাভ। নিজেরই প্রচ্ছন্ন চৈতন্যলোকে চার্ব্বাক এই নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া বিস্ময়বোধ করিতেছিল। সে বাহ্যত অজ্ঞান হইয়া গেলেও অন্তরের অন্তরতম সত্তায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, তাহার অনুসন্ধিৎসু মন সন্ধান করিতেছিল এই রক্তাভ আলোকের উৎস কোথায়, সূর্য্যচন্দ্রহীন এই দেশের নামই বা কি। উপবিষ্ট ব্যক্তিটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চার্ব্বাক আরও বিস্ময় বোধ করিল। ইহা সজীব মনুষ্য না প্রস্তরমূর্ত্তি? এই অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি কোনও জীবন্ত মনুষ্যের হইতে পারে? কিন্তু কেশ চর্ম্ম দেখিলে জীবন্ত বলিয়াই তো ভ্রম হয়। চার্ব্বাকের ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিটি সহসা কথা কহিয়া উঠিল—"চার্ব্বাক, তোমারই অপেক্ষায় আমি বসে আছি এখানে। আমাকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে?"

চার্ব্বাক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল লোকটির নয়নযুগল হইতে অদ্ভুত একটা জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে।

"আপনি কে, আপনার পরিচয় দিন।"

"আমার নাম কৌতূহল। তোমারই কৌতূহল আমি, তোমারই প্রেরণায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' তোমার অপেক্ষায় বসে আছি"

"ও"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্ব্বাক নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করিল। তাহার নিজের প্রেরণা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছিল, তাহার নিজের কৌতূহল এখন আবার মূর্ত্তিমান হইয়া কথা কহিতেছে। চার্ব্বাকের আধিভৌতিক বুদ্ধির পক্ষে ব্যাপারটা একটু জটিল। কিন্তু জটিলতা দেখিয়া ভীত হইবার চরিত্র চার্ব্বাকের নয়। বরং জটিলতাকে সরল করিবার প্রবৃত্তিই তাহাকে চিরকাল প্রবুদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং সে সপ্রতিভভাবেই বলিল, "ও, বুঝেছি। কিন্তু এ কোন দেশে আমরা এসেছি বল তো। এখানে সূর্য্যচন্দ্র নেই কিন্তু আলো আছে। আকাশের রং নীল নয়, রক্তাভ—"

"এর নাম সন্ধানলোক। তোমারই জন্য এ লোক তুমি নিজেই সৃষ্টি করেছ। এর কোনও ভৌগলিক অস্তিত্ব নেই। তুমি যে আলোকে সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে চাইছ তা চিরপ্রচলিত সূর্য্যচন্দ্রের আলোক নয়, তা তোমারই প্রতিভার আলো। তুমি বিভিন্ন, তুমি স্বতন্ত্র, তাই তোমার আকাশের রং নীল নয়, রক্তাভ। হয় তো তা পীতাভ, শ্যামল বা বেগুনিও হতে পারত, কিন্তু নীল কখনও হবে না। এই সন্ধানলোকে তোমারই জন্য আমি সংবাদ সংগ্রহ করে' অপেক্ষা করছি"

"কি সংবাদ"

"মৃতদেহটি নদীর পরপারে আছে এবং তারই মধ্যে নিহিত আছে সৃষ্টিতত্ত্ব। পিতামহ ব্রহ্মার কিছু খবর ওইখানেই পাওয়া যাবে। শুনেছি তাঁর সৃষ্টির কারখানাও ওই শবদেহের ভিতর আছে। তিনি নিজেও হয় তো আছেন"

চার্ব্বাক প্রশ্ন করিল—"নদীটি কত দূরে—"

"নদীটিই সমস্যা। ভাল করে' চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবে বিরাটকায় শবদেহটি দূর প্রান্তরে শায়িত রয়েছে। দূরদিগন্তে ওটি পর্ব্বত নয় ওটি শবের মুণ্ড। কিন্তু ওই শবদেহের সমীপবর্তী হতে চেষ্টা করলেই—এক দুকূল-প্লাবিনী নদী কোথা হতে আবির্ভূত হচ্ছে সহসা। তুমি চেষ্টা করে' দেখতে পার"

চার্ব্বাক অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেই যাহা আপাত-দৃষ্টিতে কঠিন প্রান্তরভূমি ছিল তাহা তরল তরঙ্গিণীতে রূপান্তরিত হইল। ক্রমশ তাহার তরঙ্গমালা আলোড়িত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন কোনও অদৃশ্য ঝটিকা-বেগে এই সহসা-আবির্ভূতা স্রোতোস্বিনী বিক্ষুব্ধ হইতেছে। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তি এই মায়াবিনী নদীতে অবতরণ করিতে ইতস্ততঃ করিত কিন্তু চার্ব্বাক অসাধারণ প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তি, সে বিনা দ্বিধায় নদীতে নামিয়া পড়িল। সে ভাবিল ইহা যদি তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হয় স্পর্শশক্তি সে ভ্রম অপনোদন করিবে, আর ইহা যদি সত্যই নদী হয় তাহা হইলে সন্তরণ করিয়া নদীপারে যাওয়া অসম্ভব হইবে না। সন্তরণ করিয়া বহুবার বহু দুস্তর নদী সে অতিক্রম করিয়াছে। নদীতে নামিবামাত্রই কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। নদীর তরঙ্গমালা যেন রমণীর বাহুপাশের মতো তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, নদীর কলধ্বনি আকুল প্রণয় নিবেদন করিল। চার্ব্বাক সবিস্ময়ে স্মরণ করিল—নদী মানবীর মতো কথা বলিতেছে।

"চার্ব্বাক আমি নদী নই। তুমি অবগাহন করবে বলে' আমি নদীরূপ ধারণ করেছি। তোমারই সৃষ্ট এই উষর সন্ধানলোকে অপেক্ষা করে আছি তুমি আসবে বলে'। আমি জানতাম তুমি আসবেই"

"তুমি কে"

"তুমিই তো আমার নামকরণ করেছ যুগে যুগে! আমি কে তা তুমিই জান, আমি জানি না। আমার বাপমায়ের-দেওয়া একটা নাম ছিল বটে, প্রত্যেকবার কিন্তু সে নাম কখনও মর্য্যাদা পায় নি তোমার কাছে। তপস্বী কচের নিকট তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল প্রণয়াতুরা দেবযানী। দেবযানী তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু দেবযানীর মধ্যে যে চিরন্তনী নারী ছিল সে তুচ্ছ হয় নি। তাকে তুমি কামনা করেছ বহুরূপে বহু নামে। অশরীরী আমাকে কেন্দ্র করে' তোমার কামনা যুগে যুগে অনেক রঙীন ফুল ফুটিয়েছে, কিন্তু যেই আমি শরীর ধারণ করে' ধরা দিয়েছি অমনি তোমার বিচক্ষণ বিশ্লেষণ আমাকে ম্লান করে' দিয়েছে, পড়া পুঁথির মতো তুচ্ছ হয়ে গেছি আমি দেখতে দেখতে। তাই আমি অশরীরী হয়েই অনুসরণ করছি তোমাকে। সুরঙ্গমার মধ্যে কিছুদিন আমি ভর করেছিলাম, কিন্তু আমাকে তুমি দেখেও দেখলে না। আমাকে দেখে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে, কিন্তু সুন্দরানন্দ যখন সুরঙ্গমাকে নিয়ে চলে গেল তখন তো তুমি বাধা দিলে না। তোমার অধ্যয়ন-স্পৃহা সুরঙ্গমার চেয়ে বড় হল তোমার কাছে। সুরঙ্গমার চোখের ভিতর দিয়ে আমি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম তোমার দিকে। কিন্তু তুমি তখন সামান্য একটা পতঙ্গের গতিবিধি নিয়ে এমন তন্ময় হয়েছিলে যে আমার দিকে ফিরেও তাকালে না একবার!"

নদীর অসংখ্য তরঙ্গ চার্ব্বাককে ঘিরিয়া উদ্দাম হইয়া উঠিল।

বিপন্ন হইলে চার্ব্বাকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তীক্ষ্ণতর হইয়া ওঠে, চার্ব্বাক প্রশ্ন করিল, "তোমার কথাই যদি সত্য হয়, আমি সত্যই যদি তোমাকে চিরকাল অবহেলা করে' থাকি, তাহলে আবার তুমি আমার কাছে এসেছ কেন?"

"তোমাকে বা তোমার কৌতূহলকে ওই শবের কাছে আমি কিছুতেই যেতে দেব না"

"কেন"

নদী কোন উত্তর দিল না, কেবল তাহার কলধ্বনিতে অভিমান-আবদার অনুরোধ-অনুনয়ের সুর ফুটিয়া উঠিল। চার্ব্বাকের মনে হইল একটা অস্ফুট রোদন-ধ্বনিও যেন শুনা যাইতেছে। সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল তাহার বিরাট কৌতূহল বিরাটতর হইয়াছে। তাহার সহিত চোখো-চোখি হইবামাত্র কৌতূহল কহিল, "তপস্যা আরম্ভ কর। একনিষ্ঠ তপস্যা ভিন্ন এই কুহকিনীর মায়াজাল ছিন্ন করা যাবে না—"

"তপস্যা? এ অবস্থায় তপস্যা করা কি সম্ভব? অনুকূল পরিবেশ না হলে আমি একাগ্র হতে পারি না"

"তা আমি জানি। কিন্তু এখন যদি তুমি অনুকূল পরিবেশের প্রত্যাশায় তপস্যা স্থগিত রাখ, নদীর স্রোত তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ওই শোন—"

নদীর কলধ্বনি আবার মানবীয় ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল।

"চার্ব্বাক, যুক্তিমার্গের কঙ্করে কণ্টকে জন্মজন্মান্তর ক্ষতবিক্ষত হয়েছ তুমি। তোমার বুদ্ধি তোমার কৌতূহল সত্য অনুসন্ধানের ছুতোয় তোমাকে ক্রমাগত বিপথে নিয়ে গেছে। অমৃতের সন্ধানে তুমি যাত্রা করেছ বিষবৃক্ষের অভিমুখে। শিথিলাঙ্গ হয়ে আমার তরঙ্গলীলায় আত্মসমর্পণ কর, তোমাকে আমি অমৃত সাগরে নিয়ে যাব। তোমার মনে পড়ে কি বিশ্বামিত্ররূপে তুমি যখন পুষ্করতীর্থে কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলে, মেনকারূপে আমিই তোমাকে সে কঠোরতা থেকে রক্ষা করেছিলাম? আমার সঙ্গে যে দশ বর্ষ তুমি যাপন করেছিলে তাতে কি অমৃতের আভাস পাও নি? শকুন্তলাকে আমি কেন ত্যাগ করেছিলাম জান? তুমি আমাকে ত্যাগ করেছিলে বলে'। একটা কথা কিন্তু তুমি জান না, শকুন্তলাকে আমি ত্যাগ করি নি, ত্যাগ করবার ভাণ করেছিলাম। যে শকুন্ত তাকে লালন করেছিল সে অন্য কেউ নয়, রূপান্তরিত মেনকাই। আমাকে তুমি অনেক কষ্ট দিয়েছ, নিজেও অনেক কষ্ট পেয়েছ। আর বিপথে যেও না। তুমি কোথায় যেতে চাও বল, আমি সেইখানেই তোমাকে নিয়ে যাব—"

"আমি পিতামহকে চাক্ষুষ করতে চাই"

"তার জন্য তো কোথাও যেতে হবে না। তিনি তো সর্ব্বত্র বিরাজমান, ভাল করে' চেয়ে দেখলেই তাঁকে দেখতে পাবে"

"আমি দেখতে পাচ্ছি না"

"হঠাৎ পিতামহকে দেখবার বাসনা হল কেন তোমার। পিতামহকে তুমি তো কোনদিন কামনা কর নি, কামনা করেছ আমাকে। আমাকে লাভ করবার জন্যই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তুমি তপস্যা করেছ, যুদ্ধ করেছ। গাধিনন্দন তুমি বিশ্বামিত্র হয়েছিলে আমার জন্য, পিতামহের জন্য নয়। আমিই কামধেনু শবলা, আমাকেই তুমি চেয়েছ চিরকাল, আজ হঠাৎ পিতামহকে কামনা করছ কেন, এ প্রচেষ্টা তো স্বাভাবিক নয় তোমার পক্ষে"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্ব্বাক কহিল, "মায়াবিনি, জন্মজন্মান্তরের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে' তুমি আমাকে যা বলতে চাইছ তা আমার সহজবুদ্ধির কাছে প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে। তোমার এই বিস্ময়কর আবির্ভাবও মনে হচ্ছে স্বপ্নবৎ। আমি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি তা-ও বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে—আমার মস্তিষ্ক হয়তো সুস্থ নয়, বিকারের ঘোরে হয়তো আমি অলীক বস্তু প্রত্যক্ষ করছি। একটি বিষয়ে কিন্তু আমি স্থির-প্রতিজ্ঞ; সৃষ্টিতত্ত্ব আমাকে উদ্‌ঘাটন করতেই হবে, পিতামহ নামক পৌরাণিক উপকথাকে আমি সত্যের আলোকে ছিন্নভিন্ন করে' দেখতে চাই। তুমি যেই হও, তোমাকে অনুরোধ করছি আমার এ প্রেরণাকে মর্য্যাদা দাও, আমার অনুসন্ধানের পথে বাধাসৃষ্টি কোরো না"

নদীর অসংখ্য তরঙ্গ কলহাস্যমুখরিত হইয়া উঠিল।

"আমি জানি তোমার নবতম প্রেরণাটি সুন্দরী। সে সুন্দরী বলেই তার নির্দেশ তোমার কাছে সত্য বলে' মনে হয়েছে। তুমি ভুলে গেছ যে সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের অজুহাতে তুমি একটি রূপসী যুবতীরই মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাচ্ছ। তোমার প্রকৃতি একটুও পরিবর্ত্তিত হয় নি চার্ব্বাক। তুমি নিত্য নব নব ঘৃত পান করবার জন্য নিত্য নব নব ঋণজালে জড়িত হচ্ছ। আমি চিনি তোমাকে, আমাকে তুমি ঠকাতে পারবে না। এখনও আমার কথা শোন, ওই শবদেহের সমীপবর্ত্তী হবার চেষ্টা কোরো না—ওতে আনন্দ নেই, আমার তরঙ্গ দোলায় অঙ্গ বিস্তার করে' দেখ কি আনন্দ।"

চার্ব্বাক ঘাড় ফিরাইয়া কৌতূহলের দিকে চাহিল।

কৌতূহল বলিল, "আর বিলম্ব কোরো না, তপস্যা শুরু কর"

চার্ব্বাক তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিল।

চার্ব্বাকের ধ্যান যতই গভীর হইতে লাগিল, কৌতূহলের দেহ-আয়তন ততই কমিতে লাগিল। কমিতে কমিতে ক্রমশ তাহা বিলীন হইয়া গেল। তরঙ্গিনীও মরীচিকাবৎ অদৃশ্য হইল। (ক্রমশঃ)

পশ্চিমবাংলার গ্রাম

শ্রীরমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ইংরেজ চলে গেছে ; ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। কিন্তু শুধু রাষ্ট্র স্বাধীনতাই চরম উদ্দেশ্য নয় ; চরম উদ্দেশ্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবাসীর উন্নতি। এ উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র স্বাধীনতা সহায়ক মাত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যদি আজ কেহ কেহ মনে করে থাকেন, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে তাঁদেরও কাজ শেষ হয়ে গেছে, তবে দেশের নিতান্তই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। ইংরেজ চলে যাওয়াই তো আমাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদের উন্নতির পথে ইংরেজ ছিল অন্তরায় ; সে অন্তরায়কে দূর করতে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরায় দূর হলেই তো দেশ উন্নত হয়ে উঠলো না। ব্যাপারটা কতকটা এই রকম—আমরা চাচ্ছি আমাদের জায়গায় আমাদের উপযোগী করে একটি বাড়ি তৈরী করতে। বর্ত্তমানে সেখানে রয়েছে এমন একটি বাড়ি যেখানে আমাদের সব রকমের অসুবিধা, আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হবে এ বাড়িটা ভেঙ্গে ফেলা ; তার পর সে জায়গায় মনের মতন করে বাড়ি তৈরী করা। কিন্তু পুরান বাড়িটা ভেঙ্গে ফেল্লেই তো আর নূতন বাড়ি গড়ে উঠলো না। যে পুরান বাড়িটা অন্তরায় ছিল সে বৃটিশ সাম্রাজ্য অবশ্য ধ্বংস করা হয়েছে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আছি ধ্বংসস্তূপের ওপর ; স্বাধীন ভারত তৈরী হয় নি।

ইংরেজকেই যদি তাড়ান সম্ভবপর হ'ল, তবে কি আর দেশকে উন্নত করা সম্ভবপর হবে না—এ ধরণের কথা অনেকেই অনেক সময় বলে থাকেন। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না জনসাধারণের ভেতর ধ্বংস-কাজে যতটা মোহ, যতটা মাদকতা, যতটা উৎসাহ—সংগঠন কাজে ততটা নেই। রাস্তায় গাড়ি পোড়াবার দরকার হলে কোত্থেকে কে এসে যে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, টেরও পাওয়া যায় না ; কিন্তু রাস্তায় গাড়ি বিগড়ে গেলে শত অনুনয় বিনয় করলেও কেউ বড় এগিয়ে আসে না সাহায্য করতে। পরাধীনতা সংগ্রামে যে শক্তি নিয়োজিত করতে হয়েছিল তার চেয়েও ঢের বেশী শক্তি আজ নিয়োজিত করতে হবে সংগঠন কাজে। তা না হলে স্বাধীনতা পেয়েও এ দেশ কখনও আদর্শ স্বাধীন দেশের সমকক্ষ হতে পারবে না।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ সহরেই লোকসংখ্যা অনেকটা বেড়ে গেছে এবং নূতন নূতন সহরও গড়ে উঠছে সহরের নানা রকম সুবিধা নিয়ে। কিন্তু তবুও আমাদের দেশ বলতে গ্রামের ছবিই চোখে ভাসে ; এখনও অন্তত শতকরা ৮০ জন লোকই গ্রামে বাস করে। এদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হলে গ্রামকেই উন্নত করতে হবে। এদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নতি কোন দিনই সম্ভবপর হবে না।

আজ আমাদের গ্রামগুলির যে অবস্থা তা তো কারুরই অজানা নেই। কিন্তু এমন তো চিরদিন ছিল না। এমন একদিন ছিল যখন বাংলার গ্রামে স্বাস্থ্য ছিল—ধন ছিল—মান ছিল। কি করে গ্রামগুলির ভাঙন ধরলো ?

অতীতে পল্লী সমাজ গড়ে উঠেছিল পঞ্চায়েতি শাসন অবলম্বন করে। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে গ্রামের সবার স্বার্থরক্ষা করাই ছিল পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য। সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক—সব ব্যাপারেই পঞ্চায়েতের শাসন গ্রামবাসীরা মাথা পেতে নিত। গ্রামের সবাইকে এক সূত্রে বেঁধে রাখতো এই পঞ্চায়েতি শাসন। এই পঞ্চায়েতি প্রথা লোপ পাওয়াতে আজ গ্রামের সবাই প্রধান, সবাই মোড়ল, সবাই "গাঁ না মানে আপনি মোড়ল" হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমবেত প্রচেষ্টায় আজ কোন কিছু হবারই যো নেই।

বর্ত্তমানে ভারতের সর্বত্রই চেষ্টা চলছে এই লুপ্ত পঞ্চায়েতি শাসনকে আবার জাগিয়ে তোলবার সমবেত প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে আবার গ্রামের শ্রী, সুখ ও সম্পদ ফিরিয়ে আনবার। অবশ্য বর্ত্তমান ও অতীতের পঞ্চায়েতি শাসনে অনেকটা প্রভেদ থাকবে—অতীতের পঞ্চায়েতি শাসনের পেছনে ছিল সমাজশক্তি, বর্ত্তমান পঞ্চায়েতি শাসনের পেছনে থাকবে রাষ্ট্র-শক্তি। তবুও উদ্দেশ্য একই গ্রামবাসী সবার শক্তি একত্রীভূত করে গ্রাম ও গ্রামবাসীর উন্নতি কল্পে তা প্রয়োগ করা এবং যদি কেউ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তবে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা।

এক উত্তর প্রদেশেই আজ ৩৬০০০ পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ ; সুতরাং গড়ে প্রতি ১৫০০ লোকের জন্যই স্বতন্ত্র পঞ্চায়েতি শাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। অদ্ভুত জাগরণ হয়েছে এই পঞ্চায়েত গঠনের ফলে। বিদেশী শাসনের ফলে গ্রামের প্রাণশক্তি শুকিয়ে গিয়েছিল ; আজ তা সজীব হয়ে উঠেছে। গ্রামবাসীরা যেন নূতন প্রাণ, নূতন আলো পেয়েছে। আজ তারা বুঝতে পেরেছে শুধু হুকুম তামিল করবার জন্যই তাদের জন্ম নয় ; তারা তাদের নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্তা। তাদের নবপ্রস্ফুটিত জীবনীশক্তির বিকাশ দেখা যাবে সর্বত্র সমবেত সংকীর্তনে, ক্রীড়া প্রদর্শনীতে, রাস্তা নির্মাণে, পুষ্করিণী খননে। জীবনীশক্তির এই বিকাশ দেখে আনন্দ হ'ল ; দুঃখ হল পশ্চিমবাংলার গ্রামের কথা ভেবে। আমাদের প্রায় গ্রামেই দেখা যাবে ঘরের চালা খসে পড়েছে, বাড়ির সামনে জঙ্গল, পুকুরটি হয় শুকিয়ে গেছে—নয় কচুরি পানায় ভর্তি হয়ে আছে ; রাস্তা নেই—থাকলেও ভেঙ্গে পড়েছে। কারো কোন দিকেই যেন নজর নেই; কোন রকমে দিন চলে গেলেই হল এই ভাব। গ্রামের প্রাণশক্তি যেন একবারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে। অবশ্য গত কয়েক বছর ধরে বাংলার উপর দিয়ে যে প্রবল দুঃখের বন্যা বয়ে যাচ্ছে তার কোন তুলনা নেই ; তবুও যেন এই কথাই মনে হয়—এত দুঃখ পেয়েও যদি আমরা দুঃখ মোচনের জন্য

সচেষ্ট না হই তবে মানুষ তো দূরের কথা, ভগবানই কি আমাদের ক্ষমা করবেন ?

পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় গ্লানি পরনির্ভরতা—নিজের ওপর বিশ্বাস, নিজের ওপর নির্ভর করার শক্তি হারিয়ে ফেলা। শুধু বিদেশীর ওপর নির্ভর করাই পরনির্ভরতা নয় ; কোন কিছুর জন্য আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশী ও আর দশজনের ওপর নির্ভর করা ও পরনির্ভরতা। স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ অবদান আত্মনির্ভরতা। নিজের পায় নিজে দাঁড়াবার শক্তি আজ গ্রামবাসীরা হারিয়ে ফেলেছে ; সে বিলুপ্ত শক্তি আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু এ দায়িত্ব শুধ গ্রামবাসীদের ওপরই ছেড়ে দিলে হবে না ; সহরবাসীদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

গ্রামের উন্নতির কোন পরিকল্পনাই সফল হবে না—যে পর্যন্ত সহরবাসীর মনোবৃত্তির পরিবর্তন না ঘটে। কর্মকে কেন্দ্র করেই সহর গড়ে উঠেছিল মানুষের কর্মস্থল হিসেবে ; বাসভবন হিসেবে নয়। বাসভবন মানুষের চিরদিনই পল্লীগ্রামে ; দেশবাসী বলতে বোঝায় 'পল্লীবাসী'—সহরবাসী নয় ; সহর যখন প্রথম গড়ে উঠেছিল শুধু কর্মস্থল হিসেবে, মানুষ এখানে আসতো দৈনন্দিন কাজ ও অর্থ উপার্জন করতে। উদ্দেশ্য ছিল গ্রামে গিয়ে সে অর্থ দিয়ে নিজের গ্রাম, নিজের বাড়ি সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে গড়ে তোলা। সহর ও গ্রামের মধ্যে এমন একটা যোগাযোগ ছিল—যেমন সদর ও অন্দর বাড়ি। কিন্তু সহরের নেশা ক্রমে যখন মানুষকে পেয়ে বসলো, নিজের গ্রাম ছেড়ে তারা আশ্রয় নিল সহরে। নিজের গ্রামকে রিক্ত করে তারা বদ্ধপরিকর হল সহরকে সমৃদ্ধশালী করতে, বড় সহর আরও বড় হয়ে উঠলো ; গরীব গ্রাম আরও গরীব হয়ে পড়লো। গ্রামের অস্তিত্বের প্রয়োজন হল শুধু খাদ্যসরবরাহ করে সহরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। গ্রাম ও সহরের মধ্যে আর যোগাযোগ রইল না ; শুধু তাই নয়, গ্রাম হয়ে উঠলো সহরের অবজ্ঞা ও কৃপার পাত্র। গ্রামের সব কিছুই সহরের কাছে 'গ্রাম্য' হয়ে দাঁড়ান। দেশবাসার এক অদ্ভুত রুগ্ন বিকৃতি ফুটলো—সহরের কৃত্রিমতার ওপর অসীম শ্রদ্ধা, গ্রামের অকৃত্রিমতার ওপর বিশেষ অবজ্ঞা। এ মনোভাব আজও দূর হয় নি, আজও আমরা দেখতে পাই—কারখানার বদ্ধ ঘরে যে শ্রমিক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করে, সে তার আত্মীয় স্বজনের কাছে যতটা পদমর্যাদা লাভ করে থাকে, মুক্ত আকাশের নীচে খোলা হাওয়া বাতাসে যে কৃষক জমি চাষ করে সে তা কখনও লাভ করে না। নিকটে পুকুর থাকলেও আমরা স্নান করতে ভালবাসি বদ্ধ স্নানাগারে ; বাজারে তাজা ফল পাওয়া গেলেও আত্মশ্লাঘা অনুভব করি টিনের সংরক্ষিত ফল কিনে খেয়ে, ঘরে আলোবাতাস এলেও কাজ করতে চাই জানালা বন্ধ করে বাতি জ্বেলে।

সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমৃদ্ধি আজ সবই সহরে ; গ্রামকে আঁকড়ে রয়েছে শুধু দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার। নিজের পায় দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি সাধন করবার মতন শক্তি আজ আর গ্রামবাসীদের নেই। সে জন্য অনেকটা দায়ী সহরবাসী। তাই গ্রামের উন্নতির ভার গ্রামবাসীদের দায়িত্ব বলে ছেড়ে দিয়ে সহরবাসীদের নিশ্চেষ্ট থাকা চলবে না। তাঁদেরই এগিয়ে আসতে হবে গ্রামের শ্রী আবার ফিরিয়ে আনতে। গ্রামকে নিঃশেষ করে সহরের যে শিক্ষা ও সমৃদ্ধি গড়ে উঠেছে, আজ তারই কিছুটা অংশ বিলিয়ে দিতে হবে গ্রামে গিয়ে সহরবাসীদের নিজ হাতে।

সহরের লোক গ্রামে আনাগোনা করতে আরম্ভ করলেই গ্রামের চেহারা ফিরে যায়। অনেকেই এক সহর হতে অন্য সহরে যান বায়ুপরিবর্তন বা বিশ্রাম লাভের জন্য, স্বাস্থ্যকর গ্রাম হলেও সেখানে বড় যান না। সহরের শিক্ষিত লোক মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে বাস করলে তাদেরও বিশ্রাম লাভ হয়, গ্রামবাসীদেরও অনেক কিছু জানবার ও শোনবার সুযোগ হয় ; অবশ্য সহর থেকে গিয়ে তারা যদি সব সময়ই তাদের দূরত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট না হন। কলিকাতা সহরে অসংখ্য অবসরপ্রাপ্ত সরকারী বেসরকারী কর্মচারী বাড়ি করে বা বাড়ি ভাড়া করে বাস করছেন। এত বড় সহরকে দেবার মতন তাদের কিছুই নেই, আর এখানে তাদের বিশেষ কোন প্রতিপত্তিও নেই। এরা যদি গ্রামে গিয়ে বাস করতেন, প্রত্যেকেই এক একটি গ্রামকে অনেকটা উন্নত করে তুলতে পারতেন। গ্রামকে দেবার মতন তাদের যথেষ্ট রয়েছে, আর থাকতেনও তারা এর চেয়ে ঢের বেশী মান সম্ভ্রম নিয়ে।

গ্রামের উন্নতির অভিযান আজ সহরেও সুরু করতে হবে—সাহিত্য, সংবাদপত্র, মাসিক পত্র, চলচ্চিত্র, বেতার ও সভাসমিতির সাহায্যে। আত্ম উন্নতি যে দরকার সে চেতনাও আজ হারিয়ে ফেলেছে গ্রামবাসী ; সহরবাসীকেই সে চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে।

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

'শেষপ্রশ্ন' শরৎচন্দ্রের একখানি সমস্যাবহুল উপন্যাস। জন্মগতসূত্রে সংস্কারবশে মানুষ যে আদর্শ ও ধারণার দাসত্ব করিয়া থাকে, অন্ধের মত যাহার নিকট নতিস্বীকার করে, কিন্তু আপনার অন্তর দিয়া যাহার সত্যাসত্য বিচার করিয়া দেখে না—"শেষপ্রশ্নে" তাহারই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে।

প্রচারমূলক সাহিত্য হিসাবে ইহাতে কাহিনীর ভাগ গৌণ—যুক্তি-তর্কই ইহার প্রধান উপজীব্য। বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করিবার জন্য ঘটনার যতটুকু সংকোচন এবং প্রসারণ একান্তভাবে আবশ্যক, কাহিনীকে লইয়া মাত্র ততটুকুই নাড়া চাড়া করা হইয়াছে যেন নিক্তির মাপে ওজন করিয়া, তাহার অধিক নহে। কাহিনীর মাধ্যমে মতবাদ প্রচারের প্রধান অসুবিধা এই যে, এইরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলেই ঘটনা আড়ষ্ট, বিসদৃশ, এমন কি আকর্ষণবিহীন হইয়া পড়ে। যুক্তি-তর্কের প্রাবল্য আখ্যানভাগকে খর্ব করিয়া রস নষ্ট করিয়া দেয়। ঘটনাও অনেক সময় অতিশয় অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ইহার ফলে প্রচারের উদ্দেশ্য হয় তো সিদ্ধ হয়, কিন্তু আর্টকে করা হয় হত্যা। একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে এইরূপ বিষয়বস্তুকে যে স্বচ্ছন্দগতি দান করা যায়, কাহিনীর সাহায্যে তাহাকে রূপদান করিতে গিয়া লেখককে বহু অসুবিধারই সম্মুখীন হইতে হয়। অবশ্য কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণে লেখকের একটা মস্তবড় সুবিধা এই থাকে যে, বক্তব্য বিষয়ের অনুসারী করিয়া ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রধাবিত করিবার সুযোগ থাকায় স্থূল দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা পাঠককে সহজেই বুঝান যায় এবং পাঠকের চিত্তের উপর একটা কার্যকরী অভিপ্রেত প্রভাবও বিস্তার করা সহজ হয়।

শিবনাথ, কমল আর অজিতের কাহিনী উপন্যাসখানির প্রধান বিষয়বস্তু। শিবনাথ ও কমলের কাহিনী আখ্যানভাগের একটা দিক—অপর দিকটা হইল অজিত ও কমলের কাহিনী। শিবনাথ যেন সমস্যা, আর অজিত যেন অনেকটা তাহার সমাধান। আশুবাবু সকল কিছুর কেন্দ্রে। আগ্রায় আশুবাবুর কিছুদিনের জন্য বায়ু পরিবর্তন উপলক্ষে আগমনে কাহিনীর আরম্ভ এবং কয়েক মাস পরে তাঁহার আগ্রা ত্যাগের আসন্ন মুহূর্তে উহার পরিসমাপ্তি। সময়ের প্রসার অল্প—কিন্তু পরিবর্তনের ব্যাপ্তি বিপুল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই শরৎচন্দ্র তাঁহার দীর্ঘ ও জটিল বক্তব্যকে শেষ করিয়াছেন। আগ্রায় আশুবাবুর পদার্পণের সংগে সংগেই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি নর নারী ভিড় জমাইয়াছে এবং আপন আপন অংশ গ্রহণ করিয়া কাহিনীকে পরিণতির পথে লইয়া গিয়াছে।

"শেষপ্রশ্ন" উপন্যাসের একটি প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, চরিত্রগুলির কোনটির মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বের বালাই নাই। পরস্পর বিপরীত-মুখী ভাবের দ্বৈত অস্তিত্ব কাহারও মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় না। তাহার ফলে চরিত্রগুলিকে আপন আপন অভিমত প্রতিষ্ঠিত করিতে বেশি রকমে যুক্তি তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলেও অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হইতে হয় নাই। কাহারও চরিত্রেই জটিলতা নাই, প্রত্যেকেই যেন স্বল্প-বিস্তর স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্য নিরপেক্ষ, সহজ ও সরল—এক একটি ভাবধারা, আদর্শ অথবা ধারণার প্রতীক। প্রত্যেকেই আপন আপন গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই দিক দিয়া বিচার করিলে চরিত্রগুলিকে যেন অনেকটা Epic ধর্মী বলিয়া মনে হয়—তেমনই সরল, তেমনই উন্নত, তেমনই স্পষ্ট—একটি চরিত্রের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ভাবের পরিস্ফুটনই যাহার প্রধান লক্ষ্য, পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব যেখানে কোনও বৈপরীত্য বা জটিলতা সৃষ্টি করিতে পারে না। সমগ্র উপন্যাসখানির মধ্যে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতও বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না—মত ও আদর্শের সংঘর্ষই এখানে প্রধান কথা। যে মতবাদটির প্রতিষ্ঠাকল্পে উপন্যাসটির রচনা, তাহাকে বিভিন্ন মতবাদ ও ভাবধারার সংঘাতের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা, পরিপুষ্টিলাভ ও প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যের পরিপূরণ কল্পে প্রয়োজন মত এক এক রকম মতবাদ ও ভাবধারার ধারক ও বাহক এক একটি বিশেষ চরিত্রের আমদানী করা হইয়াছে।

"শেষপ্রশ্ন" এর প্রধান চরিত্র কমল। কমল যেন জ্বলন্ত প্রশ্নশিখা। সমাজ, ধর্ম, লোকাচার ইত্যাদির অনুশাসন কমল মানিতে চায় না—কারণ কমলের মতে উহাতে কোন সত্য নাই। প্রাচীনত্ব এবং প্রচলিত বিধির ছাপ লইয়া ওহারা মানুষের মনের স্বচ্ছন্দ বিকাশ এবং সত্যোপলব্ধিতে বিঘ্নই সৃষ্টি করে মাত্র—মানুষের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কল্যাণের কোনটাই তাহারা সাধন করিতে পারে না। জগৎ পরিবর্তনশীল—বেদের বাণীর মত কোন কিছুই এখানে নিত্য, শাশ্বত এবং অপৌরুষেয় নয়। সমগ্র জগতে অবস্থাগত পরিবর্তনের সংগে সংগে আদর্শ ও সত্যেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে—সেই পরিবর্তনের উপযোগী করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লওয়াই জীবন-সত্য। এই সত্যকে অনুধাবন করিবার জন্য মানুষের মনকে বিচারশীল হইতে হয়—লোকাচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হয়। এ যুগে যাহা সত্য—অবস্থান্তরের সংগে সংগে পরবর্তী যুগে তাহা আর সত্য নাও থাকিতে পারে। নিত্য বস্তু বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব এ জগতে নাই।

ইহাই হইল কমলের সংক্ষিপ্ত জীবন-দর্শন। অতীতের স্মৃতিতে আত্মনিমজ্জনের মধ্যে কমল শুধু ভাবের আতিশয্যই দেখিতে পায়—তাহাতে গৌরবের কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না। তাহার গতিশীল সজীব মন ক্ষণিকের বিলীয়মান মুহূর্তগুলির মধ্যেই পরম সত্যের বিকাশ দেখিতে পায়। সম্মুখে সমাগত বর্তমানই একমাত্র তাহার নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ

সম্পদ—জীবনের চরম এবং পরম মুহূর্ত। বর্তমানের পাওয়াটাই তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া—অতীতের স্মৃতিতে বিভোর হইয়া থাকা তাহার নিকট জীবনের মৃত্যু অবস্থা। বিপত্নীক আশুবাবুর তাঁহার স্বর্গতা স্ত্রীর স্মৃতিকে বহন করিয়া চলা কমলের নিকট একেবারেই মূল্যহীন—উহা জরাগ্রস্ত জড়ধর্মী মনের বিকৃতি মাত্র। এই একই কারণে তাজমহলের স্রষ্টা সাজাহানের মধ্যেও সে পত্নীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হয় না। হরেন্দ্রের যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম—কমলের মতে তাহা নিরর্থক আত্ম-পীড়ন ও দারিদ্র্য অনুশীলনের প্রতিষ্ঠান মাত্র। জীবনকে পঙ্গু করিয়া দেওয়া ছাড়া উহার দ্বারা আর কোনও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। অনুষ্ঠানকে কমল বড় করিয়া দেখে না—পরিণতির দ্বারাও সে সকল কিছুর ভাল মন্দ বিচার করে না। অন্তর দিয়া সে সত্যকে সত্যকে স্বীকার করিতে চায়। লক্ষ্যের পরিবর্তে লক্ষ্য সাধনের উপায়টাই তাহার নিকট প্রধান হইয়া উঠে না।

সাধারণভাবে বিচার করিয়া দেখিলে কমলের এই মতবাদের সার-তত্ত্বটুকুকে একেবারে অস্বীকার করিতে না পারিলেও উহার অসংগতি এবং অসামঞ্জস্যও অল্প নহে। মানুষের চিরাচরিত সমাজবদ্ধতা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে সে যেন মূর্তিমান বিদ্রোহ—আকস্মিক কিন্তু দৃঢ়সংকল্প। নূতন সত্য, নূতন চিন্তার আলোকে সে যেন নূতন সমাজ গঠন করিতে চায়। কমলের যুক্তি-তর্কের মধ্যে যে সমস্যা উত্থাপিত হইয়াছে—তাহা সমাজ বা দেশবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। সে সমস্যা সর্বমানবীয়।

কমলের যুক্তি সহজ—সাবলীল এবং কতকটা আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অপরের উপর তাহা অমোঘ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। তাহার নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া যেন কাহারও গত্যন্তর নাই। নিজের বিশ্বাস সম্বন্ধে কমল এতখানি নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিয়াছে বলিয়াই আরও অনেককেই তাহার মতবাদ স্বীকারে বাধ্য করিতে পারিয়াছে। প্রচলিত সকল কিছু ভাবধারার বিরুদ্ধেই যেন কমল তাহার প্রতিবাদের খড়্গ উত্তোলন করিয়া আছে। অপরের মতবাদকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার প্রবণতা তাহার মধ্যে যেন সর্বদাই কার্যকরী।

কিন্তু কমলের যুক্তি তর্কের মধ্যেও ফাঁক আছে, তাহা অকাট্য নহে। অপরূপ রূপলাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা কমলের উদ্‌ঘাটিত সত্য বিকৃতদর্শন সক্রেটিস এর উদ্‌ঘাটিত সত্য নহে। এমন কি, রূপ ও যৌবনের পুঁজি যদি না থাকিত, তাহা হইলে সারবত্তা থাকা সত্ত্বেও কেহ তাহার কথায় এতখানি গুরুত্ব আরোপ করিত কি না সন্দেহের বিষয়। কমল তাহার পিতার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং সে কথা সে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত প্রচার করে। কমলের পিতা একজন ইউরোপীয়ান এবং মাতা এদেশীয় এক অসচ্চরিত্রা নারী। আসামের চা-বাগানে তাহার জন্ম এবং তাহার শৈশবকাল সেইখানেই অতিবাহিত হয়; সুতরাং দেখা যায় যে, এক অসম এবং অসামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে কমলের জন্ম হইয়াছে। এরূপ পিতার পাণ্ডিত্য যতই কেন থাকিয়া থাকুক না—তাঁহার নৈতিক চরিত্র যে খুব উচ্চস্তরের ছিল, একথা কেহই স্বীকার করিবে না। তাঁহার মত পিতার পক্ষে কন্যার মনে ক্ষণিকের আনন্দ ও সত্যটুকুই যে জীবনের পরম সম্পদ—এই রকমের একটা ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। সেই প্রেরণায় কমল নিজেও চলিয়াছে। প্রথমে যে একজন অসমীয়া খ্রীশ্চানের সহিত তাহার বিবাহ হয়, তাহার মৃত্যুর পর শিবনাথকে সে বিবাহ করে। বিবাহ হয় শৈব মতে। এই বিবাহের মধ্যে যে ফাঁকি রহিয়া গেল, একথা অনেকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও কমল তাহা গ্রাহ্য করে নাই। কারণ বিবাহের অনুষ্ঠানটাকে কমল বড় করিয়া দেখে নাই—মনের মিলনটাই তাহার নিকট আসল বিবেচ্য। মনই যেখানে দেউলিয়া হইয়া গেল, সেখানে বাহ্যিক অনুষ্ঠান এবং আইনের নাগপাশে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কমলের মতে বিড়ম্বনা এবং আত্মাবমাননা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কমল তাহার যুক্তিকে কোনও অবস্থাতেই ত্যাগ করে নাই। শিবনাথ সত্য সত্যই যখন প্রতারণা করিয়া কমলকে ত্যাগ করিল, কমল তাহার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও উত্থাপন করিল না। জীবনের একটা সহজ সত্য বা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনারূপেই এই ব্যাপারকে সে স্বীকার করিয়া লইল। শিবনাথ-কমলের সম্পর্ক কমলের যুক্তির একটা দিকের সততা কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াছে।

ইহার পর গড়িয়া উঠিয়াছে অজিত কমলের কাহিনী। অজিতের সহিত শেষ পর্যন্ত কমল মিলিত হইয়াছে। কমল যেন অসাধারণ বেগসম্পন্ন খরস্রোতা নদী—একদিকে ভাঙিয়া পড়া তটের ক্ষতিকে অপর দিকে নূতন গড়িয়া তোলা তটের সমৃদ্ধি দিয়া পূর্ণ করিয়া লয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, নিঃসন্তানা কমলের পক্ষে আপন যুক্তি অনুযায়ী কাজ করা যত সহজে সম্ভব হইয়াছে—বাস্তব জগতে সন্তানবতী নারী, এমন কি নিঃসন্তানা নারীর পক্ষেও তাহা করা সত্য সত্যই সম্ভব এবং সহজ কি না? সম্ভব হইলেও সমাজ-শৃংখলা, সমাজ-বিজ্ঞান এবং জীব বিজ্ঞানের বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা উপরোক্তরূপ কার্যকলাপ সমর্থিত হয় কিনা? এ একটা এমন ধরণের অপরীক্ষিত সমস্যা যে সে সমস্যার সমাধান কমল করিতে পারে নাই। এক্ষেত্রে কমলের যুক্তিকে অনেকটা Epicurean বা চার্বাকীয় বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু যাহা ব্যক্তিগতভাবে কল্যাণপ্রদ—সমষ্টিগতভাবেও তাহাকে অবশ্যই শুভ হইতে হইবে। উহা অস্বীকার করিলে মানুষকে পুনর্বার সেই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক আদিম ও বিশৃংখল সমাজ-স্তরে ফিরিয়া যাইতে হয়। পুনঃ পুনঃ স্বামী পরিবর্তন করিয়া একজন মহিলার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাও বজায় থাকে কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

কমল তর্ক-যুদ্ধে সুনিপুণা, বিশ্লেষণ করিবার শক্তিও তাহার অসাধারণ। কিন্তু জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তর্ক ও বিশ্লেষণপটু স্বামী-স্ত্রী কতখানি সুখ সঞ্চয় করিতে পারে, তাহাও সন্দেহের বিষয়। অবশ্য কমলের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার প্রয়াস না করিয়া শুধু আদর্শ হিসাবে হয় তো নেহাৎ মন্দ নাও লাগিতে পারে; কিন্তু একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত তীক্ষ্ণধী—এত সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্না হওয়া সত্ত্বেও কমল কি করিয়া শিবনাথের মত একজন অর্থগৃধ্নু, মদ্যপ ও অসদাচারীর সহিত মিলিত হইয়াছিল! উভয়ের বিচ্ছেদ সমাপ্ত হইবার পর শিবনাথের বিরুদ্ধে কোনও নালিশ কমলের না থাকিতে পারে, কিন্তু সকল কিছু জানিবার পরও শিবনাথের প্রতি তাহার মমত্ব আর কি করিয়া বজায় রাখা

সম্ভব হয়, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ইহাও কি এক ধরনের অতীতের স্মৃতি-পূজা নহে?

এক ধরনের নিষ্ঠা, নিয়মন বা সংযম ব্যতীত যে জীবনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা কমলকেও পরোক্ষে স্বীকার করিতে হইয়াছে। হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের মধ্যে সে নিষ্ফল দারিদ্র্য চর্চা ছাড়া আর কিছু দেখে নাই, বিপত্নীক আশুবাবুর পুনরায় দারপরিগ্রহ না করিয়া মৃতা স্ত্রীর স্মৃতিতে বিভোর হইয়া থাকা তাহার নিকট কেবলমাত্র জরাগ্রস্ত মনেরই পরিচয় বহন করিয়াছে, নিষ্ঠাবতী বালবিধবা নীলিমার পুনরায় বিবাহ না করিয়া পরের গৃহের কৃত্রিম গৃহিণী ও পরের সন্তানের কৃত্রিম জননী সাজিয়া থাকা তাহার নিকট জীবনের চরম অবমাননা। এ সকল নিষ্ঠা কমলের মতে মূল্যহীন ও নিরর্থক। অথচ সে নিজে কেন যে মিতাহারী, একবেলা মাত্র দুটি ভাতেভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে—তাহার কারণ দুর্জ্ঞেয়। দারিদ্র্যই যে ইহার একমাত্র কারণ নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়; কারণ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কাহারও বাড়ীতে গিয়াও কমল অন্যবিধ আহার্য গ্রহণ করে না। পুনঃ পুনঃ স্বামী নির্বাচনে যাহার অরুচি নাই, নিঃসংগ জীবন যাপন করা যাহার কাম্য নহে—আহারে এবং বিহারেই বা তাহার এই অহেতুক বৈরাগ্য, কঠোর আত্মনিপীড়ন ও তপস্যা কেন, তাহার সংগত হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন একপ্রকার নিষ্ঠা ব্যতীত বোধ হয় সম্যকরূপে মর্যাদা রক্ষা করা যাইবে না বলিয়াই কমলকে এইরূপ হইতে হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র হইলেন আশুবাবু। তিনি গ্রন্থের নায়ক না হইলেও তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া ঘটনা দানা বাধিয়াছে। তাঁহার ঐশ্বর্য বিপুল, কিন্তু হৃদয়ের প্রাচুর্যই সর্বাপেক্ষা অধিক। আশুবাবু মিষ্টভাষী, সদালাপী, অকপট, উদার, স্নেহময় এবং বন্ধুবৎসল। তাঁহার এতগুলি গুণ গ্রন্থখানিকে এক অনির্বচনীয় মাধুর্য ও আনন্দ রসে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বিরুদ্ধ মত যুক্তিসহ হইলে আপন উদারগুণে তাহা গ্রহণ করিবার শক্তি তাহার আছে—আবার আপনার মতের সহিত বিরুদ্ধ মত না মিলিলেও তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন না। সকল কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের তিনিই যেন মূর্তীভূত শক্তি। বাস্তবিক পক্ষে ইহার মত একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মধ্যস্থ হিসাবে না পাইলে এতগুলি বিভিন্ন আদর্শপন্থী নরনারী একত্র মিলিত হইতে পারিতেন না। যৌবন থাকিতে বিপত্নীক হওয়া সত্ত্বেও তিনি আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই—স্বর্গতা স্ত্রীর স্মৃতি তাঁহার নিকট যেমনই জীবন্ত, তেমনই পবিত্র। এই আত্মভোলা নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত প্রৌঢ় আশুবাবু যেন জগতের কোন কিছুতেই সহসা মন্দ কিছু দেখিতে পান না—সকল কিছুকেই বিশ্বাস করা এবং তাহার উপর নির্ভর করা যেন তাঁহার এক স্বভাব। তিনি জলে বিচরণ করিলেও পাঁক মাখেন না। এজন্য পার্থিব ব্যাপারে সময় সময় তাঁহাকে প্রবঞ্চিতও হইতে হইয়াছে। শিবনাথের সহিত তাঁহার কন্যা মনোরমার ঘনিষ্ঠতা এবং প্রণয়ের ব্যাপারে তাঁহাকে একেবারে স্তম্ভিত হইতে হইয়াছে।

শিবনাথ রূপবান, উত্তম সংগীতজ্ঞ—কিন্তু প্রতারক, অর্থলোলুপ, মদ্যপ এবং নীতিভ্রষ্ট। আগ্রা ত্যাগ করিয়া কর্মোপলক্ষে জয়পুর যাইতেছে বলিয়া কমলের সহিত সে প্রতারণা করিয়াছে এবং মনোরমার সহিত মিলিত হইবার জন্য অসুখের ভান করিয়া সে আশুবাবুর গৃহে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এক বন্ধুর নাবালক পুত্রকে ফাঁকি দিয়া তাহার সম্পত্তি হস্তগত করিবার ব্যাপার সে যেরূপ দম্ভের সহিত সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিতে পারিয়াছে—তাহাতে লোকটার ধৃষ্টতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আপনার স্ত্রী কমলের পরিচয় দানের প্রাক্কালে তাহাকে দাসী-কন্যা বলিয়া তাহার বিদ্রূপাত্মক পরিচয় দিতেও তাহার বাধে নাই এবং একমাত্র তাহার রূপ ও যৌবনের জন্যই যে সে তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, তাহাও জানাইতে দ্বিধা করে নাই। ভালই হউক, আর মন্দই হউক, কমলের মত শিবনাথেরও ইহা যে এক ধরনের অকুতোভয়তা, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গ্রন্থের প্রথম দিকটায় শিবনাথের কিছু কিছু দর্শন পাওয়া যায়, শেষার্ধে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন মিলে না।

অবিনাশ কতকটা পরমতসহিষ্ণু—আবার কতকটা রক্ষণশীল। হরেন্দ্র ভারতের প্রাচীন কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মহত্ত্ব ও উপকারিতায় বিশ্বাসবান—আবার কমলের যুক্তির সারবত্তাও অনেক সময় সে স্বীকার না করিয়া পারে না। কমলকে সে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তাই বলিয়া একমাত্র কমলের নিকট হইতেই খোঁচা খাইয়া আপন আদর্শ বিসর্জন দিয়া তাহার বহুদিনের পরিচালিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমটি তুলিয়া দেওয়ার পক্ষে তেমন যুক্তি নাই। সে যাহাই হউক, হরেন্দ্রের ভদ্র ব্যবহার, তাহার আন্তরিকতা, পরের দুঃখ কষ্ট অসুবিধায় তাহার সাহায্য করিবার আগ্রহ,—হরেন্দ্রের প্রতি আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে।

সতীশ সর্ববিষয়ে প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল। জগতের কল্যাণে প্রাচীন ভারতের মহান্ অবদানের গৌরবে সে আস্থাবান। তাহা ভুলই হউক আর ঠিকই হউক, সে ধারণা হইতে সে বিচ্যুত হইতে পারে না। উহাই সতীশের সর্বস্ব। আর একটি গোঁড়া প্রাচীনপন্থী চরিত্র অক্ষয়। অক্ষয় শুধু রক্ষণশীলই নয়—কটুভাষীও বটে। পরের ব্যাপারে অক্ষয়ের অনুসন্ধিৎসা অত্যন্ত প্রবল। যাহা কিছু চিরাচরিত প্রচলিত ভাবধারার বিরোধী—তাহাই তাহার নিকট কড়া সমালোচনার বস্তু। অক্ষয়ের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাহার চরিত্রের অনমনীয়তা। কমলের মতবাদের নিকট প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর নতি স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু অক্ষয় করে নাই। গ্রন্থের একেবারে সর্বশেষ পরিচ্ছেদে গিয়া এহেন অক্ষয়কে আমরা যখন কমলের নিকট নতি স্বীকার করিতে দেখি, তখন বিস্মিত না হইয়া পারি না।

রাজেন্দ্র বিপ্লবী—রাজেন্দ্র কর্মী। সাধারণ মানুষের রীতি-নীতি ও আদর্শের সহিত এইজন্য তাহার সামঞ্জস্য নাই। তাহার চিন্তাই কর্ম এবং কর্মই চিন্তা। বিপদে পড়িয়া যে-ই তাহার সাহায্য প্রার্থনা করে, বিনা আড়ম্বরে সেই তাহা লাভ করিয়া থাকে; অনেক সময় না চাহিয়াই অযাচিতভাবেই তাহা প্রাপ্ত হয়। তাহার সাহায্য আটপৌরে—কিন্তু অত্যাবশ্যক। তাহার উপর সকলেরই যেন একটা অলিখিত কিন্তু নিশ্চিত দাবী আছে। পৃথিবীর কেহই তাহার বিশেষভাবে আপন নয়—

আবার সকলেই আপন। আগুনে পুড়িয়া মরিবার পূর্বে দগ্ধ অবস্থায় দুই দিন জীবিত থাকিলেও এই জন্যই সে বিশেষভাবে কাহাকেও সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করে নাই। তাহার মৃত্যুটাকে পৃথিবীর একটা অতি তুচ্ছ স্বাভাবিক ঘটনারূপেই সে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। রাজেন্দ্রের সাহায্য স্বজনসুলভ, আড়ম্বরবিহীন, সহজ, স্বাভাবিক ও আন্তরিক। পৃথিবীর আলো ও বাতাসের মতই তাহা যেন সহজলভ্য—অথচ মূল্যবান।' রাজেন্দ্রের কর্ম প্রশংসানিরপেক্ষ—বাহবা লাভের প্রত্যাশা রাখে না। সকলের এত ঘনিষ্ঠ এবং তাহাদের দুঃখ-কষ্টের অংশভাগী বলিয়াই তাহাদের দুঃখ কষ্টের ব্যাপার লইয়া রাজেন্দ্র পরিহাস করিতে পারে—কিন্তু সে পরিহাস ক্রন্দনেরই নামান্তর মাত্র। সে কাজ করে বেশি—কথা বলে কম। কমল তাহার নিকট আর পাঁচজনের মতই ব্যক্তিবিশেষ—তাহার অধিক কিছু নয়। কমলের নারীত্ব তাহার মনে কোনও বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কমল দুনিয়ার লোককে শিক্ষা দিয়া বেড়াইলেও রাজেন্দ্রের নিকট তাহাকেও শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছে। রাজেন্দ্র কমলকে শিক্ষা দিয়াছে যে সত্যের অধিষ্ঠান কেবলমাত্র মনে বা চিন্তায় নহে—কর্মেও। সত্য জিনিষটা কেবলমাত্র একটা বস্তুনিরপেক্ষ Abstract idea নয়—উহা Concreteও বটে। কর্ম ও অনুষ্ঠানে রূপায়িত হওয়ার দ্বারাই সত্য বাস্তব অস্তিত্ব লাভ করিয়া থাকে, নতুবা উহার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্য অনুষ্ঠানকে একেবারে ত্যাগ করিলে চলে না। সত্য শুধু সত্য হইলেই যথেষ্ট হয় না, কর্মের মধ্যে তাহাকে রূপায়িতও হইতে হয়। চিন্তা ও কর্মের সামঞ্জস্য ও সংগতির মধ্যেই সত্য রূপ পরিগ্রহ করে।

অজিতের চরিত্র দুর্বল—তাহার নিজস্ব কোন মতের বালাই আছে বলিয়া মনে হয় না। সে বিলাত ফেরৎ—কিন্তু তাই বলিয়া ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের উপর সে আস্থাহীন নহে, বরং উহা সম্বন্ধে আলোচনায় কথায় কথায় সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং হাত তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া প্রাচীন মনীষীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। আবার কমলের যুক্তিও সে অস্বীকার করে না। হরেন্দ্রের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গিয়া উঠিতেও তাহার যতক্ষণ—আবার কমলের বাসায় গিয়া উঠিতেও ততক্ষণ। শেষ পর্যন্ত কমল যে তাহাকে সংগী নির্বাচন করিল—তাহা বোধহয় তাহার এই অতি-দুর্বলতা এবং সরলতার জন্যই। কমলের মত অতি-আত্মবিশ্বাসী এবং আপন মতবাদে অতি-আস্থাসম্পন্ন নারী একমাত্র অজিতের মত ব্যক্তিত্ববিহীন এবং আত্মসমর্পণকারী পুরুষের সহিতই কতকটা মানাইয়া গুছাইয়া সংসার করিতে পারে—তাহার নিজের মত সমগুণসম্পন্ন কোন পুরুষের সহিত পারে না। অপরের উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তারের যে একটা অস্পষ্ট ইচ্ছা কমলের অন্তরে ক্রিয়াশীল আছে, তাহার আভাষ তাহার বাহ্যিক দীনতা এবং সম্পদহীনতার মধ্যেও খানিকটা পাওয়া যায়। কেন না কমলের দারিদ্র্যও যেন অনেকটা তাহার অহংকারের কারণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কোনও দৃঢ়চেতা পুরুষের সে পত্নী হইতে পারে না। আবার ঘটনার মজা এই যে, শিবনাথ যেমন অজিতের প্রতি বাগদত্তা মনোরমাকে ছিনাইয়া লইয়াছে, শিবনাথের স্ত্রী কমলও তাহার প্রতিশোধ লইয়াছে অজিতকে সংগী নির্বাচন করিয়া, যাহার নাকি মনোরমার সহিত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

"শেষপ্রশ্ন" উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রের সংখ্যা অতিশয় অল্প। আশুবাবুর কন্যা মনোরমা শৈশবে মাতৃহীনা—পিতার আদরে লালিত-পালিত। শিবনাথ ও কমলের সম্বন্ধে যে সকল কথা সে শুনিয়াছিল, তাহার ফলে অভিজাত বংশের কন্যা হিসাবে সংগতভাবেই তাহাদের প্রতি একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব তাহার মনে প্রথমে উদ্রিক্ত হয়। পরে কিন্তু শিবনাথের প্রতি সে হয় আকৃষ্ট এবং আশুবাবুর বাড়ীতে শিবনাথ প্রায়ই গানের আসর পাতিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মনোরমা শিবনাথের প্রেমে পড়ে এবং পরম স্নেহময় পিতা আশুবাবুর পরম অনিচ্ছা সত্বেও অজিতের সহিত তাহার স্থিরীকৃত সম্বন্ধকে বাতিল করিয়া শিবনাথকে বিবাহ করে। এ ব্যাপারে সে আশুবাবুর গভীর মনস্তাপ ও ক্ষোভের কারণ হয়, যদিও আশুবাবু কমলের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত তাহাদের ক্ষমা করিয়াছিলেন। মনোরমার চরিত্র গতানুগতিক ও বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

নীলিমা হিন্দু গৃহের সুন্দরী বালবিধবা। আপন ভগ্নীপতি বিপত্নীক অবিনাশবাবুর গৃহে আসিয়া সে তাঁহার সংসার তরণীর হাল ধরিয়াছে। ইহার ফলে তাহার নিকট পিতৃগৃহ ও শ্বশুরগৃহ—উভয় গৃহেরই দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। নীলিমা আচার-আচরণে সংযতস্বভাবা, পরম নিষ্ঠা সম্পন্না। তাহার হৃদয়ে মমত্ব আছে। মূল কাহিনীটির সংগে তাহার বিশেষ সংযোগ নাই। কমলের যুক্তিকে খানিকটা হয়তো সে মনে মনে স্বীকার করে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার মত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার সাহস, শক্তি বা প্রবৃত্তি নীলিমার নাই।

বেলা অতি আধুনিক রুচিসম্পন্না। বিবাহের পর স্বামীর দুশ্চরিত্রতার সংবাদ অবগত হইয়া সে স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছে—কিন্তু আইনের জোরে পরিত্যক্ত স্বামীর নিকট হইতে তাহার খোরপোষ বাবদ মাসোহারা আদায় করিয়া লইতে তাহার আত্মসম্মানে বাধে নাই। তাহার আভিজাত্য ও আত্মসম্মানবোধ অতিশয় অন্তঃসারশূন্য ও পরস্পর-বিরোধী। এইখানেই তাহার চরিত্র কমলের চরিত্রের সহিত প্রধান বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াছে। বেলার সম্বন্ধে আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এককালে যে তাহার স্বামী অসচ্চরিত্র ছিল, এই ব্যাপার মিথ্যা প্রতিপন্ন না হওয়া সত্বেও সে স্বামীর সহিত আবার আপোষ রফা করিয়া মিলিত হইতে পারিয়াছে!

পরিশেষে গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আরও কতকগুলি বিষয় উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের কাহিনী চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত ও ঘটনা-সমাবেশের মধ্য দিয়া যেন আপনা-আপনি অনেকটা অগ্রসর হইয়া চলে—আখ্যানভাগের পরিণতিকে যেন একান্তভাবে পূর্বপরিকল্পিত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য আখ্যানভাগের অল্প-বিস্তর পূর্বপরিকল্পিত না হইয়া উপায় নাই। কিন্তু 'শেষপ্রশ্ন'-এ ঘটনার স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ অগ্রগতি বেশ খানিকটা ব্যাহত হইয়াছে—প্রচারমূলক সাহিত্য হিসাবে বক্তব্যকে

সুপরিস্ফুট করিবার জন্য ঘটনাকে চাহিদা মত অস্বাভাবিকরূপে ঘুরাইবার-ফিরাইবার একটা অতিরিক্ত প্রবণতা ইহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সেজন্য কাহিনীকে কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভাবনীয়, অকারণ এবং অতি নাটকীয় বলিয়া মনে হয়।

গ্রন্থের প্রথম দিকে তাজমহলের এলাকার মধ্যে বসিয়া কমল ও শিবনাথের শৈব বিবাহ সম্বন্ধে যখন আলোচনা হইয়াছিল, তখন কমলকে বলা হইয়াছিল যে, শৈব-বিবাহ সমাজে প্রচলিত না থাকায় শিবনাথ ইচ্ছা করিলে সহজেই কমলকে ফাঁকি দিতে পারে। কমল তখন শিবনাথকে রহস্য করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল,—হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এই রকম কোনদিন?' কমলের এই রহস্যোক্তির মধ্যে শিবনাথের প্রতি তাহার অগাধ বিশ্বাস এবং একান্ত নির্ভরতার ভাবই ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় ইহার অল্প কয়েকদিন মাত্র পরেই শিবনাথ কমলকে সত্য সত্যই ত্যাগ করে এবং কর্মোপলক্ষে জয়পুর যাওয়ার মিথ্যা ছলনা করিয়া আগ্রাতেই অবস্থান করিতে থাকে। ইহাও একদিকে যেমন অতিশয় আকস্মিক, অপরদিকে আবার পরম বিতৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া মনোরমার শিবনাথের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াও তদ্রূপ আকস্মিক। উভয় ক্ষেত্রেই যেন মধ্যস্তরকে উড়া রাখিয়া ঘটনাকে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা দান করা হইয়াছে। ঘটনার ক্রমবিকাশ অপেক্ষা ঘটনার পরিণতিটাই যেন লেখকের জরুরি প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয়।

আশুবাবুর স্নেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হইয়া তাহার মতের একান্ত বিরুদ্ধে মনোরমার পক্ষে শিবনাথকে বিবাহ করিবার জন্য দুর্জয় জিদ প্রকাশ করাও স্বাভাবিক হইয়াছে কিনা, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার কথা। নীলিমার সহসা আশুবাবুকে ভালবাসিয়া ফেলা সম্ভাব্যতার সীমা একেবারেই অতিক্রম করিয়াছে। অবিনাশবাবুর আকস্মিক দারপরিগ্রহও এক অভাবনীয় ব্যাপার। গ্রন্থের শেষ অংশে কটুভাষী, স্পষ্টবক্তা অক্ষয়ের অবস্থাও একেবারে শোচনীয় করিয়া তুলা হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যে আপনার বৈশিষ্ট্য ও অনমনীয়তা বজায় রাখিয়া একেবারে শেষ অধ্যায়ে কমলের নিকট তাহার পরিপূর্ণরূপে নতি স্বীকার ও কমলের একখানি পত্রের জন্য তাহার ব্যাকুলতা পূর্বাপর সামঞ্জস্য ও সংগতিবিহীন। কমলের বিজয় সম্পূর্ণ করিবার জন্যই যেন অক্ষয়ের প্রতি এইরূপ অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ত্রুটির কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে যুক্তি-তর্কের স্রোত স্বচ্ছন্দ-গতিতে অগ্রসর হইয়াছে—কোথাও তাহা ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে লেখকের চিন্তা, অনুভূতি ও যুক্তি এতই সতেজ ও সজীব যে উপন্যাসখানিতে তর্ক-যুদ্ধে কোথাও ভাটা পড়ে নাই, অথবা কোথাও কষ্টকল্পিত যুক্তিরও অবতারণা করিতে হয় নাই। আদি, মধ্য ও অন্ত—আখ্যানভাগের এই তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তরও বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সমস্যামূলক সাহিত্য হইয়াও আখ্যানভাগ নীরস হয় নাই—ইহাই ইহার চরম উৎকর্ষ। এই সকল ব্যাপারে গ্রন্থখানির শক্তিমান স্রষ্টার পরিচয় যেন প্রতিটি ছত্রেই প্রকট হইয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

চরম ক্ষান্তি

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র

ভুল যদি হ'য়ে থাকে, ভেঙ্গে যায় যাক্ ক্ষতি কিছু নাই,
সত্য যাহা, নিত্যকার শাশ্বত প্রকাশ, আমি তাই চাই।
অকস্মাৎ একদিন যদি ভুল ভাঙ্গি
বিদীর্ণ হৃদয় লুটে বেদনায় রাঙ্গি,
স্থির অবিচল মুখে বহি ধৈর্য্যভার
অকম্পিত পদে চলি রহি নির্ব্বিকার।
অকরুণ মুহূর্ত্তের সুকঠিন দান,
নম্রশিরে সহি যেন রাখি তার মান।
এ জীবনে লভিয়াছি যত ক্ষতিক্ষয়,
অনির্ব্বাণ বহ্নিদাহ হ'য়েছে কি লয়?
গহীন নিতল তলে বহে ফল্গুধার,
আদিহীন অন্তহীন সে কি স্নেহাসার।
প্রকাশ অতীত তার অন্তরের সুগোপন কথা
মরণ শীতল হিম, আরক্তিম অসহন ব্যথা।

মোর ভাগ্যদেবতার দানে, চিরদিন নির্ম্মম বঞ্চিত,
তবু বিজয়িনী আমি, বক্ষে মোর অমৃত সঞ্চিত।
জন্ম, জরা, মৃত্যুভয়হীন এ জীবন মোর
রূপে, রসে, গন্ধে স্পর্শে ভরি, হয়ে আসে ভোর।
শ্বাসে শ্বাসে আসি পশে একি পরিমল,
ছন্দে, গানে, কলতানে, আলো ঝলমল।
সে কোন আনন্দ স্পর্শে তনুমন শিহরায়,
সর্ব্ব অনুভূতি মোর তারি মাঝে মুরছায়।
ধরিত্রী ধরিয়া বক্ষে বাঁধে বাহুপাশে,
অতন্দ্র নয়নে নিদ্রা ধীরে ছেয়ে আসে।
তৃণে পুষ্পে, স্নিগ্ধকোলে ঘুম পাড়ানীয়া গানে,
ধীরে ধীরে দেয় দোল মৃদু মৃদু কর হানে।
পরিপূর্ণতায় ভরি, আসিছে পরমা শান্তি,
নিরঞ্জন অন্তে পাব সুচির চরম ক্ষান্তি।

নিরুপমা দেবীর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ!

রাধারাণী দেবী

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে—'ধান ভানতে শিবের গীত'। সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা নিরুপমা দেবীর মৃত্যুতে স্বর্গগত শরৎচন্দ্রের আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করেছেন 'কথা-সাহিত্য' মাসিকপত্র। শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করেছেন, মাননীয়া অনুরূপা দেবী।

বাল্যসখীর মৃত্যুতে তিনি গভীর শোকার্তা। তাঁর কাছে আমরা স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবী সম্বন্ধেই কিছু শুনব আশা করেছিলাম। শুনলাম কিন্তু বাংলাদেশের সর্বজনমান্য এবং সর্বজনপ্রিয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের প্রতি অহেতুক তীব্র কটূক্তি। শুধু তাঁর ব্যক্তিগত কুৎসাই নয়, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভাকেও অস্বীকার এবং তাচ্ছিল্য। শরৎচন্দ্র অসত্যবাদী ও মিথ্যা গুজবরটনাকারী বলে অপপ্রচার।

একজন প্রসিদ্ধ লেখিকার লোকান্তর ঘটেছে। তাঁর স্মৃতিতর্পণ করতে বসেছেন আর একজন প্রসিদ্ধ লেখিকা। তদুপলক্ষে আর একজন প্রসিদ্ধতম লোকান্তরিত লেখকের স্মৃতির প্রতি সম্মার্জনী তাড়না হোলো। এতে পরলোকগতা লেখিকারও স্মৃতিকে অসম্মানিত করা হয়েছে কিনা সেটা সাধারণের বিচার্য। তবে বাংলাদেশের সাহিত্য-রসিক যে-কোনও মানুষই স্বর্গতঃ শরৎচন্দ্রের এই আকস্মিক লাঞ্ছনায় বিস্মিত ও বিচলিত হবেন নিঃসন্দেহ।

হয়েছে লেখিকা নিরুপমা দেবীর মৃত্যু। কিন্তু পাঠকদের শুনতে হোলো, অনুরূপা দেবীর "জীবনের প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতামহদেব" ভূদেবের "মহাপ্রয়াণের" মহান্ বর্ণনা।

—১লা জ্যৈষ্ঠ উদ্যত বজ্র মাথার উপরে খসেই পড়লো, জীবনের প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ আমাদের পিতামহদেব মহাপ্রয়াণ করলেন।... আমাদের বাড়ী সমস্ত মাস ধরে কালবৈশাখীর বজ্রগর্ভ আসন্নবর্ষী কালমেঘে সমাচ্ছন্ন থেকে ১৩০১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী একাদশীর পরিপূর্ণ চন্দ্রকরোজ্জ্বল সুধা ধবলিত মধ্যরাত্রে সেই সভয়-প্রতীক্ষিত অশনি নিপাতে কম্পিত হয়ে উঠলো। দুজন রাজ-কবিরাজ গৃহে মাসাধিককাল ধরেই উপস্থিত, তাঁদের সঙ্গে পিতামহদেবের সর্ত হয়েছিল, সময় বুঝলেই তাঁরা—শুশ্রূষাকারী চারজন ব্রাহ্মণ সন্তান যাদের এই উদ্দেশ্যেই অন্য কাজ থেকে ছাড়িয়ে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের—ইঙ্গিত দেবেন, তারাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল, সজ্ঞানে তাঁকে তাঁরই গৃহতলবর্তী জাহ্নবীতীরস্থ করবে। ছেলেরা হয় তো আপত্তি করবেন, কিন্তু সে আদেশ তারা মান্য করবে না। ইতিমধ্যে নূতন বিছানাপত্র ও খাট গঙ্গার দিকের ফটকের মাপ দিয়ে তৈরি করান হয়েছিল—" ইত্যাদি। —কথা-সাহিত্য পৌষ, ১৩৭১ ২০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

একান্ত দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, স্বর্গগত শরৎচন্দ্রের যে কল্পিত অপরাধে লেখিকা তাঁর প্রতি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘৃণা-বিষাক্ত উগ্রভাষা ব্যবহার করেছেন, শরৎচন্দ্র সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। লেখিকার মনের ভ্রান্ত সন্দেহ ছাড়া তাঁর এ ধারণার অন্য কোনও ভিত্তি নেই। যে-গুজব লোকসমাজে প্রচারিত, তার জন্য শরৎচন্দ্র দায়ী নন। অর্থাৎ শরৎচন্দ্র স্বয়ং গুজব-রটনাকারী নন। বহুবার বহু লোক তাঁকে নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছেন, তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রম ও সম্মানের সাথেই নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে কথা বলেছেন এবং অনেকের ভ্রান্তি নিরসন করেছেন। এ আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমরা জানি—স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ ও একান্ত শ্রদ্ধা ছিল। সে স্নেহ ও শ্রদ্ধার রূপ সংসারের কোনও ধূলিমলিন কুশ্রী মানসিকতার সাথে তুলনাই হতে পারে না। সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বহুবার তাঁর মুখে শুনেছি, একমাত্র নিরুপমা দেবী ছাড়া বাংলা সাহিত্যে লেখিকাদের রচনা কারুরই শিল্পোত্তীর্ণ বা রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। মেয়েদের লেখা অত্যধিক কৃত্রিম এবং তাতে স্বকীয়তা অল্পই, একথা তিনি বলতেন। "বুড়ির লেখার প্রধান গুণ, তার স্বাভাবিক আন্তরিকতা আর সংযম" একথা তাঁর মুখে অনেকেই শুনেছেন। নিরুপমা দেবীকে কিংবা তাঁর কোনও সমসাময়িক বাল্যবন্ধু সাহিত্যিককে তিনি রচনা শিক্ষা দিয়েছেন, এ ধরণের কথা শরৎচন্দ্রের মুখে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও কেউ কখনও শোনেননি। নিজের সাহিত্য এবং সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে

তিনি খুব সামান্যই নিজমুখে আলোচনা করতেন। তাঁর জীবনের গভীর দুঃখসুখের সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত বেশি স্তব্ধ ছিলেন। কখনও সে বিষয় নিয়ে মুখে নাড়াচাড়া করতে পারতেন না। একাজ অন্যে করে এটাও পছন্দ করতেন না।

সেই আত্মগর্বলেশহীন, আপন-পর সবাকার প্রতি সমভাবে অকৃত্রিম স্নেহশীল, দুঃখীর দুঃখে গভীর সহানুভূতি-পরায়ণ আপনভোলা মানুষটির কথা স্মরণ করে তাঁর পরিচিত কার না চক্ষু আজও সজল হয়ে ওঠে? "আপনাকে সম্মানিত করার গূঢ় উদ্দেশ্যে" বা "বিনা কারণে কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগের জন্য" তিনি নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে কোনও মিথ্যা গুজব বা লঘু গল্প কখনও রটনা করেননি। তার কারণ পূর্বেই বলেছি। তিনি যথার্থই সুচরিত। নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে অশেষ শ্রদ্ধা, অকপট স্নেহ এবং মহৎ মনোভাব পোষণ করতেন।

পৃথিবীর সব দেশেই দেখা গিয়েছে এবং যায়—খ্যাতির বিপত্তি আছেই। যাঁরা নিজের শক্তি বা প্রতিভা দ্বারা সাধারণের মধ্যে অসাধারণ হয়ে ওঠেন, তাঁদের সম্বন্ধে বহু মানুষের মুখে বহু রকম গুজব রটনা হয়ে থাকে। সে গুজব ভালো, মন্দ, সম্ভব, অসম্ভব নানাবিচিত্র হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর জীবনকালেই কত রকমই যে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনেছি তার সংখ্যা ছিলনা। তিনি নিজেও এসকল গল্প শুনেছেন। সব গল্পই যে খুব খুসি হওয়ার মত, অথবা শ্রুতিসুখকর ছিল, তা' মোটেই নয়। কবি-সম্পর্কে নানা কল্পিত গল্পের মধ্যে কোনও কোনও সুপ্রসিদ্ধা মহিলার নামও যে জড়িত হয়নি তা' নয়। এখন যদি এই রকম কোনও প্রবাদ বা গুজবের জন্য কেউ পরলোকগত মহাকবিকেই গুজব-রটনাকারী স্থিরসিদ্ধান্ত করে তাঁর স্বর্গতঃ আত্মার উদ্দেশে বদ্ধমুষ্টি তুলে আস্ফালন করেন, তার চেয়ে হাস্যকর ও অদ্ভুত ব্যাপার আর কি হতে পারে?

ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু সিংহাসন-পরিত্যাগী সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের সতীর্থ ছিলেন এবং তাঁর পিতার পোসাক প্যারিস্ থেকে ধোলাই হয়ে আসত, এ গল্প আমরা বহুকাল ধরে শুনে এসেছি। জহরলাল স্বয়ং এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

"Another equally persistent legend, often repeated inspite of denial, is that I was at school with the Prince of Wales. The story goes on to say that when the Prince came to India in 1921 he asked for me. I was then in gaol. As a matter of fact, I was not only not at school with him, but I have never had the advantage of meeting him or speaking to him."

Autobiography of Jawaharlal Nehru
New Edition. p. 205.

এই থেকে আমরা বুঝতে পারি, 'গুজব' স্বয়ম্ভু। এর উৎস নির্ণয় করা মানুষের সাধ্যাতীত। জহরলাল তাই বলেছেন, গুজবকে যিনি সত্য বলে প্রচার করেন—"he would get a special mention for being a Prize fool. স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভা সম্বন্ধে লিখেছেন—

মেয়েদের দানে বাংলাসাহিত্য এমনটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে যে, পুরুষ লেখকেরা নাগাল পাচ্ছে না—অতএব একটা চ্যাম্পিয়ানকে খাড়া করে ওদের খাটো করা দরকার, এতবড় স্বার্থকলুষিত সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি তাঁদের ছিল না। যে-দেশে শীতলা মনসা ওলাবিবিরাও জগৎজননী জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে একই উপচারে ও সমান নিষ্ঠায় বরঞ্চ ক্ষতিকারিণী শক্তি হিসাবে সমধিক ভয়ে ভক্তিতে পূজাপ্রাপ্ত হন, সেখানে বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি, জগতের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাকবিই নন, সাহিত্যিক সর্বশক্তিমানের সঙ্গে সাধারণ শক্তির একজন ঔপন্যাসিককে সমপর্য্যায়ে দাঁড় করাবার জন্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভক্তবৃন্দ ঢাক-ঢোল—দামামা পিটিয়ে অধিকার (অনধিকার বললেও অত্যুক্তি করা নিশ্চয়ই হয় না) স্থাপন করতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে মন্ত্রের সাধনে শরীর পতন করে। তা' সাধনা করলে সিদ্ধি আসে বই কি!—" কথাসাহিত্য পৌষ, ১৩৫৭, ২২০ পৃঃ।

দেখা যাচ্ছে স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর স্মৃতিতর্পণের মধ্যে লেখিকা অনুরূপা দেবীর প্রতিপাদ্য বিষয়, শরৎচন্দ্র সত্যকার প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন না। তিনি একজন "সাধারণ শক্তির ঔপন্যাসিক" মাত্র। "উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভক্তবৃন্দের" সাহায্যে তিনি বাংলা সাহিত্যে যে "অধিকার স্থাপন" করেছেন, তাকে "অনধিকার বললেও অত্যুক্তি করা নিশ্চয়ই হয়না।"

লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকাদের দানে…মেয়েদের দানে বাংলাসাহিত্য এতটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে যে, পুরুষ লেখকেরা নাগাল পাচ্ছে না—অতএব একজন চ্যাম্পিয়ান খাড়া করে ওদের খাটো করা দরকার।

এই রকম একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রের ফলেই বাংলাসাহিত্যে রহস্যজনকভাবে শরৎচন্দ্র-রূপ চন্দ্রোদয় ঘটেছে। মাননীয়া অনুরূপা দেবী শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে তার এই অভিমত অতি তীব্র ভাষায় সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন।

তিনি আরও অনেক গোপন তথ্য আমাদের জানিয়েছেন, যা' ভবিষ্যতে শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা-কারীদের হয়ত প্রয়োজনে লাগতে পারে! শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল কারণ তিনি স্থিরসিদ্ধান্তে ব্যক্ত করেছেন—

"বাংলা উপন্যাসের জন্মদাতা (৺ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাস ছেড়ে দিলে) বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত মহিমা গরিমা যে অন্ততঃ পথ-প্রদর্শকের গৌরবটার সমমূল্যও নয়, বরং কিছু নিচেই নামিয়ে দেওয়া হয়। এতটা আয়োজন পর্ব্বের প্রয়োজন যে ছিল তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিও আমরা দেখেছি। যখন সেযুগের সত্যকার হিন্দুসমাজের পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে "মনস্তাত্ত্বিক" উপন্যাস কয়েকজন মেয়েই প্রথম লিখে একান্তরূপেই যশোলাভ করলেন, সেযুগের সুবিখ্যাত নাট্যকারেরা তাঁদের সেইসব সর্ব্বজনসমাদৃত উপন্যাসগুলিকে নাট্যরূপ প্রদান করে খুব মোটা মোটা অঙ্কের টাকা উপার্জ্জন (তাঁদের মুখেই শোনা) করতে লাগলেন, তখন পুরুষ লেখক যে যাবৎ যাঁরা ইংরেজীর অনুবাদ অথবা ছোট গল্পের লেখক ছিলেন, তাঁদের হঠাৎ চোখ খুলে গেল।

কথাসাহিত্য ২২১ পৃঃ পৌষ, ১৩৫৭

বলা বাহুল্য "যে যাবৎ ইংরেজীর অনুবাদক ও ছোট গল্পের লেখক" বলে লেখিকা শরৎচন্দ্রকেই নির্দেশ করেছেন। শরৎচন্দ্রের তরুণ বয়সের রচনা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন— "আমাদের চক্ষে সে রচনা অদ্ভুতরসই পরিবেশন করেছিল।" একটু পরে আবার কৃপাপরবশ হ'য়ে লিখেছেন—"একজন সমধর্ম্মী লেখককে অবশ্য প্রশংসা ও সহানুভূতির সঙ্গেই দেখেছি।" এইবার আমরা শরৎ-চন্দ্রের ভাগলপুরের জীবন এবং নিরুপমা দেবীর সাহিত্য-রচনার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের রচনার আদর্শগত সম্বন্ধ সম্পর্কে মাননীয়া অনুরূপা দেবী যে সব আপত্তিজনক ভ্রান্ত উক্তি করেছেন—৺নিরুপমা দেবী এবং শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট মহাশয়ের শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে উক্তি উদ্ধৃত ক'রে পাঠকদের সামনে সমগ্র বিষয়টা বিচারের জন্য উপস্থিত করছি। অনুরূপা দেবী লিখছেন—

প্রচার-কর্ত্তারা নির্ব্বাধে ও উৎসাহ সহকারে রটনা করে চলেছেন এই যে—নিরুপমা দেবীর সাহিত্যসাধনার মন্ত্রগুরু সত্যদ্রষ্টা ঋষি শরৎচন্দ্র!! এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কারে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে নিঃসন্দেহ তবে, এর ভিতর "সত্যদ্রষ্টা"র নিজেরও বেশ একটা পরিকল্পনা যে ছিল, সে কথা আমি তো জানিই, আরও অনেকেরই জানা আছে। [এই অনেক কারা ?] তিনি অর্থাৎ [শরৎচন্দ্র] সুবিধামত অনেকের কাছে নিজের মর্য্যাদা বাড়াবার জন্যই হোক, কিম্বা শুধু কল্পনা বিলাসের আকাশকুসুম চয়নের জন্যই হোক বা আনন্দ লাভের জন্যই হোক, অনেক রকম অবান্তর ও অনধিকার রটনা করে বেড়িয়েছেন, যা নিয়ে অন্য কোন সমাজে হলে ডিফামেশন্ চার্জ্জ দিয়ে মামলা আনাও চলতে পারতো! আমাদের উচ্চ হিন্দু সমাজে ধৃষ্ট ব্যক্তিকে যথাসাধ্য পরিহার করেই চলতে উপদেশ দেওয়া হয়, কাদামাটি ঘেঁটে পাক তৈরি করতে বলে নয়। যে ভদ্র সমাজের নামজাদা ঘরের সম্মানিতা মহিলাদের সম্বন্ধে কতখানি সংযতভাবে কথা বলা উচিৎ আজকের দিনের বহু সম্মানিত সেদিনকার ছন্নছাড়া ভবঘুরে লোকটীর সে উচ্চশিক্ষা ছিল না, সে আমি, আমার স্বামী এবং এখনও বর্ত্তমান দুচারজন নরনারী প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। [কারা তাঁরা ? নাম উল্লেখ করা দরকার] তিনি তাঁর বন্ধুর ছোট বোনকে বন্ধুরই মুখে শুনে শুনে "বুড়ি" বলে উল্লেখ করতে পারেন, সেটা কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু তাই থেকে এ প্রমাণ হয় না যে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে নিতান্ত নিয়মতান্ত্রিক ঘরের বাল-বিধবার শরৎচন্দ্রের মত চরিত্রের একজন অনাত্মীয় তরুণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা চলতো। নিরুপমা দেবীর সাহিত্য সাধনায় শরৎচন্দ্রের হাত দিয়ে আরম্ভ করারই বা কি আছে? যাঁরা এই দুজন লেখকের লেখা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, এঁদের লেখার ষ্টাইল সম্পূর্ণই বিভিন্ন। বিশেষতঃ ১৩০৪, ১৩০৫, ৬, ৭ সালে শরৎ প্রতিভার কি এমন বিকাশ হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমারকে বাদ দিয়ে তাঁকে লোকে অনুকরণ করতে যাবে? শরৎচন্দ্রের মত সব লেখকরা তো আর মন্ত্র-দ্রষ্টা নয়, "আলোক-দীপ্ত সমুজ্জলতর আদর্শ" সামনে থাকতে কিসের দুঃখে উদীয়মান লেখক বা লেখিকা তাদেরই সমপর্য্যায়ের একজন খাতার পাতায়-দুচারটি-গল্প লেখককে অনুসরণ বা অনুকরণ করতে যাবে? ভাগলপুরে থাকতে একটি এক্সারসাইজবুকে লেখা 'বোঝা' 'অনুপমার প্রেম' 'বামুনঠাকুর' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প, যা আমাদের চক্ষে সেদিনে অদ্ভুত রসই পরিবেশন করেছিল, এ ছাড়া "কোয়েল" বলে একটী ইংরেজীর অনুবাদ গল্প ও মাইট এটমের অনুবাদ (বাংলা নাম মনে নেই) এই তো শরৎচন্দ্রের সম্বল ছিল। সে তার দাদা বিভূতি ভট্টের ও আমি আমার জ্ঞাতি কাকা অরুণদেবের মারফৎ খাতাগুলি পেয়ে হাতের লেখার একজন সমধর্ম্মীলেখককে অবশ্য প্রশংসা ও সহানুভূতির সঙ্গেই দেখেছি।

—কথাসাহিত্য পৌষ, ১৩৫৭, ২২১-২২ পৃঃ

অন্যত্র—"নিরুপমা দেবীর কোন ছাপা লেখারও প্রুফ দেখবার

অবকাশ শরৎচন্দ্রের ঘটেনি, এ কথা খুব জোর করেই বলা যায়।...... গল্প রচনায় যদি কোন অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়ে থাকে তা আমার এবং আমার দিদি ৺ইন্দিরা দেবীরই।......শরৎচন্দ্রের প্রেরণা বা সাহায্য কিছুমাত্র আবশ্যক হবার কোনই কারণ ছিল না। অনর্থক একটা রটা কথা নিয়ে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠা সুলেখিকার যশকে খাটো করার এ চেষ্টা কেন! যখন সত্যতত্ত্ব জানা নেই।"

—কথাসাহিত্য, পৌষ, ১৩৫৭, ২২৩ পৃষ্ঠা

অন্যত্র—"সেই তপস্বিনী ও যশস্বিনী মনস্বিনী তার নিজের শক্তিতেই যথেষ্ট শক্তিমত্তা দেখিয়ে গেছে, তার জন্য কারু দাগা বুলাবার প্রয়োজন হয়নি, হাতে খড়ি দেবার দরকারও কিছুমাত্র ছিল না, যিনি এ সব বাজে কথা রটনা করবার হীন কল্পনা-বিলাস করে গেছেন, তিনি যে কত অসত্যদ্রষ্টা তার প্রমাণ এইখানেই।

—কথাসাহিত্য, পৌষ, ২২৬—২২৭ পৃষ্ঠা

এই মন্তব্য যে কত ভ্রান্ত, তার প্রমাণে স্বয়ং নিরুপমা দেবীর স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করছি। শরৎচন্দ্রের জীবিত-কালেই তিনি এই কথাগুলি লিখেছিলেন।

"এ যুগের কথা-সাহিত্যের গুরু রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎচন্দ্রই এখন যুগন্ধর। তাঁহার জীবনকথা এখন বাংলা-সাহিত্যের একটি সম্পদ্ রূপেই দাঁড়াইতেছে।......তাঁহার প্রথম জীবনের এই উদয়োন্মুখ প্রতিভার সহিত আমরা যেটুকু পরিচিত হইয়াছিলাম তাহা নিজেদের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় বলিয়াই মনে করি।"

অন্যত্র—"তবে একটি কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, গল্পটি (অন্নপূর্ণার মন্দির) লিখিতে গিয়া অলক্ষ্যে শরৎদাদার 'শুভদা'র আভাষও যে গল্পের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে ইহা খুবই সত্য। যেমন কবিতা লিখিতে গেলেই অসাধারণ প্রতিভাশালী ভিন্ন সাধারণ লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না, তেমনি এই গল্পটিতে শরৎদাদার লেখার প্রভাবও হয়ত আমার মধ্যে ফুটিয়া কার্য্য করাইয়াছিল।"......

"শরৎদাদার আমরা শিষ্যস্থানীয়া হইলেও তাঁহার প্রতিভার অনুকরণ বা অনুসরণ কিছুই করিবার ক্ষমতা যে আমাদের নাই ইহা প্রত্যেকের লেখা হইতেই প্রমাণিত হয়।"

অন্যত্র—"সাহিত্যসম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র এবং আমাদের কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইঁহাদের রচনা পাঠ আমাদের আবাল্য অস্থিমজ্জায় গ্রথিত হইলেও আমাদের শরৎদাদার লেখার প্রেরণা যে আমাদের উপর বিশেষ ভাবেই কাজ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বিষয়ে আমাদের দাদা ও তাঁর বন্ধুদের সহিত আমারও তিনি গুরুস্থানীয়।"

অন্যত্র—শরৎচন্দ্র যে আমাদের প্রথম জীবনের সাহিত্য সাধনার উৎসাহদাতা গুরু, তাহাতে তো সন্দেহই নাই।"

—'পুরাতন কথার আলোচনা'—জয়শ্রী মাসিকপত্র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৪০ সাল, ২৭০—২৭৬ পৃষ্ঠা

মাননীয়া অনুরূপা দেবী প্রমাণ করতে চেয়েছেন, শরৎচন্দ্রের মত অভদ্র অশিক্ষিত ভবঘুরে ছন্নছাড়ার সাথে নিরুপমা দেবীদের কোনও রকম বাহ্যিক বা মানসিক কোনও কিছু ঘনিষ্ঠতা বা আদানপ্রদান থাকা সে সময়ে বা পরবর্তী কোনও সময়েই সম্ভব ছিল না। তা' ছাড়া শরৎচন্দ্র তখন মস্তবড় লেখকরূপে প্রমাণিত হওয়া দূরে থাক, তার সম্ভাবনা পর্যন্তও ছিলনা। তাঁর যৎসামান্য ইংরাজীর অনুবাদ ও কয়েকটি ছোট গল্প অনুরূপা দেবীদের চক্ষে 'অদ্ভুত রস' এবং করুণা বা সহানুভূতি মাত্রই উদ্রেক করেছিল।

৺নিরুপমা দেবী এবং তাঁর দাদা শ্রদ্ধেয় বিভূতি-ভূষণ ভট্ট, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ভারতবর্ষ মাসিকপত্রে ১৩৪৪ সালের চৈত্র সংখ্যার স্মৃতিকথায় কিন্তু এর বিপরীত কথাই লিখেছেন। এখানে সেই স্মৃতিকথা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি। রচনা দুটি থেকে বোঝা যাবে, শরৎচন্দ্রের ন্যায় পরম গুণী ও অকৃত্রিম দরদী মানুষটির সত্য পরিচয় এই দু'টি গুণজ্ঞ সাহিত্যরসিক মানুষের কাছে কোনও দিনই প্রচ্ছন্ন থাকেনি। তাঁরা দুই ভাই ভগ্নীই হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় ভালবাসায় শরৎচন্দ্রের কোমল হৃদয়বত্তা, বিরাট প্রতিভা ও শিল্পীসুলভ গুণরাশিকে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়েছিলেন। অমূল্য হীরককে সামান্য কাচখণ্ড বলে ভুল করেননি। প্রথমে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টের কথা উদ্ধৃত করছি :—

আমার "শরৎদা"!

যাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তির কৌমুদীকে প্রকাশিত করিবার জন্য একদিন যে সমস্ত বাল্যবন্ধুগণ কতই না চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার অতর্কিত পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়া সানন্দে প্রণাম করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন।...

...তরুণ জীবনে সেই অনুদিত শরৎচন্দ্রের চারিদিকে যে কয়টী তারা অথবা তাঁহারই অনুদিত জ্যোৎস্নালোকে যে কয়টি অফোটা সাহিত্যিক ফুল ফুটিবার সম্ভাবনাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল—আমি তাহাদেরই একটী। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্ত্তী জীবনে সাহিত্যাকাশে দেখা দিয়া শরৎচন্দ্রের পার্শ্বে ভাসিয়াছেন, কেহ বা অকালেই নিভিয়াছেন—কেহ বা জীবনাকাশ হইতে চ্যুত না হইলেও

শরৎ মহিমার ঔজ্জ্বল্যের মধ্যেই আপনাকে অস্তমিত করিয়াছেন। আমি এই শেষের দলের মধ্যেই একজন। কিন্তু শরৎদার বিষয়ে আমাদের অন্ততঃ এইটুকু গর্ব্বের বিষয় আছে যে, আমরা সেই অনুদিত শরৎচন্দ্রকে সকলের আগেই পুজিয়াছি এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে তাঁহারই আলোকে দাঁড়াইয়া অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। যখন সমস্ত বঙ্গ-সাহিত্যাকাশ আমাদের সাহিত্য 'রবির' আলোকে উদ্ভাসিত, তখন বাঙ্গলার বাহিরের একটা অনতিখ্যাত সহরের ক্ষুদ্রবিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষুদ্রতম সাহিত্য সভার মধ্যে যে আমরা একটী পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাকে দেখিয়াছিলাম এ গৌরব আমরা করিতে পারি।

মনে পড়ে একদিন আমাদের সেই খেলাঘরের সাহিত্য সভায় যুবক শরৎচন্দ্রের একটা রচনা লইয়া ঘোর তর্ক করিতে করিতে প্রায় হাতাহাতির যোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল। আমি গায়ের জোরে সবারই চাইতে দুর্ব্বল হইলেও, গলার জোরে কাহারও অপেক্ষা কম ছিলাম না। হয়ত একটু বেশীই ছিলাম, তাই আমার সেই 'এতটুক যন্ত্র' হইতে একটু বেশী শব্দই বাহির হইয়াছিল এবং আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম—'বঙ্কিমের চাইতেও শরৎদার লেখা ভালো।' অবশ্য সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একজন অখ্যাত তরুণ সাহিত্যিকের লেখা লইয়া আর একটী তরুণতর যুবকের এই ধৃষ্টতায় সেদিন তাঁহার মহিমালোকে বসিয়া নিশ্চয়ই সস্নেহ উপেক্ষায় হাসিয়াছিলেন।......

আমার পূর্ব্ব জীবনের শরৎদার কথা বলিতে যাওয়া মানে—আমার জীবনের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণময় অংশ তাহাকেই স্মরণ করা।......

শরৎচন্দ্রকে প্রথম যখন দেখি তখন তিনি ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে পড়েন। আমার সঙ্গে সহপাঠীরূপে দেখা হয় নাই—দেখা হইয়াছিল শাস্তা—আদেশদাতা রূপে।......আমরা দুইটী ভাইভগ্নী প্রাক্-রবীন্দ্রী কবিগণের লেখার ভাব চোরাই হউক, আর অনুকরণই হউক—একটা কিছু করিতাম।......কেমন করিয়া জানিনা সেই সব লেখা, বিশেষতঃ নিরুপমার খাতাখানা শরৎচন্দ্রের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। দাদাদের মধ্যে কেহ হয়ত' তাহা শরৎদার হাতে দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন তাঁহার সমবয়স্কের মধ্যে একজন উচ্চ জগতের জীবরূপে এবং অত্যদ্ভুত 'ন্যাড়া' নামে অভিহিত......আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা-যাওয়া করিতে বা দাবাপাশা খেলিতে দেখিতাম মাত্র।......কিন্তু এহেন শরৎচন্দ্র, সেই Lara একদিন হঠাৎ আমার ছোট কুঠুরীর মধ্যস্থিত অতি ক্ষুদ্র টেবিলটির পাশে আসিয়া হাজির! আমি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম—তিনি আমার কবিতার খাতাখানা টেবিলের উপর সজোরে ফেলিয়া বলিলেন—"কি ছাই লেখ, খালি অনুবাদ—তাও আবার ভুলে ভরা। নিজের কিছু নেই তোমার লিখবার?" আমিত শুনিয়াই পৌণে মরা, কিন্তু তারপর কখন যে আমাদের আলাপ জমিয়া—এবং কবে যে তাঁহার খোলার ঘরের বইখাতাপত্রে ভরা টেবিলের পাশে বসিবার অধিকার পাইলাম তাহা আজ স্মরণ হয় না; কেবল এইটুকু মনে আছে যে তাঁহার সেই প্রথম জীবনের সাহিত্য সাধনার কুটীরের মধ্যে অতি সহজেই আমার স্থান হইয়াছিল। দিনের পর দিন তাঁহারই সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকাননে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলাম।

মনে পড়ে তাঁহার সেই ছোটঘরখানির মধ্যে বসিয়া তাঁহার বাল্য জীবনের কত কথাই না শুনিয়াছি। তাঁহার তখনকার অপটু লেখার মধ্যে কতনা ভবিষ্যতের গৌরবের ছায়া দেখিয়াছি এবং আশা করিয়াছি। ......শরৎচন্দ্রের রসস্রষ্টা রূপই শেষ জীবনে প্রকটিত, কিন্তু যৌবনে একাধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি—কতনা নূতন নূতন রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। * * * শরৎদা একদিন প্রস্তাব করিলেন যে, যখন আমরা এতগুলি কুঁড়ি সাহিত্যিক ফুটি ফুটি করিতেছি তখন একটা কাজ করা যাক। একটা হাতের লেখা কাগজ বাহির করা যাক। যে মুহূর্ত্তে বলা সেই মুহূর্ত্তে কার্য্যারম্ভ।......

এই মাসিকপত্রখানা আমাদের কুঁড়ি-সাহিত্যিকদের সভার মুখপত্র হইল। ইহার প্রথম সম্পাদক যোগেশচন্দ্র এবং মুদ্রাকর গিরীন্দ্রনাথ, লেখক অনেকগুলি এবং লেখিকা মাত্র একটী—তিনি আর কেহ নয়, আমারই অন্তঃপুরচারিণী বিধবা ভগিনী শ্রীমতী নিরুপমা। ইনি আমাদের বন্ধুদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকিয়াও আমাদের বন্ধুবর্গের একান্ত আপনার ছোট বোনটিই হইয়াছিলেন। তাঁহার তখনকার লেখা কবিতা বা প্রবন্ধ যাহা কিছু আমাদের সভার জন্য লিখিত হইত, তাহা আমাকেই সভায় পাঠ করিয়া শুনাইতে হইত এবং সভার মতামত আমাকেই বাড়ী গিয়া শুনাইতে হইত। * * * * * *

তাঁহার জীবনের আর একটা কথা এবং বোধহয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা—তাঁহার অসাধারণ ভালবাসার ক্ষমতা। শেষ জীবনে যে ভালবাসা পোষা পাখী এমন কি সামান্য একটা রাস্তার কুকুরের জন্যও অজস্র বায়িত হইয়াছিল—পূর্ব্ব জীবনেও তাহা আমরা যে কতবার কতরকমে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে গেলে সামান্য একটা প্রবন্ধে কুলাইবে না—প্রবন্ধটা গ্রন্থে পরিণত হইবে। সেই ভালবাসাই বহুদিনের বিস্মৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া হঠাৎ একদিন দুইটি Fountain penএর আকারে আমার ও আমার ভগ্নী নিরুপমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুপমা তখন 'দিদি' ও 'অন্নপূর্ণার মন্দির' প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে কিছু যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, আমিও তখন 'স্বেচ্ছাচারী' লিখিয়া ভারতীতে ছাপাইয়াছি। (ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪, ৫৮৭-৮২ পৃঃ)

মাননীয় বিভূতিভূষণ ভট্ট মহাশয়ের এই রচনা পড়ে, সকল পাঠকের মনেই এই জিজ্ঞাসার উদয় হবে নিঃসন্দেহ যে, ১৩৫৭র পৌষের 'কথাসাহিত্যে' 'উপন্যাস-সাম্রাজ্ঞী' শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ৺নিরুপমা দেবীর স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল অনাবশ্যক রূক্ষ কটূক্তি করেছেন তার মূলে সত্য কতটুকু এবং তার মূল্যই বা কতটুকু?

এইবার স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের জীবন ও

রচনা সম্বন্ধে যেসকল কথা বলেছেন, এখানে তা উদ্ধৃত করা হল। এ থেকে ৺নিরুপমা দেবীর সঙ্গে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'অভিন্ন হৃদয় মন' বা 'সমানা আকুতি' কতটা, তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

'শরৎচন্দ্র বন্দনা।'

"পর্ব্বতের এক নিভৃত গুহায় নির্ঝর যেমন তাহার জীবনের কিছুদিন কাটাইয়া সহসা একদিন প্রবল বেগে পৃথিবীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং নিজের প্রচুর জীবন ধারায় তাহার দেশ গ্রাম অভিষিক্ত করিতে করিতে চলিতে থাকে, তেমনি পশ্চিমের এক সামান্য গৃহকোণে যে অদ্ভুত রচনাশক্তি ক্রম-পরিণতি লাভ করিয়া আজ বাংলা সাহিত্যভূমিকে তাহার অপূর্ব্ব রসধারায় অভিষিঞ্চিত ও প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেই অদ্ভুত শক্তি ও শক্তিমানের কথা ভাবিতে আজ আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। একদিন যে সুধা-নিস্যন্দিনী নির্ঝরিণীর স্নেহধারা "অভিমান," 'বাগা,' 'শিশু,' 'কোরেল গ্রাম,' 'বোঝা,' 'কাশীনাথ,' 'চন্দ্রনাথ,' 'দেবদাস,' 'বড় দিদি' প্রভৃতি রূপে সেই গুহাতলে বহিয়া সেই অখ্যাত দিনের স্নেহ-সঙ্গীগুলিকে মন্ত্রমুগ্ধ করিত, আজ সেই নির্ঝর তাঁহার বিপুল বিস্তৃত স্রোতে বঙ্গ-সাহিত্যভূমির বক্ষে "শ্রীকান্ত," 'পথের দাবী', 'দত্তা,' 'ষোড়শী,' 'পল্লী সমাজ,' 'গৃহদাহ,' 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি অসংখ্য চরিত্র তরঙ্গ-মালার বিচিত্র শোভা দান করিতেছে, ইহা মনে করিতেও কি সে দিনের সেই সঙ্গীগুলি এম গর্ব্বপূর্ণ এক বিচিত্র অনুভবে অনুভাবিত না হইয়া থাকিতে পারে?"

('শরৎচন্দ্র বন্দনা' নিরুপমা দেবী। [৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯] শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত শরৎবন্দনা, পৃঃ ১৫০)

"আমাদের শরৎদাদা"

……আমার দাদারা তাঁহাকে কতদিন হইতে জানিতেন তাহা ঠিক জানি না। কিন্তু আমি জানিলাম যখন আমার লেখা কবিতা লইয়া দাদারা অত্যন্ত আলোচনা করেন তখন। দাদাদের এক বন্ধু তাঁহার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র (মেজদা কিন্তু ইঁহাকে 'ন্যাড়া' বলিয়াই উল্লেখ করিতেন) তিনিও দাদাদের মারফৎ আমার লেখার পাঠক এবং সমালোচক।………

ইহার অল্পদিন পরেই মেজভাজ মেজদার নিকট হইতে এক বৃহদায়তন খাতা আমাদের সেই ক্ষুদ্রপরিসর সাহিত্যচক্রে হাজির করিলেন। তাহা অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত, নাম 'অভিমান!' শুনিলাম দাদাদের উক্ত বন্ধু শরৎচন্দ্রই ইঁহার লেখক। গল্পটি পড়িয়া যখন আমরা সকলেই অভিভূত, তখন মেজদা সাড়ম্বরে গল্প করিলেন যে "এই গল্পটি প'ড়ে একজন ন্যাড়াকে মারতে ছুটে, তাকে তখন এই পাঠকের ভয়ে ক'দিন লুকিয়ে বেড়াতে হয়।" ক্রমে বৌদিদি দাদার নিকটে তাঁহার বন্ধুর [শরৎচন্দ্র] সম্বন্ধে আরও কিছুকিছু গল্প সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করিলেন। আমরা তখন 'অভিমানের' লেখকের উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই উদাসী কবি-স্বভাববিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড মসজেদ ছিল (শোনা যাইত তাহা নাকি সাজাহানের আমলের) তাহার বৃক্ষছায়াময় পথে কখনও কখনও দেখা যাইত। কোনও গভীর রাত্রে সেই মসজেদের সু-উচ্চ প্রাঙ্গণচত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো 'ঘমানিয়া' নদীর (গঙ্গার ছাড়) তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজবৌদিকে শুনাইয়া বলিতেন "এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড।" আমাদের সেই অল্পদিন অধিকৃত বাসাটি উক্ত নদীর তীরে সুবিস্তৃত সুউচ্চ টিলার উপরে অবস্থিত ছিল। তাহার চারিদিকের অসমতল ভূমিতে তাহাকে পার্ব্বত্য অধিত্যকার মতই দেখাইত! সেই বাটীর অধিকারীর আত্মজনের কয়েকটি স্মৃতি-সমাধি নদীতীরের টিলার গাত্রে এমোচ্চভাবে স্থাপিত ছিল। আমাদের দল একদিন সেই স্মৃতি-সমাধি হইতে বায়ুপথে ভাসিয়া আসা গানের একলাইন আবিষ্কার করিল—"আমি দু'দিন আসিনি, দুদিন দেখিনি, অমনি মুদিলি আঁখি—"। ইহার পরে দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি; কিন্তু, বাঁশী কখনও সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের রচিত আরও একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল "গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জ বন"। আমাদের পাড়া খঞ্জরপুরেরই তিনি অধিবাসী ছিলেন, সেজন্য উক্ত মসজেদ ও নদীতীর প্রভৃতি তাঁহার বিচরণ স্থান ছিল এবং দাদাদের কাছেও প্রায়ই আসিতেন। হঠাৎ একদিন জানিতে পারিলাম—তিনি আমাদের ছোটদাদারই বিশিষ্ট বন্ধু! ইহাতে আমাদের দল বিশেষ গর্ব্বই বোধ করিয়াছিল।

আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোড়দা তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁহার সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরে ঐ সকল কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। একদিন দেখি ছোড়দা আমার একটি নূতন কবিতার মাথায় লিখিয়া দিয়াছেন—" আরো যাও—আরো যাও—দূরে, থামিও না আপনার সুরে"! পরে শুনিলাম শরৎদাদা নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন "ঐ একটি ভাব আর একটি কথা ছাড়া বুড়ি যদি আর পাঁচ রকম ভেবে লেখে তো লেখার আরও উন্নতি হবে।" এই কথাই ছোটদার হাতে উক্ত কবিতাকারে আমার লেখার মন্তব্যরূপে বর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহাদের এইরূপ মন্তব্যের পর আমি যে কবিতাটি লিখিয়া তাঁহাদের খুশী করি, তাহার কয়েকছত্র মনে পড়িতেছে;…সেও একটি সমাধির উদ্দেশেই কল্পনার সঞ্চরণ।…সেই ক্রমবর্দ্ধিতাকার খাতাখানার কথা আজও মনে আছে—যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় বা আশে পাশে তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) তরুণ জীবনের সাহিত্য রুচির প্রচুর প্রমাণ ছিল। তিনি নাকি ছোড়দাকে বলিয়াছিলেন যে "বুড়ি যদি চেষ্টা করে, ত' গল্পও লিখিতে পারিবে।" কিন্তু সেকথা তখন বোধহয় আমরা বিশ্বাস করি নাই। ক্রমে আমরা শরৎদার আরও কয়েকখানি খাতা পড়িতে পাই।

"বাসা" 'বাগান' 'চন্দ্রনাথ' 'শিশু' 'পাষাণ'। এই পাষাণ গল্পটিকে আর দেখিলাম না। একজন পরমাণুবাদী নাস্তিক পিতার সন্তানের মানসিক সংঘাতের যন্ত্রণায় আমরা এতই অভিভূত হইয়াছিলাম যে সে গল্পটির কথা আজও মনে আছে। পরে শুনিয়াছি যে 'অভিমানের' মতো সেখানিতেও একটি প্রসিদ্ধ ইংরাজী গল্পের ছায়া ছিল। কিন্তু ঐ দুইটি গল্পে যে তরুণ শরৎচন্দ্রের কতখানি প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল সে দুইটি নষ্ট না হইলে আজ তাহার বিচার হইত। এই 'শিশু' গল্পটিই পরে 'বড়দিদি' নাম ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে তাঁহাদের 'সাহিত্যসভা' ও 'ছায়া'র কথাও জানিতে পারি। আমার লেখাও তাহাতে 'শ্রীমতী দেবী' নামে তাঁহারা দিতে লাগিলেন। একটু আধটু গল্প লেখার চেষ্টা আসিলেও শরৎদাদার গল্প পাঠে সে ধৃষ্টতা প্রকাশে তখন বোধহয় আমাদের লজ্জা আসিত। শ্রীমান সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র এবং আমার ছোড়দা—ইহাদের সঙ্গেই আমার কবিতার প্রতিযোগিতা চলিত। শরৎদাদাই বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন এবং ছোটদার মারফৎ তাহা আমি পাইতাম।…সমালোচনা শক্তির বিকাশও শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যসঙ্গী গুলির মধ্যে আনিবার নানাবিধ পথ নির্দ্দেশ করিতেন। শরৎদাদা কবিতা লিখিতে পারিতেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ছোট্ট একটি 'গাথা' ছাড়া আর কিছু কখনও দেখি নাই। সেটির নাম মনে নাই, কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি লাইন মাত্র তাহার মনে আছে। প্রথম লাইনটি—'ফুলবনে লেগেছে আগুন।" সুপ্রভা আর ইন্দিরা নামে দুইটি নায়িকার (নায়কের নাম মনে নাই) মনোভাব বিশ্লেষণ, পরে যথারীতি একজনের (সুপ্রভার) বিষপানে মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই তাহার জয়ের পতাকা উড্ডীন হওয়া ইত্যাদি—ইহাই 'গাথার' বিষয় হইলেও বর্ণনায় অনেকখানি ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল।

এইরূপে তিনি সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার সভাগুলির আদি গুরু-স্থানীয় ছিলেন। তবে, আমার লেখা 'তারার কাহিনী' 'প্রায়শ্চিত্ত' ও এইরূপ ছোট ছোট গল্পাকারে গল্প তাঁহাদের 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইলেও গল্প লেখার ক্ষমতা অন্ততঃ আমার মধ্যে সে সময়ে আসে নাই।…

"…শরৎদাদা বোধহয় তখন গোড্ডা নামক স্থানে চাকরী করিতে গিয়াছিলেন, অথবা মজঃফরপুর আদির দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সেই গল্প (উচ্ছৃঙ্খল) পাঠে তাহার মাথার উপরে লিখিয়া দেন্ "তুমি যে নিজের মত করিয়া অন্যকে ফুটাইতে পারিয়াছ ইহাতে বড় খুসী হইলাম।"

ইহার পরেই বোধহয় "দেবদাস" লেখা হয়। ঠিক মনে পড়ে না।

'মন্দির' গল্প লেখা আমরা দেখি নাই; কিন্তু তিনি ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে 'উক্ত গল্প পড়িয়াই তাহা যে শরৎদাদার লেখা—ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি। পরে 'যমুনা'য় তাঁহার পুরাতন ও নূতন লেখা নানা গল্প প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পরে তিনি একবার আমাদের বাড়ীতে (বহরমপুরে) আসিয়া কয়েকদিন অবস্থানও করিয়াছিলেন। একটি কথার স্মরণে তাঁহার স্নেহের পরিচয় আজও মনে আসিতেছে; কথাটি নিতান্ত পারিবারিক কথা। ছোটদা তখন বি-এল পাশ করিয়াছেন, কিন্তু ৺পিতৃদেবের মৃত্যুর জন্য যে তাঁহাকে তাঁহার বড় সাধের এম্ এ পড়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি [শরৎচন্দ্র] প্রস্তাব করেন—ছোটদা কলিকাতায় গিয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়া এম্ এ পড়িবেন। আমরা তাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি ক্ষুণ্ন হইলেন। এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি 'চরিত্রহীন' লিখিতে আরম্ভ করেন এবং যমুনায় তাহা প্রকাশিত হইলে আমাদের কেমন লাগিতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান্।

ইহার বহুদিন পরে সাহিত্য সম্রাট রূপে বহরমপুরে তিনি আর একবার আসিয়াছিলেন এবং অল্পক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গেও দেখা করিয়া যান্। সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে দাদা এবং তাঁহার তদানীন্তন বন্ধু মহলে যাহা আলোচনা হইয়াছিল সে কথাটিও আজ মনে পড়িতেছে। তাঁহার [শরৎচন্দ্র] জন্য মস্ত বোট-পার্টি সজ্জিত—মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী (অধুনা মহারাজ) স্বয়ং অপেক্ষা করিতেছেন—সময় বহিয়া দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইতেছে—'উৎসবরাজে'র দেখা নাই! তখন বেশির ভাগ ব্যক্তিই এজন্য তাঁহার [শরৎচন্দ্রের] বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কে না কি বলিয়াছিলেন—"এইই তো ঠিক—কবি কি সকলের হাত ধরা—নিয়মে বাধা পুতুল হবে? সে স্বাধীন—স্বতন্ত্র—তার বশেই সকলে চল্‌বে—সে কারও বশে নয়।"……

আজ তাঁহার শ্রাদ্ধতিথিতে আর একটা শ্রাদ্ধতিথির কথা মনে পড়িতেছে, যাহাতে তিনি আমাদের পূর্ণ মাত্রায় অবরোধ প্রথা বিশিষ্ট গৃহান্তপুরের মধ্যে আত্মজনের মত প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেদিন আমার ৺স্বামীর সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ দিন। উক্ত "খমানিয়া" নামে অভিহিত গঙ্গার ছাড়ের উপরে আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি ঠাকুরবাড়ি ছিল; তাহাতেই উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। আমার এক মাতৃতুল্যা বয়স্কা বিধবা ভ্রাতৃজায়া (জ্যেষ্ঠতাতের পুত্রবধূ) আমাকে সেইখানে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলে দেখিলাম—দাদারা বা ভগ্নীপতি কেহই সেখানে উপস্থিত হন্ নাই; (বোধ হয় দুঃখে) মাত্র ছোটদা [বিভূতি ভট্ট]* আর একজন কাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিতেছেন। পরে বুঝিয়াছিলাম তিনিই শরৎদাদা। উক্ত কার্য্যের দানাদির মধ্যে তাঁহাদের একটা ভুল হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে সসঙ্কোচে আমি পুরোহিতকে তাহা নিবেদন করিলে তাঁহারা সেটি সংশোধনার্থে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তখন অসঙ্কোচে বড় ভাইয়ের অধিকারে আমাকে উদ্দেশ করিয়া শরৎদাদা বলিলেন—"ত্যাখ' দেখি,—কতটা হাঙ্গামে পড়তে হল—ভুলটা এতক্ষণ পরে ধরিয়ে না দিয়ে তখনই দিলে না কেন?" আমি খুবই অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। সেদিন ঘৃত মধু ইত্যাদির গন্ধে একটা ভিমরুল্ (যাহা পশ্চিমে বড্ড বেশি) উক্ত শ্রাদ্ধ কার্য্যের মধ্যেই আমাকে মর্ম্মভাবে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল; কিন্তু সেটা এমন সময়—যাহার মধ্যে চঞ্চল হওয়া বা আসন ত্যাগ করা

---

* উদ্ধৃতির মধ্যে [চৌকাবন্ধনীযুক্ত] মন্তব্যগুলি সমস্তই আমার।

উচিত মনে হয় নাই, যখন সেটা রক্ত বহাইয়া দিয়াছে তখন তাঁহারা (ছোট্‌দা ও শরৎদাদা) জানিতে পারিয়া বিষম ব্যস্তভাবে তাহার প্রতিবিধানার্থ ছুটাছুটি বাধাইয়া দিলেন। ছোট্‌দার সঙ্গেই শরৎচন্দ্র ব্যাকুলভাবে একবার দধি একবার মধু লইয়া বিদ্ধ স্থানে দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন—অথচ তখন আমাদের সঙ্গে পরিচয় সামান্যই। প্রতিবাসী এবং দাদাদের বন্ধুভাবেই সাহায্যার্থে আসিয়াছিলেন মাত্র। শ্রাদ্ধান্তে যখন উক্ত ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে বাড়ী ফিরিতেছি—দেখি তখন শরৎদাদা আমাদের বাড়ীর দিক্ হইতে পুঁটুলীর মত কি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ছোট্‌দার হাতে দিলেন। ছোট্‌দা তাহা ভ্রাতৃজায়ার হাতে দিলে দেখি একখানা পাড়ওয়ালা কাপড় ও হাতের গহনা—৮ শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে যাহা বাড়ীতে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। মনের উত্তেজনায় বোধহয় সে সময় আবার সেগুলা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশই হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে জিদ্ সেদিন জয়ী হইতে পারে নাই। মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া তো কাঁদিতেই ছিলেন—ছোট্‌দা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছেন এবং একজন বাহিরের লোক—তিনিও তাহাদের সঙ্গে কাঁদিতেছেন—এ দৃশ্য সেদিন শোকে মূঢ় ব্যক্তিকেও নিজ কার্য্যে লজ্জা আনিয়া দিয়াছিল।

শরৎদাদার বন্ধুবর্গ যে তাঁহার মনকে খুব কোমল পরদুঃখকাতর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, সেদিনে আমাদের নিকটেও তাহা এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল।

— ভারতবর্ষ, চৈত্র সংখ্যা ১৩৪৪ সাল, পৃষ্ঠা ৫৯৪-৫৯৮

স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর এই লেখার পর মাননীয় অনুরূপা দেবীর বিবৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সবশেষে আরও দু একটি বিষয় মীমাংসার প্রয়োজন আছে। মাননীয়া অনুরূপা দেবী লিখেছেন—

"একটা ধৃষ্ট মন্তব্য দেখে নিতান্তই মর্ম্মাহত হতে হয়েছে। কোন এক দৈনিক সংবাদপত্রে নিরুপমার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, দারুণ অর্থাভাবে জগত্তারিণী মেডাল্ প্রভৃতি বিক্রি করে তার চিকিৎসাদি করতে হয়েছিল। এ সংবাদ সংবাদদাতা কোথায় পেয়েছেন জানিনা। জরুরী প্রয়োজনে দূরবিদেশে যদিই বা সাময়িকভাবে কোন অলঙ্কারাদি বন্ধক রেখে কারুকে টাকা ধার করতেই হয় সেটা কি জনসাধারণকে উৎফুল্ল করবার মত এতই আনন্দদায়ক প্রয়োজনীয় সংবাদ?" —কথাসাহিত্য পৌষ ১৩৫৭, ২২৩ পৃঃ

এখানে মাননীয়া অনুরূপা দেবী স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর আর্থিক দুরবস্থা ও ঋণ গ্রহণের খবরকে অসম্মানকর ধৃষ্ট মন্তব্য বলে তিরস্কার করে নিজে কিন্তু সেই নিবন্ধের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের হীন অবস্থা ও অর্থসাহায্য প্রার্থনার সংবাদ সাগ্রহে পরিবেশন করেছেন—

"নিরুপমারা ভাগলপুর ত্যাগ করবার পূর্ব্বেই শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে পলাতক এবং একটি নাগা সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে মজঃফরপুরের কাছারীর মাঠের কোন্ গাছতলায় আমার স্বামী ও তাঁর বন্ধুদের দৃষ্টিগোচর হন্।......আমারই এক সম্পর্কিত দেবর তাঁকে আবিষ্কার করে, ধর্ম্মশালায় অসুস্থ অবস্থায় দেখে আমাদের বাড়ী নিয়ে আসেন। সেখানে বৎসর দুই [?] বাস করার পর তাঁকে রেঙ্গুণের পথেই দেখা যায়। ইতিমধ্যে মজঃফরপুর ছাড়ার পর বার দুই কিছু অর্থ-সাহায্য চেয়ে আমার স্বামীকে পত্র লেখেন—"

—কথাসাহিত্য পৌষ ১৩৫৭, ২২৩ পৃষ্ঠা

বাংলাদেশের পাঠকরা মাননীয়া লেখিকাকে তাঁর নিজেরই ভাষায় প্রতিপ্রশ্ন করতে পারেন নাকি—

"জরুরী প্রয়োজনে দূর বিদেশে যদিই বা সাময়িকভাবে কোন কারুকে অর্থসাহায্য চাইতেই হয়, সেটা কি জনসাধারণকে উৎফুল্ল করবার মত এতই আনন্দদায়ক প্রয়োজনীয় সংবাদ?—"

লেখিকা ঐ নিবন্ধে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবীর শ্বশুরবাড়ীর সম্পত্তির আয় এবং পিতৃগৃহের অবস্থা মধ্যবিত্ত সংসারের পক্ষে কিছুমাত্র হীন না হওয়ায়, সবচেয়ে বড়ো কথা ভাই-ভাইপোরা থাকতে, তাঁকে জগত্তারিণী মেডেল বিক্রি করতে হয়েছে এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমরা যথার্থই লেখিকার সঙ্গে আন্তরিকভাবেই একমত্। শুধু তাই নয়, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রও ভাগলপুরে ও অন্যত্র তাঁর বহু ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং আত্মীয়দের মধ্যে পরমভক্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু গিরীন, সুরেন, উপেন প্রভৃতি এবং মজঃফরপুরে তাঁর বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য থাকা সত্ত্বেও লেখিকার স্বামীর কাছে বারংবার অর্থসাহায্য ভিক্ষা চেয়েছিলেন এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিতান্ত অন্তরঙ্গতা ভিন্ন মানুষ মানুষের কাছে দূর দেশ হতে অর্থ সাহায্য চাইতে পারে না। বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের মতো অভিমানী মানুষ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় লেখিকা যে-শরৎচন্দ্রকে পথে পড়ে মরতে দেখে কুড়িয়ে এনে নিজেদের বাড়ীতে শুধু আশ্রয় দিয়েছিলেনই নয়, সেখানে শরৎচন্দ্রের মত গৃহবিবাগী উদাসী মানুষও দীর্ঘ দুই বৎসর (!) অবস্থান করেছিলেন,—(যদিও তা' সত্য নয়, সকলেরই এটা জানা আছে। কিন্তু লেখিকার রচনার স্বেচ্ছাকৃত অস্পষ্টতার জন্য পাঠকদের মনে এই ধারণাই জন্মাবে, যেন তাঁর বাড়ীতেই শরৎচন্দ্র বৎসর-দুই বাস করেছিলেন।) সেই শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে মাননীয়া অনুরূপা

দেবী মুষ্টিভিক্ষা স্বরূপ 'ভারতবর্ষে, বা অন্য কোনও পত্রিকায় দুই লাইন শ্রদ্ধাঞ্জলি না হোক; সামান্য স্মৃতিকথাও লিখে শরৎচন্দ্রের প্রতি সমসাময়িক-সাহিত্যিকের কৃত্য সম্পন্ন করতে পারেননি। যে-কর্তব্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী থেকে বাংলাদেশের জীবিত সাহিত্যিক প্রত্যেকেই সম্পাদন করেছিলেন। আজ শরৎচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর পরে ৺নিরুপমা দেবীর লোকান্তর উপলক্ষে তিনি যে-ভাষায় ও যে-ভঙ্গীতে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অযাচিত ও অবান্তরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে আমাদের দুঃখিত ও লজ্জিত হওয়া ছাড়া আর উপায় কি আছে?

সকলের চেয়ে বিস্ময়ের কথা, যে-মাসিকপত্রের প্রকাশক ও সম্পাদকেরা নিজেরাই কথাসাহিত্যিক, সেই পত্রিকাতে বাংলা দেশের সর্বজনবন্দ্য কথাসাহিত্যিকের বিরুদ্ধে এত বড় একটা অপবাদ ও কুৎসা মুদ্রিত হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধা প্রবীণা লেখিকার রচনাটি আংশিকভাবে প্রকাশিত হলে কোনও কথাই ছিল না। যে-অংশে বাংলা কথা-সাহিত্যের পরম গৌরব সেই স্বর্গগত কথা-সাহিত্যিক সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাষা ও ভঙ্গী শালীনতার সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছে—সে অংশ প্রকাশ ও সম্পাদনার সুরুচি এবং সৌজন্যের গুরুদায়িত্ব তাঁরা কেমন করে বিস্মৃত হলেন?

একালের জীবন-ধারা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বাপ খুব ধনী…ব্যাঙ্কার…বিপত্নীক। চার ছেলে। বড় মানুয়েল, বয়স চব্বিশ বছর; মেজো আন্তনিয়ো…বয়স তেইশ; সেজো জোশ্…বাইশ; ছোটর নাম দিমাস… তার বয়স একুশ বছর।

চার ছেলে বি-এ পাশ করেছে। কিন্তু বি-এ পাশের একালে কোনো দাম নেই আর…পথে-ঘাটে বি-এর ছড়াছড়ি।

চার ছেলেকে বাপ ডাকলেন, ডেকে বড়কে বললেন—আমার বয়স হয়েছে! আমি আর ক'দিন! আমি বেঁচে থাকতে থাকতে বেছে নাও…কি পেশা ধরবে!

বড় বললে—আমি উকিল হবো।

বাপ বললেন—বেশ—আমি ব্যবস্থা করছি।

মেজো বললে—আমি ডাক্তার হবো।

বাপ বললেন—খুব ভালো কথা।

সেজো বললে—আমি ব্যবসা করবো, বাবা, তোমার মতো ব্যাঙ্কার হবো…চট্ করে বহু টাকা রোজগার হবে।

বাপ বললেন—বেশ।

তার পর ছোট! ছোট বললে—আমি চুরি-চামারি করে' দিন কাটাবো!

রাগে বাপ উঠলেন জ্বলে…বললেন—হতভাগা…ছোটলোক! ভদ্র-বংশে জন্মে এমন তোর দুর্মতি।

ছোট বললে—একালে সৎপথে পয়সা হবে না, বাবা।

বাপ দিলেন ধমক,—চুপ রও।

ছোট বললে—চুপ রও কি! আমার পণ…আমি…

ছোটর কথা শেষ হলো না। বাপ তুললেন গর্জ্জন—তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করলুম…একটা পাই পয়সা দেবো না। আমার বাড়ীতে তোমার ঠাঁই হবে না, জেনো।

ছোট বললে—কুছপরোয়া নেই।

বাপ বললেন—দূর হয়ে যা আমার বাড়ী থেকে! তুই আমার ছেলে নোস! আমি তোর কেউ নই!…

ছোটখাট নাটকের অভিনয় যেন…মর্মভেদী নাটক!

ছোট দিমাস এলো বাড়ীর পুরোনো চাকর রামনের কাছে…বললে—রামন, আমাকে হাজার খানেক টাকা ধার দিতে পারিস? আমি শুধে দেবো নিশ্চয়।

রামন বললে—দাঁড়াও, দেখি, কত টাকা আমার আছে।

দীর্ঘকালের সঞ্চয়…আড়াইশো টাকা…এনে রামন দিলে দিমাসের হাতে। দিমাস টাকা নিলে…নিয়ে বললে

—এ ধার আমি নিশ্চয় শোধ করবো, রামন। তুই ভাবিস্ নে। এ টাকা নিয়ে আমি ব্যবসা ফাঁদবো!

তার পর পঁচিশ বছর কেটে গেছে। সুদীর্ঘ কাল… পঁচিশ বছরে ছোট দিমাসের কোনো খবর নেই।

বাপের বয়স এখন সত্তর পার হয়েছে। শীর্ণ মূর্তি…অবশ অঙ্গ। তার উপর ব্যবসা গেছে নষ্ট হয়ে…ব্যাঙ্ক ফেল্… দুচারজন বন্ধুবান্ধবকে মোটা টাকা ধার দিয়েছিলেন… তারা আর উপুড় হস্ত করে নি। বন্ধুরা নিরুদ্দেশ। বাড়ী বাগান দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে। বস্তীর বুকে সঁ্যাতানে একতলা বাড়ী। সেই বাড়ীতে একখানা ঘরে বাপ থাকেন… ঘরের ভাড়া মাসে বারো টাকা করে'। এক বন্ধু দয়া করে' বাপকে মাসে মাসে কিছু টাকা দেন…তাতেই তাঁর দিন চলে! বেচারী!

বড়, মেজো, সেজো… তিন ছেলেরও দুর্ভাগ্যের সীমা নেই।

বড় মান্থয়েল…উকিল। ৬টি মকর্দ্দমা পেয়েছিল…ছুটিই হেরেছে। নতুন উকিলকে পুরোনো উকিলরা বিষনজরে দেখে। ভাবে, এলো আর-একজন ভাগীদার। কাজেই মান্থয়েল মকর্দ্দমা হারতে তারা রটাতে লাগলো… বোকা গাধা উকিল…ওকে দিয়ে কি মামলা জেতা যায়! দুর্নামের ফলে মান্থয়েলকে কোর্ট ছেড়ে দিতে হলো। একটা ফার্মে সে করে চাকরি…খাতা লেখার কাজ—মাহিনা পায় মাসে একশো টাকা করে'। ঘরে স্ত্রী, পাঁচ-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না! মান্থয়েলের দিন চলে কোনোমতে কষ্টে-সৃষ্টে!

মেজো আন্তনিয়োর ঠিক এমনি দুর্দ্দশা…ডাক্তার হয়ে রোগী পায় না! নতুন ডাক্তারকে পয়সা দিয়ে কে ডাকবে? গরীব দুঃখী…যাদের ডাক্তার ডাকবার পয়সা নেই…ভুগে ভুগে মৃত্যুর দ্বারে গড়িয়ে এসে পড়েছে, এমনি দু-একজন রোগী তার শরণ নিলে। কিন্তু ভুগে ভুগে তাদের প্রাণের দীপে তেল শুকিয়ে এসেছে…বড় ডাক্তারের ওষুধেও সে-দীপে তেল আসে না…আন্তনিয়ো তাদের কি করে বাঁচাবে! তারা মরে গেল…বিধির বিধানে কিন্তু দুর্নামের ছোপ লাগলো আন্তনিয়োর!…কাজেই তার পশার হলো না! একটা ডিসপেন্সারিতে সে চাকরি করছে…সামান্য মাহিনা পায়। তাতেই কোনোমতে তার সংসার চলে।

সেজো জোশ্ ব্যবসায় নেমেছিল…কিন্তু তাতে জ্বললো লাল বাতি!…লোকজনের বেইমানী…ধারে বিক্রীর ধূম—তার উপর নিত্য-নতুন ডিউটী…ট্যাক্স…কর্পূরের মতো ব্যবসা গেল উবে! এখন ছোট একটা মণিহারীর দোকান খুলে বসেছে…খাতা পেন্সিল, ছুরি, কাঁচি, ফিতা, ছাতা-লাঠি, পুতুল-সাবান-সেন্ট লজেঞ্চেস…এই সবের বেসাতি! এতে যেটুকু লাভ হয়…তার উপরেই সংসারের নির্ভর! সকলে বলে—যেমন বাপ, তেমনি বেটা…ব্যবসা-বুদ্ধি সমান দুজনেই ফতুর!

তিন ভাই সন্ধ্যার সময় আসে বাপের কাছে…সুখ-দুঃখের কথা হয়…কত ব্যথার নিশ্বাস পড়ে!

ছোট দিমাসের কথা ওঠে। তার হলো কী? কোনো খপর নেই!

বাপ বলেন—জেল খাটছে…চোরের যা হয়ে থাকে!

মান্থয়েল বলে—বেঁচে আছে তো?

মেজো বলে—সত্যি… মারা গেল শেষে!

সেজো বলে—ভগবান জানেন।

বাপ বলেন—কুপুত্র…আমাদের সে কেউ নয়। তার কথা মুখে এনো না কেউ!

একদিন বৈকালে—সেদিন রবিবার…তিন ছেলে এসেছে বাপের কাছে…ক'জনে বসে সুখ-দুঃখের কথা হচ্ছে, বাড়ীর সামনে একখানা জমকালো গাড়ী এসে থামলো। চাকর এসে একখানা কার্ড দিয়ে বললে—গাড়ীর সহিস কার্ড দেছে… গাড়ীতে বসে আছেন মস্ত একজন বড়লোক।

মান্থয়েল কার্ড নিয়ে দেখলো কার্ডে নাম লেখা—শাহাগানের মার্কুইস!

সকলের চোখগুলো হলো এত-বড়! কে এ বাড়ীর মার্কুইস! এখানে হঠাৎ?

বাপ শুয়ে আছেন বিছানায়…রোগশয্যা। তিন ছেলে চটপট চেয়ারগুলো ঠিকঠাক করে সাজালো…টেবিলটা নিলে ঝাড়ন দিয়ে মুছে। একটু ছিমছাম করা! এত-বড় ধনী এসেছেন দেখা করতে!

বাপ বললেন—শাহাগানের মাকু´ইস!...

শাহাগানে ছিল বাপের সাত-পুরুষের বাস...তিনি সে-বাস তুলে দিয়ে সহরে এসে ব্যবসা ফেঁদেছিলেন...পয়সা-কড়ির জন্য! দেশের বাড়ীতে কখনো যান নি! তাছাড়া সে গ্রামে মাকু´ইস ছিল না কোনোকালে!

• •

মাকু´ইস এলো ঘরে। বয়স হবে পয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর! চমৎকার বেশভূষা...দিব্য কান্তি...সেণ্ট মেখেছে...ভুরভুর করছে সুবাস!

তিন ভাই মাকু´ইসকে দেখে চমকে উঠলো· সমস্বরে বললে—আরে, দিমাস না?

ফ্যাশনের চুল-কাটা...ফ্যাশনের দাড়ি গোঁফ...তবু সে মুখ চিনতে দেরী হলো না! দিমাস এলো বাপের কাছে...নতজানু হয়ে বাপকে বললে—গল্পের বাউণ্ডুলে ছেলে ছেঁড়া কানি পরে বাড়ী ফিরেছিল, বাবা...সে সেই কোন পুরাকালের কথা! একালের হতভাগা ছেলে বাড়ী ফিরছে শুধু ক্রোড়পতি হয়ে নয়...সে ছেলের দেশে আজ কী অসাধারণ প্রতিপত্তি!··কী খ্যাতি...তোমাকে অমান্য করে চলে গিয়েছিলুম...আমার সে অপরাধ ক্ষমা করো বাবা।

ঐশ্বর্য্যের এমনি জলুশ! সকলের মনে কী আরাম! এই দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ধকারে দিমাস যেন চাঁদের জোৎস্না বয়ে এনেছে! পঁচিশ বছর আগেকার সে-সব ক্ষোভ-অভিমান চকিতে গেল মিলিয়ে!

বাপের দু-চোখে জল...বাপ বললেন গদগদ কণ্ঠে...দিমাস...ফিরে এসেছিস! মানুয়েল, আস্তনিয়ো, জোশ—দিমাসকে তিন ভাই বুকে চেপে ধরলো...কী তাকে খাতির! কী অভ্যর্থনা! যেন ধ্যানের দেবতাকে পেয়েছে তারা!

কত কথা...কত কাব্য...কত হাসি কত আনন্দ!

অনেকক্ষণ পরে বাবা বললেন—এখন বলো দিমাস, আমরা শুনি, কি করে তোমার হলো এত ঐশ্বর্য্য...এমন মানসম্ভ্রম, প্রতিপত্তি।

দিমাস বললে—রাগ করোনা, বাবা...স্রেফ চুরি-চামারি...ধাপ্পাবাজি, আর জুয়াচুরি...বাঁদরামির জোরে!

বাপ উঠে বসলেন বিছানায় ·বললেন—না, না, তা কখনো হতে পারে!

দিমাস দিলে জবাব—একালের সভ্য সমাজ ফতোয়া দেবে, আমি কোনো অন্যায় করিনি··যদি অন্যায় মনে করতো, তাহলে আমার আজ এত ঐশ্বর্য্য...এত খাতির হতো কখনো? আমি আজ দেশের একজন আদর্শ কৃতী পুরুষ!...একালের রীতি মেনে আমি চলেছি! ·সব কথা বলবো। কিন্তু তার আগে··রামন··আমাদের রামন কোথায়?

মানুয়েল বললে—সে একেবারে অথর্ব্ব হয়ে গেছে...নড়তে পারে না। অনেক চেষ্টা করে তাকে আমরা আতুর-আশ্রমে রাখিয়েছি।

দিমাস বললে—ও! তার কাছে কাল সকালেই আমি যাবো। এখান থেকে চলে যাবার সময় সে আমাকে দিয়েছিল তার সম্বল··আড়াইশো টাকা ধার। তার সে ধার সুদে-আসলে আগে আমি শোধ ক'রে দিতে চাই। সেই আড়াইশোর উপর নির্ভর করেই আমার এত ঐশ্বর্য্য আজ।··আর শোনো, আমি যা করতে চাই।

দিমাস বললে তিন ভাইকে—তুমি বড়দা, তোমার জন্য আমি আলাদা করে রেখেছি বিশ হাজার টাকা...তোমাকে দেবো। মেজদা, সেজদা...তোমাদেরো বিশ-হাজার, বিশ-হাজার টাকা দেবো...অবস্থা স্বচ্ছল হবে। আর বাবা...তোমার জন্য কাসতেলেনায় মস্ত বাড়ী কিনেছি। সে-বাড়ী সাজানো-গুছোনা কমপ্লীট...সেই বাড়ীতে আমরা সকলে থাকবো...তুমি থাকবে আমাদের মাথার উপর রাজার হালে।

...বাপের মুখে কথা নেই। তিন ভাই নিস্পন্দ...নির্বাক! স্বপ্ন দেখছে না কি?

দিমাস বললে—রামন দিয়েছিল আড়াইশো টাকা...আর আমার এক বন্ধু দিয়েছিল আড়াইশো! এই পাঁচশো নিয়ে আমি গেলুম সোজা একেবারে মার্কিন মুল্লুকে...সে

মুল্লুকে শুধু টাকা আছে, অঢেল টাকা। ধর্ম্ম নেই···ন্যায় নেই, নীতি নেই···বিবেচনা নেই, আক্কেল নেই। অদ্ভুত দেশ···সভ্যতার মণিমুকুট এই দেশ! সেখানে এক মস্ত জাহাজী কারখানায় চাকরি জোগাড় করে নিলুম। মালিক ক্রোড়পতি···ছ মাস চাকরি করবার পর মালিকের স্ত্রীকে নিয়ে দিলুম চম্পট।

বাবা আতঙ্কে নীল! তিন ভাই উঠলো আঁৎকে!

দিমাস বললে—তোমরা বলবে বাঁদরামি· ·বেইমানী! কিন্তু সেখানকার সমাজে···সেখানকার যত খবরের কাগজে এ ব্যাপারকে তারা বলে উঠলো—প্রণয়-নাট্য-লীলা!···সকলে আমার নামে জয়ধ্বনি তুললো।···মালিক বুড়ো···তার স্ত্রী যুবতী···সুন্দরী···আর স্ত্রীর মন কী ভয়ানক জীবন্ত···যাকে কবি-নাট্যকাররা বলেন—সংস্কার-বর্জ্জিত উদার মনের মানুষ···প্রাণ-হিল্লোলা! কাগজে-কাগজে আমার আর মালিকের স্ত্রীর ছবি বেরুলো···বুড়ো স্বামীর ছবিও সেই সঙ্গে!···সারা মার্কিন মুল্লুক আমাকে বানালো হীরো। স্ত্রীর হাতে অগাধ টাকা···দামী জুয়েলারি। তার টাকায় আমি মস্ত ব্যবসা ফেঁদে বসলুম···নিত্য নতুন কোম্পানি খুলতে লাগলুম···সোনার খনির শেয়ার ছাড়লুম···খনি ছিল···কিন্তু সে-খনিতে এক তিল সোনা ছিল না!···

বাপ বললেন—এ তো দস্তুরমতো লোক-ঠকানো! চীটিং!

দিমাস বললে—কিন্তু নিত্য সে-দেশে এমনিভাবে লোক-ঠকানো কারবার চলেছে! নিরেট আহাম্মকদের ঠকিয়ে পয়সা করাতে বুদ্ধিজীবীর অধিকার···এ যুগে কেউ তা অস্বীকার করবে না! শেয়ার বিক্রী হলো অজস্র। তার পর কারবার হলো ফেল্।···আমি নিজে কোনোদিন কোনো কারবারের মাথায় চড়ে বসিনি···অপরকে কর্ত্তা করে আমি মাহিনা-করা ম্যানেজার সেজে কাজ করেছি! তার ফলে সাজা-কর্ত্তা গ্রেফতার হয়ে জেলে গেছে···আমি নিষ্কলঙ্ক সরে এসেছি।···হাসচো কি মানুয়েল···তুমি তো কিছুকাল ওকালতি করেছিলে···বিচারে কারা জেতে? যার পয়সার জোর আছে···লোকবল আছে···হাকিমের সঙ্গে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে খাতির আছে, তারাই! ···ন্যায় অন্যায় সব ঐ টাকায়!

···এমনি করে' একটার পর আর-একটা ব্যবসা··· টাকার পাহাড় জমতে লাগলো। তার পর স্পেকুলেশন! পারিতে গেলুম···মস্ত ধনী ব্যবসায়ী···সেখানে বড়দের নিত্য ভোজ দেয়া···নিজেকে জাহির করা···মাঝে মাঝে ঝোপ বুঝে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান···দয়া-দাক্ষিণ্য···পারিসে টাকা খরচ করে সাহাগানের মার্ক্‌ইস উপাধি কিনলুম। ব্যস···মইয়ে চড়ে দিনে দিনে উঁচুতে ওঠা!···দেশে দেশে আমার নাম রটলো···কীর্ত্তিমান কৃতী পুরুষ বলে!

মানুয়েল বললে—বুদ্ধি বটে!

আন্তনিয়ো বললে···মার্ভেলস!

দিমাস বলতে লাগলো—পারি সহর···টাকার গোলাম দেশ। টাকার প্রত্যাশায় তারা বোধ হয় আগুনে ঝাঁপ খেতে পারে! সেখানে নানা ব্যবসা ফাঁদলুম! ফরাসী জাতটা যেন শিশু···অতি-সহজে ভোলে···তাদের ঠকানো খুব সহজ!···পানামা-ট্রাষ্ট, সোনার খনি···এ-সবের মোহ তাদের উদভ্রান্ত করে রেখেছে।···আমার বহু টাকা··· কাজেই পারি সহরে আমার প্রতিপত্তি হলো সীমাহীন ···সেখানেও বহু টাকা রোজগার করলুম। তার পর গেলুম রোমে···রোমে আমার ঐ মার্ক্‌ইস উপাধিটা কায়েমি করে নিলুম—স্রেফ ভোজ দিয়ে। তারপর কাজের পথ হলো সিধা···নিষ্কণ্টক। অনেকে আসে—কিছু আবিষ্কার করেছে, কিন্তু পয়সা নেই···আমার সাহায্য চায়। আমি শুনি তাদের আবিষ্কারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত···শুনে নিজের নামে সেগুলি চালিয়েছি। যার টাকা আছে, টাকার জোরে সে অসাধ্য সাধন করে, শুধু বিবেক-বস্তুটাকে মন থেকে বার করে দেওয়া দরকার। বিবেক, পুণ্যাপুণ্য···ন্যায়-অন্যায়···এ সব যারা ত্যাগ করতে পারে না,···তাদের উন্নতির কোনো আশা নেই এ-যুগে। গ্রন্থকার গ্রন্থ লেখেন ···তাঁর সে গ্রন্থ মেরে পাবলিশার তোলে বড় ইমারত··· কেনে গাড়ী! গ্রন্থকার না খেয়ে শুকিয়ে মরে। বড় বড় অভিনেতা, বড় বড় গাইয়ে-নাচিয়ে···তারা মরে খেটে— আর তাকে মেরে ইমপ্রেশারিয়ো হয় ধনকুবের! যে কিছু আবিষ্কার করে—সে মরে কাপিটালিষ্টের হাতে।··· ক্যাপিটাল—আমি আজ সেই ক্যাপিটাল! সারা দুনিয়া আমার পায়ে দেয় নতি···মেয়েরা আমাকে কামনা করে· ভালো কথা, জাহাজী মালিকের সেই স্ত্রী···সে আমাকে

ছেড়ে পালিয়েছিল···আমার এক মাহিনা-করা কেরাণীর সঙ্গে!···তাতে কিছু এসে-যায়নি আমার! দুনিয়ায় টাকার খাতির···তার জোরে নিত্য নব নারী মেলে!··· আমি আজ মস্ত ফাইনান্সিয়ার···এখন। কিছু টাকা দেবো চাঁদা কোনো স্কুলে···একটা হাসপাতালেও কিছু দেবো—এগুলো করা চাই···নিজেকে আরো উঁচুতে তোলবার জন্য!···এর দৌলতে আমি কি না হতে পারি? ডেপুটি···সেনেটর···মিনিষ্টার!···জানো, বাবা? আমি এখন তৈরী করবো দেশের নতুন আইন-কানুন—নিজের স্বার্থ আর সুবিধা প্রসারিত করতে!

বাপ···তিন ভাই···বিস্ময়ে হতবাক। অনেকক্ষণ পরে সকলকে স্বীকার করতে হলো—হুঁ, দিমাস্ বুদ্ধিমান বটে···যেমন স্মার্ট···তেমনি বিচক্ষণ! একেই বলে, কৃতী-পুরুষ···প্রতিভাধর!

(স্পানিশ গল্প : ব্লাশকো)

আমাদের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সার্থকতা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনৈতিক অগ্রগতির সহিত অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্যের যে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্বাধীনতালাভের পর বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদৃষ্ট হইতেছে, আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত না হইলে শক্তিমান অন্যদেশের উপর অনিবার্য্য নির্ভরশীলতার জন্য সে স্থান ভারতের পক্ষে সম্মানের না হইয়া বিপদেরই কারণ হইয়া উঠিবে। ভারতে বিদেশী মূলধন সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য সংগঠিত 'এক্সটারনাল ক্যাপিটাল কমিটি' তাঁহাদের রিপোর্টে (১৯২৪) সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, বিদেশীরা মূলধন নিয়োগ করিয়া এদেশে একটা কায়েমী স্বার্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং সেই কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাহারা এদেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা দাবাইয়া রাখিতে ও রাজনৈতিক অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করে। এদেশের বহু-লোকের উপর তাহাদের বিপুল অর্থনৈতিক প্রভাব থাকায় সে চেষ্টা সফলও হয়।

পৃথিবীতে আজ ধনতন্ত্রের জয়যাত্রা চলিয়াছে। অধিকাংশ দেশই এখন ধনতন্ত্রের মহিমায় চরম আর্থিক সঙ্কটের ভিতর দিয়া চলিতেছে। ভারত এই শোষিত দেশগুলিরই অন্যতম। দুর্গতি একক ভোগ করিতে না হওয়ারও একটা সান্ত্বনা আছে সত্য, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ভারত এখন সমুন্নত রাষ্ট্ররূপে এমন একটা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে, যাহাতে তাহার তীব্র দৈন্য ফুটিয়া উঠিতেছে রূঢ়তরভাবে। ভারত প্রভূত সম্ভাবনাময় দেশ বলিয়াই এই অর্থ সঙ্কটের স্থায়িত্ব গভীর পরিতাপের বিষয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে জাতিসঙ্ঘের পক্ষ হইতে ১৯৪৯ সালে পৃথিবীর ৭০টি দেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু বার্ষিক আয় সম্পর্কে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার শতকরা মাত্র ৭ ভাগের বাসভূমি হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একার যে জাতীয় আয় তাহা উল্লিখিত ৭০টি দেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ৪২ ভাগ। ইহাতেই বুঝা যায়, সম্পদ ও অর্থকরী বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োগপথের অসম বণ্টনের ফলে পৃথিবীর বৃহত্তর অংশকে দুর্গতির চরমে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুদ্র এক অংশ অধিকাংশ সুখ-ঐশ্বর্য্য লুটিয়া লইতেছে এবং বৃহত্তর অংশ অসহায়ভাবে ক্ষুদ্রতর অংশের হইয়া উঠিতেছে আজ্ঞাবহ দাসস্বরূপ। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার হারাইবার ফলে তাহাদের ভবিষ্যত অন্ধকার হইয়া যাইতেছে। জাতি সঙ্ঘের এই পুস্তকে ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৫৭ ডলার ধরা হইয়াছে। এই হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, গ্রেট-ব্রিটেন ও সোভিয়েট রুশিয়ার অধিবাসীদের বার্ষিক আয় যথাক্রমে ১৪৫৩ ডলার, ৮৭০ ডলার, ৭৭৩ ডলার ও ৩০৮ ডলার দেখান হইয়াছে।

ভারত সরকার ভারতের জাতীয় আয় নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের আগষ্ট মাসে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের জাতীয় আয় ধরিয়াছেন ৮,৭১০·কোটি টাকা। ভারতের লোকসংখ্যা ৩৪ কোটি হইলে মাথাপিছু সাংবৎসরিক আয় দাঁড়ায় ২৫৫ টাকা।

যুদ্ধ মুদ্রাস্ফীতিরূপ রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। গত দশ বৎসর যাবৎ এদেশে পণ্যাদির মূল্য অবিরাম বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পণ্যমূল্য-বৃদ্ধির হারের সহিত আমাদের উপার্জ্জন ক্ষমতা কিছুতেই তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। তাই আজ মাথাপিছু বৎসরে ২৫৫ টাকা আয় হইলেও ভারতবাসী দারিদ্র্যের জ্বালায় আত্মধিকৃত। অথচ ১৯৩৮-৩৯ সালে অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার আগে মাথাপিছু বার্ষিক আড়াইশত টাকা আয় ভারতবাসীর কাছে স্বপ্ন ছিল। ১৯৩১-৩২ সালে বিশিষ্ট অর্থনীতি-বিদ ডাঃ ভি কে আর ভি রাও ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় আয় হিসাব করিয়াছিলেন ১,৭৬৬ কোটি টাকা। ব্রিটিশ ভারতের তুলনায় দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা মোটের উপর পারাপই ছিল, তবু উভয় এলাকায় অধিবাসীদের আয় সমান ধরিয়াও সে সময় সমগ্র ভারতের জাতীয় আয় ২,২০০ কোটি টাকার বেশী হয় না। এ হিসাবে ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ৬৫ টাকা। আরও পূর্ব্বে

১৮৬৮ সালে দাদাভাই নৌরজী এবং ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় ধরেন যথাক্রমে ২০ টাকা ও ৩০ টাকা। ১৯৪৪ সালে বিখ্যাত বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতাগণ তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে ভারতের জাতীয় আয় বৎসরে ৬,৬০০ কোটি টাকা বা মাথাপিছু আয় বৎসরে ১৮৫ টাকায় তুলিয়া সন্তুষ্ট হইতে চাহিয়াছিলেন। এদিক হইতে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৫৫ টাকায় উঠাতো আশারই কথা!

কিন্তু অবস্থা সত্যই আশাপ্রদ নয়। আগেই বলা হইয়াছে, যুদ্ধের সময় হইতে ভারতে পণ্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে। ১৯৩৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধে, সেই সময় সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যসমূহের পাইকারী মূল্যের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিলে ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে ইহা বাড়িতে বাড়িতে ২৪৩ দাঁড়ায় এবং ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধ শেষ হইবার সময় সামান্য কমিয়া দাঁড়ায় ২৩৪। স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছিল যুদ্ধ শেষ হইবার পর পরিস্থিতি ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া আসিবে এবং জিনিষপত্রের দর কমিবে। এই আশা কিন্তু ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর কালেও নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যাদির মূল্যরেখা কমিবার পরিবর্ত্তে অবিরাম বাড়িয়া এখন সূচক সংখ্যার ৪০০ ছাড়াইয়া গিয়াছে। খাদ্যমূল্যমানের অবস্থা আরও খারাপ, ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের দর ১০০ ধরিলে বর্ত্তমানে ইহা প্রায় ৪৪০। সব জিনিষেরই এখন দর বেশী, কিন্তু খাদ্য-মূল্য এত বেশী যে, শুধু খাদ্য-সংগ্রহ করিতেই সাধারণ লোকের অধিকাংশ আয় চলিয়া যাইতেছে। একজন পূর্ণবয়স্ক ভারতবাসীর সুস্থভাবে বাঁচিতে দৈনিক নিম্নরূপ খাদ্যের প্রয়োজন বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন,—চাল, গম ইত্যাদি খাদ্যশস্য—১৬ আউন্স, তৈল জাতীয় পদার্থ—১·৫ আউন্স, ডাল—৩ আউন্স, চিনি—২ আউন্স, দুধ—৮ আউন্স বা মাংস, মাছ ও ডিম—২·৩ আউন্স, শাকসব্জি—৬ আউন্স এবং ফল—২ আউন্স। এই খাবারের মূল্য যুদ্ধের আগের দরে এক বৎসরের হিসাবে অন্ততঃ ৬৫ টাকা। কাজেই খাবারের দাম এখন সাড়ে চারগুণের কাছাকাছি হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্যের মূল্যও প্রায় চারগুণ হওয়ায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ ভারতবাসীর পক্ষে এখন অসম্ভব। বিগত দশবৎসর যাবৎ এই দুর্ভাগ্য চলিতেছে এবং শীঘ্র যে ইহার অবসান ঘটিবে এমন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। কাজেই মাথাপিছু বৎসরে ২৫৫ টাকা আয় লইয়াই বা সব খরচ কুলাইয়া ভারতবাসী মানুষের মত জীবন যাপন করিবে কি উপায়ে? যুদ্ধের আগের তুলনায় এখন সাধারণ ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মানও যে বাড়িয়াছে, ইহাও তো এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে।

এছাড়া আর একটি কথা আছে। বরাবরই ভারতবর্ষের ধনসম্পদ অসমহারে বণ্টিত। এদেশে একদিকে যখন মুষ্টিমেয় রাজা, মহারাজা, জমিদার ও শিল্পপতি প্রভৃতি প্রাচুর্য্যের মধ্যে দিন যাপন করে, অন্যদিকে তখন অসংখ্য দেশবাসী দুবেলা দুমুঠো অন্নসংস্থানকেই মনে করে পরম সৌভাগ্য। গত যুদ্ধের সময় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় অল্পসংখ্যক ব্যবসাদার ও শিল্পপতির হাতে দেশের অধিকাংশ বাড়তি সম্পদ চলিয়া গিয়াছে এবং ফলে মুদ্রাস্ফীতি সত্ত্বেও অসংখ্য সাধারণ ভারতবাসীর অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে শোচনীয়তর। অথচ মাথাপিছু আয় যখন হিসাব করা হয়, তখন দেশের সকলের আয় একত্রে ধরা হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া দেখিলে ভারতবাসীর মাথাপিছু ২৫৫ টাকা আয় সাধারণ ভারতবাসীর ব্যক্তিগত আয়ের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশী। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর কালে দেশের ধনসম্পদ অধিকতর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে বলিয়াই এই তফাৎ স্পষ্টতর হইয়াছে। যুদ্ধের আগে ভারতের ২,২০০ কোটি টাকা জাতীয় আয়ের দিনে মাথাপিছু ৬৫ টাকা বাৎসরিক আয়েও সাধারণ ভারতবাসী দরিদ্র ছিল, এখন মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে ৮,৭১০ কোটি টাকা জাতীয় আয় ও ২৫৫ টাকা মাথাপিছু আয়ে তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইয়া অবনতিই ঘটিয়াছে।

অনন্যা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমের স্বাক্ষর তব চারিধারে এ গৃহে আমার।
নৈকট্যের মিতালিতে ছেদ টানি রচিয়াছ দূর।
স্মরণের অবসরে খুঁজে ফিরি আলেখ্য তোমার।

দু'দিনেই মনে হয় নিরিবিলি জীবন বন্ধুর।
কল্পনার ঊর্ণনাভে পিয়াসী মনেরে দিই ভরি।
জীবনের রিক্তকুঞ্জে জেগে আছি লুব্ধ প্রতীক্ষায়।

অতীতের ইতিহাসে প্রথম প্রেমের পড়া পড়ি।
তাকাই ভবিষ্যপানে, বর্ত্তমান ভরে ব্যর্থতায়।

অনেক দিয়েচো জানি, পাইয়াছি মনের নাগাল।
তবু চাওয়া-পাওয়া দ্বন্দ্ব আজো যে গো চলে চিরন্তন।
অঙ্কুরিত বাসনারে তৃপ্ত করি দিবে ভাবীকাল,
বাঞ্ছিত জবাব বহি আনিবে কি জরিষ্ণু যৌবন?

প্রেম-স্বীকৃতিতে তব আছে জানি প্রত্যয়ের সুর,
হে অনন্যা, তাই কি গো কাছ ছাড়ি ভালবাস দূর?

রাজনীতিক দল—

দেশবিভাগ ও স্বায়ত্ত-শাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশ যে বহু সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে ভারতের বর্ত্তমান সরকার সে সকলের সমাধান করিতে অক্ষম হওয়ায় দেশে অসন্তোষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে ও বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহা অবশ্যম্ভাবী। আজ যাঁহারা দেশের শাসনকার্য্য—ইংরেজের মনোনীত বলিয়া—পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতার অভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরেজ এদেশে শাসনের যে কাঠাম করিয়াছিল, বর্ত্তমান শাসকগণ তাহাই কেবল যে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছেন, তাহা নহে; তাহা আরও দৃঢ় করিয়াছেন; ব্যয়বহুল শাসনপদ্ধতি আরও ব্যয়বহুল করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা বলিতেন, শিশু রাষ্ট্রে ভুলভ্রান্তি হয়; কিন্তু ভুল সংশোধিত হইতেছে না। আমরা একথা অস্বীকার করি না যে, বহুদিন পরাধীনতায় পিষ্ট জনগণ হয়ত ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত আশা করিয়াছিল এবং সেই জন্য অনিবার্য্য হতাশায় পীড়িত হইতেছে। কিন্তু তাহাদিগের সংযমের সীমাও যেন অতিক্রান্ত হইতেছে—অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, শাসনের ব্যয়বাহুল্য, নিন্দিত বিধিবিধানের প্রতি শাসকদিগের অতিরিক্ত অনুরাগ—এ সকলই লোকের অসন্তোষ-বৃদ্ধির কারণ।

স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগের নির্ব্বাচিত পার্লামেন্টের সদস্যদিগের আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন স্বৈর-ক্ষমতাপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছে। পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রী ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পার্লামেন্টের সম্ভ্রমের সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন বলা যায় না। সে সম্বন্ধে 'ষ্টেটস্‌ম্যান'পত্রের মন্তব্য, সে সময়ে মিষ্টার নেহরু যেরূপ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বন্ধুরাও মনে করিয়াছেন—তাঁহার বিশ্রাম প্রয়োজন। অর্থাৎ তাঁহার মস্তিষ্কের সুস্থতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

তাহার পরিচয় পাটনায়—আচার্য্য কৃপালানীর দলের সম্বন্ধে তাঁহার ধৃষ্ট মন্তব্যে সপ্রকাশ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—সে দলের কোনও আদর্শ নাই এবং তাহা মদ্যপানের আড্ডা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে! এই ধৃষ্ট উক্তিতে যদি কাহারও মনে হয়, জওহরলাল পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর "আনন্দ ভবনের" স্মৃতি ভুলিতে পারেন নাই, তবে তাহা কি একান্তই অসঙ্গত হইবে? আচার্য্য কৃপালানীও জওহরলালেরই মত কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। আজও তিনি কংগ্রেসের আদর্শ ত্যাগ করেন নাই—পরন্তু যে বিরোধিতা করিতে প্রবৃত্ত, তাহাকে তিনি "বন্ধুভাবের বিরোধিতা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। জওহরলালের উক্তিতে লর্ড রোজবেরীর সম্বন্ধে সাংবাদিক গার্ডিনারের মন্তব্য মনে পড়ে—"He never spoke without turning his guns on his old friends" আর সেই জন্যই শেষে লর্ড রোজবেরী বন্ধুশূন্য হইয়াছিলেন—"He was left a lonely figure in his lonely furrow—a political profligate at the end of his resources."

সেই বক্তৃতাতেই তিনি গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"বিরোধী দল গঠনে আমার আপত্তি নাই। মত হিসাবে দেশের পার্লামেন্টে বিরোধী দলে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়—দেশের অবস্থা বিবেচনা করিলে সেই মত কতকটা শিথিল করা প্রয়োজন হইতে পারে।"

অর্থাৎ জওহরলালের শাসনে দেশ যেভাবে জহরে (বিষে) জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার সম্বন্ধে গণতন্ত্রের মূলনীতিও আর প্রয়োগ করা যায় না। যদি তাহাই হয়, তবে কে দেশের সেই অবস্থা ঘটাইয়াছে?

পাকিস্তানপ্রীতির পূর্ণ পরিচয় প্রকট করিয়া জওহরলাল বলিয়াছেন, পাকিস্তানে অমুসলমানের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, ভারত রাষ্ট্রে মুসলমানের প্রতি সেইরূপ অত্যাচারই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এ উক্তি যে অসত্য তাহা ইতিহাস স্বীকার করিবে।

জওহরলাল এমন কথাও বলিয়াছেন যে, ভারত রাষ্ট্রে যাঁহারা বর্ব্বরোচিত কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাই আজ বড় বড় কথা বলিতেছেন! এই আক্রমণের লক্ষ্য কে? ইহা যদি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্য উদ্দিষ্ট হয়, তবে তিনি কি জন্য শ্যামাপ্রসাদকে—তিনি কংগ্রেসী কলমা না পড়িলেও—স্বীয় মন্ত্রিমণ্ডলে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহা কি তিনি বলিতে পারেন? তিনি পার্লামেন্টে যখন শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বলিয়াছিলেন, তখন শ্যামাপ্রসাদ যে তাঁহাকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্টদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বর্ণিত করিয়াছিলেন,

তাহাও উল্লেখযোগ্য। জওহরলাল যে বলিয়াছেন, ভারতরাষ্ট্রে হিন্দুরা মুসলমানদিগের সম্বন্ধে যে অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা পাকিস্তানে মুসলমানদিগের অনুষ্ঠিত অত্যাচারের সমান—তাহাই কি সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট উক্তি নহে?

জওহরলাল নেহরু যাহাই কেন বলুন না—আচার্য্য কৃপালানীর আহুত সম্মিলনের গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সে অনুষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে ৭শত প্রতিনিধি ও ৩০ হাজার দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ এই অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কার্য্য করেন এবং আচার্য্য কৃপালানী নূতন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপদ্ধতি বিবৃতি করেন। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, নূতন দল কংগ্রেসের নীতির অনুসরণ করিবেন। তাঁহাদিগের মত এই যে, বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকার সে নীতি ভ্রষ্ট হইয়াছেন।

আচার্য্য কৃপালানী বলিয়াছেন—কংগ্রেস সরকার দেশে দুর্নীতি দমন করিতে পারেন নাই। কলিকাতা হইতে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্ম্মীরা এক মুখপত্র প্রচার করেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছে:—

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১ জানুয়ারী হইতে মার্চ এই তিন মাসের মধ্যে সর্ব্বসাকুল্যে নয়শত বিরাশীটি দুর্নীতিমূলক ঘটনা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।"

সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু কতগুলি ঘটনা সম্পর্কে তাঁহারা অপরাধীকে অব্যাহতি দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ নাই কেন? এ কথা কি সত্য নহে যে, পশ্চিমবঙ্গসরকারের কোন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে বোম্বাইএর কোন পত্রে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি সরকারী হিসাবে বেসরকারী কাজ করাইয়া লইতে যাইয়া ধরা পড়েন—কিন্তু তাঁহাকে দণ্ড না দিয়া কেবল বলা হইয়াছে—তিনি কাজের জন্য যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা দিয়া দিলেই ব্যাপারটি ধামাচাপা দিতে হইবে!

কংগ্রেসী বলিয়াই যে সরকার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। সুতরাং দেশে যেমন ভিন্ন মত ও বিরোধী দল থাকিবেই, তেমনই পার্লামেন্টেও বিরোধীদল থাকাই সঙ্গত। তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকার হয় না।

বিরোধীদলে জওহরলালের আপত্তি অসঙ্গত। তাঁহার ব্যবহারই যে দেশে অসন্তোষ-বৃদ্ধির কারণ হইতে পারে, তাহা তিনি না বুঝিলেও দেশের লোক বুঝে।

আচার্য্য কৃপালানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নূতন দল ব্যতীত আরও একটি দলের প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য। সে দল ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হইয়াছে। কলিকাতায় সে দলের উদ্দেশ্য বিবৃতির পরে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সেই কাজের জন্য বোম্বাইএ গিয়াছিলেন। ভারতরাষ্ট্রের নানা প্রদেশে এই দলের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পণ্ডিত জওহরলাল কি জনমতের প্রবাহ রুদ্ধ করিতে পারিবেন, মনে করেন?

খাদ্যাভাব—

সরকার যে হিসাব দিয়াছেন, তদনুসারে বিচার করিলে অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না যে, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব হইবার কোন কারণ নাই। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় চাউল-কল ও চাউল-ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি। তিনি রোটারী ক্লাবে বক্তৃতা করিয়াছেন—ভারত রাষ্ট্রে সত্য সত্য খাদ্যোপকরণের অভাব নাই—কেবল ব্যবস্থাদোষে অভাব দেখান হইতেছে। তিনি এমন অভিযোগও উপস্থাপিত করেন যে, সরকার যে হিসাব সময় সময় দেন, তাহা কৃত্রিম ও অপ্রকৃত! এদেশের সাধারণ লোকের ব্যয়ের শতকরা ৭৫ টাকা খাদ্যের জন্য ব্যয়িত হয়। বর্ত্তমানে ৪ কোটি লোক "রেশনিং" ব্যবস্থায় খাদ্যোপকরণ পাইতেছে, আর বহুলোক আংশিক ("মডিফায়েড") রেশনিং ব্যবস্থাধীন। তথাপি চাউলের মূল্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্জ্জন করিলে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে—এই ভয় দেখাইয়া সে ব্যবস্থা বহাল রাখা হইতেছে। জাতীয়সরকার প্রতিষ্ঠাবধি একাধিক খাদ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, দেশে প্রকৃত খাদ্যোপকরণাভাব নাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মত অন্যরূপ। আর সেই জন্য বিদেশ হইতে অধিক মূল্য দিয়া খাদ্যোপকরণ আমদানী করায় বৎসরে ২১ কোটি টাকা নষ্ট করা হইতেছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত আরও কেহ কেহ ব্যক্ত করিয়াছেন। মিষ্টার সিদ্ধ বেসরকারী হিসাবে ও খাদ্যোপকরণের অভাবে অসামঞ্জস্য দেখাইয়া প্রধান-মন্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি।

যখন চোরাবাজারে চাউল পাওয়া যায়, তখন মনে করা অসঙ্গত নহে যে, চাউল আছে—কিন্তু ব্যবস্থার দোষে তাহা সাধারণ ভাবে বাজারে আসিতেছে না। ইহার জন্য দায়ী কে?

যে ভাবে ভারত সরকার নানা দেশের নিকট খাদ্যশস্য চাহিতেছেন, তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভ্রমজনক নহে। বিশেষ মার্কিণ যে ভাবে "দয়া করিয়া" খাদ্যশস্য দিতে সম্মত হইয়াছে, তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভ্রমহানিকর বলিলে অসঙ্গত হয় না। অনেক আপত্তি ও বিবেচনার পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতসরকারকে যে খাদ্যশস্য ঋণ হিসাবে দিতে সম্মত হইয়াছে, তাহার মূল্য—অন্ততঃ ৭৬ কোটি টাকা! এই শস্যের কিছু যে আমদানী, গুদাম-ঘাটতী প্রভৃতিতে কমিবে তাহাও যেমন সত্য, তেমনই ইহা যে মূল্যে দেওয়া হইবে, তাহাতে যে লোকশান সহ্য করিতে হইবে, তাহাও তেমনই সত্য। কিন্তু ঋণের টাকা (সুদ সহ?) পরিশোধ করিতে হইবে। সে টাকা কোথা হইতে আসিবে? কোথা হইতে আসিবে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি, দেখা যাইতেছে—

কেন্দ্রী সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন, এই প্রদেশে নানা উন্নতিকর পরিকল্পনার জন্য যে ১০৭ কোটি টাকা প্রার্থনা করা হইয়াছিল—তাহার কেবল ৩৫ কোটি টাকা দেওয়া হইবে।

যে কাজের জন্য ১০৭ কোটি টাকা প্রয়োজন, এমন কি দামোদর পরিকল্পনায় যাহা দেখা গিয়াছে, তাহাতে হয়ত ২১৪ কোটি টাকা

প্রয়োজন—সে কাজ ৩৫ কোটি টাকায় কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রকাশ, কোন্ কোন্ পরিকল্পনাকে প্রাধান্য প্রদান করা হইবে অর্থাৎ কোন্ কোন্ পরিকল্পনা এখন কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইবে, পশ্চিমবঙ্গসরকার এখন তাহাও বিবেচনা করিতেছেন। যে কমিটী সে কাজ করিতেছেন, তাহার একজন সদস্য নাকি বলিয়াছেন—"ঐন্দ্রজালিক ব্যতীত আর কেহ এ কাজ করিতে পারে না।" বলা হইয়াছে, ভারত রাষ্ট্রকে বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করিতে যে ব্যয় করিতে হইতেছে, তাহাতে উন্নতিকর কার্য্যও সঙ্কুচিত করা ছাড়া উপায় নাই।

তাহার উপর আবার কাশ্মীরের জন্য ব্যয় চলিয়াছে। কাশ্মীরের ব্যাপারে সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যয়—

১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে—২৭৩০০০ টাকা

১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে—৪২৯৪৩ টাকা ৩ আনা

কাশ্মীরকে ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার ব্যয় ৩ কোটি ১৮লক্ষ টাকা। অথচ কাশ্মীরের ব্যাপারের মীমাংসার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুই সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন।

পাকিস্তানের সহিত প্রীতি সংস্থাপিত হয় নাই; কতদিনে হইবে, তাহাও অনুমান করা অসম্ভব। সুতরাং যদি কোন সংঘর্ষ হয়, সেজন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন এবং সেজন্য—দেশরক্ষা খাতে—অর্থব্যয় অনিবার্য্য। যদি সে ব্যয়ের উপরে আবার বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে জলের মত অর্থব্যয় করিতে হয়, তবে যে দেশের উন্নতিকর কার্য্যের জন্য ব্যয় হ্রাস করিতেই হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সেই কারণেও দেশকে খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন।

দেশ সত্য সত্যই সে বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ কি না, সে বিষয়ে প্রথম অনুসন্ধান প্রয়োজন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় অবলম্বনে কালবিলম্ব না করা কর্ত্তব্য।। উৎপাদন বৃদ্ধি যে দুঃসাধ্য নহে এবং তাহাতে অধিক বিলম্বও হইতে পারে না, তাহা দেখা গিয়াছে। সে বিষয়ে যে আবশ্যক মনোযোগ প্রদত্ত হয় নাই, এই অভিযোগ দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অভিযোগ যে অস্বীকার করা যায় না, তাহার প্রমাণ—৩ বৎসরে রাষ্ট্র খাদ্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া ত পরের কথা—প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীতে প্রভূত অর্থের অপব্যয় হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বলা হয়, যুদ্ধোদ্যমে খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে; কিন্তু কার্য্যকালে কিছুই দেখা যায় না! যদি এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, তবে যে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি অসম্ভব হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। যে অর্থ অধিক খাদ্যোপকরণ উৎপাদনের প্রচার-কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে, তাহাও অপব্যয়িতই হইতেছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অথচ সরকার যেন অসহায়!

পশ্চিমবঙ্গে ও পাকিস্তানে—

পার্লামেন্টে সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাগত প্রায় ৩২ হাজার মুসলমান পরিবারের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহাদিগের প্রায় এক লক্ষ ১৩হাজার ২শত ১১জন। উহাদিগকে ২শত টাকা হিসাবে দান করায় মোট প্রায় ৯লক্ষ ৮১হাজার টাকা সরকারকে ব্যয় করিতে হইয়াছে। অথচ দিল্লী চুক্তি অনুসারে ঐ সকল লোককে অর্থ সাহায্য প্রদানের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। যাহারা ফিরিতেছে, তাহাদিগের অর্থের প্রয়োজন আছে বলিয়া সরকার (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) প্রত্যেক প্রত্যাবৃত মুসলমানকে ২শত টাকা দিয়াছেন। যাহারা ভারতীয় নহে—এমন মুসলমানরাও সাহায্যে বঞ্চিত হয় নাই।

যে সকল হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া আবার পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের নিকট হইতে কোনরূপ অর্থ সাহায্য লাভ করিয়াছেন কি না, তাহা ভারত সরকার অবগত নহেন। প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গের পাকিস্তানী সরকার প্রত্যাগত হিন্দুদিগকে কোনরূপ অর্থ সাহায্য দেন নাই; পরে ভারত সরকার তাঁহাদিগকে সে কথা জানাইলে তাঁহারা নাকি কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যাগত মুসলমানদিগকে পুনর্ব্বসতি করাইয়াছেন এবং প্রত্যেককে ২শত টাকাও খয়রাত করিয়াছেন; আর পূর্ব্ববঙ্গের পাকিস্তানী সরকার তথায় প্রত্যাগত হিন্দুদিগকে সেরূপ সুবিধা দেন নাই।

কারণ, বোধ হয় এই যে—পাকিস্তান ইসলাম-রাষ্ট্র আর ভারত ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু ব্যবহারের এই যে তারতম্য—ইহাতে কি প্রতিপন্ন হয়?

কেবল ইহাই নহে—ভারত সরকার অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সংবাদ পাইয়াছেন, পাকিস্তানে সরকার হিন্দুর মন্দির ও অন্যান্য দেবস্থান অধিকার করিবার জন্য নোটিশ দিয়াছেন।

ভারত সরকার কেবল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন্ত্রীকে (চারুচন্দ্র বিশ্বাস) পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের সহিত এই বিষয় মীমাংসার জন্য নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে ভারত সরকারের ডেপুটী কমিশনারও এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। তবে ফল কি হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা জানেন না। বোধ হয়, ফল চারুচন্দ্র বিশ্বাসের দপ্তরে রহিয়াছে। চট্টগ্রামের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট একটি মন্দির-সংলগ্ন ভূমি অধিকার করিবার জন্য নোটিশ দিয়াছেন—মন্দির নহে। জমী মন্দিরের এবং সেই জন্য সরকার নিয়মানুগভাবে তাহা অধিকার করিতে পারেন না। ভারত সরকার তাহা জানাইলে পাকিস্তান সরকার ব্যাপারটি অস্বীকার করেন। অবশ্য সেকথা মিথ্যা; কেন না, ভারত সরকার অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, জমী দখল করিবার জন্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। চট্টগ্রামে এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে যে হিন্দুর দেবস্থান অপবিত্র করা হইয়াছে, এমন অভিযোগও ভারত সরকার পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে সকল অভিযোগ ঢাকার ডেপুটী হাই কমিশনারকে পাঠাইয়াই তাঁহারা কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। এমন কি ডেপুটী হাই কমিশনার কোন রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন কি না, তাহাও ভারত সরকার বলিতে পারেন না। যখন গান্ধীজী পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগকে ভগ্ন মসজেদ পুনর্নির্ম্মাণ করিতে বলিয়া

অব্যবহৃত মসজেদ হইতেও পঞ্জাব হইতে আগত অমুসলমান
দিগকে বিতাড়িত করিবার নির্দ্দেশ দিতে কুণ্ঠানুভব করেন
ম হইতেই দুই স্থানে ব্যবহারে বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে। ভারত
কি পাকিস্তান সরকারের ব্যবহারের অনুরূপ ব্যবহার করিতে
না ?

...নীতি—

দেশে সর্ব্বত্র দুর্নীতির যেরূপ বিস্তার লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে সেই
ই মনে হয়—"শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধবি তাগা ?" সম্প্রতি
...রী চাকরীতে দুর্নীতির একটা হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৫০
...কেন্দ্রী সরকারে পুলিস দুর্নীতির অভিযোগে এক হাজার ৩শত
ঘটনার অনুসন্ধান করিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি-বিরোধী
...৫শত ৯টি ঘটনার তদন্ত করে। কতগুলিতে কঠোর দণ্ড দেওয়া
...ছিল, তাহার হিসাব দেওয়া হয় নাই। কেন্দ্রী সরকারে ২শত
ব্যাপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা করিতে বলা হয়। বলা হইয়াছে,
...নকে আদালত দণ্ড দেন—কিন্তু কেবল ২জনের বিষয় উল্লেখ করা
...ছে। পশ্চিমবঙ্গে যাহারা আদালতে বা বিভাগে দণ্ডিত হইয়াছে,
...দিগের সংখ্যা "অধিক"! যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস
...র সম্পাদক বলিয়াছেন—দুর্নীতি বা অযোগ্যতার জন্য ৭ হাজার
...লের লোককে বরখাস্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রী সরকারের মন্তব্য—
...কোচ গ্রহণ ও অন্যবিধ দুর্নীতি-দ্যোতক কার্য্য পূর্ব্ববৎসরেরই মত
...ক ছিল।"

এই অবস্থার প্রতীকার যে হইতেছে না, সে জন্য কেবল সরকারকে
...করা যায় না। কারণ, যাহারা দুষ্কার্য্য করে, তাহারা তাহা গোপনেই
এবং বহু লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারী কর্ম্মচারিদিগকে প্রলুব্ধ
...র চেষ্টা করে। তবে সরকারের কার্য্যেও যে দুর্নীতি বাড়িতে
..., পশ্চিমবঙ্গে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কোন সরকারী
...রী—একটি বিভাগের কর্ত্তা—বে-আইনীভাবে কলিকাতায় চাউল
...লে যেমন, সরকারী হিসাবে বেসরকারী কাজ করাইলেও তেমনই
হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। ইহাতে সমগ্র
...রী মহলে দুর্নীতি প্রসারলাভ করে।

১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসন সন্ধান কমিটী লিখিয়াছিলেন ;—
"So widespread has corruption become, and so de-
...ist is the attitude taken towards it, that we think
...the most drastic steps should be taken to stamp
...the evil which has corrupted the public service and
...lic morals."

ঐ কমিটী বলেন, যাহারা যে পণ্যের ব্যবসা করে না, তাহাদিগকেও যে
পণ্যের জন্য "পারমিট" দেওয়া হয়, তাহাতে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।
...র দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু
কি সেইরূপভাবে "পারমিট" দেওয়া হইতেছে না। যাঁহাদিগকে—যে
নামের তালিকা দেখিলেই এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিবে না। সে বিষয়ে
সরকারই দোষী।

যে রাষ্ট্রে দুর্নীতি প্রবল হয়, সে রাষ্ট্রের পতন যে অবশ্যম্ভাবী তাহা
কুয়োমিণ্টাং চীনের পতনে দেখা গিয়াছে। সুতরাং দুর্নীতি দমনের জন্য
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তাহা সরকারকেই করিতে
হইবে। কোন কোন কালোবাজারী যে বলিতে পারেন ও বলিয়া
থাকেন, "করি রাজবাড়ীতে যাওয়া, আসা" (অবশ্য এক্ষেত্রে মন্ত্রীর গৃহেই
যাতায়াত হয়) তাহাতেও সন্দেহ নাই। প্রধানমন্ত্রী গদীনশীল হইবার
পূর্ব্বে চোরাবাজারীদিগকে দণ্ড দিবার যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন,
ক্ষমতা তাঁহার হস্তগত হইবার পরে যে সে আগ্রহ জলে জলবিম্ব প্রায়
বিলীন হইয়াছে, তাহা যেমন পরিতাপের বিষয়—কোন প্রাদেশিক প্রধান
সচিব যে ব্যক্তিবিশেষের অপরাধ অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহাও
তেমনই অপকারী। দেশ দুর্নীতিতে যেরূপ দুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা
অবশ্যম্ভাবী—সরকারী চাকরীয়াদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে হিসাব
সরকারই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সেই আশঙ্কা আরও ঘনীভূত
ও ভয়াবহ হয়।

পার্লামেণ্টের অধিবেশন—

গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ভারতীয় পার্লামেণ্টের দীর্ঘ অধিবেশন শেষ হইয়াছে।
অধিবেশন দীর্ঘ হইলেও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের
গঠন তান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সংশোধনের আইনের পাণ্ডুলিপির এবং কর্ম্মীর সরকারী
বীমা বিলের আলোচনা সময়াভাবে সম্ভব হয় নাই। মোট ৩১ খানি
সরকারী বিল বিবেচিত হয় নাই... পরবর্ত্তী অধিবেশনে হইবে। হিন্দু
কোড বিলের ভাগ্যও নির্নীত হয় নাই। যখন ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে
অধিবেশন আরম্ভ হয়, তখন ২৯ খানি বিল বিবেচনাধীন এবং তাহার পরে
৪৮ খানি উপস্থাপিত করা হয়। এই সকল বিলের মধ্যে ৪৪ খানির কাজ
শেষ হইয়াছে।

সদস্যরা মোট ৭ হাজার ৮ শতেরও অধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে
চাহিয়াছিলেন ; সে সকলের মধ্যে ৪ হাজার ২ শত গৃহীত ও তাহাদিগের
উত্তর প্রদত্ত হয়। সে সকল ব্যতীত ৩শত ৩৬টি "শর্ট নোটিশ" প্রশ্নের
মধ্যে ৫৩টি গৃহীত হয়।

এই অধিবেশনে মতভেদহেতু বিতর্কের প্রাবল্য প্রকাশ পাইয়াছিল।
বিতর্কে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সর্ব্বাধিক প্রশংসা অর্জ্জন করেন এবং
একদিন তাঁহার সহিত প্রধান মন্ত্রীর যে বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে জওহর-
লাল যেমন উদ্ধত অধীরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ তেমনই
উপযুক্ত উত্তর দিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ শেষে যাহা বলিয়াছিলেন,
তাহাতে লর্ড পামারষ্টোনের উক্তি মনে হয়—

"I feel it right to inform the Hon. Gentleman that
any opinion he may entertain of me is to me a matter
of perfect indifference and contempt."

বিলাতে পার্লামেন্টে সময় সময় যেরূপ আক্রমণ হইয়াছে, সেরূপ "হইলে অধীর জওহরলাল কি করিতেন, বলিতে পারি না।. ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার বুকানন প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

"তিনি 'mountebank, swine and low dirty cur, who ought to be horse-whipped and slung out of public life."

সংবাদপত্র সম্বন্ধে জওহরলালের ধৃষ্ট উক্তি অজ্ঞতা অপেক্ষাও অভদ্রতার পরিচায়ক।

এই অধিবেশনে সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধীদলের অভাব বিশেষরূপ অনুভূত হইয়াছে। যদি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সাহা প্রভৃতি একযোগে কাজ করিতে পারিতেন, তবে গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় বিরোধীদল প্রবল হইতে পারিত।

পূর্ব্বে সরকারের সমালোচক মহাবীর ত্যাগীকে চাকরী দিয়া তাঁহার সমালোচনা বন্ধ করা হইয়াছিল। এবার আরও ২ জন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী লওয়ায় যুক্তপ্রদেশের সতীশচন্দ্রের ও বিহারের এস, এন, মিশ্রের স্বাধীন মত প্রকাশের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে।

শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের কলঙ্কে এই অধিবেশন কলঙ্কিত। জওহরলাল বলিয়াছেন বটে, তাঁহার পক্ষে বহুমত আছে, কিন্তু সকলেই জানেন, কংগ্রেসী দলের যে সকল সদস্য স্বাধীনভাবে ভোট দিতে চাহিয়াছিলেন—দলগত নিয়মানুবর্ত্তিতার দোহাই দিয়া তাঁহাদিগকে সে অধিকারে বঞ্চিত করা হইয়াছিল—সুতরাং ভোটের আধিক্য কৃত্রিম। মন্ত্রীদিগের মধ্যে রফি আহম্মদ কিদোয়াই হয়ত শেষে পদ ত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে অবস্থা আরও জটিল হইবে, সন্দেহ নাই।

এই দীর্ঘ অধিবেশনে জওহরলাল ও রাজা-গোপালাচারী—উভয়ের ব্যবহার যে মন্ত্রীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণকারী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা যে কোন গঠনতন্ত্রশাসিত দেশের জনমত সহ্য করিতে পারে না—ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। আচার্য্য কৃপালনীর নবগঠিত দল দেশে কিরূপ আদর ও সহযোগ লাভ করে, তাহা দেখিবার বিষয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে আবার নূতন দল গঠিত হইয়াছে।

শিল্প সম্মিলন—

কেন বুঝা যায় না, কলিকাতায় ঘটা করিয়া শিল্প সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা এই সম্মিলনের উদ্যোগ করিয়াছেন—তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কোন কথা বলিতে আমরা ইচ্ছা করি না। সম্মিলনের উদ্বোধন করিতে ভারত সরকারের মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ মহাতাবকে আমদানী করা ও সভাপতিত্ব করিতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পাকড়াও করা হইয়াছিল; একদিন সুকুমার দত্তও সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইহাতে পাণিনির একই সূত্রে "শ্বানং যুবানং মঘবানম্" যুক্ত করা মনে পড়ে।

হরেকৃষ্ণ তাঁহার অভিভাষণে তিনটি কথা বলিয়া বিজ্ঞতার ভান করিয়াছেন—

(১) লোক নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় জন্য অগ্রসর হইতেছে না।

(২) পাটচাষীরা পাট বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ লাভ করিয়াছে, অথচ শিল্পপ্রসার জন্য আবশ্যক অর্থ পাওয়া যাইতেছে না।

(৩) বৃটেন আর্থিক জীবন পুনর্গঠনের জন্য স্বদেশে বস্ত্রের ব্যবহার হ্রাস করিয়া বিদেশে কাপড় চালান দিতেছে; কিন্তু ভারত সরকার খাদ্যের মূল্য দিতে তাহাই করায় নিন্দিত হইতেছেন!

এই তিনটি কথাই বিচারসহ নহে।

লোকের নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় আগ্রহের অভাব নাই। সরকার পারমিট লাইসেন্সে যে ভৈরবীচক্র রচনা করিয়া সে আগ্রহ নষ্ট করিতেছেন, তাহার জন্যই লোকের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। সরকারের দোষ অপরের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া অব্যাহতি লাভের চেষ্টা সমর্থনযোগ্য নহে।

বৃটেন দেশের লোকের আবশ্যক বস্ত্র বরাদ্দ করিয়া—তাহা ন্যায্য মূল্যে পাইবার ব্যবস্থা করিয়া—কুপন দিয়া বিদেশে বস্ত্র রপ্তানী করিয়াছে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র কাপড়ের কণ্ট্রোল রদ করিয়াছে। ভারত সরকার দেশের লোককে দিগম্বর করিবার আয়োজন করিয়াছেন এবং তুলার চাষ বাড়াইতে উপদেশ দিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছেন। কোন প্রাদেশিক সচিব তুলার চাষে যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে লোকের মনে সন্দেহের উদ্ভব অনিবার্য্য হইতেছে।

পাটচাষীরা যে অতি সামান্য লাভই করিয়াছে এবং লাভের কোটি কোটি টাকা যে জনকয়েক ব্যবসায়ী পাইয়াছেন, তাহা বলিয়া হরেকৃষ্ণকে অপদস্থ করিবার প্রলোভন সভাপতি শ্যামাপ্রসাদই সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, সে টাকা কাহারা পাইয়াছেন, তাহা সরকার জানেন এবং ইচ্ছা করিলে সে টাকা বাহির করিতে পারেন। সে সম্বন্ধে আমরা বলিব, ঐ সকল ব্যবসায়ী লইয়াই ত সরকার "ঘর করেন" এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে টাকা বাহির করা কুকুরের গলা হইতে মাখন বাহির করার বা বাঘিনীর মুখ হইতে মাংসখণ্ড বাহির করার মতই দুঃসাধ্য। ঐ ব্যবসায়ীদিগের কেহ কেহ, বোধ হয়, সম্মিলনে বিরাজিত ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে দেখিয়াই শ্যামাপ্রসাদ ঐ উক্তি করিয়া হরেকৃষ্ণের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন।

ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বলিয়াছেন—দেশের লোকের শত্রু সরকার বা কম্যুনিষ্টরা নহেন—যাহারা সামান্য দামে মাল কিনিয়া চড়া দামে বিক্রয় করে তাহারাই।

এই উক্তিতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যাহা হইয়াছিল, সেই কথা মনে পড়ে। তখন নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে দেশে দুই শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয়—

(১) "ফোরষ্টলার"—ইহারা চড়া দামে বিক্রয় করিবার আশায় খাদ্যোপকরণ বাজারে আসিবার পূর্ব্বেই কিনিয়া লয়।

(২) "রিগ্রাটার"—ইহারা একই বাজারে মাল কিনিয়া বিক্রয় করে।

১০ই জুলাই রাস্বী নামক একজন ব্যবসায়ীকে মামলা সোপর্দ্দ করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ—সে ৪১ শিলিং হিসাবে দাম দিয়া ৯০ কোয়ার্টার কিনিয়া সেই দিনই ৪৪ শিলিং দরে তাহার এক-

তৃতীয়াংশ বিক্রয় করিয়াছিল। জুরী তাহাকে অপরাধী বলিলে প্রধান বিচারক লর্ড কেনিয়ন জুরীকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন—

"You conferred by your verdict almost the greatest benefit that ever was conferred by any jury."

কিন্তু এদেশে সরকার কি করিয়াছেন? ধনী ব্যবসায়ীদিগের সহিত সরকারের কর্তাদিগের ঘনিষ্ঠতা কিরূপ তাহা কাহারও অবিদিত নাই। লোক বিশ্বাস করিতে পারে না যে, সরকার চেষ্টা করিলে চোরাবাজারের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন না। শাসন-ক্ষমতা লাভের পূর্ব্বে জওহরলাল নেহরু চোরাবাজারীদিগের দমনের জন্য যে আস্ফালন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ক্ষমতা লাভের পরে তাঁহার ব্যবহার তুলনা করিলে মনে হয়—"সিংহ গর্জ্জন করিয়া শেষে লেজ নাড়িতে নাড়িতে পদতলে শুইয়া পড়িল।" ইহার কারণ কি? হরেকৃষ্ণ মহতাবের দ্বিতীয় উক্তির উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যে ভিত্তিহীন, এমন কথা বলিবার সাধ্য কাহারও হয় নাই। তবে যদি দেশে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক আগ্রহের অভাব লক্ষিত হয়, সেজন্য কি দেশের লোককে দায়ী করা যায়? যাঁহারা সরকারের নীতির পরিচালক এবং যাঁহারা সেই নীতির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধিতে উপকৃত—সেই দুই শ্রেণীর লোককে একত্রিত করিয়া যদি শিল্প সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহাতে বক্তৃতার বন্যা বহিতে পারে—প্রবন্ধের প্রবাহ প্রবাহিত হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে প্রকৃত কাজ কিছুই হইতে পারে না। নিদারুণ নিষ্ফলতাতে তাহার পরিণতি নিশ্চিত।

উদ্বাস্তু-সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হওয়া ত পরের কথা, তাহার জটিলতা বৃদ্ধি হইতেছে। কিছুদিন হইতে হাওড়া রেল ষ্টেশনে উড়িষ্যা ও বিহার হইতে প্রত্যাগত বাস্তুহারা নরনারী যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা শোচনীয়। আবার শিয়ালদহে তাহাদিগের সংখ্যা এত অধিক হইতেছে যে, আগন্তুকদিগকে সরকারী সাহায্য-শিবিরে স্থানান্তরিত করাও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। গত মে মাসে প্রতিদিন প্রায় ৪০টি পরিবার শিয়ালদহে আসিতেছিল—জুন মাসের প্রথম দুই বা তিন সপ্তাহে তাহাদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া প্রতিদিন ৮০ হইতে ৯০টি পরিবার আসিতে আরম্ভ করে। ষ্টেশনেও স্থান নাই—সরকারী সাহায্য শিবিরেও স্থান নাই।

বিহারে ও উড়িষ্যায় যাহাদিগকে পাঠান হইয়াছিল তাহাদিগকে যে আবশ্যক বিবেচনা না করিয়াই প্রেরিত করা হয়, তাহা তাহাদিগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের প্রত্যাগমনেই প্রতিপন্ন হয়। এমন কি যাহাদিগকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ফিরিয়া আসিতেছে।

কেন এমন হয়? যদি বিবেচনা করিয়া লোককে পাঠান হয় এবং যে স্থানে তাহাদিগকে পাঠান হয়, তথায় তাহাদিগের জীবিকার্জ্জনের আবশ্যক ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাহাদিগের ফিরিয়া আসিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে প্রত্যাবৃত্তদিগকে আবার পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানে পাঠাইতেছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ভুলের জন্য যে অপব্যয় হইয়াছে, সেজন্য কে দায়ী?

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কেন আবার এত লোক চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজও ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহারা সে কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। তবে জানা গিয়াছে, খুলনা জিলায় লোকের খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব এত প্রবল হইয়াছে যে, লোক দলে দলে গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আসিতেছে। কিন্তু তাহারা যদি সহরে আসে, তবে ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি সহরে না যাইয়া কলিকাতায় আসিতেছে কেন? বোধ হয়, যাহারা দুর্দ্দশায়ও গ্রামে ছিল, তাহারা যখন গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তখন আর পাকিস্তানে থাকিতে চাহে না। কয়দিনের আগমন-নিগমনের হিসাব লক্ষ্য করিবার বিষয়—

আগমন

	হিন্দু		মুসলমান
১৭ই জুন	৪৯১৯		১৭৯১
১৮ই „	৫৮৭৭		১৭৯৭
১৯শে „	৫৩৪৪		১৯১২
২০শে „	৫৮৯৮		১৭০৭
২১শে „	৭৫৩০		১৬৮০
২২শে „	৭৪৮৯		১৭৭১
২৩শে „	৬৮১৯		১৩৫৭
মোট...	৪৩,৮৭৬	মোট...	১২০১৫

নির্গমন

	হিন্দু		মুসলমান
১৭ই জুন	৪৭৫৫		১৫২৩
১৮ই „	৪৬২৯		১৬০০
১৯শে „	৪১৯৩		১৬৬৯
২০শে „	৪৭১৬		১৪৮০
২১শে „	৩৯১৫		১৫৪২
২২শে „	৪৩৫৮		১২৮১
২৩শে „	৩৭৫৩		১৬৭১
মোট...	৩০,৩১৯	মোট...	১০৭৬৬

হিসাবে দেখা যায়—নির্গত মুসলমানের সংখ্যা আগতের তুলনায় ১২৪৯ কম এবং নির্গত হিন্দুর সংখ্যা আগতের তুলনায় ১৩,৫৮৫ কম। অর্থাৎ অন্ততঃ ১৩হাজার ৫শত ৮৫জন হিন্দু এক সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার সহিত উড়িষ্যা ও বিহার হইতে প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদিগের সংখ্যা যোগ করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্ব্বাসন পরিকল্পনা যে অবস্থায় উপযোগী

নহে, তাঁহা বার বার প্রতিপন্ন হইলেও সংশোধিত হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার কিছু দূরে "কল্যাণী" নগরের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন—অনেক বাস্তু উদ্বাস্তু হইতেছে—এমন কি ঘোষপাড়ার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীর যে জমীতে প্রতি বৎসর লক্ষাধিক লোক বৎসরে দুইবার সমবেত হয়, তাহাও তাঁহারা কুক্ষীগত করিতে দ্বিধানুভব করিতেছেন না—বলিয়া শুনা যাইতেছে! সে নগর নির্ম্মাণের ভার সরকার যাঁহাদিগকে দিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে আছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহারা লাভবান হইবেন; আর বহু লোক ভিটাচ্যুত হইতেছে—বহু চাষের জমী বাসের জমীতে পরিণত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাব বর্দ্ধিত করিবে।

উদ্বাস্তুদিগকে বাসের ও চাষের জমী বণ্টনে কোন সুব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। সমস্যা দিন দিন যেমন জটিল হইয়া উঠিতেছে, লোক তেমনই নিরাশ হইয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে উদ্বাস্তুরা যে সকল জমীতে ঘর তুলিয়াছে, সে সকল লইয়া মামলা আরম্ভ হইয়াছে—সরকারী কর্মচারীরা সে সকল অধিকারের মীমাংসা করিতে বিলম্ব করিতেছেন।

নানা উদ্বাস্তু শিবিরে অনাচারের অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে এবং তাহাতে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইতেছে। এ সকল সুব্যবস্থার অভাবেই ঘটিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তবে তাঁহাদিগের পক্ষে অক্ষমতা স্বীকার করিয়া—ভারত সরকারকে, লোকের সহযোগ লইয়া, ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করাই ভাল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকের সম্বন্ধে আবশ্যক মনোযোগ দিতেছেন না, ইহাই প্রধান অভিযোগ।

সংবাদপত্র ও সরকার—

ভারত সরকার শাসনতন্ত্রে যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন, সে সকলে সংবাদপত্রের মতপ্রকাশ-স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। অথচ সে স্বাধীনতা সংবাদপত্রের জন্মগত অধিকার। পরিবর্তন-প্রস্তাবে সংবাদপত্র সম্বন্ধে জওহরলাল নেহরুর উক্তিও সংবাদপত্রের পক্ষে আত্মসম্মানহানিকর।

অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনের বোম্বাইয়ে এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে স্থির হইয়াছে:—

(১) সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় যে অন্যায় ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদে নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মিলনের এই অধিবেশন দেশের সকল সংবাদপত্রকে আগামী ১২ই জুলাই সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ রাখিতে অনুরোধ জানাইতেছেন।

(২) যাঁহারা পার্লামেন্ট বা কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন, নির্ব্বাচকমণ্ডলী যেন তাঁহাদিগের নিকট এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, তাঁহারা সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদের পরিবর্তন বাতিল করিয়া মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।

(৩) সম্মিলনের যে সকল কমিটী রাষ্ট্রে বা রাজ্যসমূহে সরকারের উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিতেছেন, সম্মিলন সে সকল কমিটীর কাজ বন্ধ করিয়া দিতে নির্দেশ দান করিতেছেন।

জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের সঙ্গে বিবাদ করা যেমন সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে, তেমনই রাজনীতিকদিগের পক্ষে সংবাদপত্রের বিরাগ-ভাজন হওয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বা কুবুদ্ধিদ্যোতক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভে 'টাইমস' পত্রের প্রচারকার্য্যফলে আসকুইথকে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং লয়েড জর্জ্জ সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের অবসানে লয়েড জর্জ্জ ঐ পত্রের অধিকারী লর্ড নর্থক্লিফের বিরাগভাজন হওয়ায় রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার পতন ঘটে। ভারত রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ যদি একযোগে নেহরু সরকারের অপকার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'ন, তবে যে সে সরকারের পতন ঘটিতে বিলম্ব হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য। যে দম্ভ দেখাইয়া নেহরু সরকার সংবাদপত্রের জন্মগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে সাহস করিয়াছেন, সে দম্ভ চূর্ণ করাই সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য। সংবাদপত্রই দেশের লোকের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার প্রহরী ও রক্ষক এবং সেই জন্যই স্বৈরশাসনবিলাসীরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া যথেচ্ছা কাজ করিবার সুযোগ সন্ধান করেন।

যে জওহরলাল নেহরু একদিন বলিয়াছিলেন, সংবাদপত্র যদি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে, সে-ও ভাল; কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা সঙ্গত নহে—তিনিই আজ ক্ষমতামদে মত্ত হইয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে সাহস করিতেছেন। কারণ, পার্লামেন্টে—যে প্রকারেই বা কারণেই কেন হউক না—তাঁহার দলের ভোট অধিক। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন, বহুমত তাঁহার সমর্থক। কিন্তু যদি দলের লোককে সরকারকে সমর্থন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা না হইত, তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাইত। কংগ্রেসী দলের অনেক সদস্য যে ভোট দিবার স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের দাবি স্বীকৃত হয় নাই, তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং জওহরলালের বহুমতের সমর্থনগর্ব্ব ভিত্তিহীন ও অসার।

যদি প্রয়োজন হয়, তবে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহকে মন্ত্রিমণ্ডলের সম্বন্ধীয় সংবাদ বর্জ্জন করিতে হইবে। মন্ত্রিমণ্ডলের কি অবস্থা হয়, তখন বুঝিতে পারা যাইবে।

উড়িষ্যার অর্থ-সঙ্কট—

দুর্ভিক্ষে দুর্ব্বল, যুদ্ধের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত, বিভাগে দীন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অর্থ-সঙ্কটের কারণ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু উড়িষ্যা কেন অর্থ-সঙ্কটে বিব্রত হইল, বুঝা যায় না। বর্তমান বৎসরের প্রথমার্দ্ধেই উড়িষ্যা সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা—ঋণ হিসাবে লইতে বাধ্য হইয়াছেন। গত ৩ বৎসর উড়িষ্যায় ঘাটতি বাজেটে

বাড়িয়া চলিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাপ্য সম্পর্কে ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের জুনিয়র সেক্রেটারী ও ব্যাঙ্কের একজন ডেপুটী গভর্ণর উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উড়িষ্যার বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ১১ কোটি টাকা। ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের বাজেটে ঘাটতি প্রায় এক কোটি টাকা। গঠনমূলক কার্য্যের ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতিসাধনের জন্য এই ঘাটতি ঘটিয়াছে। ১১ কোটি টাকার মধ্যে ৪ কোটি টাকা কর্ম্মচারীদিগের জন্য ব্যয়িত হয়। আর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস ক্ষমতালাভ করা হইতে শাসন-ব্যয় পূর্ব্বের তুলনায় তিন গুণ হইয়াছে।

এ বিষয়ে উড়িষ্যার অবস্থা পশ্চিমবঙ্গেরই মত।

শুনা যাইতেছে, উড়িষ্যা সরকার কেন্দ্রী সরকারের নিকট ৩ কোটি টাকা ঋণ চাহিবেন এবং আগামী বৎসর হইতে কিস্তিবন্দী হিসাবে ঋণ শোধ করিবেন। তাঁহারা ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়সঙ্কোচ করিবেন ও অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়া ৪৫ লক্ষ টাকা আয় বাড়াইবেন। সরকারের সেক্রেটারীর সংখ্যা ১৬ জনের স্থানে ৯জন করা হইবে; ৫জন পরিদর্শক এঞ্জিনিয়ারের স্থানে ২জন ডেপুটী চীফ এঞ্জিনিয়ার রাখা হইবে; ৩জন চাকুরীয়াকে লইয়া বোর্ড অব রেভিনিউ করিয়া—সেই বোর্ডের প্রধানকে সরকারের সেক্রেটারী করা হইবে। ফলে দপ্তরখানায় আর রাজস্ব বিভাগ থাকিবে না। ঐ বোর্ডই চীফ সেক্রেটারীর পরিবর্ত্তে চাকুরীয়াদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন। গণস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যয় হ্রাস করা হইবে না—শিক্ষাবিভাগের বরাদ্দ ৬ লক্ষ টাকা কমান হইবে। কলেজের ছাত্রদিগের বেতন শতকরা ২৫ টাকা বাড়ান হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাকুরীয়ার সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের ব্যয়ও বাড়িয়াছে। তাঁহারা ব্যয়সঙ্কোচের ব্যবস্থা করেন নাই; পরন্তু কলিকাতায় ভূগর্ভে ট্রেণ চালান,সাগরে মৎস্য ধরা প্রভৃতি অনাবশ্যক কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, সরকারী যানবাহন বিভাগেও ক্ষতি হইতেছে; আবার কোন কোন ব্যবসায়ীর বিক্রয় কর সম্বন্ধে যে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও অসাধারণ। ভারত সরকারের নিকট গঠনমূলক কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের প্রার্থিত টাকার পরিমাণ হ্রাস করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের পারম্পর্য্য স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে—প্রথমে কৃষি সম্বন্ধীয়, তাহার পরে খাদ্যসংক্রান্ত ও তাহার পরে সেচ বিষয়ক পরিকল্পনা স্থান পাইবে—গণস্বাস্থ্যের ও শিক্ষার স্থান তাহারও পরে।

উড়িষ্যা সরকার যেরূপ ব্যয়সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিতেছেন, শুনা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেরূপ করিলে—অর্থাভাবে অনেক গঠন-মূলক কার্য্যের পরিকল্পনা বন্ধ রাখিতে হয় না।

উড়িষ্যা সরকার কি জন্য অর্থ-সঙ্কটে পতিত হইলেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু কেন্দ্রী সরকারের ভাণ্ডার যে অফুরন্ত, তাহাও বলা যায় না। বিশেষ খাদ্য সংগ্রহে তাঁহারা যে ভাবে অর্থ ব্যয় করিতেছেন এবং কাশ্মীরের ব্যাপার লইয়া তাঁহাদিগকে যে ভাবে সামরিক আয়োজন করিয়া রাখিতে হইবে—তাহাতে প্রদেশসমূহ কি যে যাহার প্রয়োজনে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারেন না? অবশ্য প্রদেশের লোকের আস্থা না থাকিলে সেরূপ ঋণ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয় না। সুতরাং প্রথমেই সরকারকে প্রকৃত জনগণের সরকার নাম লাভের উপযুক্ত হইতে হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় ধান্যের ফলন—

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, এবার তথায় নিউ সাউথ ওয়েলস খণ্ডের সেচের সুবিধাসম্পন্ন জমীতে ধান্যের ফলন বৃদ্ধি হইবে। স্থির হইয়াছে, চাষীরা প্রতি টন ধান্যের জন্য ৬শত ৭৫ টাকা পাইবে। অনুমান, এবার ৭৫ হাজার টন ধান্য উৎপন্ন হইবে। যুদ্ধের সময় ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে এই পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেবার যে জমীতে তাহা হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার ৫শত একর, আর এবার জমীর পরিমাণ—৩৮ হাজার ৬শত একর। সুতরাং এবার অল্প জমীতে অধিক ফলন হইয়াছে। ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে ঐ অঞ্চলে প্রথম ধান্যের চাষ আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে মিষ্টার জোন্স নামক একজন কৃষক ৪১ একরের কিঞ্চিৎ অধিক জমীতে প্রতি একরে ৩টনের কিছু অধিক ধান্য ফলাইয়াছিলেন। এবার ফলন তদপেক্ষা অধিক হইবে। তথায় ধান্যচাষীরা একযোগে চাউলের কল স্থাপিত করিয়াছে এবং চাউল হইতে কোন অধিক লাভজনক পণ্য উৎপাদন করা যায় কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা চলিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় কেন ফলনে এইরূপ উন্নতি হইল, ভারত সরকার সে বিষয় অনুসন্ধান করিবেন কি? ইটালীতে যে আমাদিগের দেশের তুলনায় ধান্যের ফশলে ফলন অধিক, তাহা আমরা জানি। যে সকল দেশে ফলন অধিক সে সকল দেশে সেই আধিক্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া আপনাদিগের ত্রুটি সংশোধন করাই প্রয়োজন। মন্ত্রীদিগের সফরে অর্থব্যয় অপেক্ষা বিদেশে ফশলের ফলন বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে অর্থব্যয় যে অধিক বাঞ্ছনীয় তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু সে দিকে যে মনোযোগ প্রদত্ত হইতেছে, এমন মনে হয় না।

কোরিয়া ও পারস্য—

কোরিয়ায় যুদ্ধের অবসান হয় নাই—মীমাংসার কোন সুব্যবস্থাও দেখা যাইতেছে না। মধ্যে রুশিয়া যুদ্ধবিরতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই স্থির হয় নাই। সে প্রস্তাব এখনও আমেরিকা প্রত্যাখ্যান করে নাই বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার আগ্রহের বিশেষ পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে না।

পারস্যের ব্যাপারে কোরিয়ার দিক হইতে লোকের দৃষ্টি পারস্যের দিকে নিবদ্ধ করাইয়াছে। পারস্য তাহার তৈল-সম্পদ জাতীয়করণে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাহাতে অবশ্য ইংরেজের আপত্তি হইয়াছে। কারণ, অ্যাংলো-ইরাণিয়ান তৈল প্রতিষ্ঠানের নামেই তাহার ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধ সপ্রকাশ। বৃটিশ কোম্পানীর বিরুদ্ধে পারস্য সরকারের অভিযোগের গুরুত্ব অসাধারণ। ইংরেজ তাহাতে স্বীয় অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সমরায়োজনও করিতেছে। সে সেই দিকে রণতরী পাঠাইয়াছে।

হয় ত রুশিয়া পারস্যকে সাহায্য করিবে, এই সম্ভাবনায় ইংলণ্ড এখনও

আলোচনা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। তাহারা এমন কথাও বলেন যে, এক সময়ে দুই দিকে—পারস্যে ও কোরিয়ার যুদ্ধ পরিচালনায় অসুবিধা ঘটিতে পারে মনে করিয়াই রুশিয়া কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করিয়াছে।

ইংলণ্ডকে রণসম্ভার পাঠাইতে হইলে সুয়েজ খালের পথেই পাঠাইতে হইবে। মিশর কোন মিত্র রাজ্যের সহিত যুদ্ধে রণসম্ভার প্রেরণে আপত্তি করিতে পারে। করিবে কি না এবং "দু'কূল বজায়" রাখিবার চেষ্টা করিবে কিনা, বলা যায় না। সেতল-আরব নদী টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের সম্মিলনে প্রবাহিত। তাহার এক পারে ইরাণ বা পারস্য, অপর পারে ইরাক বা মেসোপোটেমিয়া। ইরাক এখনও কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহার সমর্থনের গুরুত্ব অসাধারণই হইবে। সে কি করিবে, তাহা জানিবার উপায় নাই।

যে জটিল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র মধ্য-প্রাচী হইতে যুদ্ধ সমগ্র প্রাচীতে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে।

সে অবস্থায় ভারত কি করিবে এবং পাকিস্তান সেই অবস্থার সুযোগ লইয়া অধিকার-বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে কি না, তাহা বিবেচনার বিষয়। যদি করে, তবে ভারত রাষ্ট্র সে অবস্থায় কি ব্যবস্থা করিবে? সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, কাশ্মীরের ব্যাপার লইয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান বেসামরিক অধিবাসীদিগকেও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিতেছে। ফলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আবার হিন্দুদিগের নিষ্ক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। বিবেচনার বিষয়—পারস্য, ইরাক, মিশর এ সকল দেশে মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য—এ সকলই মুসলমান রাষ্ট্র।

পারস্যে তৈলসম্পদ জাতীয়করণের চেষ্টা গণ-জাগরণের ফল। সে দিক হইতে দেখিলে, এ পর্য্যন্ত আবাদানে ও অন্যত্র ইংরেজদিগের বিরোধী যে ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণই থাকিতে পারে না। কোন জাতি যখন দীর্ঘকালব্যাপী জড়ত্বশাপমুক্ত হইয়া অন্ধকার হইতে আলোকের সন্ধানে অগ্রসর হয়, অবনতাবস্থার প্রতীকার-জন্য উন্নতির জন্য ব্যাকুল হয়, তখন—বন্যার জলে নদী যেমন সময় সময় কূল প্লাবিত করে, গণ-আন্দোলন তেমনই একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়।

পারস্যের ব্যাপারে আমেরিকার মনোভাব যেন রহস্যজনক বলিয়া মনে হইতেছে। ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের স্বরূপ এই ব্যাপারে প্রকাশ পাইতে পারে। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৫৮

নির্ঝরিণী

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মেঘের স্বপনে ঘুমায়ে ছিনু যে, করকাধারায় নামিয়া শেষে
শিলাগহ্বরে পেলেম প্রথম ঠাঁই।
আমার চপল চটুল মনের সন্ধান তুমি পেলে কি ভাই!
গিরি মল্লিকা মোর পানে চায়—ছুটিয়া চলেছি কত না দেশে!
তৃষিত মরুর বক্ষে তুমি কি আমার প্রাণের পেয়েছ দেখা?
শিখরে ভূধরে গিরিকান্তারে পথপ্রান্তরে বিজনে একা
যাত্রা আমার—দোসর কেহ তো নাই।

দুর্গম ভূমি ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গড়েছি কত না স্বর্গছবি
কেহ তো পারে না রোধিতে আমার গতি!
শৈল শিলার বুকচেরা ধন পাষাণের ঘরে জন্ম লভি
নহি তো পাষাণী, আমি যে হৈমবতী।
অচল উপলঅরণ্যবীথি মহামহীরুহ করিয়া ভেদ
কালের মুখেতে কালি দিয়ে নিতি শুনাই ধরায় জীবন-বেদ,
আমার কাহিনী যুগে যুগে গায় আমার রূপের পাগল কবি।
ভাঙ্গনের সুরে সৃষ্টির গান কণ্ঠে আমার মুখর করি
ভৈরবী রূপে তোমরা দেখেছ মোরে।
রবির কিরণ চাঁদের আলোক কলকল্লোলে বক্ষে বরি
ছুটেছি মৃত্যু বিপদ তুচ্ছ করে।

লুপ্ত নদীর বিস্মৃত সেতু নূতন করিয়া আমি যে গড়ি'
মহাসাগরের মিলন লাগিয়া ভূমি গর্ভের দাহন টুটি
যন্ত্রযুগের পাথেয় রচিতে শক্তি আমার উঠিছে ফুটি
সভ্যতা-পথ করিতেছি নির্ম্মাণ;
ইতিহাসগাথা স্মরণীয় কথা সে যে গো আমারি বিশেষ দান।
আশার লক্ষ মশাল জ্বেলেছি আমি,
ভাব ভুবনের নীরাজন তরে পূজারিণীসম এসেছি নামি।
মেঘমন্দ্রিত ছন্দে ছন্দে নৃত্য করি যে প্রেমের বসন পরি।

(পর্বানুবৃত্তি)

দরবারী হালদারকে যে গুলি করিয়াছে সে অজয়ই বটে। বিশ্বনাথের ছেলে। ন্যায়রত্নের পৌত্র। দরবারী হালদার আসরে গিয়া বসিবার পূর্ব্বেই ভিড় ঠেলিয়া অজয় আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া পিস্তল তুলিয়া ধরিল, চীৎকার করিয়া বলিল—তুমি আমার মাকে অসতী বলেছ। তোমাকে আমি—

হালদার শুধু থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মুখে কোন কথা ফুটিল না। ভয়ে সে অবশ বিবশ হইয়া গিয়াছিল।

পর পর তিনটি গুলি—সে ছুড়িয়াছিল।

দুইটা গুলি দরবারীকে লাগিয়াছিল। একটা গুলি গিয়া লাগিয়াছে দরবারীর পাশেই ছিল একটা বাঁশের খুঁটি—সেই খুঁটিতে। দরবারীর ডান বাহুতে এবং কাঁধে গুলি বিঁধিয়াছে। অজয় ধরা পড়িয়াছে।

সংবাদটা চারিদিকে বিদ্যুতের মত ছড়াইয়া পড়িল।

অরুণা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দেবু তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। বলিল—কি থেকে কি হয়ে গেল। কিন্তু—।

অরুণা কেমন হইয়া গিয়াছিল। অজয় দরবারী হালদারকে গুলি করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে? দরবারী হালদার তাহার সম্পর্কে কুৎসিত কথা বলিয়াছিল বলিয়া—অজয় তাহাকে গুলি করিয়াছে? সে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়াছে—তুমি আমার মাকে অসতী বলেছ। তোমাকে আমি—। শুধু এই কথা কয়টিই তাহার মাথার মধ্যে—মনের মধ্যে—ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। ঘরে যে আলোটা জ্বলিতেছিল—সে আলোটা যেন ক্রমশ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িল। সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া গেল। আকাশে আলো ঝলমল করিয়া উঠিল।

দেবু বলিয়াই গেল—কিন্তু আমি ভাবছি—ব্যাপারটাকে political caseএ না দাঁড় করায়। সামন্তজোহার রাজত্ব। অজয়ের পিছনে political ছাপ আছে। আমি ভাবছি বউদি। ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত ঘোরালো হয়ে দাঁড়াবে মনে হচ্ছে। আবার একটা conspiracy case না-হয়।

অরুণার কানে শব্দগুলি প্রবেশ করিলেও তাহার কোন অর্থ মস্তিষ্কে আলোড়িত করিল না। তাহার সে মুখভাব বিচিত্র, সে যেন নিজের মধ্যে সমাহিত হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যে অন্তর লোকে শুধু ধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছিল—অজয়ের কথা।

—"তুমি আমার মাকে অসতী বলেছ। তোমাকে আমি—।"

সে তাহাকে মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে—তাহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সে দরবারী হালদারের মত দুর্দ্দান্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর সামনা সামনি দাঁড়াইয়া তাহাকে গুলি করিয়াছে। ভয় করে নাই, পলায় নাই।—পরমুহূর্ত্তেই অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল সে। যেন একটা শ্বাসরোধী যন্ত্রণায় সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। অজয়ের ফাঁসী হইবে? তাহার জন্য?

কাহাকে লইয়া বাঁচিবে সে? কি লইয়া বাঁচিবে সে? দিদি—তাহার দিদি, অজয়ের মায়ের কাছে কি বলিবে সে? সেই একদিন বিশ্বনাথকে কাড়িয়া লইয়াছিল, আজ আবার অজয়—তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন অজয় চলিয়া যাইবে তাহারই জন্য।

সব আলো মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল। বায়ুমণ্ডলের বায়ুস্তর যেন জমিয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে। নিশ্বাস লইতে পারিতেছে না সে।

তাহার অবস্থা দেখিয়া দেবু শঙ্কিত হইয়া ডাকিল—বউদি! অরুণা দি!

—দেবুবাবু! শুষ্ক কণ্ঠে সে বলিল, স্বর বাহির হইল না, শুধু প্রশ্বাসের বাতাস শব্দোচ্চারণে বায়বীয় ধ্বনি

তুলিল।—আমি কি করব? পরক্ষণেই বলিল—আমি মরব দেবুবাবু। আমাকে খানিকটা বিষ এনে দিতে পারেন।

দেবু এবার আরও শঙ্কিত হইয়া বলিল—আপনি স্থির হোন। অরুণা-দি!

—স্থির? স্থির হব!

পরমুহূর্তে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি একবার জয়তারা আশ্রমে যাব। দাদুর কাছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।

থর থর করিয়া সে কাঁপিতেছিল।

দেবু বলিল—না। এই রাত্রে বের হবেন না আপনি। ওদিকে এই ব্যাপার নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে পুলিশ মোতায়েন হয়ে গিয়েছে।

* * *

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একজন ছুটিতেছিল। সে নলিন। সে ছুটিয়া চলিয়াছিল জয়তারা আশ্রমের দিকে। নলিনের অন্ধকারে বড় ভয়। সে ভয় আজ তাহার আর নাই। কোন ভয়ের একবিন্দু অস্তিত্ব সে অনুভব করিতে পারিতেছিল না। সাপের ভয়, মানুষের ভয়, ভূতের ভয়—ভয় অনেক, আজ কোন ভয় নাই তার। সে যেন আজ সব ভয়কে জয় করিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়কে সে খবর দিতে চলিয়াছে। এই এতবড় ভয়ঙ্কর বিপদে তাহার আর কাহারও কথা মনে হয় নাই। মনে হইয়াছে এই বৃদ্ধের কথা। তিনি হয় তো পারেন—তিনিই পারেন পরিত্রাণ দিতে।

ভয় তার নিজের জন্য নয়। ভয় অজয়ের জন্য। এ কি করিল অজয়বাবু? পরক্ষণেই মনে হইতেছে, ঠিক করিয়াছে অজয়বাবু। বিশু দাদাঠাকুরের ছেলে—সে ঠিক করিয়াছে। আবার পরক্ষণেই অজয়ের শান্তির কথা ভাবিয়া সে অধীর হইয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার গতিবেগ বাড়িতেছে—সে জোরে ছুটিতেছে।

—কে? অন্ধকারের মধ্য হইতে কে প্রশ্ন করিল।

থমকিয়া নলিন দাঁড়াইয়া গেল।

—কে? ভারী গলার আওয়াজ। চেনা মনে হইলেও ঠিক চিনিতে পারিল না।

—আমি!

—কে? নলে?

—হ্যাঁ। কে? কে ডাকছেন আপনি?

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এক দীর্ঘকায় মূর্তি। রামভল্লা। সে প্রশ্ন করিল—যাবি কোথা?

—জয়তারা-তলায়। ঠাকুর মশায়ের কাছে। খবর দিতে।

—খবর দিতে যেতে হবে না। আমি খবর দিয়ে এলাম।

—কি বললেন? সে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রামের দিকে চাহিয়া রহিল।

—কি বললেন! শুনলেন—শুনে যেমন পাথরের মতন থাকেন—তেমনি থাকলেন—তারপর বললেন—নারায়ণ! নারায়ণ!

—বললেন—নারায়ণ নারায়ণ! পুতুলের মতই কথা গুলা উচ্চারণ করিয়া গেল নলিন।

—চল ফিরে চল।

—ফিরে যাব?

—হ্যাঁ চল। গিয়ে আর কি করবি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নলিনও ফিরিল। খানিকটা আসিয়া অকস্মাৎ সে রামকে জিজ্ঞাসা করিল—রামভাই!

—হুঁ।

—কি হবে বল দিকিনি?

—সাজা হবে।

—কি সাজা হবে?

—মরে তো ফাঁসী হবে। না ম'রে তো আট দশ বছর মেয়াদ কি কালাপানি।

তাহারা বসতির মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন জংশন সহরটা যেন নতুন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। পথের মোড়ে-মোড়ে ছোট ছোট দলে মানুষেরা জমিয়া ওই কথাই আলোচনা করিতেছে। রাম বলিল—চল—একবার মায়ের ওখান হয়ে যাই।

অরুণা দিদিমণির ওখান!

—না। তুমি যাও। আমি চললাম।

—যাবি না?

—না। নলিন হন হন করিয়া চলিয়া গেল। কি বলিয়া সে অরুণা দিদির সামনে দাঁড়াইবে? কেন সে তাঁহার সাদৃশ্য লইয়া পুতুল গড়িল? সেই, সেই তো সমস্ত অনর্থের

ভুলে! কি বলিবে সে? তিনি যদি বলেন—নলিন—এ তুমি কি করলে? কেন এ কাজ করলে? কি উত্তর সে দিবে?

আঃ—কেন সে এ কাজ করিল? বুক চাপড়াইয়া হায় হায় করিতে ইচ্ছা হইতেছে তাহার! সে ঘুরিল। জনতা বসতি পিছনে ফেলিয়া সে নদীর চরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্য সত্যই বুকে করাঘাত করিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্ধকার চমকিয়া উঠিল। নদীর দুই তীরের ঘন জঙ্গলের মধ্যে তাহার চীৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

—এই! নলিন!

নলিন বোধ হয় শুনিতে পাইল না।

—নলে! ওরে! এই!

—কে?

—আমি ভূপতি। ভূপতি ছুতার তাহাকে ডাকিতেছে।

—কি?

—পুলিশ তোকে খুঁজছে।

—পুলিশ?

—হ্যাঁ। তুই পালা।

—পালাব? কেন?

—লোকে বলছে তোকে শুদ্ধ জড়াবে মামলাতে।

—জড়াবে?

—হ্যাঁ।

নলিন নদীর ঘাট হইতে উঠিয়া আসিল। বলিল—চল। দেখি কি বলছে পুলিশ!

* * * *

রাম আসিয়া অরুণার বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। দেবু প্রশ্ন করিল—কে?

—আমি রাম।

—রাম? তুমি একটা কাজ করতে পার ভাই?

—মা কই? আগে আমি তার সঙ্গে দেখা করব।

—অরুণা দিদির খুব অসুখ রাম। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। জ্ঞান হচ্ছে আবার, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন। তুমি একজন ডাক্তারকে ডেকে আনতে পার?

—কাকে ডাকব?

—যাকে হোক। দেবকী সেন কবরেজকেও ডেকো। বুঝেছ?

—কবরেজ তো জয়তারা মায়ের থানে রয়েছেন দেবু। তিনি ঠাকুরমশায়ের কাছে গিয়েছেন।

—ঠাকুর মশায় খবর পেয়েছেন তা' হ'লে?

—পেয়েছেন।

—অজয়ের মা? তিনি শুনেছেন?

—হ্যাঁ। আমি দিয়ে এলাম খবর। শুনলেন—শুনে—বার-দুই নারায়ণ! নারায়ণ! বললেন—তারপর মা ঠাকরুণেরে ডাকলেন। বললেন—মনকে শক্ত কর, একটা কঠিন সংবাদ দেব। মা ঠাকরুণ মুখের দিকে চাইলেন—বললেন—বলুন। অজয়ের খারাপ খবর? ঠাকুর বললেন—এখানকার দারোগা মেলার মধ্যে অরুণাকে অসতী বলে গাল দিয়েছিল। অজয় মেলার মধ্যে ছিল, সে পিস্তল দিয়ে তাকে গুলি করেছে। তিনি শুনে চুপ করে রইলেন। আমি চলে এলাম। মায়ের থান থেকে বেরুচ্ছি—দেখলাম কবরেজ ঢুকছে। খানিকটা এসে দেখি—নলে—। সে চুপ করিয়া গেল। বলিল—আলো নিয়ে কারা যেন আসছে গো।

মোড়ের মাথায় একটা হ্যারিকেন আসিতেছে। পিছনে অনেক কয়জন লোক।

দেবু বলিল—তুমি ভাই তাড়াতাড়ি যাও। ওরা যে হবে হোক। ডাক্তার দেখ একজন।

রাম চলিয়া গেল।

আলোটা আসিয়া দাঁড়াইল অরুণারই বাড়ীর দরজায়। আলোর পিছনে—দেবকী সেন। ঠাকুরমশাই, অজয়ের মা, জয়তারা আশ্রমের পুরোহিত, দেবকী সেনের কয়েকজন শিষ্য।

অরুণা কই?—প্রশ্ন করিলেন জয়া।

—তাঁর অসুখ। সংবাদটা শুনে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। জয়া দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

—আপনিও আসুন কবরেজ মশাই। একবার দেখুন। দেবু একখানি আসন পাতিয়া দিয়া ন্যায়রত্নকে বলিল—আপনি একটু বসুন।

—না, পণ্ডিত। আমিও ভিতরে যাব।

—আসবেন ভিতরে? আপনি?

—আসব বই কি।

ঠাকুর মহাশয়ও আসিয়া অরুণার মাথার শিয়রে বসিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

—দুঃখ জয় করার সাধনার কষ্টের চেয়ে বড় কষ্ট আর বোধ হয় নাই।

তাহার পরই ঘরের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা থম থম করিতে লাগিল। শুধু টাইম পিস ঘড়িটা—টিক্ টিক্ করিয়া চলিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই অরুণা প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে কেবল এক একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছিল—নহিলে প্রায় নিস্পন্দ। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেল। ভোরের আলো তখন ফুটিতেছে—অরুণা চোখ মেলিল। জয়াকে দেখিয়া চিনিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জয়া বলিল—অরুণার জ্ঞান হয়েছে দাদু!

—হয়েছে! এইটিই আমি চাইছিলাম। জীবনে তো প্রার্থনা করিনা। আজ এই প্রার্থনা করছিলাম—বসে বসে। অজয়কে নিয়ে যাবে পুলিশ। সে দেখা করে প্রণাম করতে চেয়েছে। আশীর্ব্বাদ তার প্রয়োজন।

ওদিকে পূর্ব্বাকাশ লাল হইয়া উঠিতেছিল। ন্যায়রত্ন সেই দিকে চাহিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃনু—সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।"

* * *

সেই দিনই অজয়কে পুলিশ সদরে লইয়া গেল।

যাইবার সময় সে সকলের শেষে অরুণাকে প্রণাম করিল—একবার শুধু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—মা!

অরুণা বলিতে কিছু পারিল না। আবার সে চেতনা হারাইয়া মেঝের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সূর্য্যমুখী

আশা দেবী

সূর্য্যের তরে কেঁদে কেঁদে কেন
ঝরিল সূর্য্যমুখী?
মাথার উপরে তামাটে আকাশ
নীচে রোদে-পড়া বন
ঝির ঝিরে জলে নেমেছে
রোদের তাপ
এপার ওপার জলে জলে যেন
তামার পাতেতে বাঁধা
করুণা বিহীন দিন।
এরি মাঝে কেন মরিল সূর্য্যমুখী?

শান্ত নয়নে এক কণা শুধু জল—
মৃত্যুর বিষে কেঁপে ওঠে টলমল।
সৌর জগতে বড়ই অবান্তর

এতো বড় নভ, এতো তারা ভরা রাত
হাসি মাখা চাঁদ, এতো আলো, এতো আশা
কোথায় সূর্য্যমুখী
স্বর্গ-সবিতা রাজরথে চলে অস্ত-উদয় পথে।
শুধু কাঁদা আর, শুধু ঝরে ঝরে যাওয়া
সুদূর আকাশে সূর্য্য কিরীটে সম্রাট মহীয়ান
এত ছোট মাটি—এত ছোট তার ফুল
কে তার বারতা জানে?
অধরার প্রেমে তবু জেগে থাকে একাকী সূর্য্যমুখী:
জেগে থাকে শুধু স্মরণ পিয়াসী
এতটুকু তার প্রাণ।
কাঁদে আর ঝরে যায়
বিশীর্ণ পাণ্ডুর—
দগ্ধ-আকাশে শোনা যায় শুধু করাল অট্ট হাসি॥

বন-মহোৎসব—

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ১লা জুলাই হইতে এক মাসকাল যাহাতে বাংলাদেশে ‘বৃক্ষরোপণ মাস’ পালন করা হয়, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট প্রচার কার্য্য করিয়াছেন। গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে ঐ সময়ে যে সকল গাছ লাগানো হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ ছিল নানা প্রকার ফলের গাছ। ঐ সকল ফল মানুষের খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য। জ্বালানী কাঠ ও অন্যান্য কাজের জন্য বাকী গাছগুলি ব্যবহৃত হইবে। বাংলাদেশে খাদ্যাভাব দূর করবার জন্য ফলের গাছ লাগানো খুবই প্রয়োজন। আম-কাঁঠালের সময় ২।৩ মাস মানুষ কম ভাত খাইয়া—অধিক ফল খাইয়া থাকিতে পারে। জাম, জামরুল, পেয়ারা, লিচু, তাল, নারিকেল প্রভৃতি ফলও মানুষের খাদ্যাভাব দূর করতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ সকল ফলের গাছের সংখ্যা একেবারে কমিয়া গেছে। সকল গৃহস্থ যদি নিজ নিজ জমীতে ২।৫টি করিয়া গাছ লাগান, তাহা হইলে আট আনায় একটা আম বা একটা নারিকেল কিনিতে হয় না। দক্ষিণ বাংলার সর্ব্বত্র প্রচুর নারিকেল ফলে—১২ মাস ফল পাওয়া যায়। আমরা ‘বৃক্ষরোপণ মাসে’ প্রত্যেক মানুষকে তাঁহার কর্ত্তব্য করিতে আবেদন জানাই। বাংলাদেশে এমন বাড়ী যেন না থাকে, যে বাড়ীতে পেয়ারা ও জামরুলের গাছ থাকবে না। আম কাঁঠালের কথা ত বলাই বাহুল্য।

অবলা বসু স্মৃতি ভাণ্ডার—

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী লেডী অবলা বসু ১৯১৯ সালে নারী-শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ৫টি বিভিন্ন বিষয়ে কাজ আরম্ভ করেন ও গত ৩০ বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত সে কাজ করিয়া গিয়াছেন। (১) সহর ও পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন (২) বয়স্কাদের প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্র ও প্রসূতিচর্য্যা শিক্ষার ক্লাস (৩) বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন—এখানে যে সকল বিধবা বাস করেন, বিনা ব্যয়ে তাঁহাদের থাকা খাওয়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় (৪) শিক্ষয়িত্রীদের জন্য বাণী ভবন ট্রেণিং স্কুল ও (৫) মহিলা শিল্প ভবন—এই ৫ ভাগে কাজ ভাগ করা হইয়াছিল। ১৯৫১ সালের ২৫শে এপ্রিল লেডী বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য পরিচালনের জন্য লেডী অবলা বসু স্মৃতি ভাণ্ডার স্থাপন করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতা ২৯৪।৩ আপার সার্কুলার রোডে শ্রীমতী ব্রহ্মকুমারী রায় ও শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা ঐ ভাণ্ডারের সম্পাদিকা। অবলা বসু বাঙ্গালার নারী সমাজের—বিশেষ করিয়া হিন্দু বিধবাদিগের স্বাবলম্বী করার জন্য সারা জীবন যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যাহাতে অর্থাভাবে বন্ধ না হয়, সেজন্য দেশবাসী সকলেরই চেষ্টা ও সাহায্য করা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের মত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেশে যত অধিক হয়, ততই দেশের পক্ষে আশার কথা।

বারুইপুর আটিসারার শ্রীপাট—অনন্তাচার্য্যের গৃহ। কটকী-ঘাট—এই ঘাট হইতে মহাপ্রভু পুরী যাত্রা করেন

ফটো—পঞ্চানন দাস

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব—

চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সংঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব বাংলাদেশে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছে। এবারও গত ২৫শে বৈশাখ হইতে ৬ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত উৎসব, মেলা ও প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীতে ‘শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঁচিবার পন্থা’ মৃন্ময় মূর্ত্তিযোগে কাহিনীছলে দেখানো হইয়াছিল এবং তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম দিনে

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন করেন ও বলেন—সংঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় ভারতীয় প্রেরণার অনুসরণে জাতিকে আধ্যাত্মিক ও মৌলিক উভয়বিধ অভ্যুদয়ে যে আহ্বান দিয়াছেন, তাহা সার্থক করিতে পারিলে বাঙ্গালী আবার চিরবিজয়ী হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পবিভাগের পরিচালক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ 'বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক সমস্যা' সম্বন্ধে, হরিজন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় 'মহাত্মাজীর তপঃপূর্ণ জীবন' সম্বন্ধে ও অন্যান্য বহু সুধী কয়দিন ধরিয়া তথায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। উৎসব,মেলা ও প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া সংঘের কর্ম্মীরা যে ভাবধারা প্রচারের ব্যবস্থা করেন, তাহাই আজ ভারতের দুর্গত নরনারীদিগকে প্রকৃত মুক্তির পথ দেখাইতে সমর্থ হইবে।

বার্ণপুর সাহিত্য সম্মিলন—

গত ৯ই ও ১০ই জুন আসানসোলের নিকটস্থ বার্ণপুর আগমনী সাহিত্য সংঘের উদ্যোগে স্থানীয় ভারতী ভবনে বার্ণপুর সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কিশোর শাখায় ও অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞান শাখায় সভাপতিত্ব করেন। খ্যাতনামা লেখক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। ৪ জন সাহিত্যিকের ভাষণই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অচিন্ত্যবাবু বলেন—"সাহিত্যে সকলের জন্যই উদার নিমন্ত্রণ প্রসারিত। এ যেন অপক্ষপাত গণতন্ত্র। জীবনের বীণায় যত সুর—এই সাহিত্যে তাহার মধুর সমন্বয়। সাহিত্য কিছুই প্রত্যাখ্যান বা পরিহার করে না।" লৌহ কারখানার মধ্যে এই সাহিত্য সম্মিলন প্রকৃতই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বের পরিচায়ক। মানুষ যে কোন অবস্থার মধ্যেই থাক না কেন, সে যে তাহার সংস্কৃতি রক্ষায় সর্ব্বদা মনোযোগী, বার্ণপুর সাহিত্য সম্মিলন তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

রহড়া বালকাশ্রমে নূতন ছাত্রাবাস—

বসুমতীর মালিক স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দানে তাঁহার পরলোকগত পুত্রকন্যা রামচন্দ্র ও প্রীতির স্মৃতি-বিজড়িত রহড়া (২৪ পরগণা) বালকাশ্রমে সম্প্রতি ২৬ জন ছাত্র থাকিবার একটি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হওয়ায় গত ১৭ই জুন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা সচিব ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন তাহার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। ঐ নূতন গৃহ নির্ম্মাণে ২৬ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, তন্মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক ব্যয় পশ্চিম বঙ্গ সরকার বহন করিয়াছেন। আশ্রমটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীন ও স্বামী পুণ্যানন্দ তাহার রক্ষক। তাঁহার চেষ্টায় গত ৬ বৎসরে ৬০ বিঘা জমী ক্রয় করা হইয়াছে ও কয়েক লক্ষ টাকার গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে আশ্রমে ২৩৫টি নিরাশ্রয় বালক বাস করে ও তাহাদের শিক্ষার জন্য আশ্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শিল্প বিদ্যালয় চলিতেছে। আমরা সহৃদয় সকল দেশবাসীকে আশ্রমটি দর্শন করিতে অনুরোধ করি। এই ধরণের বালকাশ্রমের সংখ্যা শুধু বাংলা দেশে নহে, ভারতে অতি অল্প।
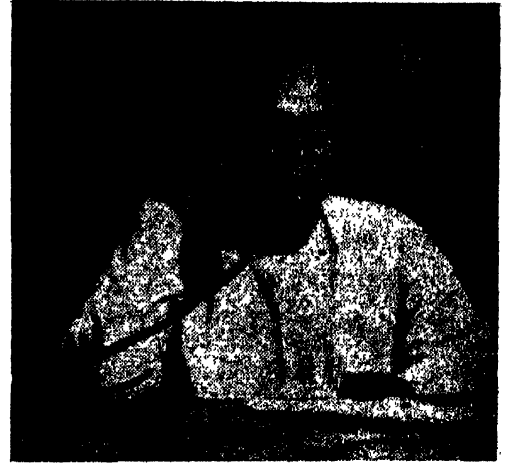
শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ—গত মাসে ইঁহার কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী হওয়ার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে

চুনারে মহিলা শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র—

পশ্চিম বাংলা হইতে ৪০০ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর চুনার দুর্গে এক শত প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ও ১১০ জন বালকবালিকা উদ্বাস্তকে লইয়া গিয়া একটি শিল্প শিক্ষা আশ্রম খোলা হইয়াছে। তথায় দর্জ্জির কাজ, তাঁতের কাজ, রুটী, লজেন্স প্রভৃতি প্রস্তুত, গেঞ্জি, মোজা প্রভৃতি বোনা শিক্ষা দেওয়া হয়। তথায় মোট ১২ শত লোক

থাকিতে পারিবে। ৮৬ হাজার টাকা ব্যয়ে তথায় প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীমতী নীলিমা মিত্র নাম্নী এক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা তথায় অধ্যক্ষা নিযুক্ত হইয়াছেন। ঐ শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র যাহাতে ভাল ভাবে চলে ও উদ্বাস্তুদের প্রকৃত উপকার করিতে পারে, সেজন্য সাধারণের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও উত্তর প্রদেশ সরকার বর্ত্তমানে উহা পরিচালনা করিতেছেন।

সুন্দরবনবাসীর দুরবস্থা—

সুন্দরবন অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বহু লক্ষ বিঘা জমী চাষের উপযোগী করিয়া তথায় লোকজন বসতি স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু সে অঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। যাতায়াতের পথের কোন ব্যবস্থা নাই। পানীয় জলের দারুণ অভাব; সেচের ব্যবস্থা নাই। বাঁধ দিয়া লবণাক্ত জল প্রবেশ বন্ধের উপায়ের অভাব। অথচ ঐ অঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। তথায় চাষের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইলে খাদ্যের অভাব বহু পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে। গত ২৮শে জুন ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে ৬০ মাইল দূরে কাকদ্বীপে যাইয়া এক কৃষক সভায় ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন ও তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন —ঐ অঞ্চলের সকল জমী সরকার গ্রহণ করিয়া যদি তাহা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন, তবে তথায় সমবায় প্রথায় চাষ করিয়া বহু অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। জমীগুলি খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় তথায় ভাল করিয়া চাষের সুবিধা হয় না। এ বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মনোযোগী হইয়া তৎপরতার সহিত কাজ করা উচিত। ডক্টর মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে ব্রহ্মচারী ভোলানাথের সহযোগিতায় সুন্দরবনের অধিবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূরীভূত হইবে।

সোমনাথ—

গত ২৭শে বৈশাখ সোমনাথ মন্দির ও বিগ্রহের পুনপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খ্যাতনামা বাঙ্গালী কবি, ভক্তবর শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক একটি কবিতা রচনা করেন—তাহা ভারত সেবাশ্রম সংঘের মাসিক মুখপত্র 'প্রণবে'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

পাপ তমিস্রা রজনী কেটেছে
এসেছ জ্যোতির্ময়—
জয় জয় তব জয়।
সকল বিঘ্ন, সব বিপত্তি, সকল অকল্যাণ—
শিব সুন্দর তব ঈক্ষণে হল আজ অবসান,
এই ভারতের ধূলি.
মধুময় করে তুলি,
পীযুষ সীকর-সিক্ত সমীর
নূতন করিয়া বয়
জয় জয় তব জয়।
কখনো পূর্ণ, কখনো চূর্ণ, হে পরব্রহ্ম
অধিগম্য যে সহজেই হও হে অনধিগম্য,
কণা চেয়ে কণীয়ান
সব চেয়ে বরীয়ান.
যেন এ ভারত চিরদিন তব
পাদপীঠ হয়ে রয়
জয় জয় তব জয়।
নির্ম্মল ঋজু তেজগর্ভ হে প্রাণ—
সেই বিশুদ্ধ সেই সমৃদ্ধি পুন কর তুমি দান
সকল হীনতা হর
অমৃতময় কর
সব অপরাধ ভঞ্জন কর
হোক সব পাপক্ষয়
জয় জয় তব জয়।
তুমিই মূর্ত্ত, তুমি অমূর্ত্ত, তুমি ক্রিয় অক্রিয়
সব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কখনো, কখনো অতীন্দ্রিয়!
তোমাকেই লয়ে আছি,
যুগে যুগে পূজিয়াছি,
তুমিই শরণ, তুমি সম্পদ
তুমি পরমাশ্রয়
জয় জয় তব জয়।

এই কবিতা সর্বত্র পঠিত হইলে ও বালকবালিকাগণের মুখে আবৃত্তি করা হইলে দেশ উপকৃত হইবে।

বাঙ্গালা দেশে পঙ্গপাল—

এ বৎসর বাংলা দেশে পঙ্গপালের আবির্ভাব হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানায় ও বীরভূম জেলার

রাণীনগর থানায় বহু স্থানে পঙ্গপাল নামিয়াছে। কয় মাস পূর্ব্বে ২৪ পরগণা জেলায় পঙ্গপাল আসিয়াছিল। এ সময়ে মাঠে ফসল না থাকায় বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বিহার হইতে পঙ্গপালের দল পশ্চিম বাংলায় প্রবেশ করিতেছে। ইহা দৈব দুর্ঘটনা—ইহার প্রতিকারের উপায় নাই।

প্রচার পত্র—

কলিকাতা ১৮নং এস্প্লানেড ম্যান্সন্স হইতে ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস কর্ত্তৃপক্ষ গত ২১শে জুন হইতে 'আমেরিকান রিপোর্টার' নামে এক বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যে কোন আগ্রহশীল পাঠক ঐ ঠিকানায় পত্র দিলে তাঁহাকে বিনামূল্যে ঐ পত্র পাঠানো হইবে। ভারতবাসীর সহিত আমেরিকাবাসীর মৈত্রী সুদৃঢ় করাই ঐ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই কামনা করি।

ইন্দিরা দেবী সম্বর্দ্ধনা—

শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর বয়স বর্ত্তমানে ৭৮ বৎসর। তিনি স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক বীরবল ৺প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী। বাংলার সাহিত্য ও সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য দানের কথা স্মরণ করিয়া গত ১০ই আষাঢ় কলিকাতায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানে শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন, অধ্যাপক কালিদাস নাগ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতে স্বরযোজনা করিয়া তাহাকে জীবন দান করিয়াছেন—অনুষ্ঠানে বহু রবীন্দ্র সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। ইন্দিরা দেবীর সম্বর্দ্ধনা দ্বারা বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হইয়াছে।

পাঞ্জাব রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা—

ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত পাঞ্জাব রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর গোপীনাথ ভার্গব পদত্যাগ করায় এবং কংগ্রেস সভাপতি সর্দ্দার প্রতাপ সিং কায়রণ ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীভীমসেন সাচার কোন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে অসমর্থ হওয়ায় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাঞ্জাব রাজ্যের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া গভর্ণর শ্রীচান্দুলাল ত্রিবেদীকে শাসন কার্য্য পরিচালনার ভার দিয়াছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নূতন শাসন ব্যবস্থায় এই প্রথম সঙ্কট দেখা দিয়াছে।

নৃত্যশিল্পী কুমারী অরুন্ধতী—

অষ্টম বর্ষীয়া কুমারী অরুন্ধতী সম্প্রতি রাজ্যপাল ভবনে এবং শ্রীরঙ্গম, কালিকা প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন নৃত্য-

নৃত্যশিল্পী অরুন্ধতী

ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। মাত্র ৬ বৎসর বয়সে সে বালীগঞ্জ সঙ্গীত সংসদের নৃত্য প্রতিযোগিতায় মণিপুরী নৃত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'ট্রফী' লাভ করিয়াছিল।

স্বামী শঙ্করানন্দ—

স্বামী বিরজানন্দের স্থানে গত ১৯শে জুন রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক সমিতির সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ মিশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১৯৪৭ সাল হইতে স্বামী শঙ্করানন্দ মিশনের সহ-সভাপতি ছিলেন। গভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ কর্ম্মশক্তির জন্য স্বামী শঙ্করানন্দ মিশনের সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন।

পরলোকে ওয়াজেদ আলি—

খ্যাতনামা বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান জনাব এস-ওয়াজেদ আলি গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সকালে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৯০ সালে তিনি

এস ওয়াজেদ আলি

হুগলী জেলার জনাই এর সন্নিহিত বড়তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ ও ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া তিনি ১৯১৫ সাল হইতে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন ও ১৯২৩ সালে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া ১৯৪৫ পর্য্যন্ত সে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ও 'ভারতবর্ষে' তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল।

প্রধান-মন্ত্রী পদে ডি-ভ্যালেরা—

গত ১৩ই জুন আয়র্লণ্ডের পার্লামেণ্ট সভায় মিঃ জোন কষ্টেলোকে দুই ভোটে পরাজিত করিয়া বিপ্লবী নেতা মিঃ ইমন-ডি-ভ্যালেরা আয়র্লণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ ডি-ভ্যালেরা সমগ্র জগতে সুপরিচিত—তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছে। তাঁহার নির্ব্বাচন সাফল্যে জগৎবাসী সকলে আনন্দিত হইবেন।

দুইটি মোটর দুর্ঘটনা—

৩১শে মে বাঁকুড়া হইতে ৩৭ মাইল দূরে এক মোটর দুর্ঘটনায় পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগের পশ্চিম সার্কেলের সুপার এঞ্জিনিয়ার শ্রী এস-কে-সেন মারা গিয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর হইয়াছিল—তাঁহার পত্নী ও ২ পুত্র বর্ত্তমান। পরদিন ১লা জুন কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূরে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে আর এক মোটর দুর্ঘটনায় শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে মারা গিয়াছেন। তিনি কোনার বাঁধের নির্ম্মাণ কার্য্যের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—তাঁহার বয়সও মাত্র ৪২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কাঠিয়াবাড়ের ভবনগরের অধিবাসী ছিলেন। উভয় দুর্ঘটনাই মর্ম্মন্তুদ ও শোচনীয়।

যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়—

পশ্চিম বঙ্গের কারাগারসমূহের ইন্সপেক্টার-জেনারেল যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় গত ২২শে জুন সকালে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মাত্র কয় দিন পূর্ব্বে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯২১ সালে সহকারী জেলাররূপে তিনি সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন ও গত ১৯৪৭ সাল হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে জেলার ছিলেন।

পরলোকে সার হরিশঙ্কর পাল—

কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও জন-সেবক বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানীর পরিচালক, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র সার হরিশঙ্কর পাল গত ১৮ই জুন ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বর্গত বটকৃষ্ণ পালের তৃতীয় পুত্র ও গত ১৯০৬ সাল হইতে ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য, বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ও বিভিন্ন ব্যবসায়ের পরিচালকরূপে তিনি বাঙ্গলায় সর্ব্বজন-পরিচিত ছিলেন।

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি খড়্গপুরস্থ ইণ্ডিয়ান টেকনলজিকাল ইনিষ্টিটিউটের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদকরূপে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিয়োগে বাংলার গ্রন্থাগারকর্ম্মীরা সকলেই আনন্দিত হইবেন।

বজবজে নূতন শিব-মন্দির—

বজবজের (২৪ পরগণা) অধিবাসীদিগের অনুরোধে বিরলা ব্রাদার্স কোম্পানী স্থানীয় চৌরাস্তার মোড়ে একটি শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। গত ৯ই জুন পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ঐ মন্দিরের উদ্বোধন করিয়াছেন। উৎসবে মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দেশের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির উন্নতি বিধানে বিরলা ব্রাদার্সের দান সর্ব্বজনবিদিত।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী—

ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য সচিব শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রস্তাবিত অর্থ কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে কলিকাতায় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার পরিচালক সমিতির সভাপতির কাজ করিতেছেন। তাঁহার এই নিয়োগ গুণগ্রাহিতারই পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

মানভূমে সত্যাগ্রহ—

গত ৩০শে জুন কলিকাতা কুমার সিং হলে কলিকাতা-প্রবাসী মানভূমবাসীদিগের এক সভায় খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু 'মানভূম সত্যাগ্রহ' সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী ও মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে জানা যায়, মানভূম জেলার সরকারী অনাচারের প্রতিবাদে সেই সকল অনাচার দূর করিবার জন্য তত্রস্থ প্রবীণ দেশসেবক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে একদল পুরাতন কংগ্রেসকর্ম্মী সত্যাগ্রহ করিয়াছেন—ফলে একদল কর্ম্মীকে কারাবরণ করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু অনাচার ও আংশিক ভাবে দূরীভূত হইয়াছে। সারা ভারতবর্ষে ভারতবাসী-দিগকে সরকারী অব্যবস্থার ফলে কষ্টভোগ করিতে হইতেছে; সে সকলের প্রতিরোধ ও প্রতীকার করিবার জন্য শুধু মন্ত্রী বা শাসকদিগকে নিন্দা করিলে কর্ত্তব্য শেষ হইবে না। মহাত্মা গান্ধী অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য যে সত্যাগ্রহের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে অন্যায় যে বন্ধ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত মানভূমের কর্ম্মীরা সমগ্র ভারতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। সে জন্য আজ মানভূমে সত্যাগ্রহের ইতিহাস ও বিবরণ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা মানভূমবাসী কর্ম্মীদিগকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। স্বাধীন ভারতে মানভূম সত্যাগ্রহ সকলের আদর্শস্থানীয় হইবে, ইহাই আমরা মনে করি।

লোক শিক্ষা ও গ্রন্থাগার—

কলিকাতা ৬৭নং এজরা ষ্ট্রীটস্থ গ্রন্থাগার প্রচার সমিতির লোক শিক্ষা সংসদের পক্ষ হইতে আগামী ৩১শে আগষ্ট হইতে এক সপ্তাহ সর্ব্বত্র গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালনের চেষ্টা হইতেছে। আমাদের দেশে বহু গ্রন্থাগার থাকিলেও সেগুলিকে এখন পর্য্যন্ত লোক শিক্ষা প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোক শিক্ষা বিভাগও কাজ আরম্ভ করিয়াছেন; সেজন্য জনশিক্ষা নামক একখানি পত্রিকার ৬ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারী চেষ্টার সঙ্গে বেসরকারী চেষ্টা মিলিত না হইলে দেশে লোক শিক্ষার প্রচার সম্ভব হইবে না। আমাদের দেশে কথকতা, কবি, গান, তরজা, যাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়া যে লোক শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা ছিল, তাহা নূতন আকারে ও আধুনিক ভাবে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইলে দেশ উপকৃত হইবে। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন ও সর্ব্বত্র অর্থ সাহায্য করিয়া কর্ম্মীদিগকে উৎসাহ দান করিতেছেন। গ্রন্থাগার প্রচার সমিতিও সে কার্য্যে দেশবাসী কর্ম্মীদিগকেও উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিলে দেশে লোক শিক্ষা প্রচারের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে।

দক্ষিণ ত্রিনিদাদে ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের সম্বর্দ্ধনা

সাম্প্রতিক নেপাল পরিভ্রমণকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু ভাটগাঁও গমন করেন। ভাটগাঁও নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ড হইতে ৮ মাইল পূর্বে অবস্থিত। প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাঁহার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, নেপালের স্বরাষ্ট্র সচিব প্রভৃতি ছিলেন। চিত্রে কয়েকটি পুরাকালের স্মৃতিস্তম্ভের সামনে তাঁহাদের দেখা যাইতেছে

করিয়াছে। পুলিসের সাধারণ কাজ ছাড়াও ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের সমাজ-সেবার প্রতি আকর্ষণ আছে—আমরা বিশ্বাস করি, তাঁহার দ্বারা কলিকাতাবাসী নূতন ভাবে উপকৃত হইবে।

অন্ধ্রদেশে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের সম্মান—

অন্ধ্রদেশের কণ্ডুর নামক স্থানের "শ্রমিক বন্ধু সভা" নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ২ই জুন হইতে সেখানে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং আসামের আদিম জাতিদের সম্বন্ধে

[illegible] চন্দ

বিশেষজ্ঞ শ্রী[illegible] সম্মেলনে যোগদান করিয়া ভারতের আদিম জাতিদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আদিম জাতিদের উন্নয়ন অন্ধ্র শ্রমিক বন্ধু সভার কর্ম তালিকার অন্তর্গত। উক্ত প্রতিষ্ঠান মালেপোলে পাহাড়ের আদিম বাসীদের মধ্যে নানা কল্যাণকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছে।

উচ্চ শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কার—

গত ১৫ই আষাঢ় কলিকাতায় পশ্চিম বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ২১তম বার্ষিক সম্মিলনের সভাপতিরূপে ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'শিক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"এ কথা হইতেই পারে না যে, বহুদিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহাই শেষ কথা। বর্ত্তমান যুগের প্রশ্ন কি, সমস্যা কি, তাহাই সকলকে বিবেচনা করিতে হইবে।' অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শিক্ষকগণের আর্থিক দুর্গতি সম্বন্ধে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। দ্বিতীয় দিনের সভায় ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা স্থির করিবার জন্য একটি কমিটী গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। কমিটি যাহাতে সত্যই কার্য্য করে, সে বিষয়ে সকল বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

ডক্টর শ্রীবিধানচন্দ্র রায়—

গত ১লা জুলাই পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের [illegible] বৎসর বয়স আরম্ভ হইয়াছে—এই উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাভিনন্দন জ্ঞাপন করি। ৩৫ বৎসরের অধিক কাল তিনি জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশ সেবায় ব্রতী আছেন। কলিকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদুনাথ[illegible] রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন যাদবপুর [illegible] কলেজ, চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকরূপে তিনি বাংলা দেশে সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়। ১৯২৩ সাল হইতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সহকর্মীরূপে তিনি কংগ্রেস তথা রাজনীতির সেবায়ও যোগদান করিয়া ক্রমে ব্রতী আছেন। তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মশক্তি ও ক্ষুরধার বুদ্ধি আজ তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সমগ্র জীবনের এক মুহূর্ত্তও তিনি অবসর গ্রহণ করেন নাই বা কর্ম্মে বিরত থাকেন নাই। এখনও তিনি প্রত্যহ ৯।১০ ঘণ্টা কাল সরকারী দপ্তরখানায় বসিয়া কাজ করেন। প্রার্থনা করি, তিনি সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন লাভ করিয়া দুর্গত বাঙ্গালা দেশকে সেবা দ্বারা উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলুন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

উইম্বলডন লন টেনিস ঃ

অল্-ইংলণ্ড লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতা পৃথিবীর টেনিস মহলে উইম্বলডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ নামে সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। উইম্বলডন বলতে বুঝায় টেনিস খেলার স্বর্গরাজ্য। লণ্ডন সহরের দক্ষিণে অন্যান্য সহরতলীর মধ্যে উইম্বলডন মাথা উঁচু করে আছে আপন গরীমায়। প্রতিবছর পৃথিবীর টেনিস ক্রীড়ারত দেশগুলি থেকে বাছাই খেলোয়াড়রা উইম্বলডন লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় খেলতে আসেন। এই চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করার গৌরব বিশ্ব টেনিস চ্যাম্পিয়ান-সীপ পাওয়ার মত সমান গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য বছরে ৩০টি দেশের নিজ নিজ টেনিস এসোসিয়েশন কিম্বা ফেডারেশন কর্তৃক নির্বাচিত খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। ভারতবর্ষ থেকে ৩নং খেলোয়াড় নরেন্দ্রনাথ এবং ৪নং খেলোয়াড় নরেশকুমার যোগদান করেছিলেন। ১নং খেলোয়াড় বাংলার দিলীপকুমার বসু শারীরিক অসুস্থতার দরুন যোগদান করেননি। গত বছর দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিযোগিতা আরম্ভের মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি ইংলণ্ডে খেলতে গিয়ে সেখানের জলবায়ুতেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'ন এবং সেইহেতু প্রতিযোগিতায় বিশেষ কোন ফল দেখাতে পারেন নি। অথচ গত বছরই তাঁর খেলায় প্রভুত উন্নতি দেখা দিয়েছিল, এশিয়ান লন টেনিসে যোগদানকারী আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন টেনিস খেলোয়াড়দের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছিলেন। উইম্বলডন লন টেনিস খেলা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের ক্রীড়ানৈপুণ্য বিচার ক'রে মান-নির্দ্ধারক হিসাবে খেলোয়াড়দের নামের একটি ক্রমপর্য্যায় তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এই মান-নির্দ্ধারক তালিকায় একমাত্র দিলীপকুমার বসুই

এশিয়ান গেমসে মিঃ এশিয়া সম্মানপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত পরিমল রায়

স্থান পেয়েছেন, ১৯৫০ সালে। এই তালিকায় যারা স্থান পান তাঁদের বলা হয় ঐ বছরের 'সিডেড' খেলোয়াড়।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় কয়েকজন খ্যাতনামা

খেলোয়াড় নবাগত এবং অখ্যাতনামা খেলোয়াড়দের কাছে হেরে গিয়ে ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

গতবছরের উইম্বলডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান বাজ পেটি (আমেরিকা) এ বছরের খেলার দ্বিতীয় রাউণ্ডে পরাজিত হয়েছেন উইম্বলডন প্রতিযোগিতার নবাগত আমেরিকার জুনিয়ার খেলোয়াড় হ্যামিল্টন রিচার্ডসনের কাছে ৬-৪, ৩-৬, ৬-৪, ৮-১০, ৭-৫ গেমে। আমেরিকার টেনিসে জুনিয়ার খেলোয়াড়ের কাছে সিনিয়ার খেলোয়াড়ের এভাবে শোচনীয় পরাজয় এই প্রথম। গতবছরের রাণার্স আপ অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রাঙ্ক সেজম্যান হার স্বীকার করেছেন কোয়ার্টার-ফাইনালে ভিক ফ্রামের (আমেরিকা) কাছে। সেজম্যান এ বছরের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশীপের মান নির্দ্ধারক তালিকায় ১নং খেলোয়াড় ছিলেন, ফ্রাম ছিলেন পঞ্চম স্থানে। এ বছরের ইজিপ্ট এবং বেলজিয়ম টেনিস চ্যাম্পিয়ান এবং ২নং উইম্বলডন সিডেড খেলোয়াড় ইজিপ্টের জরোস্লাভ ড্রোবনি হেরে যান বৃটেনের ১নং খেলোয়াড় টনি মোট্রামের কাছে। উভয়ের মধ্যে ৫ সেট খেলা হয় এবং মোট্রাম জয়লাভ করেন ৫-৭, ৬-৬, ২-৬, ৬-৫, ৮-৬ গেমে। মোট্রাম এবছরের 'সিডেড' তালিকায় কোন স্থানই পাননি! পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনাল খেলা হয়েছিল ভিক ফ্রাম (আমেরিকা) বনাম ডিক সাভিট (আমেরিকা) এবং এরিক ষ্টারগেস (দঃ আফ্রিকা) বনাম কেন ম্যাকগ্রেগর (অষ্ট্রেলিয়া)। এবছরের উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় সিডেড খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় ফ্রামের স্থান ৫ম, সাভিটের ৬ষ্ঠ, ষ্টারগেসের ৮ম এবং ম্যাক-গ্রেগরের ৭ম। সেমি-ফাইনালে ষ্টারগেস এবং ফ্রাম হেরে যান। মহিলাদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে গত তিন বছরের চ্যাম্পিয়ান মিস লুই ব্রাউ (আমেরিকা) হার স্বীকার করেছেন আমেরিকার মিস শার্লি ফ্রাইয়ের কাছে। মিস ব্রাউ ছিলেন এ বছরের ১নং উইম্বলডন 'সিডেড', মিস ফ্রাই ছিলেন চতুর্থ স্থানে। এ ফলাফল খুবই বিস্ময়জনক। অবশ্য মিস ব্রাউয়ের দিক থেকে বলবার আছে, তিনি খুবই অসুস্থা ছিলেন। উইলস মুডীর পরবর্ত্তী যুগে তিনিই মহিলাদের টেনিস মহলে সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে অধিষ্ঠান করছিলেন। মহিলাদের অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ডরিস হার্ট (৩নং উইম্বলডন সিডেড) ৬-৩, ৬-১ গেমে আমেরিকার মিস বিভালি বেকারকে পরাজিত করেন।

ভারতীয় খেলোয়াড় নরেন্দ্রনাথ প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডে হেরে যান ৭নং উইম্বলডন সিডেড খেলোয়াড় এবং ফাইনালে বিজিত ম্যাকগ্রেগরের কাছে। চারসেট খেলা হয়। নরেশকুমার পরাজিত হ'ন আমেরিকার ২নং খেলোয়াড় হ্যামিল্টন ফ্রামের কাছে ১ম রাউণ্ডে। সিডেড খেলোয়াড় হিসাবে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় ফ্রামের স্থান ছিল পঞ্চম। ফ্রাম সেমি ফাইনাল পর্য্যন্ত পেরেছিলেন।

পুরুষদের ডবলসে নরেশকুমার এবং নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় হেরে যান সুইডেনের বার্গেলিন এবং ডেভিডসনের জুটির কাছে। মিক্সড ডবলসে নরেশকুমার তৃতীয় রাউণ্ডে জয়লাভ করেন। অপর দিকে নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় রাউণ্ডে হেরে যান।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস: ডিক সাভিট ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে অষ্ট্রেলিয়ার কেন ম্যাকগ্রেগরকে পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: মিস ডরিস হার্ট (আমেরিকা) ৬-১, ৬-০ গেমে মিস শার্লি ফ্রাইকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস: ফ্রাঙ্ক সেজম্যান এবং কেন ম্যাকগ্রেগর (অষ্ট্রেলিয়া) ৩-৬, ৬-২, ৬-৩, ৩-৬ গেমে এরিক ষ্টারগেস (দঃ আফ্রিকা) এবং জরোস্লেভ ড্রোবনিকে (ইজিপ্ট) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস: মিস ডরিস হার্ট এবং মিস শার্লি ফ্রাই (আমেরিকা) ৬-৩, ১৩-১১ গেমে মিস লুই ব্রাউ এবং মিসেস মার্গারেট ডু পন্টকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলস: ফ্র্যাঙ্ক সেজম্যান (অষ্ট্রেলিয়া) এবং মিস ডরিস হার্ট (আমেরিকা) ৭-৫, ৬-২ গেমে মেরীভায়ান রোজ এবং মিসেস নান্সি বোল্টোনকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

প্রতিযোগিতায় আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড়রা সাফল্য লাভ ক'রে টেনিস খেলায় পূর্ব্ব প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ২৬ বছর বয়স্কা আমেরিকান মহিলা খেলোয়াড়

মিস ডরিস হার্ট 'ত্রিমুকুট' জয় লাভ ক'রেছেন, মহিলাদের সিঙ্গলস, মহিলাদের ডবলস এবং মিক্সড ডবলসের ফাইনালে বিজয়িনী হয়ে। গত বছরের প্রতিযোগিতায় আমেরিকান মহিলা মিস লুই ব্রাউ এই 'ত্রিমুকুট' খেতাব অর্জন ক'রেছিলেন।

ইংলণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা টেষ্ট ঃ

লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ১০ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করেছে। নটিংহামের প্রথম টেষ্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলণ্ডকে হারায়। উভয় দেশের মধ্যে আর তিনটি টেষ্ট ম্যাচ হবে, যথাক্রমে ম্যাঞ্চেষ্টার, লিডস এবং ওভালে। ১৯৫১ সালের টেষ্ট সিরিজ খেলার ফলাফল উপস্থিত সমান দাঁড়িয়েছে, ১ ১। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে ৩১১ রান ক'রে। দক্ষিণ আফ্রিকাদলের প্রথম ইনিংস ১১৫ রানে শেষ হ'লে তাদের ফলো-অন করতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ২য় ইনিংস ২১১ রানে লাঞ্চের কিছু আগে শেষ হ'লে পর জয়লাভের জন্তে ইংলণ্ডের মাত্র ১৬ রানের প্রয়োজন হয়। হাটন এবং আইকিন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু ক'রে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৬ রান তুলেন, হাটন ১২ এবং আইকিন ৪ রান। এই রান তুলতে ইংলণ্ডের কোন উইকেট হারাতে হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্ট সিরিজে ইংলণ্ড শেষ জয়ী হয়েছিল ১৯৪৭ সালের লর্ডসে এবং এই ১০ উইকেটে। আলোচ্য খেলায় জয়লাভের সমস্ত কৃতিত্ব ইংলণ্ডের অফ্-স্পিন বোলার রয় ট্যাটারসলের। তিনি ১ম ইনিংসের খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার ৭টা উইকেট পান ৫২ রানে, ২৮ ওভার বলে ১০টা মেডেন নিয়ে। ২য় ইনিংসে পান ৫টা ৪৯ রানে। খেলায় তাঁর বোলিং এভারেজ দাঁড়ায়, ওভার ৬০.২, মেডেন ২৪, রান ১০১, উইকেট ১২।

ইংলণ্ড ঃ ৩১১ (কম্পটন ৭৯, ওয়াটসন ৭৯, আইকিন ৫১। চাব ৭৭ রানে ৫ এবং ম্যাক্‌কার্থি ৭৬ রানে ৪) ও **১৬ রান** (কোন উইকেট না হারিয়ে)।

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ১১৫ (ট্যাটারসেল ৫২ রানে ৭ এবং ওয়ার্ডলি ৪৬ রানে ৩ উইকেট) ও **২১১** (ফুলার্টোন ৬০, চিথাম ৫৪ রান। ট্যাটারসেল ৪৯ রানে ৫ উইকেট।

ফুটবল লীগ খেলা ঃ

প্রথমবিভাগের ফুটবল লীগের খেলা এক সময়ে এমন এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত লীগ খেলা পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্যদের স্থান সঙ্কুলান ব্যাপার নিয়ে হেডওয়ার্ড কোম্পানীর সঙ্গে এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্যদের প্রবেশ দ্বার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ক্লাব কর্তৃপক্ষের মতানৈক্য দেখা দেয়। ফলে মোহনবাগান বনাম বি এন আর এবং ইষ্টবেঙ্গল বনাম এরিয়ান্সের খেলাটি নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয়নি, মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়রা মাঠে অবতীর্ণ না হওয়ায়। এই সংবাদ প্রকাশের পরে ক্রীড়ামহলে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ সুদীর্ঘ আট দিন সকল বিভাগের লীগের খেলা স্থগিত রেখে সন্তোষজনক মীমাংসার উদ্দেশ্যে একাধিক সভায় সম্মিলিত হ'ন। অবস্থা এতদূর গড়িয়ে ছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের হস্তক্ষেপে সরকারী দপ্তর খানায় সভা আহ্বান করারও প্রয়োজন হয়। একাধিক সভায় আলাপ-আলোচনার পর গত ২৭শে জুন থেকে লীগ খেলা পুনরায় আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু পুনারম্ভের দিনেই ভবানীপুর বনাম বি এন-আর দলের খেলা হয়নি, ভবানীপুর দল মাঠে উপস্থিত ছিল না। উপস্থিত না থাকার কারণ, আই-এফ-এ ক্লাবের অনুরোধ রক্ষা করেনি। ভবানীপুর ক্লাব কর্তৃপক্ষ খেলার আগের দিন তাঁদের শুক্রবার দিনের খেলাটি স্থগিত রাখতে আই-এফ-এ কে অনুরোধ জানান এই কারণে যে, দলের কয়েকজন খেলোয়াড় কলকাতায় উপস্থিত নেই। এরপর মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলাটি অসমাপ্ত থেকে যায়, বিশ্রাম সময়ের এক মিনিট পূর্ব্বে মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলোয়াড়রা মাঠ পরিত্যাগ করায়। আই এফ এ-র লীগ সাব কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় এই স্থগিত এবং অসমাপ্ত খেলা সম্পর্কে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোহনবাগান এবং ভবানীপুরের বিপক্ষে বি এন রেল দলকে দু' পয়েন্ট হিসাবে ৪ পয়েন্ট, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে মোহনবাগানকে এবং ইষ্টবেঙ্গলের বিপক্ষে

এরিয়ান্সকে দু' পয়েন্ট হিসাবে দেওয়া হয়েছে। মোহনবাগানের সঙ্গে খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং দলের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক মাসুমের অশিষ্ট আচরণ এবং দলের মাঠ পরিত্যাগ সম্পর্কিত বিষয়টি আই এফ-এ র গভর্ণিং বডির সভায় প্রেরিত হয়েছে। আটদিন লীগ খেলা স্থগিত থাকার পর আমরা আশা করেছিলাম বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বাকি খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু মোহনবাগান-মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলায় রেফারীর সিদ্ধান্তে একশ্রেণীর মুষ্টিমেয় দর্শকের বিক্ষোভ, প্রবীণ খেলোয়াড় মাসুম এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের অখেলোয়াড়চিত আচরণ মাঠের আবহাওয়া দূষিত করেছিল। ঘটনাটি এই, মহমেডান স্পোর্টিং দলের সৈয়দ পেনাল্টি সীমানার মধ্যে মোহনবাগানের বাবুকে অন্যায়ভাবে ভূতলশায়ী করেন। বাবু কিছুক্ষণ মাটি ছেড়ে দাঁড়াতে পারেননি। রেফারী এই ঘটনাটি উপেক্ষা করেন। রেফারীর এই সিদ্ধান্তের উপর কয়েকখণ্ড ইট এবং একজোড়া জুতা পড়ে। মহমেডান দলের মাসুম উত্তেজিত হয়ে দল নিয়ে মাঠ পরিত্যাগ করেন। মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের অনুরোধে দশ মিনিট পর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে খেলতে আসে কিন্তু রেফারীকে না জানিয়ে মহমেডান দল মাঠ পরিত্যাগ করে যে অশিষ্ট আচরণে খেলার নিয়ম ভঙ্গ করে তার উপর ভিত্তি ক'রে রেফারী খেলাটি পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি। রেফারীর ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত কিম্বা মাঠে অনুষ্ঠিত অপরাপর অন্যায় কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে দর্শকদের পক্ষে অশোভন বিক্ষোভ প্রদর্শন আমরা কোন সময়েই সমর্থন করি না।

মহমেডান স্পোর্টিং দলও একদিন কম গুরুতর অশিষ্ট আচরণের দোষে দোষী ছিল না। মাঠে সংঘটিত পূর্ব্বাপর অপ্রিয় ঘটনাগুলি তুলাদণ্ডে বিচার করলে ঐ দিনের ঘটনাটি তুচ্ছ এবং নিন্দনীয় ছিল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়রা যদি তাঁদের গৌরবময় দিনের এক শ্রেণীর উগ্র সমর্থকদের চরম উচ্ছৃঙ্খলতা এবং গুণ্ডামীর সঙ্গে এই দিনের ঘটনাটি নিরপেক্ষভাবে বিচার করতেন তাহলে এই দিনের ঘটনাটি উপলক্ষ্য ক'রে কখনই রেফারীর অনুমতি ভিন্ন মাঠ ত্যাগ করতেন না। সেই দিনের মুষ্টিমেয় দর্শকের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে এমন কোন চরম অবস্থার উদ্ভব হয়নি যার জন্য এক পক্ষের খেলা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ইতিপূর্ব্বে এর থেকেও চরম পরিস্থিতির মধ্যে খেলা হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বিচার ক'রে খেলা স্থগিত রাখার দায়িত্ব রেফারীর, কোন পক্ষের খেলোয়াড়দের নয়। অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে সাময়িক উত্তেজনায় মহমেডান স্পোর্টিং দল মাঠ পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাও দলের অধিনায়কের পরামর্শে নয়, ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক মাসুমের আহ্বানে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে এসেম্বলি হাউস থেকে সর্ব্বত্রই অযৌক্তিক দাবী উঠে। নরমপন্থী কংগ্রেস শাসনে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার সুবিধার ব্যবস্থা আছে, সেই সঙ্গে আছে নিরাপত্তার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সে দিনের খেলাতেও পুলিশের কড়া পাহারা ছিল, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীরা মাঠে উপস্থিত ছিলেন। চরম অবস্থার কোন সম্ভাবনা থাকলে রেফারীর খেলা বন্ধের অপেক্ষা না রেখে তাঁরাই তার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এ সমস্ত দিক বিবেচনা না করেই খেলা স্থগিত সম্পর্কে প্রচলিত আইন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব নিজেদের হাতেই গ্রহণ করে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদকের বিবৃতিতে মোহনবাগান ক্লাব, আই এফ এ, রেফারী এবং পুলিশ সম্পর্কে হৃদ্যতার মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং মুষ্টিমেয় দর্শকের বিক্ষোভের প্রতিবাদ হিসাবে দলটির মাঠ ত্যাগ করায় তাদের বিক্ষোভের কাছেই নতি স্বীকার করা হয়েছে। বিক্ষোভ উপেক্ষা ক'রে খেললে উচ্ছৃঙ্খলপরায়ণ দর্শকদেরই হার হ'ত। একাধিক সময়ে তাদের সঙ্গে খেলাতেই তাদের দলের এক শ্রেণীর উগ্র সমর্থকদের বিক্ষোভ উপেক্ষা ক'রে বিপক্ষদল শেষ পর্য্যন্ত খেলেছে কখনও রেফারীর বিনা অনুমতিতে মাঠ পরিত্যাগ করেনি।

এখন লীগের খেলার ফলাফলের কথায় আসা যাক। লেখার সময় পর্য্যন্ত মোহনবাগান লীগের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে। মোহনবাগান ক্লাব মাঠে উপস্থিত না থাকায় বি-এন-আর দলকে ওয়াক-ওভার দেওয়া হয়েছে। ফলে মোহনবাগান অপরাজেয় সম্মান নষ্ট করেছে। ১৬টা খেলায় জয় ১৩টা, ড্র ২টো—ভবানীপুর এবং ডালহৌসির সঙ্গে, ওয়াক-ওভার হিসাবে

হার ১টা, বি-এন-রেলদলের কাছে। মাত্র ১টা গোল খেয়ে ৩০টা গোল দিয়েছে। পয়েণ্ট ২৮টা। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ১৬টা খেলায় ২৫ পয়েণ্ট উঠেছে। ড্র ৩টে, হার দুটো—মোহনবাগানের কাছে এবং ওয়াকওভার হিসাবে এরিয়ান্সের কাছে। ৫টা গোল খেয়ে ২৮টা গোল দিয়েছে। রাজস্থান ১৬টায় ২২ পয়েণ্ট এবং ই আই আর ১৫টা খেলে ২১ পয়েণ্ট করেছে। বি-এন-আর ওয়াক-ওভার হিসাবে ৪ পয়েণ্ট যেমন পেয়েছে তেমনি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের কাছে ১-২ গোলে হেরে দু' পয়েণ্ট হারিয়েছে এ যেন বেনোজলের মত হ'ল। কালীঘাট একটা মূল্যবান পয়েণ্ট ছিনিয়ে নিয়েছে শক্তিশালী রাজস্থানের সঙ্গে খেলা ড্র ক'রে। দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাওয়া থেকে তারা অনেকখানি নিরাপদ স্থানে আছে। ক্যালকাটা গ্যারিসন তার গত কয়েক বছরের আভিজাত্য বজায় রেখে যাচ্ছে সর্ব্ব নিম্ন স্থান অধিকার ক'রে। তাদের ১৬টা খেলায় একটা পয়েণ্টও ওঠেনি। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে, লীগের ওপরের দিকে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল দলের মধ্যে। মোহনবাগানের থেকে রাজস্থান ৭ পয়েণ্টে পিছিয়ে পড়েছে। আমরা এই শুভেচ্ছা কামনা করি, লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির খেলোয়াড় এবং সমর্থকগণ যেন কখনই খেলোয়াড়সুলভ বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সীমানা লঙ্ঘন না করেন।

দৈহিক সৌষ্ঠবে দর্শনীয় এশিয়ান গেমসে যোগদানকারী জাপান ফুটবল টিম

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ

উপরিভাগের চারটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	১৬	১৩	২	১*	৩০	১	২৮
ইষ্টবেঙ্গল	১৬	১১	৩	২†	২৮	৫	২৫
রাজস্থান	১৬	৮	৫	৩	২৩	৭	২১
ই আই আর	১৫	১০	২	৩	২৭	৯	২২

টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন ঃ

আন্তর্জ্জাতিক টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বারের অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ ৯-০ খেলায় থাইল্যাণ্ডকে শোচনীয়ভাবে হারিয়েছে প্যাসিফিক জোনের উত্তরাঞ্চলের খেলায়। এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়, বোম্বাইয়ের বোম্বাই জিমখানা ষ্টেডিয়ামে। আন্তর্জ্জাতিক খেলার অনুষ্ঠান

* বি এন আর দলের বিপক্ষে ওয়াক-ওভারে হার একটা।

† এরিয়ান্স দলের বিপক্ষে একটা খেলা হার, ওয়াক-ওভার হিসাবে।

ভারতবর্ষে এই প্রথম। ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী খেলা পড়েছে প্যাসিফিক জোনের দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিযোগী দেশ অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। এ খেলা হবে অষ্ট্রেলিয়াতে।

প্রদর্শনী ফুটবল খেলা ঃ

ফুটবল প্লেয়ার্স ইউনিয়নের আর্থিক সাহায্যার্থে প্রথম বিভাগের বাছাই খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলা হয়। খেলায় কোন পক্ষেই গোল হয়নি। গ্রুপ এ' দলের খ্যাতনামা খেলোয়াড় মেওয়ালাল পেনাল্টি কিক থেকে গোল করতে পারেননি। খেলাটি খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং খেলার মানের দিক থেকে উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়রা দলে নির্ব্বাচিত হয়েও যোগদান করতে পারেননি, অফিস লীগের খেলা থাকার দরুণ। টসে বি গ্রুপ জয়ী হয়। লালবাজার হেড কোয়াটার্সের ডেপুটি কমিশনার শ্রীযুক্ত প্রণবকুমার সেনের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সেন পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধে পুনরায় জো লুই ঃ

বিশ্ব মুষ্টি যুদ্ধে ভূতপূর্ব্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান জো লুই পুনরায় চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন। বৃটিশ বক্সিং বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের উদ্যোগে ম্যাডিসন স্কোয়ার গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত ১৫ রাউণ্ডের লড়াইয়ে জো লুই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী লি সাভোণ্ডকে ৬ষ্ঠ রাউণ্ডে পরাজিত করেন। ৬ষ্ঠ রাউণ্ডের খেলায় ২ মিঃ ২৯ সেকেণ্ডে লুই বিজয়ী হ'ন। লুইয়ের প্রচণ্ড ঘুসিতে সাভোণ্ডের মুখমণ্ডলে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাসে জো লুই তাঁর বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ানসীপের খেতাব স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। ১০।৭।৫১

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত "শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী"—৫৲

রুবেন রায় প্রণীত উপন্যাস "মুপর মুকুর"—৪৲

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়-অনূদিত "কাউণ্ট অফ মণ্টিক্রিষ্টো"—১৷৷৹

তনুজা দেবী প্রণীত বুনন-শিক্ষা "বুণুনি"—১৲, রন্ধন শিক্ষা "পাঁচ মিশলি"—২৷৷৹

শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়-অনূদিত "ডাঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড্"—১৷৷৹

খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত শিশু-উপন্যাস "বন-রহস্য"—১৲

দেব সাহিত্য কুটীর-প্রকাশিত "বিশ্ব-পরিচয়"—৮৲

শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত শিশু উপন্যাস "কিশোর অভিযান"—১৲

শ্রীকমলাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ডিটেকটিভ উপন্যাস "ওয়ার ক্রিমিন্যাল"—১৷৷৹

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী"—১৲

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "তত্ত্ব জিজ্ঞাসা"—২৲

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পরিণীতা" (৩৪শ সং)—১৷৹, "নব বিধান" (৮ম সং)—১৸৹, "দত্তা" (১৩শ সং)—৩৲, "বামুনের মেয়ে" (৭ম সং)—২৲

দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "রামের সুমতি" (৫ম সং)—১৷৷৹

শ্রীআনন্দ বাগচী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "প্রলাপ"—১৹

চিত্তরঞ্জন ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "কালো আকাশ"—২৲

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "প্রিয়তমের চিঠি"—৩৲

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত শিশু-নাটিকা "রবি ঠাকুর"—১৷৷৹

শ্রীদেড়কড়ি শর্ম্মা প্রণীত ছড়ার বই "হিং টিং ছট্"—১৷৷৹

শ্রীসরযূপতি সিংহ প্রণীত কবিতা-গ্রন্থ "লিলাবতী"—২৲

সন্তোষকুমার সামন্ত প্রণীত "প্রাণতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব"—৩৲

শ্রীক্ষীরোদনারায়ণ ভূঁঞা সম্পাদিত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্"—৩৲

মদন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অন্তরীপ"—২৷৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি — বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাসিম — ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভাদ্র—১৩৫৮

প্রথম খণ্ড | উনচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

দিব্য-জীবন-বার্ত্তা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

স্মরণাতীত কাল হইতে দেখা গিয়াছে যে যখনই মানুষের চিত্ত জাগরিত হইয়াছে তখনই তাহার চিন্তা জগতের সর্ব্বোচ্চ স্তরে যাহা অবস্থিত তাহাতে পৌছিতে চাহিয়াছে। ভগবানের দিকে যাইবার আকুতি, পূর্ণতাপ্রাপ্তির আবেগ, নিখাদ সত্য এবং অবিমিশ্র আনন্দের সন্ধান, অমরত্ব এবং অমৃতত্ত্বের একটা বোধ ও তল্লাভের ইচ্ছা তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছে। মাঝে মাঝে এ সমস্ত তাহার কাছে অস্পষ্ট এবং সংশয়সঙ্কুল হইয়া উঠিলেও সে অস্পষ্টতা এবং সংশয় চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই। তাইতো মানব-জীবনের ইতিহাসে দেখিতে পাই প্রাচীন উষা পুনঃ পুনঃ আসিয়াছে—তাহার কাছে অবিশ্রান্ত অভীপ্সার বাণী বহন করিয়া। বর্ত্তমান যুগে আমরা দেখিতে পাই মানুষ যখন বিশ্লেষণ দ্বারা বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করিয়া জলে স্থলে আকাশে বাতাসে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তখনও তাহার অতৃপ্ত অন্তরে সেই আদিম অভীপ্সা পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে। ভগবান, আলোক, স্বাধীনতা, অমৃতত্ব যেমন পুরাকালে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্পৃহার বস্তু ছিল আজিও যেন তাহাই রহিয়াছে।

অহমিকাক্লিষ্ট এই পাশব-চৈতন্যের পক্ষে দিব্য পরম পুরুষকে জানা বা পাওয়া অথবা তাহার সহিত এক হইয়া যাওয়া, আমাদের জড়ীয় মনের অস্পষ্ট প্রদোষালোককে অতি-মানসের পরিপূর্ণ জ্যোতিরুচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত করা, আধিব্যাধিপ্রপীড়িত মানব-জগতের যান্ত্রিক নিয়তি ও নিয়মের মধ্যে অনন্ত স্বাধীনতাকে স্থাপিত করা, সদা-পরিবর্ত্তনশীল মর্ত্ত্য দেহে অমৃতময় জীবনকে আবিষ্কার এবং লাভ করা—এমনি করিয়া জড়ের মধ্যে পরম দেবতাকে

(Life Divine Book I.—chapter I.—অবলম্বনে)

প্রকাশ করা ক্রমপরিণতিশীল প্রকৃতির চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাধারণ জড়বুদ্ধি তাহা স্বীকার করিতে চায় না, সে মনে করে বর্ত্তমানে তাহার চৈতন্য যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহাই তাহার সম্ভাবনার শেষ সীমা। এ আদর্শ যখন বর্ত্তমান সাধারণ জীবন ও চৈতন্যের বিরোধী তখন ইহা নিশ্চয়ই মিথ্যা এবং নিষ্ফল। কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি, তবে দেখিব যে এই বিরোধ প্রকৃতির অনভিপ্রেত তো নয়ই—বরং তাহার কর্ম্ম-পদ্ধতির সহিত গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট।

মূলতঃ জড় জীবন এবং মনের সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতি সৌষম্য ও সমন্বয় খুঁজিতেছে। মানুষের জীবনে যে বিরোধ ও বেসুর আছে তাহাতে তাহার মনের ব্যবহারিক বা পাশব অংশ কতকটা তৃপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মন যখন পূর্ণরূপে জাগরিত হয় তখন এ তৃপ্তি রাখা অসম্ভব। বাহিরের বিরোধ ও বেসুর যতই প্রবল হয়, যতই তাহাদের মিলন করা অসম্ভব মনে হয়—ততই বৃহত্তর-ভাবে প্রবুদ্ধ মনে তাহাদিগকে সমন্বিত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। প্রকৃতির মধ্যে নানা বিরোধের যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি। যে জড়ের প্রকৃতি অসাড়তা, তাহার মধ্যে প্রাণের বিপুল ক্রিয়াশীল প্রকৃতিকে রূপায়িত করিয়া প্রাণী জগতের উদ্ভব হইয়াছে এবং সেখানে তাহার ক্রমশঃ উৎকর্ষ সাধন চলিতেছে। ইহার পূর্ণ-পরিণতি হইলে প্রাণীদেহ অমরত্ব লাভ করিবে। আবার একটা বড় বিরোধ আমরা দেখিতে পাই—চৈতন্যময় মন এবং যাহা স্পষ্টতঃ সচেতন নয় সেই প্রাণ ও জড়ের মধ্যে। এখানেও এই বিরোধের এক আশ্চর্য্য সমন্বয় হইয়াছে মানবদেহে। এখানেও শেষ মহাশ্চর্য্য সাধিত হইবে যখন মনকে সত্য এবং আলোক খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না, কিন্তু একটা সাক্ষাৎ এবং পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া মন কাযাতঃ সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করিবে। সুতরাং বিরোধ এবং প্রতিকূলতা দেখিলেই ভীত হইবার কারণ নাই। বিরোধের মধ্য দিয়া সমন্বয় ফুটাইয়া তোলাই প্রকৃতির কার্য্যপদ্ধতি।

ক্রমপরিণতিক্ষেত্রে আমরা জড়ে প্রাণ এবং মনের উদ্ভব দেখিতে পাই বটে কিন্তু তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। বেদান্ত এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে জড়ে প্রাণ এবং প্রাণে মন সংবৃত হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিত আছে ইহা স্বীকার করিলে কারণ পাওয়া যায়। মানস-চৈতন্য সংবৃত হইয়া প্রাণে এবং প্রাণ সংবৃত হইয়া জড়ে পরিণত হইয়াছে, তাই জড় হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে মনের বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। একথা স্বীকার করিলে আর একটু অগ্রসর হইয়া আমরা বলিতে পারি যে মনের বা মনের অতীত এক চেতনা সংবৃত হইয়া মনে পরিণত হইয়াছে। মন হইতে আবার সেই চৈতন্যের প্রকাশ হইতে পারে। ইহা স্বীকার করিলে মানুষের মধ্যে ভগবান, আলোক, আনন্দ, স্বাধীনতা, অমরত্ব প্রভৃতির দিকে যে একটা আকুল আকুতি আছে (যাহা সকলের মধ্যে সমান পরিমাণে না থাকিলেও অল্পাধিক সকলের মধ্যে রহিয়াছে) তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ঊর্দ্ধগতিশীলা যে প্রকৃতি এখানে জড়ের মধ্যে প্রাণের এবং প্রাণের মধ্যে মনের বিকাশের আবেগ সঞ্চার করিয়াছে, সেই প্রকৃতি এখন মনের উপর তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চায়। তাহারই অলঙ্ঘনীয় আবেশ এই আকুতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে ইহা বুঝা তখন সহজ ও স্বাভাবিক হয়। ইহা বলা হইয়াছে যে প্রাণী দেহের জীবন্ত বীক্ষণাগারে প্রকৃতি তাহার যুগ-যুগান্তের সাধনায় মানুষ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা হইলে মানুষের প্রাণ মনের বীক্ষণাগারে তাহারই সচেতন সহযোগিতায় অতি মানব বা দেবতা গড়িবার সাধনাই হয়ত চলিতেছে। অথবা আমরা কি ইহাই বলিতে পারি না যে মানুষের এই মর্ত্ত্য আধারে দিব্যপুরুষকে মূর্ত্ত করিবার সাধনাই চলিতেছে? কারণ ঊর্দ্ধগমনের পথে প্রকৃতি তাহার মধ্যে যাহা সুপ্ত বা গুপ্তভাবে আছে শুধু তাহা প্রকাশ করিতে যে চায় তাহা নহে, পরন্তু তাহার যে আত্মস্বরূপ সাজ তাহার কাছে গুপ্ত ও অন্ধকারাবৃত আছে তাহারও স্পষ্ট ও প্রকাশ্য অনুভূতি এবং সিদ্ধিও তাহার কাম্য। অতএব প্রগতির পথের কোথাও প্রকৃতিকে থামিতে বলিতে পারি না—যদি সে অগ্রসর হইয়া তাহার বর্ত্তমান প্রকাশের অতীতক্ষেত্রে পৌছিতে চায় তবে কোন কোন ধর্ম্মবাদীর মত তাহার এ চেষ্টাকে বিকৃত স্পর্দ্ধা বা যুক্তিবাদীর মত ইহাকে কল্পনার বিকার বা বিভ্রম বলা চলে না। এ কথা যদি সত্য হয় যে জড়ের ভিতরে দিব্য-পুরুষই সংবৃত হইয়া আছেন এবং প্রকাশমানা এই প্রকৃতি

তাঁহার গোপন সত্তায় শ্রীভগবানের সহিত একীভূত তবে অন্তরে ও বাহিরে শ্রীভগবানের প্রকাশ ও অনুভব মর্ত্ত্য মানুষের চরম ও পরম পুরুষার্থ।

চিরন্তন সমস্যা এবং পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে প্রাকৃত পাশব দেহে দিব্য জীবনের শাশ্বত সত্য ও সম্ভাবনা ফুটিয়া উঠিতেছে, মর্ত্ত্য আধারে অমৃতত্বের একটা অস্পৃহা বা সত্য সদা বাস করিতেছে. এক সার্ব্বভৌম বিশ্ব-চৈতন্য বহু সীমিত চিত্ত এবং খণ্ড অহং এর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে, বিশ্বাতীগ অনির্দ্দেশ্য, দেশ কালের অতীত অথচ যাহা হইতে দেশ কাল এবং বিশ্বজাত হইয়াছে সেইরূপ এক সত্তা সদা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং মানুষ এই দুই ভাবের নিম্নতর অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়াও উচ্চতর অবস্থার অনুভূতি এবং সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিতে পারে, এ বিশ্বাস মানুষের অন্তরের সহজাত সংস্কার, তাহার বোধিলব্ধ জ্ঞান এবং গভীর বিচারশীল বুদ্ধি ইহা স্বীকার ও সমর্থন করে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা প্রহেলিকা বা অসম্ভব বোধ হইলেও তাহার মার্জ্জিত অথবা বোধি-চৈতন্যের উন্মেষে প্রস্ফুটিত সহজ জ্ঞান ও অভীপ্সা সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে চায়। সাধারণ তর্কবুদ্ধি অনেক সময় বলে যে এ সব সমস্যার সমাধান আজিও হয় নাই, সুতরাং ইহাদের বাদ দিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকা উচিত। বস্তুতান্ত্রিকের এ উপদেশ মানুষ বহুবার শুনিয়াছে কিন্তু তবুও পুনরায় এই সমস্ত জানিতে এবং পাইতে চাহিয়াছে ; বরং এই বাধা পাইয়া তাহার জ্ঞানের পিপাসা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সেই পিপাসার ফলে সাধক জীবনে সত্যের নব নব রূপ ফুটিয়াছে। যে প্রাচীন ধর্ম্মমতসমূহ সংশয় দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে অথবা যাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য লুপ্ত হইয়াছে তাহার স্থানে দেখা দিয়াছে নব নব ধর্ম্মের নূতন আকার ও শক্তি। সত্যের পরিপূর্ণ রূপ মানুষ প্রথমেই দেখিতে পায় না, অনেক সময় অন্ধ কুসংস্কার বা যুক্তিহীন বিশ্বাসের মধ্য দিয়াই তাহার প্রথম আভাস জাগে, কিন্তু তাহার প্রকাশ অস্পষ্ট বা ব্যাহত বলিয়াই তাহাকে অস্বীকার করা অথবা তাহার মূল আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান না করা এক প্রকার অন্ধতা। যে সত্যের স্ফুরণ বিশ্বের নিয়তি, তাহার সাধনার পথ দুর্গম ও কষ্টসাধ্য ; অথবা তাহার পরিণাম প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা উচিত নয়। ত্যাগ করিলে প্রকৃতির সত্যকে অস্বীকার করা হইবে এবং তাহার গোপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইবে। বরং যে আকৃতিকে বিশ্ব-জননী মানুষের ভিতর জাগাইয়া রাখিয়াছেন অভীপ্সার অনির্ব্বাণ গোপন শিখারূপে, তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া পূর্ণভাবে প্রজ্বলিত করা তাহার পৌরুষের যথার্থ পরিচয়। এ আলো আজ তার কাছে কুণ্ঠিত বা স্তিমিত হইলেও ইহার ক্ষণিক আভাস সে মাঝে মাঝে যখন পাইয়া আসিতেছে তখন সেই আলোকের ইসারাতেই সে তাহার প্রকৃত পথ—মানবজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য দেখিতে ও জানিতে পারিবে।

সূর্যস্নান

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

রাতের পাখী ঘুমিয়েছিল অন্ধকারের গহ্বরে
পায়নি কভু আলোর ঠিকানা,
নীহারিকার তিমির পাথার কে দিল তায় পার কোরে
কে পাঠালো পূবের নিশানা।
নীলিমাতে ছিল নিলীন ছিল স্বপন কোন কারায়
পথের রেখা গোপন ছিল কোথা,
আজ সহসা উদয় পারের তীরে কেন মন হারায়
ভোলায় কেন প্রাণের যত ব্যথা।

উজল দুটি পাখা মেলি অরুণ আলোয় বুক ভরি'
উড়ল সুনীল শূন্য আকাশ মাঝে,
সূর্যস্নানে শুদ্ধ হৃদয় আজ কাহারে দান করি'
প্রকাশ হল জ্যোতির্ময় সাজে।
কণ্ঠ নীরব মুখর হল জাগল ধ্বনি দিগন্তে
পক্ষ মাঝে শিহরণের সাড়া,
অন্ধ-আঁখি দৃষ্টি পেল ; ভোর গগনের সীমান্তে,
ওরে বন্দী বিহগ, আজ পেলি কি ছাড়া?

মা

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

এক

মানসিক অশান্তি অনেকদিন হইতেই ধূমায়িত হইতেছিল, ১৯৫০ সালের কয়েকটা ঘটনার জনশ্রুতিতে ধৈর্য্যরক্ষা করা ছেলেদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িল। বড় ছেলে, শচী, বয়স প্রায় পঞ্চাশ-একান্ন, সে ত কাঁদিয়াই সারা। ঢাকার অন্তর্গত সোনাদীর বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের তিন ছেলেই কলিকাতার অধিবাসী; তাহাদের জননী কিন্তু সোনাদীরই বাসিন্দা। ছেলেরা বহুবার বহুরকমে মা'কে কলিকাতায় আনিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ মাসে, গুজবে গুজবে যখন কলিকাতার বায়ু উত্তপ্ত, মানুষ চঞ্চল, প্রবৃত্তি হিংস্র হইয়া কাণ মাথা ঝালাপালা করিয়া ফেলিতেছিল, তখন শচী, আর একবার কাকুতি মিনতি করিয়া মা'কে লিখিল: "মা, আমরা এই মনঃকষ্ট পাইতেছি; দিন রাত দুশ্চিন্তায় কাটাইতেছি; তোমার নাতি-নাতনীরা পর্য্যন্ত মন মরা হইয়া থাকে; তোমার পুত্রবধূদের চোখের জল একটিবারের জন্যও শুকায় না; মা গো, তবু কি তুমি তোমার ছেলেদের কাছে আসিবে না? বৃদ্ধ বয়সে তোমার চরণ সেবা করিয়া সন্তানরা ধন্য হইবে, সে সুযোগও তুমি তাহাদের দিবে না কি?"

উত্তরে জননী লিখিলেন, "শচি, তুই যে আমার পরম ধার্ম্মিক ছেলে বাবা, সকলের চেয়ে আমি যে তোরই বেশী ভরসা করি। সোনাদীর চৌধুরী বংশের মান মর্য্যাদা, ক্রিয়া কর্ম্ম তোর হাতে বজায় থাকিবে, এই ভাবিয়াই আমার মনে কত সুখ; লোকের কাছে এ আমার কত বড় গর্ব্ব। সেই তুই কোন্ মুখে পাচ শ' বছরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মময়ী-মা'কে ফেলিয়া আমাকে কলকাতা যাইতে বলিলি? বাবা শচি, আমার শাশুড়ী স্বর্গে যাইবার সময় ব্রহ্মময়ীকে আমায় দিয়া গিয়াছিলেন; তাহার শাশুড়ী তাহাকে, এইরূপ সাত পুরুষ ধরিয়া আমরা ব্রহ্মময়ীর সেবা করিয়া আসিতেছি। বাপ আমার, এই ক'খানা ভাঙ্গা, শুকনো হাড় বাঁচাবার জন্যে এই বয়সে আমি ব্রহ্মময়ীকে ফেলে পালাবো? চৌধুরীদের অট্টালিকায়—লোকে এখনও যাকে রাজবাড়ী বলে—সন্ধ্যায় দীপ জ্বলবে না—ঘরে ঘরে ইঁদুর, ছুঁচো, চামচিকের বাসা বাঁধবে; জাগ্রত দেবী ব্রহ্মময়ীর পূজো হবে কি-হবে-না, তাঁর মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা হয়ত বাজবে না, পাল-পার্ব্বণ, চণ্ডী-পাঠ হবে না, মা অর্দ্ধেক দিন উপবাসী থাকবেন, আমার দেহে প্রাণ থাকতেই এই সব ঘটবে; আর, বেঁচে থেকে, আমি তাই শুনবো! বাবা আমার, এমন পাপ কথা ঘৃণাক্ষরেও আর মনে স্থান দিস্ নে। জানিস্ বাপধন, দেবী ব্রহ্মময়ী হতেই সোনাদীর চৌধুরীদের সব।"

তখনকার মত শচী শান্ত হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় লেলিহান অগ্নিশিখাসম গুজবাগ্নিও প্রশমিত হইয়াছিল।

দুই

কথিত আছে, ভারত-সম্রাট আকবরের দিগ্বিজয়ী সেনাপতি অম্বরপতি মহারাজ মানসিংহ যখন বঙ্গের বিদ্রোহী মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া নৌকাযোগে প্রতাপকে বন্দী করিয়া উত্তর ভারতে লইয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় তাঁহার কটকের কয়েকখানি নৌকা জলমগ্ন হয়। লোকে আজও বলে, ভক্ত সন্তান প্রতাপাদিত্যের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে যশোরেশ্বরী মাতার কোপেই সেই প্রবল প্রভঞ্জন, তাহারই ফলে নৌকাডুবি। যে নৌকায় মানসিংহের পূজ্যা দেবী ব্রহ্মময়ী ছিলেন, সেই নৌকাও ডুবিয়া গিয়াছিল। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগাবসানে, ব্রহ্মময়ীর উদ্ধারের চেষ্টা করা অম্বরপতির আন্তরিক অভিলাষ ছিল; কিন্তু গুপ্তচরমুখে বাঙ্গালী-বিদ্রোহের সংবাদে মহারাজকে অতিদ্রুত বঙ্গ প্রদেশের সীমানা অতিক্রম করিতে হওয়ায় বাসনা ফলবতী হয় নাই। কালক্রমে, মধুমতী নদীর জল অপসারণে বারদীর নাগবাবুদিগের নগদী সোনারাম চৌধুরী নদীতটে ব্রহ্মময়ী বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কুটিরে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ এই যে, তিন বৎসরের মধ্যে নগদী সোনারাম ঢাকার অন্তর্গত তিনটি বৃহৎ পরগণার মালিক হইয়া ধনে মানে প্রভাবে প্রতিষ্ঠায়

প্রসিদ্ধ জমিদারগণের অন্যতম বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে পরগণাত্রয় একত্রীভূত হইয়া সোনারামের নামানুসারে সোনাদী নাম ধারণ করে। নদীয়ার অন্নদার মত সোনাদীর ব্রহ্মময়ী সম্বন্ধে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, যে-গৃহে যতকাল তিনি পূজা গ্রহণ করিবেন, সে গৃহের সুখ-সমৃদ্ধি অব্যয়-অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মানসিংহের সমসাময়িক কোন কোন ইতিহাসকার ইহাও লিখিয়া গিয়াছেন যে, শেষ বয়সে চিরযশঃস্বী মহারাজ মানসিংহকে রাজবিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া দিল্লীশ্বরের অপ্রিয় ও মনঃপীড়ায় আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল, অম্বরেশ্বরের গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রহ্মময়ীর অভাবই তাহার একমাত্র কারণ।

সত্য মিথ্যা জানিনা, তবে পরম্পরাক্রমে এবং লোক পরম্পরায় দেবী-মাহাত্ম্য ঐরূপ প্রচলিত হইয়াছে বটে। লোকে ইহাও বলে পাটের দালালী কত লোকেই ত করে, কিন্তু শচীর মত অল্পকালে কোটীপতি কয়জন হইতে পারে? কিন্তু ব্রহ্মময়ীর অনুকম্পা হইলে সকলই সম্ভব। সুবীন যে মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াই ষোল টাকা, ষোল হইতে বত্রিশ টাকা ভিজিট করিতে পারিল, দেবীর দয়া না হইলে তাহা হইতে পারিত কি? অমলেন্দু জল বাগে দেখিতেছ না, ছোট ছেলে শৈলেন শ্বশুরের পয়সায় ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার সাত মাস মধ্যেই শ্বশুরের দেহরক্ষা, যুগপৎ শ্বশুরের সমুদয় বিষয়সম্পত্তি ও মক্কেল রাশি প্রাপ্তি। তিন বছরের ব্যারিষ্টার হইলে কি হয় অধুনা তাহার গৃহেই কনসালটেশন বসিতেছে। বল বল দৈব বল।

স্থানীয় লোকেরাও বলে বটে, পূর্ব্ব বঙ্গে পড়া বিদ্রোহ, খাজনা অনাদায়, তেভাগা বিভ্রাট, এ সব ত লাগিয়াই আছে, কিন্তু চৌধুরীদের জমিদারীতে কোনই উপদ্রব নাই। উঁহাদের সদর-নায়েব বাহারুদ্দীন সাহেবের ভূঁড়ির উপরে ভূঁড়ি বাড়িতেছে, দাড়ীটি লাউশাখের মত লতাইয়া লতাইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধে কি আর শচীর মা-বুড়ী ব্রহ্মময়ী বিগ্রহ আঁকড়াইয়া পাকিস্তানে পড়িয়া আছে।

তিন

শচীর কলিকাতার প্রতিবাসী অবিনাশ চক্রবর্ত্তী পশ্চিম বাঙ্গলায় স্থায়ীভাবে বসবাসের বাসনায় পাকিস্তানে তাহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে গিয়া হতাশ ও ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া, ঝাল ঝাড়িল শচীর উপর। তাহার অনবদ্য ভাষা ও অভিনব ভঙ্গিমা উদ্ধৃত অথবা লিপিবদ্ধ করিবার নিষ্ফল প্রয়াস আমি পাইব না, পঙ্কোদ্ধার করিলে যাহা দাঁড়ায়, মাত্র তাহাই বলিব: আপনারা, মশায়, কলকাতায় রাজার হালে আছেন, দেশে বুড়ী মা সোয়া ক্রোশ পথ হাঁটিয়া কাখে কলসী লইয়া বলাবতী নদী হইতে দেবী পূজার জল বহিতেছে ইহা দেখিতে হইতেছে মা। আপনাদের, মশয়, ঝকঝকে, চকচকে মোটর গাড়ী দেখিয়া কলকাতার লোক হাঁ করে চকাইতেছে, আর দেশে গিয়া দেখেন, সেই সত্তর বছরের বুড়ী এক ক্রোশ পথ ভাঙ্গিয়া বারদির হাট হইতে ঠাকুরের কলা মূলা কদমা বাতাসা, চিঁড়া, মুড়কী কিনিয়া কুঁজা হইয়া গ্রামে ফিরিতেছে। কলিকাল মশয়, কলিকাল, আপনাদের দোষ কি।

শচী বিমূঢ়ের মত ভাবিতে লাগিল, তাহার লক্ষ টাকা আয়ের বিষয় সত্ত্বেও জননীকে এরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় কেন?

অবিনাশ যেন অন্তর্যামী, বলিল, তল্লাটে একটাও হিন্দু আছে কি যে নদী থেকে জল এনে দেবে? হাট করবে? আছা। যে নায়েব রেখেছেন মশয়, সেই বাহারুদ্দিন একটা হিন্দু পাইক বরকন্দাজ অবধি সেরেস্তায় রাখে নি।

শচী সেই রাত্রেই মা'কে লিখিল, মা, তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। তুমি ব্রহ্মময়ীকে লইয়া কলিকাতায় এসো। নচেৎ, আমি কোন কথা শুনিব না। বরাতে যাহা হইবার হোক, আমি আমার ছেলে পুলে কাচ্চা বাচ্চা লইয়া সোনাদী গিয়া বাস করিব।

এবারে মা রাগ করিয়া লিখিলেন, হ্যাঁরে বাবা, তোরা কি খবরের কাগজও পড়িস না? পাকিস্থান হইতে সোনা রূপা এক রতিও লইয়া যাওয়া যায় না, সবাই সে খবর জানে, শুধু তোরাই রাখিস না? ব্রহ্মময়ী-মা যে নিখাদ খাঁটি সোনায় তৈরী, বাবা আমার।

শচী উকীল বাড়ী, খবরের কাগজের দপ্তর, গভর্ণমেণ্ট আফিসে ছুটাছুটি করিয়া জানিল, মা ঠিক কথাই লিখিয়াছেন। শচীর মুখে অন্নজল আর রুচে না, দু'তিন দিন গদীতে যাওয়াও ছাড়িয়া দিল। তার পর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় একটা ব্যাগ হস্তে শেয়ালদা ষ্টেশন যাত্রা করিল।

খবর পাইয়া ভায়েরা আসিয়া চৌদিকে তিরস্কার

রিতে লাগিল। তিনি, অন্ততঃ তাহাদের না জানাইয়া মাকে পাকিস্তানে যাইতে দিলেন কেন? বৌদি তদবধি ক্ষুব্ধ ছিলেনই, দেবরদের তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করবেন, সেই লোক তোমাদের বটে। একেবারে ব্যাগ হাতে এই ঘরে এসে বললেন, মা'কে দেখতে যাচ্ছি, দশ বার দিন পরে ফিরবো। আমি ওগো ওগো করতে করতে গাড়ী গলি পার। একগুঁয়ে লোক নিয়ে সারা জন্মটা জ্বলে পুড়ে খাক হলুম আমি, আর তোমরা বললে কি না, আমার দোষ।—বৌদিদি কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র ঘটাইলেন।

মা কিন্তু বড় ছেলে, প্রথম সন্তান, ধার্ম্মিক সদাচারী শচীকে কাছে পাইয়া স্বর্গ সুখ অনুভব করিলেন। ব্রহ্মময়ীর ভোগ রাগের পরিমাণ চারিগুণ বৃদ্ধি পাইল। পুরোহিত ঠাকুরের অতিবৃদ্ধা জননীর নাড়ুর বড়ায় তাড় নাড়িতে নাড়িতে হাতের নড়া ছিঁড়িবার যো হইল। বসিরদ্দী সেখ প্রত্যহ অর্দ্ধ মণ ছানা যোগান দেয়, শচীর মা'র তাহাও মনঃপূত নহে, বলেন, হ্যাঁরে ছেলে, আর দশ সের বেশী দিতে পারিস নে, বাছা? ভট্টাচার্য্যি মহাশয়ের বিধবা ভগ্নী, তাঁহারও বয়স ষাট বাষট্টি, সন্দেশ ভিয়ান করিতে করিতে কোমরে চৌরঙ্গী বাত ধরিয়া গিয়াছে। শচীর মা'র বড় ক্ষোভ, ভট্টাচার্য্যির সধবা ও সমর্থ কন্যা সুরবালা স্বামীসহ পশ্চিম বঙ্গে পলায়ন করিয়াছে, নহিলে তাহার হাতের আদা ছানার মোণ্ডা করিয়া ব্রহ্মময়ীর প্রসাদ বিতরিত হইলে লোকের আনন্দ ধরিত না। গেল, গেল, মেয়েটা সময় বুঝিয়া গেল।

'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে সোনাদী উত্তাল হইয়া উঠিল। শচীও বহির্বাটীতে কয়েকটা ভোজে জেলা জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি সরকারী পদস্থ ও বেসরকারী মাতব্বরদের আপ্যায়িত করিল। হবি ত হ', জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নুরুদ্দিন সাহেব শচীর পুরাতন বন্ধু। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্বে তিনি আলিপুরের ডেপুটী ছিলেন, শচী চৌধুরীরই আলিপুর লেনের একখানি বাড়ীতে বাস করিতেন। বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে বিরোধ বিদ্বেষের স্রোত তখন প্রবাহিত ছিল না, উভয়ে যথেষ্ট হৃদ্যতা হইয়াছিল। রেণ্ট কণ্ট্রোল তখন ছিল উভয়তঃ স্বপ্নেরও অগোচর।

চার

জেলার ক্রিমিন্যাল বারের অবিসম্বাদী লীডার জনাব মখলুর রহমান একদিন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে, সোনাদীর শচী চৌধুরীর পক্ষে এক আবেদন পেশ করিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :

যেহেতু বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে হিন্দুর সাময়িক অভাব দৃষ্ট হইতেছে এবং যেহেতু শচী চৌধুরীর জননীর বয়সাধিক্যবশতঃ তাঁহাদের গৃহ-বিগ্রহ ব্রহ্মময়ী দেবীর নিত্য পূজায় নানা অসুবিধা ও ব্যাঘাত পরিলক্ষিত হইতেছে, সেই হেতু উক্ত শচী চৌধুরী উপরিউক্ত বিগ্রহটিকে ভারতে—কলিকাতায় স্থানান্তরিত-করণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। জনাব রহমান বিখ্যাত বাগ্মী ও বিচক্ষণ আইন ব্যবসায়ী, বাক্যপরম্পরায় ইহাও জানাইলেন, মহামহিম পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বহুতর বিষয়ে বহুতর বাধা নিষেধ আরোপিত হইলেও গৃহবিগ্রহ স্থানান্তরকরণে কোন বাধা সৃজিত হয় নাই, অতএব প্রার্থনা মঞ্জুর অনিবার্য্য।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মৃদু হাসিয়া স্বর্ণমুখ নির্ঝরিণী লেখনীর আবরণ উন্মোচন করতঃ "মঞ্জুর" কথাটি লিখিবেন, এক জুনিয়র উকীল দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মাবতার, আমাদের পবিত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান হইতে স্বর্ণ রপ্তানীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রের নিষেধ বলবৎ রহিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, ঐ বিগ্রহ সুবর্ণে নির্ম্মিত।

রহমান সাহেব টেবিলে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কহিলেন, আমি সোনা, রূপা, হীরা, জহরৎ কিছুই লইয়া যাইতেছি না, হুজুর। বরং আমার বিজ্ঞ বন্ধু কথাটা স্মরণ করাইয়া ভালই করিয়াছেন, আমার মক্কেল, উক্ত আবেদনকারীকে আমি এই পরামর্শ ই দিব যাহাতে বিগ্রহের অলঙ্কারাদি সমস্তই মহামান্য পাকিস্তান রাষ্ট্রে গচ্ছিত রাখিয়া যান, খুব ভাল কথা। সে সকল লইয়া যাইবার আমার কোন ইচ্ছা নাই। আমি বিগ্রহ লইয়া যাইতেছি, বিগ্রহ আটক করিবেন, কোন্ আইনে?

জনাব মখলুর রহমান এক মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন এবং পরে মেঘমন্দ্রস্বরে কহিলেন, আমি আমার পণ্ডিত বন্ধু ও তাঁহার সঙ্গে মাননীয় আদালত বাহাদুরকে জানাইয়া

দিতেছিলেন, কোনই আইন নাই। "বিগ্রহ আমি ভারতে লইয়া যাইবই। বিজ্ঞবর সাদিক খান্ সাহেব বাধা দিতে পারেন না।

সাদিক খান্ সাহেবও যে তাহা না জানিতেন, এমন নহে। টেবিলের গায়ে মাথা রাখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে—রগড় দেখিতে লাগিলেন। একজন প্রবীণ ব্যবহারজীব, সম্ভবতঃ নিরপেক্ষ এবং সুরসিক ব্যক্তি সাদিক খান সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া আদালতকে জানাইলেন, হুজুর, মার্চেণ্ট অফ ভেনিস্ নাটকের সাক্ষাৎ ন্যায়রূপিণী পোসিয়া মহাশয়া যে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরে আর কথা কহিবার যো কি! শাইলককে তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, এক পাউণ্ড মাংস কাটিয়া লইতে দিতে কোন আপত্তি নাই, সে তোমার প্রাপ্য, তুমি অবশ্য তাহা লইতে পার; কিন্তু সাবধান, এক বিন্দু রক্তপাত না হয়। এক্ষেত্রেও তাই, বিগ্রহের অলঙ্কার সোনার হোক্ হীরার হোক্, আমি কিছুই লইয়া যাইব না; কেন না আইন নাই; কিন্তু আইনে যখন কোনই নিষেধ নাই, তখন আমি বিগ্রহ কেন না লইয়া যাইব?

ম্যাজিস্ট্রেট লিখিয়া দিলেন, মঞ্জুর।

রহমান সাহেব শচীকে লইয়া পুলিশ-সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া একখানি বড় নৌকা ও সীমান্ত পর্য্যন্ত দশজন সশস্ত্র রক্ষী প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া পুলিশ সাহেব বলিলেন, কিন্তু মহাশয়, পাকিস্তানকে ভুলিবেন না।

পাঁচ

এ পর্য্যন্ত শচী মা'কে কোন কথা বলে নাই। নৌকা ও প্রহরী বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া কাগজপত্রগুলা জননীর চরণে রক্ষা করিয়া কহিল, মা, এবার যে আমার চিন্ময়ী ও মৃন্ময়ী দু' মাকেই আমি নিয়ে যাবো, তবে ছাড়বো।

শচীর মা'র চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বলিবার কিছু ছিল কি-না কে জানে; থাকিলেও, প্রবল অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া গেল।

মাস দুই পরে, কলিকাতার সহরতলীতে জয়পুরের শ্বেতকৃষ্ণ মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত এক নয়নানন্দকর মন্দিরে ব্রহ্মময়ীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দলে দলে হিন্দু নরনারী সমাগম হইতে লাগিল। সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় রাত্রে দর্শক যখনই আসে, দেখে সুবর্ণময়ী ব্রহ্মময়ী কালী মূর্ত্তির পার্শ্বে ধ্যাননিমিলিতনেত্রে এক মানুষী মূর্ত্তি।

আধুনিক জগতে সহস্রলোচন সংবাদপত্রের অনুগ্রহে কোন সংবাদই গোপন থাকে না। ব্রহ্মময়ী পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংবাদও গোপন ছিল না। পাকিস্তানের ব্রহ্মময়ী যাঁহার ভক্তির আকর্ষণে ভারতে আগমন করিয়াছেন, সেই শচী জননীর কথাও রাষ্ট্র হইয়াছিল। ভক্ত, অচল সচল দুই মূর্ত্তির সম্মুখেই মস্তক আনমিত করিত।

সমুদ্রমন্থন

শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ

পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে আর একটা কাহিনী আমরা শুনে আসছি বহুকাল ধ'রে। তার নাম সমুদ্রমন্থন। জনশ্রুতি আছে, এক ঋষির অভিশাপে দেবগণ লক্ষ্মীভ্রষ্ট হন। লক্ষ্মী লুকিয়ে থাকেন সমুদ্র গর্ভে। লক্ষ্মীর উদ্ধারের জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল সমুদ্রমন্থনের। মন্দার পর্ব্বত হ'ল মন্থনদণ্ড ও মন্থনরজ্জু নাগরাজ বাসুকি। দেবগণ ও অসুরগণের মিলিত চেষ্টার ফলে মন্থন সম্পন্ন হয়। অতল বারিধি তল হ'তে ক্রমশঃ উঠল—উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবত, কৌস্তুভ মণি, পারিজাত পুষ্পতরু ও অপ্সরাগণ। তারপরে উঠলেন শ্রীভগবদ্বিষ্ণুর অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মী কমলহস্তে। এই সমুদ্রমন্থন একটা রূপক। গল্পের রূপকাংশ ত্যাগ করে' অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায় সৃষ্টিরহস্য। চিন্তাশক্তিকে আর একটু এগিয়ে দিলে তার মধ্যে খোঁজ পাই দার্শনিক তথ্য। ভৌগোলিকগণের নিকটে এটা সুপরিচিত যে আমাদের পৃথিবীর ভূভাগ একটু একটু ক'রে জেগে উঠেছে সমুদ্রবক্ষে। ভূমির এই জেগে উঠার মধ্যে আমরা দেখতে পাই দেবাসুরের আকর্ষণের মত একটা ব্যাপার এবং মন্থন দণ্ডের মত একটা পদার্থ। এই বিষয়টা একটু বিশদভাবে বুঝতে গেলে ভৌগোলিক আলোচনার প্রয়োজন হয়। পৃথিবী যখন উত্তপ্ত বায়ুময় (গ্যাসীয়) পিণ্ড ছিল, তখন উহাতে ছিল জলীয় বাষ্প, লবণ জাতীয় পদার্থের গ্যাস, লৌহ নিকেল প্রভৃতি ধাতুর গ্যাস ও অন্যান্য গ্যাস। আমরা জানি হালকা বাষ্প থাকে উপরদিকে এবং ভারি বাষ্পের স্থিতি নিম্নে। তাই সর্ব্বোপরি অর্থাৎ পৃথিবীর বহির্দিকে ছিল হাল্কা গ্যাস, তার নীচে লবণজাতীয় পদার্থের গ্যাস এবং সর্ব্বনিম্নে অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যস্থলে ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ভারী লৌহজাতীয় পদার্থের গ্যাস। তাপবিকীরণ ক'রে

[illegible] এক একটা স্তরে [illegible] এই স্তর [illegible]
[illegible] সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্কোচনের ফলে
[illegible] উন্নত এবং কোন স্থান অবনত। কালক্রমে তরল
[illegible] জাতীয় পদার্থসকল কঠিন স্তরের সঙ্গে মিলিত হওয়ায়
একটা কঠিন আবরণ এবং লৌহ নিকেল প্রভৃতি ধাতব পদার্থ
[illegible] অভ্যন্তরে থাকল তরল বা অর্দ্ধতরল অবস্থায়। তাপ
অনবরতই চলিতেছে। তাই কিছুকাল পরে পৃথিবীপৃষ্ঠের
[illegible] হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস মিলিত হওয়ায় জলের সৃষ্টি
[illegible] জল আবার ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্থানগুলিতে সঞ্চিত হওয়ায় উৎপন্ন
[illegible] মহাসাগর প্রভৃতি। সৃষ্টি কালে সমগ্র পৃথিবীর উপরে যে
[illegible] হয়েছিল তা থেকে সাগরও মুক্তি পায় নি। ঊর্দ্ধে
[illegible] বায়ুমণ্ডল ও জলরাশির উপরে যেমন, আবর্ত্তন আমরা
পাই, ভূমধ্যস্থ অর্দ্ধতরল বা তরল লৌহ নিকেল প্রভৃতি ধাতব
প্রবাহিত গলিত ধাতু পদার্থের প্রচণ্ডাঘাতে ভূত্বক্ কম্পিত
[illegible] বক্ষোপরি নানা পরিবর্ত্তনের আরম্ভ হয়। উপরে জল
[illegible] মধ্যেও পরিবর্ত্তন দেখা গেল সূর্য্যের উত্তাপে ও আকর্ষণে।
সূর্য্যের আকর্ষণ এবং ভূমধ্যস্থ গলিত ধাতব পদার্থের প্রচণ্ডাঘাত-
[illegible] ভূত্বকের আলোড়ন, ইহাকেই পুরাণকার বলেছেন সমুদ্রমন্থন।
মন্থনের কর্ত্তা দেবতা ও অসুর। এখন দেখ্তে হবে দেবতা
এবং অসুরই বা কাদের বলা যায়।

[illegible] বর্ণিত আছে দেবতা সত্ত্বগুণসম্পন্ন, জ্যোতিস্ময় এবং সূক্ষ্মশরীর-
[illegible] অসুরগণ স্থূলশরীরী, তমোগুণসম্পন্ন ও কৃষ্ণবর্ণ। সমুদ্রের
[illegible] আলোড়নে দেবতারূপে আমরা বর্ণনা করতে পারি ব্যোম-
[illegible] সূর্য্যরশ্মিনিচয়কে। বায়ুমণ্ডলস্থ সূক্ষ্মশরীরধারী অসংখ্য
[illegible] কতকটা দেবযোনি বলা যায়। পুরাণবর্ণিত অসুর ভূমধ্যস্থ
[illegible] ধাতু। ভূত্বকের মধ্যবর্ত্তী অসংখ্য স্বল্পপ্রাণ জীবগণও
অসুরপর্য্যায়ে হ'তে পারে। সূর্য্যরশ্মিসমূহ জ্যোতির্ম্ময়, সূক্ষ্ম ও
[illegible]। তাই তাদের দেবতা বলা অসঙ্গত নয়। দেবতার
[illegible] সূর্য্যরশ্মিসমূহে পাওয়া যায়। ঋষিগণের মতে দেবসেবায়
[illegible] শুদ্ধ হয়, তাই ত্রিসন্ধ্যাকালে সূর্য্যের অভিমুখে বিপ্রগণের
[illegible] শাস্ত্রে বিহিত আছে। এই সূর্য্যরশ্মিসেবায় শরীর যে শুদ্ধ হয়,
[illegible] বিজ্ঞানও সমর্থন করে। সূর্য্যরশ্মি দ্বারা অনেক দুরারোগ্য
[illegible] আধুনিক যুগে চিকিৎসকগণ করছেন, এটা আমাদের
[illegible]। শুধু যে শরীর-শুদ্ধি তা নয়, সূর্য্যরশ্মির দ্বারা আমাদের
[illegible] দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে আমরা বুঝতে পারি
[illegible] অবসন্নতা। এটা দূর হয় মেঘমুক্ত আকাশের নূতন সূর্য্য-
[illegible]। এই সমস্ত কারণে সূর্য্যরশ্মিসমূহকে আমরা নিঃসন্দেহে
[illegible] পারি। ভূমধ্যস্থ গলিত ধাতুনিচয় অসুর পদবাচ্য। সূর্য্য-
[illegible]

প্রভৃতি গ্যাস—যা আমাদের [illegible]
সম্পাদন করছে আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য, বল ও দীর্ঘায়ুঃ। অসুর-
গণের ভাগে পড়েছিল নাগরাজ বাসুকির উদ্গীর্ণ বিষ। পুরাণে বর্ণিত
আছে উদ্গত বিষের কতকটা ভক্ষণ করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় শিব এবং
অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস করেছিল বহু অসুরনিচয়কে। এই বিষ ভূমধ্যস্থ
নানাবিধ বিষাক্ত গ্যাস ভিন্ন কিছুই নয়। পুরাণকারের মতে ভূমধ্যস্থ
অতল বিতল প্রভৃতি সপ্তলোকে অসুরগণের বাস এবং দেবতাগণ বাস
করেন ভূত্বকের উপরিস্থ ভুভুব প্রভৃতি সপ্ত স্বর্গে। ভূত্বকের উপরিস্থিত
এই সকল স্বর্গলোকে যে সমস্ত জীবের বাস, তারা পায় স্বাস্থ্যকর ও
দীর্ঘজীবনদায়ী অক্সিজেন প্রভৃতি গ্যাস। পুরাণকারের অমৃত, স্বর্গবাসী
জীবগণকে দিয়েছিল অমরত্ব বা দীর্ঘজীবন। এই অক্সিজেন প্রভৃতি
স্বাস্থ্যকর গ্যাসও দেয় দীর্ঘজীবন। তাই সেগুলি অমৃতেরই তুল্য। আবার
ভূমধ্যস্থ অতল বিতল প্রভৃতি লোকে অর্থাৎ ভূমির বিভিন্ন স্তরে বায়ুর
সঞ্চার পূর্ণভাবে না থাকায় সে স্থানের জীবগণ প্রাণদায়ক অক্সিজেন
প্রভৃতি গ্যাস পায় না। পরন্তু তারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করে বিষতুল্য
প্রাণনাশকর গ্যাসসমূহ। এই গ্যাসের কতকটা গ্রাস করে পৃথিবী।
পৃথিবী আবার অষ্টমূর্ত্তি শিবের একটি মূর্ত্তি—এরূপ বর্ণনা আমরা শাস্ত্রে
পাই। অতএব মৃত্যুঞ্জয় শিবের বিষভক্ষণ অর্থে আমাদিগকে
বুঝতে হবে পৃথিবীর বিষতুল্য প্রাণহানিকর গ্যাসসমূহ আত্মসাৎ
করা অর্থাৎ স্বকীয় উপাদানরূপে গ্রহণ করা। এই ত গেল
দেবাসুরের অমৃতবিষবণ্টন। এইবার আলোচনা করা যাক
সমুদ্র মন্থনে সৃষ্টির ক্রমবিকাশের কথা। পুরাণকার বলেছেন—সমুদ্র
মন্থনে প্রথমে উঠেছিল উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। দেবরাজ ইন্দ্র এই উচ্চৈঃশ্রবা
অশ্বকে অধিকার করেন। এই পৌরাণিকী বার্ত্তার মধ্যেও আমরা
অনুসন্ধান করলে পাই ক্রমবিকাশের সূত্র। দেবরাজ ইন্দ্রের বাস
স্বর্গলোকে অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী স্থানে। একটু প্রণিধান করলে
বুঝা যায় যে এই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব সিন্ধুঘোটক বা আখ্যান বর্ণিত পক্ষিরাজ
ঘোটক ভিন্ন কিছু নয়। পক্ষিরাজ ঘোটক একপ্রকার পক্ষবিশিষ্ট বর্ত্তমান
ঘোটকাকার জলজন্তুবিশেষ। জলজন্তু পক্ষ ভরে ঊর্দ্ধে উড়্‌ত আকাশপথে,
আবার প্রয়োজনমত নূতন ভূমির উপরে বিচরণ করত তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদের
সাহায্যে। আকাশমার্গে উড়্‌ত বলেই পুরাণে কথিত হ'য়েছে উচ্চৈঃশ্রবা
ইন্দ্রের ঘোটক। উচ্চৈঃ অর্থাৎ ঊর্দ্ধে শ্রব যার সেই উচ্চৈঃশ্রবা। শ্রব
শব্দের একটা অর্থ চ্যুতি অর্থাৎ গতি। অর্থাৎ ঊর্দ্ধে যে যায় সে
উচ্চৈঃশ্রবা। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের উৎপত্তিকালে স্বল্প ভূমিভাগ জেগেছিল,
তাই পক্ষের প্রয়োজন হ'য়েছিল তার আকাশ বিহরণনিমিত্ত। ক্রমশঃ
ভূভাগ আরও জেগে উঠল। তখন সৃষ্ট হল গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবত। এই
ঐরাবতকে আমরা বর্ত্তমানকালের জলহস্তী বলব। পুরাণে লিখিত আছে,
ইন্দ্রের অধিকারে ছিল এই গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবত। ভূমির অধিকাংশ জেগে
উঠায় আকাশ [illegible] এই সময়ে। তাই [illegible]

অগ্রসর হন—তভই যে তাঁর বহু শ্বাসরোধকর উপাদান ত্যাগ করে উন্মুক্ত প্রাণবৃদ্ধিকর বায়ুর সেবা। আকাশে যা উড়লেও ঐরাবত বা জলহস্তীর একটা প্রকৃতি এই যে, সে শুণ্ডদ্বারা জল আকর্ষণ ক'রে ঊর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত করে। ইন্দ্র শব্দের একটা অর্থ সূর্য্য এবং জলহস্তী বা ঐরাবতের স্বভাব ঊর্দ্ধে সূর্য্যের প্রতি জলক্ষেপ। এই দুইয়ের সমন্বয় করলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি ঐরাবত বা জলহস্তীর উপরে ইন্দ্রের আধিপত্য ছিল। ক্রমবিকাশের ফলে ভূভাগ আরও জেগে উঠল এবং সমুদ্রের জল গেল কমে। তখন মন্থনে উঠ্‌ল কৌস্তভমণি। এই কৌস্তভমণি আছে বিষ্ণুর বক্ষস্থলে। কুস্তুভ শব্দের উত্তর 'ষ্ণ' প্রত্যয়যোগে কৌস্তুভ শব্দ ব্যুৎপন্ন। কুস্তুভ শব্দের অর্থ বিষ্ণু এবং সমুদ্র উভয়ই হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে বিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী এবং বক্ষস্থলে বিরাজ করছে কৌস্তুভমণি। আমরা জানি সাগরের তলদেশে জন্মে রক্তবর্ণ প্রবালরত্ন। এই প্রবালই মনে হয় কৌস্তুভমণি। সাগরের জলরাশি যদি কুস্তুভ শব্দ বাচ্য হয় এবং কুস্তুভ শব্দের আর একটি অর্থ যদি হয় বিষ্ণু, তবে সাগরবক্ষোজাত প্রবালরত্নকে বিষ্ণুর বক্ষস্থিত কৌস্তুভমণি বলা অসঙ্গত নয়। সূর্য্যরশ্মির আকর্ষণে সমুদ্রের জল আরও শুকিয়ে গেল। তখন উঠল পারিজাত পুষ্পতরু। এই পারিজাতকে আমরা জলজ উদ্ভিদ নামে অভিহিত করতে পারি। অনেক সময়ে দেখা যায় বৃহৎ জলাশয়ের তীরভূমি যখন একটু একটু করে জেগে উঠে, তখন সেই আর্দ্রভূমিতে জন্মে নানাবিধ জলজতরু। এই পারিজাতও মনে হয় এরূপ একটা জলজাত পুষ্পতরু। এই পুষ্পতরু ভোগ করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। একটু প্রণিধান করলে আমরা বুঝতে পারি—এই পারিজাত বৃক্ষ ঊর্দ্ধে মস্তক উন্নত ক'রে তার কুসুমগুলিকে ফুটিয়ে রাখে ইন্দ্ররূপী সূর্য্যের অভিমুখে। তাই বলা হয়েছে পারিজাত ইন্দ্রের পুষ্প। অথবা পারিজাত শব্দে আমরা গ্রহণ করতে পারি—জলপদ্ম। প্রসিদ্ধি আছে, জলপদ্ম প্রস্ফুটিত হয় সূর্য্যের কিরণে এবং নিশাকালে মুদিত হয়। সূর্য্যরশ্মির সঙ্গে এর একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে ব'লে এবং ইন্দ্র শব্দে সূর্য্যও বুঝায় ব'লে পুরাণকার রূপকের ছলে বর্ণনা করেছেন—সমুদ্র মন্থনে পারিজাত উঠ্‌বামাত্রই ইন্দ্র তাহা অধিকার করেন। ক্রমবিকাশের ফলে সমুদ্র যখন সীমাবদ্ধ হ্রদের সৃষ্টি করে তখন সেই হ্রদে দেখা যায় এরূপ পারিজাত বা জলপদ্ম। পারিন্ শব্দের অর্থ সমুদ্র। সমুদ্রে সে জন্মে তার নাম পারিজাত। পুরাণে বর্ণিত আছে শ্রীকৃষ্ণ এই পারিজাত পুষ্প ইন্দ্রের নিকট হ'তে বলপূর্ব্বক সংগ্রহ করেছিলেন। পুরাণবর্ণিত এই ব্যাপারটাও একটা রূপক। শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয়া মহিষী সত্যভামার অনুরোধে প্রকৃতিজাত জলপদ্ম দূরবর্ত্তী হ্রদ থেকে সংগ্রহ ক'রে উৎপন্ন ক'রেছিলেন স্বগৃহপার্শ্ববর্ত্তী প্রমোদোদ্যানের সরোবরে। পুরাণের রূপকের সমাধান এইরূপেই করতে হবে। সমুদ্র-মন্থনে পারিজাতের পরে উঠে অপ্সরাগণ। এই অপ্সরাগণকে আমরা কাকলীবিশিষ্ট হংসাদি বিবিধ জলজপক্ষী নামে অভিহিত করতে পারি। অপ্‌সরস্ শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ ধরতে গেলে বলতে হয়, অপ্ অর্থাৎ জলে যাঁরা সঞ্চরণ করে তারাই অপ্সরা। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় অপ্সরাগণ কলকণ্ঠে সঙ্গীত করেন। এই হংসাদি জলজ পক্ষিগণেরও কাকলি সুমধুর। পক্ষান্তরে হংসগণ আকাশপথে সময়ে সময়ে সুমধুর সঙ্গীত সহকারে উড্ডীন হন, তাই পুরাণকার বলেছেন অপ্সরাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীত করেন। সমুদ্র মন্থনে বলা হয়েছে, অপ্সরাগণের পরে উঠেন শ্রীভগবদ্বিষ্ণুর অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী অন্য কিছুই নন, আমাদের প্রধান খাদ্য ধান্য। শাস্ত্রে আছে "লক্ষ্মীস্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী।" ধান্যরূপা লক্ষ্মীর উদ্ভব হ'য়েছিল সেই সময়ে, যখন বহুকাল অপবিকীরণের ফলে পৃথিবী বক্ষে জেগে উঠেছিল মহাদেশসমূহ এবং সেখানে জন্মেছিল মনুষ্যাদি স্থলচর জীব। এই স্থলচর জীবের প্রধান খাদ্য ধান্য এবং আমরা জানি জলেই এই ধান্যের উৎপত্তি। জল যদি বিষ্ণু হন, তবে ধান্যরূপা লক্ষ্মী বিষ্ণুর অঙ্কশায়িনী এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। পুরাণকার এই সহজ সত্য প্রাকৃতিক ব্যাপারকে রূপকের ছলে বলেছেন—সমুদ্র মন্থনে উঠেছিল বিষ্ণুর অঙ্কশায়িনী লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর উদ্ভবের পরে উঠেন ধন্বন্তরি অমৃত কলসহস্তে। এই অমৃতকে আমরা ইতিপূর্ব্বে অভিহিত করেছি হাইড্রোজেন অক্সিজেন প্রভৃতি প্রাণবৃদ্ধিকর গ্যাস নামে। ধন্বন্ উপপদে ঋ-ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ই' প্রত্যয় যোগে ধন্বন্তরি শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়। ঋ ধাতুর অর্থ গমন করা। ধন্বের অন্তে যে গমন করে তার নাম ধন্বন্তরি। ধন্ব শব্দে আমরা পাই স্থল। অতএব স্থলের অন্তে অর্থাৎ ভূভাগের উপরিভাগে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাকেই আমরা বলতে পারি ধন্বন্তরি। অতএব ধন্বন্তরি শব্দে আমরা লক্ষ্য করতে পারি পৃথিবীর উপরস্থিত জলভাগ ও বায়ুমণ্ডলকে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে জলে ও বায়ুমণ্ডলে প্রাণবৃদ্ধিকর হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস বহুল পরিমাণে সঞ্চিত আছে এই সমস্ত বিচার করে বলতে হয় পুরাণবর্ণিত ধন্বন্তরি অন্য কিছুই নয় ভূমির উপরিস্থ বিশুদ্ধ জল ও বায়ুমণ্ডল। ধন্বন্তরির কলসের অমৃত উপরি-কথিত প্রাণবৃদ্ধিকর গ্যাসসমূহ। দেবাসুরের আকর্ষণে যে সমুদ্র মন্থন হয়েছিল, তাতে উঠেছিল এইরূপ প্রাণদায়ক অমৃত। মন্থনের দণ্ড হ'য়েছিল মন্দার পর্ব্বত। পুরাণ বর্ণিত মন্দার পর্ব্বত ভূ-বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী কল্পিত মেরুদণ্ড। ইহাকেই বেষ্টন করে পৃথিবী পূর্ব্বাভিমুখে দৈনন্দিন আবর্ত্তন করছে। মন্দ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অরন্ প্রত্যয় যোগে মন্দার শব্দের ব্যুৎপত্তি, মন্দ ধাতুর অর্থ জড় হওয়া অর্থাৎ স্থির থাকা। অতএব যে স্থির থাকে তার নামই মন্দার। পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তনের সময়ে বক্ষসমতলের সঙ্গে সর্ব্বদাই ২৩½ ডিগ্রী হেলিয়া থাকে। তাই ইহা স্থির এবং সেই জন্যই ইহাকে মন্দার নামে অভিহিত করা যায়। পুরাণে বর্ণিত হ'য়েছে মন্থনরজ্জু ছিল বাসুকি। বসু-শব্দের উত্তর কৈ-ধাতুর সঙ্গে 'ড' প্রত্যয় (কর্ত্তৃবাচ্যে) যোগে 'বসুক' শব্দ বুৎপন্ন হয়। তদুত্তরে ষ্ণি যোগে বাসুকি শব্দ পাওয়া যায়। বসু শব্দের অর্থ ধনরত্ন এবং কৈ-ধাতুর অর্থ শব্দ করা। অতএব যে ধনরত্ন দ্বারা শব্দ করে তাকেই বলে বাসুকি। এই ধনরত্ন ভূগর্ভনিহিত সুবর্ণাদিগ্রথিত ধাতু এবং ভূমির উপরিস্থিত স্বাস্থ্যকর বায়ু ও সূর্য্যতাপ। এইগুলিই মিলিতভাবে মন্থনরজ্জুর কাজ করছে। সমুদ্র মন্থনের রূপকের বৈজ্ঞানিক অর্থ আমরা এইভাবে দেখাতে চেষ্টা করলাম। অনন্ত সমুদ্র মন্থন করে জীব আমরা কতটুকু তুলতে পারি! তবে সুধীগণের পদপ্রান্তে যে বিনীত অর্ঘ্য দিলাম, তা সাদরে তুলে নিলে এ জন্ম সত্যই কৃতার্থ হবে।...সাম্যের জয় হ'ক, সখ্যের জয় হ'ক, শান্তির জয় হ'ক।•

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মোটরটা নেমে চলল গ্রামের দিকে। মুরামের বেশ চওড়া রাস্তা, গ্রাম হিসাবে বেশ পরিষ্কার। প্রথমটা এখানে-ওখানে ছড়ানো বাড়ি, তারপরেই অল্পে অল্পে সেগুলা ঘন হয়ে উঠতে লাগল। পথে ঘাটে, মাঠে, বাড়ির উঠানে, দাওয়ায়, চলতি গাড়ি থেকে ঘরের মধ্যে যেটুকু নজর যায়—সর্বত্রই প্রভাতের নূতন জীবনের চঞ্চলতা··· ছোট মেয়েটি দুটি ভাই বোনকে নিয়ে দুটি হাত জড়ো করে একমনে ধূলার বাড়ি তুলছে···একটি বউ পিঠের ওপর একটা হাত ফেলে হেঁট হয়ে উঠানে দিচ্ছে ঝাঁট, মোটর দেখে ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়ালো···পাঠশালায় ছেলের পাল, গুরুমশাই আসে নি, ছাতরা পাখির মতো কিচির-মিচির চলছে···মেয়েরা খালি কলসী হাতে ঝুলিয়ে নদীতে জল আনতে যাচ্ছে, মাথায় ভরা কলসী চাপিয়ে চড়াই বেয়ে উঠে আসছে ক'জন···বস্তা বোঝাই গোরুর গাড়ি যাচ্ছে, মোটরের হর্ণ শুনে গাড়োয়ান পাশ কাটিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে নিলে, রাস্তার ধারে গিয়ে একটা সসম্ভ্রম সেলাম ঠুকে বলদের রাশ টেনে দাঁড়াল···পাশের বাড়ি থেকে ঘুঁটের ওপর আগুন নিয়ে একটি আধবুড়ি গোছের স্ত্রীলোক নিজের বাড়ির আঙিনায় ঢুকল, সঙ্গে একটি ছোট ছেলে, উলঙ্গ, কোমরে শুধু এক গাছা ঘুনসি, ঘাড় দোলার ভঙ্গিতে বোধহয়, কি একটা আবদার ধরেছে।···বসতি ঘন হয়ে উঠল, পাশাপাশি কয়েকখানা দোকান—চাল-ডাল, বেনে-মসলা, মেঠাই; তরিতরকারি আসতে আরম্ভ হয়েছে, দরদস্তর বেচাকেনায় লোকের জটলা বেশি। দুধারে সেলাম কুড়ুতে কুড়ুতে আস্তে চলেছে মোটর।··বসতি আবার পাতলা হয়ে গিয়ে দুদিকে মাঠ; কোনটা উষর, কোনটাতে ফসল দাঁড়িয়ে আছে, কোনটাতে হাল চলছে, মোটর দেখতে হালী, বলদ দুই-ই কাজ থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো···রাস্তা ঢালুতে নামছে, মোটরের গতি গেল বেড়ে···

সুকুমার সরমার মুখের পানে চেয়ে আছে, অবশ্য খুব সন্তর্পণে, যাতে সে বুঝতে না পারে যে লক্ষ্য করছে তাকে। মাঝে মাঝে পরিচয় দিচ্ছে—শিশুকে যেমন নাম বলে বলে পরিচয় দিতে হয় সেভাবে নয়—নিতান্তই যেন কথা কওয়ার ছলে—"ছেলেটি বোধহয় বুড়ির নাতি; আপনার কি মনে হয়? আমি বলছি আবদারের রকম দেখে; অবশ্য ছেলেও হতে পারে, বুড়ো বয়সের ছেলে, তার আবদার আবার আরও ভয়ংকর, নয় কি?···যেমন লাগিয়েছে ছেলেগুলো, কাছে পিঠে নিশ্চয় গুরুমশাই নেই; আপনার কি মনে হয়?···আমাদের দেশে নেয় কাঁখে কলসী, এদেশে মাথায়···রাজপুতানার দিকে কখনও গেছেন কি? এক এক জন তিন চারটে কলসী নিয়ে নেয় মাথায়, বড়, তারচেয়ে ছোট, তার চেয়ে ছোট···"

কথার মধ্যেই লক্ষ্য করে মুখের ভাব। একটা অদ্ভুত কৌতূহলের সঙ্গে আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে সরমা, ঈষৎ কুঞ্চিত ভ্রূর নিচে চোখের কোণে, ঠোঁটের কোণে খুব ক্ষীণ একটু হাসি; অন্ধকারের গায়ে প্রথম উষার মতো বিস্মৃতির সঙ্গে একটু যেন চৈতন্যের আভাস। সরমা একটু একটু যেন বুঝছে। হারানো জিনিষ সব যেন আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। একজন পূর্ণ যুবতীর মুখে শিশুর প্রথম জ্ঞানোন্মেষের বিস্ময়,—এমন অদ্ভুত দৃশ্য কখনও দেখেনি সুকুমার, একদিকে যেমন করুণ অন্যদিকে তেমনি অনির্বচনীয়।···মাঝে মাঝে কপালে চারটি আঙুলের ডগা চেপে বুলিয়ে নিচ্ছে, যেন কি খুঁজে পাই-পাই করেও পাচ্ছে না; তেমনি এক একবার মুখটা হঠাৎ বেশিরকম উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, যেন একটার গায়ে একটা করে এক সঙ্গে অনেকগুলো ব্যাপার বুঝতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে; যেন একটার পরিচয়ে আর একটা বা আর অনেক কিছু আপনিই এসে পড়ছে ওর কাছে। এক একবার দু' একটা কথার বেশ উত্তর দিচ্ছে;

একবার কৌতুকে চোখ ছুটো একটু হাসি-হাসি করে বললে —"এখানে যেন সব কিছুই একটু অন্য রকম—আপনারও তাই মনে হচ্ছে না ?"

সুকুমার বললে—"হ্যাঁ, পাহাড়ে অঞ্চল তো, আর, আপনি এর আগে যা দেখেছেন…"

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই প্রশ্ন করলে—"আপনি অন্যরকম কি হিসেবে বলছেন ?—মানে, কোথাকার তুলনায় ?"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সরমা, মনে করবার চেষ্টায় কপালে আঙুল চারটে চেপে আস্তে আস্তে বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিয়ে গেল। সুকুমার অন্য কথা পাড়লে, বেশি জোর দিতে চায় না।

আর একটু এগিয়ে যেতেই ওরা একেবারে গ্রামের বাইরে এসে পড়ল। এক সমতলে বেশ অনেকখানি নিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা। এর পরে জমিটা আবার ধীরে ধীরে উঠে গেছে, প্রায় চারিদিকেই। এই রকম অবস্থানের জন্যেই জায়গাটার মাঝখানে একটা হ্রদ সৃষ্টি হয়ে গেছে, বর্ষায় চারিদিককার জল জমে। গোটা তিনেক ছোট ছোট পাহাড়ে নদীও এসে নেমেছে হ্রদটাতে, এখন জলের চেয়ে বালির ভাগই বেশি ; একটা অপেক্ষাকৃত বড় নদী হ্রদের জল নিয়ে এক দিক দিয়ে গেছে বেরিয়ে। এ সমস্তই হ্রদের সামনের অর্ধেকটায়, অর্থাৎ সুকুমারেরা যেদিকে এল তার উলটা দিকে। এদিকটায় কোন নদী নেই, বর্ষার জল নামার দরুণ মাঝে মাঝে এক আধটা খোওয়াই আছে। সব মিলিয়ে জায়গাটি বড় মনোরম ; সমস্ত চত্বরটাই সুন্দর, তার মধ্যে এখানটা যেন আরও অপূর্ব।

একটি শালের বন, এইখানে এসে মোটরটা দাঁড়াল।

বীরেন্দ্র সিং নেমে বললেন—"চলুন ডাক্তারবাবু, এইবার একটু হাঁটা যাক।…আপনিও আসবেন, না, মোটরেই থাকবেন বসে ?"

একটু হেসে বললেন—"অবশ্য এ জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের ভয় নেই, ড্রাইভারও রইল।"

সুকুমারও সরমার দিকে চাইলে। সরমা বললে—"না, আমিও যাব।"

লোক লেগে রয়েছে, জঙ্গলটা পরিষ্কার করছে, আগাছা কেটে, কোথাও কোথাও গাছ কেটে—যেখানে বেশি ঘন সন্নিবিষ্ট। মাঝে মাঝে কাটা আগাছা পড়ে রয়েছে বলে এরা দৃষ্টি নিচু করেই চলছিল, জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় সুকুমার চোখ তুলে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে একটি ভদ্রলোক তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছেন। বৃদ্ধ বেশ দীর্ঘ, কতকটা স্থূল দেহ, অনাবৃত বুকের নিচে পর্যন্ত দাড়ি নেমে এসেছে, মাথায় চুল ঠিক বাবরি না হলেও একটু বড়। মুখে একটি প্রসন্ন হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছেন ভদ্রলোক ; সুকুমারের সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই নমস্কার করলেন, তারপর সরমাকেও। এরা দুজনে একটু অপ্রতিভভাবেই প্রত্যভিবাদন করলে।

একটু আশ্চর্য যে হয়ে গেছে সুকুমার তার কারণ, এই আশ্রমের মতো জায়গায় নিতান্তই আশ্রম-পুরুষের মতো একজনকে হঠাৎ দেখা এভাবে। তারপর কোঁচা করে কাপড় পরার ঢঙে মনে হোল যে বাঙালী।

একেবারে কাছাকাছি হোতে বীরেন্দ্র সিং পায়ে হাত দিয়ে অভিবাদন করলেন, বললেন—"আপনার স্কুলে নোতুন লোক নিয়ে এলাম স্যার।"

ভদ্রলোক একটু প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে বললেন—"সুখবর ; টেঁকবেন তো ?"

বীরেন্দ্র সিং একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন—"না, সেভাবে নিয়ে আসা নয় ; উনি শুধু দেখতে এসেছেন।"

"সেকি ! লোক টেঁকা দূরের কথা, সুখবরটুকুও এক সেকেণ্ড টেঁকল না ?"—ব'লে ভদ্রলোক বেশ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। তারপর সুকুমারের দিকে চেয়ে বললেন— "আসুন, কিছু মনে করবেন না। ফেঁদেছি তো বড় করে, কিন্তু লোক কই ? যা পাণ্ডববর্জিত দেশ বীরেন্দ্রের, কেউ থাকতেই চায় না, তাই ঐ আতঙ্কের কথাটাই সময়ে-অসময়ে বেরিয়ে পড়ে মুখ থেকে।"

সরমার দিকে চেয়ে বললেন—"এসো মা।"

ঘুরে অগ্রসর হলেন। এদিকটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, শাল বনটা নিয়েছে শাল বাগানের রূপ। ছাড়া ছাড়া গাছের ছায়ার মধ্যে এখানে ওখানে ছড়ানো কতকগুলা ঘর। এইগুলা স্কুল। এখন ক্লাস বসে নি, তবে কিছু কিছু ছেলে বেঞ্চের ওপর বসে নিজেদের সকালবেলার পড়া করছে। একটি ঘরে গুটি চার মেয়ে। খানিকটা সরে একটা একটানা চালা ঘর ; এটা বোর্ডিং। এর ঠিক উলটা দিকে আর একটা ঐরকম চালা ঘর, এটা

মেয়েদের জন্তে। প্রত্যেকটির পাশে একটি ছোট চালার মধ্যে রান্না আর খাবার ঘর, ওরই মধ্যে ভাঁড়ারও। রান্না হচ্ছে, তিন চারটি করে ছেলেমেয়ে সাহায্য করছে। সমস্ত বোর্ডিংএ ছেলেমেয়ে আছে বোধহয় জন পঞ্চাশেক।

ভদ্রলোক গল্প করার সাথে সাথে সব দেখালেন। তারপর অন্তদিকে নিয়ে গেলেন। এখানটা শিক্ষকদের বাসা, একটু দূরে দূরে, বাসার চারিপাশে খানিকটা করে জায়গা। খান আষ্টেক বাসার মধ্যে তিনটিতে তালা লাগানো। ভদ্রলোক স্কুমারকে দেখিয়ে হেসে বললেন—"ঐ দেখুন, যে আতঙ্কের কথা আপনাকে বলছিলুম।"

নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। এইখানে বসে বীরেন্দ্র সিং প্রথম কালকের রেল দুর্ঘটনার কথাটা বললেন, সেই সঙ্গে স্কুমারদের পরিচয়টাও দিলেন। তারপর বিদায় নিয়ে উঠে পড়লেন, অবশ্য সরমার অসুখের কথা উল্লেখ করলেন—বললেন—"এবার এঁদের ওটাও দেখিয়ে দিগে, এখনও রোদটা সেরকম তাতে নি। আপনি স্থার একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেবেন? ড্রাইভারকে বলবে, মোটরটা ঘুরিয়ে নিয়ে ওদিক দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসবে।"

এ বনের পরে বিঘে পনের নিয়ে একটা ফাঁকা জমি, একেবারেই নিষ্পাদপ, তারপর আবার একটা শালের বন দেখা যায়। জায়গাটা পেছন দিকে একটু গড়িয়ে গেছে, তারপরেই সেই নদীটা, হ্রদ থেকে বেরিয়ে যেটা বাইরে চলে গেছে।

এসে দেখা গেল এখানটা আরও অপরূপ। দূর থেকে যেটা জঙ্গল বলে মনে হচ্ছিল সেটা আরও ভালো করে সাজানো একটা বাগানই। শালই বেশি, তবে ঢালুর দিকটা যত্ন করে লাগানো ঝাউ, ইউকালিপটাস, বট্‌লপাম—এসবেরও সারি আছে, একটা ফুলের বাগানও, গোলাপ তো আছেই, কয়েকরকম মরশুমি ফুলও; সবচেয়ে বাহার দিয়েছে দুটো বড় বড় বোগেনভিলিয়ার ঝাড়, সবুজ ঘাসে ভরা একটা বড় বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাশি রাশি ফাগের-রঙের ফুলে সমস্ত জায়গাটা যেন আলো করে রয়েছে।

খানিকটা দূরেই নিচে নদীটা, অল্প এঁকে বেঁকে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে একটা বড় বাঁকের পর অদৃশ্য হয়ে গেছে। নিস্তেজ বালুচরের ওপর সূর্যের কিরণ ঝিকমিক করছে। মাঝখানে নীলজলের রেখাটা, কোথাও চওড়া, কোথাও সরু, কোথাও বা কয়েকটা ধারায় ভাগ হয়ে গেছে।... নদীটার নাম শুনলে বুলানী। ডানদিকে হ্রদটা, তারপরেই দূরে দূরে পাহাড়ের নীল রেখাগুলা—কোথাও ফিকে, কোথাও গাঢ়। আর চোখের সামনেই ঐ বোগেন-ভিলিয়ার ফাগের স্তূপ দুটো।

স্কুমার এত অন্তমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে যে বীরেন্দ্র সিং যে খানিকটা এগিয়ে গেছেন সে হুঁস নেই। ঘুরে জিগ্যেস করলেন—"দাঁড়িয়ে পড়লেন যে ডাক্তারবাবু?"

স্কুমার নিজের মুগ্ধতায় একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, সরমাও পড়েছে দাঁড়িয়ে ওর দেখাদেখি, আর দাঁড়িয়েছেও দুজনে একটা শালের ছায়ায়। এইতেই স্কুমারের একটা ভালো উত্তর জুগিয়ে গেল, বললে—"এতখানিটা খোলা জায়গার মধ্যে দিয়েই এলাম তো, সরমার বোধহয় তাত লেগে গিয়ে থাকতে পারে রোদে।"

বীরেন্দ্র সিং অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন—"সত্যিই তো! এই দেখুন, ভয়ানক অন্তায় করে ফেলেছি, ঝোঁকের ওপর আপনাদের এক সঙ্গেই সবটা দেখাতে গিয়ে। বড়ই অন্তায় হয়ে গেছে। একটু বসুনই না হয় উনি ঐ পাথরের চাঁইটার ওপর, আমি হাসপাতাল থেকে একটা ছাতা জোগাড় করে নিয়ে আসছি। সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে। এঃ!"

—একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন।

সরমা সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেল যেন, বললে—"আমার কিছু হয় নি, আমি তো মনে করছিলাম নদীর চরে নামব; বলব আপনাদের। আমায় একেবারে বাবু করে দিয়ে উনি সেটুকু নষ্ট করে দিলেন, এইটুকুতে এমন কি রোদ লাগবে?"

একটু হেসে জোর করেই ছায়ার মধ্যে থেকে চলে এল। স্কুমারও অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে, এতটা যে চঞ্চল হয়ে পড়বেন বীরেন্দ্র সিং তা ভাবতে পারে নি। এগিয়ে এসে চলতে চলতে বললে—"তবে ঠিক আছে। চলুন, আর সত্যি রোদের তাত সেরকম হয়নি তো।"

একটু ঘুরে, বাগানটা দক্ষিণে রেখে ওরা হাসপাতালের দিকে গেল। এটা আগাগোড়া ইটের বাড়ি, পাশাপাশি চারখানা বড় বড় ঘর, দুদিকে বারান্দা, সবশুটা বেশ

তকতকে ঝকঝকে। এটা ইন্‌ডোর, আউটডোরের জন্যে একটু সরে আর একটা ঘর।

এদের দুজনের বলা সত্ত্বেও বীরেন্দ্র সিং ভেতরে ভেতরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি একটু দেখিয়ে, ডাক্তার নার্স যে দু'একজনের সঙ্গে দেখা হোল তাদের পরিচয় দিয়ে নেমে এলেন; গাড়িটা ঘুরিয়ে অন্যদিক দিয়ে নিয়ে এসেছিল, সকলে গিয়ে উঠে বসলেন।

(সাত)

রাত্রে আহারাদির পর দুজনে বারান্দায় বসেছিলেন। কালকের পথশ্রান্তি তো নেই-ই, দুপুরে গা ঢেলে আরামও করেছেন দুজনে, সুতরাং বিছানার টান নেই, বসে বসে গল্প হচ্ছিল। প্রথমটা এলোমেলো ভাবেই হচ্ছিল, যখন যে-বিষয়টা আপনি এসে পড়ছিল তাই নিয়ে, তারপর বীরেন্দ্র সিং এক সময় হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠলেন—"আমার স্কুল আর হাসপাতাল কেমন লাগল বলুন ডাক্তারবাবু?"

প্রশ্নের ভঙ্গির মধ্যে কোথায় কি একটু ছিল, সুকুমারের যেন মনে হোল, হঠাৎ করলেও এই প্রশ্নই ওঁর মনটাকে এতক্ষণ পর্যন্ত যেন আলোড়িত করছিল; উত্তর করলে—"শুধু ভালো বললে সবটা বলা হয় না, বীরেন্দ্রবাবু। আপনি যেন একটা স্বপ্নপুরীর মধ্যে রয়েছেন—যার সবই ভালো, সবই কল্যাণ। আমি অবশ্য সমস্ত জায়গাটা মিলিয়ে বলছি—শুধু হাসপাতাল বা শুধু স্কুল তো বহু জায়গায়ই আছে—আশ্রম-স্কুলও।"

বীরেন্দ্র সিঙের দৃষ্টিটা একটু ভাবাবিষ্ট হয়ে উঠল, বাইরের জ্যোৎস্নায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, সুকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—"আপনার 'স্বপ্নপুরীর' কথাটায় আমার মনে পড়ে গেল—সত্যিই আমি এখানে স্বপ্ন দেখি ডাক্তারবাবু, কিন্তু আমার স্বপ্ন মাঝে মাঝে ভেঙে যায়। এ যা স্বপ্ন, এর সাথী চাই, সেইখানেই হয়েছে আমার অভাব। একেবারে যে নেই তা বলব না, ঐ মাস্টারমশাই আছেন, যাঁকে দেখলেন; উনি স্বপ্নটা আমার চেয়ে আরও বেশি করেই দেখেন, উনি রয়েছেন বলেই এটুকু দাঁড়িয়েছে আর বজায় রয়েছে; কিন্তু বয়েস হয়েছে ওঁর, মনের সঙ্গে দেহ সব সময় পাল্লা দিতে পারে না। বাকি যা সব—তারা আসছে যাচ্ছে; বিশেষ করে ডাক্তার; প্র্যাকটিসের জায়গা নয় এতো বুঝতেই পারছেন, কাজেই তাঁদের ধরে রাখা দায়, হাসপাতালের আমার খুবই ক্ষতি হয়।"

চুপ করে রইলেন; কথাটার মধ্যে যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে তাইতেই যেন সঙ্কুচিত করে দিলে খানিকটা, সুকুমারও চুপ করে রইল। একটু পরে চেষ্টা করে সঙ্কোচটা কাটিয়ে উঠে বললেন—"একটা কথা ভাবছিলাম ডাক্তারবাবু, ভরসা দেন তো বলি।"

—মুখে একটু মৃদু হাসি লেগে রয়েছে। কি কথা সেটুকু আন্দাজ করতে দেরি হোল না সুকুমারের, বললে—"বলুন, অত কিন্তু হয়ে লজ্জা দিচ্ছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বললে—"বোধ হয় হাসপাতালে কাজ করবার কথা বলছেন···"

"হ্যাঁ, আমি অনেক ভেবেছি ডাক্তারবাবু। এর মধ্যে যে আমার নিজের স্বার্থ নেই তা বলতে পারি না, তবু বিশ্বাস করুন আপনার দিক থেকেও আমি কথাটা ভেবে দেখেছি—সেদিকে নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবেই···যখন থেকে আপনার স্ত্রীর এই অদ্ভুত অসুখটার কথা শুনলাম, আর যখন থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে অনুগ্রহ করে রাজি হলেন।"

সুকুমার একটু অন্যমনস্ক হয়ে শুনছে। পরশু থেকে যা হচ্ছে তার পেছনে যেন একটি অদৃশ্য হস্ত কাজ করে যাচ্ছে, সেই সমস্যা টেনে আনছে আবার সেই করে দিচ্ছে সুরাহা। এতবড় একটা সুযোগ সুকুমার তো কল্পনাও করতে পারত না।

তবু সমস্যা যা নিয়ে—তা তো সঙ্গের সাথী হয়েই থাকবে। সেই কথাটা ভালো করে জানিয়ে রাখাই উচিত; বললে—"আপনি যে এত চিন্তা করছেন আমার কথা নিয়ে, তার উপায় করেও দিতে প্রস্তুত, সেজন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ বীরেন্দ্রবাবু; কিন্তু আপনার যেমন স্বার্থের কথা বলছেন, তেমনি আমারও তো একটা স্বার্থ আছে। বরং আপনার স্বার্থ নিঃস্বার্থ, আর আমার যা স্বার্থ—এই আমার ভালো-মন্দ, এটা আমার জীবনেরই একটা অঙ্গ; এই প্রতিবন্ধক সঙ্গে নিয়ে আমি পারব কি পূর্ণভাবে আপনার কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে?"

"এও তো আমারই স্বার্থ ডাক্তারবাবু, এঁকে আরোগ্য করে তোলা। আর সব রোগীর মতোই ইনি তো অসুস্থ

হয়ে আমার আশ্রয়ে এসেছেন; না হয় হাসপাতালে নাই রইলেন। আপনি যদি আর কোনও দিকে না চেয়ে শুধু ওঁকে নিয়েই থাকেন, আমারই স্বার্থ রক্ষা হবে না কি?"

বীরেন্দ্র সিং মুখের পানে চেয়ে একটু হাসলেন। উত্তরটা এত চতুর, তার সঙ্গে এত স্নিগ্ধভাবে মধুর যে সুকুমারও না হেসে থাকতে পারলে না; একটি সুমিষ্ট পরাজয়ের সঙ্গে সে হাসিতে আছে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। হেসেই বললে—"বেশ, রইলাম, কিন্তু কতদিনের জন্যে বলুন?—বাস্তবিক, চিরকালের জন্যে তো দস্তখৎ লিখে দেওয়া যায় না।"

এর উত্তরটাও বেশ চতুরতার সঙ্গেই দিলেন বীরেন্দ্রবাবু, হেসেই বললেন—"আপনার রোগী সুস্থ হয়ে উঠলেই চলে যাবেন···ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যেন দু'দিনেই সেরে ওঠেন উনি···"

জয়-পরাজয়ে উভয়ের মুখেই হাসি বেশ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল।

আশ্রম-স্কুলে শিক্ষকদের যে ঘর খালি পড়ে ছিল, তার মধ্যে একটি বেছে নিলে সুকুমার। বীরেন্দ্র সিং তাঁর ভবনের একেবারে একদিকে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন, সুকুমার চায় তো একেবারে আলাদা করেই, সে-ই কিন্তু রাজী হোল না। তার কারণ সরমার সুস্থ হয়ে ওঠাটাও তো একটা বিপদ; হঠাৎ কোন্ সময় স্মৃতির অন্ধকার কুহেলী যাবে গুটিয়ে, তার পরেই সর্বনাশ। সুকুমার অবশ্য প্রত্যাখ্যান করলে অন্য কথা বলে,—এ যে—মনের রোগী, তাতে তার এমন স্থানেই থাকা উচিত এবং এমন অবস্থার মধ্যেও—যার সঙ্গে তার পূর্বজীবনের, সম্পূর্ণ না হোক, তবু খানিকটা মিল আছে। কথাটা সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু ডাক্তারের মুখ থেকে বেরোনয় বীরেন্দ্র সিং আর জিদ করতে পারলেন না। হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ডাক্তারের একটি ভালো বাসা খালি ছিল; সেটাও নিল না। অসুখের কথাটা গোপনই রাখতে হবে, এক যা বীরেন্দ্র সিং জানলেন—সুতরাং অপর ডাক্তারের দৃষ্টি থেকে যতদূরে থাকা যায় এবং যতক্ষণ থাকা যায় ততই নিরাপদ।

যে-বাসাটা বেছে নিলে সেটি আশ্রমের হয়েও আশ্রম থেকে একটু আলাদা। তার ঠিক পিছনটিতে শালবনের খানিকটা এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, এইটুকু আশ্রমের অন্যান্য অংশ থেকে বাসাটিকে কতকটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, খানিকটা ঘুরে গিয়ে পৌছুতে হয়। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, এখানে-ওখানে কয়েকটা শিলাস্তূপ—এসব জায়গায় যা খুব সাধারণ—তারপরেই বেশ খানিকটা নিচু ঢালুর পর বিস্তীর্ণ হ্রদটা। বাসাটা তেমন কিছু নয়, তবে জায়গাটি মনোরম, বিশেষ করে তার পক্ষে—যে মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে একটু ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে থাকতে চায়। আশ্রমের শিক্ষক হরিশঙ্করবাবু ছিলেন একটু কবি-ভাবাপন্ন, তিনিই জায়গাটি পছন্দ করে বাসাটা করান আশ্রমের গোড়াপত্তনের সময়; তারপর একবার ছুটিতে গিয়ে কি কারণে আর ফেরেন নি।

বাসাটার একটা সুবিধে এই যে, এখানে যে থাকবে তার গায়ে পড়ে কেউ ঘনিষ্ঠতা করতে চাইবে না; ধরে নেবে লোকটা কবিই হোক বা মানব-বিদ্বেষী সিনিক্ই (cynic) হোক্, ভেজাল পছন্দ করে না।

রসুই করবার জন্যে রাখলে একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বিলটুর-মা—এদিককার ব্রাহ্মণী, বীরেন্দ্র সিংই ব্যবস্থা করে দিলেন। দৈবও একটু অনুকূল হোল; স্ত্রীলোকটি কালা। তাকে বোঝাতে একটু বেগ পেতে হয় বটে, তবে সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বোঝবার চেষ্টা করে না, কান ঠিক থাকলে যা করতই স্ত্রীসুলভ কৌতূহল বশে। বিলটুর-মা'র শোবার ব্যবস্থা হোল সরমার ঘরে।

নির্বাচনটা যে চারিদিক দিয়েই ভালো হয়েছে—জায়গার দিক দিয়ে, আবার মানুষের দিক দিয়েও, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সরমার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে এসেই নিজের ঘর-সংসার পাতার কাজে লেগে গেল, মেতে উঠল বলাই বরং আরও ঠিক হবে। এও এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলে সুকুমার, নীড় রচনার সহজ প্রেরণাটা মেয়েদের মধ্যে যে এত প্রবল তা এরকম প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে দিয়ে আর কখনও উপলব্ধি করতে পারে নি সুকুমার। মনের মধ্যে কিসের যেন একটা জোয়ার এসে গেছে সরমার, তারই অজস্র প্রবাহে বিস্মৃতির ওদিক থেকে স্মৃতির টুকরা-টাকরাও আনছে ভাসিয়ে। ঘর সাজাবার জিনিসপত্র এখানে আর

কি পাওয়া যাবে ?—বৈঠকখানার সোফা-সেটা থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘরের বঁটি পর্যন্ত সমস্তই সরবরাহ হোল বীরেন্দ্র সিঙের বাড়ি থেকে। সেগুলা যথাস্থানে সন্নিবেশ করতে আরম্ভ করলে অবশ্য সুকুমারই, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সরমা তার পাশে এসে দাঁড়াল, ক্রমে সাহায্যও করতে আরম্ভ করলে।

এই ধরণের বিস্ময়কর ব্যাপারও ঘটতে লাগল—

বৈঠকখানাটি সাজানো হয়েছে। একটি বেশ ভালো কার্পেট, মাঝখানে মিনার কাজ-করা পিতলের টপ্ বসানো একটি ছোট গোল টেবিল ; একদিকে একটি সুদৃশ্য সোফা, বাকি তিন দিকে তিনটি কুশন-চেয়ার। পর্দা ঝোলানো হয়েছে, গোটকতক ছবিও হয়েছে টাঙানো ; ঘরটি ফিট-ফাট।

সাজানোর মধ্যে সরমা বরাবর ছিল ; সোফাটা কোন্ মুখে বসানো ঠিক হবে সে-সম্বন্ধে মত দিয়েছে, কোন্ ছবিটা কোনখানে, সে সম্বন্ধেও ; উৎসাহের মুখে এমন দু'একটা কথাও ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, যা একেবারেই আশা করা যায় না। সাজানো-গোছানো সব কিন্তু যখন শেষ, চারিধারে চেয়ে চেয়ে মাঝে মাঝে ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল।

সুকুমার ওর সব গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রেখেছে, অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে, দেখলে কয়েকবারই ঘর থেকে বারান্দায় গিয়ে কপালে চারটি আঙুল চেপে দাঁড়িয়ে রইল, কিছু চেষ্টা করে মনে করবার হ'লে যেমন করে, তারপর আবার ঘরে এসে ঘুরে ফিরে কি যেন একটা খুঁজতে লাগল।

দরকার ব'লে চেষ্টা করতে দিলে একটু সুকুমার, তারপর বললে—"তোমার হিসেবে কিছু যেন একটা খুঁৎ রয়েছে ঘরে এখনও, ধরতে পারছ না ? আমার তো মনে হচ্ছে সব ঠিক আছে।"

সরমা আর একবার ভালো ক'রে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ওর মুখের পানে চাইল, বললে—"না, একটা কিছু খুঁৎ আছেই, আমি বের করবই, এই বলে রাখলাম।"

একটু হাসল।

সুকুমারও একটু হেসে বললে—"এই নিয়ে আমাদের না হয় একটা বাজি রাখা যাক, আজ সমস্ত দিন সময়, তার মধ্যে যদি না ধরা যায় তো…"

বলতে বলতে পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বের করে একটা ঠোঁটে চেপে ধরেছে, সরমা উৎফুল্লভাবে বলে উঠল—"দাঁড়াও, জিৎ! পেরেছি ধরতে!…"

সঙ্গে সঙ্গেই আবার মুখের দীপ্তিটা গেল নিভে, হারানো জিনিষটা যেন বিদ্যুৎ বিকাশে একবার ঝলকে উঠেই আবার গাঢ়তর অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে গেল।

সোফা-চেয়ারের চারিদিকে চোখ দুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি খুঁজতে লাগল আবার, দৃষ্টি বড় করুণ, তারপর কি ভেবে প্রজ্জ্বলিত সিগারেটটার দিকে চাইতে সেই দৃষ্টি আবার ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সোফার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বললে—"জিতেছি! ছোট, কাচের টপ দেওয়া টুল—তার ওপর থাকবে অ্যাশ-ট্রে—তিনটে লাগবে—সোফার দু'ধারে দুটো আর ওদিকে একটা। …কেমন, ঠিক ধরি নি ?"

—ব্যাপারটা খুবই সামান্য, এমন কি এই আসবাবের টুকরাটুকু খুব প্রয়োজনীয়ও নয়, আজকাল একটু বেশি চালু হয়েছে এই যা ; তবু বিস্মৃত অতীত থেকে এই জিনিষটা খুঁজে বের করা নূতন ফ্যাসানের এই অসামঞ্জস্যটুকু ধরা সামান্য কথা নয় সরমার পক্ষে, তার ওপর ঐ "অ্যাশ-ট্রে" কথাটা, ঐটেই বেশি আশ্চর্যজনক বলে মনে হোল সুকুমারের, প্রশ্ন করলে—"কি রাখবার জন্যে বলছিলে ?"

"অ্যাশ-ট্রে গো, অ্যাশ-ট্রে, সিগারেটের ছাই ঝাড়বার জন্যে ; দরকার তোমাদের, অথচ মনে করে রাখতে হবে আমায়!…"

ষোল আনা বিজয় ; তারই হাসি হাস্‌লে সরমা।

যেন এই ছিদ্র-পথেই জীবনের আরও কতগুলা বিস্মৃত জিনিষ ধীরে ধীরে স্মৃতির আলোয় বেরিয়ে এল। বাসায় আসবার সপ্তাহ খানেক পরেই সরমা নিজের ঘর গুছিয়ে-নিয়ে একরকম পরিপূর্ণভাবেই তার অধিষ্ঠাত্রী হয়ে বসল।

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভব ও মোহিনী

উমা ও গণগণের সহিত শিব নারায়ণের নিকট আসিয়া বলিলেন—তোমার ঐ মোহিনী মূর্ত্তির এত খ্যাতি শুনিতেছি তাহা আমাদের দেখাও। নারায়ণ তাহা দেখাইতে স্বীকার করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। উমামহেশ্বর চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অদূরে সেই অপূর্ব্ব স্ত্রী মূর্ত্তি দেখিলেন। (ভাগবতী বর্ণনার সংক্ষেপানুবাদ)

উমা-মহেশ্বর তাহাকে বিচিত্র পুষ্পারুণ-পল্লবদ্রুমযুক্ত উপবনে আবির্ভূতা দেখিলেন। কন্দুক লইয়া ক্রীড়াশীলা মোহিনীর নিতম্বপরিবৃত দুকূলের উপরি মেখলা শোভা পাইতেছে। শরীরের নমন ও উন্নমনের ফলে স্তনদ্বয় কম্পিত হইতেছে, তাহাতে বক্ষের হার যেন প্রতিপদে ছিন্নপ্রায় দেখাইতেছে। ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল কন্দুকের চাপল্যবশত তাহার আয়ত লোচনের তারকা উদ্বিগ্নভাব দেখাইতেছিল। নিবিড়নীল অলকদাম তাহার আননশোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। নৃত্যশীল উজ্জ্বল কুণ্ডল তাহার গণ্ডদেশে ঝলমল করিতেছিল। কন্দুক নৃত্যের ফলে কখনও তাহার বসন শিথিল হইতেছিল, কখনও কবরী স্খলিত হইতেছিল। মনোহর বাম করে তাহাদিগকে সংযত করিতেছিলেন। অপর করে কন্দুক চালনা করিতেছিলেন। এই-রূপে তিনি আত্মমায়া দ্বারা জগৎকে মোহিত করিতেছিলেন।

মহাদেব মোহিত হইলেন।

তিনি ভুলিলেন—উমা সঙ্গে আছে।

তিনি ভুলিলেন—গণগণ সঙ্গে আছে।

মোহিত মহাদেব মোহিনীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এমন সময়ে প্রতিকূল পবন মোহিনীর বসন অপহরণ-প্রায় করিল। তিনি দ্রুত এক বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন।

মুগ্ধ মহাদেব তাহাকে সেখানে গিয়া ধরিলেন। মোহিনী দ্রুত নিজেকে মুক্ত করিলেন এবং অন্তর্দ্ধান হইলেন।

শম্ভু তখন আত্মস্থ হইলেন।

যোগেশ্বরেশ্বর মহাদেবের এই বিভ্রম কি সত্য? বা মোহিনীর অপরূপ রূপলাবণ্যের প্রশংসাপত্র।

পরবর্ত্তী যুগে শ্রীকৃষ্ণের রূপে গুণে যে বৃন্দাবনবাসী নরনারীগণ মুগ্ধ থাকিত, ব্রজের পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত মোহিত হইত, মোহিনীর রূপ—সেই অনাগত কৃষ্ণরূপমাধুরীর পূর্ব্বাভাষ মাত্র দেয়।

কাল-যবন বধ (ভাগবতে)

গ্রীক চরিত লেখক প্লুটার্ক (Plutarch) স্বীয় পিলোপিডাসের চরিত বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠ সেনাপতির গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ সৈন্যনায়ক সকল সময়ে নিজের সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতেই ব্যস্ত থাকেন না। প্রয়োজন হইলে তিনি নিজ জীবন যেন অতি তুচ্ছ বস্তু এরূপভাবে উহাকে অশেষ বিপদের মুখে নিপতিত করেন, আবার প্রয়োজন মনে হইলে তিনি কুণ্ডলীকৃতলাঙ্গুল সারমেয়ের মত পলায়ন করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না।

শ্রীকৃষ্ণও এই শ্রেষ্ঠ সৈন্যনায়ক-গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ভূয়োভূয় অসীম সাহস ও বীরত্বের কার্য্য করিয়াছেন। আবার কখনও কখনও পলায়নও করিয়াছেন।

কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাদবগণকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কংসের শ্বশুর মহাপরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধ পুন পুন মথুরা আক্রমণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে যাদবগণ তাহাকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া পলায়িত করিলেন। এরূপ একবার আক্রমণ প্রতিরোধ করার পর শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন জরাসন্ধের সৈন্যসংখ্যা প্রভূত, তিনি আবার নূতন সৈন্য লইয়া মথুরা আক্রমণ করিতে আসিবেন। এই ভাবিয়া তিনি রাজধানী মথুরা হইতে দ্বারকায় সুদৃঢ় নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে-ছিলেন। এমন সময় জরাসন্ধ-বন্ধু যবনরাজ কাল-যবন বহু সৈন্য লইয়া মথুরা অবরোধ করিল। শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তভাবে যাদবগণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। তিনি নিজে নিরস্ত্র অবস্থায় কাল-যবনের সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া বন মধ্য দিয়া পলায়নপর হইলেন। যবনও বীর পুরুষ; তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিরস্ত্র দেখিয়া নিজেও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণকে বাহুযুদ্ধে নিহত করিয়া বন্ধুকার্য্য সাধন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের পলায়নের হেতুর একটু পূর্ব্ব কাহিনী ছিল। কাল-যবনের পিতা যদুগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া মহাদেবকে প্রসাদিত করিয়া যদু-ভীষণ পুত্র কাল-যবনকে লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের ভক্ত, তিনি তাহার কথা ব্যর্থ করিতে পারেন না। এজন্য যবন তাহার অবধ্য। এই জন্যই তিনি পলায়ন করিতে লাগিলেন।

যবন শ্রীকৃষ্ণকে রোষিত করিবার জন্য নানা কটুবাক্য বলিতে বলিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কখন যেন ধরা পড়েন ভাব দেখান এবং পুনরায় দৌড়াইয়া দূরে গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তাহারা এক পর্ব্বতের সানুদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। পর্ব্বতের এক গুহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ লুক্কায়িত হইলেন। যবন গুহায় প্রবেশ করিয়া এক শয়ান পুরুষকে দেখিলেন। তিনি ভাবিলেন কৃষ্ণ নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া আছেন। তিনি তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া পদাহত করিলেন। নিদ্রিত পুরুষ জাগ্রত হইয়া যবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া মরিয়া গেল।

নিদ্রিত পুরুষছিলেন ইক্ষাকুবংশীয় রাজা মুচুকুন্দ। তিনি বহু যুগ পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যার্থ অসুরগণের সহিত অনেক দিন যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে নিরাপদ করেন। ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাহাকে বর লইতে বলিলেন। রাজা বলিলেন, আমি বহুকাল অনিদ্রায় যুদ্ধ করিয়া নিজেকে অত্যন্ত নিদ্রাতুর মনে করিতেছি। আমি যাহাতে বহুকাল নিরাপদে নিদ্রা যাইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করুন।

ইন্দ্র সেই গুহায় তাঁহার নিদ্রা যাইবার স্থান নির্দেশ করিলেন এবং যে কেহ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবে সে তখনই ভস্মীভূত হইবে বলিলেন।

মুচুকুন্দের এই নিদ্রার কথা শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন এবং এই জ্ঞানের সাহায্যেই যদুকুলের অবধ্য কালযবনের বধোপায় বিধান করিলেন।

ভাগবতে রুদ্রমোক্ষণ

মহাদেব আশুতোষ। তিনি অতি সহজেই তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া থাকেন। তাহাকে তুষ্ট করিয়া রাবণ ও বানাদি যখন মহাশক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া জগতের পীড়ার কারণ হইয়া পড়িল, তখন বিষ্ণুকে নানা উপায় বিধান করিয়া জগৎত্রাণ করিতে হইয়াছিল।

বৃক নামক এক অসুর নারদকে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করিয়া আমি শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করিতে পারি? নারদ বলিলেন—মহাদেবের উপাসনা কর তিনি অল্প গুণদোষেই তুষ্ট অথবা কুপিত হন। বৃকাসুর নিজ মাংস কাটিয়া, অগ্নিতে আহুতি দিয়া শিবারাধনা করিতে লাগিল। কিছুদিন গত হইলে কোনও ফল না পাইয়া সে নিজ শির কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার উপক্রম করিল। সহসা হোমাগ্নি হইতে উত্থিত হইয়া মহাদেব তাহাকে নিবারণ করিলেন। তাহার পূর্ব্বের ক্ষত শরীর স্বাভাবিক হইল। শিব বলিলেন—লোকে ভক্তিভরে আমাকে তোয়মাত্র দিয়া পূজা করিলে আমি তুষ্ট হই। তুমি নিজ শরীরের এরূপ পীড়াকর কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার যথাভিলষিত বর গ্রহণ কর। তখন সেই দুরাত্মা ভূতভয়ঙ্কর বর প্রার্থনা করিল। বলিল, যাহার মস্তকে আমি হস্ত দিব সে মরিবে এই বর দিন। রুদ্র ক্ষণকাল বিমনা থাকিয়া তথাস্তু বলিয়া সেই বর দিলেন।

তখন বৃকাসুর সেই বর পরীক্ষার্থ (এবং গৌরীহরণ লালসায়) মহাদেবের শিরে হস্ত স্থাপন করিতে অগ্রসর হইল। শিব ভীত হইয়া পলায়নপর হইলেন। অসুর তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। অন্য দেবগণ ইহার প্রতিকার উপায় না জানিয়া রুদ্রের কোনও সাহায্য করিতে পারিলেন না। অনেক ঘুরিয়া রুদ্র বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া নারায়ণের আশ্রয় লইলেন। কৃষ্ণ এক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-বটুর মনোহর বেশ ধারণ করিয়া বৃকাসুরের সম্মুখীন হইলেন।

তিনি অতি মধুর ভাষায় অসুরকে বলিলেন, দূরাগমন হেতু আপনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছে। ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। পুরুষের সর্ব্বকাম সাধনোপায় এই শরীরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আর যদি আপনার বক্তিতে কোনও কার্য্য না থাকে তাহা হইলে কি প্রয়োজনে এই শ্রমকর ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা বলুন। অনেক সময় অপরের সহায়তায় অনেক কাজ সহজেই সম্পন্ন হয়। তাহার মধুর বাক্যে মোহিত হইয়া অসুর সকল কথা ব্যক্ত করিল। ছদ্মবেশী কৃষ্ণ বলিলেন, দক্ষের শাপে রুদ্র প্রেত-পিশাচরাজ হওয়ার পর হইতে আমরা তাহার কথায় আর শ্রদ্ধাবান নহি। তাহার কথাটা যে মিথ্যা এই প্রমাণ করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে আর তিনি এরূপ বর না দেন তাহার ব্যবস্থা করুন। আপনার নিজের মাথায় হাত দিলেই ত অতি সহজে তাঁহার মিথ্যাবাদীত্ব প্রমাণ করিতে পারিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় মোহিত হইয়া অসুর যেই নিজের মস্তকে হস্তার্পণ করিল অমনি বজ্রাহতের ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হইল।

কৃষ্ণ শিবকে বলিলেন—হে দেবদেব মহাদেব, এই পাপাত্মা নিজের পাপেই বিনষ্ট হইল। জগৎগুরু ঈশ্বরের নিকট অপরাধ করিয়া কোন প্রাণী ক্ষেম লাভ করিতে পারে?

কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডব পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের যোগদান (মহাভারতে)

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য হইল তখন কুরু ও পাণ্ডব পক্ষীয়েরা স্ব স্ব দলে যোগ দিবার জন্য রাজন্য ও যোদ্ধৃবর্গের নিকট নিমন্ত্রণার্থ দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালীন প্রথামতে যাহারা যাহাকে আগে বরণ করিতেন, তাহাকে সেই পক্ষে যোগ দিতে হইত। রাজা শল্য নকুল সহদেবের মাতুল। তিনি পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে দুর্য্যোধনের দূত তাহাকে বরণ করায় তিনি কৌরবপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হইলেন। পাণ্ডবমাতা কুন্তী কৃষ্ণ বলরামের পিসি। আবার শ্রীকৃষ্ণের পুত্র দুর্য্যোধনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন বলদেবের শিষ্য ছিলেন; তাহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই উভয় সঙ্কটে বলদেব কোনও পক্ষে যোগ না দিয়া তীর্থ ভ্রমণে চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণেরও উভয় সঙ্কট। উভয়েই তাহার আত্মীয়। কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহার ভক্ত। বুদ্ধিবলে শ্রীকৃষ্ণ এই উভয় সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন।

কুরুপাণ্ডবেরা কখন আসিবেন শ্রীকৃষ্ণ তাহা সঠিক অনুমান করিলেন। দৌবারিকগণকে বলিলেন—উভয় দলই আত্মীয়, অতএব তাহাদের অবারিতদ্বার প্রবেশের ব্যবস্থা করিবে। তিনি যে পর্য্যঙ্কে শায়িত হইলেন তাহার মস্তক দেশে এক রত্নময় বিচিত্র সিংহাসন স্থাপন করিলেন। ঘরে অন্য বসিবার আসন রহিল না।

প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। মণিময় সিংহাসন দেখিয়া প্রীত হইলেন। ভাবিলেন তাহারই অভ্যর্থনার জন্য ঐ সিংহাসন রক্ষিত হইয়াছে। উহাতে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন, তাহার কার্য্য সিদ্ধ হইল কারণ তিনিই ত অগ্রে আসিয়াছেন। অল্পক্ষণ পরে অর্জুন আসিলেন। ঘরে অন্য আসন না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পায়ের

দিকে পর্য্যঙ্কে যে একটু স্থান ছিল তাহাতে উপবেশন করিলেন। উভয়েই কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি সামনে দেখিলেন অর্জুন। সখে, তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ। অর্জুন বলিল, আমি আপনাকে আমাদের পক্ষে বরণ করিতে আসিয়াছি। অর্জুনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দৃষ্টি দুর্য্যোধনের দিকে পড়িল। বলিলেন, মহারাজ আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন; কেমন আছেন। দুর্য্যোধন বলিলেন—আমি অর্জুনের অগ্রেই আপনাকে বরণ করিতে আসিয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তাইত মহা শঙ্কটে পড়া গেল। একজন আমাকে আগে বরণ করিয়াছে, আর একজন আমাকে আগে বরণ করিতে আসিয়াছে। যা একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। আপনারা উভয়ে আসুন আমার সৈন্য দিগের রণচর্চ্চার ব্যবস্থা আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য করিয়াছি। কৃষ্ণসৈন্যগণ নানাবিধ যুদ্ধ সংক্রান্ত ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল। তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত, কৃষ্ণেরই মত পরিচ্ছদ ও আয়ুধধারী। দুর্য্যোধন তাহাদিগের নৈপুণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে মন্ত্রণাগারে লইয়া বলিলেন—এই যুদ্ধে একদিকে আমি থাকিব, আর অপরদিকে আমার এই সুশিক্ষিত সৈন্য দল থাকিবে। আর আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না।

আমি মনে করিতেছি এই ব্যবস্থার দ্বারা কোনও দলের দিকেই আমার পক্ষপাতিত্ব করা হইবে না। অর্জুন বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া তাহার উপরই প্রথম নির্ব্বাচনের ভার দিতেছি। অর্জুন, তুমি এ দুইয়ের মধ্যে কোনটি মনোনয়ন করিলে। অর্জুন বলিল—কৃষ্ণ আমি আপনাকেই নির্ব্বাচন করিলাম। দুর্য্যোধনও এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিলেন—কৃষ্ণ যখন যুদ্ধ করিবেন না তখন তাহাকে লইয়া কি হইবে। নারায়ণী সৈন্য লাভই পরম লাভ। তিনি নারায়ণী সৈন্য লইয়া পরম আনন্দে স্বপুরে প্রস্থান করিলেন।

দুর্য্যোধন চলিয়া যাইবার পর কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—কি বুদ্ধি লইয়া অযুদ্ধমান আমাকে বরণ করিলে। অর্জুন বলিলেন—কৃষ্ণ আপনি পূর্ব্বেই মহাবীরত্বের খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আমি এই যুদ্ধে সেই খ্যাতি অর্জন করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে চাই। আপনি আমার সারথির কার্য্য স্বীকার করুন। কৃষ্ণ তাহাই করিলেন।

দুর্য্যোধন বাহুবল পাইয়া নিজেকে সমধিক সৌভাগ্যশালী ভাবিলেন। অর্জুন বুদ্ধিবল পাইয়া নিজেকে সৌভাগ্যশালী ভাবিলেন।

কে জিতিল?

ব্রাড্‌লে

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

বস্তু ও তাহার গুণাবলীর ব্যাবৃত্তিদ্বারাও সৎবস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বস্তুর বিভিন্ন গুণের মধ্যে কোনও একটিকেই সেই বস্তু বলা যায় না। গুণ ভিন্ন বস্তুর মধ্যে আর কিছুই নাই। পরস্পর-সম্বন্ধরূপে গৃহীত বিভিন্ন গুণের সমষ্টিকে বস্তু বলা যাইতে পারে। কিন্তু গুণ কি? গুণ ও তাহাদের সম্বন্ধ যে কি, তাহার স্পষ্টধারণা করা যায় না। সম্বন্ধ হইতে স্বতন্ত্র ভাবে গুণের কোনও অর্থ নাই। বিভিন্ন গুণের মধ্যে সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত করিলে, গুণ সকল শূন্যে বিলীন হইয়া যায়—কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আবার সম্বন্ধের সমষ্টিকেও গুণ বলা যায় না। সম্বন্ধ বলিতে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধই বুঝায়। সুতরাং গুণের অস্তিত্ব যেমন আবশ্যিক, তাহাদের সম্বন্ধও তেমনি আবশ্যিক বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা বোধগম্য হয় না। প্রত্যেক সম্বন্ধ পদার্থের দ্বিবিধরূপ—একরূপে তাহা সম্বন্ধের ভিত্তি, দ্বিতীয় রূপে তাহা সম্বন্ধের সৃষ্টি। ইহা অবোধ্য। পদার্থবর্জিত সম্বন্ধ একটা শব্দ মাত্র। সম্বন্ধ থাকিলেই সম্বন্ধ পদার্থ থাকিবে। কিন্তু পদার্থ সম্বন্ধের বাহিরে অবস্থিত। তাহা হইলেও পদার্থ যে তাহার সম্বন্ধদ্বারা কোনও রূপেই প্রভাবিত নহে, তাহ' বলা যায় না। পদার্থ ও তাহার সম্বন্ধের মধ্যে সংযোগ-সূত্র কি? এই সংযোগ-সূত্রের আবিষ্কারের জন্য আবার নূতন সম্বন্ধের আবিষ্কার করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। ইহার পরে আবার এই নূতন সম্বন্ধ এবং তাহা দ্বারা সম্বন্ধ পদার্থের মধ্যে যোগসূত্রের অনুসন্ধান করিতে হয়। ইহা হইতে বোঝা যায়, যে পদার্থ ও তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধদ্বারা কেবল প্রতিভাসই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এই ভাবে ব্রাড্‌লে দেশ, কাল ও গতিকে প্রতিভাস বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ইহাদের কোনটিই সৎ নহে। পরিণাম অথবা বিকার (change) সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যাহার বিকার হয়, তাহা স্থায়ী হইতে পারে না; আবার স্থায়ী যদি না হয়, তাহা হইলে বিকার হয় কাহার? "ক" যেরূপ আছে সেইরূপই যদি থাকে তাহা হইলে তাহার বিকার হয় না বলিতে হইবে। "ক"র বিকার যদি হয়, তাহা হইলে তাহা ক্রমশঃ $ক_1$, $ক_2$, $ক_3$ তে পরিণত হয়, সুতরাং 'ক'র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। স্থায়িত্ব ও বিকারের সামঞ্জস্য কিরূপে বিধান করা যাইতে পারে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। সাধারণতঃ একবার একদিকে, দিকে,

একবার বৈচিত্র্যের দিকে চক্ষু ঘুরিয়া আমরা সেই সংকট-এড়াইতে চেষ্টা করি, কিন্তু তাহাদ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না। বস্তুর পরিণাম হইতে সৎ সম্বন্ধে সত্য ধারণা পাওয়া অসম্ভব।

কারণত্ব দ্বারাও সতের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় না। যখন 'ক'কে 'খ'এর কারণ বলা হয়, তখন 'খ' 'ক'র পরবর্ত্তী। কিন্তু "পরবর্ত্তী কালে "খ"র উদ্ভব" এবং 'ক' এক পদার্থ নহে। 'ক' হইতে 'খ' সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ অবস্থায় 'ক'এ 'খ'র আরোপ করা যায় কিরূপ? কালের পরবর্ত্তিতা ও কারণ যদি বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সংযোগসূত্র কোথায়, তাহা অবোধ্য। কার্য্য ও কারণের মধ্যে যদি ভেদ না থাকে, তাহা হইলে "কারণত্ব" বলিয়া কিছুই থাকে না। যদি বলা হয় 'ক' একাকী, 'খ'র কারণ নাই, 'গ'র সহিত সংযুক্ত 'ক'ই 'খ'র কারণ, তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে 'গ'র সহিত মিলনে 'ক'এর কোনও ইতর-বিশেষ হয় কিনা। যদি হয়, তাহা হইলে 'ক'এর মধ্যেই তো বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, এবং 'ক'এর মধ্যেই কারণত্বের সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে। এই বিকারের কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য আমাদিগকে আবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অনুসন্ধান করিতে হয়। পার্শ্বেও অনুসন্ধান করিতে হয়। কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমানে সমগ্র জগৎকে কোন মুহূর্ত্তেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। আবার 'গ'র সহিত মিলনে যদি 'ক'র কোনও ইতর-বিশেষ না হয়, তাহা হইলে 'ক'র সহিত মিলিত হইয়া 'গ' যে কিরূপে 'খ'র উৎপত্তি করিতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না। ইহা ব্যতীত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের সহিত কাল অবিচ্ছেদ্য সংবন্ধে সংবদ্ধ। কালের মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ নাই; সন্তত কাল অবিচ্ছেদে প্রবাহিত, কাল অখণ্ড। কিন্তু কাল সন্তত ও অখণ্ড হইলেও, তাহা সসীম ক্ষণের সমষ্টি; সসীম ক্ষণের সংখ্যা অনন্ত, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষণ অন্যান্য ক্ষণ হইতে স্বতন্ত্র। কালের সন্ততি ও তাহার ক্ষণসকলের এই স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য হয় না। ইহা হইতে কালও যে প্রতিভাস মাত্র, সৎবস্তু নহে, তাহা অনুমিত হয়।

দেশ-সম্বন্ধে কোনও স্বয়ং-সম্পূর্ণ ধারণা অসম্ভব। ইহা ইহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ বটে, আবার সম্বন্ধ নহেও বটে। দেশ অবিচ্ছিন্ন; কোথাও ব্যবধান নাই; ইহা "এক।" আবার ইহার অসংখ্য অংশও আছে, সেই সকল অংশ পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। প্রত্যেক অংশ আবার বহু অংশে বিভক্ত; এই বিভাগের শেষ নাই। অংশ যতই ক্ষুদ্র হউক, তাহাও বিভাজ্য, এই সকল অংশের মধ্যেও সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যাহাই দেশ-ব্যাপী, তাহা ক্ষুদ্রতর, দেশ-ব্যাপী অংশের সমষ্টি। উপরের দিকেও দেশ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া চলিয়াছে। এই বৃদ্ধির অন্ত নাই, সীমা নাই। আবার কেবল ব্যাপ্তির ধারণা করা যায় না—কোন ব্যাপ্ত বস্তু বর্জ্জন করিয়া, ব্যাপ্তির ধারণা অসম্ভব। এই ব্যাপ্তির সহিত দ্রব্য কিভাবে সম্বদ্ধ, তাহাও বোধগম্য নহে। কাল-সম্বন্ধেও এই যুক্তি প্রযোজ্য।

এই সকল বিবেচনা করিলে, বস্তু বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দ্রব্য, গুণ, সম্বন্ধ, দেশ, কাল, কার্য্যকারণ সম্বন্ধই যদি স্ববিরোধদুষ্ট হয়, সকলই যদি প্রতিভাস মাত্র হয়, তাহা হইলে বস্তুর আর কি অবশিষ্ট থাকে? সুতরাং যাহাকে বস্তু বলা হয়, তাহা প্রতিভাস-মাত্র।

ইহার পরে "অহং" কে (self) সৎ বলা যায় কিনা, ব্রাডলে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। কাহারও "অহং" বলিলে যদি তাহার অভিজ্ঞতার সমস্ত আধের বুঝায়, অর্থাৎ তাহার নিজের সম্বন্ধে তাহার ধারণা এবং অন্যান্য ব্যক্তি ও বস্তুর ধারণা ও তাহার স্বকীয় অনুভূতি প্রভৃতি সমস্তই বুঝায়, তাহা হইলে দেখা যায়, যে অভিজ্ঞতা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয় এবং যাহাকে অহং বলা হয়, তাহা কোনও নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে সীমাবদ্ধ নহে। যদি বলা হয়, যে বহু পরিবর্ত্তনের মধ্যে অভিজ্ঞতার যে-অংশ সাধারণ, সর্ব্বক্ষণেই যাহা বর্ত্তমান, তাহাই অহং (self) তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে এই সাধারণ অংশ যে কি, তাহা নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে। মানুষের জীবনে বহু মৌলিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়; এক সময়ে মানুষের জীবনে যাহা সাধারণ, অন্য সময়ে তাহা সাধারণ থাকে না। এই সকল বিভিন্ন আধেয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে একীভূত করা অসম্ভব। যদি বলা হয়, যে অন্তরঙ্গ এক অনুভূতি-কেন্দ্রই "অহমে"র সার, এবং তাহার বিশ্লেষণ অসম্ভব, তাহা হইলে অভিজ্ঞতার সাধারণ বিষয় হইতে এই অনুভূতি-কেন্দ্রকে পৃথক করিবার উপায় কি? অভিজ্ঞতার মধ্যে কতটুকু অহমের স্বরূপের অন্তর্গত, কতটুকু তাহার বাহিরে, তাহা বুঝিবার উপায় কি? যদি বলা হয়, আত্মানুসরণ, অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থার মধ্যে আপনার একত্বের বোধই অহং (personal identity) তাহা হইলে এই একত্ব-বোধের মধ্যে সাতত্য এবং গুণগত অভেদ উভয়ই বর্ত্তমান বলিতে হইবে। কিন্তু এই একত্বের প্রমাণ কি? স্মৃতিই একমাত্র প্রমাণ, কিন্তু অতি দুর্ব্বল প্রমাণ।

ইহার পরে ব্রাডলে বিষয়ী ও বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। সম্বন্ধ-বিহীন অনুভূতি-পুঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহা বিষয়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই বিষয়। সকল মানসিক অবস্থাই এইভাবে বিষয়ের রূপ ধারণ করিতে পারে। আবার যাহা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে অনহং (not self), তাহাও পরে অহমের অন্তর্গত হইতে পারে। যাহা এখন, স্পষ্টভাবে মনের মধ্যে নাই— মনের যে সকল আধেয়, সংকিদের অবচেতন স্তরে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা-দিগকেও অহমের মধ্যগত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ যে সকল অনুভূতি সমগ্র অনুভূতি-পুঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়াছে, তাহারা ভিন্ন অবশিষ্ট সকল অনু-ভূতিকেই অহমের অন্তর্গত বলিতে হইবে। সুতরাং অহং ও অনহমের আধেয় স্থির নহে। অহং ও অনহমের অধিকাংশই এক সময়ে অহমের অন্তর্গত, সময়ান্তরে অনহমের অন্তর্গত হইতে পারে।

অহমের যে কয়েক প্রকার অর্থ উপরে বর্ণিত হইল, তাহার কোনও অর্থেই অহং সৎ বস্তু নহে। ইহার সত্যতায় সন্দেহ না থাকিলেও, ইহা চরম সত্য নহে। যে অর্থেই ইহাকে গ্রহণ করা হউক না কেন, ইহা প্রতিভাস মাত্র। ইহাকে যদি সসীম বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, যে ইহার বহিঃস্থ বস্তুর সহিত ইহার যে সম্বন্ধ, তাহাদ্বারা ইহা প্রভাবিত হইতে বাধ্য; এই সকল সম্বন্ধ ইহার স্বরূপের অন্তর্গত বলিতে

হয় ; সুতরাং ইহাকে আর স্বাধীন বলিতে পারা যায় না। ইহা ব্যতীত ইহার স্বরূপও বোধগম্য হয় না। ইহাকে কেবল অনুভূতিপুঞ্জ বলিয়া ধরিয়া লইলে, বহুর সমবায়ে কিরূপে একত্বের উদ্ভব হয় তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। এবং যে অভিজ্ঞতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপ, তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও ইহা হইতে তথ্য সকলের (facts) সত্যরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহারা প্রতিভাস মাত্র ও ভ্রান্তিপূর্ণ।

কিন্তু 'সৎ'এর সন্ধানে সমস্ত চেষ্টাই যদি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, জগতের বিবিধ তথ্যকে একত্বে পরিণত করা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন প্রতিভাস এবং তাহাদিগের নিয়মের আবিষ্কারেই কেন আমরা সন্তুষ্ট থাকি না ? বিজ্ঞানের জন্য ইহাদের অতিরিক্ত কিছুই তো প্রয়োজন নাই। কিন্তু সমস্ত বস্তুকে একত্বে পরিণত করিবার চিন্তারও তো অস্তিত্ব আছে। সে চিন্তা প্রণালীও একটা তথ্য (fact), তাহারও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আবার প্রতিভাস ও তাহাদের নিয়মাবলীরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কিরূপে তাহাদের উদ্ভব হয় ? বস্তু ও তাহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধের ব্যাখ্যা কি ? বর্ত্তমানের সহিত অতীত ও ভবিষ্যতের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা কি সত্য ? কিন্তু যাহা সংবিদে বর্ত্তমান নাই, (অতীত ও ভবিষ্যৎ) তাহা কিরূপে সত্য হইতে পারে ? অতীত ও ভবিষ্যৎ যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে যাহা অসৎ তাহার সহিত বর্ত্তমান কিরূপে সংবদ্ধ হইতে পারে। তার পরে অভেদই (Identity) বা কি ? পরিবর্ত্তন যে ঘটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিবর্ত্তন যদি থাকে, তাহা হইলে কাহার পরিবর্ত্তন হয় ? নিশ্চয়ই কোনও বস্তুর পরিবর্ত্তন। সুতরাং সে বস্তুও আছে। যদি বলা যায়, 'নিয়ম' ভিন্ন স্থায়ী কিছুই নাই, এবং প্রতিভাসের মধ্যেই নিয়মাবলী প্রকাশিত, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, এই সকল নিয়মই কি একমাত্র অপরিণামী সারবস্তু ? তাহা হইলে এই সকল নিয়মের মধ্যে সম্বন্ধ কি ? প্রতিভাসদিগের সহিতই বা তাহাদের সম্বন্ধ কি ? আবার নিয়ম-সকল যদি সম্ভাবনা মাত্র (Possibilities) হয়, এবং যখন প্রতিভাসে প্রকাশিত হয়, তখনই কেবল বাস্তবতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে নিয়মও প্রতিভাস, উভয়ই অসৎ চিন্তা মাত্র।

প্রতিভাসদিগের মধ্যে সতের সন্ধান না পাইয়া মনে করা যাইতে পারে, যে আমাদের জগৎ হইতে এক উচ্চতর জগতে হয়তো "সৎ" বর্ত্তমান। কিন্তু বিশ্বকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াও সমস্যার সমাধান হয় না। এ জগতে সতের সন্ধান পাওয়া যায় না, ইহার অর্থ "সৎ" যে কি বস্তু, তাহার কোনও জ্ঞানই আমাদের নাই। কিন্তু "সৎ" যদি একেবারেই অজ্ঞেয় হয়, তাহা হইলে 'সৎ' বলিয়া কোনও বস্তু যে আছে, তাহাই বা বলা যায় কিরূপে ? 'সৎ' এক বা বহু, তাহাই বা কে বলিবে ? যদি বহু হয়, তাহা হইলে বহুর মিলনে এক জগতের উৎপত্তিই বা হয় কেমন করিয়া ? যদি বহু না হয়, তাহা হইলে 'সত্তে'র সঙ্গে, স্বয়ং-সৎ বস্তুর সঙ্গে আমাদের জগতের প্রতিভাসদিগের সম্বন্ধের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যদি উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রতিভাস-সকল 'সত্তে'র বিশেষণ হইয়া পড়ে, সুতরাং 'সৎকে' আর স্বয়ং-সৎ বলা যায় না। সতের সহিত প্রতিভাসের যদি কোনও সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে 'সতের' কোনও গুণ আছে কিনা, সেই প্রশ্ন উঠে। যদি গুণ থাকে, তাহা হইলে দ্রব্যের সহিত তাহার গুণের সম্বন্ধের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। যদি গুণ না থাকে, তাহা হইলে, ইহা সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বিশুদ্ধ সত্তা ও শূন্য একই কথা। বিশ্বকে দুইভাগে ভাগ করিয়া কোনও লাভই হয় না। সুতরাং স্বয়ং-সৎ বস্তুর কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। প্রতিভাসের সহিতই আমাদের কারবার। তাহাই আমাদের নিকট মূল্যবান। যাহা 'সৎ', তাহা যে প্রতিভাসিত হইতে পারে না, তাহা নহে। যাবতীয় প্রতিভাস 'সতে'র অন্তর্গত ; প্রতিভাস আছে বলিয়াই সৎ সৎ। প্রতিভাসই সতের উপাদান। প্রতিভাসের অস্তিত্ব আছে। ইহা যে কিছু নয়, তাহা নহে। সতের প্রকৃতিই হইতেছে যাবতীয় প্রতিভাস সংগতিপূর্ণ ভাবে ধারণ করা। 'সৎ' একটি সমগ্র বস্তু, যাহার অংশদিগের মধ্যে পূর্ণ সংগতি বর্ত্তমান। তাহার মধ্যে কোনও স্ব-বিরোধ নাই। যাহার মধ্যে স্ববিরোধ আছে, তাহা কখনও 'সৎ' হইতে পারে না। এই "কষ্টি পাথর" (criterion) দ্বারা 'সৎ' হইতে প্রতিভাসকে পৃথক করা যায়। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই, যে পরম বস্তু (absolute) বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং তাহার অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। সামঞ্জস্যে বিধৃত বহু বৈচিত্র্য বিপুলায়তন ঐক্যের ক্রোড়ে বর্ত্তমান। সৎ একমাত্র। বহু সতের অস্তিত্ব অসম্ভব ; কেন না, বহু সৎ থাকিলেও এক সঙ্গেই থাকিবে। একসঙ্গে থাকার অর্থ পরস্পর সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া থাকা। সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকিলে তাহারা স্বাধীন হইতে পারে না। সম্বন্ধযুক্ত থাকার অর্থই এক সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকা। বিশ্ব এক—কিন্তু তাহার মধ্যে যে ভেদ নাই, তাহা নহে। ভেদ আছে, কিন্তু এক সমগ্রের মধ্যে ভেদসত্ত্বেও পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। সেই সমগ্রের বাহিরে কিছুই নহে। অভিজ্ঞতাই এই সমগ্রের স্বরূপ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতাই (Sentient Experience) সৎ বস্তু যাহা তাহা নয়, তাহা সৎ নহে। যাহা অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত নহে, যাহা জ্ঞাত নহে, যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, অথবা যাহার (= সৎ-সম্বন্ধী) কোনও অনুভূতি নাই, কোনও অর্থেই তাহাকে সৎ বলা যায় না। যাহা এক (single) ও সর্ব্বাধার এবং সংগতিপূর্ণ অভিজ্ঞতার সামগ্র্য, যাবতীয় ভেদ,—বিষয়ী-ও-বিষয়ের-ভেদসমন্বিত সকল ভেদ—যাহার অন্তর্গত, তাহাই পরম বস্তু। এই পরম বস্তুর মধ্যে তথ্যসকল যেমন পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি তাহাদের মধ্যে যে সকল প্রক্রিয়া নিহিত, তাহাদের সঙ্গেও সামঞ্জস্য যুক্ত। সমস্ত বিরোধের অতীত অবস্থাকে যদি সুখ বলা যায়, এবং দুঃখ হইতে যদি অশান্তি ও অস্বাস্থ্যের (disquietude) উদ্ভব হয়, তাহা হইলে পরম বস্তুর মধ্যে দুঃখ হইতে সুখের মাত্রা অধিক, এই মীমাংসায় উপনীত হইতে হয়। পরম বস্তুর পরিপূর্ণ জ্ঞান আমাদের নাই। কিন্তু যে জ্ঞান আছে, তাহা অভিজ্ঞতামূলক। পরম বস্তুর জীবনের পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ সসীম জীবের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তাহার একটা মোটামুটি জ্ঞানলাভ অসম্ভব নহে। অব্যবহিত জ্ঞান অথবা অনুভূতির মধ্যে বহু ভেদের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু ভেদের জ্ঞান নাই।

তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। ভেদের অনুভূতি তাহার মধ্যে নাই ; কেবল একটা সামগ্র্যের বোধই তাহার মধ্যে আছে। ইহা হইতে একটা উচ্চতর সর্ব্বাধার অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব সূচিত হয়। এই অভিজ্ঞতা যৌক্তিক চিন্তার (rational thought) উচ্চতর স্তরে অবস্থিত। ইহার মধ্যে ইচ্ছা, চিন্তা ও অনুভূতি সকলই একীভূত অবস্থায় বর্ত্তমান। মঙ্গল এবং সুন্দরের যে প্রত্যয় আমাদের আছে—যাহার মধ্যে বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সম্বন্ধের অতীত একপ্রকার অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান—তাহা দ্বারাও এই উচ্চতর অভিজ্ঞতা সূচিত হয়। এই সকল হইতে ভেদ-বর্জ্জিত চরম অভিজ্ঞতার একটা ধারণা করা সম্ভবপর হয়। তাহার মধ্যে যাবতীয় প্রাতিভাসিক ভেদ মগ্ন হইয়া যায় এবং বৈচিত্র্যের সম্পদ হইতে বঞ্চিত না হইয়াও সেই সামগ্র্য অব্যবহিতভাবে উপলব্ধ হয়।

"পরম বস্তু কেবল চিন্তা নহে। চিন্তা ইহার একটি উপাদান মাত্র। চিন্তা সম্বন্ধ-ও-যুক্তি-মূলক। যখন তাহা বিচারের (judgement) রূপ ধারণ করে, তখন তাহার মধ্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের (subject and predicate) ভেদ থাকে। বিধেয় উদ্দেশ্যের গুণ মাত্র নহে, কোনও মানসিক প্রতিকৃতিও নহে। তাহা একটা প্রত্যয় ; এই প্রত্যয় কেবল উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ নহে, উদ্দেশ্যের সীমার বাহিরে ও তাহা প্রযোজ্য। তথ্য এবং তাহাদের প্রত্যয় বিচ্ছিন্ন বস্তু নহে, তাহারা অবিনা-ভাব সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহাদের একটি হইতে স্বতন্ত্রভাবে অন্যের কোনও অর্থই নাই। প্রত্যয় সকল বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় না, তাহারা নির্দিষ্ট বস্তুর সহিত সংসক্ত। প্রত্যয়-বর্জ্জিত তথ্যেরও কোনও অস্তিত্ব নাই। কিন্তু চিন্তার মধ্যে তথ্য ও প্রত্যয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য কখনও থাকে না ; সত্তা ও প্রত্যয়ের মধ্যে ভেদ চিন্তা কখনও বিদূরিত করিতে সমর্থ হয় না। চিন্তার লক্ষ্য অভিজ্ঞতার সংগতিপূর্ণ সমগ্রতা, কিন্তু তাহা কখনও প্রাপ্ত হয় না। চিন্তা চায়, সর্ব্ব বস্তুর আধার এক চরম একত্ব, কিন্তু প্রাপ্ত হয় সম্বন্ধের একটা জাল। চিন্তা যদি তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিতে সক্ষম হয়, তখন তাহা আর চিন্তা থাকিবে না, তখন তাহা এক উচ্চতর অভিজ্ঞতায় পরিণত হইবে, যাহার মধ্যে থাকিবে চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা। "অনুভূতির মধ্যে যে অব্যবহিতত্ব বর্ত্তমান, তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর অব্যবহিতত্ব এই অভিজ্ঞতায় থাকিবে। তাহার মধ্যে যাবতীয় ভেদের অবসান হইবে। তাহার মধ্যে চিন্তা থাকিবে উন্নততর উপজ্ঞা (Intuition) রূপে, ইচ্ছা থাকিবে বাস্তবে পরিণত আদর্শরূপে এবং সৌন্দর্য্য, সুখও অনুভূতি থাকিবে পরিপূর্ণ চরিতার্থতার মধ্যে। বিশুদ্ধ অথবা অবিশুদ্ধ যাবতীয় প্রবৃত্তির শিখাও তথায় অঙ্গীভূত অবস্থায় অনির্ব্বাণ প্রজ্বলিত থাকিবে ; উচ্চতর আনন্দের সংগতির মধ্যে মগ্ন সুরের মতো।"

ইহার পরে ব্রাডলে ভ্রান্তি, অমঙ্গল, দেশও কালের অস্তিত্বের সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ পরম বস্তুর সংগতি কিরূপে হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। ব্রাডলে বলেন, কোনও তথ্যের ব্যাখ্যা করিতে যখন আমরা অসমর্থ হই, তখন আমাদের অসামর্থ্য দ্বারা আমাদের অজ্ঞতাই প্রমাণিত হয়। তাহা দ্বারা দার্শনিক যুক্তি দ্বারা সমর্থিত কোনও সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় না। যাহা আমাদের নিকট স্ব-বিরোধ-দুষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়, আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত নূতন তথ্যদ্বারা তাহার সহিত সমগ্রের সংগতি সাধিত হইতে পারে। সত্যের সহিত ভ্রান্তির সংগতি নাই, কিন্তু ভ্রান্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন সন্দেহ নাই, তখন ইহাকেও সত্তের অন্তর্গত বলিতে হইবে। কিন্তু কোনও ভ্রান্তিই সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে—আংশিক সত্যের সহিত যখন অন্য সত্য যুক্ত হয়, তখন তাহা পূর্ণ সত্যে পরিণত হয়। কিরূপে এই পরিণতি সংঘটিত হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু "ইহা অসম্ভব নহে, যে উচ্চতর অভিজ্ঞতার মধ্যে ভ্রান্তি অপনোদিত হয়, মিথ্যা সত্যের ভিতর লুপ্ত হইয়া যায়। তাহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাই সংঘটিত হয়, কেননা যাহা সম্ভাব্য (possible), এবং কোনও সাধারণ-তত্ত্ব-অনুসারে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার অস্তিত্ব সুনিশ্চিত।"

অমঙ্গলের নানারূপ আছে—দুঃখ, উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা, দুর্নীতি। দুঃখের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই ; দুঃখ যে অমঙ্গল, তাহাও সত্য। কিন্তু পরম সত্তার মধ্যে হয়তো দুঃখ একটি জটিল উচ্চতর সুখের অন্তর্ভূত হইয়া যাইতে পারে। উচ্চতর অভিজ্ঞতা যে মোটের উপর সুখদায়ক, এবং তাহার মধ্যে দুঃখের দুঃখদায়কত্ব অন্তর্হিত হয়, পরম সত্তার পূর্ণতা হইতে তাহা বিশ্বাস করা যায়। আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সিদ্ধির সহায়ক হইতে পারে, যে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের তাহারা অন্তর্গত। নৈতিক অমঙ্গলদ্বারা আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে বিরোধই কেবল সূচিত হয় না, সৎ ইচ্ছা ও অসৎ ইচ্ছার দ্বন্দ্বও সূচিত হয়। কিন্তু পরম সত্তার মধ্যে এই দ্বন্দ্ব হইতে এক উচ্চতর মঙ্গলের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য যেমন ক্যাটিলিন ও বর্জিয়ার (পাপীদিগের) মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারে, তেমনি ধার্ম্মিক ও নিষ্পাপীর মধ্যেও সিদ্ধ হইতে পারে। পরমবস্তুর মধ্যে এই সকল প্রতিভাসের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিরূপে একত্বের উদ্ভব হয়, তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু তাহার মধ্যে কিছুই যে বিনষ্ট হয় না, ইহা নিশ্চিত।

(চিত্রনাট্য)

পূর্বানুবৃত্তি

(চিত্রনাট্য)

নন্দা ও মন্মথ উপরে আসিয়া নিজেদের ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। নন্দার দরজা খোলা রহিয়াছে, ভিতরে আলো জ্বলিতেছে। মন্মথ নিজের ঘরের বন্ধ দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় নন্দা মিনতির সুরে বলিয়া উঠিল—

নন্দা: দাদা, কেন রোজ রোজ এত দেরী করো বল দেখি? আজ তো আর একটু হ'লেই ধরা পড়ে গিয়েছিলে!

অবরুদ্ধ অসন্তোষ মুখে লইয়া মন্মথ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মন্মথ: আমি কি ছেলেমানুষ? কচি খোকা?

নন্দা: না। কিন্তু সে কথা দাদুকে বললেই পারো। আমরা কেন রোজ রোজ তোমার জন্যে দাদুর কাছে মিছে কথা বলব? জানো একটা মিছে কথা বলার জন্যে দাদু আজ ভুবনবাবুকে বিদেয় ক'রে দিয়েছেন?

মন্মথ: যথেষ্ট হয়েছে, আমাকে আর লেক্‌চার দিও না। আমি তোমার দাদা, তুমি আমার দিদি নও।

মন্মথ নিজের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। নন্দা কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া নীরবে অধর দংশন করিল, তারপর ফিরিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল এবং বেশ একটু জোরের সঙ্গে দ্বারের ছিটকিনি লাগাইয়া দিল। বিরাগ আহত মুখে ওয়ার্ডরোবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুলের বিননি খুলিতে লাগিল।

ওদিকে মন্মথ নিজের ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়াছিল। ঘরটি নন্দার ঘরের যোড়া; ওয়ার্ডরোবের স্থানে একটি ড্রেসিং টেবিল আছে। মন্মথ ইতিমধ্যে পাজামার উপর ড্রেসিং গাউন পরিয়াছে, সিগারেট ধরাইয়াছে। এখন সে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া একটি দেরাজ খুলিল; দেরাজ হইতে লিলির একটি ছোট ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল এবং ঘন ঘন সিগারেট টানিতে লাগিল।

নন্দা নিজের ঘরে চুল আঁচড়ানো শেষ করিয়াছে; আলনা হইতে কোঁচানো আটপৌরে শাড়ী লইয়া রাত্রির জন্য বেশ পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। নন্দা সত্রাসে দেখিল, ওয়ার্ডরোবের দ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছে, যেন ভিতর হইতে কেহ দ্বার ঠেলিয়া খুলিতেছে!

নন্দার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাহার বস্ত্র পরিবর্তন ক্রিয়া তখন মধ্যপথে। সে ভয় ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—

নন্দা: কে—?

অমনি ওয়ার্ডরোবের ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে একযোড়া যুক্ত-কর বাহির হইয়া আসিল, সেই সঙ্গে কাতর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—

স্বর: আমাকে মাফ করুন—

কণ্ঠস্বর পুরুষের, কিন্তু অতিশয় করুণ। তার উপর যোড়-করা হাত দু'টি বিনীতভাবে বাহির হইয়া আছে। নন্দা প্রথম ত্রাসের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া ক্ষিপ্র হস্তে বস্ত্র পরিবর্তন করিতে লাগিল।

নন্দা: তুমি কে?

স্বর: আমি—আমি চোর।

নন্দা: চোর!!

চোর: ভয় পাবেন না। আমি আপনার কোনও অনিষ্ট করব না।—যদি অনুমতি করেন, বেরিয়ে আসব কি?

নন্দা: না না, এখন বেরিও না—

চোর: আচ্ছা—। দেখুন, আমার কোনও কু-মৎলব নেই, আমি ধরা পড়বার ভয়ে লুকিয়ে আছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

নন্দা এতক্ষণে বস্ত্র পরিবর্তন সম্পন্ন করিয়াছে। চোরের দীনতা দেখিয়া সে অনেকখানি সাহস ফিরিয়া পাইল। সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত পরিস্থিতির নূতনত্ব তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। চেঁচামেচি করিয়া লোক ডাকিলে চোরকে সহজেই ধরা যায়; কিন্তু নন্দা তাহা করিল না। সে স্বভাবতই সাহসিনী। কোমরে আঁচল জড়াইয়া সে নিজের পড়ার টেবিলের কাছে গেল; টেবিলের উপর একটি রুল ছিল, দৃঢ় মুষ্টিতে সেটি ধরিয়া সে চোরের দিকে ফিরিল।

নন্দা: এবার বেরিয়ে এস।

চোর যুক্তকরে ওয়ার্ডরোব হইতে বাহির হইয়া আসিল।

নন্দা: দাঁড়াও—আর এগিও না।

চোর অমনি দাঁড়াইয়া পড়িল। নন্দা ইতিপূর্বে কখনও চোর দেখে নাই, চোর সম্বন্ধে একটা প্রেত-পিশাচ জাতীয় ধারণা তাহার মনে ছিল। কিন্তু এই চোরের মূর্তি দেখিয়া তাহার সমস্ত ভয় দূর হইল। চোর নিতান্ত নির্জীব প্রাণী।

নন্দা: তুমি আমার ঘরে ঢুকলে কি ক'রে?

চোর: আমাকে তাড়া করেছিল, তাই পালাবার রাস্তা না পেয়ে ওপরে পালিয়ে এসেছিলাম—দোহাই আপনার, আমাকে পুলিসে দেবেন না।

চোর দীন নেত্রে নন্দার মুখের পানে চাহিল।

নন্দা: তুমি চুরি করবার জন্যে এ বাড়ীতে ঢুকেছিলে?

চোর উত্তর দিল না, লজ্জাহত চক্ষু নত করিল। নন্দার মনে দয়া হইল; কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গী নরম হইল না। রুলের দ্বারা চেয়ার দেখাইয়া সে কড়া সুরে বলিল—

নন্দা: বোসো ঐ চেয়ারে।

চোর: সঙ্কুচিত ভাবে চেয়ারের কাণায় বসিল।

নন্দা। তোমার নাম কি?

চোর: দিবাকর—দিবাকর রায়।

নন্দা: (সবিস্ময়ে) দিবাকর রায়!—ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে তুমি চুরি কর!

দিবাকর। (কাতরভাবে) আমি বড় গরীব—কাজকর্ম পাইনি—

নন্দা: কাজকর্ম পাওনি কেন? লেখা পড়া করেছ?

চোর ছাড়া-ছাড়া ভাবে উত্তর দিল—

দিবাকর: ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছিলাম—পাস করতে পারিনি। আমার বাবা ভদ্রলোক ছিলেন, কিন্তু তিনি হঠাৎ মারা গেলেন—কিছু রেখে যেতে পারেন নি।—মা অনাহারে মারা গেলেন—তারপর—তারপর—কাজ যোগাড় করবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কেউ কাজ দিলেনা তাই শেষ পর্যন্ত—পেটের জ্বালায়—

নন্দার মুখ এবার করুণায় কোমল হইল।

নন্দা: পেটের জ্বালায়—! তাই বুঝি তুমি খাবার ঘরে ঢুকে খেতে বসেছিলে?

দিবাকর: হ্যাঁ। সবে একটি গ্রাস মুখে তুলেছি এমন সময়—

নন্দা: আহা বেচারা! এখনও বোধ হয় তোমার পেট জ্বলছে?

দিবাকর: (ক্লান্তভাবে) ও কিছু নয়। আমার অভ্যেস আছে।

নন্দা টেবিলের উপর রুল রাখিয়া দিল, সদয় কণ্ঠে বলিল—

নন্দা: তুমি খাবে? আমার ঘরে খাবার আছে।

দিবাকর চেয়ার হইতে উঠিয়া উচ্চকিত ভাবে চাহিল।

দিবাকর: খাবার!!

নন্দা: হ্যাঁ—এই যে। এস।

নন্দার অনুবর্তী হইয়া দিবাকর চকিত আলমারীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল, সাগ্রহে খাদ্যদ্রব্যগুলি দেখিয়া নন্দার পানে চোখ তুলিল।

দিবাকর: আমাকে এই সব খেতে বলছেন?

নন্দা: হ্যাঁ—খাও না।

দিবাকর: আপনার দয়া জীবনে ভুলতে পারব না—

এক টুকরা খাদ্য তুলিয়া মুখে দিতে গিয়া দিবাকর সহসা থামিয়া গেল।

দিবাকর: কিন্তু—এ তো আপনার খাবার!

নন্দা: তাতে কি! তুমি খাও।

দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া দিবাকর খাদ্য থালায় রাখিয়া দিল।

দিবাকর: না, আপনার মুখের খাবার খেতে পারব না।—আপনার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।

নন্দা: না, আমার ক্ষিদে নেই। তুমি খাও না—

দিবাকর: মাফ্ করবেন, আমি পারব না। আপনার কষ্ট হবে।

নন্দা: (হাসিয়া) আচ্ছা, আমিও খাচ্ছি। এবার খাবে তো?

নন্দা থালা হইতে একটা চিংড়ি মাছের কাটলেট তুলিয়া লইয়া তাহাতে একটু কামড় দিল। দিবাকরের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল।

গ একটা লুচি লইয়া মুখে পুরিল। চকিত আলমারীর দুই পাশে দাঁড়াইয়া চোর ও গৃহকর্ত্রীর যৌথ ভোজন আরম্ভ হইল।

মন্মথ এখনও শয়ন করে নাই, সিগারেট টানিতে টানিতে নিজের ঘরে পায়চারি করিতেছিল। বন্ধ দরজার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিবার সময় বাহির হইতে অস্পষ্ট বাক্যালাপ তাহার কানে আসিতেছিল; কিন্তু এতক্ষণ সেদিকে সে মন দেয় নাই। এখন সে হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দ্বারের দিকে চলিল।

নন্দার ঘরে দুজনের আহার তখন প্রায় শেষ হইয়াছে, দ্বারে ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল। নন্দা চকিতে নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া দিবাকরকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিল, তারপর দ্বারের দিকে ফিরিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল—

নন্দা: কে?

দ্বারের অপর পার হইতে মন্মথর কণ্ঠস্বর আসিল।

মন্মথ: আমি। দোর খোলো।

নন্দা: দাদা! কি দরকার?

মন্মথ: দোর খোলো—কার সঙ্গে কথা কইছ?

নন্দা নীরবে দিবাকরকে ইসারা করিল, দিবাকর আলমারীর পিছনে লুকাইয়া পড়িল। তখন নন্দা 'রঘুবংশ' বইখানা তুলিয়া লইয়া দ্বারের ছিটকিনি খুলিয়া দাঁড়াইল, ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল—

নন্দা: এত রাত্রে তোমার আবার কি হ'ল!

মন্মথ সন্দিগ্ধ ভাবে ঘরের এদিক ওদিক উঁকি মারিল।

মন্মথ: তুমি এখনও ঘুমোও নি?

নন্দা: না। কিছু দরকার আছে?

মন্মথ: মনে হ'ল তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ।

নন্দা: কথা কইছি! সে কি? ও:—

নন্দা হাসিয়া উঠিল। হাতের খোলা বই দেখাইয়া বলিল—

নন্দা: পড়া মুখস্থ করছিলাম।

মন্মথ: এত রাত্রে পড়া মুখস্থ!

নন্দা: হ্যাঁ। শুনবে? শোনো—

অমুং পুর: পশ্যসি দেবদারুম্
পুত্রীকৃতোঽসৌ বৃষভধ্বজেন।—

মন্মথ: (উত্যক্ত ভাবে) থাক্, দুপুর রাত্রে শ্লোক আওড়াতে হবে না।

মন্মথ নিজের ঘরে চলিয়া গেল। নন্দা আবার দ্বার বন্ধ করিল। যেন খুব একটা ফাঁড়া কাটিয়াছে এমনি ভাবে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে বইখানা টেবিলের উপর ফেলিল। দিবাকরের মুণ্ড চকিত আলমারীর পিছন হইতে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। চোখে চোখে বার্তা বিনিময় হইল।

অতঃপর তাহাদের কথাবার্তা অনুচ্চ ফিস্ ফিস্ স্বরে হইতে লাগিল।

দিবাকর: আপনি দু'বার আমাকে রক্ষা করলেন। এবার আমি যাই।

নন্দা: হ্যাঁ, এবার তোমাকে যেতে হবে। কিন্তু যাবে কোন্ দিক দিয়ে?—

দিবাকর খোলা জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

দিবাকর: বাগানে কেউ আছে কিনা দয়া ক'রে একবার দেখবেন কি?

একটু বিস্মিত হইয়া নন্দা জানালার কাছে গিয়া নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। চাঁদ অস্ত গিয়াছে, নীচে বড় কিছু দেখা যায় না।

নন্দা: না, কেউ নেই।

দিবাকর: তাহলে—আমি জান্‌লা দিয়েই—

নন্দা সরিয়া আসিল; দিবাকর গিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিল।

নন্দা: কিন্তু যদি প'ড়ে যাও, হাত-পা ভাঙ্‌বে—

দিবাকর: না, পড়ব না, একটা জলের পাইপ আছে।—(হাত যোড় করিয়া) আমাকে আপনি অনেক দয়া করেছেন, এবার বিদায় দিন।

নন্দা: (আঙুল তুলিয়া) কিন্তু মনে রেখো, আর কখনও চুরি করবে না। তুমি পুরুষ, ভদ্রসন্তান; কাজ করবে।

দিবাকর: কাজ করতেই আমি চাই; কিন্তু কাজ পাব কোথায়? যখন কুলি-কাবাড়ীর কাজ পাই তখন করি; আর যখন পাই না—পেটের দায় বড় দায়।

আচম্কা একটা কথা নন্দার মনে পড়িয়া গেল; সে বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ শূন্যে তাকাইয়া রহিল। বড় দুঃসাহসের কথা, কিন্তু একটা হতভাগাকে যদি সৎ পথে আনা যায়—! নন্দা দিবাকরের কাছে এক-পা সরিয়া আসিয়া চাপা উত্তেজনার কণ্ঠে বলিল—

নন্দা: আমি যদি তোমাকে কাজ দিই, তুমি কাজ করবে?

দিবাকর: কাজ! আপনি কাজ দেবেন!

নন্দা: দিতে পারি। আমার দাদুর একজন সেক্রেটারী চাই। তুমি হিসেব নিকেশের কাজ জান?

দিবাকর: (দ্বিধা ভরে) তা—একটু একটু জানি

নন্দা: তা হলেই হবে। কিন্তু মনে থাকে যেন, যদি এক পয়সা চুরি কর তা হলে পুলিশে ধরিয়ে দেব।

দিবাকর: বিশ্বাস করুন, কাজ পেলে আমি চুরি করব না। চুরি করা আমার স্বভাব নয়; অভাবে প'ড়েই—

নন্দা: আচ্ছা বেশ।—

নন্দা ওয়ার্ডরোব হইতে একটা দশটাকার নোট লইয়া দিবাকরের হাতে দিল। দিবাকরের মুখ কৃতজ্ঞতায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

নন্দা: এই নাও দশটাকা। এখন যা বলি শোন। কাল সকালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ভাল কাপড়-চোপড় প'রে দাদুর সঙ্গে দেখা করতে আসবে।—

দিবাকর: আপনি যা বলবেন তাই করব। আর কি করব বলুন। চাকরীর কথা আপনার দাদুকে বলব কি?

নন্দা গালে আঙুল ঠেকাইয়া ক্ষণেক চিন্তা করিল।

নন্দা: না, তাতে গণ্ডগোল হ'তে পারে। শোন, আমার দাদু জ্যোতিষ চর্চা করেন। তুমি বলবে, তাঁর নাম শুনে এসেছ; তোমার কাজ কর্ম নেই—কবে কাজ কর্ম হবে তাই জানতে এসেছ!—বুঝলে?

দিবাকর: আজ্ঞে বুঝেছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কাল সকালে আমি আসব।

আবার যোড়হস্তে নন্দাকে নমস্কার করিয়া দিবাকর জানালা পার হইল; তারপর তাহার মস্তক জানালার নীচে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নন্দা আসিয়া কিছুক্ষণ জানালার নীচে চাহিয়া রহিল; পরে জানালা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার মুখে ভয় সংশয় এবং উত্তেজনা মিশিয়া এক অপূর্ব ভাব-ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল। গত একঘণ্টা ধরিয়া এই ঘরে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা স্বপ্ন না সত্য? নিজের দুঃসাহসের কথা ভাবিয়া সে নিজেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

ফেড্ আউট্।

ক্রমশঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের সম্মিলন

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত প্রথম আলাপেই তাঁহার ভিতর ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার, যোগ-ভক্তির ও বৈরাগ্যের বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন চমৎকৃত হন এবং ইঁহার দ্বারা দুর্গত দেশের মহা উপকার সাধিত হইতে পারে বুঝিতে পারেন। কেশবচন্দ্রের ব্যবস্থানুসারে তদীয় সহ-সাধকদলের অন্যতম ভাই গিরীশচন্দ্র সেন প্রথম দিন হইতে (১৫ই মার্চ্চ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ) শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রুত উপদেশাদি যথাযথ সঙ্কলন করিয়া "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। ঐ গুলি একত্রিত করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার কার্য্যালয় হইতে "পরমহংসের উক্তি" পুস্তিকা ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।*

একাদিক্রমে এগার বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া, একত্রে কীর্ত্তন প্রসঙ্গাদি করিয়া যেমন দেখিয়াছেন ও তাঁহার মুখে যেমন শুনিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়া, তাঁহার তিরোধানের পর ভাই গিরিশচন্দ্র নিপুণতার সহিত একটী সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণজীবনী "ধর্ম্মতত্ত্বে" প্রকাশ করেন। পূর্ব্বপ্রকাশিত "পরমহংসের উক্তি" পুস্তিকার সহিত এই জীবনী সংযুক্ত করিয়া "শ্রীমৎ রামকৃষ্ণের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন" পুস্তক ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি সংগ্রহ ও জীবনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অন্যান্য ভক্তদের পুস্তকাবলী তাঁহার স্বর্গারোহণের অনেক পরে লিখিত হয়।

উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভাই গিরীশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন:—
"১৮৭৫ অব্দের মার্চ্চ মাসে একদিন পূর্ব্বাহ্নে ৮।৯টার সময় পরমহংসদেব হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বাবু জয়গোপাল সেনের বেলঘরিয়াস্থ বাগানে উপস্থিত হন। তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন প্রচারকবর্গসহ উদ্যানে সাধনভজনে রত ছিলেন, তরুতলে রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন, আত্মসংযম ও বৈরাগ্য সাধনের বিশেষ বিশেষ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পরমহংস প্রথমতঃ তাঁহার কলুটোলাস্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত উদ্যানে সাধনভজন অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন শুনিয়া পরমহংসদেব তথায় গমন করেন। তখন আচার্য্যদেব বন্ধুবর্গসহ উদ্যানস্থ সরোবরের বাঁধাঘাটে বসিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ একখানা ছেকড়া গাড়ীযোগে সেখানে উপস্থিত হন। প্রথমতঃ হৃদয় গাড়ী হইতে নামিয়া আচার্য্যদেবকে বলেন যে 'আমার মামা হরিপ্রসঙ্গ শুনিতে ভালবাসেন, মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে। তিনি

* এই পুস্তকের ৯ বৎসর পরে, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে একমাত্র সুরেশচন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত "পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি" প্রকাশিত হয়।

রামপ্রসাদের মুখে ঈশ্বরগুণানুকীর্তন শুনিতে আসিয়াছেন।' এই বলিয়া হৃদয় ভট্টাচার্য্য পরমহংসদেবকে গাড়ি হইতে নামাইয়া লইয়া আসেন। তখন পরমহংসের পরিধানে একখানা লালপাড়ওয়ালা ধুতি মাত্র ছিল, পিরাণ বা উত্তরীয় বস্ত্র গায়ে ছিল না। ধুতির কোঁচা খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়াছিলেন, দেহ জীর্ণ ও দুর্ব্বল। প্রচারকগণ দেখিয়া তাঁহাকে একজন সাধারণ লোক বলিয়া মনে করিলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই বলেন যে, 'বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাক, সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই।' এইরূপে সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ। পরে পরমহংস একটি রামপ্রসাদী গান করেন। গান করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হয়। তখন এই সমাধি ভাব দেখিয়া কেহই উচ্চ ভাব বলিয়া মনে করেন নাই, প্রচারকেরা ইহা একপ্রকার ভেক্কি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সমাধিপ্রাপ্তির

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

অব্যবহিত পরে হৃদয় ভট্টাচায্য উচ্চৈঃস্বরে ওঁ ওঁ বলিতে থাকেন ও সকলকে তদ্রূপ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তাঁহারাও সকলে ওঁ বলিতে থাকেন। কিয়ৎক্ষণ অন্তে পরমহংস কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া হাসিয়া উঠেন তৎপর প্রমত্ত ভাবে গভীর কথা সকল বলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া প্রচারকগণ স্তম্ভিত হইলেন। তখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে, রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমোদে মত্ত হইয়া সকলে স্নান উপাসনা ভুলিয়া গেলেন। সেদিন অনেক বেলায় তাঁহাদিগকে স্নানাদি করিতে হইয়াছিল। সেই দিবস পরমহংস 'গরুর পালে অন্য পশু আসিলে গরু সিং দিয়া গুঁতাইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু গরু পড়িলেই তাহার লাকাইয়া বেড়ায়।' ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন। সাধু সাধুকে বেশ চিনিতে পারেন। পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য্য মহাশয় মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন হইতে উভয়ের আত্মার গূঢ় যোগ হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে, আচার্য্য কেশবচন্দ্র পরিচালিত "The Indian Mirror" পত্রিকায় ১৮৭৫, ২৮শে মার্চ্চ তারিখে "A Hindu Saint" শীর্ষক রচনায় উক্ত সাক্ষাতের বিবর প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার আরম্ভ ছিল—"We met one (a sincere Hindu devotee) not long ago and were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit"

দীর্ঘ ৮ বৎসর কাল সাধনার পর সিদ্ধিলাভ করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদা দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ের প্রান্তভাগে ভাগীরথীতীরে একটি একতলা ঘরে অবস্থিতি করিতেন। কোথাও প্রায় তাঁহার গতিবিধি ছিল না, কদাচিৎ দেশে যাইতেন। পূর্ব্বে একবার মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি আপনার ভাবে আপনি মগ্ন, যোগসমাধি ও ভক্তির মত্ততায় বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। লোকজন বড় তাঁহার নিকট যাইত না, প্রায় কাহারও নিকট তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। দক্ষিণেশ্বরের গ্রামের লোক তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়াই জানিত। ভাগিনেয় হৃদয় ভট্টাচায্য অনুক্ষণ ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন।

বাগ্মীশ্রেষ্ঠ, ভক্তচূড়ামণি কেশবচন্দ্রের কথা মুখে মুখে চলিত। তাঁহার ধর্ম্মের অভিজ্ঞা ব্যবহারিক জীবনকে রূপান্তরিত করিয়া জাতির নৈতিক চরিত্র সামাজিক আচরণ, বিশ্ববাসীর সঙ্গে সম্বন্ধের প্রসার প্রভৃতিকে বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী করিতেছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতেই তিনি দেশবাসীকে লইয়া এই নূতন অভিযানে নিযুক্ত ছিলেন। 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি জনপ্রিয় পত্রিকায় তাহার সংবাদ থাকিত। কেশবচন্দ্র ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া নবজাগরণের বার্তা প্রচার করিয়া আসেন। ভগবানের বিশ্বব্যাপী সত্য উপলব্ধির জন্য ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সকল ধর্ম্মের শাস্ত্র হইতে সঙ্কলন করিয়া "শ্লোক সংগ্রহ" গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আমন্ত্রিত হইয়া বিলাতে গিয়া অখণ্ড ধর্ম্মমণ্ডলীর ও এক মানব পরিবারের নূতন সমন্বয়বার্তা প্রচার করেন এবং ভারতে ইংরাজ শাসন ও ব্যবহার-বৈষম্যের বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন করিয়া আসেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বিবাহ আইন ও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মাদক আইন প্রবর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। সেই সময় কেশবচন্দ্রের নানা আন্দোলনে সমগ্র হিন্দুস্থান আলোড়িত এবং তাঁহার ঈশ্বর দর্শনের ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বজন স্বীকৃত ছিল। ইনি 'বাবু কেশবচন্দ্র সেন' বলিয়া জগদ্বিখ্যাত ছিলেন।

প্রথম পরিচয়ের পর হইতেই সময়ে সময়ে কেশবচন্দ্র সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট যাইতেন এবং পরমহংসদেবও তাঁহাকে সঙ্গে

তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত প্রতিবেশী আত্মীয়বন্ধু অনেকে আসিয়া জুটিত, এখন লোকের ভিড় হইত। পাঁচ সাত ঘণ্টা ব্যাপীয়া আনন্দের স্রোত, প্রমত্ততার ব্যাপার চলিত। প্রতি উৎসবের পর বাষ্পীয় পোত বা নৌকাযোগে ব্রাহ্মমণ্ডলীসহ আচার্য্য কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট যাইতেন। কখন কখনও বেলঘরিয়ার তপোবনে যাইয়া গাড়ী পাঠাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ ও আমোদ করা উৎসবের অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা কেশবচন্দ্র এবং কেশবচন্দ্র দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজে উদ্দীপিত হয়। সরল শিশুর ন্তায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা এই অবস্থাটী তাঁহা হইতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র অধিকতররূপে প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভক্তি সত্বেও জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম ছিল, পরমহংসদেবের জীবনের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনেক সরস করিয়া তুলে। পরমহংসদেবও আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবনের সাহায্য পাইয়া নিরাকার ঈশ্বরের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষ চিনিবার ক্ষমতা আশ্চর্য্য ছিল, তিনি কোন লোকের মুখ দেখিয়া ও দুই একটি কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিতেন—সে কি ধাতুর লোক। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, "বহুকাল পূর্ব্বে (সম্ভবতঃ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে) আমি একদিন বুধবার জোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজ দেখতে গিয়ে ছিলাম। তখন দেখলাম নবযুবক কেশবচন্দ্র বেদীতে বসে উপাসনা করছেন, দু পাশে অনেক উপাসক বসে আছেন। ভাল করে তাকায়ে দেখলাম যে কেশবচন্দ্রের মনটা ব্রহ্মেতে মজে গেছে, তাঁর ফাতনা ডুবেছে। আর যে সকল লোক উপাসনা করতে বসেছিল, তারা যেন ঢাল তলওয়ার বর্শা নিয়ে বসে আছে, তাদের মুখ দেখেই বুঝা গেল, সংসারাসক্তি রাগ অভিমান ও রিপু সকল যেন ভেতরে কিল্‌ খিল্‌ করছে।" পরমহংসদেবের সেই হইতেই কেশবচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র তাঁহার কিছুই জানিতেন না। বার বৎসর পরে শুভক্ষণে বেলঘরিয়ার বাগানে উভয়ের সম্মিলন হয়।

যখন কেশবচন্দ্র সদলবলে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ও শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের ভবনে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্চ ধর্ম্মভাব ও চরিত্র, পুস্তকে ও পত্রিকায় কেশবচন্দ্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, 'মিরার' ও 'ধর্ম্মতত্বে' তাঁহার বিবরণ সকল লেখা হইল, "পরমহংসের উক্তি" নামধেয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল—তখন হইতে তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"পরমহংসদেবের সমুদয় ধর্ম্মমতে যদিচ আমরা ঐক্য স্থাপন করিতে পারি না, কোন কোন মত ব্রাহ্মধর্ম্মে অনসুমোদিত বলিয়া জানি, তথাপি তাঁহার যোগভক্তিপ্রধান সমুন্নত জীবন যে নববিধানের উন্নতি সাধনে বিধাতা কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র আমাদের সন্দেহ হইতে পারে না। পরমধার্ম্মিক মহাপণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংসের নিকটে শিষ্যের ন্তায়, কনিষ্ঠের ন্তায় বিনীতভাবে এক পার্শ্বে বসিতেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন, কোন দিন কোনরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেন না। পরমহংসের জীবনের মূল্যবান জিনিষ সকল বেশ করিয়া আপন জীবনে আয়ত্ত ও আদর করিতেন। সাধু ভক্তি কিরূপে করিতে হয়, সাধু হইতে সাধুতা কিভাবে গ্রহণ করিতে হয় কেশবচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। অনেকদিন পরমহংসের নিকট যাওয়ার পূর্ব্বে দেবালয়ে উপাসনার সময় সাধুভক্তি বিষয়ে তিনি প্রার্থনাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে গেলে পরমহংস কোন দিন আমাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনিও আচার্য্যভবনে আসিয়া অনেকদিন লুচি তরকারী ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন, এমন কি ক্ষুধা হইলে খাবার চাহিয়া খাইতেন। বরফ তাঁহার

শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস (সমাধিস্থ) ও ভক্তবৃন্দ

অতিশয় প্রিয় ছিল, তিনি পদার্পণ করিলে আচার্য্যদেব তাঁহার জন্য বরফ আনাইতেন। কখন কখন দক্ষিণেশ্বরেও বরফ পাঠাইয়া দিতেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে ১২৯০ সাল ২৫শে পৌষ (ইং ১৮৮৪, ৮ই জানুয়ারী) তারিখে অকালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শেষ অবস্থায় সঙ্কট পীড়ার সময় যখন পরমহংসদেব দেখিতে আসেন তখনও দুইজনের পরস্পর খুব ভাবের কথা হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সংবাদ শুনিয়া পরমহংসদেব অত্যন্ত শোকাকুল হন, তিনি বলেন,—"কেশবচন্দ্র চলে যাওয়াতে আমার জীবনের অর্দ্ধেক চলে গিয়েছে। কেশব প্রকাণ্ড বট বৃক্ষের ন্তায় ছিলেন, শত সহস্র লোক তাঁর আশ্রয় পেয়ে শীতল,

হ'ত, সে রকম বৃক্ষ আর কোথায়? আমরা সুপারি গাছ তালগাছের মত নিজের ছায়া দিয়ে একটা লোককেও তৃপ্ত করতে পারি না।" পরমহংস-দেবের গৃহে তাঁহার এক শিষ্য কেশবচন্দ্রের একখানি ছবি টাঙ্গাইতে গিয়াছিল, তিনি সেই ছবি দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন, এ ছবি আমার কাছে রেখ না, ছবিতে কেশবচন্দ্রকে দেখলে আমার প্রাণ ফেটে যায়।

কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের দুই বৎসরের মধ্যেই ১২৯২ সাল ৩১শে শ্রাবণ (ইং ১৮৮৬, ১৫ই আগষ্ট) তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিরোধান ঘটে। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন কিঞ্চিদধিক ৫১ বৎসর মাত্র। তাঁহাকে বৎসরাধিককাল রোগক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মাতা ও পত্নী এবং জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমপুত্র একদিন পীড়িতাবস্থায় পরমহংসদেবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি কেশব-জননীকে মা বলিয়া ডাকিতেন ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। পরমহংসদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রতি অনেক যত্ন প্রকাশ করিলেন, দুই পুত্রকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া সেদিন অনেক স্নেহমাখা কথা বলিয়াছিলেন।

বরাহনগরের শবদাহঘাটে পরমহংসদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত যোগদান করেন। তন্মধ্যে কেশবচন্দ্রের সহ-সাধক বিধান-প্রচারক ভাই অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, গিরিশচন্দ্র সেন এবং প্রাণকৃষ্ণ দত্ত প্রভৃতিও ছিলেন। শ্মশানে তাঁহার দেহের পার্শ্বে বসিয়া সঙ্গীত-প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালকে অনুরুদ্ধ হইয়া কয়েকটী সময়োপযোগী সঙ্গীত করিতে হইয়াছিল। নববিধানের অনেকে সেই মৃত্যু দিন হইতে ৩।৪ দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন।

এই সামান্য প্রবন্ধে বাঙ্গলার দুইজন ধর্ম্মাচার্য্য ও মহাপুরুষের সম্মিলন প্রসঙ্গ মাত্র আপনাদিগকে শুনাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পরমহংসের সে সময়ের উক্তি এবং কেশবচন্দ্রের বক্তব্য বহুদিন পূর্ব্বেই পুস্তকাকারে মুদ্রিত এবং বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আগ্রহশীল পাঠকেরা একটু যত্ন লইলে সে সকলের সন্ধান করিতে পারিবেন। আমি এখানে শ্রীরাম-কৃষ্ণ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের লিখিত একটী প্রবন্ধের কিয়দংশ এবং কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

"সুলভ সমাচার" ১৭ই আশ্বিন ১২৮৮ :—

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

"পাঠকগণ, উপরি উক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার শুনিয়াছেন। ইনি কলিকাতা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাণী রাসমণির কালী বাড়িতে অবস্থিতি করেন। আমরা এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি ততবার তাঁহার উচ্চজীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ, তাহার মতন লোক আর এদেশে আছে কিনা সন্দেহ। যোগবলে তাঁহার মন সর্ব্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে; আমরা যেমন ঘর, বাড়ি, ধনমানের কথা কহি ও সর্ব্বদাই সেই সমস্ত চিন্তা করি, তিনি পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপ করেন। তিনি ছেলের মতন সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মতন হন। তিনি কখন হরি বলিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের প্রায় নৃত্য করেন, কখনও মা কালী বলিয়া অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্তধর্ম্মের আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখন কখন পুরাতন যোগীদের মতন নিরাকার ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইয়া যান। যখন যে ভাব তাঁহার মনে প্রবল হয়, তখন তিনি মুগ্ধ হইয়া বাহ্য জ্ঞান আর রাখিতে পারেন না, একখানি তক্তার মতন তাঁহার শরীর শক্ত হইয়া তাঁহার বাহ্যজ্ঞান চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার আত্মা ভাব-সমুদ্রে লীন হইয়া যায়। তিনি নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী দুই। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, মায়ের হস্তপদবিশিষ্ট কালী অথবা কৃষ্ণেতে তিনি মত্ত হন না। তাহার কালী কৃষ্ণ নিরাকার, চিন্ময়—কেবল আত্মাতেই উদয় হন। তিনি আরও বলেন, নিরাকার ঈশ্বর সমুদ্রবৎ, কিন্তু সেই চিন্ময় সমুদ্রের এক একটী চিন্ময় রূপলহরী হয়, সেই লহরী সাকার ঈশ্বর।"

একবার দক্ষিণেশ্বরে কেশবচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরে কেশবচন্দ্র আসিলে তিনি উৎফুল্ল হইয়া কেশবচন্দ্রকে জড়াইয়া গান ধরেন—"তুমি শ্যাম আমি রাধা, আমি রাধা তুমি শ্যাম।"

কোন ভক্ত বলেন, "টাকাকড়ির চেষ্টা ত সকলেই করছে দেখ্‌ছি। কেশব সেন কেমন রাজার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলে।" তাহাতে শ্রীরাম-কৃষ্ণ বলেন, "কেশবের আলাদা কথা। সে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তায় সব জুটিয়ে দেন। সে ঠিক রাজার বেটা, সে মুসোহারা পায়। যার কোন কামনা নেই, যে টাকা কড়ি চায় না, টাকা আপনি আসে। গীতায় আছে 'যদৃচ্ছালাভ', সে চায় না কিন্তু আপনি আসে।"

কেশবচন্দ্রের সঙ্কট পীড়ার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলেন—"কাল রাত্রে প্রাণ কেমন করে উঠ্‌ল, নিদ্রা হয় নি, মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'মা যদি কেশব না থাকে, তবে কার সঙ্গে কথা কইবো?"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কেশবচন্দ্রের বাটী কমল-কুটীরস্থ নবদেবালয়ে বাকি দিনগুলি কাটাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

(২)

মোক্ষ কামনা করিয়া ভগবদ্‌ভজন করিলে সেটা হয় কপটধর্ম্ম। ভাগবতে ইহার ইঙ্গিত আছে। ভাগবত গোড়াতেই বলিয়াছেন, "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র" ইত্যাদি অর্থাৎ এই ভাগবতে যে ধর্ম্ম কপটতা হইতে বিশেষ প্রকারে মুক্ত তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। "প্রোজ্ঝিত"-শব্দের অর্থ বিশেষ প্রকারে পরিত্যক্ত। কৈতব কপটতা। শ্রীধর স্বামীর মতে মোক্ষের অভিসন্ধিও ত্যাগ করিলেই ধর্ম্ম "প্রোজ্ঝিত কৈতব" হয়।

জ্ঞানবাদী। হাঁ, ধর্ম্মচর্য্যায় সকল অভিসন্ধির মত মোক্ষের অভিসন্ধিও নিন্দনীয়, নিষ্কাম তাই শ্রেষ্ঠ। তাই বলিয়া মোক্ষ নিন্দনীয় হইতে পারে না। উহা জীবের স্বভাবসিদ্ধ ও চরমগতি। সকল অধ্যাত্মশাস্ত্রের উহাই প্রতিপাদ্য।

ভক্তিবাদী। না ; তাহা হইলে ভাগবত মূলেই প্রোজ্ঝিত কৈতব শব্দ প্রয়োগ করিয়া মোক্ষের নিন্দা করিতেন না।

জ্ঞানবাদী। মোক্ষ শব্দটি ত ঐ স্থলে ভাগবতে স্পষ্ট প্রযুক্ত হয় নাই, টীকাকার উহা প্রয়োগ করিয়াছেন ; অভিসন্ধিরূপে মোক্ষ নিন্দনীয় ইহাই টীকাকারের অভিপ্রায়। মোক্ষই ভাগবতের প্রতিপাদ্য নয় ?

ভক্তিবাদী। না, হইতেই পারে না। ভাগবতের প্রতিপাদ্য হইতেছে ভক্তি।

ভক্তিবাদীর এই মত জ্ঞানবাদীরা ত স্বীকার করেনই না, এমন কি সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরাও অনুমোদন করেন না। জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে মণ্ডলেশ্বর শ্রীমহাদেবানন্দ গিরি একাধিক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন ভাগবতের উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস ইত্যাদি দ্বারা মোক্ষই তাহার প্রতিপাদ্য ইহা প্রচুররূপে প্রমাণিত হয়। এখানে শুধু উপসংহারটিরই উল্লেখ করা যাইতেছে।

সর্ব্ব বেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্॥

(ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বই সর্ব্ব বেদান্তের সার, সেই অদ্বিতীয় বস্তুনিষ্ঠ হইতেছে এই ভাগবত-পুরাণ এবং ইহার প্রয়োজন (প্রতিপাদ্য) হইতেছে কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ।) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে রাধাকৃষ্ণোপাসক নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য্য ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী ও ভাগবতের প্রতিপাদ্য মোক্ষ নহে, ভক্তি—এই মত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

তার পর জ্ঞান জীবের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া উৎপাদ্য নহে—এই মতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ভক্তিবাদী বলেন, ভক্তি কি কম ? ভক্তি ভগবানেরই শক্তি বিশেষ।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥

এই তিন শক্তিকে যথাক্রমে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা বলে।

অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে।

উহার তিন প্রকার—

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি॥

এই হ্লাদিনীশক্তির সারই ভক্তি, সুতরাং উহা ভগবানেরই শক্তি। কে উহার উৎপাদন করিবে ? ভগবানেরই কৃপায় ভক্তে উহার আবেশ হয়।

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

(চৈতন্য চরিতামৃত)

জ্ঞান (সংবিৎ) ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি হইলেও উহা ভক্তি হইতে অতি পৃথক্। জ্ঞানের সহিত চর্চ্চা করিলে ভক্তি মলিন—নিকৃষ্ট হইয়া যায়। মহাপ্রভু—রামানন্দ রায় সংবাদে আছে—

রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।
প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর॥ (চৈ, চ,)

এই মতেরই পরিপুষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর এই বোধ থাকিলেও খাটি ভক্তির উদয় হয় না। চৈতন্য-চরিতামৃতকার নিম্নলিখিত কথাগুলি শ্রীকৃষ্ণের মুখে দিয়াছেন—

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি॥
আপনারে বড় মানে আমারে সমহীন।
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে—স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

জ্ঞানবাদী। এসব অতি অপ্রমাণ কাব্য, কাব্য কথা মাত্র।

ভক্তিবাদী। অপ্রমাণ ? চৈতন্যচরিতামৃত সকল সার প্রমাণের সংগ্রহে সমুজ্জ্বল ভক্তিগ্রন্থ। "ইহা বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সম্পুট।...বৈষ্ণবের নিকটে পরম আদরণীয়, বেদবৎ মান্য।" (শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ) আর ভগবান্ রস স্বরূপ। রসো বৈ সঃ। আবার কাব্যের প্রাণ ও রস।

সেই জন্য মহাপ্রভুর কাছে সময় সময়—"শকুন্তলা" নাটক পঠিত হইত এবং তিনি উহা আদরপূর্ব্বক শুনিতেন। রসাভাসযুক্ত কাব্যাকারে কৃষ্ণ-তত্ত্বের বিবরণ যেমন মনোরম তেমনই সত্য। সেই জন্য "বিদগ্ধমাধব", "ললিতমাধব" কাব্য হইলেও ভক্তের পরম আদরণীয় এবং তাঁহার চক্ষে প্রামাণিক সত্য ঘটনা পূর্ণ। তোমরা রসবোধহীন, তোমরা এ তত্ত্ব কিরূপে বুঝিবে?

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।

রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥ (চৈ, চ)

উত্তরকালে দার্শনিক বলদেব বিদ্যাভূষণ কিন্তু ভক্তিকে কেবল হ্লাদিনীর সার বলিয়া প্রচার করিতে স্বস্তিবোধ করেন নাই। তাঁহার মতে ভক্তি হইতেছে—"হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিচ্ছক্তিরূপা। অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তির সহিত সমবেত (নিত্য সম্বন্ধ, ওতপ্রোত) সংবিৎ (জ্ঞান) শক্তি। এই বিবৃতির বিশ্লেষণ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামী এই ভাবে করিয়াছেন—"ভগবদাহলাদিনী শক্তির সার সমবেত সংবিদ্ শক্তির সারাংশরূপা ভক্তি নাম্নী ভাগবতী শক্তি সৎ মহাপুরুষের কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ জীবে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া স্বীয় আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অচিন্ত্য কার্য্যক্ষমতা বলে নিজাংশ সংবিদ্ শক্তির জ্ঞান-জ্ঞাপন বৃত্তি দ্বারা সাধক হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব করায়।" ("সাধনকুসুমাঞ্জলি")। তথাপি আধুনিক অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থেই হ্লাদিনীর সারই ভক্তি এই মতই অধিক প্রচলিত, ভক্তিতে জ্ঞানের অংশ ছিটা ফোঁটা পরিমাণেও স্বীকার্য্য নহে।

জ্ঞানবাদী শ্রুতিপ্রমাণহীন বলিয়া—এই সকল মত অতি অসার ও উপেক্ষাযোগ্য মনে করেন।

জ্ঞানবাদীর মতে চরম তত্ত্ব ও চরম সাধ্য হইতেছেন ব্রহ্ম। ইনিই পরমাত্মা; ইনিই পুরুষোত্তম। "তৎব্রহ্ম। স আত্মা।"

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্)

"উত্তম পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" (গীতা)।

ভক্তিবাদী। ভাগবতে আছে—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদ্ তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(তত্ত্ববিদগণ সেই অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। তাহাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান ও বলে। এখানে বুঝিতে হইবে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটি নাম প্রকৃতপক্ষে এক অর্থের বাচক নয়। ইহাদের মধ্যে উচ্চাবচতা স্বীকার্য্য। ব্রহ্ম সব্ব নিম্ন, পরমাত্মা মধ্যম, ভগবান্ সর্ব্বোচ্চ। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ অনুবাদ তিন।

অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন॥

অর্থাৎ এখানে বিধেয় বা প্রতিপাদ্য হইতেছে কৃষ্ণের প্রভা, অংশ ও স্বরূপ; তাহারই নাম যথাক্রমে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্। (এই তিনেরই উপরে আরও একটি স্তর আছে তাহার বিবরণ পরে উল্লিখিত হইবে।)

জ্ঞানবাদী। ভাল, ব্রহ্ম যে কৃষ্ণের প্রভা, এই অদ্ভুত মত কি প্রমাণ বলে স্থাপিত হইয়াছে?

ভক্তিবাদী। কেন? ব্রহ্ম সংহিতা দেখ, তথায় বলা হইয়াছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি

কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্।

তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষ ভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(যে আদি পুরুষ গোবিন্দের—প্রভা হইতেছে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ পৃথিব্যাদি বিভূতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম…ইত্যাদি) ব্রহ্ম সংহিতা প্রামাণিক গ্রন্থ।

সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্ম সংহিতা সম।

গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানের পরম্ কারণ॥ (চৈ, চ,)

(চৈতন্য দেবের পূর্ব্বে ব্রহ্ম সংহিতা নামে কোনও গ্রন্থ বাঙ্গালাদেশে পরিজ্ঞাত ছিল না। তিনিই দাক্ষিণাত্যে তীর্থভ্রমণকালে উহার সন্ধান পান এবং এক খণ্ডিত পুস্তকমাত্র পাইয়া তাহা নকল করাইয়া আনেন।) রূপ গোস্বামী ঐ উক্তির প্রামাণ্যে লিখিয়াছেন।

তদ্ ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োরৈক্যং কিরণার্কো পমাজুষোঃ।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

সূর্য্য ও কিরণের যে ঐক্য তাহাই ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের ঐক্যের তুলনা; কৃষ্ণ সূর্য্য, ব্রহ্ম কিরণ।

এই দুই প্রমাণই চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও ইহাতে জ্ঞানবাদীর ব্রহ্ম প্রায় অবস্তুই হইয়া পড়েন, তথাপি ইহাতে অর্ব্বাচীন কালের বৈষ্ণবগণ তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি শ্রীকানু-প্রিয় গোস্বামী প্রণীত "নাম চিন্তামণি"—নামক একখানি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণোপ-নিষদের উক্তি বলিয়া এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

অহো মূঢ়া ন জানন্তি কৃষ্ণস্য নিত্য বৈভবম্।

যস্য পাদ নখ জ্যোৎস্না পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্॥

ইহাতে পরব্রহ্মকে কৃষ্ণের পদনখজ্যোৎস্না বলা হইয়াছে। কানু প্রিয় গোস্বামী এই শ্লোকের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা নিশ্চয়ই নহেন। আমার কাছে কিন্তু বোম্বাইতে মুদ্রিত "অষ্টাবিংশত্যুপনিষদঃ" নামের একখানি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণোপনিষদ্ ও মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে ঐ বচনটি নাই, উহার অনুরূপ কোনও উক্তিও নাই। বচনটি কি গৌড়দেশে উক্ত উপনিষদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে? কানুপ্রিয় গোস্বামী নামোল্লেখ না করিয়া কোনও স্মৃতিগ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত বচনটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন—

যস্য পাদনখ জ্যোৎস্না পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্।

স এব বৃন্দাবন ভূবিহারী নন্দনন্দনঃ॥

এটি কৃষ্ণোপনিষদের উক্তি বলিয়া উদ্ধৃত বচনের অনুবাদ মাত্র। কবি ভারতচন্দ্র রায় বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।

পদনখে পড়ি তার আছে কত গুলা॥

এটা অবশ্য একটা কাব্যালঙ্কার মাত্র। উপরি উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতির বচনে কাব্য দৌর্ব্বল্য সন্দেহ করা যায় না, উহা সার সত্য বলিয়া লোকে মানিয়া লইবে এইরূপ আশাই নিশ্চয় উহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

কাশ্মীর

শ্রীআদিনাথ সেন

ভারতের পরীস্থান—পাকিস্থানের জুলুম—আংলো-আমেরিকান্ কুটনীতি—ভারতের দায়।

কোন প্রবন্ধ লিখিতে, প্রথমেই আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করা সমীচীন। কিন্তু কাশ্মীরকে, প্রকৃতির কোলে, পারিপার্শ্বিক অপূর্ব বিশালত্বের শোভায় ও কেন্দ্রীয় সৌন্দর্য্যের সৌষ্ঠবে এবং স্বাস্থ্যনিবাস ও ক্রীড়াভূমি হিসাবে দেখিয়াই কেহ কেহ সন্তুষ্ট ; কেহ কেহ পাকিস্থানের অন্যায় আক্রমণে, শুধু জঘন্য এবং অন্ধ ধর্মোন্মত্তার পরিচয়ই কাশ্মীরে দেখিতে পান ; অন্যেরা, কমিউনিষ্ট্‌ আশঙ্কায় ভীত আংলো-আমেরিকান সঙ্ঘের কুটনীতির ক্রীড়াক্ষেত্র ভাবেই কাশ্মীরকে দেখেন। পুনরায় স্বদেশের মঙ্গলকামী অনেকে, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায়, ভারতের রক্ষার প্রয়োজনে কাশ্মীরকে প্রথম স্থান দেন। কাশ্মীর আলোচনায় এই প্রত্যেকটি বিষয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং বিশদ আলোচনা পূর্বেই উল্লেখযোগ্য।

কিছুদিন পূর্বে কাশ্মীর যাওয়ার দুইটি পথ ছিল, সুগম না হইলেও দুইটিই বিস্ময়কর ও মনোহর। লাহোর রেল লাইনে একটি রাউলপিণ্ডি হইতে, অপরটি ওয়াজিরাবাদ হইয়া জম্মু হইতে, মোটরে শ্রীনগর পর্যন্ত ২০০ মাইল পথ। শেষেরটি অধিকতর মনোরম। একটিতে গিয়া অপরটিতে ফিরিয়া আসিলে, দুইটিই উপভোগ করা যাইত। প্রথমটিতে ৪০ মাইলের মধ্যে সাড়ে ছয় হাজার ফুট উচ্চ (সমুদ্র হইতে) বিখ্যাত গ্রীষ্মনিবাস মুরির পাহাড়ে উঠিয়া, জেলাম নদীর উপত্যকায় নামিয়া, কোহালা (হাজার ফুট উচ্চ—রাউলপিণ্ডি হইতে কিঞ্চিদধিক) হইতে ডোমেলে কাশ্মীর রাজ্যে ঢুকিয়া ক্রমে ৫২০০ ফুটে, পশ্চিমে বরমুলা হইতে প্রায় ৩০ মাইল সমতল পথে, উপত্যকার কেন্দ্র শ্রীনগর পৌঁছান যাইত। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের নিমিত্ত খ্যাত তক্ষশীলা (ট্যাক্সিলা) এবং সেনানিবাস এবটাবাদ হইয়া, আর একটি পথেও ডোমেলে যাওয়া যাইত।

অপর পথে, রেলে, ক্রীড়া সম্ভারের নির্মাণস্থান শিয়ালকোট হইয়া কাশ্মীরের শীতকালের রাজধানী জম্মু (১০০০ ফুট) হইতে মোটরে প্রথমে প্রায় ৬০০০ ফুট উঁচুতে কুড্‌ পাহাড় পার হইয়া, পুনরায় ২০০০ ফুট উচ্চ চেনার উপত্যকায় রামবানে নামিয়া, প্রায় ৯০০০ ফুট উচ্চ বানিহল মধ্যে ৬৪০ ফুট লম্বা সুড়ঙ্গ পার হইলেই কাশ্মীরের সমগ্র উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয় এবং নামিয়া দক্ষিণ হইতে ৩০ মাইল সমতল পথে শ্রীনগর পৌঁছান যায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে, অমৃতসর হইতে পাঠানকোট হইয়া জম্মু যাওয়ার অন্তর—শুধু হিন্দুস্থান দিয়া, পথ খোলা হইয়াছে।

এই সব পথের বিবরণে কাশ্মীর রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থানের কিছু আভাষ পাওয়া যায়, কাশ্মীরের মোট ৮৪০০০ বর্গ মাইলের মধ্যে, ৩৭,০০০ বর্গ মাইল, অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধাংশ, উত্তর ও পূর্বের পার্বত্য ভূমি লাডাক্‌, ১২,০০০ হইতে ১৫,০০০ ফুট উচ্চ, এবং হিমালয়ের পশ্চিমাংশ ; লোক সংখ্যা নগণ্য—প্রতি বর্গ মাইলে ১ জন, (সমস্ত কাশ্মীরের প্রতি বর্গ মাইলে ৫০ জন) এবং শতকরা ৯০ জন বৌদ্ধ—বাকী মুসলমান ও খৃষ্টান, সুতরাং মুসলমান গরিষ্ঠ বলিয়া পাকিস্থানের দাবী অর্দ্ধেক অংশ সম্বন্ধেই ভিত্তিশূন্য, কাশ্মীরের মুসলমান প্রধানমন্ত্রী ও জননেতা সেক্‌ আবদুল্লা বলিয়াছেন যে মুসলমানপ্রধান হইলেও পাকিস্থানেরই হইবে এই যুক্তিতে আফগানিস্থানের পাকিস্থানে আসা উচিৎ। কাশ্মীরের মোট ৮৭৪০টি গ্রামের মধ্যে লাডাকের গ্রাম সংখ্যা মাত্র ১২০টি, পর্বতগাত্রে কোন সুগম্য

...নিধিদের দলবলে তাড়াইয়া দেয়। তিব্বতের অ্যাংলো আমেরিকার ... নিয়ন্তা এবং প্রতিনিধিদের ঘন ঘন আনাগোনা চলিতে থাকে। ... সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত চীনে আহুত তিব্বতের প্রতিনিধিগণ ... আসিয়া সম্ভ অ্যাংলো আমেরিকান্ পরামর্শের নিমিত্ত ৯ মাস কাল ... দেয়। নিরপেক্ষ ভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে ব্যাপারটি কিরূপ

...ল। পণ্ডিত নেহেরু কিন্তু তিব্বত ব্যাপারে চীনকেই সমর্থন করিয়াছেন। ... না করিয়া উপায়ও নাই। যদিও আদানপ্রদানে, যাতায়াতে, ... বাণিজ্য, কালিম্পং চীন হইতে, লাসার সান্নিধ্যে, তথাপি যুদ্ধের ... উঠিতে পারে না। পাকিস্থান মারফৎ কাশ্মীরে প্রভাব রাখা অ্যাংলো-আমেরিকার মতলব। পাকিস্থান সম্বন্ধে ভারতবর্ষ হইতে প্রবর্তনীয় হইবে

বলিয়া সর্বক্ষেত্রেই পাকিস্থানের অ্যাংলো-আমেরিকান পক্ষপাতিত্ব। পাক-আফগান গোলমাল মিটাইবার চেষ্টায় আমেরিকার উদ্দেশ্য বুঝা যায়। আমেরিকা, ইউ, এন্, ও কে প্রভাবিত করিয়া, ৩ বৎসর ধরিয়া সুস্পষ্ট কারণ সত্ত্বেও আক্রমণকারী পাকিস্থানকে ভারতের সমান স্থান দেয়, কাশ্মীর মীমাংসা হইতেছে না। দেশ বিভাগের কথাও উঠিয়াছে। খুনাখুনীর সংসর্গে না আসিয়া, দূর হইতে এরূপ পরামর্শ আমেরিকাই দিতে পারে, জেনারেল টিটোর বা কোরিয়ার উপর দিয়া এটম্ বম্বের পরীক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল, এখনও পশ্চিম ইউরোপেই পরীক্ষা হইবে। মরিতে বৃটেনই মরিবে—সুদূর আমেরিকা নিশ্চিন্ত।

আমেরিকার যুদ্ধতেই আর্থিক লাভ, লোকসানের আশঙ্কা কম, অথচ বেকার সমস্যার সমাধান। ইন্দোচীনে, জাপানে, হংকং, মালয়, থেইলাণ্ড সর্বত্র জবরদস্তী কার্য্য কলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। মতলব—কালো সৈন্য দ্বারা কালোর উপর আধিপত্য এবং নিজের বাণিজ্যের প্রসার। প্রত্যক্ষ কারণ দেখান যায় কমিউনিষ্ট প্রসারে বাধা প্রদান—এই সবই আমেরিকান রাজনৈতিক চাল।

জামু সহরটি কাশ্মীর রাজ্যের প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। বর্তমানে জামুর পশ্চিমে ও উত্তরে পুঞ্চ, উরি, টিথোয়াল, গুরেজ ও কার্গিলের পাশ দিয়া যুদ্ধবন্ধের সীমানা, যদিও শ্রীনগরের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, বরমুলার লুণ্ঠনে বিলম্ব না করিলে, পাক হানাদারীরা হয়ত শ্রীনগর দখল করিয়া ইতিহাসের স্রোত বদলাইয়া দিতে পারিত। ঐরূপে তাহারা উপরে লেহের ১২ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছিল। সীমানার অপর পারে ভীমবর, মীরপুর, স্কার্দু ও গিলগিট অঞ্চলে, কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্থানের করগ্রস্ত। জামুর উত্তরে চেনাব নদীর উপত্যকার পরে তেরী ... উচ্চ গিরিশ্রেণী; ঝেলাম নদীর উৎপত্তি এইখানে, উত্তরে প্রবাহিত। অনন্তনাগ, কাশ্মীরের দ্বিতীয় সহর, ... ; ...

গিলগিট বর্ক্স

লিডার উপত্যকা

মাইল উত্তরে শ্রীনগর অবস্থিত। লিডার নদী উৎপত্তিও এই পর্বতে এবং লিডার উপত্যকা ও লিডার পর্বত শ্রেণী, জেলাম উপত্যকার পূর্বে উত্তর দিকে বিস্তৃত। শ্রীনগর হইতে এই দুই নদী ধরিয়া প্রথমে দক্ষিণে, পরে উত্তর পূর্ব কোণে প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস পাহালগাঁর (৭০০০ ফুট) ৬২ মাইল মোটরের রাস্তা, পাহালগাঁ হইতে শেষনাগ হ্রদের (১২০০০ ফুট) ধার দিয়া অমরনাথে (১৩০০০ ফুট) পৌঁছিবার প্রধান পথ। অতিশয় দুর্গম হইলেও বহুলোক এই পথে অমরনাথ তীর্থে যায়। প্রকাণ্ড গুহার অভ্যন্তরে (প্রায ১০০ ফুট উচ্চ, প্রস্থ ও গভীর) বরফের শিবমূর্ত্তি অমরনাথে সংবৎসর দেখিতে পাওযা যায। পাহালগাঁ
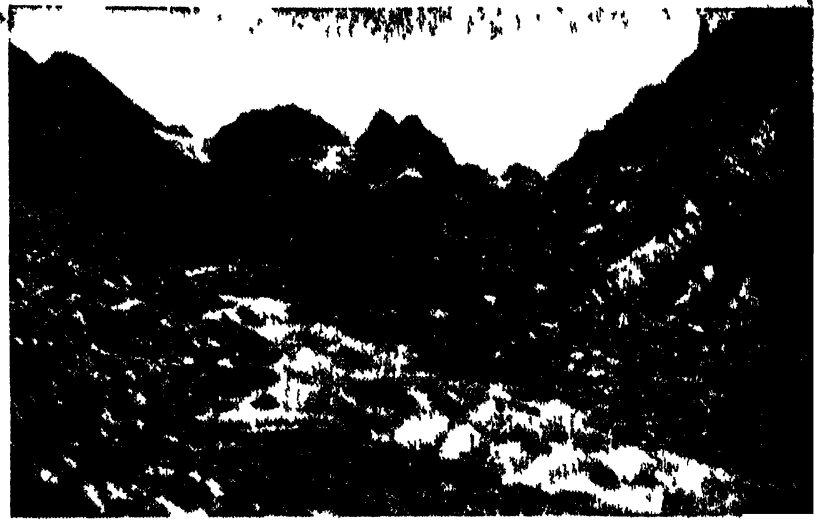
গোলমার্গ

শ্রীনগরের ঠিক পূর্বদিকে এবং লাডাকের পর্বতমালার প্রান্তে। লাডাকের রাজধানী লেহ্, দূরে, আরও পূর্ব, একই রেখায় অবস্থিত। লিডার উপত্যকার ও গিরিশ্রেণীর উত্তরে সিন্ধ নদীর উপত্যকা এবং লাডাকের প্রান্তে সিন্ধু গিরিশ্রেণা, কিন্তু মধ্যে ১৭,০০০ ফুট উচ্চ কোলাহাই গিরিশৃঙ্গ ও গ্লেসিযার এবং উচ্চ ভূমিতে কতকগুলি সুদৃশ্য হ্রদ। লিডার উপত্যকা পাহালগাঁ হইতে সিন্ধ উপত্যকায সোনামার্গ পর্যন্ত এক গ্লেসিয়ারের ধার দিয়া দুইটি দুর্গম পথ আছে। সোনামার্গের উত্তরে প্রায় ১৪০০০, ১৫০০০ হাজার ফুট উচ্চে লাডাকের সীমায় কৃষাণসার, বিশাপসার, গডসার ইত্যাদি কয়েকটি, গ্লেসিযার হইতে পুষ্ট, অতি সুদৃশ্য হ্রদ আছে। দক্ষিণে সোনামার্গ বা উত্তরে গুরেজ হইতে যাওয়া যায। মধ্যে কাঙ্গান হইয়ে শ্রীনগরের উত্তরে হরমুখ পর্বতের গাত্রে, ১২০০০ ফুট উচ্চ, হিন্দু তীর্থস্থান গঙ্গাবল হ্রদ হইয়া, আরও একটি পথ আছে।

শ্রীনগরের পশ্চিমে ৯০০০ ফুট উচ্চ পর্বতের গায়ে, ২৮ মাইল দূরে গুলমার্গ, বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস ও ক্রীড়াকেন্দ্র। সিন্ধ গিরিশ্রেণী জেলাম উপত্যকার উত্তরে বিস্তৃত থাকায় এবং উত্তর পশ্চিম কোণে নাঙ্গা পর্বত (২৬০০০'), দক্ষিণে পীড়পঞ্জল ইত্যাদি উচ্চ গিরিশ্রেণী থাকায়, এই ৮৪ মাইল দীর্ঘ, ২০ মাইল প্রস্থ, বাদামী চকের একটি রেকাবীর মত উপত্যকা চতুর্দিকে ১৪,১৫ হাজার ফুট উচ্চ পর্বত বেষ্টিত। কোন কালে একটি বিশাল হ্রদ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীনগরের আশে পাশে কতকগুলি ছোট বড় সুদৃশ্য হ্রদ ইহাই ইঙ্গিত করে। এই পর্বতগুলী উত্তর দিক হইতে ঠাণ্ডা ও দক্ষিণের গরম হাওয়া হইতে বাঁচাইয়া উপত্যকাটিকে একটি অপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। পর্বতসান্নিধ্যে, অসংখ্য নির্মল জলের ঝরণা ও আঁকাবাঁকা প্রবাহের সৃষ্টি। পরিষ্কার বায়ুর অতিশয় উর্বরা জমিতে চিনার, পাইন ইত্যাদি মূল্যবান ও বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষাদিতে পূর্ণ, এবং বিবিধ পুষ্প ও ফল বাগান এই উপত্যকাটিকে

আসা পর্য্যন্ত জনমত লওয়ার কোন অর্থই হয় না। স্থানীয় ঋতুর পার্থক্যের দরুণও জনমত লওয়া মুস্কিল, কোন এক সময়েই সর্বত্রই পরিষ্কার আবহাওয়া পাওয়া যায় না। পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে জনমত লইয়া কোন রূপেই দেশবিভাগ হইতেই পারে না, কারণ পুনরায় দেশ বিভাগ করিলে, লোক চালাচালির ও খুনাখুনীর ব্যবস্থাই হইবে।

জেলাম নদীর উভয় তীরে ৪ মাইল বিস্তৃত শ্রীনগর সহর; বহু খালে, (পার্বত্য ভেনিস্ সহর বলিয়া খ্যাত), বিলে, নিকটস্থ পদ্মশোভিত হ্রদে এবং উদ্যান ও বৃক্ষাদিতে অত্যাশ্চর্য্য শোভাশালী। পূর্ণ সরঞ্জাম-সহ বহু বজ্‌রায় গমনাগমনের, আমোদ ভ্রমণের এবং বাস করিবার ব্যবস্থা বড়ই আরামপ্রদ। ডালহ্রদ ৫ মাইল দীর্ঘ ও ২ মাইল প্রস্থ, শ্রীনগর হইতেই সুরু, পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত, এবং অনেক নালায় যুক্ত হইয়া পরিভ্রমণের আনন্দ দান করে। প্রমোদ উদ্যানগুলি শ্রীনগরের সন্নিকটবর্ত্তী। কিছু দূরে অবস্থিত উলার হ্রদ, মানসবল হ্রদ ইত্যাদি বাহিরেকে পর্বত গাত্রে উচ্চ ভূমিতে বহু হ্রদের কোন কোনটি উল্লিখিত হইয়াছে।

কাশ্মীরের লোক ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সকল লোকদিগের ন্যায় সুগঠিত এবং গৌরবর্ণ, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশই (শতকরা ৯৫%) নিরক্ষর। কাশ্মীরের শাল এককালে জগৎবিখ্যাত ছিল, নেপোলিয়ানের সময়ে ইহার আদর ছিল। কিন্তু ফরাসী-জার্মাণ যুদ্ধের পর (১৮৭০) ও ১৮৭৭ সনের দুর্ভিক্ষে কারীগরেরা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে, এই শিল্প মন্দীভূত হয়। কিন্তু ইহার স্থলে কার্পেট বুনান সুরু হয়। কাশ্মীরের রূপার কাজ ও কাঠের খোদাই খুবই চমৎকার। কাশ্মীরের রেশম শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তুতগাছ রাজ্যের সম্পত্তি, টাকা দিয়া জন্মান হয়; রেশম পোকার বীজ ও তুতপাতার জন্য পোষাকের মূল্য দিতে হয় না, এবং ককুন নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় হয়। বর্ত্তমান উন্নত পদ্ধতিতে জাম্মুর দুইটি ও কাশ্মীরের ৪টি কারখানায় ৫০০ ও ২০০, ইতালীয় ও

অমরনাথের শিবমূর্ত্তি

নিজেদের তৈয়ারী ঘাইতে ককুন হইতে সূতা তৈয়ারী হয়। কিছুদিন পূর্বে, সমগ্র ভারতের মধ্যে মহীশূরে ৬০ ও মাদ্রাজে ৪০টি উন্নত বাষ্প চালিত ঘাই ছিল। এদিকে বাংলায় প্রাচীন ব্যবস্থায় রেশম শিল্প ক্ষীণই হইতেছিল। কাশ্মীরের জাতয় বিখ্যাত, শ্রীনগর হইতে দক্ষিণে পথের পাশে জাফরাণের একমাত্র জন্মভূমি।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যেদিন আঁধার রজনীর শেষে উদিলে পূর্ব্ব উষা-দিগন্তে,
সেই শুভক্ষণে কোন্ অমরার জ্যোতি নেমে
এল অবনী'পরে
সেদিন সহসা মিলন ঘটালে সীমার সহিত চির-অনন্তে,
দীপিল সেদিন দ্যু-লোক, ভূলোক কোন
আলোকের দিব্য-করে!
সেদিন তোমার প্রথম প্রকাশ হ'ল অচিন্ত্য, ধরার বক্ষে,

সে শুভ সময়ে প্রভাতের পাখী গাহিল সেদিন কাহার গান?
সে প্রেমের গীতি ধ্বনিয়া উঠিল অজ্ঞানতার শয়ন-কক্ষে,
জাগায়ে তুলিল ঘুম-ঘোর হ'তে ত্রিদিবের কোন মধুর তান?
কোন অসীমের নীলিমা লুকায়ে করুণা-নির্ঝর নয়নে তব,
প্রতিভায় তব ঝলকায় কোন কনকোজ্জ্বল শুভ্র-ভাতি?
নরতনুধারী হে মহামানব মনীষায় তোমার উজলি সব।
তোমারে স্মরিয়া পদারবিন্দে প্রণমি তোমায় তুমি অনাদি!

জাহাজে বিলাত

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

পয়লা জুন বোম্বাই সহরের ব্যালার্ড বন্দরে জাহাজ ধরতে হবে। মঙ্গলের ঊষা মুখে পা—৩০শে হাওয়াই জাহাজে বোম্বাই গেলাম। পুত্র, পুত্রবধূ ও তাদের দুটি শিশু কন্যা দু'দিন পূর্বে তাজমহল হোটেলে পৌঁচেছিল।

আমি প্রথম বোম্বাই দেখেছিলাম পঁচিশ বছর পূর্বে। তখন মেরিন ড্রাইভ ছিল না। সমুদ্রের ধারে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে জমি দখল করা হ'য়েছিল। পরাজয় হ'য়েছে সাগরের। মানুষের বল, বুদ্ধি, উৎসাহ ও পরিশ্রম একটি মনোরম স্থান নির্মাণ করেছে—সন্ধ্যায় সাগরের উপকূলে বেড়াবার।

আজ কলিকাতা পরিধিতে এবং অট্টালিকা সম্ভারে সমৃদ্ধ। তার এ বৃদ্ধিও গত পঁচিশ বছরে। কিন্তু এ কয়েক বৎসরে তার লক্ষ্মীশ্রী একেবারে ম্লান। বোম্বাই যেমন গগনস্পর্শী অট্টালিকার গর্ব করতে পারে, তেমনি গর্ব করতে পারে পরিচ্ছন্নতায়। পাকীস্তানের হিন্দুপ্রীতির আশীর্বাদে কলিকাতার যে অবনতি হ'য়েছে সেটা অনিবার্য্য। তার ওপর কলিকাতার নিজস্ব অধিবাসীর কর্মবিমুখতা এবং দারিদ্র্য তাকে ম্লান করেছে। এতো ভাঙা বঙ্গদেশ তবু তার বৈশিষ্ট্য ছাড়েনি। কারণ বাঙালী সমাজই কলিকাতার সমাজ।

বোম্বাই কারও নয়। যার অর্থ আছে, অধ্যবসায় আছে, বুক ঠুকে সামনে দাঁড়াবার সামর্থ্য আছে এ সহর তার। মারাঠি খুব পেছিয়ে পড়েছে, তার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে কিন্তু ব্যবসায়পটুতা নাই। ভাটিয়া বা গুজরাটি ব্যবসায় দক্ষ, তার বাড়-বাড়ন্ত ভালো। দুই শ্রেণীর মুসলমান—বোরা এবং খোজা ব্যবসায়ী। কিন্তু সকল মুসলমানের মত পাকীস্তান চাওয়া। • একপেশটা প্রদেশ। পার্শীর আর সে প্রতিপত্তি নাই। কিন্তু বোম্বাই সহরের বহু অনুষ্ঠানের সঙ্গে পার্শী দেশ-প্রেমিক ধনীর নাম সংশ্লিষ্ট। এলফিনষ্টোন কলেজের প্রকাণ্ড সৌধ, মালাবার শৈলের হ্যাঙ্গিঙ্ গার্ডেনে, সংগ্রহ-শালার অপূর্ব মনোরম চিত্র—সবই পার্শী—টাটা, বেটা প্রভৃতির দান। যাদুঘর সংগ্রহশালা অতি নবীন প্রতিষ্ঠান। সেটি তারাপুরওয়ালার নামে। ভাষাও বহুবিধ। হিন্দী ভাষাভাষী কুলি মজুর। সুতরাং সেথায় হাটে বাজারে হিন্দীরও প্রচলন যথেষ্ট। অবশ্য ইংরাজের রাজত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ, ক্লাব ও হোটেলের বিজয়-বৈজয়ন্তী যেমন সারা হিন্দুস্থানে উড্ডীয়মান বোম্বাইতেও তেমনি। তবে এদেশের লোকের মধ্যে ধনীর প্রাচুর্য্য, তাই মোটর গাড়ী এবং নরনারীর একত্র নাচ কলিকাতা হ'তে অধিক। অবশ্য আমি বলছি না যে নাচতে গেলে ঐশ্বর্য্য চাই। কারণ সন্ধ্যার পর কলিকাতার হোটেলে এবং ক্লাবে নর্তন-বিলাসিনীদের মধ্যে স্থানান্তরিতা পাঞ্জাবিনীই অধিক।

নাচের কথাই যখন উঠলো, তখন স্ট্র্যাথ-ইডেনের নাচের ঘরের উল্লেখ করি। সান্ধ্য-ভোজের পর জাহাজের নাচের ঘরে একটা না একটা হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার লেগে আছেই। কোনোদিন ট্যাম্বোলা বা হাউসি হাউসি জুয়া, কোনোদিন ভালো ঐক্যতান বাজনা, কোনোদিন প্রশ্নোত্তর দেশ হিসাবে। যথা—চারজন অষ্ট্রেলিয়ার লোক একদিকে। অন্যদিকে চারজন ব্রিটিশ। তিনজন বিচারক। ইংরাজ প্রশ্ন করলে—গত দশ বৎসরে ডন্ ব্র্যাডম্যান কতবার শতক দৌড় করেছে? অষ্ট্রেলিয়া জিজ্ঞাসা করলে—আকাশের সর্বোজ্জ্বল তারার নাম কি? সে কোন্ তারকাপুঞ্জে? কিন্তু দশদিনে এ পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী সভা হয় অল্প—অধিকাংশ যাত্রী চায় নাচগান ছায়াচিত্র। তাই ছায়াচিত্র হয় প্রায় প্রতিদিন। নাচ যতবার সম্ভব। এটা পাশ্চাত্য মহিলাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় মহিলারাও অনেকে নাচেন। প্রথমটা একটু বিসদৃশ বোধহয়। কিন্তু যে কুমীর এসেছে তাকে বধ করতে গেলে খাল বোজাতে হয়। কিন্তু ইংরাজ দেশ ছাড়বার পর, তার অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা, শ্রম প্রভৃতি আয়ত্ত করবার আমাদের বিশেষ চেষ্টা নাই। তারা যে সব ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল আমাদের জন্য, সেই রুদ্ধকক্ষের কল্পিত বিলাসে আত্মসমর্পণ করবার প্রচেষ্টা আমাদের প্রচুর। ইংরাজ দেশে থাকতে যে সব রাজকর্মচারী তাদের দখল-করা স্থানে পৌঁছতে পারতো না, আজ তাদের পরিত্যক্ত আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের দেশী অফিসাররা তাদের দক্ষতা সবাই লাভ করতে পারে নি, কিন্তু তাদের দম্ভের উত্তরাধিকারী হয়েছে বহু কর্মচারী। এ দুঃখের কথা—কিন্তু সত্য কথা।

রাত্রে নাচের আসরে পাশ্চাত্য মহিলাদের ঊর্দ্ধের অঙ্গ অনাবৃত হয়। কিন্তু সারাদিন ডেকে ঘোরবার সময়—বিশেষ হৌজে স্নান করবার অজুহাতে—তাদের উপর নিচের অঙ্গে অতি অল্প কাপড় থাকে। ভগবানের ইচ্ছায় ভারতীয় মহিলারা এদের সে ব্যবহারটা নকল করেনি। আর সাড়িও কেহ ছাড়েনি। সেদিন জাহাজে ফ্যান্সি-ড্রেস হল, এই খেয়ালী পরিচ্ছদ উৎসবে ভারতীয় মহিলাদের নিকট বহু মেম সাড়ি ধার করলেন ও পরিধান করলেন। একটি ইংরাজকে আমার পুত্র ধুতি, পাঞ্জাবী, গান্ধী টোপিতে সাজিয়ে দিল। কিন্তু পারিতোষিক পেলে সেই সাহেব যে অষ্ট্রেলিয়ার জমপুরে সেজেছিল। ভদ্রলোক সেজেছিলও ভালো।

একটানা জলের উপর যাত্রা ক'রে মানুষের মন জমি দেখতে চায়, চরণ চায় ভূমিস্পর্শ করতে। পঞ্চম দিনে প্রথম দেখা গেল আরবের কূলের পাহাড়—তরুহীন মরুভোমী। তারপর একদিকে সোমালীর, অন্য দিকে আরবের পাহাড়-ঘেরা দুইকূল। নরনারী বালকবালিকা, যাঁরা আবার দু'বছরের পৌত্রী মরলী আমার দিনে জাহাজের ডেকের রেলের ধারে। কূল হ'তে গাল পাখী এলো ঝাঁকে ঝাঁকে, দু এক ঝাঁক উড়ু উড়ু

মাছ, সূর্য্যের আলোয় উড়ে জল হ'তে উঠে জলে পড়লো। নাবিকেরা সিঁড়ি নামাবার আয়োজন করলে। সবাই এডেনে নামবার জন্য ব্যস্ত—পুরুষেরা পরিষ্কার ধোয়া পোষাক পরলে, মহিলারা ঘটা ক'রে মুখে পাউডার দিলে, ঠোঁট রাঙালে। ক্রমশঃ আরবী থাউ-নৌকা দেখা গেল—এডেনের পাহাড়ী কূল, বাড়ি, ঘর, পাথরের বন্দর-সৌধ মসজিদ্ ঘাটের ধারের মোটর গাড়ি। পাইলট ধীরে ধীরে ঘাটে ভেড়ালে—অর্থাৎ কূল হ'তে কিছুদূরে জলের মাঝে। মোটর বোট এলো—প্রত্যেক যাত্রীকে নিয়ে যেতে নেবে দশ দশ আনা। সবাই তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ শেষ ক'রে বোটে উঠ্লো।

এডেনে নামবার স্থানটি ভালো পাথরের ঘাট—আপেলো বন্দরের মত সুদৃশ্য বা সু-রচিত না হ'লেও, বেশ সুদৃশ্য সৌধ। এর আরবী নাম, তওয়াহি।

এডেন ও তওয়াহি

ভারতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা কর্বার আয়োজনে ইংলণ্ডের পক্ষে এডেনের প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। দুইটি মহাপ্রদেশে খবরদারী করা যায় এমন স্থল হাতে থাকলে—আর তৃতীয় মহাপ্রদেশ আফ্রিকায় ইংরাজের প্রভুত্ব পর্য্যাপ্ত হলেও সব ঘাঁটি বাঁধা বিবেচকের সাম্রাজ্য পরিকল্পনা। তাই ১৮৩৯ সালে ইংরাজ এডেন হস্তগত করেছিল! এর দক্ষিণে হাদ্রামও—সিবামের আমীর হত হয়েছিল। উত্তরে য়িমেনড ছিল নির্জীব। এডেনের আয়তন ৭৫ বর্গমাইল।

১৯৩৭ সাল অবধি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনে ছিল এডেন। তার পর হ'তে এটি ইংলণ্ডের কলোনী, এর শাসন-ভার স্থানীয় ইংরাজী সমর বিভাগের হাতে প্রধানতঃ যদিও এটি উপনিবেশ।

এডেনের বন্দরে পৌঁছে একটি আরব পুলিস কর্মচারীর সাহায্যে ট্যাক্সি সংগ্রহ করলাম। কারণ জানতাম তাদের দংশন তীক্ষ্ণ। ঠিক তাই হ'ল। আধ মাইল গিয়ে লোকটা বল্লে—২ পাউণ্ড লাগবে পাহাড়ের ওপর গেলে।

আমি রুদ্রমূর্ত্তি গ্রহণ করলাম। পুলিস যা' বলবে তাই দেব। একটি সিন্ধী দোকানদার এসে তাকে তিরস্কার করলে। লোকটা বোকামুখ বল্লে—ভদ্রলোক ভুল বুঝেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম, আপনারা কি পাহাড়ের উপর ক্যাণ্টমেণ্ট দেখতে যাবেন।

সোভান আল্লা!

এডেনও বিশ্বজনীন সহর। এখানে বিশেষ ক'রে বাণিজ্য করছে, বোম্বাইয়ের হিন্দু মুসলমান। এডেনে দ্রব্যের উপর কর নাই—ফ্রী পোর্ট। জিনিসপত্র খুব সস্তা। অবশ্য দোকানদারদের শতকরা ১০০্ টাকা লাভ দিয়েও মাল পাওয়া যায় কলিকাতা হ'তে কম দামে। কিন্তু দেশে প্রবেশ করবার সময় কাষ্টম পুষিয়ে নেবে। কাজেই হরে-দরে সমান।

এ সহর ক্ষুদ্র কিন্তু পরিষ্কার। আরবী পোষাক পরিহিত ভদ্রলোক নাই। কুলি মজুর সোমালী অধিক। ব্যবসাদার ভারতীয় বা সিন্ধী কর্তৃপক্ষ ইংরাজ। এবার কলিকাতায় যে গ্রীষ্মের উৎপাত সহ্য করেছি সে অনুপাতে এডেন মোটেই কষ্টকর বোধ হয়নি।

এডেন ছেড়ে লোহিত সাগরের নীল জলে পড়লাম। আমার পৌত্রী সস্মিতা দশ বছরের। ১৯৪৭ সালে সে একবার এই পথে বিলাত গিয়েছিল। এখন সে মুরুব্বি হ'য়েছে। জিজ্ঞাসা করলে—দাদু লাল সমুদ্রের নীল জল কেমন লাগছে?

আমি বল্লাম—সোনার পাথর বাটিতে আমড়ার মিষ্টি টক যেমন লাগে।

এখন আমরা করসিকা সারদিনিয়ার মাঝে—বনিফেস প্রণালীতে। কাল এ চিঠি মার্সেলে ফেলব। ভারতবর্ষের মায়া কাটানো শক্ত, তাই ভারতবর্ষ পত্রিকায় এ দু'ছত্র লিখে পাঠালাম।—নমস্কার।

কেন করি বঞ্চনা

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর কোলে জনম লভিনু মুগ্ধ চকোর সম,
প্রকৃতির বুকে অন্তবিহীন সবুজের উৎসব—
হাসি ও গানেতে ভ'রেছিল যাহা মুকুলিত প্রাণ মম
তটিনীর স্রোতে উছসিছে তারা লীলায়িত অভিনব।
পূরব-তোরণে সোনালী সূর্য্য-রাজরথী বেশে আসে,
সলাজ মাধবী কোমল মেয়েটি প্রণাম করিছে তায়,
দূর্ব্বার বুকে শিশির বিন্দু মুক্তার মত হাসে,
বনানীর শাখে বনবিহগের কলগীতি শোনা যায়।
সরসীর জলে রক্তিম শ্বেত শতদল জেগে ওঠে,
মরাল মিথুন পাশাপাশি দুটি আপন মনেতে ভাসে,
অশোক বকুল পারুলের মৃদু মন্দ সুবাস ছোটে
[illegible] সাহানা বাজিছে মন্দ্র শ্রবণে আসে।

অস্তগগনে ক্লান্ত রবির শেষ রক্তিম রেখা;
মুদিয়া আসিছে তন্দ্রালোলুপ আঁখি পল্লবসম,
বনানীর শিরে গোধূলি-আলোক আঁকিছে স্বর্ণলেখা।
কুমুদিনী হাসে আপনার সুখে হাসে দেখি প্রিয়তম
স্নিগ্ধ সজল ধরার ছবিটি বড়ই মধুর লাগে,
বড় সুন্দর লাগে যে প্রিয়ার আয়ত, আনত আঁখি;
ডুবে থাকি যবে নীড়ের মায়ায় স্বজনের অনুরাগে,
মনে হয় যেন জীবনের সুখ কিছুই নাহিক বাকী।
মানসীর প্রেম, বসুধার শোভা, স্বজনের ভালোবাসা,
ছেড়ে যেতে হবে দিন শেষে হায় [illegible] কিছু কল্পনা,
সৃষ্টির সেই মুক হ'তে মোরা শুধু করি যাওয়া আসা
তবে কেন করি আপনার সাথে এতখানি বঞ্চনা।

লেখক ও সমালোচক

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শুধু সাহিত্য কেন, সব কিছুর সমালোচনাকেই দুই ভাবে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা : গঠন-মূলক ও ধ্বংসমূলক। প্রথম প্রকারের সমালোচনা গঠনের কাজে অর্থাৎ সুন্দর কিছু, শ্রেয় ও প্রেয় কিছু—গড়িয়া তুলিবার কাজে সহায়তা করে এবং দ্বিতীয় প্রকারের সমালোচনা, যেটুকু হইয়াছে সেটুকুও ধ্বংসের পথে আগাইয়া দেয়। ইহা আমরা আমাদের বাংলা সাহিত্যে পূর্ব্বেও দেখিয়াছি—এখনও দেখিতেছি।

কোনও লেখক বা লেখিকার রচনা লইয়া যখন আমরা সমালোচনা করি তখন আসল বস্তুটিকে আর রাখি না—হয় অতি প্রশংসার জন্ত তাহা নিকৃষ্ট হইয়াও পাঠকের কাছে উৎকৃষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়, নতুবা তাহাকে ধূলাৎ করিয়া দিবার চেষ্টায় তাহা অপাঠ্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহা বর্জ্জন করিবার পক্ষে মনের মধ্যে যুক্তিতর্ক চলিতে থাকে। কি প্রকারে আলোচ্য রচনাটি সমালোচনায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পর্য্যায়ে উঠিতে পারে—তাহার কোনও নির্দ্দেশ, ইঙ্গিত বা আভাস না থাকিলে সে সমালোচনাকে আমরা বলি ধ্বংসাত্মক এবং তাহা দ্বারা সমালোচক নিজেই নিজেকে খাটো করিলেন মনে হইলে খুব অপরাধ করা হয় না। এমন খুব কম সাহিত্যিকই আছেন যাঁহারা তাঁহাদের রচনার ধ্বংসাত্মক সমালোচনাকে নিজেদের মহত্ত্ব দ্বারা স্বীকার করিয়া লইয়া রচনাবলীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হন—কিন্তু কোনও রচনার নিরবচ্ছিন্ন ও অপরিমিত বিরুদ্ধ সমালোচনা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিবার মত সাহিত্যিক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ইহাও দেখা যায় যে সমালোচনার লক্ষ্য কি—সাহিত্যিক তাহার আভাস না পাইলেও আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিতে নিজের নূতন পরিকল্পনা, উপলব্ধি ও মননশীলতার দ্বারা নিজেই তাঁহার রচনাকে সত্যকার উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করিলেন। সে স্থলে সমালোচক নিজের অক্ষমতার জন্ত লেখকের কাছে ছোট হইয়া যান। ছোট হইয়া যান এই জন্ত যে তিনি শুধু ধ্বংসাত্মক সমালোচনাই করিয়াছেন—রচনার উৎকর্ষ সাধন করিবার কোনও নির্দ্দেশ বা আভাস তিনি দিতে পারেন নাই—এখানে কৃতিত্বের জন্ত প্রশংসার দাবী একমাত্র লেখকই করিতে পারেন—সমালোচক কখনই নহেন।

যিনি গঠনমূলক বা রচনাত্মক সমালোচনা করেন—লেখকের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি থাকে—রচনার প্রতিও থাকে তাঁহার সত্যকার দরদ। তিনি বলিয়া দেন, দেখাইয়া দেন কেমন করিয়া আলোচ্য রচনার উৎকর্ষ সাধন করা যায়, উদাহরণ দেখাইয়া বলেন যে এই ভাবে ও এই ভাষায় রচনা করার রীতিই শ্রেয়স্তর। এই দিক দিয়া সমালোচক—সাহিত্য-সৃষ্টির পথপ্রদর্শক। প্রগতিভাবাপন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই এরূপ সমালোচনার প্রশংসা করিবেন ; ইহার প্রয়োজন ও সার্থকতা স্বীকার করিয়া লইবেন।

"It will often build good men out of weaklings and better men out of good ones." অর্থাৎ গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা অক্ষমদের মধ্য হইতে সত্যকার ভাল মানুষ তৈরী হইবে—ভাল মানুষদের মধ্য হইতে তৈরী হইবে উৎকৃষ্ট মানুষ। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য, কিন্তু জ্ঞানী ছাড়া এরূপ গঠনমূলক সমালোচনা আর কেহ করিতে পারে না।

আমরা বলি,—যদি শ্রেয়স্তর পথের সন্ধান না দিতে পারি তাহা হইলে আমরা আদৌ সমালোচনা করিব না—কেন না তাহাতে কেহ না কেহ ব্যথিত হইবে—হয়ত বা কেহ সাহিত্য সাধনা হইতে বিরত থাকিবে। অক্ষম লোকের হাতে অপদার্থ সমালোচনা হইতে দেখি বলিয়াই একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে যাঁরা অজ্ঞ অথচ জ্ঞানের বড়াই করে, মস্তিষ্ক নাই অথচ বিদ্যাবত্তার গর্ব্ব করে, হিতাহিত জ্ঞান নাই অথচ লেখকের হিতসাধন করিবার অহঙ্কার রাখে, তাহারা সাহিত্যের বন্ধু নহে ;—কপট বন্ধু অপেক্ষা সহজ ও প্রকাশ্য শত্রুকে বরং আমরা সমাদর করিব কিন্তু তথাকথিত সাহিত্যসমালোচক মাত্রকেই আমরা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে দ্বিধাবোধ করিব না।

সমালোচনার দ্বারা যদি লেখককে উন্নত পন্থায় সাহিত্যসাধনা করিবার কোনও নির্দ্দেশ দিতে না পারা যায় তাহা হইলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া, শুধু বাহাদুরি লইবার মোহে, অথবা সহজপ্রাপ্য অসাহিত্যিক জনসাধারণের নিকট হইতে খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভের চেষ্টায় সমালোচক হইয়া বসিলে সাহিত্যের অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করা হইবে। সেই জন্তই একজন ইংরাজি সাহিত্যের সমালোচক বলিয়াছিলেন—

"If I cannot build myself and other men with my criticism, I will not tear down or destroy with it."

অর্থাৎ আমি যদি আমার সমালোচনার দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে গড়িয়া তুলিতে না পারি তাহা হইলে তাহা দ্বারা আমি কোনও কিছু ছিন্নভিন্ন বা ধ্বংস করিয়া ফেলিতে প্রবৃত্ত হইব না।

সন ১৩২১ সালের সাহিত্য সম্মেলনে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, সাহিত্যের সত্যকার আদর্শের পূজারী, অন্যতম সাহিত্যরথী স্বর্গীয় শশধর রায় মহাশয় সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া সাহিত্যালোচনা সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা আজিকার দিনেও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন—"মানব-কল্যাণ সাধনই যদি যথার্থ ধর্ম্ম হয়, তবে সর্ব্বপ্রকার সাহিত্যালোচনার দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে ; সেই "আলোচনা করিতে আসিলেই হইল।" সাহিত্য আলোচনা বা সমালোচনার আসল কথাটা ইহাই—"সেই আলোচনা করিতে আসিলেই হইল।"

তাই জিজ্ঞাসা করি, আজিকার দিনে আমাদের মধ্যে কয়জন [illegible]

সত্যকার সাহিত্যালোচনা করিতে পারেন? সাহিত্য আলোচনা করিবার মত বিদ্যা বুদ্ধিই বা কয়জনের আছে? যে গভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত মনোভাব থাকিলে নিরপেক্ষ ভাবে সাহিত্য সমালোচনা করা যায় তাহা আমাদের মধ্যে কয়জনের আছে? জ্ঞান বুদ্ধি সীমাবদ্ধ হউক কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টি যদি ব্যক্তিগতবিদ্বেষ-প্রবৃত্তির দ্বারা সংকীর্ণ না হয় তাহা হইলে সমালোচনার জন্য সমালোচক নিন্দাভাজন হইতে পারেন না। নিজের সাহিত্যিক বিদ্যা, সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অনুরাগ থাকিলে সমালোচক নিজেকে নিজে যেমন মর্য্যাদা দেন তেমনি আলোচ্য রচনা ও রচয়িতাকেও মর্য্যাদা দিয়া থাকেন। অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও সে প্রকার সমালোচনা সাহিত্যক্ষেত্রে বর্জ্জনীয় ত নহেই বরং আদরণীয় হইবার অধিকার রাখে।

সমালোচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সহিত সংবেদনশীল মননের একান্ত প্রয়োজন আছে। সমালোচকের স্বধর্ম্মে (এখানে ধর্ম্ম religion অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই) নিষ্ঠা থাকিবে, দেশের সাহিত্য-কর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট মর্য্যাদাবোধ থাকিবে—প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের পূর্ব্বাপর ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিবে—দলীয় মনোভাবের প্রতি অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ও উপেক্ষা থাকিবে, ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা থাকিবে, এবং কোন একটি বিশেষ সাহিত্যিক মতবাদ, কোন একটি বিশেষ আঙ্গিক বা ব্যঞ্জনা, কোন একটি বিশেষ ভাব ধারণা, আদর্শ ও রুচির প্রতি কোনও পক্ষপাত বা আসক্তি থাকিবে না—তবেই আমরা বলিব সাহিত্যের আলোচনা বা সমালোচনা করিবার যোগ্যতা ও অধিকার তাঁহার আছে।

শশধর বাবু ৩৭ বৎসর আগে তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন—আজিকার দিনে তাহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই বলিয়াই এখানে তাঁহার কথার উল্লেখ করা হইল। অবশ্য আধুনিক সাহিত্যিক বা পাঠক শশধর রায়কে চিনিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না —কারণ তাঁহাদের কাছে পূর্ব্বকথিত "স্বধর্ম্মের" কোনও বালাই নাই—তাঁহাদের কাছে আজ বিশেষভাবে পরিচিত এলিয়ট, ওয়েলস্, শ, অ্যালডুস্ হাক্সলি, এজরা পাউণ্ড, গিবসন্, র‍্যালে, গর্কি, আঁদ্রেজিদ্, কার্লমার্কস্—। আজ তাঁহারা মার্কসীয় দর্শন পাঠ করিয়া ভূয়োদর্শনের বড়াই করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আমাদের স্বধর্ম্মে আস্থা নাই বলিয়াই আজ আমরা—ঘরের সাহিত্য ফেলিয়া বাহিরের সাহিত্যের তারিফ করিতেছি। তারিফ করিবার মত বস্তু অবশ্যই সেখানে যথেষ্ট আছে, কিন্তু 'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?' দেশের সাহিত্যকে আমরা যদি অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে না পারি, তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ যদি আমরা সহজভাবে সাহসের সহিত স্বীকার করিয়া লইতে না পারি, তাহা হইলে কোন অধিকারে আমরা সাহিত্যের সমালোচক হইয়া বসিতে চাহিব? তাই বলিতেছিলাম—শশধরবাবুর সাহিত্য-সমালোচনা ও সাবধান বাণী—আমাদিগকে আমাদের সাহিত্য-আলোচনা বা সমালোচনায় সাহায্যই করিবে।

তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের সাহিত্যে আমরা—"কেবল কি স্ত্রী মূর্ত্তির বিলাস-বিজড়িত রূপের বর্ণনাই করিব? যাহাতে কাম-প্রবৃত্তির [illegible] কেবল কি তাহাই করিব? বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন মাসিক পত্রিকার ন্যায় কেবল কি ইন্দ্রিয় লালসা উত্তেজক স্ত্রী মূর্ত্তিই অঙ্কিত করিব? নাটক ও নভেলে নিরবচ্ছিন্ন প্রণয় প্রণয়েরই ছড়াছড়ি করিব? বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সদ্গুণ ও সদনুষ্ঠান সমাজের বিবিধ শ্রেণীর উপকারী হইতে পারে, তাহার চিত্র যথাযোগ্য ভাবে কাব্য-সাহিত্যে অঙ্কিত করিতে পারিলে সাহিত্যও সার্থক হয়, সেবাও সফল হয়। * * * নীচ যাহাতে উন্নত হয়, পতিত যাহাতে পবিত্র হয়, তেমন আদর্শ সৃষ্টি বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্য হইতে কি চিরবিদায় গ্রহণ করিল? * * * কষ্ট করিয়া দশ পাতা যে পড়িতে পারে না, চিন্তা করিয়া দুইটি কথার মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হয় না, কালব্যাপিনী চেষ্টা শুনিলেই যাহাদের দেহে জ্বর আসে, সে ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র চুটকী, চটুল, মজাদার শ্রবণেন্দ্রিয়ের আপাতসুখকর দুই দশ লাইন কবিতা, কি একটু ছোট গল্প ভিন্ন আর কি লিখিবে? কি বা পড়িবে? এখন ইহারই নাম সাহিত্য-সেবা দাঁড়াইয়াছে। ইহা মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ। * * * সকলেই জানেন, আমরা বাঙ্গালী একেবারেই মারা যাইতে বসিয়াছি। সাহিত্য-সেবা দ্বারা কি আমাদিগকে রক্ষা করা যায় না?"

সাহিত্য-সেবা দ্বারা আমরা আমাদিগকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারি—কিন্তু আজ সাহিত্য সেবার পথে অনন্ত বাধা—তন্মধ্যে সাহিত্যিক হিসাবে আমরা নিজেই যে সে পথের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ বাধা। আমরা যে আত্ম-আত্মপ্রতারণার আশ্রয়ে সাহিত্য-সেবক সাজিতে চাহি,—সাহিত্য-সেবা আমাদের উপলক্ষ মাত্র কিন্তু আমাদের আসল লক্ষ্য হইতেছে আত্মনাম ঘোষণা। যে পথে আমরা চলিতেছি—তাহাই যে প্রকৃষ্ট পথ অথবা সে পথ যে পথ নহে—সে লক্ষ্য যে লক্ষ্য নহে, শুধু দিকভ্রান্তকারী আলেয়ার আলো—অতএব আমি যে পথ দেখাইতেছি সেই পথই আসল পথ, একথা বলিয়া কোন সাহিত্য-সমালোচক আমাদের পথ প্রদর্শন করিবেন না।—তাঁহাদের ভাবের ঘরে চুরি—পদে পদে ধরা পড়িতেছে—তাঁহারা বিদ্বেষ প্রবৃত্তি হইতে নিরস্ত হইতে জানেন না। সাহিত্যের আলোচনা হউক উচ্চ স্তরের মনোবৃত্তি লইয়া, সমালোচনা হউক [illegible] মানুষের হিংসা দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও হীনতা ও দীনতার বহু ঊর্দ্ধে থাকিয়া, তবেই আমরা সত্যকার পথে চলিয়া সাহিত্য সেবা দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিব। কিন্তু সাহিত্য আলোচনা যদি আত্ম-প্রচারের পথ হয়, সাহিত্য সমালোচনা যদি সাহিত্যিক বিশেষের প্রতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা এবং তাঁহাকে পাঠক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সেই সমালোচকগণকে—প্লেটোর কথায় বলিতে চাই যে তাঁহারা "always contradictory and refuting……like puppy dogs who delight to tear and pull at all who come near them."

অর্থাৎ অসঙ্গতিপূর্ণ পরস্পর-বিরোধী উক্তি দ্বারা তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রতিপক্ষের সহিত তর্ক করেন—নিকটে পাইলে কুকুর শাবকের মত সকলকে টানা হেঁচড়া করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিতে আনন্দ পান।

আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে সমসাময়িক সাহিত্যিক ও সমালোচকের মধ্যে শুধু যে সাহিত্যের আদর্শ ও রচনার উৎকর্ষ লইয়া

অন্তর থাকে তাহাই নহে, লেখক বিশেষের প্রতি কোনও কোনও সমালোচকের অকারণ বিরূপ মনোভাব থাকায় এই মতান্তর অবশেষে মনান্তরে পরিণতি লাভ করে। ইহাতে সাহিত্য সৃষ্টির পথে নিরুৎসাহ ও নৈরাশ্য আসে। এ সম্পর্কে হেনরি ফিল্ডিং, "টম্ জোন্‌স" গ্রন্থে সমালোচকদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন এবং যে মন্তব্যটি অর্জ র্ণাক শ প্রবন্ধে শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী বিশ্বভারতী পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে সেই মন্তব্যটিই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"Now in reality, the world have paid too great a compliment to critics, and have imagined them men of much greater profundity than they really are. From this complacence, the critics have been emboldened to assume a dictatorial power, and have so far succeeded, that they have now become the masters, and have the assurance to give laws to those authors from whose predecessors they originally received them. The critic rightly considered, is no more than the clerk...... the clerk became the legislator, and those very peremptorily gave laws whose business it was, at first only to transcribe them."

অর্থাৎ—বস্তুতঃ পৃথিবীতে সমালোচকেরা খুব বেশী মাত্রায় সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন—এবং জ্ঞানের যে গভীরতাটুকুর সত্যকার তাঁহারা অধিকারী, অপেক্ষা অনেক বেশী গভীরতা আছে বলিয়া আমরা ধারণা করিয়াছি। এই আত্মপ্রসাদের জন্য তাঁহারা একনায়কত্বের দাবী করিতে সাহসী হইয়াছেন। তাঁহাদের সে দাবী আজ এতদূর পর্য্যন্ত সফল হইয়াছে যে তাঁহারা এখন আমাদের প্রভু হইয়া বসিয়াছেন এবং লেখকগণের পূর্ব্বপুরুষদের কাছ হইতে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম যে বিধান পাইয়াছেন তাহাই এখন তাহাদের উপর চাপাইবার অধিকার পাইয়াছেন। ঠিক বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে সমালোচকগণ কেরাণী ছাড়া আর কিছুই নহেন। কেরাণী বিধানদাতা হইলেন এবং যাঁহাদের পেষা ছিল বিধানগুলি নকল করা তাঁহারাই এগুলি লেখকগণের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় ও চূড়ান্ত বলিয়া জারি করিলেন।

যিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন—তাঁহার সে সৃষ্টির একটি নিজস্ব ধারা আছে—সেই বিশিষ্ট ধারার সহিত তাঁহার সংবেদনশীল মনের সহিত, তাঁহার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার সহিত যদি সমালোচকের সংস্কার, বুদ্ধিবৃত্তি, আদর্শপ্রিয়তা এবং রচনার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করিবার মানের কোনও প্রকার মিল না থাকে তাহা হইলে সে সাহিত্যের সত্যকার সমালোচনা হইতে পারে না;—পারে না বলিয়াই আমাদের দেশের সমালোচকগণ স্বয়ম্ভু হইয়া আত্মঅহঙ্কারে মশগুল থাকেন—লেখকের সঙ্গে কোনও দিকের কোনও বিষয়ে মিল না থাকাতে লেখক ও সমালোচকের মতান্তর ও মনান্তর সর্ব্বজনবিদিত হইয়া পড়ে। সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে? বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে এমনই একজন স্বয়ম্ভু সমালোচকের আবির্ভাবে কমল বনে মত্ত হস্তীর বৃংহিতি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

তবে একথাও ঠিক যে সমালোচনা ছাড়া সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বুঝা সম্ভব নয় এবং সমালোচনার অভাবে মুড়ি মিছরীর দাম এক হইয়া যাইবার আশঙ্কাও থাকে। কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচনা সর্ব্বদাই সমালোচকের সহানুভূতি সাপেক্ষ;—পক্ষপাতিত্ব নহে, সহৃদয় মনোভাবের সহিত বস্তু বিচারের চেষ্টা থাকিলে সমালোচনা সার্থক হয় এবং তাহার দ্বারা সাহিত্যের কল্যাণ ও উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়া থাকে।

লেখককে যেমন নিজের লেখার কঠোর সমালোচক নিজেকেই হইতে হইবে তেমনি সমালোচকের উচিত হইবে লেখকের চোখে দেখা, লেখকের মন লইয়া চিন্তা করা। তফাতের মধ্যে হইবে এইটুকু যে সমালোচক লেখকের পথে চলিতে গিয়া ভাবাবেগে অভিভূত হইবেন না—নিজের সংস্কারজাত নির্দ্দেশে কদাচ কখনও বিভ্রান্ত হইবেন না।

আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে লেখক ও সমালোচকের মধ্যে যোগাযোগকে সম্পূর্ণ কল্যাণকর করিতে হইলে পরস্পরের সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত—মনোভাবে, মতে ও বিশ্বাসে, রুচি প্রবৃত্তিও মতিগতিতে;—নিজের ব্যক্তিত্ব তৎকালের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে বজায় রাখিয়া এই পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও তাহার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করিবার সংকল্প থাকিলে—লেখকের সহিত সমালোচকের বিরোধ হইবার কোনও কারণই ঘটিতে পারে না। সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সেই যোগাযোগ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(পূর্বানুসরণ)

৩

চার্ব্বাকের তপস্যা কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল তাহা কেহ জানে না। হয় তো তাহা কয়েক ঘণ্টা মাত্র, হয় তো তাহা বহু শতাব্দীব্যাপী, কিন্তু সে তপস্যার একনিষ্ঠতায় স্বয়ং পিতামহ একদা বিচলিত হইলেন। চার্ব্বাক যদি এ সময়ে পিতামহকে চাক্ষুষ করিতে পারিত তাহা হইলে তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিত সন্দেহ নাই। এই কমনীয়কান্তি তরুণ যুবককে সে সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ বলিয়া চিনিতেই পারিত না। পিতামহ নূতন সৃষ্টির স্বপ্নে মশগুল হইয়া ছিলেন। তাঁহার কল্পনায় 'স্বৈরচর' নামক একপ্রকার অদ্ভুত জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন বাস্তবে তাহাকে মূর্ত্তিদান করা সম্ভব কিনা। সহসা তাঁহার মনে হইয়াছিল বৃক্ষলতা পশুপক্ষী বা জড়কে এক একটি দেহ-পিঞ্জরে দীর্ঘকালের জন্য আবদ্ধ রাখা নিষ্ঠুরতারই নামান্তর। আর কিছুর জন্য না হোক, বৈচিত্র্যের জন্যও অন্তত এমন একপ্রকার জীব সৃষ্টি করা উচিত যাহারা ইচ্ছামত দেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে পক্ষী বা ব্যাঘ্র বা অন্য কিছু হইতে পারিবে। ভেক সর্প, অথবা সর্প ময়ূরে রূপান্তরিত হইবে। কেবল ইচ্ছা করিলেই গাছের এক ঝাঁক ফুল, এক ঝাঁক প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া যাইবে, পর্ব্বতস্তূপ মেঘস্তূপ হইয়া আকাশে সঞ্চরণ করিতে পারিবে। এই অপূর্ব্ব কল্পনায় তিনি মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। অর্দ্ধ-সৃষ্ট এই জাতীয় কয়েকটি জীব তাঁহার আশেপাশে পড়িয়াছিল। একটি গোক্ষুর সর্পের কিছু অংশ মানবীতে রূপান্তরিত হইয়া তরুণ কান্তি পিতামহের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল, প্রকাণ্ড একটি হীরকখণ্ড ধীরে ধীরে আঙুরগুচ্ছে রূপান্তরিত হইতেছিল. একটি পুষ্পের একটি পাপড়ি পতঙ্গের ডানার আকার ধারণ করিয়া দ্রুত স্পন্দনে নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। পিতামহের কল্পনা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মূর্ত্ত হইতে পারিতেছিল না বিশ্বকর্ম্মার জন্য। সৃষ্টি ব্যাপারে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাই পিতামহের প্রধান সহায়। পিতামহ কল্পনা করেন, কিন্তু সে কল্পনাকে রূপ দেন বিশ্বকর্ম্মা। সৃষ্টির প্রাথমিক পর্ব্বে পিতামহ নিজেই নিজের কল্পনাকে রূপ দিতেন, কিন্তু ক্রমশ এত অসংখ্য সৃষ্টি-কল্পনা তাঁহার চিত্তলোকে ভীড় করিয়া আসিল যে তিনি একজন সহায়কের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তিনি সৃষ্টি করিলেন বিশ্বকর্ম্মাকে। অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মার পিতা প্রভাস এবং মাতা যোগসিদ্ধাকে সৃষ্টি করিলেন। পিতামহই আদিতম স্রষ্টা, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিতে তাঁহার নিজের স্বাক্ষর কোথাও নাই। নিজেকে রহস্যের অন্তরালে গোপন রাখিয়া পিতামাতাকেই সৃষ্টির কারণরূপে পাদপ্রদীপের সম্মুখে প্রকট করিয়া তিনি আনন্দ পান। প্রভাস-যোগসিদ্ধার মাধ্যমে তাই তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃটি ব্যাপারে বিশ্বকর্ম্মাই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। কিছুদিন হইতে—তাঁহার কিন্তু একটা সন্দেহ হইয়াছে। মনে হইতেছে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার সমস্ত কল্পনাকে যেন ঠিকমতো রূপ দিতেছেন না। পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর দ্বারা প্ররোচিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা যেন তাঁহার সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। নতুবা এই সকল অযথা বিলম্বের কারণ কি? কেন ওই গোক্ষুর সর্প এখনও সম্পূর্ণরূপে মানবীতে রূপান্তরিত হয় নাই? ওই আঙুরগুচ্ছে এখনও কেন হীরকের কুচি সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে? তাঁহার ইহাও মনে হইতেছিল এ বিশ্বকর্ম্মা যদি তাঁহার কল্পনাকে রূপ দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি নূতন বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টি করিবেন। অর্দ্ধ-পতঙ্গ পুষ্পটির দিকে চাহিয়া তাঁহার অন্তর করুণার্দ্র হইয়া

ছিল। আহা, বেচারার উড়িবার কি আগ্রহ! এতদিন ধরিয়া কত সহস্র সহস্র পুষ্প মৌন-আগ্রহে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ঝরিয়া গিয়াছে এই কথা ভাবিয়া ক্ষণিকের জন্য তিনি অন্যমনস্কও হইয়া পড়িলেন।

"বিশু—"

"আজ্ঞে যাই"

বিশ্বকর্ম্মা আবির্ভূত হইলেন।

"এদের তুমি এমনভাবে অসম্পূর্ণ করে' রেখেছ কেন বল তো? এদের সম্পূর্ণ কর। আরও অনেক কিছু করতে হবে যে—"

"আমি অবিলম্বে এদের সম্পূর্ণ করে' দিতে পারি। কিন্তু একটা কথা আমার মনে উদিত হওয়াতে আমি ইতস্তত করছি—"

"কি কথা"

"আপনার সৃষ্টিতে এতকাল যে শৃঙ্খলা বর্ত্তমান আছে এই অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্ট হলে সে শৃঙ্খলা আর থাকবে না। এই স্বৈরচর নামক প্রাণী যখন যা খুশী হ'য়ে আপনার সৃষ্টিকে বিশৃঙ্খল করে' তুলবে। ফুল যদি কখনও প্রজাপতি, কখনও পাখী, কখনও ভেক, কখনও বা অপর কিছুতে রূপান্তরিত হ'তে পারে তাহলে সমস্ত প্রাণী সমাজে আলোড়ন উপস্থিত হবে, সকলেই অস্থির হয়ে উঠবে—"

"উঠুক না, তোমার তাতে কি। তোমার বুদ্ধি মোটা বলে' একটা কথা তুমি বুঝতে পার নি। সকলেই স্বৈরচর হ'তে চায়, হ'তে পারে না বলেই যত গোল। যত গোলমালের মূলই ওইখানে। সবাই সব হ'তে চায়। তোমার নিজের ব্যাপারেই দেখ্ না। তোমাকে সৃষ্টি করলাম মিস্ত্রি করে', তুমি নিজের কাজ ছেড়ে আমার কাজ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ। সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা থাকবে কি থাকবে না, তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথার দরকার কি? তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব, বড় জোর বিষ্ণু ঘামাতে পারে। কিন্তু তুমি ঘামাচ্ছ মানে—তুমিও ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণু হতে চাও। আসলে তুমিও মনে মনে একটি স্বৈরচর। তোমারও অনেক কিছু হবার ইচ্ছেটি ষোল-আনা আছে কিন্তু হবার সামর্থ্য নেই। দুনিয়া জুড়ে এই ভাও চলেছে। সেই জন্যেই এত অশান্তি। তাই ঠিক করেছি সত্যি সত্যি এবার স্বৈরচর সৃষ্টি করব। তারা সব কিছু হয়ে দেখুক মজাটা কি। তুমি যদি চাও তোমাকেও ব্রহ্মা বানিয়ে দেব দিন কয়েকের জন্য। এখন এই কাজগুলো শেষ করে' দাও—ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না"

মাথা চুলকাইয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "আজ্ঞে না, আমি মাথা ঘামাই নি। বিষ্ণুই এ নিয়ে চিন্তা করছিলেন এবং বলছিলেন যে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন।"

"ও, বলছিল বুঝি। আমি আগেই বুঝেছি তা। সৃষ্টি-ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কথা বিষ্ণুরও নয়। কিন্তু ওর স্বভাবই হচ্ছে সব বিষয়ে ফোড়ন কাটা। আচ্ছা, সে আমি বিষ্ণুর সঙ্গে বোঝাপড়া করব এখন, তুমি কাজ শুরু করে' দাও—"

বিশ্বকর্ম্মা ইতস্তত করিয়া কি যেন বলিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু একটি গৈরিক-ধারিণী রূপসীর আকস্মিক অভ্যাগমে তিনি থামিয়া গেলেন।

পিতামহ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে"

"আমি সাধনা"

"এখানে কি চাই"

"সিদ্ধি"

"তাহলে গণেশের কাছে যাও। সিদ্ধি বিতরণ করবার জন্যে ওকেই ঠিক করে' রেখেছি আমরা"

"আমি আপনারই উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছি, অন্য কোথাও যাবার আমার শক্তি নেই"

"মুশকিলে ফেললে দেখছি! তুমি কার সাধনা"

"তা তো জানি নে। আমি তাঁর চিত্তলোকে জন্মগ্রহণ করে' আলোক বাহিত হয়ে আপনার উদ্দেশে আসছি। আমি কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত একটি কম্পমান আলোক-তরঙ্গ মাত্র ছিলাম, আপনার দ্বারে এসে সহসা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছি, আমি এতক্ষণ ছিলাম মৌন-আকুতি, আপনার কাছে এসে ভাষা পেয়েছি।' কিন্তু যাঁর চিত্ত-লোকে আমার জন্ম তাঁর কোনও পরিচয় আমি জানি না"

পিতামহের নয়নযুগলে কৌতুক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মনে হইল বহুকাল পূর্ব্বে যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই যেন মূর্ত্তিমতী হইয়াছে।

"বেশ তাহলে তুমি আবার আলোক-তরঙ্গ হয়ে তাঁর চিত্তলোকে ফিরে যাও, আমি দেখি কোথা থেকে তুমি এসেছ"

গৈরিক-ধারিণী তরুণী সঙ্গে সঙ্গে একটি জ্যোতির্ময় আলোক রেখায় রূপান্তরিত হইয়া অন্ধকার মহাশূন্যপথে মর্ত্ত্যের দিকে অবতরণ করিতে লাগিল। পিতামহ এবং বিশ্বকর্ম্মা উভয়েই একটু ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

"ও, সেই ছোকরা—"

পিতামহের মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"কে বলুন তো"

"আরে তুমিই তো তৈরি করেছ ওকে আমার কল্পনা অনুসারে। যুগে যুগে নূতন নূতন নামে নানা কীর্ত্তি করেছে ও? আরও করবে—"

"ঠিক ধরতে পারছি না—"

"বিশ্বামিত্রকে মনে নেই? রাবণকে মনে নেই? আমার মানসপুত্র পুলস্ত্যের কীর্ত্তি শোন নি?"

"আজ্ঞে না, পুলস্ত্য? তিনি বোধহয় অনেক আগে জন্মেছেন, তাঁর কথা আমি জানি না"

"পুলস্ত্য তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমের কাছে গিয়ে তপস্যা করছিল। কিন্তু মুনিকন্যারা আর অপ্সরারা এমন বিরক্ত করতে লাগল তাকে—যে শেষ পর্য্যন্ত সে রেগে মেগে অভিশাপ দিলে, যে মেয়ে তার দৃষ্টির সম্মুখে আসবে সে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হবে। কিছুদিন পরে পড়বি তো পড় তৃণবিন্দুর মেয়ে হবির্ভূই পড়ে গেল তার চোখের সামনে। বাস্ সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ ফলে গেল। তৃণবিন্দুর মাথায় হল বজ্রাঘাত। গর্ভবতী কুমারী মেয়ে নিয়ে সে যুগেও সমাজে বাস করা শক্ত ছিল। তৃণবিন্দু তখন ধরে বসল পুলস্ত্যকে—হবির্ভূকে বিয়ে করতে হবে। অন্যান্য মুনিঋষিরাও এসে ধরলে। পুলস্ত্য একটু কাটখোট্টা রাগী গোছের লোক হলেও লোক ছিল ভাল। হবির্ভূকে বিয়ে করলে সে। হবির্ভূ গর্ভবতী ছিলই, সে প্রসব করলে বিশ্রবাকে। এই বিশ্রবাই রাবণগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ, কুবেরও এর ছেলে। এরা সকলেই তপস্বী কিন্তু সকলেই ঘোর বস্তুতান্ত্রিক। এই ধরণের একদল লোক সৃষ্টি করেছিলাম আমি। এদের হঠকারিতায়, এদের নাস্তিকতায়, এদের শৌর্য্যে বীর্য্যে আমার সৃষ্টিকাব্য বিচিত্র। হিরণ্যকশিপু বিশ্বামিত্র এরা সব ওই দলের। চিরকাল এরা বিদ্রোহ করে' এসেছে। আমার কিন্তু ভারী ভালো লাগে এদের, বুঝলে। এই চার্ব্বাককে নিয়ে একটু রগড় করতে হবে। কয়েকদিন থেকে ওর ঝোঁক হয়েছে আমাকে ও উড়িয়ে দেবে। আমি নেই এই প্রমাণ করবার জন্যে ও অহরহ আমার কথাই ভাবছে—। ওর চিন্তার ধাক্কায় বিচলিত হয়ে সেদিন—না, থাক এখন, সব কথা ভাওব না তোমার কাছে। তুমি যা মুখ-আলগা লোক, এক্ষুণি গিয়ে বিষ্ণুকে সব কথা বলে' দেবে, আর সে এসে এই নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর সুরু করবে। তুমি ওকে এখন ওই মায়ানদী পার হবার ব্যবস্থা করে' দাও। ও বুঝুক যেন ওর তপস্যার জোরেই এটা হল—"

"স্বৈরচর এখন থাক তাহলে—"

"একটা সাঁকো করতে আর কতক্ষণ লাগবে। তারপর স্বৈরচরে হাত দিও। স্বৈরচর করতেই হবে—"

বিশ্বকর্ম্মা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ওই মায়ানদীটি কে—"

"ও হচ্ছে ওই চার্ব্বাকেরই অবচেতন লোকের কামনা"

"ওর ওপরে কি রকম ধরণের সাঁকো আপনি তৈরি করতে বলছেন"

"মায়ানদীর উপর মায়া সাঁকো বানাও"

"কি রকম হবে সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না"

তরুণকান্তি পিতামহ বিশ্বকর্ম্মার নাসিকাগ্রে একটি টোকা দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমার নাকের ডগাটি তো খুব সূক্ষ্ম। বুদ্ধি এত মোটা কেন!"

বিশ্বকর্ম্মা অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

পিতামহ বলিলেন—"আচ্ছা এক কাজ কর। উপনিষদের এক ঋষির শ্লোককেই মূর্ত্ত করে দাও। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—মনে পড়েছে?"

"পড়েছে"

"যাও তবে। বেশী দেরী কোরো না কিন্তু। স্বৈরচরদের তাড়াতাড়ি শেষ করে' ফেলতে হবে"

"আচ্ছা"

বিশ্বকর্ম্মা অপসৃত হইলেন।

বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলে পিতামহ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। বহুবর্ণের বিদ্যুৎকণা তাঁহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলকে বিচিত্র ও বহ্নিময় করিয়া তুলিল। মনে হইতে লাগিল, তরুণকান্তি

পিতামহের দেহের আয়তন ক্রমশ উজ্জ্বলতর কিন্তু ক্ষীণতর হইতেছে। তাঁহার দেহই যেন ধীরে ধীরে অসংখ্য বিদ্যুৎকণায় রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। পিতামহ নূতনতর সৃষ্টি-স্বপ্নের কল্পনা-লীলায় আবিষ্ট হইয়াছিলেন। নূতনতর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন সম্পূর্ণ আলোকময় জীবের সৃষ্টি সম্ভব কি না—যাহার দৈহিক স্থূলতা থাকিবে না—কিন্তু বুদ্ধি থাকিবে, প্রতিভা থাকিবে, গতি থাকিবে। অর্দ্ধ-সমাপ্ত গোক্ষুরমানসী পিতামহের ভাবান্তর দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিল। উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "পিতামহ আমাদের এ ভাবে ফেলে রেখে আপনি কোথায় অন্তর্হিত হচ্ছেন?"

পিতামহ উত্তর দিলেন, "ভবিষ্যৎ লোকে। ভয় পেও না, সেখানে তোমরাও থাকবে। কথা বলে' আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না"

পিতামহের সর্ব্বাঙ্গ হইতে আরও বিদ্যুৎকণা বিস্ফুরিত হইতে লাগিল।

৪

মৃত্তিকা-বিদারণের শব্দে চার্ব্বাকের তপস্যা ভঙ্গ হইল। চার্ব্বাক চাহিয়া দেখিল মায়ানদী তখনও কলকলনাদে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার প্রতি তরঙ্গ তখনও যেন তরলিত আশ্লেষের ভঙ্গীতে তাহার দিকে উন্মুখ হইয়া আছে, স্মরঙ্গমার চোখের চঞ্চল দৃষ্টিও তাহাতে যেন আভাসিত হইতেছে। পুনরায় মৃত্তিকা-বিদারণের শব্দ হইল। চার্ব্বাক সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখ ভাগের মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া একটি তীক্ষ্ণাগ্র শাণিত ছুরিকা ভূতল হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছে। চার্ব্বাক রোমাঞ্চিত-কলেবরে সেই উদীয়মান ছুরিকাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল—কার্য্যের সহিত যখন কারণ অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত, এই বিস্ময়কর ঘটনারও নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। এই বৃহৎ ছুরিকা এ স্থানে কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয় কেহ প্রোথিত করিয়া গিয়াছে। কেন? প্রোথিত ছুরিকাই বা কোন শক্তি বলে এই কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে? চার্ব্বাকের যুক্তিবাদী মন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই অদ্ভুত আবির্ভাবের হেতু নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মনে হইল তপস্যা দ্বারা আত্মস্থ হইতে চাহিয়া তো কোনই ফল হয় নাই। অলৌকিক মায়ানদী তো তেমনই প্রবাহিত হইতেছে, উপরন্তু ছুরিকাকার অদ্ভুত এই ছুরিকাটি কোথা হইতে আসিল? ইহা কি তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ? ক্ষীণভাবে মনে পড়িল—গত রাত্রে পিতামহ-বিষয়ক চিন্তা করিবার পর হইতেই এমন সব অলৌকিক ঘটনাবলী তাহার জীবনে ঘটিতেছে যুক্তির দ্বারা যাহাদের কারণ নির্ণয় করা শক্ত, প্রায় অসম্ভব। যে রূপসীটি নিজেকে তাহার প্রেরণা বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল এ সব কি তাহারই কীর্ত্তি? মেয়েটি কি সত্যই যাদুকরী? সত্যই কি যাদুশক্তি বলিয়া কোনরূপে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি আছে? সম্ভবত নাই। কিন্তু জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না। সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও বোধশক্তি লইয়া অসীম সম্ভাবনার পরিমাপ করা কঠিন। হয়তো পরলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোক, স্বর্গ, নরক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেরই অস্তিত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু "হয়তো"র উপর নির্ভর করিয়া কি চার্ব্বাক তাহার জীবন-যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবে? অসীম অনিশ্চয়তা অপেক্ষা সীমাবদ্ধ নিশ্চয়তা কি বেশী স্বস্তিকর নহে? যাহা প্রত্যক্ষ সত্য, তাহাই কাম্য, সে সত্য যদি সীমাবদ্ধ হয়, পরবর্ত্তী নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় যদি সে সত্যের রূপান্তরও ঘটে তথাপি তাহাই কাম্য। নানাবিধ চিন্তা চার্ব্বাকের মস্তিষ্কে ভীড় করিতে লাগিল।

...ছুরিকাটি কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও শ্লথগতি হয় নাই। চার্ব্বাক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে ছুরিকাটি কিছুদূর ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া ক্রমশ নদীর দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহা নদী অতিক্রম করিয়া গেল এবং পরপারে পুনরায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। যাহা অলৌকিক ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছিল তাহাও আর পরমুহূর্ত্তে অলৌকিক বা অসম্ভব রহিল না, দিব্যজ্যোতিঃসম্পন্ন এক পুরুষ আবির্ভূত হইয়া চার্ব্বাককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি কে, এখানে কি জন্য এসেছেন"

চার্ব্বাক ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল, "আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্রশ্ন করব ভাবছিলাম। আপনি কে"

"আমি পাতাল-নিবাসী রাজপুত্র কালকূট। এখানে এসেছি ওই শবদেহে প্রবেশ করব বলে'। কিছুদিন পূর্ব্বেও এসেছিলাম, কিন্তু এই ছলনাময়ী মায়ানদী আমাকে পার হ'তে দেয় নি। তাই আমি ফিরে গিয়েছিলাম আবার পাতালে। আমার প্রেয়সী নাগকন্যা বর্ণমালিনী বললেন—তুমি আবার ফিরে যাও, আমি আমার জিহ্বা দিয়ে মায়ানদীর উপর সাঁকো তৈরি করে' দেব, তুমি তার উপর দিয়ে মায়ানদী পার হয়ে যাও। ওটা ছুরিকা নয়, নাগকন্যা বর্ণমালিনীর জিহ্বা"—

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ

(শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ)

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস

ফিরে কি আসিবে কভু　　গোবিন্দ এ বৃন্দাবনে
আত্মীয় স্বজনগণ করিতে দর্শন,
সেই মুখ সেই নাসা　　প্রাণঢালা ভালবাসা
স্মিতহাস্যে বিকশিত কমললোচন ?
দাবাগ্নি ও ঝঞ্ঝাবৃষ্টি　　বৃষ সর্প অনিবার্য্য-
মৃত্যু হ'তে রক্ষা করে চির বরণীয়,
হে উদ্ধব, মহাত্মার　　লীলা স্মরি' অনিবার
আঁখিজলে ভাসি হায়, শিথিল ইন্দ্রিয় ।
স্মরিলে কৃষ্ণের লীলা　　সুবঙ্কিম দৃষ্টি হাসি
মনোহর বাক্য তাঁর অমিতবিক্রম,
সরিৎ-পর্ব্বৎ-বন　　মুকুন্দের পদচিহ্নে
ভূষিত পবিত্র ভূমি, জাগায় সম্ভ্রম ।
গর্গের গম্ভীর বাণী　　রাম আর রামকৃষ্ণ
দেবতার মহাকার্য্য করিতে সাধন,
এই ব্রজে ধরাধামে　　অবতীর্ণ লীলাচ্ছলে
দুই শ্রেষ্ঠ দেব আসি', সত্য সে বচন ।
অযুত নাগের বল　　ধরিত পাপাত্মা কংস
সেই কংসে, দুই মল্লে আর গজপতি,
পশুরাজ অনায়াসে　　যথা করে পশুবধ,
রামকৃষ্ণ দুইজনে সংহারে তেমতি ।
গজরাজ যষ্টি যথা　　অবহেলে ভঙ্গ করে
তালত্রয় ধনু তথা করেন ছেদন,
এই ব্রজে এক হাতে　　সপ্ত দিবা সপ্ত নিশা
ধরিয়া ছিলেন তিনি গিরিগোবর্দ্ধন !
সুরাসুরজেতা যত　　প্রলম্ব ধেনুকারিষ্ট
বকাসুর তৃণাবর্ত্তে করেন সংহার ।

(শ্রীশুক)

কৃষ্ণ-স্মৃতি-কথা স্মরি'　　কৃষ্ণ অনুরাগে মত্ত
নন্দ প্রেমে গদ্‌গদ ঝরে অশ্রুধার ।
অতঃপর প্রেমভরে　　নন্দ বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
লীলাবিলা পুত্র কথা বারবার কহি,
যশোদার স্তনধারা　　স্বতঃই ঝরিয়া পড়ে,
বাৎসল্য ও প্রেমভরে বক্ষময় বহি ।

(শ্রীউদ্ধব)

হে মানদ, ধরাধামে　　আপনারা শ্লাঘ্যতম
ভগবান নারায়ণে এতাদৃশ মতি !
তিনি অখিলের গুরু　　তিনি আদি তিনি অন্ত,
তিনি মধ্য মরলোকে তিনি পরাগতি ।
এ বিশ্বের দোঁহে প্রাণবীজ,
রামকৃষ্ণ চিত্ত সরোসিজ ।
এ আকাশ, এ ধরণী, ক্ষিতি,
সর্ব্বভূতে অনুক্ষণ স্থিতি ।
প্রবেশিয়া যত ভূতগণ
রামকৃষ্ণ করে নিয়ন্ত্রণ ;
জীবের বিবিধ ভেদকারী,
ধরণীতে দোঁহে দেহধারী ।
মৃত্যুকালে যদি কোনজন
ক্ষণমাত্র স্মরে সে-চরণ,
সর্ব্ব কর্ম্মফল নাশ হয়,
অন্তিমে শ্রীভগবানে লয় ।
নিখিলের সে আত্মায়, দোঁহে
পূজিলেন অতি সমারোহে,
হে মহাত্মা, সুকৃতির আর
বাকী কিছু নাই দুজনার !
অচ্যুত অচিরকাল মধ্যেই এ ব্রজে—
মাতাপিতা উভয়ের সন্তোষ বিধানে
আসিবেন সুনিশ্চয় সাত্বতার পতি
আবার এ ব্রজবাসী পাবে ভগবানে ।
রঙ্গমধ্যে কংসরাজে করিয়া সংহার,
সভামধ্যে যেই বাক্য বলিলেন হরি,
নিশ্চয় সে সত্যরক্ষা করিবেন ত্বরা
আসার আশায় রহ, বিরহ পাশরি' !
মনে কেন রহে খেদ শীঘ্রই নিকটে
দর্শন পাইবে পুনঃ প্রাণের অচ্যুতে ;
অগ্নি যথা কাষ্ঠ মধ্যে সদা বিরাজিত,
চিত্তে তিনি বিরাজিত, আছে সর্ব্বভূতে ।

ভারতের রাস্তাঘাট

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে ভাল করে বাঁচবার যে সব পরিকল্পনা বিভিন্ন দেশ ও জাতির প্রয়োজন অনুসারে গড়ে তোলা হয়েছে, সেসব পরিকল্পনার প্রধান একটি হচ্ছে দেশের রাস্তাঘাট নিয়ে। প্রাচীন জগতে সভ্যতার আলো মানুষ দেশদেশান্তরে বয়ে নিয়ে গিয়েছে হয় জলপথে, না হয় স্থলপথে। সেই থেকে নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, অরণ্য-প্রান্তর, পাহাড় মরুভূমি করে নানা প্রাকৃতিক বিচিত্রতার উপর দিয়ে পথের রেখাপাত করা গিয়েছে। পথের প্রয়োজনীয়তা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ উপলব্ধি করেছে সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে এ প্রয়োজনীয়তার এক নূতন রূপ দেখা দিয়েছে।

মানুষের শরীরে নানা ধমনী, শিরা-উপশিরা যেমন দেহের স্বাস্থ্য অটুট রাখে রক্তের স্রোত সারা দেহে প্রবাহমান রেখে—ঠিক তেমনই দেশের উন্নতি, আর দেশের সৌভাগ্য সূচনা করে রাস্তাঘাট,—লোকজন, মালপত্তর যাতায়াতের সুযোগ করে দিয়ে। কোন সভ্যসমাজই অন্যান্য সমাজগুলোর সঙ্গে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব না রেখে চলতে পারে না। এমন কি স্বার্থের খাতিরেও। কৃষক যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন করছে সে খাদ্যশস্য বিক্রী করার প্রয়োজনে হাটে বাজারে নিয়ে যাওয়া চাই। সেই ভাবে কৃষকের দরকারে আসে এমন সব জিনিষ তাকে হাট-বাজার থেকে কিনতে হয়।

সহরে যারা বাস করেন তাঁদের স্বস্তি, আরামের জন্য রাস্তাঘাট একান্ত দরকার। ব্যবসায়ী তার গাড়ী করে কাজে বেরিয়ে যাচ্ছে, ডাক্তার যাচ্ছে রোগী দেখতে, শিক্ষক যাচ্ছে শিক্ষালয়ে, কেরাণী যাচ্ছে তার কর্ম্মস্থলে, আর শ্রমিক যাচ্ছে কলকারখানায়। এত সব কর্ম্মীর যাতায়াতের সুবিধের জন্য চাই রাস্তা; এ রাস্তা সহজেই কর্ম্মীর কর্ম্মস্থলে যাওয়া-আসার বন্দোবস্ত করে দেবে। ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধের সমষ্টি করলে রাস্তার প্রয়োজনীতা জাতীয় স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বিজড়িত দেখা যাবে। এ ভাবের দৃষ্টি নিয়ে দেশের পথঘাটের ব্যবস্থা লক্ষ্য করার চেষ্টা বহু প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে এসেছে। তবে সরকারী ব্যবস্থায় পথঘাটের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন আজকাল যত বেশী হচ্ছে আগে তত হয় নি। বিশ বছর কালের ভেতর পৃথিবীর বুকে দু'দুটো মহাসমর ঘটে যাওয়ার পর মানবসমাজ চাইছে শান্তিতে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে। সব দেশেই সমান তালে নদীর জল বেঁধে নানা কাজে সেই জল ব্যবহার করার প্রচেষ্টা চলেছে; কৃষি-কাজকে বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা ভাবে ফলপ্রসূ করার আয়োজন হয়েছে; দেশের নানা শিল্পকে ক্রমাগত বর্দ্ধিতায়তন করে তোলা হচ্ছে। এত সব উন্নতির আয়োজন কোন বিশেষ কাজে আসবে না, যদি না দেশের রাস্তা-ঘাটগুলোকে প্রয়োজন মত উন্নত করা হয়—আর দেশের চারিদিকে নূতন পথঘাট উন্মুক্ত করা হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই সরকার ও জনসাধারণ দেশের যেসব অব্যবস্থা প্রকট হয়ে উঠেছিল সেগুলোর দিকে নজর দিলেন। খাদ্য-সমস্যাই ছিল সব চাইতে বড় সমস্যা। এ সমস্যার সমুচিত সমাধান আজও করা যায় নি। এ সমস্যার দুটো দিক রয়েছে,—প্রথমতঃ, বেশী খাদ্য ফলানো; দ্বিতীয়তঃ, দেশময় খাদ্য বিতরণের কার্য্যকরী ব্যবস্থা। সমস্যার দ্বিতীয় দিকটার দিকে নজর দিতে গেলে দেশের রাস্তাঘাটগুলোর সুবন্দোবস্ত করার এবং নূতন রাস্তাঘাট তৈরী করার পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক বলে মনে হবে। দেশের নানা অংশে কৃষিকাজ প্রসারিত করার ফল ফলবে তখনই—যখন নূতন রাস্তাঘাট দেশের সেসব অংশকে অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযোজিত করতে পারবে। এদেশে গ্রামোন্নয়নের কাজ সুরু করার প্রারম্ভেই রাস্তাঘাট তৈরীর কাজ সুরু করা প্রয়োজন।

কেবল যে খাদ্য-সমস্যার আংশিক সমাধান, কৃষিকাজের প্রসার আর গ্রামোন্নয়নই হবে সকল দেশের বুকে নানা নূতন পথ অঙ্কিত করার ফলে এমন নয়, পথ এনে দেবে দেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমাজগুলোর মাঝে এক কৃষ্টিগত নিবিড় সম্বন্ধ। এদেশের গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ অজ্ঞতা, মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত কারণ শহরগুলোর সঙ্গে গ্রামগুলোর কোন যোগাযোগ প্রায় নেই-ই। দেশের সর্ব্বাঙ্গে পথের রেখাঙ্কন ঘটলে সেই সব পথে ভ্রাম্যমান পাঠাগার, খবরের কাগজ অথবা বিভিন্ন সাময়িক পত্র, নানারূপ শিক্ষাদীক্ষার আয়োজন গ্রামগুলোর দিকে অভিযান করবেই করবে। এ ভাবে শহর আর গ্রামের মাঝে আদানপ্রদান ঘটার সুযোগ হবে। এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে ভাবের দেওয়া-নেওয়া করায় দেশে জাতীয়তাবোধের এক বিরাট সৌধ উঠবে গড়ে।

আজ দেশরক্ষার ভার আর বিদেশীর হাতে ন্যস্ত নেই, এ ভার আমাদেরই বইতে হচ্ছে। তাই, আমাদের ভাবনা, কি করে এ নূতন দায়িত্ব আমরা বইব। ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ, এদেশের সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ করার কাজ নেহাৎ ছোটখাট ব্যাপার নয়। কত লোকজন, অস্ত্র-শস্ত্র, সাজসরঞ্জাম সেজন্যে প্রয়োজন। তবে যদি দেশে রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা থাকে, তবে দেশের সর্ব্বত্র সৈন্যসামন্ত ছড়িয়ে রাখার প্রয়োজন হবে না। কোন এক স্থানে একদল সৈন্য থাকলে সেই দলকে প্রয়োজন মত নানা দিকে নানা সময়ে পাঠানো যেতে পারে।

রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তা এবং কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করলে বলতে হয় রাস্তাঘাটই দেশের উন্নতির প্রতীক।

ভারতবর্ষের আয়তন ১২ লক্ষ ১০ হাজার বর্গ মাইল, আর এদেশে প্রায় দু'লক্ষ ৪০ হাজার মাইল রাস্তা বর্ত্তমান। অতএব প্রতি বর্গ মাইলে দশমিক দুই মাইল রাস্তা। আমেরিকায় প্রতি বর্গ মাইলে ১·০১ মাইল, আর যুক্তরাষ্ট্রে ২·০২ মাইল রাস্তা রয়েছে। এ হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে

যে ভারতের তুলনায় ফ্রান্সে ১০ গুণ, আর আমেরিকায় ৫ গুণ বেশী রাস্তা-ঘাট বর্তমান।

এদেশে কেবল যে রাস্তাঘাটের অপ্রতুলতা এমনই নয় ; যেসব রাস্তা-ঘাট রয়েছে সেগুলোও যথাযথ উন্নত নয় ; আর যেসব রাস্তাঘাট শহরের গা ঘেঁসে রয়েছে সেগুলো যতটা কার্য্যকরী, গ্রামের রাস্তাগুলো ততটা নয়। দেশের যেসব অংশে নদীনালার প্রাচুর্য্য সেসব অংশে রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে। দেশের অনেক গ্রামই কাছাকাছি শহরের সঙ্গে যথাযথ ভাবে সংযুক্ত নয়।

এ দেশের রাস্তাঘাট অপ্রতুল, সামঞ্জস্যহীন ও অকেজো, কিন্তু এদেশে রাস্তাঘাটের প্রয়োজনীয়তা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে স্বীকৃত হয়েছে। সিন্ধু প্রদেশে (বর্তমানে পাকিস্থান অঞ্চল) যে মৃতের শহর,—মোহেঞ্জোদারো,—আবিষ্কৃত হয়েছে সেই শহরের রাস্তাঘাট লক্ষ্য করলে বলতে হয় যে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এ দেশের অধিবাসীরা রাস্তাঘাট তৈরী করার সব প্রধান প্রধান বিধি ব্যবস্থাগুলো আয়ত্ত করেছিলেন। তবে মোহেঞ্জোদারো শহরে গাড়ী ঘোড়া চলত বলে মনে হয় না। ঘোড়ার কথা ছেড়ে দিলেও গরুর গাড়ীর প্রচলন ছিল বলেও বলা চলে না।

তবে পাঞ্জাব অঞ্চলে হারাপ্পা বলে যে প্রাচীন শহর অধুনা ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কার করা গিয়েছে এ শহরে দু'চাকার গাড়ী ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। পৃথিবীর প্রাচীনতম গাড়ীর তামা দিয়ে তৈরী এক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। আর্য্যরা যখন এদেশে বসবাস আরম্ভ করে দিয়েছেন সেসময়ে নানা প্রাচীন গ্রন্থে রাস্তার কথা বলা হয়েছে। কেবল যে দু'পেয়ে পথই সেকালে ছিল এমন-নয়, রাজপথও বর্তমান ছিল। এ পথ পায়ে হেঁটে চলার ফলে তৈরী হয়নি, এ পথ রীতিমত মাটি পাথর দিয়ে তৈরী করা গিয়েছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহারাজ বিম্বিসার রাজগৃহ অঞ্চলে এক রাজপথ নির্ম্মাণ করান। সেকালে এদেশে হিয়ুয়েন সাঙ্ নামে যে চীনা পর্য্যটক আসেন তাঁর রচিত বিবরণীতে রাজগৃহের রাজপথ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়। রাজা বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য স্বয়ং এ পথে হেঁটে গিয়েছেন। এ রাজপথের সামান্য পরিচয় আজও পাওয়া যায়। অব্যবহারের দরুণ এ রাজপথ আজ অরণ্যাকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

মৌর্য্যযুগে রাজপথ ও অন্যান্য পথ তৈরীর কাজ বেশ এগিয়ে গিয়েছিল। এ দেশে সুযোগ-সুবিধে অনুসারে রাস্তাঘাট তৈরীর নানা সাধারণ নিয়ম-কানুন প্রচলিত হয়েছে, তারপর গ্রীকরা যখন সেকেন্দর শাহের নেতৃত্বে এ দেশে এলো, তারা রাস্তা তৈরী সম্বন্ধে নানা অভিনব তথ্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। তাই মৌর্য্যযুগে রচিত কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" রাস্তাঘাট সম্বন্ধে যে যে সব বিধি নিষেধ লিপিবদ্ধ আছে সেগুলোর পর্য্যালোচনা করলে এদেশে রাস্তাঘাটের ক্রমোন্নতি সহজেই লক্ষ্য করা যাবে। সেকালে রাস্তাঘাটের যে বিভিন্ন বিভাগ করা হয়েছিল সে বিভাগগুলো হল এরূপ—যানবাহনের উপযুক্ত রাস্তা, রাজপথ, স্থানীয় গ্রাম্য পথ, সৈন্যদের চলাফেরার জন্য নির্দিষ্ট পথ, শ্মশান ভূমিতে যাওয়ার রাস্তা, সর্ব্বসাধারণের রাস্তা, যাত্রীদের পথ, বনের পথ, শিকারে যাওয়ার রাস্তা, জন্তু চলার পথ, পায়ে হাঁটা পথ। এ সব নানা ধরণের রাস্তাগুলোর আকার প্রকার বিভিন্ন। যানবাহনের রাস্তা আর সাধারণ রাজপথগুলোর প্রস্থ হবে ১৬ হাত। সৈন্য চলাচলের রাস্তা, আর এক শহর থেকে অন্য শহর—বা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার যে রাস্তা (যাকে আজকাল বলা হয় জাতীয় রাস্তা) সেগুলোর প্রস্থ হবে ৩২ হাত।

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীকালে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণের রাস্তাঘাটগুলোর তদারক করার ভার এক বিশেষ বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকত। দূরত্ব জানিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিম্বা দিক-নির্দ্দেশ করার প্রয়োজনে রাস্তার এক এক স্থানে পাথরের স্তম্ভ প্রোথিত করা হয়। সেকালে এক প্রশস্ত রাজপথ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রের যোগাযোগ সাধন করত।

সম্রাট অশোক যখন সিংহাসনে আরোহণ করলেন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়ে পড়েছিল। তাই রাস্তাঘাটের প্রতি সর্ব্বাধিক মনসংযোগ করার প্রয়োজনীয়তা সম্রাট অশোক উপলব্ধি করেছিলেন। রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ করার ব্যবস্থা উনিই করেন। উদ্দেশ্য, পথচারী শ্রান্ত পথিক গাছতলায় বিশ্রাম করতে পারবে। কিছুটা দূরে রাস্তার পাশে থাকবে আমের বাগান, সেই বাগানে থাকবে একটা কুয়ো, আর যাত্রিদের জন্য বিশ্রামাগার। পঞ্চম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন এদেশে আসেন ; তিনি রাস্তার পাশে যাত্রিদের জন্য বিশ্রামাগার দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সে সম্বন্ধে বিবরণ লেখেন।

মুসলমানেরা এদেশে রাজত্ব করার আমলেও রাস্তাঘাট পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনের কাজ যথেষ্ট হয়েছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আরবীয় পরিব্রাজক ইবন্ বতুতা এদেশে আসেন। তাঁর লেখা বিবরণীতে তদানীন্তন সম্রাট মহম্মদ তুগ্‌লকের দিল্লী থেকে দৌলতাবাদ যাওয়ার ঘটনাটি সবিশেষ বর্ণিত হয়েছে। এ অভিযান ৪০ দিন ধরে চলে ; আর যে রাস্তার উপর দিয়ে এ অভিযান চলে সে-রাস্তার দু'পাশে নানা গাছ সারি দিয়ে লাগান হয়েছে ; তারপর, কতকটা দূরে দূরে রয়েছে বাগান, যে বাগানে যাত্রীরা বিশ্রাম করতে পারে ; প্রতি তিন মাইল দূরে দূরে রয়েছে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা।

পাঠান সম্রাট শেরশাহের সময় রাস্তাঘাটের প্রভূত উন্নতি করা হয়। সেকালের বিবরণী থেকে জানা যায় সে সম্রাট গরীব পথচারীদের জন্য কিছু দূর অন্তর এক একটা সরাই স্থাপন করেছিলেন। কেবল তাই নয়, রাস্তার পাশে গাছ লাগিয়ে দিয়েছিলেন যাতে পথশ্রমক্লান্ত পথিকরা সেসব গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে পারে। সম্রাট শেরশাহ বাঙলা থেকে পাঞ্জাব, আগ্রা থেকে যোধপুর, আগ্রা থেকে বুরহানপুর, লাহোর থেকে মুলতান করে কয়েকটি নূতন রাস্তার পত্তন করেন।

মোঘল সম্রাটদের আমলে রাস্তাঘাট তৈরীর কাজ বেশ এগিয়ে চলেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লী থেকে লাহোর, লাহোর থেকে আটক, আটক থেকে কাবুল, কাবুল থেকে কান্দাহার, গুজরাট থেকে শ্রীনগর, লাহোর থেকে মুলতান, দিল্লী থেকে আজমীর, দিল্লী থেকে পাটনা, দিল্লী থেকে কোল, আগ্রা থেকে এলাহাবাদ, বিজাপুর থেকে

তদারকী করে নানা নূতন রাস্তা তৈরী কিম্বা পুরোণ রাস্তার সংস্কার করা হয়। সেকালের ভারতবর্ষে পথঘাটের যেন এক জাল বোনা হয়। এসব খবর পাওয়া যাবে নানা বিবরণী থেকে।

ফরাসের পর্য্যটক ট্রাভারনিয়ার সপ্তদশ শতাব্দীতে এদেশে আসেন। বলদের গাড়ী করে তিনি এদেশের অনেক স্থানে গিয়েছেন। এভাবে যাতায়াত করার অসুবিধে কেবলমাত্র বর্ষাকালেই উপস্থিত হত। অবিশ্যি ব্রাহ্মণ গ্রামে রাস্তায় চলাফেরার অসুবিধে ছিল খাবার জল জোগাড় করে নেওয়ার। যা হোক, এ অসুবিধে দেশের সব অংশে সমান ভাবে দেখা দিত না।

মোঘলদের পর এদেশের রাজলক্ষ্মী বৃটিশ বণিকের হাতে বন্দিনী হয়ে পড়লেন। বণিকের দল এদেশের প্রাকৃতিক ও শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার চালানির কাজে এত ব্যস্ত রইল প্রায় শতাব্দীকাল সময়—যে সেসময়ের মধ্যে এদেশের রাস্তাঘাট উন্নত করার কোন প্রচেষ্টাই ঘটল না। তারপর এদেশে রেলপথ খোলা হল। এরূপ নূতন যানবাহনের প্রবর্ত্তন হওয়ায় রাস্তাঘাট তৈরীর কাজ স্থানীয় প্রয়োজন ও স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় পর্য্যবসিত হল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার রাস্তাঘাট তৈরী ও রক্ষার কাজ প্রাদেশিক সরকারের হাতে তুলে দিলেন। প্রাদেশিক সরকার তাঁর দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক নানা প্রতিষ্ঠানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। কেবল যেসব রাস্তা সৈন্য চলাচল করার প্রয়োজনে আসতে পারে, কিম্বা যেসব রাস্তা বৃটিশ ভারতের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলোর যোগাযোগ সাধন করেছে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্ম্মাণের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার মাঝে মাঝে মনঃসংযোগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

এদেশে রাস্তাঘাটের কাজ যতই কমে আসতে লাগল ততই যেন পথচলার নানা নূতন সমস্যা দিল দেখা। প্রথম মহাসমর শেষ হওয়ার ঠিক পরেই এদেশের রাস্তায় মোটর গাড়ীর প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। সারা দেশে প্রাচীন বলদের গাড়ীর পাশে দ্রুতগতি মোটর গাড়ী চলতে সুরু করেছে। মোটর গাড়ীর চাই সমতল টানা রাস্তা, আর গরুর গাড়ী সেই রাস্তার নানা ক্ষতি সাধন করে চলেছে। তারপর, দেশে যে পরিমাণ মোটর গাড়ী এসে জমা হয়েছে, তাদের চলেফিরে বেড়াবার মত আরও বহু নূতন রাস্তা তৈরী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল। একে, এ প্রয়োজনীয়তা দূর করার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই হল না, তার উপর দিনের পর দিন দেশের রাস্তাগুলো খারাপ হয়ে যেতে লাগল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এ অবস্থার প্রতি সরকার দৃষ্টি দিতে বাধ্য হলেন। পর্য্যবেক্ষণের ফলে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান গেল তার স্বরূপটি ছিল এরূপ :—কেন্দ্রীয় সরকার রাস্তাঘাট তৈরী ও রক্ষণের জন্য একটি তহবিল সৃষ্টি করবেন। এ তহবিলের টাকা সংগ্রহ করা হবে পেট্রল বিক্রির উপর এক নজরানা আদায় করে। এ টাকার একটা অংশ খরচ হবে জাতীয় রাস্তাঘাট সম্বন্ধে নানা গবেষণার কাজে—আর বাকী টাকাটা নানা প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যকে প্রয়োজনমত ভাগ করে দেওয়া হবে, সেসব প্রদেশ অথবা রাজ্যে রাস্তাঘাটের কাজ চালু রাখতে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রাস্তাঘাটের তহবিল খোলা হল। কেন্দ্রীয় সরকার এ তহবিলের টাকা এক বিশেষ সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী খরচ করে চললেন। যদিও তহবিলটি প্রথমতঃ পাঁচ বছরের জন্য খোলা হয় পরে কিন্তু এ তহবিলটি প্রায় স্থায়ী হয়েই পড়ল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ থেকে দশ বছরের মধ্যে রাস্তাঘাট তহবিলের টাকায় অনেক কিছু কাজ করা সম্ভব হল। ১২শ' মাইলেরও উপর কন্‌ক্রিটের নূতন রাস্তা গড়ে উঠল ; ১৫শ' মাইলের মত সাধারণ রাস্তা তৈরী হল, আর ২২শ' মাইলের মত পুরোণ রাস্তার উন্নতি করা গেল। সেই সঙ্গে ৩৪২টি নূতন সেতুর নির্ম্মাণ কাজ শেষ হল, আর কতশত পুরোণ সেতুগুলোকে কার্য্যকরী করে তোলা হল।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় রাস্তাঘাট সংসদ উঠল গড়ে। এ আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানটি নানাভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করে এসেছে, আজও করছে। ভারতের ভবিষ্যত রাস্তাঘাটের পরিকল্পনা ও উন্নতির কাজে এ সংসদ এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করবে বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয় মহাসমর, এবং তারই অব্যবহিত পরে—ভারতের স্বাধীনতা,—এ দু'টি ঘটনা এদেশের রাস্তাঘাট রচনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সমস্ত দোষ ত্রুটি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এনে দিয়েছে। শত্রুর আক্রমণ হলে এ দেশকে রক্ষা করার প্রয়োজনেই আরও বহু নূতন রাস্তাঘাট উন্মুক্ত করা চাই-ই। সেজন্যে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে বহু টাকা ব্যয় করে বসেছেন ; সেই টাকায় অনেক কাজও করা হয়েছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের রাস্তা বিশারদেরা নাগপুর শহরে মিলিত হন। তাঁরা অনেক বিচার বিবেচনার পর নূতন রাস্তাঘাট তৈরীর উদ্দেশ্যে এক দশ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করেছেন। নাগপুর সম্মেলনে রাস্তাঘাটের যেসব বিভিন্ন বিভাগ করা গিয়েছে তার সংখ্যা মাত্র পাঁচটি। এদেশের সমস্ত রাস্তা এ পাঁচটি ভাগের যে কোন একটিতে স্থান গ্রহণ করবে। ভাগ পাঁচটি এরূপ—জাতীয় রাজপথ, রাষ্ট্রীয় রাজপথ, স্থানীয় রাস্তা (বড় আর ছোট), আর গ্রাম্যপথ। জাতীয় রাজপথগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানীগুলোকে শৃঙ্খলিত করে রাখবে, সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন বন্দরগুলোকেও। এসব রাস্তার রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট, আবশ্যক হলে এসব রাস্তায় সৈন্য চালনা করা যেতে পারবে। জাতীয় রাজপথগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অন্যান্য ছোট বড় সব রাস্তা তৈরী করা হবে। জাতীয় রাজপথগুলোর মোট দূরত্ব স্থির করা হয়েছে ২২ হাজার মাইল। এসব পথ তৈরীর কাজে ব্যয়ের যে হিসেব করা হয়েছে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৭ কোটি টাকায়। সব রাস্তার মোট হিসেব করা হয়েছে ৪০০ হাজার মাইল, খরচ ৪৫০ কোটি টাকা।

জাতীয় রাজপথের রচনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক রাষ্ট্রে রাস্তাঘাট তৈরীর কাজে যথাযোগ্য সাহায্য দান করবেন ; রাস্তাঘাট সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা করবেন, আর করবেন রাস্তা তৈরীর কাজে বিশেষ শিক্ষা প্রদান।

এরপর পশ্চিম বাঙলার রাস্তাঘাট নিয়ে আলোচনা করব অন্য এক প্রবন্ধে।

কংগ্রেস, নির্ব্বাচন ও পরিকল্পনা—

ইংরেজ ভারত-শাসন-ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে দেশ বিভক্ত করিয়া একাংশের শাসন-ক্ষমতা কংগ্রেস-পক্ষীয়দিগের মধ্যে কয়জনের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া গিয়াছে। তদবধি ভারত রাষ্ট্রে ব্যবস্থা-পরিষদে বা পার্লামেণ্টে সাধারণ প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন হয় নাই। সেজন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সরকার প্রকৃতপক্ষে অস্থায়ী—এই সরকার নানা কারণে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। কিন্তু আর বিলম্ব করা অশোভন হইবে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সেই জন্য বাঙ্গালোরে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

অধিবেশনের প্রস্তুতি হিসাবে—প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কয় বৎসরে ভারত সরকারের কার্য্য সম্বন্ধে এক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন (৭ই জুলাই) এবং পরিকল্পনা কমিশনের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয় (৯ই জুলাই)। এই রিপোর্ট ও এই পরিকল্পনা যথাক্রমে ভাষ্য ও উপকরণ হিসাবে বিবেচনা করিয়া কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহার বুঝিতে হইবে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে :—

(১) সমাজতন্ত্রের মূলনীতি গ্রহণ করিয়া ভারত রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

(২) দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন।

(৩) যেভাবে লোকসংখ্যা দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে সরকারের পক্ষে পরিবার-পরিকল্পনা বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণে লোককে প্রণোদিত করা প্রয়োজন।

(৪) ভারত রাষ্ট্র ধর্ম্মনিরপেক্ষ। সে বিষয়ে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। সেই জন্য মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহকে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে।

(৫) ভারত রাষ্ট্রকে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। আদর্শবাদ যত বাঞ্ছনীয়ই কেন হউক না, আদর্শ বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে বৃথা হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় বেসরকারী শিক্ষাদি প্রতিষ্ঠানের স্থান আছে।

(৬) শাসন-যন্ত্রের বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রচলিত, সে সকলে যোগ্য ও অযোগ্য—সাধু অসাধু কর্ম্মচারী বুঝিবার সুযোগ অতি অল্প। যাহাকে, অসাধু মনে হয়, তাহাকে কোন দায়িত্বদ্যোতক কার্য্যে নিযুক্ত রাখা অসঙ্গত।

(৭) শান্তির আদর্শে ভারত রাষ্ট্র অবিচলিত থাকিবে।

(৮) ভারত রাষ্ট্র কমনওয়েলথ বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিবে না।

(৯) বিভক্ত ভারতবর্ষ বিভক্তই থাকিবে—তাহাকে সংযুক্ত করিবার কথায় কেবল নানা দুর্দ্দশার উদ্ভব হইবে।

(১০) পূর্ব্ব-পাকিস্তানে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়াছে। পাকিস্তানের নীতি তথায় (অমুসলমান) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করিয়াছে এবং সেই সম্প্রদায়ের লোকরা ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় চলিয়া আসিতেছেন।

(১১) আগামী নির্ব্বাচন কংগ্রেসের পক্ষে পরীক্ষা। যাঁহারা কংগ্রেসের নীতিতে ও মতে আস্থাবান, কংগ্রেসকে সেইরূপ লোক বাছিয়া নির্ব্বাচনপ্রার্থী মনোনীত করিতে হইবে।

এই রিপোর্টে কয় বৎসরে কংগ্রেসী সরকারের সাফল্য ও ত্রুটি বিবেচিত হয় নাই—কংগ্রেসের আদর্শ কি এবং সরকারের কর্ত্তব্য কি হওয়া সঙ্গত তাহাই বলা হইয়াছে। অথচ এই রিপোর্ট ভিত্তি করিয়া কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহার রচিত ও গৃহীত হইয়াছে। তাহাই ইস্তাহারের ত্রুটির ও দৈন্যের কারণ। এই রিপোর্ট যে কংগ্রেসের নিকট দাখিল করা হইয়াছে, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, সরকারের কংগ্রেসী রূপ রক্ষা করাই প্রধান মন্ত্রীর অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করা সম্ভব হয় নাই।

পরিকল্পনা কমিশন যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া পেশ করিয়াছেন, তাহা সরকারের জন্য হইলেও কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনের প্রাক্কালে প্রকাশিত হওয়ায় মনে করা যায়—তাহা প্রথমে কংগ্রেসকেই জানান হইবে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে—যুদ্ধপূর্ব্ব কালের মত প্রয়োজনীয় পণ্যের প্রাচুর্য্য সৃষ্টিই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। তাহার আনুমানিক ব্যয়—১৭৯৩ কোটি টাকা। প্রথম জিজ্ঞাস্য—এই টাকা কোথা হইতে আসিবে? ইতোমধ্যেই খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানীর

যে দেশে বহু উন্নতিকর কার্য্য সম্পন্ন করা অসম্ভব বা বিলম্বিত হইতেছে। সিন্দ্রীর সার ক্রয়ে ও পূর্ব্বনির্ম্মিত গৃহের ব্যাপারে যে দুর্নীতি ধরা পড়িয়াছে, তাহাতে যে কোন বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ ও শঙ্কার উদ্ভব হয়। আবার দেখা গিয়াছে—সরকারের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাবও নির্ভরযোগ্য নহে। দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার আরম্ভকালে যে ব্যয় হইবে বলা হইয়াছিল—পরে তাহা দ্বিগুণ হইবে বলা হইয়াছে। শেষ কোথায় তাহা বলা যায় না। সিন্দ্রীতে যে সারের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ব্যয়ও ঐরূপ দাঁড়াইতেছে।

ইহা ব্যতীত বেসরকারী পরিকল্পনা থাকিবে। তাহার ব্যয়ের হিসাব জানিবার কোন উপায় নাই।

পরিকল্পনা দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম—১৯৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে পণ্যের পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের মতই হইবে। সেজন্য ব্যয় করিতে হইবে—১৯৯৩ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ৩০০ কোটি টাকা উচ্চাঙ্গের কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। যে সকল কার্য্যে ব্যয় করা হইবে সে সকলের তালিকা এইরূপ—

(১) কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন

(২) সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন

(৩) যান ও সংযোগ

(৪) শিল্প

(৫) জনকল্যাণকর কার্য্য

(৬) পুনর্ব্বসতি

(৭) বিবিধ

পরপর নিম্নলিখিত কাজ করা হইবে—

(১) পুনর্ব্বসতি প্রভৃতি যে সকল কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে, সে সকল সম্পূর্ণ করণ,

(২) অপেক্ষাকৃত অল্পদিনে খাদ্য ও পণ্যোপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি;

(৩) সাধারণ উন্নতির ও বেকার সমস্যা সমাধানের যে সকল পরিকল্পনা হইয়াছে সে সকল সমাধাকরণ,

(৪) জনকল্যাণকর কার্য্যে যাহা হইয়াছে তাহার রক্ষণ ও বিস্তৃতি সাধন;

(৫) শাসন ও জনকল্যাণকর কার্য্যে মনোযোগ দান এবং যে সকল প্রদেশ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সে সকলের উন্নতি সাধন।

এই পরিকল্পনার বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান আমাদিগের নাই।

প্রথম রিপোর্ট ও পরিকল্পনা উভয়ের ভিত্তিতে নির্ব্বাচনী ইস্তাহার রচিত হইয়াছে। ইস্তাহারে রিপোর্টের অতিরিক্ত মাত্র কয়টি বিষয় আছে এবং সে সকলের মধ্যে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠন অন্যতম। ঐ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—ভারত রাষ্ট্রের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগ হইতে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী চলিতেছে। কংগ্রেসও পূর্ব্বে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে অর্থনীতিক আর্থিক ও শাসনসম্বন্ধীয় বাধা থাকিতে পারে এবং সে তাহাদিগের সম্মতির উপর সরকারের সীমা নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা করা অনেকটা উপায়-অবলম্বন নির্ভর করিবে।

দেখা যাইতেছে, বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করার দাবী উপেক্ষিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি—ভিক্ষা হিসাবে—পূর্ব্ববঙ্গাগতদিগের স্থানাভাবহেতু—সাঁওতাল পরগণা ও পুর্ণিয়া চাহিয়াও যে বিহারী সচিবের বিরাগভাজন হইয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

যাহাকে "বিসমিল্লায় গলদ" বলে, ইস্তাহারে তাহাই দেখা যায়। নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে লোক কতকগুলি প্রাথমিক নীতি বা কি কি উপায় অবলম্বিত হইবে তাহার বর্ণনা চাহে না—জনগণের আস্থাভাজন সরকার পার্লামেন্টের সাধারণ আয়ুষ্কালে কি কি কাজ করিবার আশা করেন, তাহাই জানিতে চাহে। মাত্র দুই তিনটি বিষয়ে তাহা দেখা গিয়াছে—

বলা হইয়াছে প্রদেশসমূহে যান-পরিচালন ভার সরকার গ্রহণ করায় লোকের সুবিধা হইয়াছে। সেই কাজ করা হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সরকার যান পরিচালনের সম্পূর্ণ ভার আজও গ্রহণ করেন নাই এবং যে আংশিক ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে লাভ হয় নাই বলিলেই হয়। সুতরাং বহু অর্থ নিয়োগে লোকের লাভ না হইয়া লোকসানই হইয়াছে।

আবার বলা হইয়াছে—নদীর জল নিয়ন্ত্রণে কৃষির উন্নতি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে বলিয়া সে কাজ প্রথমে করা হইবে। কিন্তু সে সকল বহুব্যয়সাধ্য এবং তাহাতে কোথাও ভুল হইলে যে ক্ষতি অনিবার্য্য তাহা সহ্য করা ভারত রাষ্ট্রের মত দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নহে।

এ দেশে কুটীরশিল্পের মধ্যে হাতের তাঁতশিল্প সর্ব্বপ্রধান। স্বীকৃত হইয়াছে, হাতের তাঁতশিল্পে আবশ্যক পরিমাণ সুতা জোগান যায় নাই। কিন্তু সে জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইবে, তাহার কোন কথা ইস্তাহারে নাই।

সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্যের ও কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য করিতে হইলে ভূমি বণ্টনের, সেচব্যবস্থার সার ও বীজ সরবরাহের যে সকল উপায় অবলম্বন করা অনিবার্য্য সে সকলের উল্লেখ করা হয় নাই। কুটীর-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়; সেজন্য উপকরণ সরবরাহের মত পথের উন্নতিসাধনও প্রয়োজন। সে কথা ইস্তাহারে নাই।

প্রকৃত উন্নতি সাধন জন্য যে অধিক শ্রম প্রয়োজন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু গত ৪ বৎসরেও যাহাদিগকে পূর্ণাহার দিতে পারা যায় নাই তাহাদিগকে অল্প খাইয়া অধিক শ্রম করিতে বলা যে তাহাদিগের ক্ষতে ক্ষার-ক্ষেপেরই মত, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? লোকের অধিক শ্রম করিবার প্রবৃত্তি উৎপন্ন করিতে হইলে—তাহাদিগের সন্তোষ যেমন প্রয়োজন—তাহাদিগের উন্নতির আশাও তেমনই প্রয়োজন। অনশনক্লিষ্টের সন্তোষ কোথায়? আর লোক

... পর্য্যন্ত লোকের যত আশা করিয়াছে—তদপেক্ষা অনেক অধিক আশা ফলে নাই। সেই জন্য লোকের মনে হতাশা নিরাশায় পরিণতি লাভ করিতেছে। তাহা নিবারণের উপায় কি? সাধারণ শাসন-ব্যয় হ্রাস না করিলে এবং লোকের আয় বৃদ্ধি ও নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস না হইলে কল্যাণকর ভাণ্ডের জন্য যে ব্যয় প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করা দুষ্কর। সেই জন্যই সরকারের পক্ষে ঋণলাভ আশানুরূপ হয় নাই। যাহারা পাটের বাজারে, চিনির ব্যবসায়, ফাটকায়—কোটি কোটি টাকা লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে ধরিতে না পারিলে আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে না।

সে জন্য ও চোরাবাজার উচ্ছেদ করিতে সরকার কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহার আভাসও কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে ইস্তাহার লোককে উৎসাহিত করিতে পারিতেছে না।

কংগ্রেস ও সরকার—

ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ও দীর্ঘকাল হইতে কংগ্রেসপন্থী মিষ্টার রফি আমেদ কিদোয়াই কিছুদিন পূর্ব্বেই আচার্য্য কৃপালনীর নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস-বিরোধী রাজনীতিক দলে যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গালোরে কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন ও নির্ব্বাচনী ইস্তাহার প্রচারের পরে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং তিনি কংগ্রেসের মনোনয়নে পার্লামেন্টের সদস্য হইয়াছিলেন বলিয়া মন্ত্রীর পদও ত্যাগ করিলেন—জানাইয়া দেন। ভারত সরকারের আর একজন মন্ত্রীও—শ্রীশান্তিপ্রসাদ জৈন—তাহাই করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁহাদিগের পদত্যাগ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া তাঁহাদিগকে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহারা সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। জওহরলাল যদিও পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে কোন দল সৃষ্টি অনভিপ্রেত এবং যদিও তিনি পাটনায় আচার্য্য কৃপালনীর দলকে ভাঁটিখানা (অর্থাৎ মদ্যপানের আড্ডা) বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কংগ্রেসত্যাগী এই মন্ত্রিদ্বয়কে মন্ত্রিমণ্ডল ত্যাগে বিরত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস ত্যাগে বিরত হইতে বলেন নাই। কিদোয়াই ও জৈন সেই অনুরোধে সম্মত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে যৌথ বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে একদিকে যেমন জওহরলালকে "জাতির সর্ব্বাধিনায়ক" বলিয়া অভিহিত করেন, তেমনই কংগ্রেস সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন—কংগ্রেস বলে এক, করে আর। তাঁহারা কংগ্রেসের মত কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতিকেও আক্রমণ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

মন্ত্রিদ্বয়কে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করাইয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্রিমণ্ডলে রক্ষা করায় কংগ্রেসের সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন আপত্তি করিয়া বিরাট বিচারের জন্য কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন, মন্ত্রিমণ্ডলে যদি কংগ্রেসপন্থী নহেন, এমন কোন মন্ত্রী থাকেন, তাহা সহ্য করা যায়; কিন্তু যে ... কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন এবং কংগ্রেসকে ও তাহার সভাপতিকে আক্রমণ করেন, তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলে স্থিতি সঙ্গত কি না, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। তাঁহার বিশ্বাস—কংগ্রেস ও সরকার যখন অভিন্ন, তখন মন্ত্রিমণ্ডল কংগ্রেসের নীতি পরিচালিত করিতে বাধ্য এবং কংগ্রেসের নিকট দায়ী। সুতরাং যাঁহারা কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন, তাঁহাদিগকে মন্ত্রিমণ্ডলে স্থান দান সঙ্গত নহে। কংগ্রেসের সভাপতি ট্যাণ্ডনজী যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, এতদিন সরকার তাহাই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবসর আছে; কারণ, সরকারকে যদি সর্ব্বতোভাবে কোন রাজনীতিক দলের নির্দ্দেশে কাজ করিতে হয়, তবে তাহার পক্ষে কার্য্য পরিচালন অসম্ভব হইতে পারে। আজ যদি পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তবে—গান্ধীজীর মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম এবং কংগ্রেস গান্ধীজীর মতানুবর্ত্তী—এই জন্য হিংসার পথে সে আক্রমণ রোধ করা সরকারের কর্ত্তব্য কি না তাহা বিচার করিতে হইলে সরকারকে দেশরক্ষার কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম হইতে হয়। ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইলে গান্ধীজী কংগ্রেসকে জনকল্যাণসাধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে—অর্থাৎ তাহার রাজনীতিক রূপ বর্জ্জন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয়, যাঁহারা তাঁহার মতই অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা যে বিষয়ে তাঁহার সেই মতের অনুবর্ত্তী হ'ন নাই। সেই জন্য কংগ্রেসের সহিত সরকারের সম্বন্ধ অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, এইবার সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট মীমাংসা হইয়া যাইবে। যদি তাহা হয়, তবে যে ভালই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্তান—

কিছুদিন হইতে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আগন্তুকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলে অসঙ্গত হয় না। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে তাহাদিগকে আশ্রয়ে লইয়া যাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে ষ্টেশন আবার উদ্বাস্তুতে পূর্ণ হইয়াছে। এই সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসায় প্রকাশ পায়—পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরা আর মানসম্ভ্রম নিরাপদ বোধ করিতেছেন না, মুসলমানরা হিন্দুর ক্ষেতের ফসল লইয়া যাইতেছে—নারীর প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার করিতেছে—ইত্যাদি। এই সকলের পশ্চাতে যাহা আছে, তাহা পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সমর সজ্জা। কাশ্মীর উপলক্ষ করিয়া পাকিস্তান পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্তে সেনা সন্নিবেশ করিতেছে—যশোহর, খুলনা, মেহেরপুর প্রভৃতি স্থানে বহু সেনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এমন কি বেসামরিক ব্যক্তিদিগকেও অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত করা হইতেছে। পাকিস্তানী সচিব বলিয়াছেন, কাশ্মীর পাকিস্তানভুক্ত করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক লোক জীবনদান করিতে প্রস্তুত।

মিথ্যা যদি বার বার উক্ত হয়, তবে সে অনেকের নিকট সত্য বলিয়া মনে হয়। এই কথা পাকিস্তান বিশেষরূপ বুঝে এবং সেই জন্য ...

প্রচার-কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হয় নাই। সে কাজে লিয়াকত আলী খাঁন অগ্রণী এবং জাফরুল্লা খাঁন তাহার দোসর। লিয়াকত আলী খাঁন স্বদেশে ও বিদেশে ঘোষণা করিয়াছেন—ভারত রাষ্ট্র কাশ্মীরের সীমান্তে তাহার সেনাবলের শতকরা ৯৩ ভাগ এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছে যে, যে কোন সময়ে কাশ্মীরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে—কাজেই বিশ্বের শান্তি বিপন্ন হইয়াছে। একদিকে এই ঘোষণা—আর একদিকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সীমান্তে সেনাসন্নিবেশ ও সমরসজ্জা। ভারত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যতই বলা হইতেছে—ভারতের পাকিস্তান আক্রমণের কোন অভিপ্রায় নাই, ততই লিয়াকত আলী খাঁন বলিতেছেন—ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর উক্তি মিথ্যা। কিন্তু লিয়াকত আলী খাঁন বার বার পণ্ডিত জওহরলাল কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও এ কথা বলেন নাই যে পাকিস্তানের ভারত রাষ্ট্র আক্রমণের অভিপ্রায় নাই।

পাকিস্তানের সহিত যে চুক্তি—ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতি স্বীকার করিয়া—পণ্ডিত জওহরলাল সম্পাদিত করিয়াছেন, তাহার সর্ত্ত যে পাকিস্তান কর্তৃক পালিত হইতেছে না, তাহাও আজ সপ্রকাশ। কেহ কেহ দেখিয়া শিখে—কেহ কেহ ঠেকিয়াও শিখে না। পাকিস্তানের সহিত ব্যবহারে জওহরলাল দেখাইয়াছেন, তিনি ঠেকিয়াও শিখেন না। এই চুক্তি অনুসারে ভারত রাষ্ট্র কয়লা, কাপড়, লোহা প্রভৃতি পাকিস্তানকে সরবরাহ করিয়া বিনিময়ে পাট, তূলা, চাউল প্রভৃতি পাইবে। ভারত রাষ্ট্র সব সর্ত্ত যথাযথরূপে পালন করিয়াছে, কিন্তু পাকিস্তান করে নাই। প্রতিদিন ২শত ৫০ মালগাড়ী কয়লা পাকিস্তানে যাইলেও পাকিস্তান এ পর্য্যন্ত যে পাট দিয়াছে, তাহা চুক্তির তুলনায় অতি অল্প—যে সামান্য পরিমাণ চাউল দিয়াছে, তাহা প্রায় অব্যবহার্য্য। পাকিস্তানে রেল, কল প্রভৃতি এখন সঞ্চিত কয়লায় ৬ মাস আর অচল হইবে না। অর্থাৎ পাকিস্তান কাজ গুছাইয়া লইয়াছে—সে প্রস্তুত। চুক্তি অনুসারে কাজ হইতেছে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য দিল্লীতে যে সম্মিলন হওয়ার কথা ছিল, পাকিস্তান জানাইয়াছে—এখন তাহার সেজন্য প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভব নহে। হয়ত তাঁহারা যুদ্ধের জন্য আয়োজনে ব্যস্ত। আর ইতোমধ্যে ৫শত ৩৪বার পাকিস্তান অন্যায়রূপে ভারত রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কোন কৈফিয়ৎ পাকিস্তান দেয় নাই—কেবল তাহা অস্বীকারই করিয়াছে।

পাকিস্তান কাশ্মীরের জন্য "ধর্ম্মযুদ্ধ' করিবে বলিয়া হুঙ্কার দিতেছে। সে হুঙ্কার হয়ত শূন্য কুম্ভে দমকা বাতাসের শব্দ। কিন্তু তাহার ফলে পূর্ব্ব পাকিস্তানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তথা হইতে হিন্দু আগন্তুকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে ও হইতেছে। পাঞ্জাবের যে অংশ পাকিস্তান হইয়াছে সে অংশ অমুসলমান শূন্য হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানেও তাহাই করা যে মুসলমান নেতৃগণের অভিপ্রেত, তাহা অনায়াসে মনে করা যায়। অথচ ভারত সরকার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগকে আবার অগ্নিকুণ্ডে ফিরিতে উপদেশ দিতেছেন! তাঁহারা যে অতিরিক্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি সেই পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্তে সমরসজ্জা হইতেছে, আর লাহোর নিষ্প্রদীপ করিয়া পাকিস্তান বিদেশী শক্তিসমূহকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বিমানে আক্রমণ হইবে, এমন আশঙ্কা তাহার পক্ষে অনিবার্য্য হইয়াছে। অথচ ভারত রাষ্ট্র সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছে ও করিতেছে যে, তাহার পাকিস্তান আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় নাই।

ভারত সরকারের পক্ষে বলা প্রয়োজন হইয়াছে—ভারত রাষ্ট্র শান্তি চাহে—সে শান্তির আদর করে—কিন্তু শান্তির জন্য সম্ভ্রম নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহে—সে সম্ভ্রম অপেক্ষাও ন্যায়ের আদর করে।

পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গান্ধীজী তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতে সম্মত না হইলে সূতিকাগারেই তাহার মৃত্যু হইত। কিন্তু সেই অর্থদান হইতে—পাকিস্তান চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী কাজ না করিলেও তাহাকে কয়লা লৌহ প্রভৃতি প্রদান করিয়া ভারত সরকার যাহাকে আপনার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া পরের সুবিধা করা বলা যায়—তাহাই করিয়া আসিতেছেন। ভারত সরকারের উদারতা দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে—তাহার শান্তিপ্রিয়তা কাপুরুষতা বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। পাকিস্তান "ধর্ম্মযুদ্ধ" ঘোষণায় হুঙ্কার দিতেছে ও বলিতেছে, আল্লার দয়া হইলে তাহারা সমগ্র ভারতে প্রাধান্য করিবে। সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল একবার যখন বলিয়াছিলেন, পাকিস্তান যদি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে তথায় সসম্মানে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিতে না পারে, তবে তাহাকে সেজন্য আবশ্যক ভূমি দিতে বলিতে হইবে—তখন পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছিলেন, উহা ভীতি প্রদর্শন নহে। তিনি অনাবশ্যক আগ্রহ দেখাইয়া কেবলই বলিতেছেন, ভারত রাষ্ট্রের পাকিস্তান আক্রমণের কোন অভিপ্রায় নাই। আরব লীগের একজন নেতাও বলিয়াছেন—নেহরু প্রধান মন্ত্রী থাকিতে পাকিস্তানের আক্রান্ত হইবার ভয় নাই। অবশ্য ইহাতে পাকিস্তানকে 'আলোয় আলোয় ঘর ছাইয়া" লইতে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে কি না, বলা যায় না।

কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, ভারত সরকারের পক্ষে পাকিস্তান সম্বন্ধে দৌর্ব্বল্যদুষ্ট নীতি বর্জ্জন করিয়া সম্মানজনকভাবে আত্মরক্ষার ও প্রয়োজন হইলে, আক্রমণের নীতি ঘোষণা করিয়া সেজন্য আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়াছে। পাকিস্তান যে ৫ শত ৩৪ বার ভারত রাষ্ট্রের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে—তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে তাহা কি অসঙ্গত হইত? পাকিস্তান যদি দিল্লী চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করে, তবে কি ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে চুক্তি বাতিল ঘোষণা করিয়া তাহাকে কয়লা, লৌহ প্রভৃতি দিতে বিরত হওয়া অন্যায় হইতে পারে? ভারত-রাষ্ট্রে বেসামরিক অধিবাসীদিগকে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়া—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা বর্ত্তমান অবস্থায় অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। লিয়াকত আলী প্রমুখ ব্যক্তিদিগের মিথ্যার স্বরূপ দেখাইয়া তাহার প্রভাব নষ্ট করা কি প্রয়োজন হইয়া পড়ে নাই? ভারত সরকার যতদিন দুর্ব্বল নীতির স্থানে সবল নীতি গ্রহণ না করিবেন, ততদিন পাকিস্তানের আস্ফালন নিবৃত্ত হইবে না—ভারত শান্তিও নিরাপদ হইবে না।

সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহ—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবের পদপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে—১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে—ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় মৎস্য বিভাগ অন্য বিভাগের সহিত সংযুক্ত থাকায় আপত্তি করিয়া বলেন, তিনি দেখিয়াছেন, আমেরিকায় মৎস্য কেবল মানুষের খাদ্যরূপেই ব্যবহৃত হয় না; পরন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত মৎস্য সাররূপে ব্যবহৃত হয় এবং পশু-খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া গবাদি পশুর দুগ্ধ বৃদ্ধির চেষ্টাও হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু প্রয়োজনানুরূপ মৎস্যও পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগ কৃষি বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু আমেরিকায় যে প্রথায় মৎস্য-সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে, সে উপায় অবলম্বিত হয় নাই। তাহাতে ব্যয় অল্প হয়—উৎপাদন-বৃদ্ধিও সুনিশ্চিত। নদী নালা পুষ্করিণীতে মাছের চাষ বাড়াইবার আবশ্যক চেষ্টা হয় নাই বটে, কিন্তু বিদেশ হইতে বহু ব্যয়ে জাহাজ আনিয়া সমুদ্র হইতে মৎস্য আহরণের চেষ্টা হইতেছে।

ডেনমার্ক হইতে বহু লক্ষ টাকা মূল্য দিয়া যে দুইখানি জাহাজ আনা হইয়াছে, তাহাতে কয় মাসে মাত্র ৭৩ হাজার টাকার মাছ নীত হইয়াছে। জাহাজ চালাইবার ব্যয় অত্যন্ত অধিক। চালকের মাসিক বেতন ৩হাজার ২শত টাকা—তদ্ভিন্ন ভাতা আছে; অন্যান্য স্কীপারের প্রত্যেকের মাসিক বেতন—ভাতা ব্যতীত মাসিক ২হাজার ৪শত ৫০ টাকা; নাবিকদিগের প্রত্যেকের মাসিক বেতন—ভাতা ব্যতীত এক হাজার ৬শত ১৬ টাকা। বর্ষাকালে মাছ ধরা বন্ধ থাকে—বেতন বন্ধ থাকে না। আবার ইতোমধ্যেই জাহাজ দুইখানি বার বার মেরামত করাইতে হইয়াছে। জাহাজ দুইখানি পুরাতন; অব্যবহার্য্য কি না বলিতে পারি না। মধ্যে কল অচল হওয়ায় সংগৃহীত মাছ পচিয়া গিয়াছিল।

বলা হয়, অর্থের অপব্যয় হয়—ক্ষতি নাই; পরীক্ষা হইতেছে!

সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহের পরীক্ষা মাদ্রাজেও ব্যর্থ হইয়াছে, বলা যায়। অথচ গত যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানী জাহাজ তিন চারি হাজার মাইল দূরে আসিয়া ভারত মহাসাগর হইতে মৎস্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে উদ্বর্ত্ত সামুদ্রিক মাল হইতে ৮খানি মোটরযান কিনিয়া সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহের কার্য্যে ব্যবহার আরম্ভ করা হয়। বৎসর যাইতে না যাইতেই সেগুলির সংস্কার প্রয়োজন হয়।' আশা করা হইয়াছিল, ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে ৪শত টন মাছ পাওয়া যাইবে। কিন্তু ৩শত সাড়ে ১৮ টন মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। পর-বৎসর আশা ছিল—৫শত টন মাছ ধরা যাইবে। সে স্থলে ধরা গিয়াছিল ২শত ৬৬ টন। তাহাতেও সরকারের চৈতন্যোদয় হয় নাই। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে নিশ্চয়ই ৯শত টন মাছ পাওয়া যাইবে। সেস্থলে কিন্তু ৩শত ৪৩ টনের অধিক পাওয়া যায় নাই। এ যেন রোহিত মাছের মূল্য দিয়া পুঁটি কিনিতে হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে ২লক্ষ ৭৫হাজার ৩শত ৭টাকা ব্যয় করিয়া যে মাছ ধরা হইয়াছিল, তাহার মূল্য পাওয়া গিয়াছে—৩০হাজার ১শত ৫৫ টাকা! এইরূপে যদি ৯ টাকা ব্যয় করিয়া এক টাকার জিনিষ কিনিতে হয়, তবে যে কুবেরের ভাণ্ডারও হইয়া যায়, তাহা বলা বাহুল্য। এখনও বলা হইতেছে—লাভ [illegible] তবে সেজন্য প্রথমে কাজ করিতে হইবে। তবে কি সরকারের মৎস্য বিভাগের কতকগুলি কর্ম্মচারী জনসাধারণের অর্থে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন?

ব্যয়ের অনুপাতে আয় যদি অল্প হয়, তবে প্রযুক্ত অর্থের অপব্যয় না করিয়া সমুদ্রে মৎস্য ধরার পরিকল্পনা বর্জ্জন করাই সঙ্গত। কারণ, এই দরিদ্র দেশের অর্থের অপব্যয়ের অবসর নাই।

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য বিভাগ এ পর্য্যন্ত পরীক্ষায় বহু অর্থের অপব্যয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ধান্য ক্ষেত্রে মাছের চাষের পরিকল্পনা ব্যঙ্গের বিষয় হইয়া আছে।

আমেরিকায় ও জাপানে মৎস্যোৎপাদন বৃদ্ধির যে সকল বিজ্ঞান-সম্মত উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার অনায়াসেই সে সকল জানিতে পারেন। সে সকল উপায় ব্যয়সাধ্যও নহে। কিন্তু তাহা না করিয়া বিদেশকে বহু অর্থে সমৃদ্ধ করিয়া তথা হইতে জাহাজ, নাবিক ও ধীবরের আমদানী করার কারণ ও সার্থকতা কি? পশ্চিমবঙ্গে কোন্ কোন্ স্থানে মাছের "ডিম" সংগ্রহ করা যায়, সে সম্বন্ধে আবশ্যক সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়াছে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কাঁথীর সমুদ্র-কূলবর্ত্তী স্থানে মৎস্য বা হাঙ্গর ধরায় অনেক টাকা নষ্ট হইয়াছে। সে সম্পর্কে চক্রবর্ত্তী ঘোষ কোম্পানীর কি হইয়াছে, তাহাও জানিবার বিষয়। আমরা শুনিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গের আইন বিভাগে একজন নন্-ম্যাট্রিক অনায়াসে স্পেশ্যাল অফিসার হইয়াছেন। তেমনই মৎস্য বিভাগে একাধিক মৎস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পদ পাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের নদী নালা খাল বিল পুষ্করিণীতে উপযুক্ত ভাবে মৎস্যের চাষ করিলে যে বাজারে মৎস্যের অভাবহেতু মূল্যবৃদ্ধি হইত না, তাহা অনায়াসে বলা যায়। কিন্তু সে বিষয়ে আবশ্যক মনোযোগ প্রদত্ত হয় নাই। সুন্দরবন অঞ্চল হইতে ধৃত মৎস্য বাজারে আনিবার সুব্যবস্থাও করা হয় নাই। অনেক স্থানে জালের জন্য যে সূতা প্রয়োজন ধীবররা তাহাও পায় নাই ও পাইতেছে না এরূপ অভিযোগ নূতন নহে। •

সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহে যদি কেবল আর্থিক ক্ষতিভোগই করিতে হয় তবে সে চেষ্টা ত্যাগ করাই কি সঙ্গত হইবে না? সচিবদিগের খেয়াল বা স্বপ্ন অনুসারে জনসাধারণের—দরিদ্র দেশবাসীর অর্থ ব্যয় করা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

উদ্বাস্তু-পুনরাবর্ত্তন—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সকল হিন্দু নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কতকাংশ আন্দামানে, বিহারে ও উড়িষ্যায় পাঠান হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে বিহারে ও উড়িষ্যায় পাঠান হইয়াছিল তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছেন। কেন্দ্রী সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদিগের উপর রুষ্ট হইতেছেন। বিনা

কেন তাহারা ফিরিয়া আসিতেছে? তাঁহারা মনে করেন, কতকগুলি রাষ্ট্রদ্রোহী লোকের প্ররোচনায় তাঁহারা ফিরিতেছেন। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ, যাহারা মান সম্ভ্রম গৃহ সব ত্যাগ করিয়া আশ্রয়ের জন্য আসিতেছে, তাহারা যে আশ্রয় পাইয়া সহজে তাহা ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে, এমন মনে করা দুষ্কর।

সরকার এই সকল আশ্রয়প্রার্থীর জন্য যে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সে অর্থের যদি সদ্ব্যবহার করা হয়—যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করিয়া কাজ করা হয়—যদি আশ্রয়প্রার্থীদিগের সুখসুবিধা সহানুভূতি সহকারে দেখিয়া তাহাদিগের সহিত সহযোগ করা হয়, তবে তাহারা কখনই অস্থির হয় না। এই সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র বিষয়ের উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন মনে করি—প্রধান-সচিব যদি কখন বাস্তুহারাদিগকে দর্শন দেন, তবে তাঁহাদিগকে "তুমি" ব্যতীত "আপনি" সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন না। বাস্তুহারারা যে অবস্থা সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের পক্ষে inferiority complex অবশ্যম্ভাবী—সে অবস্থায় তাঁহাদিগের পক্ষে অল্পেই আপনাদিগকে অপমানিত মনে করা সম্ভব। কিন্তু পদাধিকার যদি কোন কোন লোককে সেই মানব মনোভাব উপেক্ষা করায় তবে তাহা দুঃখের বিষয়।

বাঙ্গালী যে "ঘরমুখো" তাহা সত্য। সে তাহার স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সমাদর করে, আপনার সমাজ ভালবাসে। সেই জন্য আমরা পূর্ব্বেও প্রস্তাব করিয়াছি—এখনও করিতেছি—বিহারের ও উড়িষ্যার যে সকল অংশ পশ্চিমবঙ্গসংলগ্ন সেই সকলে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা করাই অভিপ্রেত। তাহা হইলে উদ্বাস্তুরা পরিচিত সমাজভ্রষ্ট হইবেন না এবং তাঁহাদিগের অনেক অসুবিধার কারণ ঘটিবে না। সেজন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে আপাততঃ বিহারের ও উড়িষ্যার ঐ সকল অংশ পশ্চিমবঙ্গভুক্ত না করিলেও ক্ষতি নাই। কারণ, আমরা যে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল দাবী করি, তাহা যে অধিকারে, তাহা কংগ্রেস কর্ত্তৃক বহুদিন পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা সে অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সমকক্ষ লোকনায়ক আজ আর কেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাজেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী যে দয়াদত্ত দান হিসাবে—সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছেন, তাহাতে যে কোন সুফল ফলিবে, এমন মনে হয় না। "ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈবচ।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রথমেই মনে করিতে হইবে—কেবল দপ্তরখানার বুদ্ধিতে জনগণ-সংক্রান্ত কাজ সুসম্পন্ন হয় না। সেজন্য জনগণের সহযোগ প্রয়োজন। সচিবরা কয় জন শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাইয়া লোকের অভিযোগ শুনিয়াছেন? তাঁহারা কয় জন হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া আগতদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা ভুল করিতেছে? কয় জন সচিব বিহারে বা উড়িষ্যায় আশ্রয় কেন্দ্রে যাইয়া আশ্রিতদিগের অসুবিধা বুঝিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাদিগকে কে বুঝিবার অবসর দিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাদিগকে বিহারে ও উড়িষ্যায় পাঠাইয়াই তাহাদিগের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য শেষ হইল, মনে করেন নাই?

পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা বিবেচনা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে,—তথা হইতে আরও হিন্দুর আগমন অনিবার্য্য। তথা হইতে হিন্দু বিতাড়নই পাকিস্তান নীতির অনুমোদিত। যাহারা সেই ইসলামিক রাষ্ট্রে বাস করিতে চাহিবে, তাহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত হইতে হইবে। সুতরাং পুনর্ব্বাসন-ব্যবস্থায় অবহিত হওয়া সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

কিছুদিন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নানারূপ ঝটিকাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সম্বন্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। তাহার জন্য অনুসন্ধান সমিতি গঠিতও হয় এবং সেই সমিতির রিপোর্টে দেখা যায়, "যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।" অর্থাৎ দুর্নীতি যত ব্যাপক বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা তত ব্যাপক নহে।

এদিকে সেকেণ্ডারী স্কুল বোর্ড গঠিত হওয়ায় প্রাথমিক পরীক্ষা সরকারের অধীনে বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত হইবে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ও আয় উভয়ই কমিয়া গিয়াছে। সরকারী ব্যবস্থায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় কিরূপ ফল হয়, তাহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়কে পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিপদ যেমন তাহার কর্ম্মচারী ও ছাত্রদিগের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব—আর একটি বিপদ তেমনই ছাত্রদিগের উপাধিলাভের অকারণ অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা যদি ছাত্রদিগের অধিক অধ্যয়নে আত্মপ্রকাশ করে, তবে তাহাতে উন্নতি হয়। কিন্তু তাহাও হইতেছে না। প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ব্বে আন্দোলন হয়—পরীক্ষার সময় পিছাইয়া দিতে হইবে; প্রত্যেক পরীক্ষার পরে আন্দোলন হয়—পরীক্ষার প্রশ্ন এমন হইয়াছে যে "গ্রেস মার্ক" না দিলে পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা অতি অল্প হইবে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার এই অতিরিক্ত আগ্রহ অনেক স্থলে ছাত্রদিগকে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতে, কখনও বা দুর্নীতিদুষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে প্ররোচিত করে। ইহা একান্ত পরিতাপের বিষয়। যদি এই নিন্দনীয় আগ্রহ সহজে দূর করা না যায়, তবে কি করা হইবে?

কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন—যে সকল ছাত্র প্রবেশিকা ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা যদি কলেজের অধ্যক্ষের মতে—পরবর্ত্তী দুই বৎসর যথারীতি কলেজে পাঠ করিয়া থাকে এবং কোনরূপ অসচ্চরিত্রতার পরিচয় না দিয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে সহজেই বি-এ বা বি-এস সি পরীক্ষার উপাধি দিয়া—যাহারা উচ্চতর শিক্ষা লাভের বা গবেষণার জন্য আগ্রহশীল তাহাদিগকে উচ্চমানের পরীক্ষা দিতে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে বি-এ ও বি-এস সি পরীক্ষায় "পাশ" ও "অনার্স" দুই ভাগ আছে। "পাশ"—উপাধি অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য—তাহা যদি আরও সহজলভ্য করা হয়, তবে যেমন ছাত্রদিগের উপাধি লাভ ঘটে তেমনই অল্পদিনেই—তাহা যে মূল্যবান নহে, লোকের ইহা জানা হইলে—ছাত্রদিগের উপাধি লাভের জন্য অকারণ অত্যধিক আগ্রহ-ব্যাধি দূর হয়।

এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ভারতে সর্ব্বত্র আদৃত ছিল এবং বিদেশেও তাহার সম্মান ছিল। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আজ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত। যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি তাহার পূর্ব্ব-গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সে কাজ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদিগের দ্বারাই সংসাধিত হইতে পারে না; সেজন্য ছাত্রদিগের নিষ্ঠা ও একাগ্রতাও প্রয়োজন। আর ছাত্রদিগকে কবির সেইকথা মনে রাখিতে হইবে :—

Let knowledge grow from more to more
But more of reverence in us dwell."

আমাদিগের দেশে বিশ্বাস—বিদ্যা যেমন উন্নতির সহায় ও শক্তির উৎস, তেমনই তাহা বিনয় দান করে। শৃঙ্খলা ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না।

বারাসত-বসিরহাট ও বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেল—

বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তগামী একমাত্র রেলপথ। সে হিসাবে ইহার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অসাধারণ। সে রেলের অবস্থা ও বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলের অবস্থা শোচনীয়। তাহার উপর আবার বারাসত-বসিরহাট রেলে প্রায় তিন মাস শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জন্য রেল চলাচল বন্ধ আছে। উভয় রেলই জাতীয়করণের দাবী বহুদিন হইতে করিয়া আসা হইয়াছে। সরকার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই; পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যে সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত এমন মনে হয় না। মধ্যে বলা হইয়াছিল, সরকার এই দুইটি রেল কোম্পানীতে অর্থ সাহায্য করিয়া আবশ্যক সংস্কার, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ব্যবস্থা করিবেন। সে প্রস্তাবও কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। দীর্ঘকাল পরে ভারত সরকার যে অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন, তাহার ফলে বারাসত-বসিরহাট লাইনের "গতি করিবার" অধিকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ লাইনটি সরকার গ্রহণ করিবেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ম্যানেজিং এজেন্ট পরিবর্ত্তন করিয়া মার্টিন কোম্পানীকে পরিচালনের অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু এই লাইন প্রথমাবধি মার্টিন কোম্পানীর পরিচালনাধীনই ছিল এবং অধিকাংশ অংশীদার মার্টিন কোম্পানীর হাত হইতে পরিচালনভার হস্তান্তরিত করিয়া এন, এল, রায় কোম্পানীকে দিয়াছিলেন। তাহার পরে—

"যাও ছিল উঠা বসা
বৈদ্য ঘুচালে আশা।"

শ্রমিক ইউনিয়নের দ্বারা ধর্ম্মঘট করান হয় এবং রেল চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং মার্টিন কোম্পানীর পরিচালনায় রেলের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা [illegible]।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেল কোম্পানীর নূতন ডিরেক্টার-সঙ্ঘ গঠিত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের যান বিভাগের কর্ত্তাকে সেই বোর্ডের সভাপতি করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইঁহার বয়স—চাকরীর বয়স—উত্তীর্ণ হইলেও ইহাকে কার্য্যভার দিয়াছেন; কারণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে ইতি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন। সরকারের যান বিভাগে তাঁহার খ্যাতির "apple cart" উল্টাইয়া গিয়াছে কি না, তাহা বিবেচ্য। তাঁহার অভিজ্ঞতায়ও সে বিভাগে প্রযুক্ত বহু অর্থে যে লাভ হইয়াছে তাহা উল্লেখেরও অযোগ্য। সরকার যদি রেলপথটি গ্রহণ করিতেন, তবেই ভাল হইত। তাঁহারা যখন তাহা করেন নাই, তখন অংশীদারদিগকে—পরিচালক-সঙ্ঘ নির্বাচনের অধিকারে বঞ্চিত করায় যে আপত্তি হইতে পারে না, তাহাও নহে। অথবা মার্টিন কোম্পানীকে পরিচালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারা যাইত, যদি তাঁহারা অংশীদারদিগের নিকট কৈফিয়তের দায়ী থাকিতেন। নূতন ব্যবস্থা—"না এ দিক, না ওদিক" হইয়াছে। ইহাতে সুফল ফলিলেই মঙ্গল।

সাংবাদিক অমৃতলাল রায়ের পরিকল্পিত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প হইলে—তাহার প্রয়োজন অল্প নহে। তাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। ইহা একান্ত দুঃখের বিষয় এবং বাঙ্গালী যাত্রীদিগের অসুবিধা সম্বন্ধে নির্ম্মম ঔদাসিন্যের পরিচায়ক।

আমরা বলি, কেন্দ্রী সরকার এই দুইটি রেলপথ গ্রহণ করুন এবং জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলের সংস্কার সাধন ও বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলের স্থানে বড় রেল (ব্রড বা মিটার গেজ) স্থাপিত করুন। সামরিক প্রয়োজনেও যে তাহা করা প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি কেন্দ্রী সরকারকে সে বিষয়ে অবহিত করিতে বিরত থাকিবেন?

পাকিস্তানের "আত্মরক্ষা দিবস"—

পাকিস্তান "আত্মরক্ষা দিবস" অনুষ্ঠিত করিয়াছে। পাকিস্তানের আত্মরক্ষার কি প্রয়োজন-মনে হইয়াছে, বলা যায় না। সে ইংলণ্ডের কৃপায় পুষ্ট এবং আমেরিকার সহিত তাহার বন্ধুত্বের পরিচয়-তাহার মুদ্রামূল্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাশ্মীর লইয়া যেভাবে সে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশে অনধিকার প্রবেশ করিয়াও নিশ্চিন্ত আছে এবং সমগ্র কাশ্মীর দাবী করিয়াও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দ্বারা অনুগৃহীত হইতেছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে তাহা ভারত-বিরোধী প্রচার কার্য্য সফল হইয়াছে। তবে তাহার "আত্মরক্ষার" কারণ কি? তাহা কি তাহার প্রচার-কার্য্যের অংশমাত্র? সে চীৎকার করিয়া প্রচার করিতেছে, ভারত রাষ্ট্র কাশ্মীরের সীমান্তে সেনা সন্নিবেশ করায় বিশ্বের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিতেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্ব্বপাকিস্তানের সীমান্তে যে ভাবে সেনা-সন্নিবেশ করিতেছে, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের আক্রান্ত হইবার ভয় অসঙ্গত নহে।

"প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের" অভিজ্ঞতার পরে এই "আত্মরক্ষা দিবস" অনুষ্ঠানে ভারত রাষ্ট্রের মনোভাব সহজেই অনুকূল হওয়া স্বাভাবিক।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে সেনা-সমাবেশের প্রতিবাদ করিতে বিরত রহিয়াছেন।

গত ১৭ই জুলাই করাচীতে "আত্মরক্ষা দিবস" অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে সভা হয়, তাহাতে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁন বর্দ্ধাবৃত মুষ্টি উত্তোলন করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহাই পাকিস্তানের প্রতীক। সেই সভায় বাহিত পতাকায় লিখিত ছিল—"

"প্যালেষ্টাইন, কাশ্মীর ও ভারত অধিকার কর।"

তাহাতে জনতা ধ্বনি করিয়াছিল :—

"হিন্দুস্থান অধিকার কর।"

অনেকেই অনুমান করিতেছেন, পাকিস্তান কাশ্মীর লইয়া যাহাই কেন করুক না—পূর্ব্ববঙ্গ সে—পঞ্জাবের মত—হিন্দুশূন্য করিতেই চাহিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে যে এখনও বহু হিন্দু রহিয়াছে, তাহা তাহার অনভিপ্রেত এবং পাকিস্তানের যুদ্ধের এই আয়োজন ফলে বহু হিন্দু পুনঃ পাকিস্তান ত্যাগ করিবে এবং যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারা ধর্ম্মান্তরিত হইয়া ইস্‌লামী রাষ্ট্রে বাস করিবে।

ভারত সরকারও স্বীকার করিয়াছেন—পাকিস্তানের সহিত যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার সর্ত্তানুসারে পাকিস্তান কাজ না করায় তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। তবে তাঁহারা কেন যে তাহা ঘোষণা করিয়া তদনুসারে কাজ করিতেছেন না, তাহাই লোককে বিস্মিত করিতেছে।

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পণ্ডিত জওহর লাল দিল্লীতে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতেও পূর্ব্ববঙ্গে অমুসলমান সমস্যায় কোন উদ্বেগ নাই। যেন—বাঙ্গালার সমস্যা মনোযোগেরও অযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ আজ যে অবস্থার সম্মুখীন, তাহা কি ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী অবগত নহেন? না—তিনি সে কথা বলিতে অসম্মত?

পাকিস্তানে যে "সাজ! সাজ!" রব উঠিয়াছে, তাহার কারণ যাহাই কেন হউক না, তাহা যে পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুর পক্ষে ভয়াবহ তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাশ্মীর সম্বন্ধে কি হইবে, তাহা বলা যায় না। তবে ভারত সরকার এক দিনে বলিয়াছেন—পাকিস্তান যদি যুদ্ধ করিতেই চাহে, তবে ভারত সরকার সেজন্য প্রস্তুত। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী এখনও বলিতেছেন—পাকিস্তানের সহিত ভারত রাষ্ট্রের যুদ্ধের কথা—হাস্যোদ্দীপক। কেন? পূর্ব্ব পাকিস্তানের অবস্থা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, পাকিস্তান যে ভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে ও যেরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতেছে, তাহাতে যুদ্ধের সম্ভাবনা যে নাই, দৃঢ়তা সহকারে এমন কথা বলিবার উপায় নাই।

ময়ূরাক্ষীর জল-নিয়ন্ত্রণ—

গত ১২ই শ্রাবণ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে স্মরণীয় দিন। এই দিন, ময়ূরাক্ষী নদীর জল-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার একাংশ—নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই—সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সিউড়ী (বীরভূম) হইতে ২ মাইল দূরে তিলপাড়া বাঁধ হইতে নদীর দুই কূলে এক শত ৫০ মাইল দীর্ঘ খালে জল প্রবেশ করিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর জল-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার নির্দ্ধারিত আনুমানিক ব্যয় ১৫ কোটি টাকা। বাঁধ ও খালগুলি রক্ষা করিবার জন্য বার্ষিক ব্যয়ও অল্প হইবে না, তবে যদি পরিকল্পনায় ত্রুটি লক্ষিত না হয়, তাহা হইলে যে লাভ হইবে তাহার তুলনায় ব্যয় উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে। কারণ, আশা এই যে, এই পরিকল্পনায় এক লক্ষ ২০ হাজার একর জমীতে নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা করা যাইবে এবং এই অঞ্চলে জমী—সেচের ফলে—গোল আলু, পাট, ইক্ষু, সরিষা ও গম উৎপাদনের উপযোগী। সুব্যবস্থা করিলে এক জমী হইতে একাধিক বার শস্য পাওয়া যাইতে পারিবে এবং সেচের জমীতে প্রতি একরে অতিরিক্ত অর্দ্ধ টন ধান্য উৎপন্ন হইবে। ইহা ব্যতীত মৎস্য সরবরাহও বাড়িতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে ইহাই জল নিয়ন্ত্রণের প্রধান পরিকল্পনাদ্বয়ের অন্যতম। ইহা যে বহু ব্যয়সাধ্য তাহা বলা বাহুল্য। দেশের লোক ইহার সাফল্য কামনাই করে। আজ অনেকের রনডিহায় দামোদরের বাঁধের কথা মনে পড়িবে। যখন সে বাঁধ সম্পূর্ণ হয়, তখন বাঙ্গালার তৎকালীন গভর্ণর সার জন এণ্ডারসন মিশরের নীলনদের জল নিয়ন্ত্রণের কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—যখন সে ব্যবস্থা হয়, তখন মিশরের কৃষকরা সেচের জল পাইয়া বলিয়াছিল—ইহা জল নহে, গলিত স্বর্ণ। বাঙ্গালার লোকও আশা করিয়াছিল, সেই বাঁধের ফলে বহু জমী সেচের সুবিধা পাইবে ও ফশলের ফলন বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য হেতু সে আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেই কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয়, পশ্চিমবঙ্গের সেচ সচিব ভূপতি মজুমদার উদ্বোধনের আনন্দোৎসবের সময় বলিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্বেও বহু পরিকল্পনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সকল কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় লোকের মনে সন্দেহের সঞ্চার ও অবিশ্বাসের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন, এই কাজের সাফল্যে সে ভাব দূর হইবে।

আমরা ভূপতি বাবুর আশা সফল হউক—এই আশা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু ফল না দেখিয়া উল্লাস করিবার কারণ থাকিতে পারে না। কোন কোন অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে জল পাওয়া যাইবে, তাহাতে খালে আবশ্যক পরিমাণ জল যাইবে কি না সন্দেহ এবং সে জল অল্প হইলে সেচের জন্য জল পাওয়া নাও যাইতে পারে। তাঁহারা হিসাবে নির্ভর করিয়াই এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ পরিকল্পনা যেরূপ ব্যয়সাধ্য তাহাতে অসাফল্যে যে আর্থিক ক্ষতি হয়, তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা এই দরিদ্র দেশের নাই। বিশেষ দামোদর পরিকল্পনার আরম্ভ কালে যে ব্যয় হিসাব করিয়া কাজ করা হয়, এখন দেখা যাইতেছে, ব্যয় তাহার দ্বিগুণ হওয়া অনিবার্য্য। দ্বিগুণ ব্যয়ে আয় যথেষ্ট মনে করা যাইবে কি না, তাহা বিবেচ্য।

আমরা আশা করি, এই পরিকল্পনায় যাহারা উপকৃত হইবে, তাহারা, মিশরের কৃষকদিগেরই মত, সেচের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে চাষের উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আপনারা যেমন উপকৃত হইবে, তেমনই সমগ্র দেশের কৃষি-সম্পদ বর্দ্ধিত করিয়া দেশবাসীর কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।

কুষ্ঠ প্রতিরোধ—

"হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘের" পশ্চিমবঙ্গীয় শাখা পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি নিবারণকল্পে সপ্তাহ পালন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যে সকল দেশে কুষ্ঠ অধিক ব্যাপ্ত, ভারতবর্ষ সে সকলের অন্যতম। পৃথিবীতে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ। সে সকলের মধ্যে ভারতবর্ষে ১০ লক্ষ রোগী দেখা যায়। ভারতবর্ষে আবার আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ—এই কয়টি প্রদেশে কুষ্ঠরোগাগ্রস্তের সংখ্যা অধিক। যুরোপেও পূর্ব্বে কুষ্ঠরোগ ব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু তথায় লোক উহা নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া যুরোপ কুষ্ঠব্যাধিমুক্ত হইয়াছে, সেই সকল অবলম্বন করিলেই পশ্চিমবঙ্গ কুষ্ঠরোগশূন্য হইতে পারে। সে জন্য রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। বিস্ময়ের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় (গোবরায়) যে কুষ্ঠরোগীর হাসপাতাল (অ্যালবার্ট ভিক্টর লেপার হাসপাতাল) আছে, তাহা তুলিয়া দিয়া রোগীদিগকে বাঁকুড়ায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় সে ব্যবস্থা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। সে যাহাই হউক, লোককে উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া—চিকিৎসার দ্বারা ও রোগীদিগকে স্বতন্ত্র রাখিয়া যাহাতে রোগের বিস্তার নিবারণ করা যায়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া সরকারের কর্ত্তব্য ও জনসাধারণের দায়িত্ব। আমরা "হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘের" কার্য্য বিস্তারের কামনা করি। চেষ্টা করিলে যে ৫০ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে এই ব্যাধি দূর করা যায়, এ বিশ্বাস আমাদিগের আছে। আমরা আশা করি, সঙ্ঘ এ বিষয়ে সরকারের সাহায্য ও জনগণের সহযোগ লাভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই আবশ্যক কাজ করিতে পারিবে। বাস্তবিক এতদিন যে এ বিষয়ে য়ুরোপের অভিজ্ঞতার সুযোগ গৃহীত হয় নাই, তাহা যেমন পরিতাপের বিষয় তেমনই লজ্জার কথা।

রাজা আবদুল্লা—

হাসেমাইট জর্ডানের রাজা আবদুল্লা আততায়ীর দ্বারা নিহত হইয়াছেন। তাঁহার হত্যার ৪ দিন পূর্ব্বে জর্ডানে প্রতীচীর পক্ষপাতী লেবাননের প্রধান মন্ত্রী রিয়াদ শল নিহত হইয়াছিলেন। গত তিন বৎসরে মধ্য-প্রাচীতে বহু রাজনীতিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এইভাবে নিহত হইয়াছেন—মিশরে ২ জন প্রধান মন্ত্রীর হত্যা ঘটিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস: স্থানীয় রাজনীতিক কারণেই এই সকল হত্যা সংঘটিত হয় নাই অর্থাৎ তাহার মূলে মধ্যপ্রাচীর প্রভুত্বের জন্য প্রাচীতে ও প্রতীচীতে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। রাজা আবদুল্লা বৃটেনের বন্ধু ছিলেন এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা মনে করিয়াছিল, তিনি আরব দেশসমূহকে সম্মিলিত-ভাবে কম্যুনিষ্ট মতবাদের বিরোধী করিয়া সেই মতবাদ প্রসারে বাধা দিতে পারিবেন। প্রতীচীর কূট রাজনীতি একদিন আফগানিস্থানের প্রগতিপন্থী রাজা আমানুল্লাকে স্বদেশ হইতে পলায়নে বাধ্য করিয়াছিল। তদবধি অ্যাংলো-আমেরিকান ষড়যন্ত্র নানা ভাবে কম্যুনিজমকে প্রহত ও আপনাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া মধ্য প্রাচীকে প্রভাবাধীন করিতে প্রয়াস করিয়া আসিতেছে। রাজা আবদুল্লার হত্যাকারী "ধর্মযোদ্ধা সম্প্রদায়ের" সদস্য ছিল। রাজা আবদুল্লা লেভান্ট প্রজাতন্ত্রবাদীদিগের ঘৃণার পাত্র ছিলেন—তাঁহারা সিরিয়া, জর্ডান, প্যালেষ্টাইন ও লেবাননে আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী। তিনি প্যালেষ্টাইনের কতকাংশ ও জেরুসালেম তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিতে চাহিতেছিলেন—ইহাই এক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে মধ্য প্রাচীর রাজনীতিক সতরঞ্চ খেলায় কে কি চাল চালিবেন, বলা যায় না।

ইরাণ—

ইরাণে সরকারের তৈলসম্পদ জাতীয়করণের বাসনা যেমন অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহাতে ইংলণ্ডের আপত্তি তেমনই প্রবল। একদিন—যখন বৃটেন ভারতে প্রভুত্ব করিত ও চীনকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিল তখন ইরাণকে তাহার প্রভাবাধীন (Sphere of Influence) রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই ব্যবস্থার স্বরূপ এইরূপ:—

"The native Government is as a rule left undisturbed, indeed its unabated sovereignty is sometimes specifically reaffirmed, but commercial exploitation and political influence are regarded as the peculiar right of the interested power."

কিন্তু প্রাচীতে যে নবভাব দেখা দিয়াছে, তাহা ঐরূপ ব্যবস্থা বিলোপ-সাধনই করে। পারস্য আর কোন বিদেশীর প্রভাবাধীন থাকিতে চাহে না। চীন আজ নিজ শক্তিতে স্বাধীন হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ভারত আজ স্বায়ত্ত শাসনশীল হইয়াছে। পারস্য যদি তাহার সম্পদ জাতীয় করিতে চাহে, তবে তাহা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। সে যে রুশিয়ার সাহায্য পাইবার আশা করে—এমন না-ও হইতে পারে। কিন্তু আজ য়ুরোপের ও এশিয়ার রাজনীতিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে বৃটেনের পক্ষে ইরাণের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সাহসী হওয়াও সঙ্গত কি না, সন্দেহ। সুতরাং বৃটেনকে হয়ত "কিল খাইয়া কিল চুরি" করিতেই হইবে।

কোরিয়া—

কোরিয়ার যুদ্ধ যে সহজে নিবৃত্ত হইবে, এমন সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। যুদ্ধ-বিরতির ব্যাপারেও যেন আমেরিকার আগ্রহের অভাব লক্ষিত হইয়াছে! মূল কথা এই যে, চীনে যে কারণে আমেরিকা ও ইংলণ্ড চিয়াং কাইসেককে সাহায্য দিয়াছিল, সেই কারণেই তাহারা কোরিয়ায় পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। তাহারা কম্যুনিষ্ট মতবাদের উচ্ছেদ সাধন চাহে। কোরিয়ায় যদি সেই মতবাদ বিস্তারলাভ করে, তবে সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদ কোথায় স্থান পাইবে? কিন্তু প্রাচীর যেসকল দেশ দীর্ঘকাল বিদেশীর দ্বারা শাসিত ও শোষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা যে সেই শাসনের ও শোষণের প্রতিবাদেই আজ কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাই প্রতীচীর শক্তিপুঞ্জ বুঝিতে চাহিতেছে না। স্বার্থই তাহাদিগের সে কথা বুঝিবার অথবা বুঝিয়া স্বীকার করিবার অন্তরায় হয়।

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৫৮

গাঁয়ের স্কুল-মাষ্টার

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রোকোরভকার প্রৌঢ় জমিদার তাঁর বাড়ীর বারান্দায় চুপ করে বসে আছেন··সামনে পথ। পথে একখানা হাতগাড়ী ঠেলে চলেছে প্রোকোফাই! কী ক্যাঁচ-ক্যাচ আওয়াজ!

জমিদারের মেজাজ হলো খাপ্পা। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি হাঁকলেন—প্রোকোফাই··

গাড়ী থামিয়ে প্রোকোফাই তাকালো জমিদারের দিকে!

জমিদার বললেন—তোর কাণে কি হয়েছে! ·কালা?

—আজ্ঞে হুজুর, চাকায় তেল দেয়া হয়নি বহুদিন—তাই অমন আওয়াজ হচ্ছে।

—গাড়ীতে আছে কি?

—আজ্ঞে, জল।

—পুকুর থেকে তোলা?

—হুজুর।

—আচ্ছা যা চাকায় তেল দিস্ মোদ্দা।

গাড়ী ঠেলে প্রোকোফাই চলে গেল।

এক সেপাই এসে সেলাম করে দাঁড়ালো।

জমিদার বললেন—কে?

—আজ্ঞে, মার্কুলভস্কি জেলায় আছে ভার্কোলিয়াদতু গ্রাম—ঐ যে কোপ্তা নদী আছে··আমি সেই গ্রামে থাকি।

—কি চাই?

—আজ্ঞে, চাকরি। পিয়ন হোক, দরোয়ান হোক··

—কি কাজ করতে আগে?

—আজ্ঞে, আমি ছিলুম ফৌজের দলে সেপাই। শাস্ত্রীর কাজ করতুম কমাণ্ডারের বাড়ীতে। তারপর সে চাকরি ছেড়ে এক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে রাঁধুনির কাজ করেছি। তা ছাড়া মালীর কাজ জানি, কুকুর দেখাশুনা, কুকুরের সেবা করার কাজ জানি·। মানে, যে কাজ দেবেন, করবো হুজুর।

জমিদার বললেন—হুঁ, পাথর ভাঙতে পারো?

—না হুজুর···কখনো করিনি।

—ছ্যাখো, পারবে?

—আজ্ঞে না···ফৌজের চাকরিতে শক্তি-সামর্থ্য সব খুইয়ে বসেছি।

—কিন্তু জোয়ান চেহারা দেখছি···এ-চেহারায় মেহনতীর কাজ করতে যদি না পারো···নিরুপায়।··· কুকুরের কাজ ভালো লাগে?

—আজ্ঞে, তাতে হাড়ভাঙ্গা মেহনৎ নেই!

—সার্টিফিকেট আছে?

—আজ্ঞে, না।

—তার মানে, মাতাল, না হয় চোর! না বাপু, সার্টিফিকেট না দেখে আমি লোক রাখিনা।·· এখানে কিছু হবে না। সরে পড়ো।

সেপাই নিশ্বাস ফেলে চলে গেল।

বেয়ারা এসে খপর দিলে—এক বিদেশী ভদ্রলোক এসে বসে আছেন! অফিস-কামরায়।

—কে ভদ্রলোক?

—বললেন, কোন গাঁয়ে মাষ্টারী করতেন?

—পাঠিয়ে দে!

বারান্দায় এসে দাঁড়ালো মলিন-বেশ এক শীর্ণ ভদ্রলোক। ···বয়স প্রায় চল্লিশ বছর—পায়ে তালি-দেওয়া ভারী বুট··· রোদে ঘুরে গায়ের রঙ তামাটে-পানা।

জমিদার তাকে বসতে বললেন সামনের চেয়ারে। ভদ্রলোক বসলেন।

জমিদার বললেন—তুমি?

ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে, পবিরাখিনস্কি জেলায় বেজুবভ গাঁ···সেই গাঁয়ের স্কুল-মাষ্টার। আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি···মানে, চাকরির জন্য!

জমিদার বললেন—কিন্তু স্কুল-মাষ্টার নিয়ে আমি কি করবো?

—আজ্ঞে···শুনেছি, আপনি একজন ক্লার্ক চান।

জমিদার বললেন—স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেবার হেতু ?

—আজ্ঞে, স্কুলটি আগুন লেগে পুড়ে গেছে।

—কতকাল আগে ?

—মাসখানেক হলো। কি করে আগুন লাগলো, কেউ জানে না।···সারা গাঁ পুড়ে গেছে একখানা ঘর খাড়া নেই।

—হুঁ ! ভ্রূ কুঞ্চিত করে জমিদার বললেন—খোড়ো-ঘরে আজকাল প্রায় আগুন লাগচে··শুনতে পাই। এই যে সেদিন আমাদের পাশের গাঁখানা আগুন লেগে ভস্মসাৎ হয়ে গেল। যাক, স্কুল-মাষ্টারী চাকরি তুমি কি করে' পেয়েছিলে ?

ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে, লেখাপড়া শেষ করে আমি আমার দাদার কাছে ছিলুম স্কেলনয় গ্রামে। বেকার··· দাদার অন্নেই বাস। তারপর সেখানকার এক বড় লোকের ছেলেকে পড়াবার চাকরি পেলুম—মাহিনা মাসে পাঁচ-টাকা করে। কিন্তু ছেলে-পড়ানো চাকরি দু চারমাস মাত্র করেছিলুম। তারপর তাঁর কোচম্যানি করেছি।

—হঠাৎ মাষ্টারী ছেড়ে কোচম্যানি !

ভদ্রলোক বললেন—মানে, ছেলে পড়তে চায় না। মা-বাপ বললেন,—যাক, লেখাপড়া করতে হবে না! ওদের কোচম্যান মরে গিয়েছিল, আমাকে বললেন—কোথায় যাবে ? এখানে কোচম্যানি করো। তাই মানে, বেকার···

—আশ্চর্য্য !

—আজ্ঞে, দায়ে পড়ে কোচম্যানি করেছি স্যর।

—কোচম্যানির দরুণ মাহিনা পেতে কত ?

—একটি পয়সা নয়, স্যর। তাঁর ওখানে থাকতে দিতেন, আর খাওয়া-পরা !···পরা মানে, কর্ত্তার ছেঁড়া জামা জুতো···পোষালো না। দাদার বাসায় ফিরে এলুম। দাদা বললে—বসে বসে খাবি কতকাল ! তার চেয়ে গান-বাজনা শেখ্···কনসার্ট-পার্টিতে চাকরি মিলবে'খন। ও গাঁয়ের জমিদার—ছোকরা-বয়সী—কনসার্টের দল খুলবেন বলছিলেন। গান-বাজনা শিখলুম দুমাস ধরে—তারপর চাকরি হবে। জমিদার বললেন, না, তিনি কনসার্টের দল খুলবেন না। তখন বেঙ্গুবেডের স্কুলে মাষ্টারী চাকরি নিলুম। গাঁয়ের মানুষ-জন গরীব চাষাভুষো···পয়সা-কড়ির সামর্থ্য নেই তো··তবু আজকালকার দিনে লেখাপড়া না শিখলে নয়, তাই।···মাষ্টারী করছি·· সেণ্ট পীটার্সবর্গ থেকে হঠাৎ এক ধনী ভদ্রলোক কি কারণে গ্রামে এলেন—স্কুল দেখে খুশী হয়ে তিনি কিছু টাকা দেবেন বলেছিলেন—কিন্তু দিলেন না !···

জমিদার বললেন—লেখাপড়া শেখা দরকার। মাষ্টারী করায় পুণ্য আছে হে, ও কাজ ছাড়া উচিত হবে না।

—কিন্তু পেটটা তো চালানো চাই।

জমিদার বললেন—তোমার স্কুলে কি-কি বই পড়ানো হতো ?

ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে, নিউ টেষ্টামেণ্ট, তা ছাড়া কতকগুলো বই জোগাড় করা ছিল একখানার নাম দয়া-দাক্ষিণ্য; ছেলেদের শিক্ষা—বিশ্ব-পৃথিবীর ইতিহাস চয়ন—মিলিটারী সার্ভিসের আইন-কানুন; মনের খোরাক, সেণ্ট প্রোকোপিরাসের জীবনী, রীডার্স ফর দী পীপল, পারিবারিক কথা আর রেডার রীডার··· আরো দু-চারখানা বই।

জমিদার বললেন—বেশ বাছা-বাছা বই। বাঃ!··· এ চাকরি করেছো কতদিন ?

—আজ্ঞে, আট বছর। মাহিনা বাড়ে না ·একদিন এক ইন্‌সপেক্টর এলেন স্কুল দেখতে। স্কুল দেখে খুশী হয়ে আমার মাহিনা-বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করে' নোট লিখে গেলেন। সে নোট পেশ হলো সরকারী দপ্তরে··· কিন্তু কিছু হলো না। ইন্‌সপেক্টর আরো নোট দিয়ে গেছলেন মানে—স্কুলের সঙ্গে লাগাও জমিতে ফুল-গাছ পোতা চাই·

বাধা দিয়ে জমিদার বললেন—ফুলগাছে কি হবে! বার্চ গাছ পোতা দরকার।

ভদ্রলোক বললেন—বার্চ গাছ অনেক আছে স্যর !···

জমিদার বললেন—বিবাহ করেচো ?

—না, স্যর। বিবাহের জন্য পাত্রী মজুত···কিন্তু পয়সার অভাব···কি ভরসায় বিবাহ করি !··· গ্রামের চার্চে ক্লার্কের কাজ করেন এক ভদ্রলোক·· তাঁর শালী···চমৎকার দেখতে···ক্লার্ক-ভদ্রলোক সেই শালীকে আমার হাতে দিতে চান। গেলুম আমি মেয়ে দেখতে···

জমিদার বললেন—মেয়ের বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে ?

—তা জানিনা স্যর···তবে দেখতে চমৎকার। তার সঙ্গে পরিচয় হলো। মেয়ের নাম অলগা। অলগাকে বললুম—জানো, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে! অলগা বললে—জানি। তার সঙ্গে দু-চারদিন এখানে-ওখানে বেড়ালুম। অলগা বেশ গান গাইতে পারে। আমায় গান শোনালো।

জমিদার বললেন—কি গান···ভগবৎ-সঙ্গীত ?

—আজ্ঞে, ভগবৎ-সঙ্গীতও সে জানে কিন্তু আমাকে প্রেম-সঙ্গীত শুনিয়েছিল। তার মধ্যে একটি গান···আমার মনে গেঁথে আছে।···সে গানটি হলো

আমার এমন মতি কেন হলো—
বলেছিলেম কেন তোমায়,
আমি তোমায় ভালোবাসি—
তাই কি চলে গেলে তুমি হায়!

জমিদার বললেন—তার মানে, তুমি তাকে ত্যাগ করেছো বুঝি ?

—আজ্ঞে, ত্যাগ করা নয় স্যর···মানে, পয়সা-কড়ি নেই···বিবাহের আশা তাতে···

—ঐ, ঐ! তা যাক। স্কুল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ?

—আজ্ঞে।

—টেবিল-চেয়ার বই-খাতা—সব গেছে ?

—আজ্ঞে না, সেগুলো রক্ষা পেয়েছে···দিনের বেলায় আগুন লাগলো কিনা—গাঁয়ের চাষাভুষোরা এসে বই খাতা টেবিল-চেয়ারগুলো কোনো মতে বার করে আনতে পেরেছিল!

—ভালো। আচ্ছা, ধরো, কেউ যদি পরে স্কুল-বাড়ী তৈরী করিয়ে দেয়···তুমি সে স্কুলে-মাষ্টারী করতে রাজী আছো ?

—আজ্ঞে না···ঐ সামান্য মাহিনায় কি করে চলে, বলুন? তা ছাড়া ও কাজে আমার রুচি নেই।

—কেন নেই ?

—মাথা খারাপ হবার জো! বছরের পর বছর ধরে ঐ এক বই পড়ানো···একই রুটিন···কোনো বৈচিত্র্য নেই! ···মানুষ এতে পাগল হয়ে যায়!

—তাই তুমি মাষ্টারী ছেড়ে অন্য চাকরি চাও ?

—হ্যাঁ। আমি বাঁচতে চাই স্যর, আর পাঁচজনের মতো।

—কেরাণীর চাকরি করবে ?

—হ্যাঁ, স্যর···মানে, এ সব চাকরির ভবিষ্যৎ আছে।

—পারবে···না বাপু।···আমার ক্লার্ক ছিল, তাকে আমি ডিস্‌মিস্ করেছি, সত্য। কিন্তু ঠিক করেছি, ক্লার্ক আর রাখবো না।···নিজেই হিসাব-পত্র লিখবো। তবে হ্যাঁ, একজন পিয়ন রাখবো বটে। দ্যাখো, পিয়নের কাজ করতে রাজী থাকো যদি—মাহিনা বেশী নয়···মাষ্টারী-চাকরিতে পাঁচ টাকা করে পেতে···এ চাকরিতে পাবে সাত টাকা করে মাহিনা···আর আমার এখানে থাকা···খাওয়া-দাওয়া···

ভদ্রলোক বললেন কুণ্ঠিতস্বরে—আজ্ঞে, মাহিনাটা বড় কম, স্যর।

—তা হতে পারে। কিন্তু ক্লার্ক আর রাখবো না। দিন-কাল যা পড়ছে···খরচ যত কমানো যায়!···তাছাড়া আমি ভেবে পাচ্ছি না···তুমি মাষ্টারী চাকরি কেন ছাড়তে চাও! পুণ্যব্রত···বলো কি, মানুষজনকে শিক্ষিত করে তোলা···মহৎ কাজ।···মাহিনা অল্প···তা মহৎ কাজ করতে হলে ত্যাগী হতে হয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা কত কষ্ট করেন ···বিনা-পয়সায়···তাঁদের সে-কষ্টের ফলে পৃথিবীর কত কল্যাণ হয়!···আমি বলি, তোমাদের এ ত্যাগ···এ কত বড় আদর্শ!···শোনো, তুমি দ্যাখো···চেষ্টা-বেষ্টা করে স্কুলের বাড়ী যাতে তৈরী হয়···তাই করো। স্কুল তৈরী হলে আমার কাছে এসো। আমি সে স্কুলে একরাশ বই দেবো···আমার এখানে পড়ে আছে···কাজে লাগে না··· জঞ্জালের স্তূপ—তা ভালো ভালো বই···মানে,···আমার শুধু একটি সর্ত্ত আছে···একটি আলমারি তৈরী করাবে···সে-আলমারিতে আমার দেয়া বইগুলি রাখতে হবে···আর আলমারির মাথায় বড় বড় হরফে লেখা থাকবে··· 'প্রোকোরভকার জমিদার বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুয়াকভ আন্তনোভিচ বিহুধু-মহাশয়ের দান'···মানে, ভবিষ্যৎ-যুগের সকলে জানবে আমার কীর্ত্তির কথা।···ভাগ্য ভালো··· আমার কাছে এসেছো···আমার ঐ জঞ্জালগুলোর সদ্গতির আশা হলো!···

জমিদার ডাকলেন বেয়ারাকে⋯আলিয়োসকা⋯একখানা ঠেলা গাড়ি ডেকে আন্⋯আর ঐ বইয়ের তাগাড় তাতে তুলে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দে⋯উনি নিয়ে যাবেন।

দু-মাস পরে স্কুলের জন্ম নূতন বাড়ী তৈরী হলো⋯ স্কুলের লাইব্রেরীতে জমিদার চুয়াকভের দেওয়া বইগুলি রাখা হয়েছে। বইগুলির নাম⋯

নরকের চিঠিপত্র; কুকুর নিয়ে শিকার; রাস্তার রঙ্গমঞ্চ; প্রকৃতির প্রতিশোধ; রাজনীতি; সুনীতির উপকথা; মস্কো গেজেট; লাতিন বর্ণমালা; বিতর্ক-সহচর; জ্ঞানের পন্থা⋯

ইত্যাদি ইত্যাদি⋯

প্রায় দুশো বই⋯স্কুলের সাজসজ্জা হয়েছে⋯সব হয়েছে ⋯অভাব শুধু একজন মাষ্টারের। সে-মাষ্টার মশায় নাকি আত্মহত্যা করে' এ পুণ্যব্রত-পালনের দায়ে মুক্তি লাভ করেছেন!

(রুশ গল্প: উসপেন্‌স্কি)

রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন

শ্রীজনরঞ্জন রায়

আমার মনে হয় রামদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রধান পরিচয় তাঁহার কীর্ত্তনে।

নবদ্বীপের মঠবাড়ির নাম-কীর্ত্তন—

'ভজ—নিতাই গৌর রাধেশ্যাম,
জপ—হরে কৃষ্ণ হরে রাম,'

নবদ্বীপবাসীর কানে গেলেই সকলে সেই দিকে ছুটিত⋯আমরাও ছুটিয়াছি। কারণ লোকে জানিত এইবার বাবাজী মহাশয় গাহিবেন।

কী যে সে আকর্ষণ!

কীর্ত্তন শেষে মনে হইত—যিনি সকলের প্রাণে মূর্ত্ত করিতে পারেন নিজের ভাবকে, তিনি কত বড় ইন্দ্রজালিক!

একদিনের কথা বেশ মনে আছে। সকালে মঠবাড়ির 'ভজ নিতাই গৌর' নাম-কীর্ত্তন নবদ্বীপ পোড়ামা-তলার নিকট আসিয়া থামিয়াছে। তারপর প্রভাতী রাগিনীতে বাবাজী মহাশয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

ঐ গৌর নেচে যায়⋯

তিনি অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইতেছেন সকলকে

—ঐ⋯ঐ নেচে যায়।

সকলে যেন প্রত্যক্ষ করিতেছেন—গৌর সুন্দর ঐ তো নাচিয়া চলিয়াছেন। বাবাজী মহাশয়ের ভাবে যেন আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন সকলে। ঘটকক্ষে ভাগীরথীর ঘাটে চলিয়াছেন পুরনারীগণ, তাঁহারাও ক্রমে নিশ্চল হইলেন। পসরা লইয়া ব্যবসায়ী বণিকরা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ!

তারপর বাবাজী মহাশয়ের সেই মনমাতানো 'আখর' উঠিতে লাগিল—

দেখবি যদি ফেল্ পসরা
দেখবি আর সব নাগরী
ঐ যে প্রাণের গৌরহরি,
—তোদের গৃহকাজ, আর ফেলে আয়,
গৌর নটন দেখবি আয়⋯আয়, আয়।

সুরের মোহ স্পষ্ট হইয়াছে। বাবাজী মহাশয়ের চক্ষু মুদ্রিত। তিনি তাঁহার অন্তরের অনুভূতি আখর দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক শিহরণ। অশ্রুধারায় বুক ভিজিয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম—এ অশ্রু কি বিরহের⋯যাঁহাকে ডাকিতেছেন তাঁহাকে কি পাইতেছেন না? অথবা প্রাপ্তির-আনন্দে দুকুল ছাপিয়া প্রেম বন্যা বহিতেছে?

একটু সংবিৎ ফিরিতেই বাবাজী মহাশয় ধরিলেন লোচনদাসের সেই পদ—

ধবল পাটের জোড় পরেছে
তায়—রাঙা রাঙা পাড় দিয়েছে
চরণ উপর দুলে যেছে কোঁচা।
বাঘনল সোনার নূপুর
বেজে যায় মধুর মধুর,
রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা।

ইহার পর আখর দিতে আরম্ভ করিলেন—

কী বিমোহন—সবাই বিধুর,
রাঙা পায়ে সোনার নূপুর।
মন হরিতে নদীয়া বধুর
নূপুর বাজে কতই মধুর।

আবার পদটি ধরিলেন—

ঝাঁঝল ঝাঁঝল চাঁচর চুল,

তার গুঁজেছে চাঁপার ফুল।

আখর দিলেন—

যেন সুমেরু শিখরে দুলছে,

তায় সোনার চামর দুলছে।

আবার পদের শেষ চরণ ধরিলেন—

কুঁদ-মালতি মালা-বেড়া ঝোঁটা।

চন্দন মাখা গোরা গায়,

বাহু দোলায়ে চলে যায়,

কপাল মাঝে ভুবন মোহন ফোঁটা॥

শেষে যেন এইরূপ আখর দিলেন—

গোরার কপালে ওটা

মদন-বিজয় ফোঁটা।

কুলবতীর কুলের খোঁটা

ও নয় চন্দনের ফোঁটা।

হয়তো দুই ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। বাবাজী মহাশয়ের কণ্ঠ বন্ধ হইল। দ্রুতপদে তাঁহার দল ভজ নিতাই গৌর—নাম ধরিয়া নবদ্বীপ পরিক্রমা সারিতে অগ্রসর হইলেন। যেন সুরের ইন্দ্রজাল কাটিল…ধরার মানুষ ধরায় ফিরিয়া আসিল। ব্যবসায়ীগণ দৌড়িলেন পণ্যসম্ভার লইয়া যে যাঁহার গন্তব্য স্থানে। মহিলারা সব ছুটিলেন লজ্জানত হইয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে…মুখে বলিতেছেন—ছিঃ ছিঃ কি বেহায়াপনা করিলাম দশের মাঝে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া! কিন্তু কতক লোকের সহজে ঘোর কাটিল না। আমিও সেই দলের মধ্যে ছিলাম। ভাবিতেছি—গৌর কি সত্যই নাচিয়া যান নাই…এ কি শুধুই গান?

বুঝিলাম—ইহাই লীলা-আস্বাদন। এরূপে আস্বাদন করাইতে পারেন কয়জন, যাহা বাবাজী মহাশয় পারিলেন? যাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় তিনিই অন্যকে তাহা জানাইতে পারেন।

এরূপ আরও একটি দিনের কথা মনে পড়িতেছে। হুগলীর অবধূত-আশ্রমে গিয়াছি, প্রাতে স্নান করিয়া ফিরিতেছি। দেখি দলে দলে লোক দৌড়িতেছেন সুরধুনী তীরে। কানে গেল—ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম কীর্ত্তনের সুর। বুঝিলাম নাম-প্রচার ব্রতধারী বাবাজী মহাশয় আসিয়াছেন, তাঁহার গান শুনিতে সকলেই ছুটিতেছে। আমিও দ্রুতপদে চলিলাম। তখন কীর্ত্তন থামিয়াছে, বাবাজী মহাশয় ধরিয়াছেন—

ঐ যায় নিতাই হেলে দুলে

সুরধুনীর কুলে কুলে,

হেমদণ্ড বাহু তুলে

ডাকে তোরে আয়রে—।

তারপরে একটি পদের এই কলিটি ধরিলেন—

কে যাবি কে যাবি তোরা ভবসিন্ধু পার।

কলুষ পাবন গোরা যুগ অবতার।

কে পারে যাবি আয়রে

নিতাই ডাকে আয়রে—

আমি পার কোরে দিই ভববারি

কোনো বিচার নাইরে।

শুধু মুখে বল্ গৌরহরি

দিন বহে যায় রে॥

যতদূর সাড়া গেল সকলেই আসিতেছেন। আসার যেন অন্ত নাই। নিতাই যে পার করিয়া দিবেন—বাবাজী মহাশয় বলিতেছেন।

বিচার বুদ্ধি জিজ্ঞাসা করিল—ইহা কি অভিনয়? অন্তর হইতে কে সাড়া দিল—ইহা সত্য-সত্য-সত্য…চিরন্তনের সত্য। ভগবান যে মায়া-মোহ পার করিতে ডাকেন…মানুষ শোনে না; চিহ্নিত বৈষ্ণব-প্রধান বাবাজী মহাশয় শুনিয়াছেন সে ডাক, তিনি পার হইতেছেন। কিন্তু অকৃপণ পরম উদার বৈষ্ণব, সকলকে শুনাইতেছেন দয়াল দেবতার সেই ডাক—আয় আয়…তোরা জয়-গৌর বলে' আয়…জাতি-কুল-অধিকারের কোনো বিচার নাইরে আজ…পার হ'বি আয়।

—শ্রদ্ধানত হইল সারা অন্তর।

কীর্ত্তনের ধুলায় আকুল-ব্যাকুল ক্রন্দনে গড়াগড়ি দিতেছেন কত লোক।

মন বলিল—ছাড়্ মিথ্যা অভিমান…তুইও গড়াগড়ি দে এই নামযজ্ঞের রজে……।

আহা! কি তৃপ্তি…আমি যেন অমৃত-ধামে—আর এপারে নাই।

অতি দীর্ঘকাল একাসনে কীর্ত্তন করিয়া ক্লান্ত হইতেন না বাবাজী মহাশয়।

সে আজ হইতে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। হেতমপুরে রাজ-বাটীতে নবরাত্রি উৎসব। একাসনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিলেন বাবাজী মহাশয়। তিনিও বাহ্যহারা, শ্রোতারাও বাহ্যহারা। প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত এরূপ একাসনে তিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সুর-তালে কোনও ভুল হইত না এই নারদতুল্য সুরবিদের। দলের কাহারও করতালের বাদ্যে এতটুকু বেতাল আওয়াজ হইলে, তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন।

এক সুরে গান শুনিতে শুনিতে শ্রোতারা ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়েন, এজন্য শুধু তালফেরতা নয়, মিশ্রসুরের ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন, ইহা তিনি বিশেষভাবেই অনুভব করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মিশ্রসুরের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন, রামদাস বাবাজী মহাশয় মিশ্রসুর ব্যবহার করিয়াছেন শ্রুতি-মাধুর্য্য বাড়াইতে। তাহা তাঁহার আখরগুলিতে নব নব রস পরিবেশনে সাহায্য করিয়াছেন। সুতরাং এই উভয় প্রসিদ্ধ সুরস্রষ্টার উদ্দেশ্য বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ নিজের আবিষ্কৃত মিশ্রসুরে সমস্ত রবীন্দ্র-গীতি গাহিলেন, তাহাই রবীন্দ্রগীতিকলা। আর বাবাজী মহাশয় সংযোজিত

বাবাজী মহাশয়ের এই মিশ্রসুরকে 'ভাঙা গরানহাটী' বলিলে ভুল হইবে কি-না জানি না।

রামদাস বাবাজী মহাশয়কে এই মিশ্রসুরে গাওয়ায় হাতে খড়ি দেন বড় বাবাজী (রাধারমণ চরণদাস) মহাশয়, প্রভু জগৎবন্ধু নহেন। রামদাস বাবাজী মহাশয় ফরিদপুরে জগৎবন্ধু সঙ্গী যতদিন, ততোদিন শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছেন বাঁধা সুরে। নবদ্বীপে বড় বাবাজী মহারাজের সঙ্গে মিলনের পর হইতে গৌরনাম প্রচারে ব্রতী হইলেন এবং মিশ্রসুরের সন্ধান পাইলেন। কোন্ কোন্ সুরের মিশ্রণ দিয়া কিরূপ গানে কতটা রসবৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ বা রামদাস বাবাজী মহাশয়, সঙ্গীতজ্ঞ সমাজ তাহা লইয়া ভবিষ্যতে গবেষণা করিবেন নিশ্চয়। কারণ সঙ্গীত রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে উভয়েরই মিশ্রসুর। তাহার যোগ্য মূল্য দিতেই হইবে।

কীর্ত্তনের সময়ে রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কণ্ঠে বজ্রনাদ বাহির হইত। তাহা অৰ্দ্ধ কোশ দূরেও স্পষ্ট শোনা যাইত। বাবাজী মহাশয়ের বয়স তখন ৪৪।৪৫ হইবে। বেলুড় মঠে তিনি গাহিতেছেন, আর গঙ্গার পরপারে বরাহনগরের পাটবাড়িতে বসিয়া আখরসহ সেই গান লিখিয়া লওয়া হইয়াছে—ইহা আমরা জানি।

কীর্ত্তনের সময়ে কোনো বাধা আসিলে বাবাজী মহাশয় বিচলিত হইতেন না।

এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনা মনে পড়িতেছে।

পুণ্যকীর্ত্তি মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সম্মিলনীর শুভারম্ভ উদ্‌যাপন হইয়াছে কাশীমবাজারে। শেষে নগরকীর্ত্তন বাহির হইয়াছে। পাগড়া বাজারে ভীড় বাড়িতেছে। শত শত বৈষ্ণবের পশ্চাতে নগ্নপদে চলিয়াছেন মহারাজা। দোকানপাট ছাড়িয়া ব্যবসায়ীগণ করযোড়ে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গৃহ ছাড়িয়া গৃহস্থেরা নাম কীর্ত্তনে সহযাত্রী হইয়াছেন। পুরনারীগণ হুলুধ্বনিসহ গবাক্ষ পথ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতেছেন। কোনও উদ্ধত ধনী ব্যক্তি এই জনসংঘট্ট ভেদ করিতে চাহিলেন তাঁহার জুড়িগাড়ি লইয়া। গাড়ি-চালকের চীৎকারে কেহ কাণ দিতেছেন না। বাবুটির ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সম্মুখের লোকদের চাবুক প্রহারে রাস্তা করিয়া লইতে হুকুম দিলেন তিনি। চাবুকের আঘাতে আর্ত্তনাদ করিলেন বহুলোক। কানে গেল সে শব্দ বাবাজী মহাশয়ের। তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জুড়ির সম্মুখে আসিলেন। কোনো চাবুকের ভয় করিলেন না। অবিচলিতভাবে দৃপ্তকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

> নিতাই মোদের কাণ্ডারী,
> কিসের দেখাও জারিজুরি ?
> যখন করবে তোমায় সমনজারি
> কোথায় রবে জুড়িগাড়ি।
> এখনো, পাপের বোঝা করো ভারি
> তুমি বলিহারি গো বলিহারি।
> ক্ষমার আধার মোর গোরারায়
> তাঁর চরণে দাও গড়াগড়ি।

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন মদমত্ত লোকটি গাড়ি হইতে নামিতেছেন। তিনি একেবারে বাবাজী মহাশয়ের চরণে আসিয়া পড়িলেন। হরিবোল হরিবোল…নিতাই গৌর হরিবোল রবে ফাটিয়া গেল যেন আকাশ। ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে গঙ্গার দুকূল পবিত্র হইল। সার্থক হইল বৈষ্ণব সম্মিলনী। অবিস্মরণীয় হইল বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন মহিমা।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের ৭০তম জন্মতিথি সমাগত। তদুপলক্ষে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী 'রামদাস জয়ন্তী' উৎসবের আয়োজন করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছেন। এই জয়ন্তী উৎসবের জন্য রচিত আমার এই শ্রদ্ধা নিবেদনে কোনো অতিশয়োক্তি আছে মনে করি না। তবে স্মৃতি হইতে লেখা বহুকাল পূর্ব্বে শোনা পদাবলী ও আখরগুলির মধ্যে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকিয়া গেল। বৈষ্ণব সমাজ সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই জয়ন্তী উৎসব সার্থক করুন শ্রীগৌরসুন্দর।

তোমার মধুর নামে

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনর্থক একা আজ ব'সে আমি বহুক্ষণ ধরি'
আকাশের অনির্দ্দেশে পাঠাতেছি একান্ত আকুতি,
ভোরের ভাস্কর বুকে জাগাল না নব অনুভূতি,
সমস্ত জীবন যেন শেষহীন শ্রাবণ-শর্ব্বরী।
কুশল-কামনা নিয়ে আসিলে না কভু স্নেহ করি',
বেদনা-উত্তল মনে পড়ে শুধু পুরাতন পুঁথি,
নয়নে কেবলই ঝরে অশ্রুম্লান শত স্মিত-যূঁথি,
আমার চির-নিদ্রা-হারা-রাত্রি-সহচরী।

তবুও তাহারা মোর পরাণের পরম আপন,
আমার ধূপের দাহে আমোদিত তোমার ধরণী,
তাইতো গোপনে জাগে অনুরাগে কবির স্বপন,
অশেষ আকাশে ভাসে উদয়াস্ত সুরের সরণী।

সুচির বিরহে ভালো মনে পড়ে মরমের মিতা,
তোমার মধুর নামে ভ'রে ওঠে আমার কবিতা॥

সোমনাথ

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্
উজ্জয়িন্যাং মহাকালে মোঙ্কারমমলেশ্বরম্ ॥

প্রভৃতি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ অন্যতম। সোমনাথকে কেন্দ্র করিয়া হাজার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া ভারতের এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও শিল্প গড়িয়া [উঠিয়াছি]ল। গ্রীক্ ঐতিহাসিক যুগ হইতে নানা শাস্ত্র পুরাণে, সাহিত্যে সোমনাথের মহিমা কীর্তিত হইয়া

কারুকার্যময় সোমনাথ মন্দিরের সুবৃহৎ স্তম্ভ এবং ভিত্তিভূমি
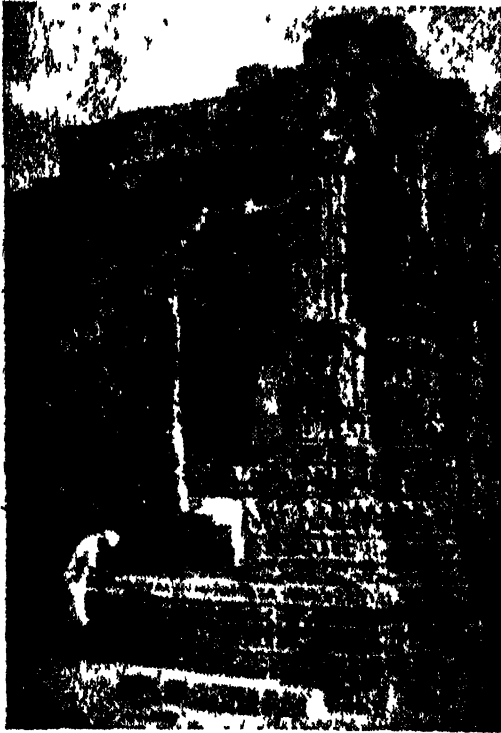
আসিতেছে। সোমনাথের দেউলের ঐশ্বর্য্য দেশ-বিদেশের মানবকে আকৃষ্ট করিত। নানা দেশের পর্য্যটকগণ যুগে যুগে সোমনাথের গুণকীর্ত্তন লিখিয়াছেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০ সালে চন্দ্রগুপ্ত সভায় গ্রীক্ রাজদূত মেগাস্থিনিজ সোমনাথ দর্শন করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"তুঙ্গ মন্দিরের চূড়াগুলি মিশিয়া আছে আকাশের নীলে, সেগুলি সব স্বর্ণময়। স্বরগের সুষমা, ভূমার আনন্দ যেন শিল্পী পাষাণে রাখিয়া গেছে। এমন সুমহান পাষাণের মধ্যে যে সৎ-সত্য-আনন্দের মন্ত্র ধ্বনি নিত্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহা যেন 'অর্ফিউস'-এর গান অনন্ত অম্বরে উঠিয়া স্বর্গে ও মর্ত্তে সমন্বয় সৃষ্টি করিতেছে।"

৬৩২ সালে নাগাইত চীন পরিব্রাজক হিউয়েং সাং সোমনাথের গরিমায় মুগ্ধ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"এ তীর্থ যোজন ব্যাপী, সুপ্রাচীন অশত্থ বৃক্ষের মত ভারতের সব শান্ত রস বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ইহার দরশনেই ধ্যান। এ শুধু মন্দির-মঠ নয়, জাতির ভাব ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া আছে প্রস্তরীভূত দেউলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতার বর্ণনা দিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া নিষ্ফল। ইহার বিপুল মহিমা ম্লান করিয়া দেয় শত শত রাজ-রাজশ্রীকে। কেবল ভক্তের প্রাণ রাজ্যে উদ্ভাসিত থাকে। ভারতের মহাদেব, হিন্দুত্বের রাজ্যের বিগ্রহ সুপ্রাচীন মহাচীনের তুমি প্রণিপাত লহ।"

১০২৫ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ সোমনাথের মন্দির ধ্বংস ও লুন্ঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে পারস্য দেশের ঐতিহাসিক পণ্ডিত আল বেরুণী আসিয়াছিলেন, তিনি সুলতানের সঙ্গে গজনী প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় মামুদকে অনুতপ্ত চিত্তে বলিয়াছিলেন—"এ গোটা দেশটাই, মন্দিরই গোটা দেশ। দেবের যোগ্য এ গৃহ, দেখিবার মতন দৃশ্য বটে। ইহার শিল্প ঐশ্বর্য্য অবিস্মরণীয়, অতুলনীয়। এই মন্দির ভগ্ন করিয়া কোন ফল ফলিবে না। আপাততঃ লুপ্ত, সুপ্ত হইলেও ধীরে ধীরে জাতির বল যোগাইবে। "কুফর" ভাঙ্গিয়া সুলতান গর্ব্বভরে চলিতেছ, এই "কুফার" ভাঙ্গা কুঠারই তোমার মরণ কুঠার হইবে। তব সঙ্গী বটে, এ মন্দির ধ্বংসেতে সুখী নই; ঘৃণা, লজ্জা ও দুঃখ ভরে গৃহে ফিরিতেছি।"

দেবাদিদেব সোমনাথ শত সহস্র বৎসর যেমন ভারতের নরনারীর চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তেমনই

সোমনাথের মন্দিরের শিল্প ও ঐশ্বর্য্য ভারতবাসীর পরম গৌরবের বস্তু ছিল।

দ্বাপরে বহু প্রাচীন কালে—রামায়ণের ও ত্রেতায় মহাভারতের যুগ হইতে প্রভাস, রৈবতক ও দ্বারকার মহিমার কথা শুনিয়া আসিতেছি। মহাভারতে এবং পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাসলীলা ও প্রভাসে তাহার মানবলীলা শেষ হইবার কথা বর্ণিত আছে। এ যুগেও নবীনচন্দ্র সেন "রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস," মহাকাব্যে শ্রীকৃষ্ণ লীলার নূতন যে ভাবধারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা বাল্য-কালে মদীয় চিত্তে এক নব অনুপ্রেরণা প্রদান করে। মহাভারতের মুশল পর্ব্বে যদুকুল ধ্বংসের বিবরণ আছে। মুনিগণের শাপে গৃহবিবাদে ও মুশলের আঘাতে যদুবংশের কুমারগণ মৃত্যু মুখে পতিত হন এই প্রভাস ক্ষেত্রে। এই প্রভাসেই বলরাম সমুদ্রতটে বসিয়া নিজ দেহ সংকর্ষণ-পূর্ব্বক পশ্চিমদেশাভিমুখে লীন হইয়া যান। শাপগ্রস্ত যাদব মুশল ক্ষয় করিবার জন্য ঘষিয়া ঘষিয়া সামান্য খণ্ডে পরিণত করে এবং একেবারে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। তৎক্ষণাৎ একটী মৎস্য তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। সেই মৎস্যকে এক এবং তাহার পেট হইতে মুশল বাহির করে। প্রভাসেরই "জরা" নামে এক ব্যাধ মুশলখণ্ড লইয়া বাণের ফলা তৈয়ার করে।

পুণ্যতোয়া সরস্বতী, হিরণ্য ও কপিল নদীত্রয় যেখানে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে সেই ত্রিবেণী সঙ্গমে মনোরম দ্বীপে শ্রীভগবান নিজ লীলা অন্তের কথা চি- করিতেছিলেন তখন ঐ জরা নামের ব্যাধ হরিণ

প্রাচীন সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

সোমনাথ মন্দির সংস্কারের নূতন নক্সা

শ্রীকৃষ্ণের রাতুল চরণে মুশল নির্ম্মিত বাণ নিক্ষেপ করে। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের মানব লীলা শেষ হয়।

সোমনাথ মন্দির পরিদর্শনে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ

এই প্রভাসেই সোমনাথের মন্দির। ভারতের পশ্চিমাংশে আরব্য সাগরের তীরে সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপে দক্ষিণ পশ্চিম অংশে প্রভাস পত্তন অবস্থিত। এইখানে বর্ত্তমানে ভেরাভেলা নামে বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। ভেরাভেলা কলিকাতা হইতে দিল্লী, রাজপুতানা, মেসানা, রাজকোট, হইয়া রেলপথে ১৭০২ মাইল অন্তরে অবস্থিত। সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপ আরব্য সাগর মধ্যে ধনুক আকারে অনন্ত নীলাম্বুরাশি মধ্যে বিস্তারিত। পূর্ব্বে ক্যাম্বে উপসাগর, পশ্চিমে কচ্ছ উপসাগর বেষ্টন করিয়া আছে। প্রভাস পত্তন সৌরাষ্ট্রের মধ্যমণি।

সোমনাথের প্রাচীনত্ব

পুরাণে আছে দক্ষের ছাব্বিশটী কন্যার বিবাহ হইয়াছিল চন্দ্রের সঙ্গে। তাহাদের মধ্যে রোহিণী অন্যতম, চন্দ্রের অসৎ ব্যবহারে রোহিণী জর্জ্জরিত হইয়া পিতার নিকট চন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। দক্ষ চন্দ্রকে তাহার কন্যাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। শশী নিজ রূপে মত্ত হইয়া শ্বশুরের কথা উপেক্ষা করেন। শাপ দান করেন। চন্দ্র নানা দেবদেবী, মুনী ঋষির স্তব স্তুতি করিয়াও শাপ মোচন করিতে পারিলেন না। ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভাসে উপস্থিত হইয়া নির্জ্জন নিরালায় সমুদ্রতটে বসিয়া মহাদেবের অনুগ্রহের জন্য কঠোর তপস্যা করেন। ভোলানাথ তাহার সাধনায় তুষ্ট হইয়া দক্ষের শাপের তীব্রতা কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া দেন। তাঁহার বরে চন্দ্র একপক্ষে কলায় কলায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত পাইয়া পূর্ণ জ্যোতিঃ লাভ করিতে থাকেন এবং অপর পক্ষে দিন দিন হ্রাস পাইয়া নিষ্প্রভ হন। প্রভাসে সমুদ্রতটে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে খ্যাত এবং স্থানটীকে সোমতীর্থ বলা হয়।

স্কন্দ পুরাণে প্রভাস খণ্ডে, প্রভাসের গরিমা ও মহিমা ব্যক্ত আছে। হর পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—প্রভাস বিশ্বে
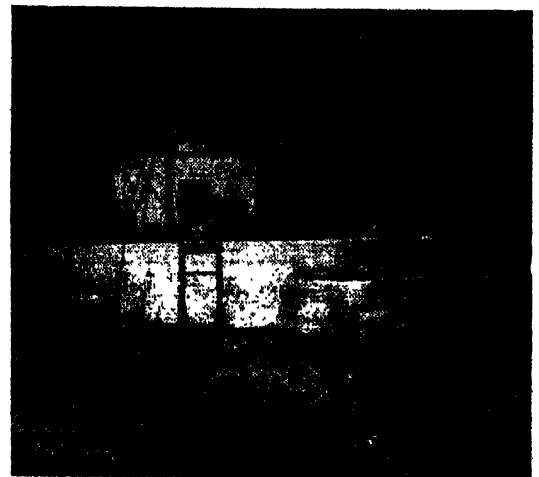
নবনির্মিত সোমনাথ মন্দির

সর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতির্ম্ময় স্থান। তীর্থ [illegible] [illegible]

প্রভাস প্রসিদ্ধ। হে দেবী, প্রভাসে সূর্য্য চিরবিরাজমান, সেইজন্য প্রভাস চিরপূজনীয় স্থান।

পূর্ব্বে যখন সূর্য্য এমনই উজ্জ্বল ছিল যে সূর্য্য-পত্নী ছায়া তাঁহার জ্যোতির প্রখরতায় সূর্য্যের সন্নিকট হইতে পারিতেন না, তখন ছায়া প্রভাসে গিয়া সোমনাথের নিকট স্বামীর তেজের হ্রাস কামনা করেন। সোমনাথ ছায়ার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, সূর্য্যের তেজ একচতুর্থাংশে পরিণত হয়।

অতি প্রাচীন কালে সোমনাথের মন্দির স্বর্ণের ছিল। ত্রেতায় রাবণ মন্দিরটী রূপার দ্বারা নির্ম্মাণ করেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ এই মন্দির কাষ্ঠে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক যুগে অনহিল্‌বাদে রাজা ভীমদেব সোমনাথের মন্দিরটী প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ করেন এবং কুমারপাল মনোরম শিল্প কার্য্যের দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি করেন।

প্রভাস পত্তনকে পুরাণে অনেক স্থানে "দেবপত্তন" বলা হইয়াছে। গ্রীক্ ভূগোলতত্ত্ববিদ্ স্ট্রাবে এবং এথেন্সের রাজনীতিবিদ্ প্রভাসের মনোরম, নরম গরম আবহাওয়া, সুদৃশ্য প্রাকৃতিক শোভা এবং উর্ব্বরভূমির গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রথম শতাব্দীতে রোমের প্লিনি সোমনাথকে "পত্তনশ্রী" (patomri) অর্থাৎ নগরশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। নগরটী বৃহৎ, সুদৃঢ় বন্দর, বিত্তশালী জনপথ, বিরাট বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ভদ্রকালী দেবীর মন্দিরে ১২৫ সম্বদে (১১৬৯ খৃঃ) এক শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে যে—সোমনাথ নগর সোমপুর নামেও খ্যাত, পৃথিবীর ইহা মুখমণ্ডল অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান। বিশ্বের অলঙ্কার মানবের ধনভাণ্ডার, মহাদেবের পরম প্রিয় স্থান, চন্দ্রের শাপমুক্তির কেন্দ্র। প্রভাস পত্তন আফ্রিকা হইতে ইন্দোনেশিয়া পর্য্যন্ত ভারত মহাসাগরের বক্ষে পরিভ্রমণকারী অর্ণবপোত ও বণিকগণের রসদ পরিপূর্ত্তির [illegible]।

সোমনাথের মন্দিরের ঐশ্বর্য্য

জনপ্রবাদ যে সোমনাথ লিঙ্গ ভক্তিভরে স্পর্শ করিয়া মাত্রই নরনারী নানা ব্যাধি হইতে মুক্ত হইত। লিঙ্গ স্পর্শে মানুষ জন্মান্তরে উত্তম জীবে পরিণত হয়, প্রভাসের ত্রিবেণীতে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ স্খালন হয়। এই বিশ্বাসে যুগে যুগে ভারতের দিগন্ত হইতে নরনারী আগমন করিত এবং মণিমুক্তা স্বর্ণ রৌপ্য সোমনাথের মস্তকে চড়াইত। বিগ্রহের সেবার জন্য রাজা, প্রজা, ধনী, ব্যবসায়ী, তাহাদের আয়ের অংশ দিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইত। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে সোমনাথের সেবায় দশ হাজার গ্রাম নির্দ্ধারিত। ইহা অত্যুক্তি হইলেও সোমনাথের সেবার জন্য সহস্রাধিক গ্রামের

নূতন মন্দির উদ্বোধন দিনের জনতা

সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে শত শত ব্রাহ্মণ পূজা করিত, শতাধিক ক্ষৌরকার মস্তক মুণ্ডনে লিপ্ত থাকিত, শত শত দেবদাসী মন্দিরে নৃত্য করিত, শত শত ক্রোশ দূর হইতে নিত্য গঙ্গাবারি আনিয়া পূজা হইত।

অল্‌বেরুণী সচক্ষে মন্দির দেখিয়া লিখিয়া গেছেন;—দুর্গ ও মন্দির খুব পুরাতন নহে, আন্দাজ শতবর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত। পৌত্তলিকদের পরম শ্রদ্ধার বিগ্রহ, হিন্দের সকল প্রান্ত হইতে আবেগ ভরে নরনারী আনয়ন করিয়া পূজা করিত।

আরব মণ্ডিত জ্যাকেরিয়া (অল্‌-কাজভিনি) 'আসার অল্‌-বিলাদ' পুস্তকে লিখিয়াছেন—সোমনাথ [illegible]

বিখ্যাত নগর, সমুদ্রতটে অবস্থিত, নিত্য লহরী মন্দিরের স্ফাটিক সোপানের পদ ধৌত করে। মন্দির অভ্যন্তরে বিরাট প্রস্তর লিঙ্গ অবস্থিত। তাহার তলদেশ খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। চন্দ্রগ্রহণের সময় এখানে যাত্রীর সমাগম অত্যন্ত অধিক হয়। এক সহস্র ব্রাহ্মণ নিত্য পূজা পাঠ করেন। তোরণ দ্বার সম্মুখে নটী নিত্য নৃত্যে রত থাকে। মন্দিরের সৌধ ৫৬টী দারুস্তম্ভের উপর ন্যস্ত। স্তম্ভগুলি সব সীসার দ্বারা মোড়া, গর্ভমন্দির অন্ধকারময়—কিন্তু মরকত মণি ও বিবিধ রত্নের জ্যোতিতে সমগ্র কক্ষ উদ্ভাসিত। দুই শত মণ ওজনের সোনার শৃঙ্খলে রত্নখচিত ঘৃতের স্বর্ণপ্রদীপ ঝুলিত। যখন এই শৃঙ্খল নড়িত তখন এক মধুর ঝঙ্কারে কক্ষটী মুখরিত হইয়া উঠিত।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ধ্বংসের গান

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

যন্ত্র-যুগের সভ্যতারে নমস্কার !
দুই দিকে দুই সভ্য-দানব—কী দুর্গতি কোরিয়ার।
যন্ত্র-যুগের সভ্যতারে নমস্কার।

মাঝখানে এক দাঁড়ি টেনে—
দু'দিক্ থেকে কামান হেনে,
গায়ের উপর পড়েই তারা—করছে পরের উপকার।
যন্ত্র-যুগের সভ্যতারে নমস্কার।

আজ কোরিয়ার মানুষগুলো
হচ্ছে যেন 'ধোনা-তুলো'।
রক্ত-রসিক রাষ্ট্র সঙ্ঘে—চতুরঙ্গের অহঙ্কার।
যন্ত্র-যুগের সভ্যতারে নমস্কার।

হোক্ কোরিয়ার অধিবাসী
বরের পিসি, ক'নের মাসী,
তবুও কি পাচ্ছে তারা—জীবন-ধারণ-অধিকার ?
যন্ত্র যুগের সভ্যতারে নমস্কার।

অ্যাটম-বোমা আসবে কবে ?
এ কারসাজি ধ্বংস হবে—
ভবার্ণবে ভাসবে কেশব ! দেখবো বিচার নিয়ন্তার।
যন্ত্র-যুগের সভ্যতারে নমস্কার।

ভবিষ্যৎ

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

শোণিত মূল্যে কিনিতে চেয়েছি স্বদেশের স্বাধীনতা,
দুর্বার লোভে ভঙ্গ করিনি পণ,
অভয় হাস্যে উজ্জ্বল করি মৃত্যুর মলিনতা
চালায়ে গিয়েছি সংকটে-ভরা রণ।
খ্যাতি মর্যাদা তুচ্ছ করিয়া উচ্চে রাখিয়া শির
ছিন্ন করিয়া সুকঠিন বন্ধন
লুপ্ত-রত্ন-সন্ধান লাগি আলোড়ি সিন্ধুনীর
যাত্রা করেছি না মানিয়া দিনক্ষণ।

পূর্ণ হয়েছে দুর্জয় পণ, সিদ্ধ হয়েছে কাজ ;
উদিত সূর্য, শর্বরী অবসান,
শ্বেত-পর্বত স্কন্ধ হইতে ভূমিতে পড়েছে আজ,
সফল হয়েছে তপ্ত-রক্ত-দান।

তবু কেন আজো শত্রু-বিজয়ে হয় না তূর্যধ্বনি,
সূর্য-উদয়ে যায় না অন্ধকার ?
লুণ্ঠন-কারী দস্যু গিয়াছে, বক্ষ হইতে শনি,
মর্ম-বিদারী তবু কেন হাহাকার ?

ক্ষণিকের লোভে বাড়িয়াছে ক্ষোভ, মিথ্যার অভিযান,
তবু জানি মোরা এ নহে চিরন্তন।
'মলিন হইতে দিব না কখনো ভারতের সম্মান'
স্তব্ধ সত্য করিতেছে গর্জন।

জনশিক্ষা প্রসারে শিক্ষাদান—

গত ১৫ই মে হইতে ৩০শে জুন দেড়মাস কাল ২৪পরগণা জেলার হাবড়া ষ্টেশনের অনতিদূরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বুনিয়াদি শিক্ষণ-শিক্ষা মহাবিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার প্রায় ২শত ছাত্রছাত্রীকে জনশিক্ষার প্রসার বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করেন—কয়েকজন জন-সেবা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেও গিয়াছিলেন। জনশিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদারের নেতৃত্বে শিক্ষাদান ব্যবস্থা হইয়াছিল। সকলকে ঐ স্থানে দেড়মাস কাল বাস করিতে হইয়াছিল; তথায় সমবায়ী মনোভাব সৃষ্টির সুযোগ ছিল। গ্রাম-সংগঠনের অভিজ্ঞতা ও তাঁহাদের প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম হীরাপুরে লইয়া গিয়া পানা পরিষ্কার,কম্পোষ্ট সার তৈয়ারী, শিক্ষিতের মান নির্ণয়, অর্থনীতিক মান নির্ণয় প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বাটানগরে জুতার কারখানাটি তাহাদের দেখানো হইয়াছিল। ছাত্রাবাস পরিষ্কার, রাস্তা, নর্দমা, পায়খানা, খেলার মাঠ প্রভৃতি পরিষ্কার, জঙ্গল কাটা, কৃষিকাজ, রান্নাঘরের কাজ, নূতন রাস্তা তৈয়ারী প্রভৃতি কাজ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তাঁতের কাজ, মাদুর ও পাপোষ তৈয়ারী, তালপাতার ব্যাগ, চাটাই প্রভৃতি বোনা, চামড়ার কাজ, ছবি ও প্রাচীর পত্র লেখা প্রভৃতি শিখানো হইয়াছে। এই সকল শিক্ষাপ্রাপ্ত জন-শিক্ষা প্রচারকের-দল বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে যাইয়া বাস করিলে দেশে জনশিক্ষার প্রসার হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন।

২৪পরগণায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা—

২৪পরগণা জেলা স্কুল বোর্ড গত ১৬ই জুলাই হইতে জেলার নিম্নলিখিত ইউনিয়নগুলিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন—বারাকপুর মহকুমা—বিলকান্দা ও বন্দিপুর ইউনিয়ন। বারাসাত মহকুমা—কাসিমপুর, মারিচা, আমুদিয়া, সোহাট শেঠপুর, রাজীবপুর ও পাথরঘাটা। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা—শোন পুর, মূলটি, ফ্রেজারগঞ্জ, মৌসিনী, মনসা দ্বীপ, সরিষা, ডায়মণ্ড-হারবার, ফলতা ও করনজলী। সদর মহকুমা···ভোজের হাট, বোদরা, দক্ষিণ গড়িয়া, ক্যানিং, চোরাবিদ্যা, তেনাড়ী, নঙ্গী, জোনকা, আশাটি, সুকদেবপুর, ফলতাবাদ। বসিরহাট মহকুমা—হাড়োয়া, গোপালপুর, ইতিণ্ডা, শিকরা, ধান্যকুড়িয়া, ঘোড়ারস, চাত্তরা চাঁদপুর, চরঘাট, রামেশ্বরপুর, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ও শম্ভুনগর। বোর্ডের সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সহ-সভাপতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ নস্করের এ বিষয়ে পরিশ্রম ও চেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয়—

পণ্ডিচেরীতে যে শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত ২৯শে জুলাই কলিকাতায় ভারতী সিনেমা হলে এক জনসভা হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু সভাপতিত্ব করেন ও বহু খ্যাতনামা মনীষী বক্তৃতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বহির্জগতের প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে শিক্ষা দিয়াছে—শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যালয় মানুষের মনকে আয়ত্ত করিবার শিক্ষা দিবে। ভারতবর্ষে চিরকাল এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে—পুরাকালের নালন্দা ও তক্ষশীলা এবং বর্তমান যুগের শান্তি-নিকেতন, গুরুকুল আশ্রম, সবরমতী আশ্রম প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। কলিকাতায় যাহাতে ঐ নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয়, সেজন্য সকলের নিকট আবেদন জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

ভূমিসেনা দল গঠন—

গত ২৪শে জুলাই হুগলী জেলার আটপুর গ্রামে প্রাচীন রাধাগোবিন্দ মন্দিরে এক জনসভায় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ভূমিসেনা দল গঠন করেন। তথায়

একশত জন ভূমিসেনায় ব্রত গ্রহণ করেন—তন্মধ্যে সর্বপ্রথম মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর ব্রত গ্রহণ করেন। পরে কৃষি-মন্ত্রী, হুগলীর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীরামপুরের মহকুমা হাকিম, কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার প্রভৃতি সকলে ব্রতী হইয়া ব্যাজ গ্রহণ করেন। এইভাবে এখন সর্বত্র শিক্ষিত ভদ্রলোকগণকে ভূমিসেনার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে—তবে যদি দেশে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গ পল্লী-মঙ্গল সমিতির সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

জনাব কিদোয়াইএর পদত্যাগ—

কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করায় গত ২রা আগষ্ট প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইয়াছে ও রাজকুমারী শ্রীঅমৃত কাউরকে আপাততঃ ঐ বিভাগের কাজ দেখিতে বলা হইয়াছে। রাজনীতিক মতবাদ লইয়া বিরোধের ফলে জনাব কিদোয়াইকে পদত্যাগ করিতে হইল। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা তাঁহাকে সর্বত্র জনপ্রিয় করিয়াছিল।

নূতন কমার্শিয়াল কলেজ—

স্যর বদরীদাস গোয়েঙ্কা প্রদত্ত ৬ লক্ষ টাকা দ্বারা কলিকাতায় একটি নূতন কমার্শিয়াল কলেজ খোলা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনিষ্টিটিউট-এর নাম-পরিবর্ত্তিত হইয়া "গোয়েঙ্কা কমার্স কলেজ" করা হইবে ও কলিকাতা বৌবাজার ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে সায়েন্স এসোসিয়েশন ছিল তাহা নূতন কলেজের জন্য ক্রয় করা হইয়াছে ও তথায় পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইবে। তথায় এ বৎসর হইতেই বি-কম্ পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই দানের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা উপকৃত হইবে।

প্রাচীন সহর খনন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের প্রত্নতাত্বিক খনন বিভাগ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রাচীন বানগড় খনন করিয়া বহু চিত্তাকর্ষক দ্রব্যের সন্ধান পাইয়াছেন, ঐ স্থানটিতে একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল—তথায় বহু মনোরম অট্টালিকা ও কূপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তথায় মৃৎশিল্পের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, সেরূপ ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। ২৪ পরগণ জেলার বারাসত-বসিরহাটের বেড়াচাপার নিকট চন্দ্রকেতু গড়ের খনন কার্য্য ও শীঘ্র আরম্ভ হইবে। অর্থসংগ্রহ হইলেই তথায় কাজ আরম্ভ করা হইবে। প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হইলে দেশ তাহার পূর্ব্বগৌরব সম্যক বুঝিতে সমর্থ হইবে।

বাংলার বেকার সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গে নব গঠিত মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে ৩৪টি পদে চাকরীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইলে ১৫ হাজার শিক্ষিত যুবক ঐ পদগুলির জন্য আবেদন করিয়াছিল। শুধু সেক্রেটারী পদের জন্য ১৫০খানা আবেদন পাওয়া গিয়াছে। এই আবেদনের সংখ্যা হইতে বাংলার বেকার সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। কেন আজ এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে সে বিষয়ে উপযুক্ত তদন্ত করিয়া এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কতদিনে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই চাকরী খোঁজার মনোভাব দূর হইবে, তাহাও বলা যায় না।

প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবী—

গত ২১শে জুলাই কলিকাতা ভারত সভা হলে শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ সম্মিলনের এক সাধারণ সভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমরেখা পরিবর্তন করিয়া সমগ্র মানভূম জেলা, সিংহভূম জেলার ধনভূম পরগণা, সাঁওতাল পরগণার জামতাড়া, দুমকা, পাকুড় ও রাজমহল, পূর্ণিয়া জেলার অংশ বিশেষ, সেরাইকেলা রাজ্য, গোয়ালপাড়া ও কাছাড় প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানানো হইয়াছে। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সর্বপ্রথম এ বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতেও এই দাবী জানাইয়াছেন। ঘোষ মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের সকল পৌর-প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড ও বিভিন্ন সংঘ সমিতির পক্ষ হইতে এই দাবী প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুকে জ্ঞাপন করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী সকলকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

নূতন গ্যাস তৈয়ারীর পরিকল্পনা—

কলিকাতা সহরের ময়লা হইতে গ্যাস তৈয়ারী করিয়া তাহা নানা কাজে ব্যবহারের জন্য এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এক কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম যে গ্যাস-তৈয়ারীর কারখানা হইবে, তাহাতে উৎপন্ন গ্যাসে শুধু সহরের আলো জ্বলিবে না—বাস ও মোটর ট্রাক চালানো হইবে—সেই গ্যাসের মূল্য পেট্রলের মূল্যের অর্দ্ধেক হইবে। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় উৎপন্ন গ্যাস দ্বারা কারখানার কাজ, গৃহস্থালীর কাজ ও সহরের পথের আলোর কাজ চলিবে। সে ব্যবস্থায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। তাহার দাম ও বর্ত্তমান গ্যাসের দামের অনেক কম হইবে। প্রথম ব্যবস্থা এক বৎসরে ও দ্বিতীয় ব্যবস্থা আড়াই বৎসরে সম্পূর্ণ হইবে। এই ভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের উন্নতি বিধান করিতে পারিলে দেশ সমৃদ্ধ হইবে।

শ্রীম স্মরণোৎসব—

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী 'রামকৃষ্ণকথামৃত' প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাধারণের নিকট 'শ্রীম' নামে খ্যাত ছিলেন। গত ২৯শে জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের উদ্যোগে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে 'শ্রীম' স্মরণোৎসব হইয়াছিল। ভারতের সংখ্যালঘু মন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন। সকলেই বলেন—কথামৃত লিখিত না হইলে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী এত অধিক প্রচার লাভ করিত না। মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কথা সকলে ভুলিতে বসিয়াছে—তাঁহার কথা স্মরণ করিবার সুযোগ দিয়া মহামণ্ডল সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

ময়ূরাক্ষী খাল উদ্বোধন—

গত ২৯শে জুলাই রবিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বীরভূম জেলার প্রধান সহর সিউড়ী হইতে ২ মাইল দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে তিলপাড়াঘাটে ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার খালসমূহের উদ্বোধন করেন। ১০১৩ ফিট দীর্ঘ বাঁধের ধারে ১৬০ মাইল দীর্ঘ ২টি প্রধান খালের উদ্বোধন করা হয়। ৫ মাইল প্রশস্ত স্থানে যে জল আটকাইয়া ছিল তাহা ২টি নূতন নদীর খাতে প্রবাহিত হয়। বাঁধের ১৫টি ফটক এক সঙ্গে খুলিয়া দেওয়ায় জল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—ফলে নূতন [illegible] বিঘা জমীতে সেচের ব্যবস্থা হইবে ও চাষের সুবিধা হইবে। স্বাধীন ভারতে নূতন পরিকল্পনা অনুসারে এই প্রথম কাজ সম্পাদিত হইল। দেশের বহু অধিবাসী ইহা দ্বারা উপকৃত হইবে। কাজেই ঐ দিনটি পশ্চিমবঙ্গে এক স্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে।

মেজর জেনারেল রুদ্র—

মেজর জেনারেল শ্রীঅজিত অনিলরুদ্র ভারতীয় সেনাবাহিনী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দিল্লীতে ভারতীয় ন্যাশানাল স্পোর্টস ক্লাবের সেক্রেটারী হইয়াছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় এবং হায়দ্রাবাদ অভিযানকালে অন্যতম সেনাপতিরূপে কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা দেশের জাতীয় খেলাধূলার উন্নতি বিধান হইলে দেশ উপকৃত হইবে।

পরলোকে কবি কায়কোবাদ—

পূর্ববঙ্গের বয়োবৃদ্ধ কবি কায়কোবাদ গত ২১শে জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁহার জন্ম হয়। তিনি 'মহাশ্মশান' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য গ্রন্থ লিখিয়া যৌবনেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন!

সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতি—

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য পরিস্থিত সঙ্কটজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে ৫লক্ষ ৭৫হাজার টন খাদ্য বরাদ্দ করিয়াছিলেন, তাহার মাত্র এক তৃতীয়াংশ সরবরাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত খাদ্যের মধ্যে ৩০হাজার টন চাউল দেওয়ার কথা ছিল—এ পর্য্যন্ত মাত্র ১০হাজার টন চাউল পাওয়া গিয়াছে। ফলে খাদ্য বরাদ্দ হইতে চাউলের পরিমাণ কমাইয়া সপ্তাহে মাত্র ১সের চাউল দেওয়া হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের লোক চাউল বেশী খায়—কাজেই অধিকাংশ লোক না খাইয়া আছে—যাহাদের অর্থ আছে তাহারা চোরাবাজারে সের প্রতি ১টাকা বা ততোধিক মূল্যে চাউল ক্রয় করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র চাউলের মণ ৪৫টাকা হইতে ৫০টাকা হইয়াছে। যে সব সরবরাহ করা হয়

তাহাও ভাল নহে। বর্ষার সময় বাংলায় উদরাময় রোগ বৃদ্ধি পায়, এ বৎসর চাউলের অভাবে তাহা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। অর্থাভাবে লোক দুধ, মাছ, ফল প্রভৃতি খাইতে পারে না...তাহার উপর চাউলের পরিমাণ কম, আটা ভাল নহে। এ অবস্থায় লোক কতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাই চিন্তার বিষয়।

নরসিং দাস পুরস্কার—

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯ সালের নরসিং দাস বাংলা পুরস্কারের এক হাজার টাকা ডাঃ সৈয়দ মরতুবা আলীকে প্রদান করিয়াছেন। ঐ পুরস্কারের জন্য যে সকল বাংলা পুস্তক দাখিল করা হইয়াছিল তন্মধ্যে ডাঃ আলির 'দেশে বিদেশে' নামক পুস্তকই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আমরা ডাঃ আলিকে তাঁহার এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

দেশরক্ষা ব্যবস্থা—

ভারত সরকার অসামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন এবং সেজন্য একটি পরিকল্পনা রচনার ভার শ্রীযুত এন-জি-মীরচাঁদনীর উপর অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীমীরচাঁদনি বর্তমানে কৃষি দপ্তরে কাজ করিতেছেন—তিনি গত বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশরক্ষা ব্যবস্থার সহিত যুক্ত ছিলেন ও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। নূতন অসামরিক সৈন্যদল গঠন করিয়া শীঘ্রই তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে। স্বাধীন দেশে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কব্যক্তির সামরিক কৌশল শিক্ষা করা প্রয়োজন।

কলিকাতার ট্রাম—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর গত ২৬শে জুলাই যে চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে আরও ২০ বৎসর অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোম্পানী ট্রাম চালাইবেন—কোম্পানীর কাজ রাষ্ট্র গ্রহণ করিবেন না। কোম্পানী প্রয়োজনীয় খরচ চালাইয়া শতকরা ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ বণ্টন করিবেন ও তাহার পর যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাইবেন। ১৯৭২ সালে ২ বৎসরের নোটিশ দিয়া ও কোম্পানীর বর্তমান মূল্য সাড়ে ৩৭ লক্ষ টাকা (যদি নূতন মূলধন যুক্ত হয় তাহাও প্রদান করিয়া) দিয়া সরকার ট্রাম ক্রয় করিবেন। এ ব্যবস্থার উদ্বৃত্ত হিসাবে সরকারের ভাগে কত টাকা আসিবে, তাহাই দেখিবার বিষয়।

আজাদ কাশ্মীর ও ভারত রাষ্ট্র—

বাগদাদের খ্যাতনামা সাংবাদিক ডাঃ আলহান আবদুল ওয়াহাব আনাসকারি ভারত ও পাকিস্থান ভ্রমণের পর দেশে ফিরিয়া গিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে আজাদ কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব নেতা সর্দ্দার ইব্রাহিম ভারত রাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইবার পক্ষপাতী। তিনি বলিয়াছেন যে তিনি সেখ আবদুল্লা ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সহিত একযোগে কাজ করিবেন—কারণ তাঁহার বিশ্বাস, ভারতের মুসলমানগণ সকল প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। এই সংবাদ বহু লোকের মন হইতে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবে।

ভারতে আমেরিকার গম—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে আগামী সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে আমেরিকা হইতে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ও আড়াই লক্ষ টন গম ভারতে প্রেরণ করা হইবে। এই গম ভারতবর্ষে আসিলে ভারতের খাদ্যাবস্থা অনেকটা ভাল হইতে পারে। কিন্তু যতদিন না ভারত খাদ্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে, ততদিন তাহার খাদ্য সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হওয়া সম্ভব হইবে না।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়—

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় সম্প্রতি আই-সি-এস চাকরি ছাড়িয়া দিয়া শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে ১লা আগষ্ট হইতে বিশ্বভারতীর নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক, বয়সেও তরুণ। মাত্র ২০ বৎসর সরকারী কাজ করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর সহিতও তিনি বহু দিন সংযুক্ত আছেন। সকলেই আশা করেন, তাঁহার দ্বারা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সুপরিচালিত হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—

কলিকাতার মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ ভ্রমণে

জন্য গত ৩০শে জুলাই বিমানে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। সকলেই জানেন উক্ত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সম্প্রতি কলিকাতা চৌরঙ্গীতে হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল কোম্পানীর সুবৃহৎ গৃহ ক্রয় করিয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবু শুধু ব্যবসায়ী নহেন, পরহিতব্রতী সমাজ-সেবক বলিয়াও সর্ব্বজনপ্রিয়। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার ভ্রমণের ফলে দেশ উপকৃত হইবে।

পরলোকে মার্শাল পেঁতা—

খ্যাতনামা ফরাসী বীর মার্শাল হেনরী ফিলিপ পেতা গত ২৩শে জুলাই নির্জ্জন দাই দ্বীপে ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার কাছে মাত্র তাঁহার স্ত্রী ও উকীল উপস্থিত ছিলেন।

ব্রহ্মবান্ধব স্মৃতি সমিতি—

সম্প্রতি মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের বাসভবনে মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের সভাপতিত্বে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব স্মৃতি সমিতির এক সভা হইয়াছিল। স্থির হইয়াছে যে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদিতে 'উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধবের জীবনী ও মতবাদ' সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করা হইবে। ব্রহ্মবান্ধব লিখিত 'সন্ধ্যা' ও 'কেশরী' পত্রিকা বা অন্য কোন পুস্তক বা পত্রিকা কেহ সংগ্রহ করিয়া দিলে তাহা পুনপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে। ব্রহ্মবান্ধবের জন্মস্থান হুগলী জেলার খন্যান গ্রামে একটি সংস্কৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কলিকাতা ১নং ময়রা ষ্ট্রীটে সমিতির কার্য্যালয় খোলা হইয়াছে ও শ্রীশ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমিতির সম্পাদক করা হইয়াছে। ব্রহ্মবান্ধবের ত্যাগ, সেবা ও দেশপ্রেমের কথা দেশ আলোচনা করিলে আবার দেশবাসী নবজীবন লাভ করিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন—

গত ৫ই শ্রাবণ কলিকাতায় ভারত সভা হলে ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ও ২৪ পরগণা জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সভাপতি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার তাৎপর্য্য বিবৃত করেন ও উদ্বোধক শ্রীযুক্ত ঘোষ শিক্ষকগণের আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণে সকলকে মনোযোগী হইতে উপদেশ দেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের সর্ব্বত্র অধিকতর আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র স্মৃতি রক্ষা—

অপরাজেয় কথাশিল্পী স্বর্গত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি ও প্রিন্সিপাল শ্রীক্ষেত্রপাল দাস ঘোষকে সম্পাদক করিয়া একটি কমিটী গঠিত হইয়াছিল। কমিটীর চেষ্টায় কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ বালীগঞ্জ ত্রিকোণ পার্কে (রাসবিহারী এভেনিউ) ১৬ কাঠা জমি কমিটীকে দান করিয়াছেন। তথায় ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঠাগার, মিউজিয়াম, বক্তৃতা হল প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইবে। সেজন্য কমিটী অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন। উপযুক্ত সভাপতি ও সম্পাদকের চেষ্টায় এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে।

হাওড়া মিউনিসিপালিটি—

কংগ্রেস দলের প্রার্থী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কর ও শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহকে ভোটে পরাজিত করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সংযুক্ত দলের প্রার্থী শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত ও শ্রীশঙ্করলাল মুখোপাধ্যায় হাওড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ২টি দলের সদস্য সংখ্যা ১৬ ও ১৪। নূতন কর্ম্মকর্ত্তাদের দ্বারা হাওড়াবাসীর তথা মিউনিসিপালিটীর উন্নতি সাধন সম্ভব হইলে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ—

গত ২০শে আষাঢ় কলিকাতা আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮১৬ সালের ৫ই জুলাই এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়—তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫০ ও হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ছিল

১০০—এখন ছাত্র সংখ্যা হইয়াছে এক হাজারের অধিক ও রোগীর সংখ্যা ৬০০। এখনও জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা পাইলে উহার আরও উন্নতি বিধান করা সম্ভব হইবে। মন্ত্রী মহাশয় তরুণ চিকিৎসকগণকে গ্রামাঞ্চলে যাইয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হইতে অনুরোধ করেন। গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধ করার ভার কতক পরিমাণে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

টালিগঞ্জে নূতন হাসপাতাল—

দক্ষিণ কলিকাতায় লেক হাসপাতাল উঠিয়া যাওয়ায় ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের যে অসুবিধা হইয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য টালীগঞ্জে ২০০ রোগী রাখার ব্যবস্থা সমেত বাঙ্গুর হাসপাতাল নামক একটি নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ৬ই জুলাই ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ঐ স্থানের ৮০ বৎসরের পুরাতন 'প্রিন্স গোলাম মহম্মদ হাসপাতাল'টি নূতন হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত হইবে—পুরাতন হাসপাতালের সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা জমা আছে। বাঙ্গুর পরিবার ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। নূতন হাসপাতালের বাড়ী নির্ম্মাণ খরচ হইবে ১২ লক্ষ টাকা। বাকী টাকাও সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে। দক্ষিণে যেমন এই 'ভাঙ্গুর হাসপাতাল'টির পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার ব্যবস্থা করা হইল, ডাঃ রায় উত্তরে তেমনি সাগর দত্ত হাসপাতালের পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন। সাগর দত্ত হাসপাতালের গৃহে এখনই ১৫০ রোগী রাখার ব্যবস্থা আছে—অর্থাভাবে তথায় রোগী রাখা সম্ভব হইতেছে না। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গত সাগরলাল দত্ত কামারহাটীতে ১০০ বিঘা জমীর বাগান ও ১৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়া ঐ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হাসপাতালের সঙ্গে একটি অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ শত ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে।

কলিকাতার নিকটস্থ জমী-সংস্কার—

কলিকাতা লাটপ্রাসাদ হইতে মাত্র ৮ মাইল দূরে অবস্থিত প্রায় ২শত বর্গমাইল স্থানে জলা জমিগুলির সংস্কারের জন্য ভারত সরকারের পুনর্গঠন বিভাগ শীঘ্রই ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ই-আই-রেলের ৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উন্নত করা হইবে—ঐ পরিকল্পনার নাম দেওয়া হইয়াছে—বাগজলা-ঘুঘী-যাত্রাগাছি পরিকল্পনা। ই-আই-রেলের দক্ষিণ বিভাগে ডায়মণ্ডহারবার লাইন ও পোর্ট ক্যানিং লাইনের মধ্যস্থ ১০০ বর্গমাইল স্থান ১০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উন্নত করা হইবে—ঐ পরিকল্পনার নাম—সোনারপুর-আরা-পাঁচমাতলা পরিকল্পনা। জল সরাইবার জন্য ২টি পাম্পিং ষ্টেশন করা হইবে—একটি যশোহর রোডের নিকট ও অপরটি পিয়ালী নদীর ধারে উত্তরভাগে। কলিকাতার এত কাছে এত অধিক জমী পতিত রহিয়াছে—সেগুলির সংস্কার হইলে বহু বেকার লোকের কাজের ব্যবস্থা হইবে। অধিক খাদ্য—বিশেষ করিয়া তরী-তরকারী, ফল প্রভৃতি উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হইবে। সত্বর যাহাতে এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়, সেজন্য সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি—

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ৭০ বৎসর বয়সে ১৮৯১ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৬০ বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় আজও আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাসম্মান প্রদর্শন করি না। তাঁহার কর্মজীবন এই কলিকাতাকেই কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয় এবং সেই কর্মের মধ্যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কর্ম শিক্ষা বিস্তার। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটন স্কুল কলেজের নাম সর্বজন পরিচিত এবং তাহার ছাত্র সংখ্যাও অগণিত। প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যু দিবস উপলক্ষে মেট্রপলিটান স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বাহির করে বটে কিন্তু ইহাই কি যথেষ্ট? বিদ্যাসাগরের ন্যায় একজন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা সংস্কারক, জ্ঞানী, পণ্ডিত এবং দাতার প্রতি আজও আমরা উদাসীন। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। আরো দুঃখের কথা, বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমানে কলিকাতার খ্যাতিমান নাগরিক, কিন্তু তাঁহারাও কেহ এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেন না। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটান কলেজের নাম বদলাইয়া আবদ্ধ

বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট রাখা হইয়াছে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ও কলেজ স্কোয়ারে ২টি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্তব্য শেষ করিয়াছি। স্বর্গতা অবলা বসু (আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী) বিধবাদের দরদী বিদ্যাসাগরের নামে বাণীভবন প্রতিষ্ঠা করিয়া বালবিধবাদের স্বাবলম্বী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত বিরাট কর্ম্মীর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা ইহাতে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। বিদ্যাসাগর বাংলা দেশের মহিলাদের উন্নতি বিধান আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্তমান বাঙ্গালী সমাজে মহিলাদের আর সম্মানজনক স্থান নাই···কাজেই তাঁহাদের আত্মনির্ভর করার জন্য বহুভাবে বহু প্রকার কার্য্য করা প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের এমন কোন পরিকল্পনা স্থির করা উচিত যাহা দ্বারা বাংলার মহিলাবৃন্দ সাধারণ শিক্ষা ও কর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিয়া আপন আপন জীবনযাত্রা নির্বাহে সমর্থ হন। বর্তমান ছাত্রসমাজের কাছে আমাদের নিবেদন, তাঁহারাই অগ্রণী হইয়া এই মহাপুরুষের স্মৃতিপূজার উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।

কলিকাতায় ইলিস মাছ—

পূর্বে যেমন গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় ইলিস মাছ আমদানী হইত, বর্তমান বৎসরে তেমনই লালগোলা হইতে প্রত্যহ প্রায় ১৫০ মণ ইলিস কলিকাতায় আসিতেছে—শীঘ্রই প্রত্যহ ৩৫০মণ ইলিস আসার সম্ভাবনা আছে। দেশ বিভাগের পর গোয়ালন্দের জালিয়ারা দেশ ছাড়িয়া মুর্শিদাবাদ লালগোলা অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতেছে—তাহারাই ঐ অঞ্চলে মাছ ধরিতেছে। গোয়ালন্দে মাছ ধরার লোক নাই—সেজন্য এলাহাবাদ পর্য্যন্ত গঙ্গানদীতে সর্বত্র প্রচুর ইলিস মাছ এবার পাওয়া যাইতেছে। উত্তর প্রদেশ হইতেও এবার প্রত্যহ কলিকাতায় প্রায় ১৫০মণ ইলিস মাছ আসিতেছে। মোট কথা কলিকাতায় ইলিস মাছ আসিলেই ভাল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের—বিশেষতঃ শিল্পাঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক লোক পূর্ববঙ্গ হইতে নূতন আসিয়াছেন—ইলিস মাছের অভাব তাঁহারাই অধিক অনুভব করিয়া থাকেন—সেজন্য এখানে প্রচুর ইলিসের চাহিদা আছে।

ভারতে চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি—

২রা আগষ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সী ঘোষণা করিয়াছেন যে গত বৎসর ভারতে মোট ৯লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল—এ বৎসর ১১লক্ষ ২৮ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এ বৎসরই চিনির উৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক। তন্মধ্যে ১০লক্ষ টন রেশনিং প্রথায় বিলি করা হইবে ও কলওয়ালারা ১লক্ষ টন খোলা বাজারে বিক্রয় করিবেন। বাজারে চিনি বিক্রয়ের অনুমতি পাইয়া চিনি কলের মালিকরা অধিক চিনি উৎপাদন করিয়াছেন—ফলে দেশে চিনির অভাব কমিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

বেলিয়াঘাটায় নূতন প্রতিষ্ঠান—

গত ২৮শে জুলাই বাংলার প্রদেশ-পাল কলিকাতা বেলিয়াঘাটায় বাহির সুরা লেনে একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছেন। তথায় ৭০টি উদ্বাস্তু বালিকাকে রাখিয়া বুনিয়াদি শিক্ষণ-শিক্ষা ও অন্যান্য কুটীর-শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে। সকল বালিকার বয়সই ১৩ বৎসরের অধিক। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও নোয়াখালি দাঙ্গার পর ঐ সকল বালিকাকে সংগ্রহ করিয়া নানাস্থানে পালন করা হইয়াছে। অনেক বালিকা পূর্বেই সুতাকাটা, তাঁত বোনা, সবজি-বাগান করা, মাদুর বোনা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছে। ডাঃ শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ নূতন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের কাজ করিবেন। বালিকাগণকে উপার্জনক্ষম করিয়া দেওয়াই নূতন প্রতিষ্ঠানের কার্য্য হইবে।

পাকিস্তানী সরকারের ব্যবস্থা—

যে সকল খ্যাতনামা ভারতীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গত ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ববঙ্গে কাঁচা পাটের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে ৮টি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে এ বৎসর পাটের নূতন মরসুমের জন্য পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট লাইসেন্স দেন নাই। সে সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক—বিরলা, সুরজমল নাগরমল, গোয়েঙ্কা প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা। তাহাদের গুদাম, বাড়ীঘর, পাটকল প্রভৃতি মিলিয়া কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি পাকিস্তানে আছে। গত ৩০শে জুন তাহাদের ব্যবসায়ের লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে তাহাদের আর নূতন লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই। ফলে তাহাদের কি পরিমাণ ক্ষতি হইবে তাহা বর্ণনার অতীত।

পশ্চিম বঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন—

১৯৫০ সালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম

বঙ্গে যে ২৭ লক্ষ উদ্বাস্তর আগমন হইয়াছে তন্মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক লোক আসিয়াছে ২৪ পরগণা জেলায়। তাহার পর উদ্বাস্তর সংখ্যা অধিক নদীয়া জেলায়। ২৪ পরগণা জেলায় ১০০৫৬৪ পরিবারে ৫৬৯৯৬৪ জন ও নদীয়া জেলায় ৯৯২১৩ পরিবারে ৪৯৯০৮৭ জন উদ্বাস্ত আসিয়াছে। কলিকাতা সহরে ৭৬০৭৮ পরিবারে ৪২২৩৪৩ জন উদ্বাস্ত আসিয়াছে। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত মোট ২১৪৩২২৮ উদ্বাস্ত আসিয়াছে পশ্চিম বঙ্গে। তাহার মধ্যে আশ্রয় শিবিরে অবস্থিত ১৫৮২৮৬ জন উদ্বাস্ত ধরা হয় নাই। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত উদ্বাস্তর সংখ্যা ছিল ১২০০৪৭৯ জন। এই সকল উদ্বাস্ত লইয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে বিব্রত হইতে হইয়াছে। বীরভূমে ১১৫২৪ জন, বাঁকুড়ায় ১২০৬০ জন, মেদিনীপুরে ২৩৪০৪ জন, হুগলীতে ৩৮৮৮৬ জন, হাওড়ায় ৮৬৭২৬ জন উদ্বাস্ত আসিয়াছে। কোন জেলাতেই এই সমস্তার অভাব নাই। এই সমস্তা শুধু সরকারের নহে, জনগণের। কাজেই উদ্বাস্ত সমস্তা সমাধানে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের জমীদারী উচ্ছেদ—

পূর্ববঙ্গে ১৭টি বড় বড় জমীদারী ও কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ অধীন জমীদারী পাকিস্তানী সরকার গ্রহণ করিয়াছেন—সে গুলি প্রায় হিন্দুদের ছিল। জমীদারীগুলির মোট বার্ষিক আয় কোটি টাকার অধিক। ১৭টির নাম—ভাগ্যকুল রাজ ষ্টেট, ঠাকুর রাজ ষ্টেট, নড়াইল ষ্টেট, মৈমনসিংহ মহারাজ ষ্টেট, গৌরীপুর ষ্টেট, রোশনাবাদ ষ্টেট, সরাইল ষ্টেট, ভুলুয়া ষ্টেট, নাটোর রাজ ষ্টেট, পুটিয়া ষ্টেট, মেদিনীপুর জমীদারী কোম্পানী, দিনাজপুর রাজ ষ্টেট, চাকলা রাজ ষ্টেট, কাসিমবাজার রাজ ষ্টেট, ডিমলা রাজ ষ্টেট, মুর্শিদাবাদ নবাব ষ্টেট ও মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ষ্টেট। ১৭টির মধ্যে ১৫টির মালিক ছিল হিন্দু—তাহারা সকলেই এখন পশ্চিম বঙ্গে। ফলে তাহাদের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মিলন—

গত ৪ঠা ও ৫ই আগষ্ট শনিবার ও রবিবার ২ দিন কলিকাতা ২৯, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের সভাপতিত্বে পশ্চিম বঙ্গের জেলা কংগ্রেস কমিটীগুলির সভাপতি ও সম্পাদকগণ এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণের সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে সকালে ও সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম-মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এবং দ্বিতীয় দিন সকালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব সম্মিলনে বক্তৃতা করেন। সভায় প্রত্যেক জেলার সমস্তার কথা পৃথকভাবে উত্থাপিত ও আলোচিত হয় এবং কি করিয়া জেলাগুলিতে কংগ্রেসের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, সে সম্বন্ধে সকলে পরামর্শ দান করেন। প্রায় সকল জেলার কংগ্রেস-নেতারা উপস্থিত ছিলেন এবং সকলে সাধারণ সমস্তাগুলি ছাড়াও জেলা-গত সমস্তাগুলি বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির সভায় বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। উদ্বাস্ত পুনর্বাসন সমস্তার সমাধানের জন্য বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্যস্থিত বাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি যাহাতে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেজন্য একটি প্রস্তাবে দাবী করা হইয়াছে। সন্ধ্যায় প্রাদেশিক নির্বাচন বোর্ডের সভায় স্থির হইয়াছে রাজ্য পরিষদের ১৩৮টি আসনের জন্যই কংগ্রেস হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইবে। দ্বিতীয় দিনে শ্রীযুত মহাতাব তাঁহার সুললিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাঙ্গালা বক্তৃতায় কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থার কথা ও এ অবস্থায় কংগ্রেস কর্ম্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই ভাবের সম্মিলন আহ্বান করিয়া কর্ম্মীদিগকে কর্ম্মপদ্ধতি বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করায় দেশে কংগ্রেসী মনোভাব প্রচারের সুবিধা হইবে।

ভারতীয় কয়লা রপ্তানী—

১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে জুলাই ৬ মাসে মোট ১১৯১২৮৯ টন ভারতীয় কয়লা জাহাজে করিয়া বিদেশে পাঠানো হইয়াছে। কলিকাতা বন্দর হইতে হংকং, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, কলম্বো, এডেন, ডুবোতি (পূর্ব আফ্রিকা), আলেকজান্দ্রিয়া (মিশর), করাচী, ত্রিপলি, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপানে কয়লা প্রেরিত হয়। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীতে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, চীন,

ডেনমার্ক, মিশর ও সুইডেন পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কয়লা লইত, এখন তাহারা ভারতের কয়লা লইতেছে। কয়লার ব্যবসা দ্বারা যদি ভারত বাহিরের অর্থ আনিতে পারে, তবে খাদ্যশস্য ক্রয়ের সুবিধা হইবে।

নাসিক কংগ্রেসের ব্যয়—

গত বৎসর নাসিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে ৫৬তম অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির আয় হইয়াছিল ৭১৯১৭৮ টাকা ও ব্যয় হইয়াছে—৬১৩১৫৮ টাকা। রিপোর্ট ছাপার জন্য ১৫ হাজার টাকা রাখিয়াও মোট ৯১০২০ টাকা কর্তৃপক্ষ লাভ করিয়াছেন। ঐ টাকা অবশ্যই কংগ্রেসের কার্য্যে ব্যয় করা হইবে।
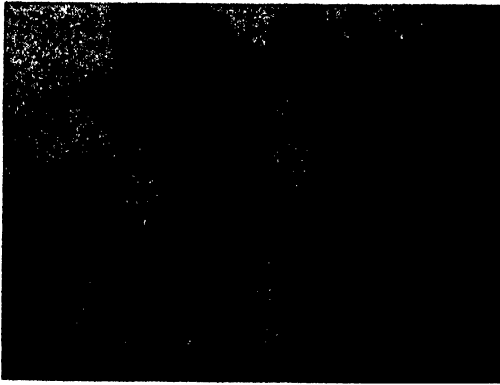
রাণী রাসমণির গৃহদেবতা ৺রঘুনাথ জিউর রৌপ্যরথ ও তৎদৌহিত্র বলরাম দাসের রৌপ্যরথ। রাণী রাসমণির রথ ১২৪৪ সালে এবং বলরাম দাসের রথ ১৩১৯ সালে নির্ম্মিত হয়

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল—

এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় শতকরা ৪২.৮ জন পরীক্ষার্থী পাশ করিয়াছে। মোট ৩৮১২১জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৪৩৫জন প্রথম বিভাগে, ৩১৪৭জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ১০৮৫৫জন তৃতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে।

'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য—

ভারত রাষ্ট্রের 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যসমূহে আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভাসহ বিধান সভা স্থাপিত হইবে। গ শ্রেণীতে হিমাচল প্রদেশ, বিন্ধ্য প্রদেশ, কুর্গ, আজমীর, দিল্লী ও ভূপাল—কয়টি রাজ্য আছে।

ভারত সরকার কর্তৃক চিত্র ক্রয়—

ভারত সরকার জাতীয় মিউজিয়ামের জন্য ১০ হাজার ৪শত টাকায় শ্রীনন্দলাল বসুর ৮খানা ছবি ও ৭ হাজার ৬শত টাকায় শ্রীযামিনী রায়ের ১৫খানি ছবি ও ২৩খানি স্কেচ ক্রয় করিয়াছেন। বাঙ্গালী শিল্পীদের এই সম্মানে সকলেই আনন্দিত হইবেন। ভারত সরকারের এই শিল্পানুরাগ প্রশংসনীয়।

শ্রীমতী অমিয়া দেবী—

সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী অমিয়া দেবী পিতার নিকট ১২ বৎসর সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরও মিষ্ট।

শ্রীঅমিয়া দেবী

সম্প্রতি বিষ্ণুপুর রামশঙ্কর প্রতিযোগিতাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ধ্রুপদ ও খেয়ালে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি বৃত্তি পাইয়াছেন। বিষ্ণুপুর "রামশরণ কলেজ" পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি 'গীত সরস্বতী' উপাধিও লাভ করিয়াছেন।

চাউলের মণ ৯৫ টাকা—

আসামের লক্ষীপুর জেলায় ঢুমঢুমা ও তালাপে চাউলের দাম বাড়িয়া ৯৫ টাকা মণ হইয়াছে—অথচ সরকার

নিয়ন্ত্রিত মূল্য ২৫ টাকা ৬ আনা মণ। পশ্চিমবঙ্গেও বহু স্থানে ৫০ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা চালু আছে বটে, কিন্তু সপ্তাহে মাত্র ১ সের চাউলে কাহারও কুলায় না—সে জন্য কালো-বাজারে কলিকাতায় ৪৫ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রীত হয়। এই কালো বাজারের চাউল যে কোথা হইতে আসে তাহা বলা কঠিন। অথচ নানা স্থান ঘুরিলে ৪৫ টাকা মণ দরে বহু পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করা যায়। এ ব্যবস্থা যে কেন বন্ধ হয় না, তাহা বুঝা কঠিন।
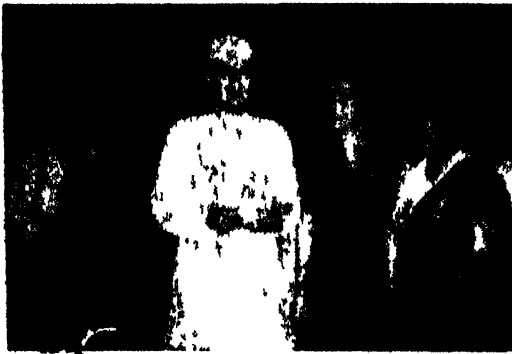
গার্ল গাইড্‌স্ আন্দোলনে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য শ্রীমতী মলিনা দত্ত 'শিলভার ফিস্' পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। চিত্রে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সাথে তাঁহাকে দেখা যাইতেছে

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ—

কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়া শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস মহাশয় সম্প্রতি আসাম হইতে দিল্লীতে গমন করিয়াছেন। তিনি শিলংয়ে অবস্থানকালে স্থানীয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উন্নতি বিধানের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন, অসমীয়া ও বাঙ্গলা সংস্কৃতির ভাবের আদান প্রদানে সাহায্য করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কমলা দাশও এ বিষয়ে দেবেশ বাবুকে উৎসাহিত করিতেন। পরিষদের নূতন গৃহনির্ম্মাণের সময় শ্রীযুক্তা কমলা ঘোষণা করিয়াছিলেন—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার শুধু বাঙ্গালা সাহিত্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না—সকল ভাষা ও সাহিত্যের মিলন-ক্ষেত্র হইবে। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা শিলংয়ে যে কাজ আরম্ভ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব স্থল হইবে। দিল্লীস্থ প্রবাসী বাঙ্গালীরা দেবেশ বাবুকে পাইয়া নূতন উৎসাহের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় উদ্বুদ্ধ হইবেন—ইহাই আমরা কামনা করি।

নীল গাই—

এই নীল গাই দুইটী বর্ত্তমানে রাজমহলে গোশালায় আছে। রাজমহাল হইতে ২৫।৩০ মাইল দূরের এক পর্ব্বতে
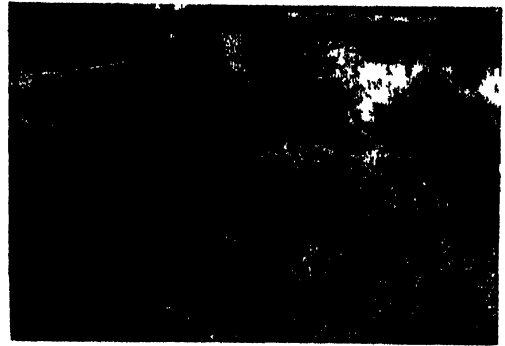
নীল গাই ফটো—শ্রীকামাখ্যা ভট্টাচার্য্য

এই নীল গরু দুইটী সাঁওতালেরা দেখিতে পায় এবং ধরে। উপস্থিত রাজমহলের গোশালায় অন্যান্য গরুর সহিত ইহাদের রাখা হইয়াছে। ইহাদের গায়ের বর্ণ নীল, মুখের ভাব হরিণের মত। পায়ের খুর গরুর মত, দেহটী ঘোড়ার মত, উচ্চতাও ঘোড়ার মত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসুস্থতার জন্য 'ঝারমণ্ডল' উপন্যাস এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না। আশা করা যায় আগামী সংখ্যা হইতে যথানিয়মে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল লীগ ঃ

১৯৫১ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগে মোহন-বাগান ক্লাব লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। ইতিপূর্ব্বে লীগ পেয়েছে ৩বার—১৯৩৯, ১৯৪৩-৪৪ সালে। এই নিয়ে চারবার লীগ পেল। লীগে রানার্স-আপ হয়েছে ১১বার—১৯১৬, ১৯২০, ১৯২১, ১৯২৫, ১৯২৯, ১৯৩৫, ১৯৪০, ১৯৪২, ১৯৪৬, ১৯৪৮ এবং ১৯৫০ সালে। মোহন-বাগানের বিশিষ্ট খেলোয়াড় সেণ্টার ফরওয়ার্ড বসিথ ই আই রেলদলের খেলায় সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী হ'ন। ওদিকে লেফ্ট-হাফ অভয় ঘোষ বি এন রেলের খেলায় আহত হয়ে বসে যান। এঁদের কেউই পরবর্ত্তী খেলায় যোগদান করতে পারেন নি; শীল্ডের খেলায় যোগদানের সম্ভাবনাও কম। নতুন খেলোয়াড় এ মুখার্জিকে সেণ্টার ফরওয়ার্ডে খেলিয়ে কোন সুবিধা হয়নি। মুখার্জিকে বসিয়ে নতুন খেলোয়াড় ধনবাহাদুরকে পরীক্ষা চলেছিল। অভয় ঘোষের জায়গায় দু'দিন ব্যাক টি পালকে পরীক্ষামূলকভাবে খেলানো হয়েছিলো কিন্তু তিনি অনভ্যস্ত স্থানে কোন সুবিধা করতে পারেননি; টি পাইনকে রাজস্থানের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলার দিন থেকে নামাতে হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল-জর্জ্জটেলিগ্রাফের খেলার দিনে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে যোগদান না করার অপরাধে লীগ সাবকমিটি ইষ্টবেঙ্গলের দু' পয়েণ্ট বাতিল ক'রেছেন, যেমন ইতিপূর্ব্বে মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল এবং ভবানীপুরের ২ পয়েণ্ট ক'রে বাতিল হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে এই সিদ্ধান্তের উপর আই এফ এ-র গভর্নিংবডির কাছে সুবিচারের আবেদন করা হয় কিন্তু ভোটাধিক্যে তাদের আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে।
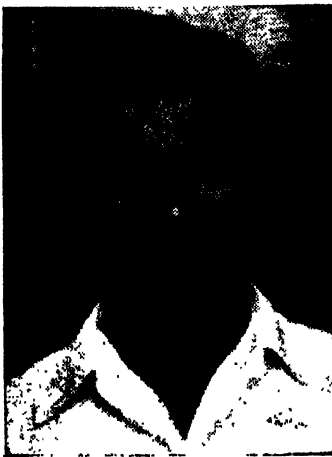
ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ পর্য্যন্ত লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে পাঁচবার—১৯৪২, ১৯৪৫-৪৬ এবং ১৯৪৯-৫০ সালে।

বাবু (মোহনবাগান)

শৈলেন মান্না (মোহনবাগান)

বসিথ (মোহনবাগান)

লীগে রানার্স-আপ হয়েছে সাতবার—১৯৩২-৩৩, ১৯৩৫, ১৯৩৭, ১৯৪১, ১৯৪৩ এবং ১৯৫১ সালে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, গত দু' বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ-শীল্ড জয়লাভের সম্মান অর্জ্জন করেছে। আলোচ্য বছর তারা স্থানীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপনের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের লীগের প্রথম খেলায় মোহনবাগান ৩-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে হারিয়ে লীগ তালিকায় আধিপত্য বিস্তার করে। অসুস্থ থাকার জন্য ইষ্টবেঙ্গল দলে সালে, চন্দন সিং এবং গোকুল নামেননি। সালের শূন্য স্থানে সামরিক দলের নামকরা খেলোয়াড় প্যাট্রিক খেলেন। বি এন আর দলের সঙ্গে ১-১ গোলে

অভয় ঘোষ (মোহনবাগান)

খেলা ড্র ক'রে মোহনবাগান একটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করে। যদিও গ্যারিসন দলে নতুন খেলোয়াড় এসে দলের শক্তি বৃদ্ধি করেছে তবু তাদের বিপক্ষে লীগের ফিরতি খেলায় মোহনবাগান মাত্র পেনাল্টি গোলে জয়লাভ করে। প্রথম খেলায় তারা ৪-০ গোলে জিতেছিল। ওদিকে নিম্নস্থান অধিকারী ডালহৌসীর সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে জয়ী হয়। এই খেলার ফলাফলে উভয় দলের সমর্থকেরা হতাশ হয়ে পড়েন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে মোহনবাগানকে লীগের ফিরতি খেলায় হারিয়ে দিয়ে দু' পয়েন্টের ব্যবধান কমিয়ে সমান খেলায় সমান পয়েন্ট ক'রে নেয়। এই খেলায় মোহনবাগানের সেণ্টার থাকায় যোগদান করেননি। উভয় পক্ষের গোলরক্ষক চঞ্চল ব্যানার্জি এবং এম ঘটকের খেলাই উল্লেখযোগ্য ছিল বলা চলে। ফিরতি খেলায় মোহনবাগান ৪-০ গোলে ই আই রেল দলকে হারিয়ে খেলায় দু'টি মূল্যবান পয়েন্ট পায় কিন্তু সেই সঙ্গে এ মরসুমের মত বসিথকে হারাতে হয়। দশজনে খেলে মোহনবাগান ৩টি গোল দেয়; প্রথম গোল করার পরই বসিথ যখন মাঠে আহত হয়ে পড়ে থাকেন তখন দ্বিতীয় গোলটি হয়। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ফিরতি খেলায় ইষ্টবেঙ্গল গোল শূন্য ড্র ক'রে লীগচ্যাম্পিয়ানসীপের পাল্লায় একধাপ পিছিয়ে যায়। লীগচ্যাম্পিয়ানসীপের পাল্লা থেকে ই আই আর অনেক দূরে পিছিয়ে পড়ে। বি এন আর সম্পর্কে অনেক কিছু আশা করা হয়েছিলো কিন্তু তারা

আবিদ (মহঃ স্পোর্টিং)

ফিরতি খেলায় ০-১ গোলে ক্যালকাটা গ্যারিসনদলের কাছে এবং ০-৬ গোলে রাজস্থান দলের কাছে শোচনীয় ভাবে হেরে গিয়ে সমর্থকদের হতাশ করেছে। পুলিশ মাঝে মাঝে শক্তিশালী দলকে বেশ বেগ দিয়েছে। আগামী বছর থেকে প্রাচীন এবং ফুটবল খেলার অন্যতম পথপ্রদর্শক ডালহৌসী দলকে দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে হবে। দ্বিতীয় বিভাগ থেকে ক্যালকাটা এবং ওয়াড়ীদলের মধ্যে একদল প্রথম বিভাগে উঠবে। ১৫টা খেলায় উভয়েরই ২৪ ক'রে পয়েন্ট উঠেছে। লীগচ্যাম্পিয়ানসীপ নির্দ্ধারণের জন্য উভয়কে পুনরায় খেলতে হবে। [শেষাংশ—২৬৮ পৃষ্ঠায়]

উগ্র সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ঃ

ইস্টবেঙ্গল-জর্জ্জটেলিগ্রাফের ফিরতি খেলা হয়নি,

খেলায় ইষ্টবেঙ্গল তাঁবুর সম্মুখে সত্যাগ্রহ হয়; সত্যাগ্রহীরা আই এফ এ এবং পুলিশকে উপলক্ষ্য ক'রে নানাবিধ রাজনৈতিক ধ্বনি করেন এবং ক্লাবকে খেলায় যোগদান না করার জন্য দাবী জানান। সত্যাগ্রহীরা রাস্তার উপর শুয়ে থাকায় ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ আই এফ এ-র সেক্রেটারী এবং পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করেন। সত্যাগ্রহীরা তাঁদের মেম্বারসীপ কার্ড দেখাতে অনিচ্ছুক থাকায় এবং খেলোয়াড়দের মাঠে যাওয়ার রাস্তা না দেওয়ায় পুলিশ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এদিকে ক্লাবের যে সব সভ্য খেলায় যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে সত্যাগ্রহীদের ইষ্টক নিক্ষেপ এবং হাতাহাতি আরম্ভ হয়। হাঙ্গামাকারীদের উপর পুলিশ লাঠিচালনা করে। আই এফ এ এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে যে বিরোধ চলেছিল তার অবসান ঘটে।

পূর্ব্বাপর বৎসরের মত এ বছরও ফুটবল মাঠে একশ্রেণীর দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। স্পোর্টিং ইউনিয়ন-ইস্টবেঙ্গলের খেলায় একশ্রেণীর দর্শক যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করেন তা কোন কারণেই উপেক্ষা করা যায় না। সংবাদপত্রে প্রকাশ, স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলোয়াড়দের উপর ক্যালকাটা মাঠের সাদা গ্যালারী থেকে থুথু পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করা হয়। ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকা নিরপেক্ষভাবে সংবাদ পরিবেশন রীতিনীতিতে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলাকে কেবল প্রাধান্যই দেয় না, একাধিক ক্ষেত্রে খেলা পরিচালনা ব্যাপারে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ নিয়ে মন্তব্য করেছে। সুতরাং

রবিদাস (ভবানীপুর)

পি বড়ুয়া (মোহনবাগান)

লতিফ (মহঃ স্পোর্টিং)

সংবাদপত্রে প্রকাশ, এই লাঠিচালনার ফলে ইস্টবেঙ্গল দলের কয়েকজন খেলোয়াড় আহত হ'ন। আই এফ এ-র সেক্রেটারী কর্তৃক আহূত সাংবাদিক সভায় সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দত্ত রায় বলেন, ঐ দিনের ঘটনা সম্পর্কে আই এফ এ এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে যে পত্রালাপ হয় তার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চিঠিতে পুলিশ কর্তৃক খেলোয়াড়দের আহত হওয়ার কোন অভিযোগের উল্লেখ ছিল না। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে খেলোয়াড়দের আহত হওয়ার কোন সংবাদ পাননি। ঐ দিনের ঘটনার জন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ আই এফ এ এবং দর্শকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আই এফ এ-র সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অপরাপর সময়ের মত আস্থা স্থাপন করায় এই নিয়ে ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ দিনের ঘটনার বিবরণ এবং মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ।

—"Before proceeding with description, it is necessary to report one of those unsavoury incidents in sport, unpleasant to witness and distasteful to relate."

'East Bengal's centre forward was carried off to return after a minute's attention, but a section of the crowd whose ire had already been aroused, took further exception to an improper tackle by B. Chowdhury for which he was promptly penalised. At this juncture, brickbats were thrown on the field, and the referee before proceeding with the freekick

appealed to the police to take control of the particular section of the crowd. The matter was taken in hand, and here a word of commendation is due to referee Ghosh for his judicious handling of the game.

After the game was over, spectators swarmed the field and attacked the Sporting union players."

"So as darkness fell, tempers cooled down, but while commending the players of both clubs for keeping their heads, the unsporting behaviour of East Bengal's supporters cannot be condoned. There was nothing seriously wrong with Dhanraj and he looked as right as rain at the end of the match."

Telegraphs player. Ahmed was also warned for dangerous tackling." (Statesman, May 30, 1951)

নিজের দলের খেলোয়াড়দের এরূপ আচরণ যদি দলের উগ্র সমর্থকদের কাছে উপেক্ষনীয় হয় তাহলে অপর দলের খেলোয়াড়দের দোষ ত্রুটিগুলির বিপক্ষে তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন সঙ্গত হয় কি? কোন দলের উগ্র সমর্থকই নিজ দলের খেলোয়াড়দের ত্রুটি এবং রেফারীর ভুলের জন্য দলের সুবিধা লাভের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন না।

খেলা পরিচালনায় এবং বিপক্ষের খেলা সম্পর্কে যদি কোন অভিযোগ থাকে তা'হলে মাঠে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ না ক'রে নিজ নিজ ক্লাব কর্তৃপক্ষদের উপরই সে সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ভার অর্পণ করাই উচিত।

রমন (রাজস্থান)

এস মেওয়ালাল (ই আই আর)

প্যাট্রিক (ইষ্টবেঙ্গল)

বিক্ষোভ প্রদর্শনের পূর্ব্বে প্রত্যেক দলের সমর্থকদের মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বিচার করা উচিত—তাঁদের দলের খেলোয়াড়রা অপর কোন খেলাতে অভদ্র আচরণ এবং ফাউল করেছেন কিনা অথবা রেফারীর ত্রুটির জন্য তাঁদের দল লাভবান হয়েছে কিনা। এরূপ নিরপেক্ষ বিচার ক'রে দেখলে অনেকখানি উত্তেজনার উপশম হবে। অন্যান্য বছরের কথা বাদ দিলাম, এ বছরই ঐ দিনের খেলার পরবর্ত্তী ইস্টবেঙ্গল-জর্জ্জ টেলিগ্রাফের খেলা সম্পর্কে Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ধরা যাক।

ক্লাবের স্বার্থরক্ষা ব্যাপারে উগ্র সমর্থকদের থেকে ক্লাব কর্তৃপক্ষের আগ্রহ এবং দায়িত্ব কম নয় বরং অনেক বেশী।

উগ্র সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যাপারে কোন ক্লাবকে দোষারোপ করা যায় না। কোন ক্লাব কর্তৃপক্ষই এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা সমর্থন করেন না। এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশে দলের সুনাম যথেষ্ট নষ্ট হয় এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষদেরও যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়।

সকল দলের উগ্র সমর্থকেরা ঘটনার গুরুত্ব বিচার ক'রে

তাঁর সীমানায় সংঘটিত ঘটনার উপর ভিত্তি ক'রে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদক পদত্যাগ করেন।

মোহনবাগান-মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলায় আহত বাবুর প্রতি রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এবং তার সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট না হয়ে একশ্রেণীর দর্শক যে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করেন আমরা তা কোন মতেই সমর্থন করি না। বি এন রেল দলের বিপক্ষে মোহনবাগানের সত্তার খেলার প্রথম দিকে যে গোল করেন তা রেফারীর ত্রুটিতে অফসাইড অজুহাতে অগ্রাহ্য হয়। এই ঘটনায় যেমন দলের সমর্থকরা রেফারীর সিদ্ধান্ত নির্বিবাদে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি সব সময়েই বাঞ্ছনীয়। মোহনবাগান-রাজস্থানের খেলায় লাইন্সম্যান রাজস্থানের

লিডসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেষ্টের পঞ্চম দিনে বৃষ্টির জন্য মাঠের অবস্থা অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত খেলাটি পরিত্যক্ত হয়েছে এবং খেলাটিকে ড্র হিসাবে ধরা হয়েছে। প্রথম টেষ্টে দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ী হয়। ২য় এবং ৩য় টেষ্টে ইংলণ্ড জয়ী হয়ে ২-১ ম্যাচে এগিয়ে আছে। এই খেলায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, (১) দক্ষিণ আফ্রিকা দলের এরিক রাওয়ান ২৩৬ রান ক'রে টেষ্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা দলের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড ক'রেছেন। রাওয়ান ৯ঘণ্টা ১৮ মিনিট ব্যাট করেন। বাউণ্ডারী করেন ২৮টা। ব্রাউনের বলে সজোরে কাট মারেন কিন্তু এলেক বেডসার মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে তাঁর বলে ক্যাচ ধরে রাওয়ানকে আউট করেন। (২) দক্ষিণ
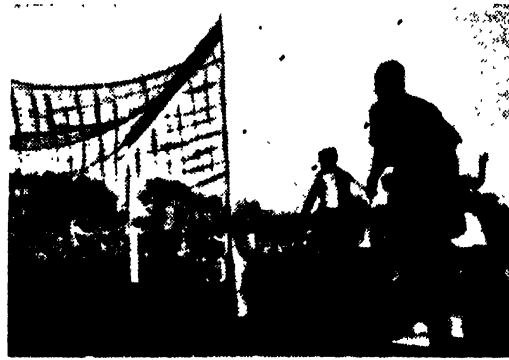
মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের প্রথম খেলায় গুহঠাকুরতা গোল দিয়েছেন।

দেওয়া গোল অফসাইড বিধানে অগ্রাহ্য করায় তাঁর উপর বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং কাদা নিক্ষেপ করা হয়। অন্যান্য বিভাগের খেলাতেও রেফারীর উপর বিক্ষোভ এবং হামলা হয়েছে।

চতুর্থ টেষ্ট খেলা ঃ

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ ৫৩৮ (উল্লেখযোগ্য রান এবং বোলিং : এরিক ২৩৬; ম্যানসেল ৯০; ভ্যানরেনিভেণ্ড ৮৩; ম্যাকনীল ৬৭ রান। ব্রাউন ১০১ রানে ৩, হিল্টন ১৭৬ রানে ৩ উইকেট পান) ও **৮৭** (রাওয়ান ৬০ নট আউট। কোন উইকেট না পড়ে)

ইংলণ্ড : ৫০৫ (মে ১৩৮; হাটন ১০০; বেলী ৯৫; লসন ৫৮ রান। রাওয়ান ১৭৪ রানে ৫ উইকেট; ম্যান ৯৬ রানে ৩ উইকেট)

আফ্রিকার প্রথম ইনিংসের ৫৩৮ রান যে কোন টেষ্ট খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে রেকর্ড রান হিসাবে গণ্য হয়েছে। (৩) এরিক রাওয়ান এবং ভ্যানরেনিভেণ্ড দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ১৯৮ রান ক'রে ইংলণ্ডের বিপক্ষে টেষ্ট খেলায় নিজ দলের পক্ষে রেকর্ড রান স্থাপন করেন। (৪) ভারতীয় সফরে এম-সি-সি দলের নির্ব্বাচিত খেলোয়াড় পিটার মে (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সারে) টেষ্টে প্রথম খেলতে নেমে ১৩৮ রান করেন। টেষ্টে প্রথম খেলতে নেমে এ পর্য্যন্ত ১১জন খেলোয়াড় ইংলণ্ডের পক্ষে সেঞ্চুরী করেছেন। শেষ সেঞ্চুরী ক'রেছিলেন পতৌদির নবাব ১৯৩২-৩৩ সালে। (৫) লেন হাটন ১০০ রান করায় প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁর ১০২টি সেঞ্চুরী করা হয়। এই খেলায় তাঁর ৯ রান উঠলে টেষ্ট খেলায় তাঁর ৫,০০০ হাজার পূর্ণ হয়। টেষ্ট খেলায় তাঁর মোট রান হয়েছে ৫০৯১।

সমস্ত পৃথিবীর টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত মাত্র এই চারজন খেলোয়াড় পাঁচ হাজার কিম্বা ততোধিক রান করার কৃতিত্ব লাভ করেছেন—ইংলণ্ডের পক্ষে রেজিনাল্ড ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, জ্যাক হবস, লেন হাটন এবং অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে মাত্র স্যর ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান। হাটনের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন জনের রানের হিসাব—

	টেষ্ট ম্যাচ	মোট	সেঞ্চুরী	এভারেজ
ব্র্যাডম্যান	৫২	৬৯৯৬	২৯	৯৯·৯৪
হ্যামণ্ড	৮৫	৭২৪৯	২২	৫৮·৪৫
হবস	৬১	৫৪১০	১৫	৫৬·৯৪

অরুণ দাশগুপ্ত (মোহনবাগান)

রুণু গুহঠাকুরতা (মোহনবাগান)

এস নন্দী (ই আই আর)

(৬) ইংলণ্ডের বোলার এলেক বেডসার চতুর্থ টেষ্টে ২টো উইকেট পেলে টেষ্ট ক্রিকেটে তাঁর ১৫৭টি উইকেট পাওয়া হয়। ইংলণ্ডের পক্ষে উইকেট পাওয়ার রেকর্ড ছিল এস বার্ণেসের ১৮৯টি এবং মরিস টাটের ১৫৫টি। মরিস টাটের থেকে বেডসার বেশী উইকেট পেলেন।

আই এফ এ শীল্ড ঃ

গত ১৩ই আগষ্ট থেকে আই এফ এ শীল্ড খেলা আরম্ভ হয়েছে। মোট ৪০টি দলের নাম প্রতিযোগিতায় তালিকাভুক্ত হয়েছে। বাইর থেকে এসেছে ১১টি দল। শীল্ডের নীচের দিকের অর্দ্ধাংশে আছে মোহনবাগান, ই আই (মহীশূর) প্রভৃতি নামকরা দল। উপরিভাগের অর্দ্ধাংশে ইস্টবেঙ্গল, রাজস্থান, এরিয়ান্স, এস এস সি বি (দিল্লী), মহারাষ্ট্র এফ এ, রাজপুতানা এফ এ প্রভৃতি নামকরা ক্লাব।

ভারতীয় টমাস কাপ দল ঃ

আন্তর্জ্জাতিক টমাস কাপ ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছেন—বোম্বাইয়ের দাভিন্দর মোহন (অধিনায়ক) এবং হেনরী ফেরেরা (সহঃ অধিনায়ক), দিল্লীর ত্রিলোকনাথ শেঠ, বাঙ্গলার মনোজ গুহ এবং গজানন হেমাডী। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, হেমাডীর পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া সফরে যাওয়া সম্ভব হবে না। ভারতীয় দল ফাইনাল খেলবে ১৯শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর।

মানকদের পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ ঃ

ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেট অল-রাউণ্ডার ভিন্নু মানকদ ভারতবর্ষে পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে যোগদানের যে আবেদন জানিয়েছিলেন ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড তার সাধারণ সভায় মানকদের আবেদন মঞ্জুর করেছে। পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে মানকদের যোগদান ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই প্রথম সুতরাং এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি দেশের ক্রিকেট মহলে যথেষ্ট

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের নির্ব্বাচন ঃ

নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ২২তম সাধারণ সভায় ১২-৭ ভোটে শ্রীযুক্ত কে সি মুখার্জি শ্রীযুক্ত এ এস ডিমেলোকে পরাজিত ক'রে বোর্ডের সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। বিগত ২২ বছর ভারতীয় ক্রিকেট মহলের সঙ্গে শ্রীযুক্ত ডিমেলো ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় ১৯২৯ সালে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড স্থাপিত হয়। ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি বোর্ডের সভাপতির আসন অধিকার ক'রে এসেছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট মহলে ডিমেলোর সুদীর্ঘকালের আধিপত্যের আজ অবসান হ'ল। তাঁর যেমন সংগঠন শক্তির পরিচয় পেয়েছি তেমনি পেয়েছি অন্যায় জেদের পরিচয় যার জন্য বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি পাতিয়ালা মহারাজার মত প্রভাবশালী ব্যক্তিকেও অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সভাপতির পদত্যাগ করতে হয়েছিল এবং অমরনাথের মত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সহযোগিতা থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দল বঞ্চিত হয়েছিল।

উইম্বলডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলস বিজয়িনী মিস ডরিস হার্ট

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোর্ডের সম্পাদকপদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন বাঙ্গলার শ্রীযুক্ত অমর ঘোষ। ১৩-৫ ভোটে মার্চেন্টকে হারিয়ে এম সি সি দলের বিপক্ষে ভারতীয় দলের অধিনায়ক পদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন বিজয় হাজারে। বোর্ডের সভায় ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডিমেলো কর্তৃক রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট খেলা স্থগিত রাখার প্রস্তাব বাতিল হয়। শ্রীযুক্ত ডিমেলোর পরিকল্পনায় গত বৎসরের রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী বরোদা দলের সঙ্গে এম সি সি দলের খেলা তালিকাভুক্ত করা হয়নি। বোর্ডের সভায় বরোদা দলের খেলা তালিকাভুক্ত করা হয়।

ওং পেং সুন ঃ

পৃথিবীর এক নম্বর ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ওং পেং সুন এবং তাঁর জুটি আবদুল্লা পিরুজ (মালয়) ক'লকাতায়
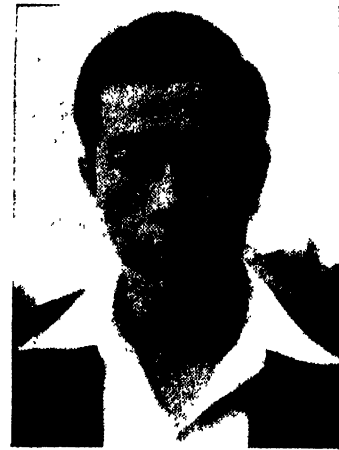
বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ান ওং পেংসুন

ন্যাশানাল ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী ব্যাডমিন্টন খেলায় যোগদান ক'রে জয়ী হয়েছেন।

ফুটবল লীগ খেলা ঃ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
মোহনবাগান	২৬	২০	৪	২*	৪৮	৫	৪৪
ইস্টবেঙ্গল	২৫	১৭	৪	৪†	৩৭	৭	৩৮

* বি এন রেল দলের বিপক্ষে খেলায় যোগদান না করায় ১টা হার।

† এরিয়াল এবং জর্জটেলিগ্রাফের বিপক্ষে খেলায় যোগদান না করায় ২টো হার।

মোহনবাগান ড্র করেছে পুলিস (১-১; গত বার ভুলক্রমে ডালহৌসি ছাপা হয়), ভবানীপুর (১-১), বি এন আর (১-১) এবং ১-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে লীগের ফিরতি খেলায় মোহনবাগানের রুণ গুহঠাকুরতা এবং বাবু মহমেডান দলের অবৈধ খেলার ফলে আহত হন। রুণুকে তিনবার মাঠ ছেড়ে যেতে হয়। বাবু দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৬ মিনিটে মাঠ ছেড়ে যান আর ফিরেননি। রুনু ভাল খেলছিলেন এবং তাঁর উপরই বেশী আক্রমণ চলে।

রেফারী মহমেডান দলের কোন কোন খেলোয়াড়কে কেবল সতর্ক ক'রে দেন। খেলা পরিচালনায় তাঁর দুর্ব্বলতা লক্ষ্য ক'রে মহমেডান দলের খেলোয়াড়রা মারমুখী হয়ে পেলে। প্রথম থেকেই খেলা পরিচালনায় কঠোর মনোভাব দেখালে মোহনবাগান দলের গুহঠাকুরতার উপর তিনবার আক্রমণ হ'ত না এবং বাবুকে গুরুতরভাবে আহত হয়ে মাঠ ছেড়ে যেতে হ'ত না। খেলার শেষ মুহূর্ত্তে সত্তার ও লতিফের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়, ফলে লতিফের আঘাত লাগে।

লীগের ফিরতি খেলায় এরিয়ান্স ১-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

ভারত সফরে এম সি সি দল :

আগামী ভারত সফরে এম সি সি ক্রিকেট দলের পক্ষে নিম্নলিখিত ১৬জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছেন। নাইগেল হাওয়ার্ড—অধিনায়ক; ডি ভি ব্রেনান; জ্যাক রবার্টসন; ফ্রাঙ্ক লসন; জ্যাক আইকিন; টম গ্রেভেনি, এলান ওয়াটকিন্স; এ ডাসটি রোডেস; রয় ট্যাটারসল; জে ব্রেন স্টাথাম; ফ্রেড রিজওয়ে; আর টি স্পুনার, ম্যালকম হিলটন; ডেরিক শ্যাকলটন; ডি বি কার এবং ডন কেনিয়ন।

খেলোয়াড়দের ছবি :

এই সংখ্যায় ফুটবল খেলোয়াড়দের ছবি তুলেছেন জে কে সান্যাল, গণেশ সিংহ, [illegible] বসু, মোনো মিত্র, এবং হিরন্ময় ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কালের মন্দিরা"—৩॥০
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সহসা"—২৸০,
জীবনী-গ্রন্থ "লেনিন"—১॥০
ডাঃ ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কি করা যাবে?" (১ম খণ্ড)—২॥০
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র-সম্পাদিত গল্প গ্রন্থ "প্রেমের ফাঁদ"—১৸০
শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "প্রিয়ার গোপন চিঠি"—১॥০
শ্রীশশধর দত্ত-সম্পাদিত উপন্যাস "নিষিদ্ধ দ্বীপে স্বপন"—২৲,
"বন্দী বেকার"—২৲, "সব্যজয়ী মোহন"—২৲,
"শঙ্করের নব জন্ম"—১৸০, "চীনের পুতুল"—২৸০
শৈলেশ বিশী প্রণীত "বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ন"—২৲
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "মেবার পতন" (১৬শ সং)—২৲
মন্মথ রায় প্রণীত নাটক "মীরকাশিম" (৪র্থ সং)—২॥০
শ্রীসুষমা মিত্র প্রণীত ভ্রমণ-[illegible] যাত্রী"—৩॥০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পল্লী-সমাজ" (২৫শ সং)—২॥০,
"অরক্ষণীয়া" (১৮শ সং)—১।০
শিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী-সম্পাদিত "বাংলা বর্ষলিপি" (১৩৫৮)—২৲
শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রণীত উপন্যাস "দ্বীপ ও দ্বীপান্তর"—৩॥০,
সন্দর্ভ "Man & Society"—১॥০
প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত উপন্যাস "অনাগত" (২য় সং)—২৲
শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত নাটক "মহাকবি"—২।০
শ্রীরতীশচন্দ্র দাস প্রণীত উপন্যাস "কল্পনার শাঁখ"—১।০
শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "আকৃতি"—১৲,
উপন্যাস "উচ্চাকাঙ্ক্ষা"—২৲
শ্রীহৃদয়রঞ্জন রায় প্রণীত স্বরলিপি "ভজনগীতিকা" (১ম)—১৷

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূজার ভারতবর্ষ :—শারদীয় পূজা উপলক্ষে আগামী আশ্বিন সংখ্যা "ভারতবর্ষ" ভাদ্রের তৃতীয় সপ্তাহে এবং কার্ত্তিক সংখ্যা আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ১০ই ভাদ্রের মধ্যে আশ্বিনের এবং ১লা আশ্বিনের মধ্যে কার্ত্তিকের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কপি না পাইলে বিজ্ঞাপন ছাপার অসুবিধা হইবে। **কর্ম্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ**

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ভেঙে গেছে মোর স্বপনের ঘোর
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার—

শিল্পী—শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
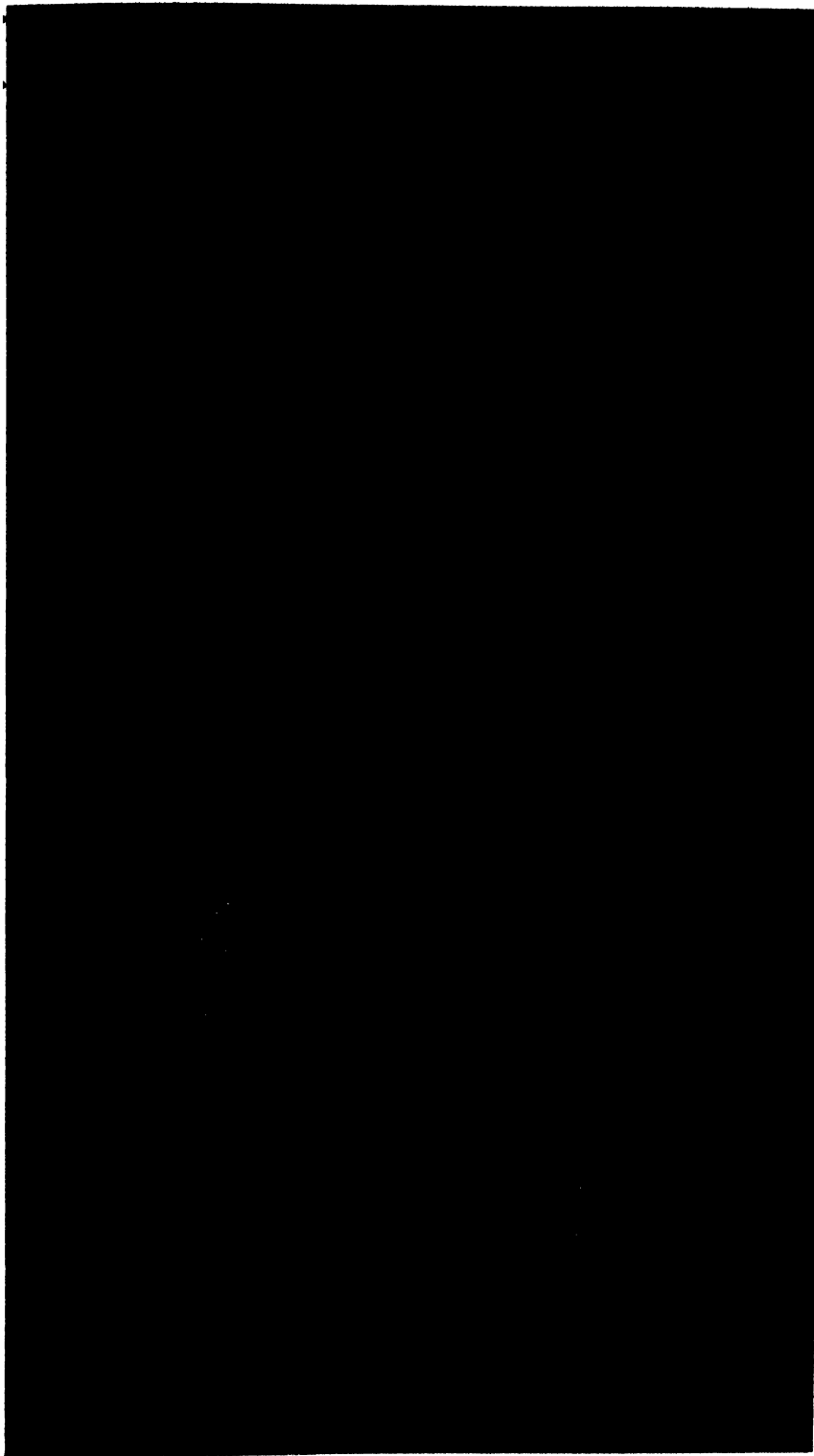
আশ্বিন—১৩৫৮

প্রথম খণ্ড | উনচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থা

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ এম. এ, পি. এচ-ডি, এফ. এন. আই

বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে অনেকেই চিন্তা করিতেছেন। এই উপলক্ষে কয়েকটি কথা আমি বলিতে ইচ্ছা করি। এই কথাগুলি কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নহে—শুধু কল্পনা মাত্র। ব্যবহারিক কার্যক্ষেত্রে হয়তো ইহার অনেক কথাই কল্পনা-বিলাস বলিয়াই মনে হইবে। তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে এই কল্পনার কিছু কিছু হয়তো বাস্তবতায় পরিণত হইতে পারিবে।

কলিকাতার লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই নগরীর সামাজিক জীবনে জটিলতা ও কঠোরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষা-উপলক্ষে যাহাদিগকে বাধ্য হইয়া এই নগরে বাস করিতে হয়, তাহাদের সংখ্যা অল্প নয়। ইহাদের ছাত্রজীবনের কঠোরতা যেন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

শিক্ষা-ব্যবস্থার ঊর্ধ্বস্তরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যায়তন (College) এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ও বকীর্ণ করিয়া দিতে পারিলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবিষয়ক, নৈতিক ও দৈহিক-উন্নতির পক্ষে সহায়তা করা হইবে।

কলিকাতার দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া হইতে সহস্র সহস্র ছাত্র ও ছাত্রীকে রক্ষা করিবার পক্ষে এবং ইহাদিগের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষে অন্য পথ নাই।

এজন্য আমার মনে হয়, বাংলাদেশে অন্তত পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। কলিকাতাতে তো আছেই। এতদ্ব্যতীত মেদিনীপুর, বোলপুর, * বহরমপুর ও জলপাইগুড়ি—এই চারটি স্থানে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা কর্তব্য। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করিবেন প্রদেশের স্থায়ী ও অস্থায়ী জনসাধারণ এবং তাহাদের প্রতিনিধিরা। বোলপুরের শান্তিনিকেতনকেই সম্প্রসারিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত ও পরিণত করা যাইতে পারে। জলপাই-গুড়ির চা-ম্যাগনেটগণের সহায়তালাভ কঠিন হইবে না। মেদিনীপুর ও বহরমপুরের অধিবাসীগণেরও উৎসাহ কম হইবার কথা নয়। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ই যে কলিকাতার মত প্রকাণ্ড হইবে, তাহা নাও হইতে পারে। কলিকাতার বাহিরে ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ই বাঞ্ছনীয়।

* বোলপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ভারতসরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল।

ইহাতে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শৃঙ্খলা-রক্ষা, নৈতিক ও মানসিক উন্নতির অনুকূল আবহাওয়া-সৃষ্টি প্রভৃতি সকল বিষয়েই সুবিধা হইবে। তা ছাড়া প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই যে প্রত্যেকটি বিষয়ে চূড়ান্ত অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহারও প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ অধ্যাপনা ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকিবে। পৃথিবীর সর্বত্র তাহাই হইয়া থাকে।

বাংলাদেশে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি হইবে না। সম্মানহানিরও কোন কারণ নাই। উত্তরপ্রদেশে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বিলাতে লণ্ডন ছাড়াও বোধহয় চাব্বিশটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যে ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, সে ঘরে আরো চারটি প্রদীপ জ্বালিলে কোনটিরই ক্ষতি বা অসম্মান হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা আরম্ভ করিতে হইলে প্রথমেই বিরাট বিরাট কড়ি বরগা বা কন্‌ক্রিটের স্তূপ একান্ত অপরিহার্য নয়। ভিত পাকা করিয়া উপরে খড় বা তালের খুঁটি ও অ্যাজবেস্টসের বা টালির ছাদ করিয়া গৃহ নির্মাণ করিলে, সেগুলি বাংলার অত্যুষ্টি সহিয়াও পঁচিশ ত্রিশ বৎসর অনায়াসে চলিতে পারে। ক্রমশ আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অট্টালিকাদি নির্মাণ কার্য অগ্রসর হইতে পারে। আমেরিকার স্কাই-স্ক্রেপারের স্বপ্ন বা মোহ হইতে আপাতত মনকে বিমুক্ত রাখিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরস্পর স্বাধীন হইবে। তবে তাহাদের পরীক্ষা, ডিপ্লোমা, ডিগ্রী প্রভৃতি বিষয়ে অনেকটা সামঞ্জস্য থাকিবে এবং পরস্পরের পরীক্ষা, উপাধি প্রভৃতি অনুমোদন ও গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

এই সকল নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেশি অভাব হইবে না। কোন কোন বিশেষ বিষয়ে হয়তো উপযুক্ত অধ্যাপক নিয়োগে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিবে। নচেৎ এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই বিভিন্ন বিভাগে এমন বহু কৃতী বিদ্বান্ প্রতিভাবান্ কর্মকুশল ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা যে কোন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। শুধু তাহাই নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন কেহ প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তারপর সেই বিষয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে যাঁহার যতই প্রতিভা বা বিদ্যাবত্তা থাকুক না কেন, গবেষণাদি দ্বারা যতই প্রসিদ্ধিলাভ করুন না কেন, তাঁহার উন্নতির বা বিকাশের পথ অনেক সংকীর্ণ হইয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা একাধিক হইলে, ইঁহারা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া নিজের এবং দেশের অধিকতর কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেখানে সব বিভাগে উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাব হয় নাই।

সম্পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কলিকাতায় সম্ভব নহে। তবে মফঃস্বলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ঢাকার মত অনেকাংশে আবাসিক হইতে পারে। এগুলিতে অভিভাবকগণের বাড়ীতে থাকিয়া অধ্যয়নের ব্যবস্থাও থাকিবে।

বাংলার সমস্ত উচ্চশিক্ষা, সমস্ত প্রতিভা, সমস্ত অর্থ, সমস্ত যৌবন একটি মাত্র সহরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা অত্যন্ত অপরিণামদর্শিতার কার্য, ইহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হওয়া উচিত নয়।

ভবিষ্যতে প্রতি জেলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব হইবে না। তবে সেই ভবিষ্যৎ কতদূরে, তাহা দেশবাসীর উদ্যম ও কৃতিত্বের উপর নির্ভর করিবে।

Teaching University প্রতিষ্ঠা আপাততঃ যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে Affiliating University প্রতিষ্ঠা করিতে কোনই অসুবিধা নাই। প্রতি Affiliating university-এর জন্য বার্ষিক দুই লক্ষ হইতে তিন লক্ষ টাকা হইলেই আপাতত যথেষ্ট হইবে। একটি দেওয়ান (Registrar), একটি পরিদর্শক (Inspector) এবং একটি পরীক্ষানিয়ামক (Controller of Examination) এর কার্যালয় (office) চালাইতে পরীক্ষার ফির সহিত উক্ত টাকাই যথেষ্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রায় ষাট বৎসর যাবৎ শুধু affiliating University ছিল। বর্তমানেও উৎকল, আসাম প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র affiliating University আছে।

একটি Affiliating University প্রতিষ্ঠিত হইলেই, তদন্তর্গত কলেজগুলির আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইবে—ক্রমশ এগুলি উন্নত ও উন্নততর হইবে। ইহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে। বিদ্যায়তনের (কলেজের) সংখ্যা বাড়িলেই বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িবে। নিম্নতর পাঠশালাগুলির সংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে।

Affiliating University প্রতিষ্ঠিত হইলে তত্তদঞ্চলের ছাত্রদের কলিকাতা অভিমুখের আকর্ষণ অনেক কমিয়া যাইবে, কলিকাতায় অস্বাভাবিক জনবাহুল্য ও ছাত্রবাহুল্য কমিয়া যাইবে। কলিকাতার অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় ছাত্রদের যে শারীরিক ও নৈতিক ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইতে রক্ষা করিবার একটি দ্রুততম উপায়—অনেকগুলি Affiliating University প্রতিষ্ঠা করা। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষাদির মানের সামঞ্জস্য থাকিলে কাহারই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে আপত্তি হইবে না।

বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যধিকসংখ্যক পরীক্ষার্থীর একত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকায় ছাত্র, শিক্ষক, পরীক্ষক, টেবুলেটর, প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষা-নিয়ামক প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির উপরেই যে সাংঘাতিক শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক চাপ পড়ে, তাহা প্রকৃত শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে অনুকূল নহে। অনেকগুলি Affiliating University প্রতিষ্ঠা করিয়া পরীক্ষাদির কার্যকে বহুধা বিভক্ত করিয়া দেওয়া অবিলম্বে বাঞ্ছনীয়।

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত Statutory grant থাকিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয় ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে।

যে সকল স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে, সাধারণত শুধু সেই সকল স্থানেই সম্মান-উপাধির জন্য (Honours Course) শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

কলিকাতায় দশটির বেশি বিদ্যায়তনে (College) সম্মান-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রের জন্য সম্মান-শিক্ষার ব্যবস্থা সকলদিক হইতেই অনিষ্টকর। সম্মান-শিক্ষার উপযোগী অধ্যাপক-নিয়োগ ব্যয়সাপেক্ষ। একটি বা দুইটি ছাত্রের জন্য এই ব্যয় সমীচীন নহে। আবার উপযুক্ত অধ্যাপক না থাকিলে সম্মানশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টায় শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই প্রতি অবিচার করা হয়। উপযুক্ত ছাত্রকে, প্রয়োজন হইলে বিশেষ বৃত্তি দিয়া, যেখানে সম্মান শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে, তথায় পাঠানর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মফঃস্বল বিদ্যায়তনে সাধারণত সম্মান শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না। একটি ছাত্রের জন্য দুই হাজার টাকা বেতনের তিন চারিজন অধ্যাপক নিয়োগ না করিয়া ছাত্রটিকে একশত টাকা বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়াই সমীচীন।

পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। যাহাতে একত্র অত্যধিক সংখ্যক ছাত্রের পরীক্ষা না লইতে হয়, তাহার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে পরীক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব হইবে না। যেমন এক হাজার ছাত্রকে একত্র পড়ান বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি এক হাজার ছাত্রের পরীক্ষাও একস্থানে বসিয়া গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

পরীক্ষায় দুর্নীতি সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা কোন সভ্যসমাজের পক্ষে শোভনীয় নহে। এ বিষয়ে দুইটি কর্তব্য আছে। প্রথমত একত্র অত্যধিকসংখ্যক ছাত্রের পরীক্ষার ব্যবস্থা না করা। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষা-বিষয়ক দুর্নীতি সম্পর্কে জনমতের পরিবর্তন সাধন। একটি পেনসিল বা একটি পয়সা চুরি করিলে, এই কাজটিকে সমাজ যে চোখে দেখে, পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন করাটাকে সমাজ সে চোখে দেখে না। আমরা সকলেই জানি, অনেক জ্ঞানী প্রবীণ ব্যক্তি ছাত্রদিগকে পরীক্ষার সময়ে এবং পরীক্ষার পরে অসদুপায় অবলম্বনে সহায়তা করিয়া থাকেন। দুর্নীতিকে যতক্ষণ দুর্নীতি বলিয়া আমরা মনে মনে স্বীকার না করিতেছি, ততক্ষণ শুধু লোক দেখান আপত্তি জানাইয়া কোন লাভ হইবে না।

পরীক্ষাবিষয়ক দুর্নীতি নিবারণ করিতে হইলে, সমাজের কল্যাণকর জনমত গঠন করিতে হইলে, শিক্ষা ও পরীক্ষা বিষয়ক সকলপ্রকার দায়িত্বই পবিত্র নৈতিক আদর্শে সম্পন্ন করিতে হইবে।

প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জনসাধারণকে এবং তাহাদের প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ও গবেষণাদির জন্য বৎসরে আনুমানিক এক কোটি টাকা ব্যয় করা কর্তব্য। কলিকাতায় ষাট লক্ষ এবং অন্য চারটি বিশ্ববিদ্যালের প্রত্যেককে দশ লক্ষ টাকা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে এই অঙ্কগুলি অবশ্য আরো বাড়াইতে হইবে।

দেশের শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহাই যে অন্য সর্বপ্রকার ব্যয় অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ (investment) এই কথা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যে কোন পরিবারের একটি সুশিক্ষিত সন্তান যেমন সেই পরিবারের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি, তেমনি দেশের সুশিক্ষিত সন্তানেরাই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পত্তি। মানুষ হইলে মানুষ সবই করিতে পারে। শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের অভাব ঘটিলে অন্য কোন প্রকার সম্পদই পারিবারিক বা সামাজিক কল্যাণসাধন করিতে পারে না। দেশের জনসাধারণকে এবং তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণকে একথা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

আই এ ও আই এস সি পরীক্ষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিতে হইবে। আমি যতদূর জানি বিলাতে লণ্ডন ব্যতীত আর কোথাও আই এ ও আই-এস সি পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন লণ্ডনের নিয়মাবলীর আদর্শেই ইহার নিয়মাবলী রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য আই-এ ও আই এস সি পরীক্ষাও এখানে প্রচলিত হইয়াছে। নূতন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনেক স্থলেই এই পরীক্ষা নাই।

বি এ ও বি এস সি অধ্যয়ন পূর্ণ তিন বৎসরে সমাপ্ত হইবে। সম্মান ও সাধারণ, উভয় প্রকার উপাধিই বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আসিবার পরে তিন বৎসরে সমাপ্ত করিতে হইবে। বর্তমানে যে চার বৎসর ব্যয়িত হয়, তাহার মধ্যে পরীক্ষাদির সময় বাদ দিলে তিন বৎসরের সামান্য বেশি সময় প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপনার জন্য ব্যয়িত হয়। তাহা বাংলা মাধ্যম প্রবর্তিত হইলেই প্রত্যেক বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সহজতর হইবে এবং এখন যাহা চার বৎসরে অধীত হইতেছে, তাহা অতি সহজেই তিন বৎসরে অধীত হইতে পারিবে। ম্যাট্রিকুলেশন ও বি এর মধ্যে একটি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার কোনই প্রয়োজন নাই।

সাধারণ শিক্ষার বিদ্যায়তন (College) এক প্রকারই হইবে। এখানে বি এ ও বি এস সি পড়ান হইবে। বর্তমান Second Grade কলেজ যাহা আছে, তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না।

সরকারী বিদ্যায়তনগুলিতে শাসন ও আর্থিক ব্যাপারে বর্তমান নীতিই চলিতে পারে। যতদিন পর্যন্ত অন্যান্য সাধারণ বিদ্যায়তনগুলির শাসন, অধ্যাপনা প্রভৃতির উন্নতি না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিকে বর্তমান স্বতন্ত্র ব্যবস্থার অধীনে রাখিতে হইবে।

প্রত্যেক বেসরকারী বিদ্যায়তনকে সরকার উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিবেন। যাহাকে সরকারী অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় না, এমন কোন বিদ্যালয় বা বিদ্যায়তন থাকিবে না।

শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন এবং শিক্ষাদান প্রণালী এমন হইবে, যাহাতে ছাত্রগণ শুধু পল্লবগ্রাহী না হইয়া প্রত্যেক পঠনীয় বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এজন্য প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্য পঞ্জীর (syllabus) সংকোচসাধন হয়তো আবশ্যক হইবে। যেমন তেমন করিয়া পাঁচ শত পৃষ্ঠা গলাধঃকরণ অপেক্ষা ভাল করিয়া দুই শত পৃষ্ঠা আয়ত্ত করা সমধিক প্রয়োজনীয়।

প্রত্যেক বিদ্যায়তনে (College) প্রত্যেক বিষয়ে একজন প্রধান অধ্যাপক থাকিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসামান্য পারদর্শিতা এবং গবেষণায় কৃতিত্ব না থাকিলে কেহ প্রধান অধ্যাপক হইতে পারিবেন না। ইঁহার বেতন হইবে আনুমানিক ৮০০্ হইতে ১২০০্ টাকা।

অন্যান্য অধ্যাপকগণের বেতন হইবে ৩৫০৲ হইতে ৮০০৲ টাকা। সরকারী বিদ্যায়তনে বর্ত্তমানে S.E.S. নামক যে পদ আছে, তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না। বর্ত্তমানে S.E.S. এবং B.E.S.—এ শিক্ষক নিয়োগ হয়। তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই যোগ্যতায় উভয়েই প্রায় সমকক্ষ। অথচ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক একটি নিয়ম সৃষ্টি করিয়া S.E.S. ও B.E.S. এর পার্থক্য করা হইয়াছে। এই দুই প্রকার পদের কোন আবশ্যকতা নাই। বর্ত্তমানে মুদ্রার যে মূল্য, তাহার পরিবর্ত্তন শীঘ্র হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং উপরে যে আনুমানিক বেতনের উল্লেখ করা গেল, তাহা অত্যধিক বিবেচিত হইবার কারণ নাই। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বিদ্যায়তনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া পরিবারবর্গের জন্য সাধারণ মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থার সামর্থ্য নিশ্চয়ই দাবী করিতে পারে।

প্রদর্শক (Demonstrator) ও সহকারী (Assistant) শিক্ষকগণের বেতন হইবে ১৫০৲ হইতে ৪০০৲ টাকা।

অধ্যাপকগণ সপ্তাহে ১৬ ঘণ্টা পড়াইবেন। যাঁহাদের ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হয়, তাঁহাদিগকে সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে।

বেসরকারী বিদ্যায়তনগুলির পরিচালনার ভার থাকিবে একটি শাসন-সংসদের উপর। এই সংসদে কৃতবিদ্য পদস্থ ব্যক্তিরা থাকিবেন।

পাঠ্যনির্বাচন, পরীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব থাকিবে। আভ্যন্তরীণ পরিচালনা কার্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব থাকিবে না।

বিদ্যায়তনের কৃতী ও যশস্বী অধ্যাপকগণ বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করিবার অধিকার পাইবেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা উপযুক্ত বৃত্তি বা অতিরিক্ত বেতন পাইবেন।

বিদ্যায়তনের ছাত্রদের বেতন মাসিক ১২ টাকার ন্যূন হইবে না। ইহা বর্ত্তমান হার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইলেও মোটের উপর অধিক হইবে না। কারণ বর্ত্তমানে আদ্য (Matric) পরীক্ষার পর বি. এ. পর্য্যন্ত চার বৎসরের বেতন দিতে হয়। তৎপরিবর্ত্তে শুধু বি. এ. বা বি. এস্-সি. এর জন্য তিন বৎসরের বেতন দিতে হইবে।

দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণের জন্য বহুসংখ্যক বৃত্তি ও বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্নাতকোত্তর শিক্ষা (post-graduate teaching) এবং বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যকরী শিক্ষা, যেমন, চিকিৎসা, স্থাপত্য, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকিবে।

এইগুলির পরিচালনার ভার এবং আভ্যন্তরীণ কার্য তত্ত্বাবধানের ভার থাকিবে এক একটি স্বাধীন শাসন-সংসদের উপর। পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা, প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা থাকিবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অর্থসাহায্য দিবেন, তাহার মধ্যে কোন অংশ কোন প্রতিষ্ঠান পাইবে, তাহা পূর্ব হইতেই সরকার স্থির করিয়া দিবেন।

যদি কোন ব্যবহারিক শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান (technical institution) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকিতে না চায়, তাহা হইলে তাহাকে স্বাধীনভাবে পরিচালনার ক্ষমতা দিতে হইবে এবং সরকার হইতে সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়বহির্ভূত এই সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য বার্ষিক আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিলে ভাল হয়।

বিদ্যায়তনের ছাত্রগণের জন্য যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য সেনাবিভাগের সহিত সহযোগিতা আবশ্যক।

শিক্ষার মাধ্যমরূপে অবিলম্বে বাংলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা, সমস্তই বাংলাভাষার মাধ্যমে অবিলম্বে আরম্ভ করিতে হইবে।

আদ্য (matric) স্তর পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বাংলা পরিভাষা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ইতিপূর্বেই সংকলিত হইয়াছে; এই কার্য্য এখন পুনরায় আরম্ভ করিয়া এম. এ. ও এম. এস্-সি. পর্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে।

অবিলম্বে বিভিন্ন বিষয়ে এক একটি মণ্ডলী গঠিত করিয়া এই কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। এজন্য সরকারকে অর্থব্যয় করিবার জন্য সম্মত হইতে হইবে।

অনেকগুলি বিশিষ্ট অর্থবাচক ব্যবহারিক শব্দ (technical words) শুধু বাংলা অক্ষরে লিখিলেই চলিতে পারে। বহু মনীষী এই মত পোষণ করেন।

যতদিন পূর্ণাঙ্গ পারিভাষিক সংকলনগ্রন্থ রচিত না হইতেছে, ততদিন ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কেই পারিভাষিক শব্দগুলির ব্যবহারে অনেকটা স্বাধীনতা দিতে হইবে। ইহাতে ইংরাজি ও বাংলার মিশ্রণে ভাষার কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা হানি হইলেও ভবিষ্যতের কার্য্য অনেকখানি অগ্রসর হইয়া যাইবে। ক্রমশঃ

ছায়ানট

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

চৌরঙ্গীতে নিয়ন্ লাইটগুলো জ্বলতে নিভতে সুরু করেছে। প্রকৃতির দেওয়া নিখরচায় পাওয়া নিভন্ত আলোর একটু বঙ্কিম কটাক্ষ তখনও সদ্য-জ্বলা আকাশের স্বচ্ছতায় রক্তিম হয়ে এদিকে ওদিকে লেগে। মনে হচ্ছে দূরদিগন্তের মাঝখানে ক্রমবর্দ্ধমান তমসার কোলে দাঁড়িয়ে এক মহান্ত পুরুষ—ক্লান্ত স্তব্ধ, একাকী। হারিয়ে গেছে তাঁর সকাল-বেলার আদিত্যবর্ণ হিরণ্ময়দ্যুতি, প্রাণের পাবন শিখা, নিভে গেছে তাঁর মধ্যাহ্নের দীপ্ত তেজ, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অপরাহ্নের শান্ত দিনান্তের শেষ মাধুর্য্যের রেশ। শুধু ছায়ার মায়ায় আলো আঁধারের মাঝে ফুটে উঠেছে অস্পষ্ট এক নটরূপ ম্লান হয়ে মরণোন্মুখ দিনের চিতায়।

সুমন্ত্র ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল, সেখান থেকে যাবার কথা গড়পার—খেলাটা হঠাৎ কিসের গোলমালে শেষ পর্য্যন্ত এগুলো না। মাঠের মধ্য দিয়ে সেই কথাটারই প্রবল আলাপ শুনতে শুনতে সে ভিড় ঠেলে আসছিল। যারা আসর জমাচ্ছিল তারা সকলেই প্রায় সেই বয়সের —যখন ভবিষ্যতের নয়া জল্পনায় কল্পনা হয় মুখর ও উদ্দাম, জীবন ও জীবিকা যখন এক হয়ে যায় না। শ্রেণীহীন সমাজ, শোষণহীন ব্যবস্থা, অর্থ, আভিজাত্য, প্রেম, ভালবাসা, দাবীদাওয়া, আর্ট, পলিটিক্স, মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল, নানা কথার মারপ্যাচ নানা ইজমের দোহাই সবই নতুন খোলা উগ্র মদের বোতল থেকে বেরিয়ে আসা ফেণার মত তাদের কথায় কথায় উপচে উঠছিল।

আকাশের বর্ণসমারোহের সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাগুলো শুনতে সুমন্ত্রর ভারী ভালো লাগছিল। সজীব মনের পরিচয় কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। নিজে সে শিল্পী, বি-এ পাশ করে আর্ট স্কুলে ঢুকেছে ক'বছর। ফ্যাশনের খাতিরে সে আর্ট চর্চ্চা করে না, পারিবারিক স্বাচ্ছল্য তার নেই, তবু সে এই পথে গেছে ভেতরের প্রাণপ্রোজ্জ্বল এক প্রেরণায়। অবশ্য তাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় প্রবীণবাবুর আর্ট কলেকশনই তাকে প্রথম উৎসাহ উদ্দীপনা দেয়। ছবিগুলোর সামনে দাঁড়ালে সে যেন ভুলে যেতো নিজেকে। আবার যখন মালিনী এসে জিজ্ঞাসা করতো—আচ্ছা "উমার তপস্যা" এই ছবিটা আপনার কি রকম লাগে—তখন সে যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়তো। মালিনীও আঁকতে শেখা সুরু করেছে। প্রবীণবাবুই উৎসাহদাতা। আরো আশ্চর্য হয়ে যেতো যে মালিনীর বয়স তার চেয়েও কম, আর প্রবীণবাবু ত বাজ-পড়া বনস্পতিরই সামিল, বয়সের গাছপাথর নেই।

—কিরে সুমন্ত্র, চলেছিস্ কোথায়—

হঠাৎ রণেশকে দেখা যায় ভিড়ের মধ্যে। তার কলেজের বন্ধু এখন সুপুষ্ট এটর্ণীর শিক্ষানবিশী করে থাকে রাসবিহারী এ্যাভিনিউএ, নূতন মত ও পথের আধুনিক রুচিসম্মত যুগদেবতা যেখানে প্রগতির সীমা নির্দ্ধারণ করেছেন বলে জনশ্রুতি। আর সুমন্ত্র থাকে শ্যামবাজারের ছোট্ট গলিতে, অতীতের কলকাকলীতে ভরা পোড়ো বাড়ীতে—যার দালানে বারান্দায় ঘরে পায়রাদের বকবকমের সঙ্গে লেগে রয়েছে পিতৃপিতামহদের পদধূলি। চোখ বুজলেই দেখতে পায় সে—বিবর্ণ দেওয়াল বেয়ে বসুধারার পঞ্চটি ধারা—তার পিতার বিবাহের আয়ু বৃদ্ধ্যন্নের স্মারকচিহ্ন, আয়ুবৃদ্ধি বংশবৃদ্ধি হয়েছিল, অন্ন বৃদ্ধি হয়নি। এককালে সুজলা সুফলা বাংলা দেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম থেকে শতাব্দীর আড়াআড়ি এদের পূর্ব্বপুরুষরা কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন। সুমন্ত্রর 'পিতৃপিতামহের যেদিন বীরভূমের মল্লভূমি থেকে কলকাতায় এসে মারাহাট্টাডিচের কাছে নহবৎখানা সমেত সিংহ-দরওয়াজাওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ী ফেঁদেছিলেন, সেদিন ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ—জব চার্ণকের ভবিষ্যদ্বাণী সবে সফল হোতে সুরু হয়েছে। আজ অবশ্য সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। বাড়ীটাও শতধা বিভক্ত সরিকানী সূত্রে।

কোথায় চলেছিস—চ না গড়পারে—

রণেশ বললে—তোর মাথা খারাপ হয়েছে, কাফে ডি মণিকো, মণিকা মিত্তির, মেট্রো ছেড়ে গড়পার—এ যে

গ্রাম থেকে রমণীগ্রামে মালা ভাসিয়ে দিলি, উহুঁ কি রকম যেন লাগছে—

দূর—

থাম্ অষ্টাদশ শতাব্দীর বেরসিক্—তা গড়পারের দৌত্যটা কিসের—

প্রবীণ বোসের নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই, সকাল থেকেই জরুরী তলব দিয়েছেন তিনবার, দুবার টেলিফোনে, একবার লোক পাঠিয়ে, বিশেষ দরকার—

ও বাবা, সেই লম্পট চূড়ামণি, বুড়ো শিল্পী, তিনি ত শুধু সার রিয়েলিষ্ট নন্ একেবারে ঘোরতর রিয়েলিষ্ট—তার নবতমা সঙ্গিনীটির খবর কি ?

যাই বলিস্—

হ্যাঁ, খাটি লোক বটে, লাম্পট্যের উপর অনুরাগ জন্মাচ্ছে—না, যা দেরী করিস নি, একটু যেন রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি, তাই বলি ভরা গঙ্গার গড়ের মাঠ থেকে গড়পার কেন—দেখিস্ দাদু-নাতিতে সুন্দ উপসুন্দের লড়াই না লাগে—

গড়পারের বোসেদের পুরানো বাগান বাড়ীটার ধারে গিয়ে যখন পৌছল তখন রাত্রির প্রায় হয় হয়। পথটা ছিল পথিকহীন, সহরতলীর এই দিকটায় নির্ব্বান্ধব সন্ধ্যা নির্বিবাদেই নামে। সুমন্ত্রর মনে হচ্ছিল সে যেন এ যুগের লোক নয়—অনেক দিনের পুরানো, অনেক যুগান্তরের, কালান্তরের শিকড় মনের ফাটলে জড়িয়ে গেছে, পলি-মাটিতে উর্ব্বরা হয়েছে। গল্পের মত হারানো দিনের সন্ধানে সে যেন চলেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফেরত চওড়া গালপাট্টাওয়ালা বুড়ো দরোয়ান সেলাম করে দাঁড়ালে—আভিজাত্যের শেষ সম্বল এই পুরাতন প্রতীকটিই চিঠি নিয়ে গিয়েছিল—বল্লে—কর্ত্তাবাবু অনেকক্ষণ থেকে আপনার খোজ করছেন, জলদি যান।

বাড়ীটার বিরাট বাগানটা আরও বড়। গেট থেকে খোয়া লাল সুরকির রাস্তা দুদিকে বেঁকে মোটা থামওয়ালা প্রাচীন গাড়ীবারান্দায় গিয়ে মিশেছে, সাঁড়াশীর দুই ক্ষীণায়িত বাহুর মত। সামনে চমৎকার একটা ঝিল—কাকচক্ষুজলে পদ্মপত্রে টলমল নয়, অযত্নে সংস্কারের অভাবে শ্যাওলায় কচুরীপানায় ভর্ত্তি—তবু ওরই মধ্যে প্রাণের সহজ হিল্লোলে দু'একটা নীল ফুল মুখ তুলে চেয়ে দেখছে। এককালে কালো রাজহংসের দল গ্রীবা দুলিয়ে জলের তালে তালে নাচতো। দুদিকে ফুলের বেড় তার পিছনে ফলের গাছ, আরও পিছনে তাল তমাল নারিকেলের কুঞ্জ। আগাছায় ভর্ত্তি বাগানেও রক্তপীতশ্বেতের ছড়াছড়ি, গন্ধরাজ ও গন্ধহানের ভিড়।

সুমন্ত্র যখনই এদিকে আসে তখনই বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের এই প্রাচীন ভগ্নাবশেষ তাকে বেশ একটু বিচলিত করে। এর প্রত্যেকটি গাছগাছড়া ইট কাঠ যেন এক একটি ক্ষুধিত পাষাণ। কাম-কামনা আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্যে তালগোল পাকানো এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে তার শিল্পী মন যেন অতীতের দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পায়, শুনতে পায় কারা যেন কথা কইছে আস্তে আস্তে, কারা যেন কি বলাবলি করছে। বালীগঞ্জের লনের দেড় কাঠা জমির আশে পাশে দুএকটা সৌখীন ক্রিসেনথেমাম দুএকটা মার্শালনীল একটু ঊর্দ্ধমুখীর তপ্ত কাঞ্চনের আগ্নেয় আভা এই কথা কওয়া অতীতের মেলায় যেন কোথায় হারিয়ে যায়।

ভিতরে ঢুকে দেখে দুধারের দেওয়ালে এককালের হংসশুভ্র পঙ্কের মসৃণ চিক্কণ বেমরামতীতে কালো হয়ে গেলেও অটুট আছে। জোড়া মিলিয়ে ইটালীয়ান ও জয়পুরী মর্ম্মরের সাদায় কালোয় মেশা যে চওড়া সিঁড়িটা নর্ত্তকার মত পড়ে আছে তারই উপর দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎবাহিনীর মত মালিনী। ল্যাণ্ডিংএর উপর জল জল করছে নন্দলালের "অর্দ্ধনারীশ্বর" ছবিটা। পাশেই আরাম কেদারায় চোখ বুজে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় লোলচর্ম বৃদ্ধ। হাতে কিন্তু গেলাস—তখনও কাঁপছে অগ্নিবর্ণা তরলিত চন্দ্রিকায়। পাশে ইজেল, তুলি, রং—একটী অর্দ্ধসমাপ্ত ছবি।

বুড়ো হলেও প্রবীণবাবু বেশ রসিক; চোখ না খুলেই বল্লেন—এত দেরী করে আসতে হয় সুমন্ত্র। 'হে সখা মর্ম হৃদয়ের' "পল পল সোচ্ বিচার করু মায়, কাহে পীতম আজ হুন আয়ে।"

সুমন্ত্র জিজ্ঞাসা করে—কেন বড্ড জরুরী নাকি ?

মালিনী উত্তর দেয়—উনি যে প্রদর্শনীতে যাবেন বলে অস্থির হয়ে উঠেছেন—

নিরুৎসাহের সঙ্গে সে উত্তর দেয়—ও তাই নাকি—

আমায় দিয়ে একটা ছবিও আঁকাচ্ছিলেন. প্রদর্শনীতে দেবেন বলে, উমা শিব আর নন্দীকে নিয়ে। উমা আর শিবকে না হয় বুঝলাম, নন্দীটিকে? ঠাট্টা করে বলে সুমন্ত্র। মালিনী তার কথার ভঙ্গীতে হেসে ফেলে।

প্রবীণবাবু ছবির কথায় উত্তেজিত হয়ে সুরাজড়িত স্বরে বলে ওঠেন—কুমারসম্ভব পড়েছো।

অশোকনির্ভৎসিত পদ্মরাগ
মাকৃষ্টহেমদ্যুতি কর্ণিকারম্
মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারম
বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী।
আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বা সো বাসনা তরুণার্করাগম্
পর্য্যাপ্ত পুষ্প স্তবকাননম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব—

ভাষার ভিতর দিয়ে কি রংটাই ফলিয়েছেন কবি, জানলে মালিনী তোমার মালঞ্চেও ফুল ফুটবে, তোমার মনের বকুল বনেও পবন হবে সুরার মত সুরভি—তাদের দিকে চেয়ে শুধু একটু হাসলেন তিনি।

সুমন্ত্র মালিনীর ডাগর চোখের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। কোন অতল রহস্যের সন্ধান যেন সেখানে। শুধু মালিনীকে দেখে সে চমকায় না, তার মালিকটিকে দেখেও। তিনিও যেন দিন দিন কোন গভীরে ডুবে যাচ্ছেন। উঠতি বয়সের এক কমনীয়া রমণীয়া রমণীকে দেখে পুরুষচিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠবে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক মনে হতো কেমন করে এই উর্ষসী তরুণী জড়িয়ে পড়লো এই অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে। আজ কিন্তু কেন যেন সেটা আর বেমানান্ মনে হলো না।

প্রবীণ বোসের পূর্ব্ব কথা জানতে সুমন্ত্রর বাকী ছিল না। তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা রাখা যে সুনামের পরিচয় নয় সে কথা জানতো, তবু সে মাঝে মাঝে আসতো ছবি দেখার লোভে, রসিক মনের বিদগ্ধ আলোচনা শুনতে। এককালে সুবিখ্যাত চিত্রসমালোচক বলে তাঁর নামও ছিল। প্রবীণ বোসকে সেকালে যারা চিনতো না তারা ছিল নেহাৎই কৃপার পাত্র। তাঁর নামে, তাঁর অর্থের আভিজাত্যের গৌরবে গরবে, প্রাক্ প্রথম যুদ্ধের কলকাতার ধনী সমাজ নিজেকে ধন্য মনে করতো। লম্বা চে চওড়া দিল, মুক্ত হস্ত, উদারপ্রাণ সুপুরুষ এই লোকটির বাগানবাড়ীর মাইফেলে, সুরা ও সুন্দরীর নি চর্চ্চায়, দান-খয়রাতীতে, পূজায় পার্ব্বণে, বাইনাচে হাফ-আখড়াই খেমটায়, রঙ্গালয়ের ও রঙ্গিণীদের পৃষ্ঠপোষকতায়, এমন একটা নাম রটে গিয়েছিলো যে সেটা খাটি দুর্নাম কি সুনাম সে বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ ছিল। শুধু তাই নয়, অন্য নেশার সঙ্গে জুটে গিছলো ছবির নেশা—শুধু বিলাতী ছবিতে বড় লাইব্রেরী হল, ল্যাণ্ডিং জুড়ে থাকতো না, শুধু পিকাসো, ম্যাটিস, বটিচেলি, রেমব্রান্ট, রেনল্ডস্, ডাভিঞ্চিই ভিড় করতো না, কোথায় মুরল পেন্টিং অজন্তা, বাঘগুহার ছবি, কোথায় তিব্বতের ভূত-প্রেত মহাকাল ত্রিকালেশ্বর, নেপালের তারা বজ্রসেন, দক্ষিণের পার্ব্বতী নটরাজ। ভাগ্যিস্ তখনও ভ্যাঙ্গগগ্, পলগগ্যাঁ এপষ্টাইন চালু হননি। রবিবর্ম্মাকে ডাকিয়ে এনে তিনি নিজের জন্য একপ্রস্থ আঁকিয়ে নিয়ে ছিলেন শকুন্তলার প্রতি, দুর্ব্বাসার অভিশাপ। বলেছিলেন—প্রেমের দেওয়ানা সে, সে ত সব ভুলবেই। বুড়ো বয়সে নন্দবাবুর শিবের বিষপান দেখে সে কী উল্লাস—বল্লেন—সত্যিকার রসবেত্তা না হলে শিবের শিবত্ব বোঝে। তাইত ভুঁড়িওয়ালা জটাজুট-মণ্ডিত যাত্রাদলের বুড়ো খড়িমাখা শিবের বদলে নব-গৌরকান্তি প্রশান্তবদন বিশ্বের চিরতরুণকে পেলুম, সংসারের কোলাহল মেটাবার জন্য যিনি পান করতে পারেন হলাহল নির্ব্বিকারচিত্তে। সংসারের বিষ কি সহজে হজম হয়, ছায়ার পেছনে যে নটরাজ আছেন—তিনিই শুধু পারেন শুধু ধুলো বালি মেখে, কাদা পাক ঘেঁটে, শ্মশানে মশানে বেড়িয়ে খুঁজছি আমার শিব কই, শিব কই, আমি বলি প্রিয়ই শিব, প্রিয় ওই।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতো সুমন্ত্র আর মালিনী। আর একদিন হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—অবন্ ঠাকুরের সেই ছবিটা দেখেছো—মুমূর্ষু সাজাহান চেয়ে আছে তাজমহলের দিকে—সাজাহানকে তোমরা বলবে অত বড় লম্পট, অত বড় অত্যাচারী সম্রাট আর ছিলো না—শাস সন্ধি সালতামামী মিলিয়ে মানুষের ইতিহাস হয়ত সেই কথায় সায় দেবে, কিন্তু মনের ভেতরে খুড়ো আর ভাইপো মিলে, কবিতে আর শিল্পীতে যে চিরকালের রসের হাঁ

সেটাও কি সত্যি নয়—হয়ত সেই কণ-সত্যটাকে তাঁরা শাশ্বত করে বন্দী করলেন কালের জন্য—ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া—চিত্র চর্চা করতে করতে এমন একটা দিব্যদৃষ্টি খুলে যায় তাঁর যে ছবির সম্পর্কে তিনি প্রায় বিশেষজ্ঞ হয়ে গেলেন বল্লেই হয়। কিন্তু অর্থ ও আভিজাত্য, জীবন ঘুনে ঘুণ ধরলে ঠেকানো দায়। মা লক্ষ্মী অলক্ষ্যে ফিরিয়ে চোখের জল মুছে চলে গেলেন। বিষয়-গন্ধভুক্ত কপিত্থের মত হয়ে উঠলো। নিলামে জাটগুলো। শেরিফের সেলে বিক্রী হয়ে গেলো তার বাড়ী কখানা। কুকের কাছ থেকে সখ করে ল্যাণ্ডো আর সাদা ওয়েলার ঘোড়াগুলো একদিন হল হয়। কোচম্যান সহিস চোখের জলে বিদায় বিদায় নেয় কোম্পানীর কাগজগুলো, জমিদারীর সত্ত্ব গুলা। মিনার্ভা রোলস্-রয়েস দুটোও নিঃশব্দে বেরিয়ে একদিন শূন্য গারেজ শূন্যতর হয়। থাকবার ভিতর গঙ্গাপারের এই বাগানবাড়ীটা—তাও তার পিতামহ রাগ ও অনুরাগের চোটে দেবোত্তর করেছিলেন তিনি নাকি একদিন রাতে কোন সুন্দরীর দেহ ও জয় করতে না পেরে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে বাগান-টাকে সেই দেবতার সেবায় দেবেন যিনি মদনমোহন। দিন সকালেই তিনি বীতরাগ হয়ে সংসার ত্যাগ। বড়লোকের খেয়ালে সেইখানেই এক মন্দির হয়েছিল মহাসমারোহে—কিছু সম্পত্তিও দেওয়া ভোগরাগাদির জন্য। প্রবীণবাবু এখন শুধু এইটুকুরই উপভোগী। তবে মন্দ অবস্থার দিনেও মদনমোহনের দেবোত্তরেরও বেশীর ভাগই গেছে মদনের সেবায়, দেবতার সেবাইতের হুইস্কীর খরচে আর নারীর নিক্কণে। মদনমোহনের পূজার ঘর থেকে দেখা জলসা ঘরের রোশনাই, নাচের আসর। নাচছে রোশেনারা, হীরাবাই, কমল বাইজী, মিস্ মারিয়াম্মা। সন্ধ্যার বৈঠকে ছায়ানটের সুর সেতারী কল্যাণের ঠাটে বিলম্বিত লয়ে। পাখোয়াজে বোল ফুটে উঠেছে গভীর আবেশে, তাল দিচ্ছেন গুণী।

বোস এখনও সশরীরে বর্তমান—তবে কলকাতার সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচেছে। ছবির প্রদর্শনী হলে বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জলসায় কচিৎ কদাচিৎ গুণী জ্ঞানী রংদার বলে এখনও দু'চারটে আমন্ত্রণ আসে এবং তিনিও অতি কষ্টে বাত ব্লাডপ্রেসার ডায়েবিটিস নিয়ে মালিনী বাহন হয়ে যান। কিন্তু ঐ হয়েছে কাল—আজকালকার লোকেরা ওটাকে সহজ চোখে দেখে না—দুর্মুখরা কটূক্তি করে, নানা কথা বলে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন বৃদ্ধ, তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মালিনীর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন—চলো, তৈয়ারী হয়ে নাও, চোকেকে বলো একটা ট্যাক্সী আনতে—

জবাব দেয় না মালিনী।

চিঠি দেয়নি এই তো—প্রবীণ বোসকে চিত্রপ্রদর্শনী আমন্ত্রণ করলেনা, এও দেখতে হলো, সভায় না হয় নাই গেলাম, প্রদর্শনী দেখতে ত সবাই যেতে পারে,—নিমন্ত্রণ করলে না, তা কি হয়েছে, হো, হো—

মনে হোল এক অশরীরীর অস্থিপঞ্জর ভেদ করে বুক-ভাঙা চীৎকার গুমরে উঠলো। গেলাসের তরল আগুনে মুখটাকে রাঙিয়ে নিলেন প্রবীণবাবু—সুরার সুরতোৎসব।

মালিনী চুপি চুপি বল্লে—কি যে করি, সারাদিন ওই চলেছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় আজ দুদিন ধরে গেলাসের পর গেলাস, আর খবর নিচ্ছেন চিঠি এলো কিনা, বলছেন নিশ্চয়ই ভুল করেছে—

কথাটা কানে গেল তাঁর—ঠিক্, নিশ্চয়ই ভুল, রাজা-বাহাদুর কর্মকর্তা, যাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করলুম আমি, কায়দা-কানুন শেখালুম, চিত্র রসিক হলেন যিনি আমার কৃপায়, যে প্রদর্শনীর গোড়াপত্তন করেছিলুম আমি, সেখানকারই সভায় একখানা আমন্ত্রণও আসবে না, হতেই পারে না—

কি বল্লে, তড়িল্লেখা দেবী পছন্দ করেন না আমায়, বড্ড কড়া মর‍্যালিষ্ট? হবেও বা। তড়িল্লেখা, তিনি যে 'তপনশশী বৈশ্বানরময়ী' কিন্তু গোড়ার যুগের কথা তিনি কি জানেন—বীজ যখন মাটির নীচে লুকিয়ে অন্ধকারের ভিতর তপস্যায় বসে—একদিন সেই বীজই ত বনস্পতি হয়ে ফুলে ফলে পল্লবে শ্যামলশ্রী শোভায় ঝলমল করে, যাকগে সবই ভুল, জানলে ভুমর—প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে

বেঁচে থাকাটাই ভুল, আর অবস্থায় ভেদে সহজ হতে না পারাটাও ভুল হো, হো……

হাসির মাঝে হাহাকারটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, বুকফাটা সে হাসি। আজকাল কেউ খোঁজ করে না, কেউ খবর দেয় না, চিঠি দেয় না। মালিনী ফিস্ ফিস্ করে বলে—সকাল থেকেই বায়না ধরেছেন সুমন্ত্রকে ডাকো—শিল্পী লোক, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, দেখিয়ে দেবো ছবি দেখবার, বোঝবার, বিশ্লেষণ করবার চোখ এখনও অটুট প্রবীণ বোসের।

সুমন্ত্রর মনে হোল সেও যেন এক ছবি দেখছে—একটা স্বয়ম্পূর্ণ ছবি—একদিকে আগুন নিভে যাওয়া বৃদ্ধ, আর একদিকে সদ্য আহিতাগ্নি এক লকলকে অনলশিখা, মাঝখানে সে। কি রকম অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার বুক দুলে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে ভোরের আলোর মত ভরে যায় অজানা মমতায়।

আবার বোতলের দিকে হাত বাড়ান প্রবীণবাবু বোধ হয় মনের মধ্যে গুমরে ওঠে ফুরিয়ে-যাওয়া দিনগুলো, নটরাজের ছায়া যেন আনত। বিবশ মন চেতনায় জাগছে—কত সঙ্গিনী অর্দ্ধাঙ্গিনী এলো গেলো, কতো হুইস্কী শ্যাম্পেনশেরীর সাথী-সাথিনীরা নাগ-নাগিনীরা। আজ বাইজীরা নাচে না, ওস্তাদরা আসে না, জলসাঘরের হাজারবাতির ঝাড় জ্বলে না, শিল্পী আর্টিষ্ট রসিকরা ভিড় করে না। তবু সকাল হলেই মালিনীকে সঙ্গে করে ইজেল তুলি নিয়ে বসবেন—আর বিকেল হলেই অনেকদিনের শোনা দু'একচরণ পুরাণো গান গুন্ গুন্ করে মনের মধ্যে গুমরে উঠবে। বোতল গেলাস নিয়ে আসবে মধু, চলবে গেলাসের পর গেলাস। যতক্ষণ না গৌড়ী মাধ্বীর বোতলটা কেড়ে নেবে মালিনী, বলবে—আর নয়—

ঢুলে-আসা নিষ্প্রভ চোখ দুটো ছল ছল করে উঠবে—তাজা তুলতুলে নিটোল হাত দুটো ধরে শির-ওঠা মরা চামড়ার ভিতর ধরে রাখবেন কিছুক্ষণ প্রবীণ বোস, তাঁর নিভে আসা প্রাণ যেন সমস্ত সত্তা দিয়ে জীবনের উত্তাপ পেতে চায় শেষবারের মত। তার পর সন্ধ্যার ছায়ায় নেমে আসবে নটরাজের পদধ্বনি, এক একদিন চমকে উঠে বলবে—শুনতে পাচ্ছো, কান্নার শব্দ, পায়ের শব্দ।

কই না—জবাব দেবে মালিনী—

ও, আমারই ভুল—বলে আবার ঢলে পড়বেন তিনি।

একদিন সুমন্ত্র জিজ্ঞাসা করেছিলো মালিনীকে—আচ্ছা, আপনি এখানে কেন—

সে শুধু কপালে হাত দিয়ে বলেছিল—বরাত, জন্মেই যে জয়ের রাজটীকা পরেছি, ভাগ্যলিপি কে খণ্ডাবে বলুন—আর এই বয়সে ওঁকে দেখবেই বা কে—

নাছোড়বান্দা প্রবীণবাবু যাবেনই—তবু ছবিগুলো দেখে আমার অভিমতটা লিখে দিয়ে আসি, লোকে হাসে হাসুক—

তাঁরা তিনজনে যখন প্রদর্শনীর কক্ষে পৌছলেন, তখন সভা ভেঙে গেছে—চারিদিকে ছবির সমালোচনা চলছে জোর—

ল্যাণ্ডস্কেপটা সুন্দর হয়েছে, কি বলিস—

না, না ঐ যে 'আগুন নিয়ে খেলা'টা—যেন নিয়োক্লিউ-বিক্রমের স্বপ্ন—দেখিসনি রবিবাবুর এক লাইন কোটেশন নীচে "দেখতো চেয়ে আমায় তুমি চিনিতে পার কি"

চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন প্রবীণ বোস, পাশে মালিনী—আপনি মগ্ন একদৃষ্টে চেয়ে আছেন তিনি সামনের দিকে। শেষকালে বল্লেন—চমৎকার, এমনটি আর দেখিনি, তুলিতে যেন ছায়ানট ফুটে উঠেছে।

চল মা মালিনী, আমার ছবি দেখা হয়ে গেছে।

অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে সুমন্ত্র তাঁর কথা শুনে।

সামনে বেরুতেই এক বুড়ো প্রেস্ রিপোর্টার ধরলে। চিনতো তাঁকে, তাঁর অভিমত চাইলে।

হাঁ, ঐ মাতাল বুড়ো আর তার সঙ্গিনী তরুণী—অপূর্ব্ব, কি বল্লে—বিউটি এ্যাণ্ড দি বিষ্ট, শুধু বৃদ্ধের লালসাটাকেই দেখলে, ভুল, ভুল, তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু খুলেছে ছবিটাতে, তোমাদের চোখ নেই—এ হচ্ছে ছায়ানটের শেষ রূপ। এই পৃথিবীতে আমরা সবাই নটুয়া। শুধু পেছনের আলোছায়ার খেলায় নিত্য নূতন রূপ ফুটে উঠছে। সেই ছায়ার মিছিলেই আসে চিরযৌবনা উর্ব্বশী রম্ভা তিলোত্তমার দল, আবার তারই মন্থনে আসে অন্ধ আতুর, খঞ্জ, ধনী নির্ধন, যশমান প্রেম, বঞ্চিত লাঞ্ছিতের বাহিনী। কায়া নিয়ে খেলা করলেও ছায়া মায়াই থাকে তাকে খুলতে যেয়ো না, দেখতে চেয়ো না—মা অপাবৃণু। যদি নেহাত দেখতে চাও তবে মনের ভিতর আগুন জালিয়ে অতি নিভৃতে ঘোমটা খুলে এক একবার হয়ত সে মায়াবিনীর

রেখা পেতে পারো, কিন্তু সে আগুন শুধু জ্বালালে হয় না, নেভাতেও শিখতে হয়, তা না হলে সব পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, সন্ধ্যার ছায়া বন্ধ্যা হয়ে ওঠে, নটরাজের কান্নায় কান পাতা যায় না। নৃত্যের তালে তালে সে কী কান্না, শুনেছো কোনদিন—

পরের দিন সকালে কাগজে কাগজে বেরিয়ে গেলো প্রবীণ বোসের অভিমত। হৈ হৈ পড়ে গেলো—অচলগড়ের রাজা তখনি লিখে পাঠালেন ছবিটা তিনি দশ হাজার টাকায় কিনতে রাজী।

কর্তৃপক্ষরা অবাক্—ও রকম ছবিই আসেনি।

একদল বল্লে—মাথা খারাপ বুড়োর।

আর একদল টিপ্পনী কাটলে—লম্পট, মাতাল, কি দেখতে কি দেখছে, কি বলতে কি বলেছে।

আরো নবীনরা বল্লে—খাটি ডিকাডেণ্ট বুর্জোয়া, যত সব রোম্যান্টিক ননসেন্স।

কিন্তু শিল্পজগতে শিল্পদরদী প্রবীণ বোসের অভিমত একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। কর্তৃপক্ষরা হানা দিলেন গড়পারে—কই ছবি দেখাবেন চলুন।

মালিনী কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্লে—কাল থেকেই ওঁর শরীর বড্ড খারাপ, সারাদিন কিছু খান্ নি—আজ ওঁকে বিশ্রাম করতে দিন্…

কে শোনে সে কথা, প্রবীণবাবুও একগুঁয়ে। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত তিনি কি সব আবোল তাবোল বকছেন। স্বয়ং রাজা বাহাদুর এসে হাজির, অনেক বছর পূর্ব্বে এইখানে তাঁর নিত্য যাতায়াত ছিল। বল্লেন—আপনার উপর এতদিন যা হয় একটু শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু এ কী পাগলামী—

প্রবীণ বোস হেসে উত্তর দিলেন—মহারাজ, ফেলো তব সাজ, চোখের ঠুলি খুলে ফেলো—"নোখাঃ ইব আবির্ অকৃত প্রিয়াণি" তিনিই ত আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন, প্রিয় বস্তুকে দেখিয়েছেন…

উদ্যোগীরা শুনলে না, দস্তুরমত ধরে নিয়ে গেলো তাঁকে।

সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি প্রদর্শনীর হলে। ওপারের আয়নায় প্রতিফলিত হলো তাঁর ও মালিনীর যুগল ছবি।

ঐ ঐ বলে চীৎকার করে ঢলে পড়লেন তিনি, উত্তেজনায় পড়ে গেলেন মাটিতে। সুমন্ত্র ছুটে গিয়ে ধরে ফেল্লে। তার হাতদুটো ধরে প্রবীণবাবু কেমন যেন কোমল হয়ে এলেন, বল্লেন হাঁফাতে হাঁফাতে—মালিনী ভারী লক্ষ্মী মেয়ে, ওর দিদিমা মস্ত বড় ওস্তাদ ছিলো ছায়ানটে—"অবকো রাখো ভগবান কাণ মোরি" তাঁর লজ্জার মর্য্যাদা হয়ত মানুষ রাখেনি, ভগবান রেখেছিলেন কিনা কে জানে, মারা যাবার আগে বলে গেছলো—তোমার কাছেই মালিনীকে দিয়ে গেলুম, ও হচ্ছে আগুনের শিখা, নিত্য শুদ্ধা, অমঙ্গল ওকে স্পর্শ করবে না। আমি অবাক্ হয়ে বলেছিলুম—আমার কাছে? আমায় ত তুমি খুব ভাল করেই জানো, নিজের জীবন-যৌবন দিয়ে চেনো! বিশ্বাস হয়? সে শুধু জবাব দিয়েছিল—এত ভালো আর কাকেও চিনি না, তাইত এ সাহস হচ্ছে।

প্রদর্শনীর ঘরে আস্তে আস্তে সব শেষের চরম ছবিখানি ফুটে উঠলো এক অদৃশ্য শিল্পীর গভীরতম তুলির রেখায়। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো ছায়ানট 'নিষাদহীন আরোহে' মিশলো গিয়ে বিদায় বেহাগে। রাত্রির প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেলো, মালিনী কেঁদে উঠলো—দাদু, দাদু—

চোখের জল মুছতে মুছতে সুমন্ত্র নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়ালো, তার হাতখানি তুলে নিলে।

ভারী হাইড্রোজেন ও ভারী জল

সলিল বসু

কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে যদি অক্সিজেনের সহযোগে কোন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তা' হ'লে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থটিকে সাধারণতঃ মৌলিক পদার্থটির অক্সাইড্ বলা হ'য়ে থাকে। বিজ্ঞানীর এই দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌লে আমাদের আবাল্য-পরিচিত জলটা হ'য়ে দাঁড়ায় হাইড্রোজেন গ্যাসের অক্সাইড্। এতে ভয় পাবার কিছু নেই অবশ্য, কারণ জলটা সাধারণ লোকের কাছে জলই রইল', তার স্বাদ বা বিস্বাদ কোনটারই এল না কোন পরিবর্ত্তন, তবে বিজ্ঞানীর দলিল দস্তাবেজে তার স্থান হ'ল নতুন নামে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে জল জিনিষটা মৌলিক পদার্থ নয়, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনের একটা যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোজেনের প্রকৃতি ও প্রতিকৃতির উপর নির্ভর ক'রছে জলের রাসায়নিক আচার ও আচরণ, জলের যা কিছু জলীয় মনোভাব।

চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে তেজস্ক্রিয়া নিয়ে বিজ্ঞান মহলে একটা বেশ সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। তেজস্ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা ক'রতে গিয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন রকম আইসোটোপের সন্ধান পেয়েছিলেন। কোন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ হ'ল এমনি একটা পদার্থ—যার পরমাণু ক্রমাঙ্ক (Atomic no.) মৌলিকটির সমান, কিন্তু বিভিন্ন তাদের পারমাণবিক গুরুত্ব (Atomic wt.)। আজকালকার রসায়ন শাস্ত্র বলে যে পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ভর করে পরমাণু ক্রমাঙ্কের উপর, অর্থাৎ কোন পদার্থ ও তার আইসোটোপের মধ্যে সাদৃশ্য থাকবে পুরোপুরি, হয়ত' একটু এধার ওধার হ'তে পারে।

আইসোটোপগুলো যখন তৈরী করা হয়, তখন সেগুলো অনেক রকম পদার্থের সঙ্গে মেশানো অবস্থাতেই পাওয়া যায়। এখন এই মিশ্রণ থেকে আইসোটোপটিকে আলাদা ক'রে নেবার অনেক রকম উপায় আবিষ্কার হ'য়েছে এবং হ'চ্ছে। এই রকম একটা বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা ক'রতে গিয়ে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী ও তাঁর সহকর্ম্মীরা সন্ধান পেলেন হাইড্রোজেন আইসোটোপের। বৈজ্ঞানিকটির নাম এইচ্, সি, ইউরে (H. C. Urey), আর তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন এফ্, জি, ব্রিক্‌ওয়েড্ (F.G. Brickwedde) ও জি, এম্, মার্ফি (G. M. Murphy)। এটা হ'ল ১৯৩০-৩২ সালের কথা। এই আইসোটোপটির নাম হ'ল ডয়টেরিয়াম্ বা ভারী হাইড্রোজেন কারণ আবিষ্কৃত পদার্থটির পারমাণবিক গুরুত্ব সাধারণ হাইড্রোজেনের দু'গুণ অথচ একই তাদের পরমাণু ক্রমাঙ্ক। এই থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণ হাইড্রোজেন-যৌগিক পদার্থগুলোর সঙ্গে ডয়টেরিয়ামের যৌগিক পদার্থগুলোর কিছু কিছু পার্থক্য থাকবে। সাধারণ জল যেমন হাইড্রোজেন অক্সাইড্, তেমনি ডয়টেরিয়াম্ অক্সাইড্ পদার্থটিও জল, তবে তার পারমাণবিক গুরুত্ব সাধারণ জলের চেয়ে কিছুটা বেশী, তাই এটাকে বলা হ'ল ভারী জল। ৪°—২০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ উষ্ণতায় মধ্যে ভারী জলের ঘনত্ব সাধারণতঃ ১.১০০৬ বা এই সংখ্যার কাছাকাছি কিছু একটা। ডয়টেরিয়ামটা প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল তরল হাইড্রোজেনের আংশিক পাতন ক্রিয়ার সাহায্যে। সাধারণ তরল হাইড্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক (boiting pt.) হ'ল—২৫১.৬° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্, আর তরল ডয়টেরিয়ামের স্ফুটনাঙ্ক—২৪৯.৫° ডিগ্রী। কিন্তু স্ফুটনাঙ্কের এই অল্প পার্থক্য থেকে দু'টো পদার্থের পৃথক্‌করণ একটা দুরূহ এবং আয়াস সাধ্য ব্যাপার তাতে কোনই সন্দেহ নেই। মিটল' না বিজ্ঞানীর মনের তৃষা, তার অনুসন্ধিৎসু আঁখি খুঁজতে লাগল' নতুন পথের নিশানা। পথের সন্ধান পেতে দেরী হ'ল না খুব বেশী। ইউরে (Urey) আর ওয়াস্‌বার্ণ (E. W. washburn) আবিষ্কার ক'রলেন এক তড়িদ্‌বিশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া। সাধারণ জলকে যখন তড়িদ্‌বিশ্লেষের সাহায্যে তার মৌলিক উপাদানের রূপ দেওয়া হয়, তখন বিশ্লেষাধারের মধ্যে ভারী জলকে বেশ ঘনভাবে (Concentrated) থাকতে দেখা গেছে। কিন্তু জলের সাধারণ হাইড্রোজেনটার বেশীর ভাগ অংশই গ্যাসের আকারে বেরিয়ে যায়। যদি এই আধারের মধ্যে মাঝে মাঝে জল ঢেলে জলের উপরকার সীমারেখাটাকে সমান রাখা হয় এবং সেই সঙ্গে বিশ্লেষণ পদ্ধতি চালান যায়, তা হ'লে এমন একটা পর্য্যায়ে এসে পৌঁছন' যাবে, যার পর আর ভারী জলের গাঢ়তায় কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাবে না। এই ভাবে এক সহজ উপায়ে ভারী জল তৈরী করা যায়, অর্থাৎ সাধারণ জল থেকে অসাধারণ কিছু একটা।

সাধারণ অবস্থায় জল তড়িদ্‌বাহী নয়, বিদ্যুৎ বিশ্লেষের সময় একে তড়িদ্‌বাহী ক'রে নিতে হয়। তার জন্যে জলের মধ্যে সোডিয়াম্ বা পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড্ মেশানো হয়। এই বিশ্লেষণের জন্যে সাধারণতঃ শতকরা ১৮ ভাগ দ্রবণ (18% Solution) ব্যবহার হ'য়ে থাকে। বিশ্লেষণাধারের মধ্যে যখন ভারী জলের গাঢ়তার পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছয়, তখন বিশ্লেষণ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। তারপর দ্রবণটির মধ্যে দিয়ে কার্বণ-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস্ পাঠান হয়, হাইড্রক্সাইড্‌টাকে প্রশমিত (neutralise) করার জন্যে। হাইড্রক্সাইডের মধ্যে কিছু ভারী হাইড্রোজেন যদি গায়েব হ'য়ে থাকে তা হ'লে কার্বণ-ডাইঅক্সাইড্ পুলিশ তাকে মুক্ত ক'রতে পারবে। তার পর দ্রবণটি থেকে পাতন ক্রিয়ার সাহায্যে ভারী জলটিকে আলাদা ক'রে ফেলা হয়। এই ভারী জলকে তড়িদ্‌বিশ্লেষ ক'রলে পাওয়া যাবে ভারী হাইড্রোজেন অর্থাৎ ডয়টেরিয়াম্। বিশ্লেষের জন্যে যে সব আধার ব্যবহার হ'য়ে থাকে সেগুলো সচরাচর কাঁচের বা ধাতব পদার্থের হ'য়ে থাকে। তড়িদ্‌দ্বার (electrode) হিসেবে ব্যবহার করা হয় লোহা বা ইস্পাতের রড্ এবং মাঝে মাঝে

রিক্রিয়ার দৌরাত্ম্য এড়িয়ে চলার জন্যে রড্‌গুলোকে নিকেলের লেপন (plating) দেওয়া হয়। অবশ্য ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে লেপন-না-দেওয়া রড্‌গুলোর কার্য্যক্ষমতা বেশী। আধারের মধ্যচ্ছদা (diaphragm) সাধারণতঃ অ্যাস্‌বেস্টস্‌ বোর্ডের ব্যবহার হয়। পদ্ধতিটি সুচারুভাবে চালান'র জন্যে ১২-১৫ এ্যাম্‌পিয়ার কারেন্ট লাগে আর ভোল্টেজ্‌ লাগে ১১৫ ভোল্ট্‌। উষ্ণতা সাধারণতঃ ৬০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্‌ বা তার কাছাকাছি হয়।

এ ছাড়া ব্যাপন (Diffusion) পদ্ধতির সাহায্যেও ডয়টেরিয়াম্‌ তৈরী ক'রেছেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। হাইড্রোজেনের সঙ্গে এর পারমাণবিক গুরুত্বের ব্যবধানের ফলেই এই প্রক্রিয়াটি সম্ভব হয়েছে। তবে এখনও পর্য্যন্ত তড়িদ্‌বিশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াটিই সবিশেষ গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'চ্ছে। অনাগত কালের বিজ্ঞানশিশু কি ক'রবে কে জানে?

এখন এদের কিছু আচার আচরণের কথা ভাবা যাক্‌। সাধারণ জলের স্ফুটনাঙ্ক হ'ল ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্‌, আর হিমাঙ্ক ০° ডিগ্রী; কিন্তু ভারীজলের স্ফুটনাঙ্ক ১০১·৪২° ডিগ্রী আর হিমাঙ্ক ৩·৮২° ডিগ্রী। সাধারণ জল, যাতে প্রায় ১০ লক্ষ হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে তাতে ডয়টেরিয়ামের পরমাণু সংখ্যা প্রায় ১৭৫। বাজারচলন (Commercial) হাইড্রোজেন অক্সিজেন তড়িদাধার থেকে যে ব্রবণটি পাওয়া যায় তাতে ডয়টেরিয়াম্‌ পরমাণু র'য়েছে প্রায় ৫০০, যখন হাইড্রোজেন পরমাণু সংখ্যা হ'ল ১০ লক্ষ।

হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা ডয়টেরিয়ামের চাইতে অনেক বেশী, এমনকি হাইড্রোজেনের সঙ্গে কিছুমাত্র ডয়টেরিয়াম্‌ থাকলে এর সক্রিয়তা হ্রাস প্রাপ্ত হয় অনেকটা। এ্যামোনিয়া প্রস্তুতির সময় তড়িদ্‌বিশ্লেষকৃত হাইড্রোজেন ব্যবহার ক'রে সুফল পাওয়া গেছে, কারণ এই প্রক্রিয়ার হাইড্রোজেনে ডয়টেরিয়ামের পরিমাণ থাকে অনেক কম। ডয়টেরিয়ামের অনেক রকম গুণ ও দোষ রয়েছে জানা অজানার মধ্যে, কারণ এটা এখনও র'য়েছে পুরোপুরিই গবেষণার পর্য্যায়ে আমাদের জানা যত রকম রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ র'য়েছে তার মধ্যে শতকরা ৯০টার মধ্যেই র'য়েছে হাইড্রোজেন। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে হাইড্রোজেনের বিভিন্ন রূপ ও অরূপের পরিচয় পাওয়া কত দরকার। ভবিষ্যতের বিজ্ঞান-শিশুর ক্রিয়া-কলাপের দিকে চেয়ে আছে আজকের বিজ্ঞান জগৎ!

দ্বিজেন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি, ডি-এস্‌-ই

অনেকে বলেন দূরত্ব জিনিষটা নাকি দৃশ্য বস্তুর উপর একটা রমনীয়তার প্রলেপ লাগাইয়া দেয়। কথাটা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে সত্য হইতে পারে। কিন্তু ইহার চেয়েও বড় সত্য হইতেছে দূরত্ব বড় জিনিষকে ছোট করিয়া দেখায়, ভাস্বর জিনিষকে হীন-প্রভ করিয়া দেখায়, আমাদের অতীত ঋণের কথা ভুলাইয়া দিয়া আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ করিয়া তুলে এবং পূজ্য-পূজা ব্যতিক্রম ঘটাইয়া আমাদের প্রত্যবায়-ভাগী করিয়া তুলে।

এই প্রত্যবায় আজ আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আসিয়াছে। আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট আমরা কতটা ঋণী। আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি সেই দিনের কথা যে দিন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকাবলীর ভিতর দিয়া আমাদের দেশে দেশাত্মবোধের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন, সে দিন বিলাতী অর্কেষ্ট্রার সুরে তিনি তাঁহার স্বদেশী গানের ঝঙ্কারে আমাদের মধ্যে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমাদের শিরায় শিরায় যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সে কথা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

তীব্র দেশাত্ম-বোধের প্রেরণায় দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গজননীর শুষ্ক নয়ন ও রুক্ষ কেশ দেখিয়া কত কাঁদিয়াছিলেন, "জননী বঙ্গভাষার" নিকট "চাহিনা অর্থ চাহিনা মান" বলিয়া নয়নের ধারা ও কণ্ঠের শোলা সম্বল করিয়া শুধু তাঁহার "অমল কমল চরণে স্থান" পাইবার জন্য কত দুঃখের সাধনা করিয়াছিলেন, মহিমার জন্মভূমি এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র ভারতমাতার পুত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিয়াই জীবনের দুঃখ ভুলিয়াছিলেন, দেশের নৈরাশ্যের দুর্দ্দিনেও "আবার তোরা মানুষ হ" বলিয়া চারণ কবির মত প্রেরণা দিয়াছিলেন। এ সব কথাও আজ আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি।

তিনি আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ চারণ কবি হইলেও ইহাই তাঁহার সম্বন্ধে শেষ কথা নহে। তাঁহার রুদ্র বীণার অন্য সুরও ঝঙ্কৃত হইত এবং এই সমস্তের ভিতর দিয়া তিনি আমাদের মনুষ্যত্বের প্রেরণাই দিয়াছেন। যে সমস্ত কিশোরের দল "হাস্য পেলে হাস্য করি, নৃত্য পেলেই নাচি" বলিয়া লঘু আনন্দে মত্ত হইয়াছে, তাহাদের তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন, কপটাচারের প্রতি ধিক্কার দিয়াছেন, প্রাচীনপন্থী নব্যপন্থী হিন্দুসমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্ম বিলাত-ফিরত পর্য্যন্ত সকলের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন, আবার শিক্ষার দীক্ষার মাঝে হইয়াও পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি আমাদের হিতকাব্য শুনাইয়াছেন, মধুর কাব্য শুনাইয়াছেন, আমাদের আনন্দে হাসাইয়াছেন, দুঃখে কাঁদাইয়াছেন, আদর্শে উদ্বেজিত করিয়াছেন। এই মহাকবির ঋণ বিস্মৃত হওয়া অকৃতজ্ঞতার কাজ।

তবে এই অকৃতজ্ঞতা বাংলার নাট্যামোদী জনসাধারণ শুধুই দেখায়

নাই ; যতটা দেখাইয়াছেন বাংলার বিদগ্ধ আলঙ্কারিক ও সাহিত্য ঐতিহাসিক দল।

এই দোষজ্ঞের দল দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি খুব সদয় নহেন। কারণ রসবিচারের মাপকাঠি তাঁহাদের হাতে আছে এবং সেই মাপকাঠির আদর্শে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে অনেক ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে। ইংরাজীতে কথা আছে, পুডিং এর শ্রেষ্ঠ বিচার হইতেছে খাওয়ার মধ্যে। কিন্তু সমালোচক বলিবেন "তোমার খাইতে ভাল লাগিলেই ত চলিবে না, আমাদের নির্দ্দেশ মত ভাল লাগা চাই" সমালোচকদের ফরমাজী রুচিবোধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে না পারিলে সাহিত্য জিনিষটা জাতিতে উঠিতে পারে না। এই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালও জাতিতে উঠিতে পারেন নাই, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। ডাঃ সুকুমার সেনের বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের ২য় খণ্ডে ৬২৩টি পৃষ্ঠার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের কুড়িটি নাটকের সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে মাত্র ছয়টি পৃষ্ঠায় এবং এই ছয়টি পৃষ্ঠার মধ্যেও তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত প্রশস্তির কথা প্রায় কোনও স্থানেই নাই। তিনি বলিয়াছেন— দ্বিজেন্দ্রলাল একখানি নাটক সীতা ছাড়া যথার্থ ভাল নাটক রচনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্লটের মধ্যে প্রবাহের অভাব, ভূমিকা-গুলির স্বাভাবিক পরিণতির ব্যতিক্রম, স্থান কাল পাত্রের বৈসাদৃশ্য এবং সংলাপের কৃত্রিমতা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অমার্জ্জনীয় অপরাধ। শুধু তাই নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত নাটক "চন্দ্রগুপ্ত," তাহার মধ্যেও তাঁহার কৃতিত্ব কিছুই নাই, কারণ ইহাও উমেশচন্দ্র গুপ্তের "বীরবালা" নাটকের যথার্থ অনুকরণ !

দ্বিজেন্দ্রলালের এই যশোদৈন্যের কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কিনা জানি না। একদিন কুক্ষণে তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তিনি "আনন্দ বিদায়" রচনা করিয়া-ছিলেন। এই "কলীয়সী স্পর্দ্ধা"ই হয়ত তাঁহাকে অনেকের কাছে অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই অন্যায়ের ঋণ হয়ত তিনি এখনও পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার দাবীর কথা মহাকালই বিচার করিবে। উপস্থিত আমাদের কর্তব্য হইতেছে তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গ-নাটক যাহা পাইয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইয়া তাঁহার প্রতি অকৃতজ্ঞ না হওয়া। অকৃতজ্ঞতা মহাপাপ, ইহা যে করে সেও ছোট হয়, আর যাহার প্রতি ইহা করা হয় তাহাকেও ছোট করা হয়। দূরের জিনিষ ত স্বভাবতঃই আমাদের নিকট ক্ষুদ্রতর হইয়া প্রতিভাত হয়, তাহার উপর যদি অকৃতজ্ঞতা সেই ক্ষুদ্রতর জিনিষটিকে আরও ক্ষুদ্রতর করিয়া তুলে, তাহা হইলে অত্যন্ত অন্যায় হয়। এ অন্যায় আমরা যেন না করি।

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাঁহার প্রতিভা উন্মেষের ইতিহাস আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

স্বাভাবিক কবি-প্রতিভার সহিত পরিপক্ব বিদ্যার মূলধন লইয়া তিনি তাঁহার নাট্য সাহিত্যের সাধনা আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। ইতোপূর্ব্বে হাসির গান লিখিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং বোধ হয় তাহারই সূত্র ধরিয়া প্রথমে প্রহসন আরম্ভ করেন। ছয়খানি প্রহসন এবং তিনখানি পৌরাণিক নাটক লিখিয়া তিনি তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত ক্ষেত্রের সন্ধান পান। এই সময় তিনি নয়খানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন এবং পরে দুই খানি সামাজিক নাটকও লিখিয়াছিলেন। প্রথমে প্রহসনের কথাই আলোচনা করা যাক।

প্রহসন

কল্কি অবতার (১৩০২) দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন। ইহা হুতোম মত মিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। ইহাতে বিলাত ফেরত, ব্রাহ্ম, নব্য হিন্দু, গোঁড়া এবং পণ্ডিত এই পাঁচ সম্প্রদায়ের প্রতিই বিদ্রূপ করা হইয়াছে। শেষে কল্কি অবতার আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, বিশ্বাস প্রেম ও মনুষ্যত্বের উপরই সমাজের প্রকৃত ভিত্তি।

দ্বিতীয় প্রহসন "বিরহ" (১৩০৪) ; এই নাটক সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন "আমার এই গ্রন্থে উদ্দেশ্য অল্পায়তনের মধ্যে বিরহের প্রকৃত হাস্য রসটুকু দেখান" এই নাটকের গানগুলি উপভোগ্য।

ত্র্যহস্পর্শ (১৩০৭) ডাঃ সুকুমার সেনের মতে বইটি অমৃতলালের "রাজা বাহাদুরের" অনুকরণে রচিত এবং ইহা নিম্নস্তরের ভাঁড়ামিতে পূর্ণ। বইটির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সরস চিত্র ডাঃ ভূদেবের চরিত্রটিও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অলীক বাবুর অনুকরণে অঙ্কিত। উপকাহিনীর রসজ্ঞ রোমান্সে প্রধান কাহিনী গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার গান গুলিই প্রধান সম্পদ।

প্রায়শ্চিত্ত (১৩০৮) প্রহসনটিতে বিলাত ফেরত নব্য হিন্দু ও শিক্ষিতা রমণীদের লইয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে। ইহার উপরেও নাকি অমৃতলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। লেখকের মতে ইহা Moliere এর ধরণের comedy, কিন্তু ডাঃ সেন ইহাকে barlesque হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে স্থান দিতে চাহেন না।

পুনর্জ্জন্ম (১৩১৭) সময়ের দিক দিয়া ইহা ঐতিহাসিক নাটকের যুগে রচিত হইলেও প্রহসনের সঙ্গেই ইহার আলোচনা করা সুবিধা। ডাঃ সেন ইহাকে অত্যন্ত লঘু রচনা এবং ইহার প্লট ইংরাজী হইতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া সরাসরি রায় দিয়া দিয়াছেন। কৃপণ দয়াহীন কুসীদজীবীর কি পরিণতি হইতে পারে, রহস্যচ্ছলে তাহাই এই প্রহসনটিতে দেখান হইয়াছে। যাদব চক্রবর্ত্তীর স্বীকারোক্তির ভিতর দিয়া গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়টি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাদব বলিতেছে "মরে ছিলাম, এ আমার পুনর্জ্জন্ম, আজ নূতন বিশ্বাস নিয়ে আবার বেঁচে উঠেছি। মৃত্যুর পর যা ঘটবে আমি চক্ষের সম্মুখে তার অভিনয় দেখলুম।" বাংলা নাটকের ইতিহাস রচয়িতা শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের মতে দারোগা কনষ্টবলের অহেতুক অত্যাচারের কথা প্রকাশ করাও গ্রন্থকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। যাদব বলিতেছে "বাক্ পোড়া রূপের গুঁতোয় প্রমাণ হয়ে গেলো যে আমি যাদব চক্রবর্ত্তীর নই। গুঁতোর চোটে বাবা বলায়—এত তুচ্ছ কথা।"

প্রহসনটির মধ্যে নর্ত্তকীর দৃশ্যটি নিতান্ত নিম্ন রুচির পরিতৃপ্তির সংযোজিত হইয়াছিল।

আনন্দ বিদায়—দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাকে Parody বলিয়াছেন, কিন্তু সমালোচকেরা ইহাকে তীব্র ব্যক্তিগত Satire বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র কলহের পঙ্কিল বারি মন্থনে যে হলাহল উত্থিত হইয়াছিল, তাহারই ফল হইতেছে এই ব্যঙ্গ নাটক। ইহার প্লট ভাল নয়, রুচিও শোভন নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন রচনায় শিক্ষানবিশীর যুগের এই রচনাগুলি দিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিচার করিলে চলিবে না। একজন মানুষের চরিত্রের বিচার করিতে হইলে তাহার দোষ এবং গুণ দুই দেখিতে হয়। সে আদর্শের জন্য যতটা উচ্চে উঠিতে পারে—তাহাও যেমন দেখিতে হয়, সে কতটা হীন হইতে পারে তাহাও দেখিতে হয়। নতুবা বিচার অসম্পূর্ণ হয়। কিন্তু শিল্পী বা সাহিত্যিকের বিচারে আমরা তাঁহার অক্ষম ও অপরিণত সৃষ্টি গুলিকে বাদ দিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলি লইয়াই বিচার করিতে পারি। Shakespeare এর বিচার করিতে হইলে তাঁহার প্রস্তুতির যুগের Titus Andronicus, King Henry VI (first part) Lovis labour lost প্রভৃতি লইয়া বিচার করিলে তাঁহার প্রতি অবিচারই করা হইবে। এই অবিচারের ভয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'প্রভাত সঙ্গীত' 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' এবং 'ছবি ও গান' এর পরের যুগের কাব্য দিয়াই পাঠক সমাজে পরিচিত হইতে চাহিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেকার রচনা গুলিকে তিনি নিজের বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই। যে অতুলপ্রসাদ সেনের গানের কথা আজ ভারত-বিখ্যাত, তাঁহার শিক্ষানবিশী যুগের অপরিস্ফুট সঙ্গীতের রেকর্ড রাখিয়া তাহা দ্বারাই আজ যদি তাঁহাকে বিচার করা হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইত। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিও অন্যায় করা হইবে যদি তাঁহার প্রহসনগুলিকে দিয়া তাঁহার শিল্প প্রতিভা সম্বন্ধে আমরা কঠোর মন্তব্য করি। যে পক্ষি-শাবক ডিম ছাড়িয়া এখনও পক্ষিত্ব প্রাপ্তই হয় নাই, পক্ষিত্বের বিচারে তাহাকে অসম্পূর্ণ বলা ঠিক নহে।

পৌরাণিক নাটক

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রস্তুতির যুগের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি তিনখানি পৌরাণিক নাটক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক নাটক তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না। তাঁহার বস্তুবাদী ইহ-সর্ব্বস্ব মন পৌরাণিক দেব-দেবীর মহিমা প্রচারের পক্ষে উপযুক্ত অধিকারী ছিল না। এই নাটকগুলি দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে একটা মানবিক ভাবাত্মক সুর আনিয়াছে বটে, কিন্তু দেব-চরিত্রের মহিমা অনেক ক্ষেত্রেই হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ ক্ষীরোদপ্রসাদের অথবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সংসর্গ-পুষ্ট গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা পৌরাণিক দেব দেবীর মহিমা কীর্ত্তনে যতটা উপযুক্ত ছিল, যুক্তি-নিষ্ঠ সন্দেহবাদী বিলাত-ফেরত দ্বিজেন্দ্রলালএর কাব্য-প্রতিভা দেব-দেবীর মহিমা কীর্ত্তনে ততটা উপযুক্ত ছিল না।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পৌরাণিক নাটক হইতেছে অহল্যার কাহিনী অবলম্বনে পাষাণী (১৩০৭); এই নাটকের কোনও স্থানেই অহল্যা পাষাণ মূর্ত্তি লাভ করেন নাই সুতরাং নাটকের এই পাষাণী নামটি সার্থক হয় নাই। এই নাটকে গৌতমের চরিত্র ক্ষমা ও প্রেমে অপূর্ব্ব গৌরবের সহিত চিত্রিত হইলেও অহল্যাকে একেবারে ভ্রষ্টা নারী করিয়া দেখান হইয়াছে, ইন্দ্রও কামার্ত্ত লম্পটের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পরিবারও একজন সামান্য চাটুকার মাত্র। নাটকটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত; ডাঃ সুকুমার সেনের মতে ইহা রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র। গানগুলিও নাকি রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি। ইহার চিরজীব ও মাধুরীর ভূমিকাও গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনুকরণ!

দ্বিতীয় নাটক সীতা (১৩০৯) ডাঃ সেনের মতে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ নাটকটি সম্বন্ধে তিনি যা প্রশস্তি দিয়াছেন তাহা হইতেছে "এই পঞ্চম অঙ্ক নাট্যকাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রামায়ণ কাহিনীকে যে কাব্যরূপ দিয়াছেন, তাহাতে কৃতিত্বের পরিচয় আছে।"

ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ভবভূতির সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে লিখিত বলিয়া ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ণনামূলক দীর্ঘ উক্তি আছে, তাহাতে সাধারণ কথাবার্ত্তার স্বাভাবিকতা ব্যাহত হইয়াছে।

কবি ইহার চরিত্রগুলি আধুনিক দৃষ্টি দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেক মৌলিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে পরবর্ত্তী যুগে যিনি মহামায়া জাহানারা প্রভৃতি তেজস্বিনী নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই আবার সীতার চরিত্রও সৃষ্টি করিলেন কি করিয়া? এখানে কবির যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেও তাঁহার মৌলিকতা আছে; সীতা পরিত্যাগ, শূদ্রক বধ প্রভৃতির জন্য তিনি রামচন্দ্রকে দায়ী না করিয়া তাঁহার চরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

তৃতীয় নাটক ভীষ্ম। মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে এই নাটকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সক্ষম হইয়াছেন। এই নাটকে আমাদের প্রাচীন ভারতের এক উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভীষ্মের সংকল্পের দৃঢ়তা ও চরিত্রের উদারতা তিনি বিশেষ নিষ্ঠার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু এই সব পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু তাঁহার "গিরিশ ঘোষ বক্তৃতাবলীতে" যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন পৌরাণিক চরিত্রকে স্বেচ্ছামত নূতন করিয়া গড়িতে যাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক সময় ঔচিত্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন।

এ অভিযোগ খুব মিথ্যা নহে। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির কাহিনীগুলিকে "সিদ্ধরস" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কারণ এই সব কাহিনীর বর্ণিত চরিত্র গুলির রসমূর্ত্তি আমাদের মধ্যে 'সিদ্ধ' বা চিরস্থায়ী হইয়া আছে। নূতনত্বের অজুহাতে বা কল্পনার স্বাধীনতায় এই চিরন্তনী রসমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে একটা "কালাপাহাড়ী" অন্যায় করা হয়। সর্ব্বসাধারণের ভক্তি-ভাজন ব্যক্তিদের চরিত্রে অযথা কলঙ্ক লেপন করিলে আমাদের নীতি রুচি ও রস বোধের উপর একটা নির্ম্মম আঘাত করা হয়। মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদের তুলনায় লক্ষ্মণকে হীন ও কাপুরুষ ভাবে অঙ্কিত করিয়া এই রসভঙ্গের অপরাধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় অপরাধ দ্বিজেন্দ্রলালও করিয়াছেন। ভীষ্ম নাটকে তিনি সত্যবতীর চরিত্রে গভীর কলঙ্ক আরোপণ করিয়াছেন, আজীবন ব্রহ্মচারী ভীষ্মদেবের মধ্যে একটা কাল্পনিক প্রণয় কাহিনীর আরোপ করিয়াছেন, অহল্যা দেবীকে সাধারণ পতিতার পর্য্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছেন। ভীষ্ম নাটকের একটি দৃশ্যে তিনি দেখাইয়াছেন শল্য রাজের অনুচরেরা আসিয়া তাঁহাকে শিয়াল কুকুরের মত বাঁধিয়া ফেলিল এবং শল্যরাজ সেই সুযোগে তাঁহাকে পদাঘাতও করিল। পাষাণী নাটকের একটি দৃশ্যে তিনি দেখাইয়াছেন ঋষি গৃহিণী অহল্যা দেবী ক্ষুধার্ত্ত ক্রন্দনরত শিশুপুত্রদিগকে হত্যা করিয়া ভ্রষ্টা রমণীর মত জারের অনুগমন করিতেছেন! এই গুলি আমাদের চিরাচরিত সংস্কারের উপর অত্যন্ত রূঢ় ভাবে আঘাত করে।

(ক্রমশঃ)

(চিত্রনাট্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

ফেড্ ইন্।

পরদিন প্রভাত। বেলা আন্দাজ ন'টা।

যদুনাথের হল্ ঘরে টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া আছেন: স্বয়ং যদুনাথ, ইউনিফর্ম্-পরা একজন পুলিস ইন্স্পেক্টর এবং ড্রেসিং-গাউন-পরা মন্মথ। যদুনাথের চেয়ারের পিছনে নন্দা পিতামহের কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; ইন্স্পেক্টরের পিছনে দাঁড়াইয়া একজন নিম্নতর পুলিস কর্মচারী খাতা-পেন্সিল হাতে নোট লিখিতেছে; সেবক একটা খালি চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দণ্ডায়মান আছে এবং সতর্ক ভাবে সওয়াল জবাব শুনিতেছে।

খোলা সদর দরজা দিয়া ফটক পর্যন্ত দেখা যাইতেছে।

ইন্স্পেক্টর:—তাহলে চুরি কিছুই যায়নি?

যদুনাথ: না, কিন্তু চোর বাড়ীতে ঢুকেছিল।

ইন্স্পেক্টর: তা বটে। চোরকে আপনারা কে কে দেখেছেন?

মন্মথ: আমি দেখেছি। কিন্তু এক নজর, ভাল ক'রে দেখিনি।

সেবক: আমিও দেখেছি—

ইন্স্পেক্টর: দাঁড়াও, তোমার কথা পরে শুনব। মন্মথবাবু, আপনি চোরের চেহারা কি রকম দেখেছেন বলুন দেখি।

মন্মথ চিবুক চুলকাইতে চুলকাইতে চোরের চেহারা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল। এই সময় নন্দা চক্ষু তুলিয়া দেখিল, একটি অপরিচিত যুবক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। যুবকের গোঁফ দাড়ি কামানো, ধারালো মুখ, শরীর ঈষৎ কৃশ, কিন্তু হাড় বাহির করা নয়। পরিধানে খদ্দর পাঞ্জাবী ও ধোপদস্ত ধুতি। নন্দার বুকের ভিতর ধক্ করিয়া উঠিল, এই কি গতরাত্রির চোর—?

দিবাকর টেবিলের কাছাকাছি আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে একটু কাশিল। সকলে একবার তাহার দিকে চাহিলেন; যদুনাথ চশ্মা খুলিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন।

যদুনাথ: কে তুমি বাপু? কি চাও?

দিবাকর: আজ্ঞে, শ্রীযুক্ত যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

কণ্ঠস্বর শুনিয়া নন্দা দিবাকরকে নিশ্চয়ভাবে চিনিল; সে দাদুর শুভ্র মস্তকের উপর চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের দ্রুত স্পন্দন চাপিবার চেষ্টা করিল।

যদুনাথ: ও—কি নাম তোমার?

দিবাকর: আজ্ঞে, দিবাকর রায়।

যদুনাথ: আচ্ছা, তুমি একটু বোসো, তোমার কথা শুনব।—সেবক!

সেবক শূন্য চেয়ারটা টেবিল হইতে একটু দূরে টানিয়া দিবাকরকে বসিতে ইঙ্গিত করিল; দিবাকর বসিল। কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বিনীত ভাবলেশহীন মুখ লইয়া বসিয়া রহিল। বড় মানুষের বাড়ীতে এমন কৃপাপ্রার্থী উমেদার কত আসে; কেহ আর তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

ইন্স্পেক্টর তাহার প্রশ্নোত্তরের ছিন্নসূত্র তুলিয়া লইলেন।

ইন্স্পেক্টর: হ্যাঁ, চোরের চেহারার কথা হচ্ছিল, (মন্মথকে) কি রকম চেহারা দেখেছিলেন?

মন্মথ: মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফ ছিল—রোগা-পটকা চেহারা—

সেবক অমনি হাত নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল।

সেবক: না না, রোগা-পটকা কেন হবে? চোর কখনও রোগা-পটকা হয়?—কালো—মুস্কো—ইয়া জোয়ান—

দিবাকর নির্লিপ্তভাবে একবার সেবকের মুখের পানে তাকাইল। মন্মথ রুষ্ট হইয়া বলিল—

মন্মথ : তুই কি জানিস? আমি বলছি রোগা-পটকা!

সেবক আবার প্রতিবাদ করিবার জন্ত মুখ খুলিয়াছিল, ইন্সপেক্টর হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন।

ইন্স্‌পেক্টর। মন্মথবাবু, চোরের চেহারা যেমনই হোক, বলুন দেখি, চোরকে দেখলে সনাক্ত করতে পারবেন?

মন্মথ চিন্তিতভাবে এদিক ওদিক চাহিল। নন্দার মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল; দিবাকর কিন্তু নির্বিকার।

মন্মথ : তা ঠিক বলতে পারিনা। বোধ হয় না।

ইন্স্‌পেক্টর : (সেবককে) আর তুমি? চোরকে দেখলে চিনতে পারবে?

সেবক : আপনি নিয়ে আসুন, আলবৎ চিন্‌ব। আমি দেখেছি, ইয়া মুকো জোয়ান—ভুষকুণ্ডি কালো—

ইন্সপেক্টর হাসিয়া যত্নাথকে সম্বোধন করিলেন।

ইন্স্‌পেক্টর : দেখছেন তো, ইনি বলছেন রোগা-পটকা, আর ও বলছে ইয়া মুকো জোয়ান। এ রকম অবস্থায় চোরকে সনাক্ত করার তো কোনও উপায়ই নাই।

সেবক : উপায় আছে দারোগাবাবু। এই যে উপায়।

মেঝে হইতে টপ্‌ করিয়া চোরের জুতাযোড়া তুলিয়া লইয়া সেবক ইন্সপেক্টরের সামনের টেবিলের উপর রাখিল এবং সহর্ষে হাত ঘষিতে লাগিল।

ইন্স্‌পেক্টর : (চমকিয়া) এ কি। বদ্‌ গন্ধ বেরুচ্ছে। কার জুতো?

সেবক : চোরের জুতো। জুঁই ঝাড়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, আমি খুঁজে বার করেছি।

ইন্সপেক্টর রুমাল বাহির করিয়া নাকের উপর ধরিলেন। মন্মথ মুখ বিকৃত করিয়া উঠিয়া গেল এবং ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল।

ইন্স্‌পেক্টর : হুঁ—চোরের জুতো। কম্বল সিং, জুতা লে চলো।…যদি দাগী চোর হয়, হয়তো সনাক্ত করা যাবে।

কম্বল সিং নাক সিঁটকাইয়া আলগোছে জুতাযোড়া তুলিয়া লইল।

যত্নাথ : দেখুন ইন্স্‌পেক্টরবাবু, কাল রাত্রে যে চোর ঢুকেছিল তার জন্তে আমি বেশী ভাবিনে, আমার মনে হয়, ছিঁচ্‌কে চোর, ঘটিটা বাটিটা সরাবার মৎলবে ঢুকেছিল।—

ইন্স্‌পেক্টর : জুতোর অবস্থা দেখে তো তাই মনে হয়।

যত্নাথ : হ্যাঁ। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, আমার বাড়ীতে এক অমূল্য জহরৎ আছে—আমার গৃহদেবতা। আপনি বোধ হয় সূর্যমণির নাম শুনেননি—

ইন্স্‌পেক্টর : বিলক্ষণ। সূর্যমণির নাম কে না শুনেছে? এমন রুবি বাংলা দেশে আর নেই—

যত্নাথ : হ্যাঁ। আমার ভয় সূর্যমণি নিয়ে। কে জানে, হয়তো কলকাতা সহরে যত পাকা চোর আছে সকলের নজর পড়েছে সূর্যমণির ওপর। এখন পুলিস যদি আমার সম্পত্তি রক্ষা না করে—

ইন্স্‌পেক্টর : সকলের সম্পত্তি রক্ষা করাই পুলিসের কাজ। আমরা চেষ্টার ক্রটি করব না। কিন্তু আপনি যদি special protection চান তাহলে কমিশনার সাহেবকে দরখাস্ত করতে হবে।—আজ তাহলে উঠি। চলো কম্বল সিং—

ইন্সপেক্টর নমস্কার করিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন। কম্বল সিং জুতা-যোড়া নাক হইতে যতদূর সম্ভব দূরে টাঙাইয়া লইয়া চলিল। সেবক তাহাদের ফটক পর্যন্ত আগাইয়া দিতে গেল। হলঘরে যত্নাথ নন্দা ও দিবাকর ছাড়া আর কেহ রহিল না।

যত্নাথ অন্তমনস্কভাবে বসিয়া বোধ করি সূর্যমণির বিপদ আপদের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। নন্দা ও দিবাকর গোপনে একবার দৃষ্টি বিনিময় করিল। তারপর দিবাকর উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু রকম গলা ঝাড়া দিল। কিন্তু বিমনা যত্নাথ লক্ষ্য করিলেন না।

নন্দা তখন তাঁহার কানের কাছে নত হইয়া বলিল—

নন্দা : দাদু, ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

যত্নাথ : ও—হ্যাঁ হ্যাঁ। তা—কি দরকার তোমার বাপু?

দিবাকর : (যোড়হস্তে) আজ্ঞে, আপনার নাম শুনে এসেছি—আমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে—

যত্নাথ : অনুগ্রহ! কি অনুগ্রহ?

দিবাকর : আমি শুনেছি জ্যোতিষ শাস্ত্রে আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য। তাই এসেছিলাম ‥যদি আপনি—

যত্নাথ খুশি হইলেন।

যত্নাথ : হ্যাঁ—তা—বোসো বোসো—কি নাম বললে? দিবাকর রায়—ব্রাহ্মণ সন্তান নাকি?

দিবাকর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

যদুনাথ: বেশ বেশ। তা জ্যোতিষ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি বটে। তুমি কোত্থেকে খবর পেলে?

দিবাকর: আজ্ঞে এ কথা কি চাপা থাকে। আমি আপনাকে একটু কষ্ট দিতে এসেছি। আমি বড় গরীব, কাজকর্ম কিছু নেই—আপনি যদি দয়া ক'রে দেখে দেন—আর কতদিন কষ্ট ভোগ আছে। সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে—

যদুনাথ: সময় খারাপ যাচ্ছে? বেশ বেশ। তা ঠিকুজি কুষ্টি এনেছ?

দিবাকর: আজ্ঞে এনেছি।

সে পকেট হইতে কুণ্ডলিত ঠিকুজি বাহির করিয়া দিল। যদুনাথ চশ্‌মা পরিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত জাতচক্র পরীক্ষা করিতে লাগলেন। দিবাকর ভয়ে ভয়ে একবার নন্দার পানে চোখ তুলিল, যেন নীরবে প্রশ্ন করিল—ঠিক হচ্ছে তো? নন্দা একটু ঘাড় নাড়িল।

যদুনাথ: (হঠাৎ) বা বা! এ যে দেখছি মেষ!

দিবাকর: আজ্ঞে মেষ!

যদুনাথ: হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মেষ রাশি মেষ লগ্ন—একেবারে খাঁটি মেষ।

দিবাকর: (ঘাড় চুল্‌কাইয়া) আজ্ঞে আপনি যখন বলছেন তখন তাই। কিন্তু আমার ভাল সময় কবে পড়বে?

যদুনাথ: (কোষ্ঠি দেখিতে দেখিতে) ভাল সময়? হুঁ—বৃহস্পতি গোচরে তোমার ভাগ্যস্থানে প্রবেশ করেছেন: শনি ষষ্ঠে, রাহু একাদশে। বা বা! তোমার তো ভাল সময় এসে পড়েছে হে।

দিবাকর: আজ্ঞে তাই নাকি? কিন্তু কৈ কিছু তা দেখছি না। বরং খুবই দুঃসময় যাচ্ছে, চাকরি বাকরি নেই—

যদুনাথ: ও কিছু নয়, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

দিবাকর: চাকরি পাব?

যদুনাথ। নিশ্চয় পাবে। মেষ রাশি, নবমে বৃহস্পতি, একাদশে রাহু—এ কখনো মিথ্যে হয়! দেখে নিও, শীগ্গিরই তোমার বরাত ফিরে যাবে।

যদুনাথ জন্মকুণ্ডলী দিবাকরকে ফেরৎ দিলেন, চশ্‌মা খুলিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহার কাচ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। দিবাকর কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিল, কিন্তু যদুনাথ আর কিছু বলিলেন না। দিবাকর তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দিবাকর: আচ্ছা, আজ তাহলে আসি। নমস্কার।

অনিচ্ছা মন্থর পদে দিবাকর দ্বারের দিকে চলিল। নন্দা অমনি যদুনাথের কানে কানে বলিল—

নন্দা: দাদু, ওঁকে যেতে দিচ্ছ?

যদুনাথ: অ্যাঁ—কী?

নন্দা: উনি যদি চাকরি না পান, ভাববেন তুমি জ্যোতিষের কিছু জান না।

যদুনাথ: অ্যাঁ—তা—?

নন্দা: তোমার তো একজন সেক্রেটারী দরকার, ওঁকেই রেখে নাও না কেন?

যদুনাথ: ওঃ? আরে তাই তো! ওহে কি বলে—দিবাকর! শোনো শোনো—

দিবাকর এতক্ষণে দ্বার পর্যন্ত গিয়াছিল, এক লাফে ফিরিয়া আসিল।

দিবাকর: আজ্ঞে?

যদুনাথ: হ্যাঁ—ছাখো, আমার একজন সেক্রেটারী দরকার। তুমি পারবে?

দিবাকর: আজ্ঞে পারব।

যদুনাথ: ত্রিশ টাকা মাইনে পাবে, আর খাওয়া-পরা—রাজি?

দিবাকর: আজ্ঞে রাজি।

যদুনাথ: রোজকার হিসেব রাখতে হবে, খুচরো খরচ নিজের হাতে করবে, বাড়ীর সব কাজ দেখাশুনো করতে হবে—দরকার হ'লে বাজার যেতে হবে, ফাই-ফরমাস খাটতে হবে—বুঝলে?

দিবাকর: আজ্ঞে।

যদুনাথ: তাহলে আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। হ্যাঁ, আর একটা কথা। বাইরে থাকা চলবে না, এই বাড়ীতেই থাকতে হবে। ওপরে যে-ঘরে আমার পুরোনো সেক্রেটারী থাকত, সেই ঘরে তুমি থাকবে।

দিবাকর: আজ্ঞে থাকব।

সহসা যদুনাথের মনে সংশয়ের উদয় হইল।

যদুনাথ: কিন্তু—তোমার বিষয় কিছুই জানি নে—তুমি লোক ভাল বটে তো হে?

দিবাকর: (আহতস্বরে) আজ্ঞে আপনি এখনি আমার ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখলেন, আমি ভাল কি মন্দ তা আপনার চেয়ে বেশী আর কে জানে? আপনি তো আমার নাড়ী নক্ষত্র জেনে নিয়েছেন।

যদুনাথ: হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটে। তুমি মেষ। মেষ কখনো ঠগ জোচ্চোর মিথ্যাবাদী হতে পারে না। আমিও মেষ কিনা!

দিবাকর: (পুলকিত) আপনিও মেষ!

যদুনাথ: হুঁ। বেশ তুমি থাকো।—বলেছিলাম কি না যে শিগ্‌গিরই বরাত ফিরে যাবে?

দিবাকর: (যোড়হস্তে) অদ্ভুত আপনার গণনা; বল্‌তে না বল্‌তে ফলে গেল। সত্যিই আমার বরাত ফিরেছে।

যদুনাথ স্মিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পিরানের বোতাম খুলিতে লাগিলেন।

যদুনাথ: নন্দা, দিবাকরকে ওর ঘর দেখিয়ে দে।—আমার স্নানের সময় হ'ল—

নন্দা: (দিবাকরকে) আসুন আমার সঙ্গে।

নন্দার অনুগামী হইয়া দিবাকর সিঁড়ির দিকে চলিল। তাহারা সিঁড়ির পাদমূল পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে এমন সময় মন্মথ খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ড্রয়িংরুম হইতে বাহির হইয়া আসিল। দুই পক্ষের মুখোমুখি হইয়া গেল। নন্দা একটু থতমত হইল।

নন্দা: দাদা, ইনি দাদুর নতুন সেক্রেটারী দিবাকরবাবু।

দিবাকর সবিনয়ে নমস্কার করিল। মন্মথ তাচ্ছিল্য ভরে তাহার দিকে একবার ঘাড় নাড়িয়া কাগজ পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল। নন্দা ও দিবাকর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

ওয়াইপ্‌।

উপরের বারান্দায় নন্দা ও দিবাকর। নন্দার চোখে চাপা উত্তেজনা।

নন্দা: প্রথমটা আমিও আপনাকে চিনতে পারিনি, গলা শুনে চিনলাম। দাদা আর সেবক তো—

সে মুখে আঁচল দিয়া হাসি চাপা দিল।

দিবাকর: ওঁদের সঙ্গে এমন অবস্থায় দেখা হয়েছিল যে—। আমিও ওঁদের চিনতে পারিনি।

নন্দা: (গম্ভীর হইয়া) এটা আমার ঘর; এটা

নন্দার দরজার লাগাও আর একটা দরজা ভেজানো ছিল; নন্দা তা ঠেলিয়া খুলিয়া দিল। ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট; আসবাবের মধ্যে একটা উলঙ্গ খাট, টেবিল ও চেয়ার।

নন্দা: ঘরটা খালি প'ড়ে আছে, বিশেষ কিছু নেই আমি আজই সাজিয়ে গুছিয়ে দেব।

দিবাকর: আর কিছু দরকার নেই; আমা পক্ষে স্বর্গ।

নন্দা: কিন্তু দাদু চান আমরা যে ভাবে থাকি তাঁ সেক্রেটারীও সেই ভাবে থাকবে, ঠিক বাড়ীর ছেলের মতন

দিবাকর: দেবতুল্য মানুষ আপনার দাদু। ওঁ সেবা করবার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।—ওঁ ঘর কোনটা?

নন্দা: দাদু ওপরে শোন না। একে তো বাতে ব্যথার জন্যে ওপর-নীচে করতে কষ্ট হয়, তাছাড়া ঠাকুর নীচে। ঠাকুর ঘরে সূর্যমণি আছে—

দিবাকর: সূর্যমণির নাম শুনলাম নীচে, কী জি বুঝতে পারলাম না।

নন্দা: (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) সূর্যমণি আমাদে গৃহদেবতা।—দেখুন, আমি দাদুর কাছে আপনার সত্যিক পরিচয় লুকিয়ে আপনাকে ভাল হবার সুযোগ দিয়ে একথা যেন ভুলে যাবেন না।

হাত যোড় করিয়া দীনকণ্ঠে দিবাকর বলিল—

দিবাকর: আপনার দয়া কখনো ভুলব না।

ডিজল্‌ভ্‌।

সেইদিন অপরাহ্ণ। খোলা ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া সেবক ও দরোয়ান বাক্যালাপ করিতেছে।

গুর্খা: আজ সুবেরকো পুলিস আয়ি থি। ক্যিব্‌ হুয়া সেবকরামজি?

সেবক: অনেক ব্যাপার হুয়া। দাদাবাবু তো ভেস্তে দিয়েছিল, আমিই শেষরক্ষে করলুম।

গুর্খা: ক্যাসা? ক্যাসা?

সেবক। দাদাবাবু পুলিসকে বললে, চোরটা রোগা-পটকা। আচ্ছা তুমিই বল তো গুরুঘণ্টাল তুমি তো দশ বছর ধ'রে দরোয়ানগিরি করছ, চোর ক

গুর্খা। চোর হাম্ কভি দেখা নেই, সেবকরামজী। হামকো দেখনে সে হি চোর ভাগ্‌তা হায়।

এই সময় বিলাতী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মন্মথ বাহির হইয়া আসিল। গুর্খা স্যালুট্ করিল। সেবক মন্মথর কাছে ঘেঁষিয়া নিম্নস্বরে বলিল—

সেবক। মনে আছে তো? আজ ফিরতে দেরী করেছ—

মন্মথ: আচ্ছা আচ্ছা—

রাস্তা দিয়া একটা খালি ট্যাক্সি যাইতেছিল, মন্মথ তাহাতে চড়িয়া চলিয়া গেল। সেবক গুর্খার দিকে ফিরিল।

সেবক: কি বলছিলে, চোর তোমাকে দেখেই পালিয়ে যায়? ভারি মদ্দ তুমি। কাল তবে বাড়ীতে চোর ঢুকলো কি ক'রে? তুমি যে বন্দুক ঘাড়ে ক'রে পাহারা দিচ্ছিলে, কৈ, ধরতে পারলে না?

গুর্খা: আরে হাম্ কৈসে পাক্‌ড়েগা? চোর ফাটকসে ঘুসা থা থোড়ই।

সেবক: নাই বা ঘুসা থা ফাটক দিয়ে। চোর ধরা তোমার কাজ, তুমি দরোয়ান। ধরনি কেন? তার বেলা এই সেবকরাম।

গুর্খা: ক্যা তুম্ চোর পাকড়াথা?

সেবক: পাক্‌ড়া থা নেই, কিন্তু দেখা থা। আর চোরের জুতো খুঁজে বার কিয়া থা।

গুর্খা: চোর কা জুতা?

সেবক: হ্যাঁ হ্যাঁ, জুতো।

গুর্খা: তো জুতা লেকে তুম্ কা করেগা—চবায় গা? চোর তো ভাগ্ গয়া।

সেবক: দ্যাখ গুরুঘণ্টাল্ সিং, তুমি আমার সঙ্গে বুঝে সমঝে কথা বলবে। চোরের জুতো আমি চিবোব কেন? চিবোতে হয় পুলিস চিবোক্।

সেবক রুষ্ট মুখে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পশ্চিম বাংলার খাদ্য ঘাট্‌তি

শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্ সি, এল-এজি

আমাদের দেশে বিশেষত: পশ্চিম বাংলায় খাদ্য ঘাট্‌তি আছে কিনা এই সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবত: মতদ্বৈধ থাকিবে। কিন্তু যে সকল তথ্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আমরা আলোচনা অভিযোগ করি বা সিদ্ধান্তে আসি সে গুলি গভর্মেণ্টের পক্ষ থেকে আসিলে সাধারণত: আমরা মানিতে চাহিনা, আবার তাহারই উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া যদি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রতিকূল অভিমত দেন তখন আমরা তাহা মানিয়া লই। এইরূপ একদিকে অবিশ্বাস ও আর এক দিকে সহজে বিশ্বাস এই উভয় প্রবণতার সন্ধি স্থলে থাকিয়া আমরা সূক্ষ্মভাবে বিচার না করিয়া কখনও সত্য কখনও মিথ্যা গ্রহণ করিতেছি। এই জন্ত আমাদের বর্ত্তমান গভর্মেণ্টেরও যথেষ্ট ত্রুটি আছে। তাঁহাদের পরি-সংখ্যানগুলি এমনভাবে প্রকাশিত হয় যে সকল তথ্য সুপরিব্যক্ত থাকে না। ফলে আমরা তাহার ভাবগ্রহণ ও ব্যাখ্যা এমনভাবে করি যাহাতে অনেক অনৈক্য প্রবেশ করে। সত্য কথা বলিতে কি গভর্মেণ্টের Statistical Report গুলি প্রধানত: পরিসংখ্যানের ধারাবাহিক তালিকা,—যেন সংখ্যানের সাজান কবিতার স্তবক (Poetry in figures)। সেগুলির সহিত কোনও ব্যাখ্যাই থাকে না। আমাদের দেশের অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহা বিশেষ আবশ্যক যে এগুলি এমনভাবে রচিত হওয়া উচিৎ—যাহাতে ইহা অধ্যয়ন করিবার জন্ত একটা স্বতঃপ্রবৃত্ত আগ্রহ ও আকর্ষণ উৎপাদিত হয়।

সম্প্রতি এইরূপ সংখ্যানের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া দুইটি আলোচনা "ভারতবর্ষে" প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু মনে হয় সে-গুলি বিচারের সময় কয়টি মুখ্য বিষয় অনুপলক্ষিত থাকিয়া গিয়াছে। সেই গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

১। গত বৈশাখের (১৩৫৮) "ভারতবর্ষে" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাম-গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিম বাংলায় ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত Statistical Abstract (1947) হইতে কয়টি পরি-সংখ্যান বিচার করিয়া "পশ্চিম বাংলায় খাদ্য শস্যের ঘাট্‌তি নাই" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার আলোচনা হইতে দেখা যায় যে তিনি ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদন ঘাট্‌তি বাড়্‌তি বিচার করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। কিন্তু সংখ্যানগুলি ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় হইতে লইয়াছেন। অনেকেই হয়তো দেখিয়া থাকিবেন যে গভর্মেণ্টের সংখ্যানগুলি "প্রথম পূর্ব্বাভাষ," (first forecast), "শেষ সংশোধিত পূর্ব্বাভাষ" (final forecast) "নমুনা জরিপ"

survey), "ফসল কাটিয়া উৎপাদন পরীক্ষা" (crop cutting Experiment), প্রভৃতি পর্য্যায় শ্রেণীভুক্ত করিয়া প্রকাশিত হয়।

১৯৪৬-৪৭ সালের পরিসংখ্যান : এই বৎসরের আমন ও বোরো চাউলের সংখ্যানগুলি তিনি "সরকারি পূর্ব্বাভাষ" (official forecast) হইতে লইয়াছেন। কারণ তিনি বলিয়াছেন পূর্ব্বাভাবে প্রদত্ত সংখ্যান অপেক্ষা অন্য সংখ্যান "অনেক অধিক" এবং "সেই হেতু পূর্ব্বাভাবে প্রদত্ত পরিমাণই সমধিক নির্ভরযোগ্য।" কিন্তু আউস চাউলের বেলা sample survey দ্বারা স্থিরীকৃত ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৪শত মণ চাউল ধরিয়াছেন। এইরূপ ভিন্ন নীতি অনুসরণের সুযুক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে তাঁহার এই সংখ্যান যে sample survey তালিকা (Table 4·6A) হইতে লইবার কথা সেখানে

আউসের উৎপাদন দেওয়া আছে…	১১৩৫৬০০০	মণ
তিনি সংখ্যান দিয়াছেন…	১৫৮৭০৪০০	"

তাঁহার সংখ্যানটি official forecast, sample survey, Departmental estimate প্রভৃতি কোনও তালিকায় দৃষ্ট হয় না।

১৯৫০-৫১ সালের পরিসংখ্যান : এই সালের আলোচনা সূত্রে তিনি বলিয়াছেন যে "১৯৫০-৫১ সালে ৮০ লক্ষ ৪২ হাজার একর জমীতে আমন ধানের আবাদ হইয়াছে।—১৯৪৬-৪৭ সালের অপেক্ষা উহা ৬৩০'৩ হাজার একর বেশী এবং এই হিসাবে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ হয় আরও ৭৮ লক্ষ ১৫'৭ হাজার মণ অধিক। মোট খাদ্য শস্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ কোটি ১'৭ হাজার মণ এবং উদ্বৃত্ত হয় ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৬'৪ হাজার মণ। অর্থাৎ তিনি ১৯৫০-৫১ সালের জন্য ১৯৪৬ ৪৭ সালে যে-পরিমাণ জমিতে আমন ধান হইয়াছিল তাহা লইলেন, কিন্তু যে-হেতু ১৯৪৬-৪৭ সাল অপেক্ষা ১৯৫০-৫১ সালে ৬৩০৩০০ একর অধিক আমন জমির আবাদ হইয়াছিল সেই জন্য তিনি তাহার উৎপাদন গণনা করিয়া ১৯৪৬-৪৭ সালের আমনের সহিত যোগ করিলেন। আউস ও বোরোর বেলাও ১৯৪৬-৪৭ সালের উৎপাদন ধরিলেন। গমের বেলা ১৯৪৩-৪৪ সালের জমি ধরিলেন এবং তাহা হইতে মোট জুড়িলেন। তিনি যে ভাবে গণনা করিয়াছেন তাহাতে ১৯৪৬-৪৭ সালে যাহা ধরিয়াছিলেন তাহা সমস্তই রাখিলেন ; কেবল আমন ধানের যে পরিমাণ অধিক জমি ১৯৫০ ৫১ সালে আবাদ হইয়াছিল সেই অধিকটুকু যোগ করিয়া ১৯৫০-৫১ সালের উৎপাদন স্থির করিলেন।

অধ্যাপক মহাশয় যে-নীতি অনুসারেই একবার এক স্থান হইতে ও আর একবার অন্য স্থান হইতে সংখ্যা লইয়া আলোচনা করুন, একথা সকলেই জানেন যে কেবল আবাদী জমির কম-বেশীর উপর ফসলের কম-বেশী নির্ভর করে না এবং যে পরিমাণ জমি আবাদ হয়, উৎপন্ন সেই অনুপাতে কোনোও বৎসরই হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অধ্যাপক মহাশয় যে Statistical Abstract হইতে তাঁহার সংখ্যান লইয়াছেন তাহা হইতেই সংযুক্ত তথ্য দিয়ে দেওয়া হইল :

১নং তালিকা

৪'৪ এবং ৪'৫ বিবৃতি হইতে সঙ্কলিত।

Statistical Abstract West Bengal 1947 pp. 38-39

চাউলের উৎপাদন

বৎসর	আবাদী জমির পরিমাণ (হাজার একর)	চাউল উৎপাদন হাজার মণ
১৯৪২-৪৩	৭২৫৪'২	৫০,৯১০'০
১৯৪৩-৪৪	৮১৫৯'৩	১০১,১১৬'০
১৯৪৪-৪৫	৮২০১'৯	৮৩,৮৭৬'১
১৯৪৫-৪৬	৮০০৫ ৬	৭৩,৬০২'৮
১৯৪৬-৪৭	৯১৫৪'১	১০৮,৫৮৩'৩

এই তালিকার সংখ্যান গুলি প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে ১৯৪২-৪৩ সালে, অর্থাৎ যে-বৎসরের অল্প উৎপাদনের ফলে মন্বন্তর হয় সে বৎসর যে পরিমাণ চাউল উৎপাদন হইয়াছিল তাহার তুলনায় ১৯৪৩-৪৪ ও ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল ; অথচ আবাদী জমির পরিমাণ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হয় নাই। ১৯৪৩-৪৪ সাল অপেক্ষা ১৯৪৪-৪৫ সালে অধিক জমি আবাদ হইয়াছিল কিন্তু ফসল কমই হইয়াছিল। বস্তুতঃ উপরের যে পাঁচ বৎসরের সংখ্যান দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে ১৯৪৬-৪৭ সালের উৎপাদন উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অধ্যাপক মহাশয় এই উৎকৃষ্ট বৎসরেরই সংখ্যানের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার প্রদত্ত দুই বৎসরের ঘাটতি—বাড়তি বিচার করিয়াছেন।

এইভাবে বিচার করিলেও একটি মুখ্য বিষয় তাঁহার অনবহিত থাকিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার হিসাবের মধ্যে বীজের জন্য প্রয়োজন এবং রোগ কীট পতঙ্গাদির জন্য কি পরিমাণে সংস্থান পৃথক রাখা প্রয়োজন তাহা একেবারেই ধরেন নাই। এই জন্য এবং চিড়া মুড়ি, পূজা পার্ব্বণের জন্য শতকরা অন্ততঃ ১০ ভাগ বরাদ্দ রাখা আবশ্যক। এইভাবে বিচার করিলে তাঁহারই প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বৎসরের উৎপাদন হইতে কি নির্দ্দেশ পাওয়া যায় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

২ নং তালিকা।

	১৯৪৬-৪৭ মণ	১৯৫০-৫১ মণ
অধ্যাপক মহাশয়ের হিসাবে মোট তণ্ডুল খাদ্যের পরিমাণ	১০৯২৯৪১০০	১১৭১৯৭০০০
বীজ ও অন্যান্য প্রয়োজন শতকরা ১০% হারে	১০৯২৯৪১০	১১৭১৯৭০০
মোট তণ্ডুল খাদ্যের প্রাপ্যতা	৯৮৩৬৪৬৯০	১০৫৪৭৭৩০০
তাঁহার গণনানুসারে পশ্চিম বাংলার আদি অধিবাসীদের প্রয়োজন	১০৪২৩৩০০০	১০৪২৩৩০০০
উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি	—৫৮৬৮৩১০	+২৪৪৩০০
তাঁহার গণনানুসারে ২৭ লক্ষ উদ্বাস্তুদের প্রয়োজন	১২১১৪০০০	১২১১৪০০০
ঘাটতি বাড়তি	—১৭৯৮২৩১০	—১০৮৬৯৭০০

এখানে আরও কয়টি বিষয় বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ তিনি ১৯৪৬-৪৭ সালের বিচারকালে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা না ধরিয়াই বিচার করিয়াছিলেন কারণ তাঁহার মতে ইহার "সমাধান ভারত সরকারকেই করিতে হইবে" এবং উদ্বাস্তুদের "নির্ভরযোগ্য" কোনও হিসাব গভর্মেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই।" সেই জন্য তাঁহার "ঘাটতির পরিবর্ত্তে উদ্বৃত্ত" দাঁড়াইয়াছিল ৮৮৭০৩০০ মণ। কিন্তু উপরের তালিকা হইতে পরিস্ফুট হইবে যে বীজ প্রভৃতির জন্য যে-পরিমাণে বরাদ্দ প্রয়োজন তাহা এই উদ্বৃত্ত অপেক্ষা অধিক। যথা দৃশতঃ উদ্বৃত্ত—৮৮৭০৩০০ মণ (অধ্যাপক মহাশয়ের

বীজ প্রভৃতির জন্য—১০৯২৯৪১০ মণ গণনায়)।

তাহার উপর উদ্বাস্তুদের প্রয়োজন ধরিলে কি রূপ দাঁড়ায় তাহার সমস্তই উপরের তালিকা হইতে উপলব্ধি হইবে। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে-পরিমাণে আদি অধিবাসী ও উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ধরিয়াছেন, প্রকৃত ১৯৫১ সালের গণনানুসারে ইহা কিছু কম। এই অনুসারে পশ্চিম বাংলার লোক সংখ্যা (উদ্বাস্তু লইয়া) ২ কোটি ৪৭'৯ লক্ষ এবং তাহাদের মধ্যে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ২১ লক্ষ ১৮ হাজার। এই সংখ্যাগুলি দ্বারা কি নির্দ্দেশ পাওয়া যায় তাহাও গণনা করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা নিরর্থক হইবে কারণ অধ্যাপক মহাশয় যে ভিত্তির উপর তাঁহার সংখ্যানগুলি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ত্রুটিশূন্য না করিয়া গণনার কোনও মূল্য নাই।

যাহাতে এই সংখ্যানগুলি যতদূর সম্ভব নির্ভরশীল হইতে পারে সেই জন্য লেখক ১৯৪৬-৪৭ সালের শেষ সংশোধিত তণ্ডুল খাদ্যের পরিমাণ (৯৯১৩২০০০ মণ) আনুমানিক লোকসংখ্যা (২২৯০০০০০) দুই বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের লোক সংখ্যা (২১৯৮৪০০০) সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই মত ১৯৫০-৫১ সালের তণ্ডুল খাদ্যের পরিমাণ (১০৮৪৯২০০০ মণ) সমস্ত লোক সংখ্যা (১৯৫১ সালের গণনানুসারে ২৪৭৯০০০০), দুই বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের সংখ্যা (২৩৭৯৯০০০) সংগ্রহ করিয়াছেন। এই উভয় পর্য্যায়ের দুই বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের দৈনিক ১৫ আউন্স বা বাৎসরিক ৪'২৫ মণ হিসাবে গণনা করিয়া যে নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

৩নং তালিকা

	১৯৪৬-৪৭ মণ	১৯৫০-৫১ মণ
মোট তণ্ডুল খাদ্যের উৎপাদন কৃষিবিভাগ হইতে সংগৃহীত	৯৯১৩২০০০	১০৮৪৯২০০০
বীজ প্রভৃতির জন্য শতকরা ১০% বিয়োগ	৯৯১৩২০০	১০৮৪৯২০০
মোট তণ্ডুল খাদ্যের প্রাপ্যতা	৮৯২১৮৮০০	৯৭৬৪২৮০০
দুই বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের বাৎসরিক ৪'২৫ মণ হিসাবে প্রয়োজন	৯৩৪৩২০০০	১০১১৪৫৭৫০
ঘাটতি বাড়তি	—৪২১৩২০০	—৩৫০২৯৫০

এইখানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে অধ্যাপক মহাশয় বাৎসরিক প্রয়োজন [illegible]

মণ বা দৈনিক ১৫ আউন্স হিসাবেও ধরিলেও এই উভয় বৎসরেই নির্দ্দেশিত হয়। বলা বাহুল্য অধ্যাপক মহাশয় যে হারে ধরিয়াছেন অনুসারে গণনা করিলে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও অধিক হইবে। এই গুলির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ বিশেষ প্রয়োজন; কারণ তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তের উপর যে-সকল মন্তব্য করিয়াছেন সেগুলির প্রয়োজনীয়তা উপরি উক্ত নির্দ্দেশের পর কতদূর ন্যায় বা যুক্তিসঙ্গত তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তিনি বলিয়াছেন "গভর্মেণ্টের পরিসংখ্যান হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে পশ্চিম বাংলায় খাদ্য শস্যের কোনও ঘাটতি নাই।" তিনি গভর্মেণ্টের কর্ম্মচারিদের অযোগ্যতা অসাধুতা অতিলোভ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "দেশের লোককে এই ভুল বুঝান কতকাল সম্ভব হইবে?" এবং "জনসাধারণকে আর কতদিন এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে?"

গভর্মেণ্টের যেখানে ত্রুটি ও অন্যায় আছে সে-সম্বন্ধে আমরা সক্রিয় জনমত সৃষ্টি ও সতর্কতা অবলম্বন করিলে সে ত্রুটি ও অন্যায় বিদূরিত করা অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহার জন্য আমাদের কর্ত্তব্য—যাহাতে জনসাধারণের কাছে সংপৃক্ত তথ্যগুলি নির্দ্দোষ ও বোধগম্য ভাবে উপস্থাপিত করা হয়। সেইজন্য অধ্যাপক মহাশয়ের আরও কয়টি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ আবশ্যক। তিনি বাংলার গত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "ক্লাউড কমিশন তো স্পষ্টই উহাকে 'মানুষের কৃত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।" ক্লাউড কমিশন কিন্তু দুর্ভিক্ষ কমিশনের সম্ভবতঃ চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এবং বাংলার ভূমি রাজস্ব সম্বন্ধীয় তদন্তের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ কমিশনের সভাপতি ছিলেন সার জন উডহেড। সেই দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে কমিশন বলিয়াছেন "...আমাদের যে রিপোর্ট দিতে হইয়াছে তাহাতে শুধু অনাবৃষ্টিই দুর্ভিক্ষের সহজ-বোধ্য কারণ রূপে নির্দ্দেশিত হয় নাই। এই দুস্থতা কতকগুলি জটিল সঙ্কটের সংঘর্ষে উদ্ভূত; এবং প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ও মানুষের ভুল ইহার জন্য দায়ী।" "...We had to report not on Famine due to the obvious cause of drought, but on a calamity resulting from a complicated series of evento for which both natural causes and human error were responsible." বস্তুতঃ আমাদের অনৈক্য ও কলহের জন্য এই দুর্ভিক্ষ দমনের প্রস্তাবিত কমিটি অবধি গঠন করা সম্ভবপর হয় নাই; এবং সেই জন্য কমিশন গভর্মেণ্টের উপর যেরূপ দোষারোপ করিয়াছেন সেইরূপ জনসাধারণ, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক দলাদলি প্রভৃতি সকলের দোষের কথা স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। একস্থানে (পৃ ১০৬) কমিশন বলিয়াছেন "We have criticised the Government of Bengal for their failure to control famine...But the Public of Bengal, or at least certain sections of it have also their share of blame." অর্থাৎ "দুর্ভিক্ষ দমনে অকৃতকার্য্যতার জন্য আমরা গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছি।...কিন্তু জনসাধারণ,—অন্ততঃ তাহাদের কোনও কোনও

শ্রেণীদেরও এই দোষ-ত্রুটির অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।" এইখানে আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্ব আরও অধিক। কারণ তাঁহাদের কথার মূল্য আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ লোক তাঁহাদের কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। দেশের খাদ্য পরিস্থিতি প্রকৃত পক্ষে কি মন্দ সে সম্বন্ধে যাহাতে আমরা সংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে আসিতে পারি সেইজন্য এই জাতীয় আলোচনা যতদূর সম্ভব দোষশূন্য হইতে পারে তাহার প্রতি আমাদের সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

(২)

গত আষাঢ় (১৩৫৮) মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় দুর্ভিক্ষ আলোচনা সূত্রে বলিয়াছেন যে আশু ও বোরো ধান্য "বাদ দিলেও ১০ কোটি মন চাউলে পশ্চিমবঙ্গে অন্নাভাব হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।"

তিনি পূর্ব্বের ২ সের ১১½ ছটাক হারে যে সাপ্তাহিক রেশন দেওয়া হইত তাহা হইতে "প্রাপ্তবয়স্কের বৎসরে প্রয়োজন—৩ মণ ১০ সের" ধরিয়া ২ কোটি ২৫ লক্ষ (প্রাপ্ত বয়স্ক) লোকের প্রয়োজন ৭ কোটি ৬ লক্ষ মণ পাইয়াছেন। এখানে ছাপার একটু ভুল হইয়াছে, কারণ যেখানে ২ কোটি ২৫ লক্ষ হইবার কথা, সেখানে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ছাপা হইয়াছে। তাহা হইলেও এ কথা সত্য যে যদি সকলে এই পরিমাণে চাউল পায় তাহা হইলে ১০ কোটি মণ চাউল হইতে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকিবে। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে দেশের সকল লোককেই রেশনিংএর অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যে-পরিমাণ লোক রেশনিংএর অন্তর্ভুক্ত তাহা সম্পূর্ণ জানা না থাকিলেও কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রীর একটি ভাষণ হইতে নিম্ন লিখিত আভাষ পাওয়া যায় :

৪নং তালিকা

	রেশনিংএর অন্তর্গত লোক সংখ্যা		
	১৯৪৮	১৯৪৯	১৯৫০
	লক্ষ	লক্ষ	লক্ষ
আইন মত (Statutory) রেশনিং	৫২	৫৪	৫৬
রেশনিং এলাকার বাহিরে বড় নিয়োক্তাদের (Large employers)	৮	৮	৮
জেলাগুলিতে বণ্টন	৭	১২	১২
মোট	৬৭	৭৪	৭৬

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে পশ্চিম বাংলার ২৪৭৭৯ লক্ষ লোকের মধ্যে ৭৬ লক্ষ লোক রেশনিংএর আংশিক বা পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত। ইহা শতকরা হারে ৩০.৬% ভাগ বা এক-তৃতীয়াংশেরও কম। এই রেশনিংএর জন্য পশ্চিম বাংলা হইতে যে-পরিমাণে চাউল সংগৃহীত হইয়াছে তাহাও উক্ত ভাষণ হইতে নিয়ে প্রদত্ত হইল।

৫নং তালিকা

বৎসর	চাউল উৎপাদন হাজার টন	চাউল সংগ্রহ হাজার টন	শতকরা হারে সংগ্রহ %
১৯৪৮	৩৪৫২	৪৬৭	১৩·৬%
১৯৪৯	৩৩৪০	৪৩৭	১৩·১%
১৯৫০	৩৫৩৮ (পূর্ব্বাভাষ)	৫৫০ (target)	১৫·৫%

এই দুই তালিকা হইতে দেখা যায় যে পশ্চিম বাংলার এক-তৃতীয়াংশ হইতে কম লোকে রেশনিংএর অন্তর্ভুক্ত এবং তাহাদের জন্য যে পরিমাণ চাউল সংগ্রহ হইতেছে তাহা এক-ষষ্ঠাংশ অপেক্ষাও কম। এইজন্য যে অধিক তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন তাহা কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্ট বিদেশের আমদানি হইতে ব্যবস্থা করিতেছেন।

এই দুই তালিকা হইতে আরও দেখা যায় যে দেশের উৎপন্ন ✓০ আনা অপেক্ষা কম চাউল গভর্মেণ্ট সংগ্রহ করিতেছেন এবং ৸✓০ আনা দেশের লোকের হাতেই থাকিতেছে। বলা বাহুল্য এই ৸✓০ আনা চাউল দেশের বাকি শতকরা ৭০ ভাগ বা ৷৷✓০ আনা লোকের পাইবার কথা। তাহারা প্রকৃত কি পরিমাণে পাইতেছে বা খাইতেছে তাহা প্রধানতঃ তাহাদের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাহা হইলেও এ কথা ঠিক যে তাহাদের খাদ্য প্রয়োজন মিটাইবার পথে রেশনিং এলাকার মত সীমাবদ্ধ চাউলের উপর নির্ভর করিতে হয় না। অন্ততঃ এরূপ কোনও বাধ্যতামূলক অন্তরায় নাই। বস্তুতঃ যে-সকল চাষীদের উৎপাদন তাহাদের পারিবারিক প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক তাহাদের চাউল, আটা, প্রভৃতি কি পরিমাণে প্রতিমাসে খরচ হয় তাহা ১৯৩৯ ও ১৯৪৮ সালে কালনা, কাটোয়া ও বর্দ্ধমান সদরে তদন্ত করা হইয়াছিল। খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আগষ্ট ১৯৫১ সালের Economic Reviewএ প্রকাশিত একটি বিবৃতি হইতে নিয়ে তাহা প্রদত্ত হইল :—

৬ নং তালিকা

খাদ্য সম্ভার	১৯৩৯	১৯৪৮
চাউল	২৩·০৯' সের	২৪·৯৪ সের
আটা	০·৮১' „	০·৬৯ „
ডাল	১·৩৮' „	১·৩৪ „
চিনি	০·৫৬' „	০·৪৬ „
গুড়	২·৫৬' „	২·৫৯ „
সরিষার তৈল	০·৬২' „	০·৬২ „
লবণ	০·৮১' „	০·৯৭ „
কাপড়	১·৭৯' গজ	১·৮৫ গজ

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে চাষীদের মধ্যে যাহারা বেশী চাউল উৎপাদন করিতেছে তাহারা প্রতি মাসে প্রত্যেকে ২৫ সের চাউলের অন্ন খাইতেছে। দৈনিক হিসাবে ইহার পরিমাণ হয় ১৩·৩ ছটাক বা প্রায় ২৭ আউন্স। লেখক গ্রামাঞ্চলের এই জাতীয় চাষীদের সঙ্গে আলাপ

করিয়া অবগত হইয়াছেন যে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ /১। বা ২০ ছটাক (৪০ আউন্সের অধিক) অবধি খায়। সেই তুলনায় রেশনিং অঞ্চল চাউল আটা গম সমস্ত মিলাইয়া সাপ্তাহিক /২ সের বা দৈনিক ৯ আউন্স পরিমাণ পাইতেছে।

অবশ্য ইহাও প্রকৃত যে সকল চাষীই এই পরিমাণে খায় না বা খাইতে পায় না। যাহাদের অবস্থা সচ্ছল তাহাদেরই পক্ষে এই রূপ খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা। তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে অনেকেরই চাউলের সঙ্গতি উপেক্ষণীয় নয়। এই সম্বন্ধে গত ১৯৪৯ সালে ৮ই ডিসেম্বরে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সরকারি বিবৃতি হইতে নিম্নলিখিত তথ্য উদ্ধৃত হইল :—

৭ নং তালিকা

জমির পরিমাণ	চাষী পরিবারের সংখ্যা (লক্ষ)	শতকরা হারে চাষী পরিবার %	ঘাটতি বাড়তি ১০০০ টন (?)
৬ বিঘা হইতে কম	১০·৩৬	৪৪·১%	—৬৯৩
৬ হইতে ৯ বিঘা	২·৭৫	১১·৭%	— ৪৭
৯ „ ১২ „	২·২৬	৯·৬%	+ ৩৬
১২ „ ১৫ „	১·৯৯	৮·৫%	+ ৯৭
১৫ „ ৩০ „	৪·৩২	১৮·৪%	+৫৪১
৩০ „ ৭৫ „	১·৬৫	৭·০%	+৩৬২
৭৫ বিঘার উর্দ্ধে	০·১৭	০·৭%	+১১৫
মোট	২৩·৫০	১০০·০	+১০৩৬

এই বিবৃতির দ্বিতীয় স্তম্ভের সংখ্যানগুলি ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট হইতে গৃহীত। এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে যে-সকল চাষী পরিবারের ৯ বিঘার উপরে জমি আছে তাহাদেরই নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া কমবেশী উদ্বৃত্ত থাকে। এই জাতীয় পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৪৪% ভাগ বা প্রায় ।৶০ আনা। ইহারা যে অধিক পরিমাণে চাউল পাইতেছে ও খাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য ইহাও সত্য যে যাহাদের জমির পরিমাণ ৬ বিঘা হইতে অল্প তাহাদের ঘাট্তি অত্যধিক। তাহাদের গড়পড়তা হারে জমির পরিমাণ ৪ বিঘা হইতে ৫ বিঘা ধরা অন্যায় হইবে না। যদি এই জমির বিঘা প্রতি চাউল উৎপাদন বীজ বাদে ৩৷০ মণ হারে এবং পারিবারিক লোক সংখ্যা ৫ জন করিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে ৫ বিঘা জমি হইতে তাহাদের উৎপাদন হইতেছে ১৫ মন; এবং ছোট বড় প্রত্যেকের মাথাপ্রতি পড়িতেছে ২·৮ মণ বা দৈনিক ১০ আউন্সের কিছু নিম্নে। যাহাদের জমির পরিমাণ ৬ বিঘা হইতে ৯ বিঘা তাহা গড়পড়তা যদি ৭॥ বিঘা ধরা হয় তাহা হইলে তাহারা মাথা প্রতি হারে প্রায় ১৫ আউন্স চাউল পাইতেছে। এই দুই পর্য্যায়ের মধ্যেই ঘাটতি অধিক। তাহা হইলেও ইহাদের মধ্যে যাহাদের জমির পরিমাণ ৬ হইতে ৯ বিঘা তাহারাও যে-পরিমাণে চাউল পাইতেছে তাহা মাথাপ্রতি হারে রেশনিং এলাকার সমস্ত তণ্ডুল খাদ্য অপেক্ষা অধিক।

এইগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে পশ্চিম বাংলার ৸৶০ আনা চাউল দেশের লোকের হাতে রহিয়াছে এবং তাহা ॥৶০ আনা লোকের মধ্যে বিতরিত হইতেছে। রেশনিংএর জন্য যে চাউল সংগৃহীত হইতেছে তাহা দেশের উৎপাদনের এক-ষষ্ঠাংশেরও কম। রেশনিংএর হারে যদি সমস্ত দেশে চাউল ভক্ষণ হয় তাহা হইলে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকিবে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রায় সকলেরই প্রয়োজন ইহা অপেক্ষা অধিক এবং গ্রামাঞ্চলে এই অধিক পরিমাণেই ভক্ষিত হইতেছে। তাহা যদি মাথাপ্রতি ১৫ আউন্স হিসাবেও ধরা হয় তাহা হইলেও আমাদের উৎপাদন যে হারে হইতেছে তাহাতে ঘাটতিই থাকিয়া যায়। ইহা ৩নং তালিকা হইতে উপলব্ধি হইবে।

লেখকের বিনীত নিবেদন যে যদিও আমাদের আলোচিত সংখ্যানগুলি আনুমানিক ইহা তুলনামূলক হিসাবে দেশের অবস্থা নির্দেশক। যে পরিমাণে সংখ্যানগুলি হইতে ঘাটতি সঙ্কেত দৃষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা প্রকৃত অবস্থা কম বেশী হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ঘাটতির পরিবর্তে বাড়তি নির্দ্দেশিত হয় না। এই ঘাটতির প্রবণতা কিরূপ তাহা পূর্ব দুর্ভিক্ষ কমিশন সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন। অনেক অভিজ্ঞ অর্থনীতি বিশারদ, পুষ্টিতত্ত্ববিদ্ এবং বিশেষজ্ঞেরা খাদ্য সঙ্কটের বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অনুনয় করিয়া আসিতেছেন। আমরা ইহা উপেক্ষা করিয়াই আসিয়াছি, এখনও করিতেছি।

পরিশেষে লেখকের নিবেদন যে যদি তাঁহার গণনায় কোথাও ভুল প্রচ্ছন্ন থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হইবেন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আট

অবশ্য অতীত জীবনের মূল অংশটার কিছু সন্ধান পাওয়া গেল না এখনও, তবে বর্তমানের দৈনন্দিন জীবনটা অনেক সহজ হয়ে এল, নয়তো প্রথম ভাগের মতো প্রতিপদে অক্ষর-পরিচয় করিয়ে এগুনো তো সোজা কথ নয়। নূতন কথা শেখবার, জীবনকে চারিদিক দিয়ে দেখবার একটি পরিবর্ধমান কৌতূহল ঠেলে উঠতে লাগল মনের ভেতর থেকে, অতন্দ্র-ভাবে ঘুরে-ফিরে, দেখে-শুনে, কাজ ক'রে, প্রশ্ন ক'রে, পরীক্ষা ক'রে সেই কৌতূহলকে চরিতার্থ ক'রে যেতে লাগল সরমা। বাড়িটি, সংসারটুকু ধীরে ধীরে একটি সুস্মিত মাধুর্যে বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল ওর চারিদিকে, পাশে রইল সুকুমার। দেখে যাচ্ছে ডাক্তারের দৃষ্টি দিয়ে; ওর সফলতায় যা আনন্দ তার পাশে একটি আশা, একটি অপরিস্ফুট ভীরু বাসনাও এসে জমা হচ্ছে।

বীরেন্দ্র সিংকে বললে কথাটা দু-একদিন লক্ষ্য করবার পরই।...আশ্চর্য ব্যাপার নয়? নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই নিজের সংসার পাতবার যেই সুযোগটুকু হোল, অমনি ধীরে ধীরে হারাণো জিনিষ সব যেন ফিরে আসতে লাগল স্মৃতির মধ্যে!

বীরেন্দ্র সিং হেসে বললেন—"আপনারা ভাবেন আপনাদের হোমরা-চোমরা নামওলা ডাক্তারী ওষুধগুলোই যা-কিছু ডাক্তারবাবু, এক আধটা টোটকারও যে কী অসীম ক্ষমতা! স্বীকার তো করবেন না আপনারা।

সুকুমার প্রায় প্রতিদিনের ইতিহাসটুকুই জানায়। অকৃত্রিম সুহৃদ, দুর্দিনে দৈবানুগ্রহের মতোই পাওয়া, জানিয়ে আনন্দ পায়, কৃতজ্ঞতায় মনটি পূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এ আনন্দের ভাগ দেওয়ার মানুষও তো ঐ একটি এখানে। করছেনও যতদূর করা যায়, একটি মোটর সুকুমারের জন্যেই আলাদা করে দিয়েছেন। এদিকে দুবেলাই আসেন আশ্রম আর হাসপাতালের খোঁজ নিতে, অন্তত একবার আসেনই এ-বাসাতে। এরাও দুজনে যায়।

অভিজ্ঞ মানুষ, চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি আছে,—এই যে নিত্য যাওয়া-আসা, নব পরিচিতের সঙ্গে এই যে ঘনিষ্ঠতা—যার গৃহে নবপরিণীতা সুন্দরী স্ত্রী—সংসারের কাছে এর একটা কদর্থও তো দাঁড়িয়ে যায়। সেইজন্য স্বামী-স্ত্রীতে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়েছেন এদের সঙ্গে। সরমাকে বলেন—'বিটিয়া' অর্থাৎ মেয়ে। কথাটা শুদ্ধ হিন্দী নয়, এ অঞ্চলের ঘরোয়া হিন্দী, সেই জন্যেই যেন অন্তরের সমস্ত স্নেহ-মাধুর্য ঢেলে দেওয়া থাকে তার মধ্যে। সরমাও খুঁজে পেতে এখানকার প্রতি-সম্পর্কের কথা দুটি সংগ্রহ করে নিয়েছে, আদরের সম্বোধনে বীরেন্দ্র সিংকে বলে 'বুবুয়া', ওঁর স্ত্রীকে বলে 'মৈয়া'।...বাবা ও মা।

দিন দিন এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে—আগে ছিল একজন বিপন্ন আশ্রয়াগতের প্রতি অনুকম্পা, এখন যে উৎকণ্ঠিত আগ্রহে বীরেন্দ্র সিং রেল দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে নিজের ছেলে আর পুত্রবধূর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন সেদিন, কতকটা সেই ধরণের আগ্রহ নিয়েই সরমার নিরাময়তার দিকে আছেন চেয়ে।

একদিন এই ভাবেরই একটা কথা বেরিয়েও গেল মুখ দিয়ে। সরমার উন্নতির আলোচনাই হচ্ছিল দুজনে, বীরেন্দ্র সিঙের বাড়ির বারান্দাতেই; সরমা গেছে দেউড়ির ভেতরে, বীরেন্দ্র সিং একটু ম্লান হেসেই বললেন—"আমার কি আশঙ্কা জানেন ডাক্তারবাবু?—হাঁ, শত আনন্দের সঙ্গে আশঙ্কাই করে বলব—আশঙ্কা এই যে যে-পথে অল্প অল্প করে, মাঝে মাঝে, এক আধটা পুরাণো স্মৃতির টুকরা বেরিয়ে আসছে বিটিয়ার, সেই পথে সমস্ত ওর অতীত জীবনটাই এইবার সামনে এসে দাঁড়াবে শীগ্‌গির কোন্ দিন।"

একটু বিরতি দিয়ে, আরও একটু স্পষ্টভাবে হেসে বললেন—"আমার, কোন প্রার্থনাই তাড়াতাড়ি মঞ্জুর করেন

না ভগবান, সেই সাহসেই এই প্রার্থনাটা করেছিলাম, ডাক্তারবাবু।"

কথাটার ওপরে-ওপরে আছে হাসিই, সুকুমার উঠল হেসে; কিন্তু ভেতরে ভেতরে আছে অপরিসীম দরদ, বেদনা, তারই স্পর্শে হাসির মধ্যে দুজনেরই চোখের কোণ একটু চক্‌চক্ করে উঠল।

এই আন্তরিকতার স্পর্শেই সুকুমারের ঠোঁট পর্যন্ত একটা কথা ঠেলে এসেছিল—একটা প্রতিজ্ঞা, কিন্তু কি ভেবে, চেষ্টা করেই সেটাকে কণ্ঠের নিচে নামিয়ে দিলে।

সুকুমারও এই আশঙ্কার কথাই ভাবছিল বাড়ি আসতে আসতে। যত উন্নতি হচ্ছে সরমার, এই আশঙ্কাই ধীরে ধীরে ওর মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, অবশ্য বীরেন্দ্র-সিঙের থেকে অন্য ভাবে। সুকুমারের ভয়, সেই জীবন যেদিন সামনে এসে দাঁড়াবে, সেদিন ওরও সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে না কি?…এ-এক মহা বিক্ষোভ মনের মধ্যে—একদিকে কঠোর কর্তব্য, যাদের জিনিষ তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসা, বা সরমা যেখানে ফিরে যেতে চায় সেখানে, আর এক দিকে…

এই অন্যদিকে যা, তাকে ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে অনুভব করছে সুকুমার—জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর একটি নীরব মুহূর্তে—আতপ্ত সমীরে শালমঞ্জরীর মৃদু একটি শিহরণে, নব-বসন্তের একটি অস্ফুট নিঃশ্বাসে, দূর সৈকতে দুটি বন-কপোতের সঞ্চরণে, ঘুম-ভাঙা রাতে অতি দূরাগত নাম-না-জানা কোনও একটি পাখীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে—কখনও কর্মের মাঝে অন্যমনস্ক করে দিয়ে, কখনও আবার অলস অবসরের মধ্যে একটি অব্যক্ত বেদনার আকারে এ-ই তো ধীর-সঞ্চারে সুকুমারের মনটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সুকুমার একে চেনে—যুগযুগান্ত ধরে এর কাছে আর সব কিছুই পরাজিত—ধর্ম, বিবেক, কর্তব্য, ন্যায়—জগতের শ্রেষ্ঠ যা—যে-নাম নিয়েই আসুক, এর কাছে চিরদিনই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছে; চেষ্টা করেছে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু সফল হয় নি।

সুকুমারও করবে চেষ্টা; সরমাকে দেবে ফিরিয়ে, নিয়ে যাবে। সেই জন্যেই তো এত দ্বন্দ্ব মনে। কিন্তু পারবে না।

তাই, বিবেক যাই বলুক, যাতে পারা-না-পারার প্রশ্নই না ওঠে সেই দিকেই প্রয়াস সুকুমারের। হয়তো মনের খুব জ্ঞাতসারে নয়, তবু ক'য়ে যাচ্ছে চেষ্টা। ওর ডাক্তারের মন, এই নূতন অভিজ্ঞতাও কাজে লাগাচ্ছে—বুঝছে, নিবিড় মোহের মধ্যে দিয়ে যদি সরমার মনটা এই নূতন জীবনে ধরে রাখতে পারে তবে চেষ্টার অভাবেই, কৌতূহলের অভাবেই ওর মূল অতীত জীবন চিরকালের মতোই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে এ-জীবন থেকে।…সুকুমার সেই চেষ্টাই করছে, এই জীবনটাকে হাজার রকমে মোহনীয় করে রাখবে সরমার কাছে, যাতে এর ওদিকে দৃষ্টি ফেলবার অবকাশ না হয়। জীবনে কী হারিয়ে এল ভেবে দেখবার ইচ্ছাও না হয়।…নিরতিশয় নিষ্ঠুর ব'লে মনে হয়, একটা ক্রুর যাদুবিদ্যা যেন। কিন্তু কি করবে? ভালোবাসা যে আরও নিষ্ঠুর।

শুধু বাড়ির ছোট গণ্ডীটুকু নিয়েই নয়, দুজনে দুজনকে নিয়েই নয়, জীবনের পরিসর বাইরেও যাচ্ছে ক্রমে বেড়ে। সুকুমার হাসপাতালের কাজে ডুবে থাকে। দুদিক থেকে আরম্ভ করেছে; প্রথমত বীরেন্দ্র-সিঙের প্রতি কৃতজ্ঞতা, সরমা যতই ভালো হয়ে আসছে, সে কৃতজ্ঞতা ততই যাচ্ছে বেড়ে। অন্য দিক থেকে আছে সেবার একটা স্পৃহা। এক সময় সব ডাক্তারই এ স্বপ্নটা দেখে—ছাত্র জীবনে, তারপর জীবন সংগ্রামের হানাহানিতে ফেলে হারিয়ে। দৃষ্টি-কোণই যায় বদলে। সুকুমারের মনে পড়ে কলকাতায় নিজের ডিস্‌পেনসারিতে বসে রোগীর প্রত্যাশায় পথের দিকে চেয়ে চেয়ে কি মনে হ'ত…পাড়ার অন্য ডাক্তারের ওপর মনোভাবটাই বা কি ছিল। সে তো একই মিশনের সহ-যাত্রী নয়, অর্থাগমের পথে একটা অন্তরায় মাত্র। এই জন্যই, নাকি শোনা যায়, পুরাকালে চিকিৎসকদের অর্থ নেওয়া বারণ ছিল, যেমন ছিল শিক্ষাব্রতীদের; দেশের রাজাই এঁদের অন্নবস্ত্র জোগাবার ভার নিতেন। তাই সমাজসেবার এই দুটো জিনিস চিরকালই ছিল ব্রতের আসনে প্রতিষ্ঠিত, কখনও উপজীবিকার স্তরে নামতে হয়নি।

সেই সুযোগটি বীরেন্দ্র সিং দিয়েছেন। একদিনের স্বপ্ন আরও রঙিণ হয়ে ফিরে এসেছে। সেবা করে যেন আশ মেটে না। হাসপাতালে যে সব রোগী ভর্তি হয়ে আছে, নিত্য যারা আসে যায়—ইনডোর আর আউট-ডোরের চিকিৎসার্থী—তাদের ছাপিয়ে তার মনটা বাইরে গিয়ে পড়ে। মনের প্রসারটা দিনদিনই যাচ্ছে বেড়ে—

ইচ্ছা করে বাইরে পর্যন্ত এই সেবাকেই দিই এগিয়ে, চিকিৎসাকে অর্থের গ্লানি থেকে মুক্ত ক'রে।

এটা যে সর্বত্র সম্ভব নয় এ-যুগে, এটুকু স্বীকার করে সুকুমার—জীবনের অন্য দিকও দেখেছে, নিতান্তই একজন আদর্শবিলাসী নয় সে। কিন্তু এখানে যখন সম্ভব, একজন যখন এর জন্যে নিজের অনেক কিছুই পণ করে বসে আছে, তখন জীবনের এ-স্বার্থকতা থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করে কেন?

শেষে একটি সুযোগ পাওয়া গেল, কিন্তু তার পরিমাপটা ভালো হোল কি মন্দ হোল সুকুমার ঠিক বুঝতে পারলে না।

নয়

হাসপাতালে দুজন ডাক্তার, দুটি নার্স, একজন কম্পাউণ্ডার। ইনডোরে রোগীর বিছানার সংখ্যা বারোটি।

ডাক্তারদের মধ্যে একজন এম্. বি; নাম পুরুষোত্তম সাক্সেনা। ইনিই হাসপাতালের চার্জে। অপরটি একজন বাঙালী যুবক, কলিকাতার ক্যাম্বেল-স্কুল থেকে পাস-করা। সুকুমার নিজে একজন এম্. বি।

সে এখানে থাকতে রাজী হলে বীরেন্দ্র সিং যখন তাকে নিয়ে গিয়ে সাক্সেনার সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন, সে লোকটা বাইরে বাইরে বেশ অভ্যর্থনা করে নিলেও, অন্তরে বেশ সন্তুষ্ট হোল বলে মনে হোল না সুকুমারের; বীরেন্দ্র সিং অতটা লক্ষ্য করলেন কিনা বলা যায় না, তবে সুকুমার করলে। মার্জনাও করলে; শিক্ষার দিক দিয়ে এক, তারপর প্রভুর বিশেষ অনুগ্রহভাজন, এমন লোককে যদি সুকুমারকেও অভ্যর্থনা করতে হোত, সেও মনে মনে লাঠিতে তেল মাখাতে মাখাতেই করত।

তার প্রথম কাজই হোল সাক্সেনার মনের ভেতর থেকে সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত করা। কথাবার্তায় নিরুদ্দিষ্ট-ভাবে জানিয়ে দিলে স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য সে বীরেন্দ্র সিঙের অতিথি হয়ে এসেছে—আগে থাকতে পরিচয় ছিল—কিছুদিন এখন থাকতে হবে, তবে স্থায়ীভাবে থাকবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কাজ যে করতে লাগল সেও নিজের দূরত্বটা রক্ষা করে, একরকম প্রতিপদেই সাক্সেনার আদেশ নির্দেশের ওপর নির্ভর করে। আরও একটু নিচু করে রাখলে নিজেকে—একদিন অনুগ্রহপ্রার্থীর মতোই জানালে সাকসেনা একজন অভিজ্ঞ লোক, সুকুমার নিজে নবাগত, তার পরিচালনায় কাজ করতে পাওয়া সে একটা সুযোগ আর সৌভাগ্যই মনে করে।

লোকটার বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ করে গেছে, এর মধ্যে দশবারো জায়গায় চাকরি করেছে, সুতরাং ধীরে সুস্থে বসে, অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সুবিধা কতটুকু পেয়েছে বোঝে সুকুমার। ডাক্তারির নমুনাও দেখে, কিন্তু অনধিকার-চর্চা জ্ঞানে নাক গলাতে যায় না; বরং বিরাগ-বিরক্তিটাকে চাপা দেবার জন্যই নিজের কথাগুলা আরও মিষ্ট করে রাখে।

বাঙালী যুবকটি 'ফিল্ড'-এর আশায় এসেছিল; রোগীর সংখ্যাল্পতা দেখে বিমর্ষ হয়ে থাকে। একদিন মনের কথাটা বলে ফেললে সুকুমারকে—"কোথায় শুনেছিলাম বেহারের এ-সব পাহাড়ে অঞ্চলও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরে ছেয়ে গেছে; এই তার চেহারা মশাই? বারোটি বেড হাসপাতালে—এসে রাজার হালে থাকবে, তাও ভর্তি হয় না।"

হাসি চাপতে না পারার জন্যই সুকুমার বললে—"আগে অসুখ হবে তবে তো রাজ-সুখ?"

"সেই কথাই বলছি; কেস কোথায়? তারপর যদিবা এক আধটা কল্ এল কালেভদ্রে—ইন্‌ডোর হাসপাতাল সম্বন্ধে এদিকে আবার একটা সুপারস্টিশন্ আছে কিনা, বলে যমের বাড়ি যাবার মাঝপথে একটা পান্থশালা—তাই যদিবা এল এক আধটা কল্ তো ঐ সাকসেনাকে ডিঙিয়ে এদিকে আসবার জো আছে?"

ছোকরা টেকল না, মাসতিনেক আগে এসেছিল, সুকুমার আসবার দিন পনের পরে একদিন ইস্তাফা দিয়ে উর্বর 'ফীল্ড'-এর সন্ধানে চলে গেল।

যেটা ছিল কতকটা সখের কাজ, সুকুমারের পক্ষে সেটা দায়িত্বের আকারে এসে পড়ল। ও ঠিক দুঃখিত হোল না, কিন্তু দুঃখিত হবার লোক ছিল।

দিনকতক পরে আরো একটা ব্যাপার হোল। ডাক্তার সাকসেনা অসুখে পড়ে গেল। একলা পড়ে গিয়ে সুকুমারের খাটুনিটা গেল অত্যধিক বেড়ে, কিন্তু অবাধে কাজ করবার

আনন্দে তার শক্তির উৎসও যেন গেল খুলে। এদিকে আউটডোরের দৈনন্দিন রোগী, ইনডোরের ন'টা, তার মধ্যে গোটা তিনেকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন; সাকসেনাকেও দেখতে হয়, তারপর অষ্টপ্রহরের ভাবনা, বাড়িতে সরমা। সে ভালো আছে, একটা না একটা কাজ নিয়েই থাকে, তবু সুকুমারের মনটা ওর কাছেই থাকে পড়ে, মাঝে একটু খোঁজখবর না নিয়ে গেলে যেন অশান্তি লেগে থাকে।

এর ওপর বাইরেও যেতে হয়। সাকসেনার হাতের দুটো কেস আছে, একজন বড় গৃহস্থ, বেশ চাষবাস আছে, আর একজনের বাজারে চালডালের আড়ৎ, সবচেয়ে এখানে যেটা বড়। দুজনেই চারটাকা করে দর্শনী দেয়, সুকুমার সেটা সাকসেনার হাতেই দিয়ে যায়।

সাকসেনা যে খুব সন্তুষ্ট থাকে এমন মনে হয় না সুকুমারের। নীরবে টাকাটা নিয়ে মুখটা ফিরিয়ে নেয়। একদিন জিজ্ঞাসা করলে—"আছে কেমন?···দেখবেন, আমার কেসটা খারাপ করে দেবেন না যেন।"

সুকুমার বললে—"আছে অনেকটা ভালোই।"

"I mean, he can pay." (আমার বলবার উদ্দেশ্য লোকটার টাকা-কড়ি দেওয়ার সামর্থ্য আছে।)

একধরণের অর্থপূর্ণ চাহনি নিক্ষেপ করলে একটু।

সঙ্কেতটা বুঝলে সুকুমার—কেস্ খারাপ করে দেবার মানেটা কি। গাটা ঘিনঘিন করে উঠল, তবে বললে না কিছু।

দুদিন বাঙালী ডাক্তারটির একটা রোগীও দেখে এল। একটি ছোট মেয়ে, বাজারে বাপের একটা কামারশালা আছে; একটি টাকা করে দিত। নিলে সুকুমার, ভেবে দেখলে তার বাজার নষ্ট করবার অধিকার নেই, আরও একজন ডাক্তার যখন রয়েছে।

এরপর আলাদা করে তার নিজের হাতে কেস এসে পড়ল।

আউটডোরের কাজ শেষ করে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে যাবে, দেখলে সিঁড়ির নিচে একপাশে একটি আধবুড়ো গোছের সাঁওতালী দুটি হাঁটু একত্র করে মাথা-গুঁজে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলে—"কে? কি চাও তুমি?"

লোকটা মুখের পানে চেয়ে রইল, বললে—"ডাগডর বাবু"

সুকুমার বললে—"হ্যাঁ, আমিই ডাগডরবাবু, বলো। কি চাই?"

মুখের পানে চেয়েই রইল। সুকুমার একরকম ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে কথাটা বলেছিল, ওর মনে হোল, ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না লোকটার। একজন মালীকে ডাকলে, সে সাঁওতালী, স্থানীয় হিন্দী আর কতক কতক বাংলা মেশান যে একধরণের কথা প্রচলিত আছে এ-প্রান্তে তাইতে বুঝিয়ে বললে। প্রশ্নে উত্তরে যা বোঝা গেল—তা এই যে কোটপ্যান্ট হ্যাট পরে যে ডাক্তারবাবু আছেন, সায়েবের মত দীর্ঘ আর গৌর, সে তাঁকেই চায়। তিনি তার ছেলেকে দেখছিলেন, টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় আজ এগার দিন হোল আর যাননি। ছেলের অসুখ পরশু থেকে বেড়ে উঠছে—তিন হাত দু'মুঠোর জোয়ান ছেলে তার—একেবারেই চ্যাটাইয়ের সঙ্গে মিশে গেছে—গিয়ে দেখতে পাবে কি না জানে না। সে তার হালের মহিষটা বেচে টাকা নিয়ে এসেছে, ডাক্তারবাবু চলুন দয়া করে—না হয় কদিনের দর্শনী আগাম নিয়েই চলুন, শুধু ওষুধপথ্যের দরুণ গোটাকতক টাকা বাদ দিয়ে—তা ডাক্তারবাবু যা দরকার মনে করেন—কেননা তার কাছে ঘরটা ছাড়া বেচবার আর কিছু নেই।

আরও প্রশ্ন করিয়ে সুকুমার টের পেলে, ওর বাড়ি পশ্চিমের পাহাড়টার ওদিকে আরও ক্রোশ দুই দূরে। পাহাড়ে উঠতে হয় না, পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে। পাহাড়টা প্রায় ক্রোশখানেক পথ, এর মাঝামাঝি পর্যন্ত মোটর যাবে, তারপর বরাবর গোরুর-গাড়ি, তার ব্যবস্থা লোকটা করে এসেছে।

দর্শনীর কথা বললে—প্রতি ক্ষেপে দশটা করে টাকা সে দিয়ে এসেছে ডাক্তারবাবুকে।

এদিককার অবস্থাটা জানানো হোল; সে-ডাক্তারবাবু সপ্তাহখানেক থেকে পীড়িত; তার যাবার উপায় নেই। সুকুমার তাঁর জায়গায় কাজ করছে, যদি তার গেলে চলে তো যাবে। তবে দেরী হবে, হাসপাতালে অনেকগুলো কাজ আছে; সেরে নিতে দুপুর গড়িয়ে যাবে।

লোকটা সুকুমারের পা জড়িয়ে ধরলে

ফেলে, তাকে বাঁচিয়ে দিক, 'বোঙা' ঠাকুর তার ভালো করবেন।

সুকুমার আর বাসায় গেল না, যেটুকু সময় বাঁচাতে পারে।

এই সময়টায় সরমা ওর পথ একটু চেয়ে থাকে, মালীকে বললে খবরটা দিয়ে আসতে—তাকে দূরে যেতে হবে, হাসপাতালের কাজগুলা একেবারে সেরেই আসবে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে যখন বাসায় গেল, দেখে সরমা খাতা-কলম নিয়ে বারান্দায় একটা উইকারের চেয়ারে বসে; নিচে ডানদিকে মালী আর বাঁদিকে সেই সাঁওতালী লোকটি। সুকুমার যেতেই ছেলেমানুষের মতো একটা সঙ্কুচিত উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠল।—"আমি সাঁওতালীও শিখব, এই দেখোনা লিখে নিয়েছি—মা কে বলে গো; বাবাকে,—বাবা, ভাইকে, বোয়েহা, বোনকে মিসেরা, ছেলেকে কোরা গিদরে, মেয়েকে কুরি গিদরে, জলকে দা, শোফা ওদের নেই, কথাও নেই; গাছকে বলে দাড়ি; আশ্চর্য নয়? এই আমি এতগুলো লিখে নিয়েছি; শিখব; তুমি কিছু বলতে পারবে না; কেন, বাঃ! তোমার বাংলাও তো শিখছি এদিকে।

বড় ভালো লাগে এটুকু সুকুমারের; কিছু দিন আগে সব ভুলে-ভালে যে শিশু হয়ে গিয়েছিল সরমা—সেই ভাবটা যখন এইরকম হঠাৎ আনন্দে এক একবার ফিরে আসে ক্ষণিকের জন্য। শিশুকে উৎসাহ দেবার মতো করেই চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে খাতার ওপর দৃষ্টি ফেলে একটু হেসে বললে—"দেখি, তাইতো! দু'পাতা ভরিয়ে ফেলেছ। আর বাকিই বা কি?...ও বেচারিদের সম্বলই হদ্দ তিন পাতা কি চার পাতা।"

মালীর কথা শুনে নিজেই লোকটাকে ডাকিয়ে এনেছে সরমা, সমস্ত কাহিনী শুনেছে ওর, ভালো করে নিজে বসে খাইয়েছে, তারপর এই বসে শিক্ষাগিরি করছিল। তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে সুকুমার লোকটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ফিরল রাত যখন সাড়ে ন'টা। মোটর থেকে নামল নিজে, রোগীর বাপ সেই লোকটা, একটি বছর পঁচিশ ছাব্বিশের সাঁওতালী যুবতী—লোকটার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আর একটি শিশু কন্যা। ছেলেটিকে ষ্ট্রেচারে করে খুব সন্তর্পণে নামাতে হোল, অবস্থা খুবই খারাপ, তার ওপর এই পথশ্রমটাও গেল। উপায় ছিল না, এ রোগীকে অতদূরে রেখে চিকিৎসা করার কোন অর্থই হয় না।

পরিণামটা ভালো হোল না কিন্তু—অন্তত সদ্য সদ্য। সাকসেনা বললে এইরকম ক'রে ঘর থেকে রোগী টেনে এনে যদি হাসপাতাল বোঝাই করা হয় তো সে হাসপাতালের ছাপা সে বইতে পারবে না। তার অসুখটা কমে এসেছিল, আবার গেল বেড়ে, ভালো হবার দিন চারেক পরেই কাজে জবাব দিয়ে রাগারাগি করে চলে গেল।

হাসপাতালের সমস্ত দায়িত্বটা এসে পড়ল সুকুমারের ঘাড়ে। সেবাটা এমন করে হঠাৎ শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াতে একটু বেশ বিচলিত হয়েই পড়ল প্রথমটা। (ক্রমশঃ)

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি

কঠিন কাঁকর মাটি প্রান্তরের আবরণ ভেদি,
শেষের সঙ্কীর্ণ সাড়া আজো তবু নাহি পায় যদি,
তবে সেথা নামুক প্রাবৃটের যত আশীর্ব্বাদ,
মরুর দৈন্যের ভাষা শুষ্কতার আনুক সংবাদ।
মধ্যাহ্নের দাহ হ'তে রুদ্রতার যে রূপ উচ্ছলে,
আমি তারে পেতে চাই জীবনের প্রতি কোলাহলে।

নিভৃত দিনের সাঁঝে সঙ্গীহীন বসন্ত ব্যথায়,
নদীর ওপারে যবে রশ্মিরিক্ত দিনান্ত ঘনায়,
তারে যেন ভুলে যাই বিদ্রোহের উচ্চ কলরবে,
প্রাণের প্রাচুর্য্য পূর্ণ যৌবনের বিপুল বৈভবে।
শ্মশান মৃত্তিকা হ'তে স্মরণের কঙ্কালের কাল,
আজি হতে মুছে দিক জীবনের যা কিছু জঞ্জাল।

সোমনাথের দুঃসময়

ধচন্দ্র ঘোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রাক্ মহম্মদ যুগের আরব বণিকগণ সৌরাষ্ট্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিমিত্ত গমনাগমন করিত। তাহারা তখন সৌরাষ্ট্রকে "সোরথ" বলিত এবং সোমনাথের মন্দির ও বিগ্রহ দেখিত এবং তাঁহারা দেব মূর্ত্তি বিরোধী ছিল না। সোমনাথের পূজার জাঁকজমক, ঐশ্বর্য্য, অলৌকিক শক্তি আরবগণকে প্রভাবান্বিত করিত এবং আরবগণ অতি শীঘ্রই সোমনাথের স্থান, আবহাওয়া ও লোকের সহিত এক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িত। আরবগণের ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের পর হইতে তাহাদের মতি-গতি ভিন্ন হইয়া গেল।

একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে আফগানিস্থানে মামুদ গজনীর আবির্ভাব হয়। বালক অবস্থা হইতে তাহার চিত্তে দারুণ সাহস, অদম্য উৎসাহ, এবং নিদারুণ মূর্ত্তিপূজায় বিরোধের ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যৌবনে তিনি পরধন লুণ্ঠনে ও পরধর্ম্মবিনাশের নেশায় মত্ত হইয়া উঠেন। সোমনাথের ধন ঐশর্য্য ও মহিমার কথা তাহার কর্ণে পৌঁছায়, তিনি ভারত লুণ্ঠন ও সোমনাথ ধ্বংসের কল্পনা দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করেন। তিনি সুদক্ষ সৈনিক ছিলেন; ৩০,০০০ দুর্দ্দান্ত সৈনিক সংগ্রহ করিয়া ভারত আক্রমণে উদ্যত হইলেন। ১০২৫ খৃষ্ট সালের হেমন্ত ঋতুতে সেপ্টেম্বর মাসে গজনী হইতে নিক্রান্ত হন, অক্টোবরে ডেরা ইসমাইল খাঁয়ে আসেন। প্রচুর খাদ্য ও পানীয় জল লইয়া শীতকালে বিকানীর, জেসেলমীর ও রাজপুতানার মরুভুমির মধ্য দিয়া সোমনাথের দিকে অগ্রসর হন। সম্বরের নিকট সামান্য যুদ্ধ হয় তাহাতে জয়লাভ করিয়া তিনি আজমীড় নগর ও দুর্গ আক্রমণ ও জয় করেন। আনাহল-পত্তনের রাজা ভীমদেবের নিকট হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া আজমীড়ের শাসনকর্ত্তা জঙ্গলে পলাইয়া গেল, আর মামুদ আনন্দে আজমেড় লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিল। এরূপে রাজপুতানার বড় কয়েকটি রাজ্য লুণ্ঠন করিতে তিনি উত্তর গুর্জ্জরের প্রান্তে উপনীত হন। সহজেই এবং বিনা বাধায় তিনি ভাল-ওয়াদান মধ্য দিয়া ভালাতে উপস্থিত হন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রভাস পত্তনের সীমানায় উপস্থিত হইলেন। গজনীর সুলতান যখন প্রভাসপত্তনের প্রাচীরের অনতিদূরে নিজ সৈন্য সজ্জিত করিতে ছিলেন তখন মাজরোলের রাজপুত বীর অধিপতি পিছন হইতে সুলতানের সৈন্য আক্রমণ করেন এবং ঘোর যুদ্ধ হয়। রাজপুত বীর পরাজিত হন, কিন্তু সুলতানের বহু সৈন্য ক্ষয় হয়।

সোমনাথের মন্দির এক সুদৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যে—পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরে প্রাকার, আর দক্ষিণ দিক উন্মুক্ত নীলাম্বুরাশি। পূর্ব্ব নগর তোরণের ৮০০ হাতের পরে। আর এক প্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত হইয়া বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির, ইহারও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ অপার ঊর্ম্মি-মালা বিধৌত হইত। যখন মামুদের দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য দুর্গ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতেছিল তখনও সোমনাথের সরল, ধর্ম্মবিশ্বাসী, ভক্তিপরায়ণ সেবকগণ ও নগরবাসীগণ মামুদের আক্রমণকে অতি তুচ্ছভাবে লইয়াছিল। তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সোমনাথের ধ্বংস মানব দ্বারা সাধিত হইতে পারে। সোমনাথ তাহাদের সকল আপদ হইতে রক্ষা করিবে বলিয়া তাহার সোমনাথ রক্ষার বিরাট রণকৌশলের ব্যবস্থা করে নাই। ভারত রাষ্ট্রে বিশেষত সৌরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষুদ্র রাজ্যে এমনই বিভক্ত এবং পরস্পর ঈর্যায় এমনই জর্জ্জরিত যে দুর্দ্দান্ত বহিঃশত্রুকে বিতাড়িত করিবার সংহতি তাহাদের মধ্যে আদৌ ছিল না। এখনও একা সৌরাষ্ট্রে ১৩টী বড় রাষ্ট্র ও ১৪০টী ছোট ছোট হিজ হাইনেসেস্ বর্ত্তমান। সর্দ্দার প্যাটেলের কৌশলে সৌরাষ্ট্র এক রাষ্ট্র গোষ্ঠিতে পরিণত হইয়াছে। ভীমদেব মামুদের সঙ্গে একলা যুদ্ধ করিতে অক্ষম হওয়াতে পালাইয়া জঙ্গলে রহিলেন।

সোমনাথ ধ্বংস

যখন প্রভাতের অরুণ আলোকে সোমনাথের ত্রয়োদশতল মন্দির ও তার গগনচুম্বী শিখর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তখন সুলতান মামুদ অগণিত সৈন্যদের মন্দির আক্রমণের আদেশ দিলেন। যখন মামুদের সৈন্য প্রাচীর বাহিতে আরম্ভ করিল তখনও নগরবাসীগণ প্রাচীরের আলিসার উপর হইতে যবন সৈন্যদের বিদ্রুপ করিতেছিল। প্রাচীরের পদতল হইতে ক্ষিপ্র হস্তে ধনুকধারী সুলতান বাহিনী এক একটা করিয়া তাঁহাদের ধরাশায়ী করিতে লাগিল। তখন প্রভাস পত্তনের পৌরবাসীদের চৈতন্য উদয় হইল। তখন সোমনাথের আশীর্ব্বাদ লইয়া সৈন্য-সামন্ত পুরবাসীগণ শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইল। "জয়. সোমনাথ" ধ্বনি সাগর গর্জ্জন ছাড়িয়া উঠিল। সারাদিন যুদ্ধ চলিল, বহু মুসলমান সৈন্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে হাতাহাতি যুদ্ধ করিল, হিন্দুগণ রণকৌশলে মুসলমান সৈন্য অপেক্ষা দুর্ব্বল হইলেও প্রাণদানে পরাঙ্মুখ নয়। সোমনাথের রক্ষার জন্য মরণপণে লড়িতে লাগিল। প্রাচীর উল্লঙ্ঘনকারী মামুদের বহু সৈন্য হত হইল। দিনের শেষে মামুদ রণ-বিরতির হুকুম দিলেন এবং হিন্দুরা যেমন জয়ের আশায় সোমনাথের নিকট ধন্না দিলেন, সুলতান তেমনই ভাবিলেন বিনা আল্লার কৃপায় জয়লাভ করিতে পারিবেন না। তাহার সহিত যে ঐতিহাসিক সহচর ছিলেন তিনি বলেন সুলতান সমস্ত রজনী নেমাজ পড়িয়াছিলেন। পরদিন সূর্য্য উদয় হইবামাত্র সুলতান স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণে সৈন্য পরিচালন করিয়া পরিখা পার হইলেন এবং দুর্দ্দান্ত পাঠান সৈন্যগণ [illegible] পূর্ব্বে তোরণ ভগ্ন করিলেন। বহু হিন্দু হত হইল। এই [illegible] বলেন ৫০,০০০ হিন্দু প্রাণ দিয়াছে। হত সংখ্যা অত্যুক্তি, তবে হ[illegible] সংখ্যা

খুবই বেশী। অনেকে নৌকাযোগে সমুদ্রে পালাইয়া যাইতেছিল সুলতান ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাদের জল-সমাধি ঘটাইল। এইরূপে মামুদ জয়লাভ করিয়া নগর ও মন্দির লুণ্ঠনে মন দিলেন। ঐতিহাসিক ফরিস্তা (Ferishta) লিখিয়াছেন :—

"সুলতান সোমনাথের ৫৬টী স্তম্ভের উপর ত্রয়োদশতল সুদৃশ্য ও কারুকার্য্যময় মন্দির ধ্বংস করিতে তাঁহার হৃদকম্প হয়। কিন্তু প্রকৃত বীরের ন্যায়, একজন আল্লার প্রকৃত অনুরাগীর ন্যায় চিত্তের দুর্ব্বলতা কাটাইয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্তি হইলেন।

বিগ্রহটী মধ্য কক্ষে ছিল, পাঁচ হাত মেঝে হইতে উত্থিত এবং ৩ হাত তাহার বেড়। ইহাতে চক্ষু খোদিত, আর দুই হাত মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত। অন্যান্য অবয়ব খোদিত ছিল না। ইহার গর্ভে রত্ন লুক্কায়িত আছে মনে করিয়া তিনি স্ব হস্তে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, কতক অংশ অগ্নিসংযোগে ধ্বংশ হয় এবং গৌরীপটের কতক অংশ "যামীন-উদ-দৌলা" (সুলতান মামুদ) তাহার লুণ্ঠিত দ্রব্যের সহিত গজনী লইয়া যান এবং জামি মসজিদের প্রবেশ দ্বারের সোপানের ধাপ রূপে ব্যবহার করেন। তোষাখানা সন্নিকটেই ছিল, তথায় বহু স্বর্ণ ও রৌপ্যের দেব-দেবীর মূর্ত্তি পান। মন্দিরের মধ্যে স্বর্ণ শৃঙ্খলে বহুমূল্য রত্নরাজি খচিত ঘণ্টা ও প্রদীপ লম্বিত ছিল তাহা সমস্তই সুলতান সংগ্রহ করেন। ইহার মূল্য প্রায় দুই কোটী 'দীনার' হইবে। সবই সুলতান গজনীতে লইয়া যান।"

উইলসন সাহেব লিঙ্গ মধ্য হইতে রত্ন লুণ্ঠনের কথা যাহা ফিরিস্তা লিখিয়াছেন তাহা সমর্থন করেন না, তিনি বলেন লিঙ্গ নীরেট প্রস্তর ইহার পেটে কিছু থাকিতে পারে না। তবে অল্‌-বেরুনী লিখিয়াছেন যে লিঙ্গর উপর এক সোনার ঢাকা বসান থাকিত, তাহার মধ্যে বহু মহামূল্যবান অনেক মণি-মুক্তা রত্ন শোভা পাইত। সেই সব সুলতান লইয়া গিয়াছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, সোমনাথের মন্দিরের তোরণের প্রত্যর্পণের কথা যাহা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৮৪২ খৃঃ লর্ড এলেনবরা সুলতান মামুদ দ্বারা সোমনাথ লুণ্ঠন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ; তাহাতে তিনি রত্নখচিত তোরণের উল্লেখ খুব জলাও ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাহার কোন সন্ধান নাই এবং আজিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। ইহা এক পাকিস্থানী বিদ্রূপ বিশেষ।

মামুদ সোমনাথ লুণ্ঠন করিলেন সেখানে স্থায়ী রাজত্ব করিবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। ইতিহাসের আর এক মত, তিনি তাঁহার সেনাপতি মিয়াখাঁকে প্রভাসপত্তনে শাসন ও লুণ্ঠনের জন্য রাখিয়া গেলেন। কিন্তু অন্য অন্য ঐতিহাসিকরা বলেন তাহার রাজ্য শাসন করা ইচ্ছা ছিল না। তিনি হিন্দুগণের দেব মন্দির রক্ষা করিবার দৃঢ়তা, সাহস ও প্রাণ বিসর্জ্জনের আকাঙ্খা ও তীব্রতা বড় উপলব্ধি করিয়াছেন। তৎ নিমিত্ত রাজা দেবী সিংকে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া রাষ্ট্র গঠন ভার প্রদান করেন।

পাড়িয়া ছিল, মামুদের দেশগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সৌরাষ্ট্র দখল করিলেন এবং সোমনাথের মন্দির পুনরায় সংস্কৃত হইল তার পূর্ব্ব গরিমায় ও ঐশ্বর্য্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত সিদ্ধরাজ সোলনক—তাঁহার মাতা মিনাল দেবীর আজ্ঞায় তীর্থযাত্রী কর উঠাইয়া দেন। তখন সোমনাথ যাত্রীগণ অবাধে সোমনাথ দর্শনে আসিতে লাগিল।

"প্রবন্ধ চিন্তামণি"তে উল্লেখ আছে সিদ্ধরাজের বংশধর কুমারপাল সোমনাথ মন্দির সংস্কার করিয়া পুরাকালের আদর্শে নির্ম্মাণে রত হন, এবং পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কুমারপালের সময় সোমনাথের মন্দিরটি সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে সমুদ্রতটের ঘাট ও রাস্তা বিধ্বস্ত হইয়া মন্দিরের বনিয়াদ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ভক্তদের স্নানেরও অসুবিধা হয়। কুমার পাল হিন্দু অপেক্ষা জৈন ধর্ম্মানুরাগী বেশী ছিলেন তাই তিনি ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণে উদাসীন। তখন জৈন আচার্য্য হেমাচার্য্যের অনুপ্রেরণায় বণিকগণ রাস্তা ও ঘাট পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং মন্দিরকে নানা রত্ন ও শিল্প ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেয়। কর্ণেল টড সাহেব এক শিলালিপি দ্বারা ইহা বর্ণিত করিয়াছেন।

১২৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলিজির ভ্রাতা আলফাখান সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংশ করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করেন। মামুদের আক্রমণ অভিযানের তিন শত বৎসর পরে মুসলমান সৌরাষ্ট্র ও প্রভাসে স্থায়ী শাসনের ব্যবস্থা করেন। তদানীন্তন রাজা কারণ (আনিহিলওয়াদের) এর যথাসর্ব্বস্ব, সুন্দরী স্ত্রী, যুবতী কন্যা দিল্লীর সুলতান হরণ করেন॥

তাহার পর আবার ভক্তদের উদ্যোগে সোমনাথ মন্দির ও বিগ্রহ পুনরায় স্থাপিত ও নির্ম্মিত হয়, আকবর বাদশার উদার নীতির ফলে সোমনাথের মন্দির আবার গগন চুম্বিয়া মানবকে ভগবানের ঐশ্বর্য্যে ও অবলম্বনে বিশ্বাসী করিয়া তুলিল। ভারত আকাশে হিন্দুদের আবার দুর্দ্দশা হইল—ঔরঙ্গজেব বাদশার সময়।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব বাদসা সোমনাথের ঐশ্বর্য্য ও প্রভাবের খ্যাতি শুনিয়া গুজরাটের শাসনকর্ত্তা মুজাৎখাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন এবং অচিরে মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংসের কড়া হুকুম দেন। সেই বৎসরই মোগল বীরেরা হিন্দুর প্রিয় ও গৌরব সোমনাথের বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংস করেন এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করিয়া দম্ভে চিত্ত পূর্ণ করিল।

ভগবৎ প্রেমের ও শক্তির ধ্বংস হয় না। ভগবৎ প্রেম শাশ্বত, সত্য, সনাতন। সত্যম্‌-শিবম্‌-সুন্দরম্‌-এর উপাসক হিন্দুরা বাহ্যিক বিভূতির অভাবে চিত্তকে ভগবৎ প্রেমে অধিকতর আবিষ্ট করে এবং আরো শুদ্ধ ও উদার হয়। নশ্বর দেহ বা ঐশ্বর্য্য ধ্বংস করিয়া কখনও বিজাতি বা বিধর্ম্মী শাসকগণ হিন্দুর ভগবৎ প্রেমের অনুরাগ বা মানবসেবার শক্তি দমন বা লুপ্ত করিতে পারে নাই। সোমনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহারই অংশের উপর ঔরঙ্গজেবের বাদসা মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দুর মান চিরকাল যে গ্লানির চিহ্ন জাগ্রত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই ধ্বংস ও মসজিদের সন্নিকটে—সাধ্বী ও ভগবৎ প্রেমিকা রাণী অহল্যা বাঈ :—১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সুদৃশ্য মন্দির ও সুমহান সোমনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। আজও শত সহস্র বৎসর হিন্দুর রক্ত চক্ষুকে

উপেক্ষা করিয়া মন-প্রাণে সেই অনাদি জ্যোর্তিলিঙ্গের সেবা-পূজা করিয়া হিন্দু নর-নারী ধন্য হইতেছেন।

ভারত আকাশে নবসূর্য্যোদয়

১৯৪৭ সালে ভারত আবার বিদেশী শাসনের কবল হইতে মুক্ত হইল। নিজস্ব ঐশ্বর্য্য, সুখ, শান্তি, শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম শ্রীবৃদ্ধি সাধনে স্বাধীন ভাবে চিত্ত ও বিত্ত প্রদানে সংকল্প লইল। তখনই ভারতের সর্ব্ব প্রাচীন ও প্রথম বিদেশীয় আঘাতের পীঠস্থান সোমনাথের প্রতি দেশবাসী এবং রাষ্ট্রনায়কদের মন আকৃষ্ট হইল। বৃটিশ শাসনের কালে ধর্ম্ম-নির্লিপ্ত রাজনীতি প্রভাবে সোমনাথের পূজা সেবায় কোন ব্যাঘাত বা অসুবিধা না থাকিলেও জুনাগড়ের নবাবের রাজ্যভুক্ত থাকায় হিন্দুগণ নিজস্ব অধিকারে, মর্য্যাদায় বা স্বাধীন মনে সোমনাথ তীর্থে গমন করিতে চিত্তে তেমন প্রীতি ও শান্তি পাইত না।

ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যে ভারত বা সুপ্রাচীন জম্বুদ্বীপ বিভক্ত হইল। জুনাগড়ের নবাব অহিংসার আওতায় থাকিবার তাহার শক্তি হইল না, তিনি যথাসর্ব্বস্ব, রাজ্য, রাজপ্রাসাদ, বিলাস-ব্যসন এমন কি দু' একটি বেগমকে ফেলিয়া হিংসার রাজ্য পাকিস্থানে পলাইয়া গেলেন।

তখন ভারতবাসী দশ শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা ভাবিল, এ সোমনাথের প্রতি ধূলিকণা আমাদেরই রক্তে হয়েছে রাঙা, আমাদের অস্থি পাষাণের চাপে পিষ্ট হয়েছে। আমাদের সোনার শরীর ধূলি হয়ে হাহাকার রবে ঝঞ্ঝায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। আমাদেরই আঁখিজল সাগরেতে মিশাইয়া আছে। আমরাই দশ শত বর্ষ সোমনাথ প্রভুজীর পূজার ধূপ হয়ে পুড়িতেছি। স্মরণ হইল সেই অপূর্ব্ব দেউলের ছবি। মনে পড়িল বিরাট দেউলের রূপ, ৫৬টী স্তম্ভ অবলম্বনে দাঁড়াইয়া আছে ত্রয়োদশ তল দেউল। মন্দিরের চূড়াগুলি যেন বিধাতার অঙ্গুলি স্বর্গের পথ দেখাইতেছে, স্ফটিকের সোপানে সাগর জল আছড়াইয়া পড়িয়া তীর্থযাত্রীর চিত্তে বিস্ময় ও পুলক সঞ্চার করিতেছে, মনে পড়িল দুই শত মণ সোনার শৃঙ্খলে ঝোলা শত শত ঘৃতের স্বর্ণপ্রদীপের উদ্ভাসিত আলো, আর প্রতি দেউলের চূড়ার তলে তারকার মত উজ্জ্বল মণির জ্যোতি যুগে যুগে যাহা বিপথিক মাঝিকের পথ নির্দ্দেশ করিত। মনে পড়িল মন্দিরের শোভার ছটা, গুণী ভাস্কর খোদিয়া রেখেছে কত শত মোহন মূর্ত্তি, দক্ষ শিল্পী ধরিয়া রেখেছিল শিলা ও পটে, রঙে ও রেখায় কি অপূর্ব্ব লাবণ্য ধারা। দেবের প্রীতি উৎপাদনে কত শত সহস্র কণ্ঠ কক্ষে কক্ষে গাহিত বন্দনা, কত পূজারী রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনি তুলিয়া করিত স্তোত্র পাঠ, কত মৌনী তাপস ধ্যানে ধরিত সোমনাথের সৌম্য-মূর্ত্তি। কত শত দেবদাসীর নৃত্যে, নানা ছন্দের ভঙ্গিমায় আত্ম-নিবেদনের সুর তুলিত। পাঁচ ক্রোশ ব্যাপী সেই বিরাট দেউলের প্রাঙ্গণ ও পত্তন দিবা-নিশি সেই দেবাদিদেবের আরাধনা চলিত, কেহ বাদ্যে ও গীতে তাঁহার ভজনা করে, কেহ বা পুষ্পে ও জলে। এ মহান, মহা পুণ্য তীর্থে আবার সেই অপার অমৃত রস তুলিতে যুগ যুগের পর যে স্বাধীনতা আসিয়াছে তাহা ভুলিল না ভারতবাসী। সত্য, সুন্দর, সৎ কখন লুপ্ত হয় না। পঙ্কের মধ্য হইতেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় পঙ্কজ ফুটিয়া বিশ্ববাসীর চিত্তে সৎ ও শুভ বিকশিত হয়।

সেই ইচ্ছায় ১৯৪৭ সালের ১৩ই নভেম্বর জুনাগড় নবাবের রাজ্য-গ্রহণ উপলক্ষে স্বর্গীয় মহামতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভাস পত্তন উপস্থিত হইয়া যখন সোমনাথের ধ্বংসের উপর দণ্ডায়মান হইলেন তখন ভারতবাসীর পুঞ্জীভূত গ্লানির দুঃখ ব্যথার কথা মনে পড়িল।

সর্দ্দার প্যাটেল সোমনাথের ধ্বংসের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ভারতের পুরাতন সাধনার এক প্রতীক্, সংস্কৃতির উৎস বিশ্বমানবতার পীঠস্থান পুনঃ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, ভারতবাসী উদাত্ত স্বরে সাড়া দিল পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল জামনগরের জামসাহেব দিগবিজয় সিং।

মহারাজ দিগবিজয় সিং শ্রীকৃষ্ণের বংশধর। একথা কল্পনা নহে গবেষণা ও নানা তথ্য সংগ্রহের দ্বারা স্থির হইয়াছে যে জামসাহেব দিগবিজয় সিং শ্রীকৃষ্ণের ১৩৩ অধস্তন পুরুষ। তাঁহার জন্ম ১৮৮৯।

চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। চন্দ্রবংশেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। গণ্ডালের ভুবনেশ্বরী পীঠে শ্রীচরণ তীর্থ মহারাজ এক পুস্তিকায় দেখাইয়াছেন যে বর্ত্তমান জামসাহেব চন্দ্রবংশের ১৮৮তম পুরুষ।

একটি বই-এর দোকান

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কী শীত, কী গ্রীষ্ম, লণ্ডনের যে-কয়েকটি স্থান সব সময়েই জনাকীর্ণ থাকে, ফয়েলের বই-এর দোকান তাদের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর মধ্যে খুচরো বই-এর দোকান হিসাবে এইটিই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় আর বিরাট। এই পুস্তকালয়কে বলা হয় গ্রন্থকীটদের স্বর্গভূমি। বিচিত্র এই গ্রন্থমালা! বিচিত্রএর পরিবেশ আর বিস্ময়কর এর আয়তনের পরিধি। যে-সব অগণিত বইএর শেল্‌ফ এই দোকানে আছে তাদের লম্বালম্বি শোয়ালে ৩০ মাইল জায়গা জুড়ে যাবার সম্ভাবনা। ২৭ বিঘা জায়গা দখল করে আছে এই দোকান। ৩০ লক্ষ বই আছে সর্ব্বসমেত। তাছাড়া আছে একটি ছবির গ্যালারি, একটি রেকর্ড-সঙ্গীত বিক্রয় বিভাগ, একটি বক্তৃতা-গৃহ, একটি বই-পড়ার গ্রন্থাগার এবং মাসের-সেরা বই-এর সমিতি-কক্ষ। প্রতিদিন এই দোকানের কর্ম্মকর্তার কাছে ২০ থেকে ৩০ হাজার চিঠি আসে, আর আসে পৃথিবীর নানা স্থান থেকে বইএর ফরমায়েস।

দোকান তো নয়, যেন বইএর অরণ্য। মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত শেল্‌ফে শেল্‌ফে বই থাকে ঠাসা, ৬[illegible]

এদিকে সেদিকে স্থানে অস্থানে বইএর স্তূপ—যাদের তখনো তালিকাভুক্ত করা হয় নি।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অসংখ্য নরনারী তাদের বই বিক্রয় করবার জন্যে এখানে আসে। লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয় তাদের। তাছাড়া আসে নানা দূর দেশ থেকে বাক্স বাক্স বই। তাতেও শেষ হয় না। তার ওপরেও ফয়েলের ট্রাক্ লণ্ডন ও সহরতলীর চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়ায় আরও বই কেনবার জন্য। এখান থেকে কোন বই, তা তাদের নাম আর নমুনা যেমনই হোক না কেন, ফেরৎ যায় না। সম্প্রতি একজন গীতশ্রী গ্রন্থকার তাঁর বই বেচতে এলেন। দর হল, প্রতিখানা পাচ শিলিং। "আমি যদি প্রত্যেক বইএ নাম সই করে দিই?"—বললেন গ্রন্থকার। "তাহলে ছ' শিলিং।" বেচাকেনা সম্পূর্ণ হল সঙ্গে সঙ্গে।

চ্যারিং ক্রশ রোডে ফয়েলের এক লপ্তে এগারোখানা পুরণো ধরণের বাড়ী। ঘুপ্‌সি ঘুপ্‌সি ঘর, নড়বড়ে সিঁড়ি। নীচু কড়িকাঠ। চারিদিকে যেন একটা ঠাণ্ডা আবহাওয়া। কিন্তু তার মধ্যে আসে না কে? রাণী মেরি আসেন মাঝে মাঝে; সিগার-মুখে চার্চিল সাহেবকে দেখা যায়, তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে কী যেন খুঁজছেন। নোয়েল কাওয়ার্ড স্বীকার করেছেন যে তিনি এখান থেকেই কতকগুলো পুরাণো পত্রিকা ওলটাতে ওলটাতে তাঁর বিখ্যাত বই "কাভাল্‌কেড্"-এর বিষয়বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন। শোনা গেছে, আর্নল্ড বেনেট্ উৎসুক চোখে এখানে ঘুরে বেড়াতেন, সন্ধান করতেন, কেউ তাঁর বই পড়ছে কিনা। তাঁর পকেটে থাকতো ১০০ পাউণ্ডের নোট, কেউ তাঁর বই পড়ছে দেখলে তাকে বখ্‌শিস্ দেবেন, এই ছিল অভিপ্রায়। তাঁর দুর্ভাগ্য, তেমন লোকের দেখা তিনি পান নি।

একদিন এসেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রলোক। ট্রেণে যাবার সময় সময়-কাটাবার জন্যে একখানা যেমন-তেমন বই কিনতে চান তিনি। বিক্রয়-কারিণী মেয়েটি তাঁকে এক কপি "ফরসাইট্ সাগা" গছালে, বললে, চমৎকার বই, এই বই পড়ে মেয়েটি খুব আনন্দ পেয়েছে। ভদ্রলোক বইখানা কিনলেন। তারপর কয়েক মিনিট বাদেই তিনি ফিরে এসে সেই বইখানা মেয়েটির হাতে ফিরিয়ে দিলেন; বইখানার প্রথম পাতায় তিনি লিখে দিয়েছেন; "যে মেয়েটি আমার বই পড়ে আনন্দ পেয়েছে, তাকে দিলাম।—জন গল্‌স্‌ওয়ার্দি।"

যুদ্ধের সময় এই দোকানে প্রত্যহ গড়পড়তা দশ হাজার বই বিক্রয় হয়েছে। যে-সব অসংখ্য লোক প্রত্যহ এই দোকানে আসে তারা যে প্রত্যেকে বই কেনে তা নয়। কেউ কেউ তাদের দ্বি-প্রহরের খাবার সঙ্গে আনে এবং সারাদিন এখানে বসে বই পড়ে। যে-কোন বই পড়বার জন্য এখানেই পড়তে পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে ফয়েলের দোকান অবারিত-দ্বার। কলেজের যে সব ছাত্রদের পাঠ্য বই কেনবার সঙ্গতি নেই তারা অবাধে এখানে এসে পড়ে। কিছুদিন আগে শ্রমিক-নেতা হার্বার্ট মরিসনের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ এক ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র পেয়েছেন, ছেলেবেলায় মরিসন যখন গরীব ছিলেন তখন এখানে বসে তিনি পড়াশোনা করবার যে প্রচুর ও বাধাহীন সুযোগ পেয়েছিলেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

এই দোকানের মালিক ৬০ বছরের বৃদ্ধ উইলিয়ম অ্যালফ্রেড ফয়েলের অসামান্য কর্ম্মকুশলতাই এই ব্যবসায়ের ভিত্তি। সামান্য অবস্থা থেকে ফয়েলের জীবন আরম্ভ। যৌবনের প্রারম্ভে কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক বিক্রয় ক'রে ফয়েল আর তাঁর ভাই গিল্‌বার্ট যে সামান্য টাকা সংগ্রহ করেন তাই দিয়ে তাঁদের বই-এর ব্যবসার সূত্রপাত হয়। সে আজ থেকে ৪০ বছর আগেকার কথা।

বর্ত্তমানে ফয়েলের পুস্তকালয় এক বিরাট ব্যাপার। প্রতি মাসে এই প্রতিষ্ঠান থেকে সে-মাসের সেরা বই নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয় তার বাঁধা খরিদ্দার আছে পঁচিশ হাজার। প্রতি মাসে গ্রন্থকারদের সম্মানিত করবার জন্য ফয়েল একটি ক'রে ভোজ দেন। সেও এক মহাসমারোহের কাণ্ড। প্রায় দু' হাজার লোক সেই ভোজ সভায় যোগ দেয়।

সস্তাদরে মূল্যবান পুরনো বই খুঁজে খুঁজে ক্রয় করার কাজে ফয়েলের দক্ষতা অপরিসীম। বাজে বইএর দাম কী ক'রে বাড়াতে হয় সে কৌশলও ফয়েল বিলক্ষণ জানেন। একবার তিনি বার্নার্ডশর কতকগুলি চিঠির একটি সংকলন-গ্রন্থ ৪০০ ডলার দামে এক ক্রেতাকে বিক্রয় করেন। কিছুদিন পরে ক্রেতা জানতে পারলেন যে চিঠিগুলি অপদার্থ, জাল, আসলে সেগুলি বার্নার্ডশর লেখাই নয়।

ক্রেতা যখন এসে ফয়েলকে সে-কথা জানালেন তখন তৎক্ষণাৎ বইখানা ফিরিয়ে নিয়ে ক্রেতাকে টাকা ফেরৎ দিলেন তিনি। তারপর তিনি সেই পাণ্ডুলিপি বার্নার্ডশর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। বার্নার্ডশ সেই পাণ্ডুলিপির ওপর এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখলেন এবং নানা ব্যাখ্যা নানা উপমা নানা ভঙ্গীর দ্বারা প্রমাণ করলেন তাঁর লেখার সঙ্গে সেই নকল লেখার কোথায় কী ভাবে এবং কতখানি ফারাক্। ফয়েল তখন বার্নার্ডশর মন্তব্য-সম্বলিত সেই জাল-পত্রাবলী বিক্রয় করলেন হাজার ডলার দামে।

কিছুদিন আগে কয়েকজন ব্যবসায়ী তাঁর বইএর দোকানটি কিনতে চেয়েছিলেন এবং দাম দিতে চেয়েছিলেন, ১০ লক্ষ পাউণ্ড। ঘাড় নেড়ে ফয়েল শুধু বলেছিলেন—"কী হবে ওতে। আমার বইগুলি এবং বইএর পোকাগুলি ব্যতিরেকে আমি করব কি?"

মহাজীবনের মহানাট্য

(ওবারামারগাওয়ের 'প্যাশান প্লে')

শ্রীনরেন্দ্র দেব

নাম তার ওবারামারগাও।

তুষার-শিখর আল্পস পর্বতের উত্তরে, জার্মানির দক্ষিণ সীমান্তে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, তুলিতে আঁকা ছবির মতো সুন্দর এই গ্রামখানি। আশে পাশে ঐতিহাসিক দুর্গমালা। ব্যাভেরিয়াপতি দ্বিতীয় লাডভিগ্ (Ludevig. I.) এগুলি নির্মাণ ক'রেছিলেন।
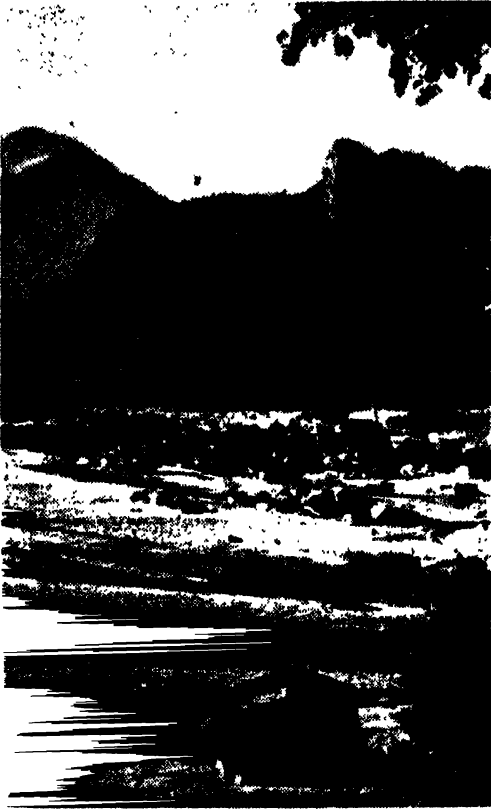
ওবারামারগাও গ্রাম

তিনশো আঠারো বছর আগে এই গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা মিলে একদা এক আশ্চর্য নাট্যাভিনয় করেছিলেন। সে অভিনয় বিগত তিন শতাব্দী ধরে প্রতি দশ বৎসর অন্তর এখানে অভিনীত হ'য়ে আসছে। এদের এ অভিনয় শুধু অভিনবই নয়, এমন বিশেষত্বপূর্ণ যে এর সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের কোনও অভিনয়েরই তুলনা করা চলে না। নিজেদের বিশেষ একটি স্বকীয়তা এবং আদর্শবাদকে ভিত্তি ক'রে এই প্রাচীন ঐতিহাসিক অভিনয়টি পৃথিবীর মধ্যে স্বীয় মহিমায় প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মুখে প্রথম এই অভিনয়ের বিবরণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হ'য়ে শুনেছিলাম। কবি সেবার য়ুরোপ ভ্রমণের

গ্রামের পথে অভিনয়
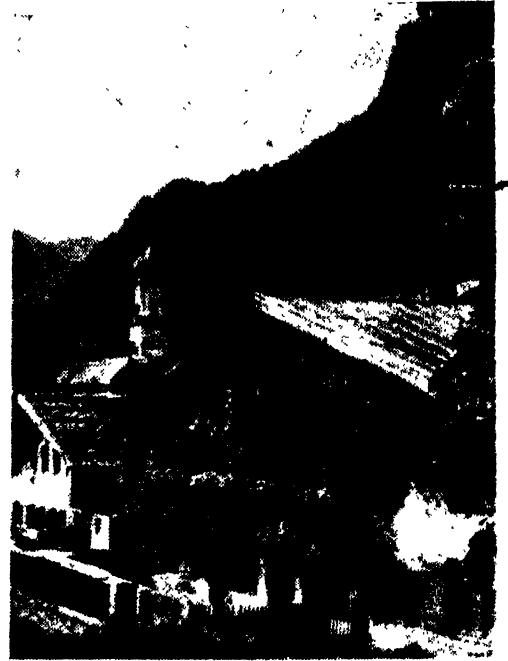
অবকাশে জার্মানির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একটি ছোট গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের এই অদ্ভুত কীর্তি দেখে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আনন্দে অভিভূত হয়ে এসেছিলেন কবি। পৃথিবীর সকল দেশের নাট্যরসপিপাসু ও ধর্মানুগত নরনারী পরম আগ্রহে এই অভিনয় দেখে অর্থব্যয়ে ছুটে আসেন তাঁরা এই গ্রামে—

বৎসর অন্তর। এই অভিনয় সারা বিশ্বে ওবারামার-গাওয়ের "প্যাশান প্লে" বলেই খ্যাত। তাঁরা এ অভিনয় দেখে গিয়ে বলেন—'ওয়াণ্ডারফুল!—এমনটি আর কোথাও

আমাদের জার্মান সঙ্গিনী

দেখিনি!' কবির দৃষ্টিকেও এ অভিনয় যে সম্মোহিত করেছিল সেটা আমরা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম কবির সেই
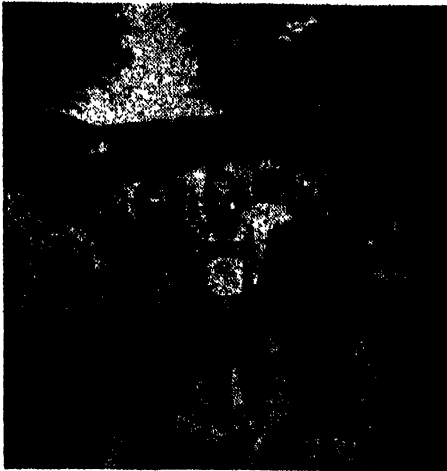
সবারই দেখি লম্বা দাড়ি গোঁফ, আর মাথায় বাবরি চুল

অভিনয় দর্শনার উচ্ছল আবেগ দেখে। সেই থেকে মনের এক কোণে অজ্ঞাতে বাসা বেঁধেছিল এই বাসনা যে, দেখে আসতেই হবে এ অভিনয় একবার—যেমন ক'রেই হোক।

সেবার জার্মানিতে এই অভিনয় দেখবার সময়ই কবির প্রতি হঠাৎ দর্শকদের দৃষ্টি পড়ায় তারা চকিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল—"দি খ্রাইস্ট!" "দি খ্রাইস্ট!"

প্রেক্ষাগৃহ

—যীশুখৃষ্ট স্বয়ং এসেছেন তাদের অভিনয় দর্শন করতে এই তাঁরা মনে করেছিলেন কবিকে দেখে।

লাঙ্গার পরিবার (বৃদ্ধ-জোসেফ্ লাঙ্গার ও তাঁর পত্নী ক্যাথারীনা, কন্যা এলিজাবেথ, জামাতা হ্যান্স্, নাতিনাতনীরা এবং পুত্র ও পুত্রবধূ)

১৯৫০ সালে মে মাসে—দীর্ঘ সতেরো বছর পরে—ওবারামারগাওয়ে 'প্যাশান-প্লে' আবার অনুষ্ঠিত হবে খবর পেয়ে আমরা টমাসকুকের দ্বারস্থ হয়েছিলাম প্রবেশ-পত্রের জন্য। ওখানে চার রকম আসন থাকে। প্রথম শ্রেণীর মূল্য প্রত্যেকখানি ১৫ মার্ক, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১২ মার্ক, তৃতীয় শ্রেণীর ৯ মার্ক এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৫ মার্ক। জার্মাণ এক মার্কের ভারতীয় মূল্য প্রায় এক টাকা চার আনা। আমাদের আবেদনের উত্তরে টমাসকুক্ দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে একখানি টিকিটও অবশিষ্ট নেই। সমস্ত বিক্রী হয়ে গেছে!

কলকাতায় হতাশ হয়ে বোম্বাইয়ে চেষ্টা করলেম। সেখানেও ঐ একই উত্তর! লণ্ডনে বার্ক্‌লে স্ট্রীটের হেড অফিসে গেলাম—সেখানেও 'সরি, অল টিকেটস্ সোল্ড্!' তখন বুঝলাম—আমাদের ভাগ্য-দেবতা বিমুখ। এরপর 'দুপুর রাতের সূর্যোদয়' (Mid-night-Sun) দেখবার এবং নরওয়ের সমুদ্র খাঁড়িতে (Fjord) নৌবিহারের লোভে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় প্রায় একমাস ঘুরেছি, প্যাশান প্লের টিকিটের আর কোনও চেষ্টাই করিনি। ও আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। আরও মাসাধিককাল পরে আমরা যখন সুইজারল্যাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছি সেই সময় দেখা হ'ল ওখানে একজন পরিচিত বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে। তিনি জার্মাণী ঘুরে সুইজারল্যাণ্ডে এসেছেন

"ভূমিবাস" (Landhaus)
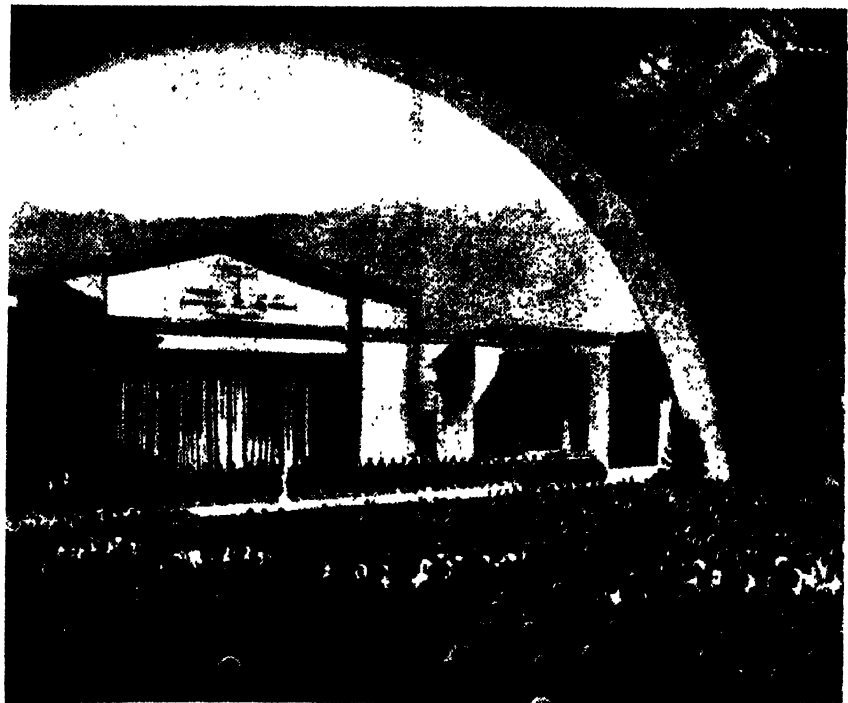
বিরাট রঙ্গপীঠের উপর পঞ্চাশজন গায়ক 'প্যাশন প্লে'র উদ্বোধন সঙ্গীত গাইছেন। বিশাল প্রেক্ষাগারে পাঁচ হাজার দর্শকের মাথা দেখা যাচ্ছে

বেড়াতে। জার্মাণীর অবস্থা কেমন দেখে এলেন জিজ্ঞাসা করায় কথাপ্রসঙ্গে 'প্যাশান-প্লে'র কথা উঠলো। তিনি

সস্ত দেখে এসেছেন। ক্ষেপিয়ে দিলেন আমাদের আবার সেই অভিনয়ের বিশদ বর্ণনা শুনিয়ে। বললেন—চলে যান আপনারা একেবারে সটান ওবারামারগাও। সেখানে গেলে টিকিট পাবেনই। কারণ, শেষমুহূর্তে অনেকেরই আসা হয় না বলে প্রায় প্রতিদিনই বহু টিকিট ক্যানসেল হ'য়ে যায়। সেইগুলো আপনারা পেতে পারেন। গিয়েই যদি তখনই টিকিট না পান হতাশ হবেন না। দু'চার দিন সেখানে থেকে যাবেন। ইতিমধ্যে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই টিকিট যোগাড় হবে। জার্মান্‌রা ভারী অতিথি-বৎসল। কোনও

যীশু খৃষ্টের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত আন্তন প্রায়সিংগার
(Anton Preisinger)

মেরী মাতার ভূমিকায় কুমারী এ্যানিমারী মায়ার
(Annemar-rie Mayr)

কষ্ট হবে না, বরং, সেখানে থাকতে বেশ ভালই লাগবে। 'ওবারামারগাও' নামটাই চার্মিং! আল্পসের ঢালু প্রান্তে বনশ্রীতে ঢাকা সুন্দর গ্রামখানি। শান্ত, স্নিগ্ধ তার পরিবেশ। গ্রামবাসীরা সবাই প্রায় শিল্পী ও কারিগর। ছেলেবুড়ো প্রত্যেকেই তারা অতি সজ্জন। চলে যান আপনারা।

'চিয়াজো' হ'য়ে আমাদের 'ভিনিস' যাবার টিকিট কেনা ছিল। বিদেশী বন্ধুর মুখে 'প্যাশান প্লের' প্রবেশ পত্র পাওয়ার

কাইফাস (য়িহুদী পুরোহিত) Mr.Stuckl Benedikt Jr.

সম্ভাবনা আছে শুনেই দিলুম তা cancel করে। দৌড় দিলুম জুরিখ থেকে একেবারে সোজা অস্ট্রীয়ার ইন্‌সব্রুক্ শহরে। কারণ, খোঁজ খবর করে জানা গেল যে ওখান থেকে মোটরকোচ্ ধ'রে ওবারামারগাও যাওয়াই নাকি সবচেয়ে সুবিধার। তাছাড়া, অস্ট্রীয়া ও জার্মানি বেড়িয়ে আসবার লোভটাও ছিল আমাদের প্রচণ্ড। ভিয়েনার নাম শুনে আসছি স্কুলের পাঠ্যাবস্থা থেকে। সঙ্গীতে, শিল্পে,

•• সূত্রধারের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত এ্যালয় ল্যাং (Alois Lang)

নাট্যকলায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে ও ধর্মানুশীলনে অস্ট্রীয়া একদিন য়ুরোপের শীর্ষস্থানে পৌচেছিল। মারিয়া থিরেসার রূপ-গুণের ঐন্দ্রজালিক প্রভায় ভিয়েনার রূপান্তর রূপকথার মতই চিত্তাকর্ষক। আর রাইন নদী তীরের সেই জার্মানি—তার ব্যাভেরিয়া, প্রাশিয়া, হ্যানোভার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অঞ্চল, ফ্রেডরিক দি গ্রেট, কাইজার উইল্‌হেলম্, মনীষী বিসমার্কের দেশ—সে যে বিশ্বের বিস্ময়! এই সেদিনও হের হিটলার যে দেশকে 'ভুবন-ত্রাস' করে তুলেছিলেন—সেই দিগ্বিজয়ী

আনাস্ (বৃদ্ধ পুরোহিত) Mr Klucker Jakob

নেপোলিয়ন তুল্য মহাবীরের মিউনিকে অবস্থিত 'বিয়ার সেল্' না দেখে কি য়ুরোপ থেকে ফেরা যায়?

ইনস্‌ব্রুকে পৌছে এই নগরীর অপরূপ রূপ দেখে

অভিনয় শেষে ফেরার পথে—প্রেক্ষাগৃহের পাশে

একেবারে আনন্দে বিস্ময়ে যেন অভিভূত হয়ে ...ুম। ছোট্ট শহর। অষ্ট্রীয়ার টাইরোল অঞ্চলের প্রধান জনপদ। স্বচ্ছসলিলা ইন্ নদীর সবুজ তীরে ...ন্দর পরিবেশের মধ্যে এই শহরটি গড়ে উঠেছে। ...গর উত্তুঙ্গ পর্বতমালা পরিবেষ্টিত এই নগরটি যেন আঁকা একখানি মনোহর চিত্রের মতই চিত্তাকর্ষক! ...টি বড়ই ভাল লাগলো। কাশ্মীরের 'শ্রীনগর'কে ...ছিল! দিন দুই এখানে থেকে গেলুম আমরা। ...পর, এখান থেকে 'ওবারামারগাও' যাবার 'মোটর-রওনা হলুম একদিন লাঞ্চের পর। সারাদিন আঁকাবাঁকা পথে ঘুরে ঘুরে কত বিচিত্র ...তর দিয়ে সেই অবিস্মরণীয় যাত্রা। একবার ... আবার নেমে এসে পাহাড়ের বুক চিরে ...র ভিতর দিয়ে শৈলমালার কোল ঘেঁসে ... সরোবরের তীর বেয়ে চলেছে আমাদের ...সর উপত্যকা ও দুর্ভেদ্য পর্বতমালা উত্তীর্ণ ...য়ার সীমান্ত লঙ্ঘন করে প্রায়-দিনান্তে আমরা জার্মাণ দেশের মাটিতে এসে পৌছলাম। পথে তিনবার আমাদের পাশপোর্ট ও ভিসা পরীক্ষা হ'ল। সুইশ বর্ডারে একবার—অষ্ট্রীয়ার বর্ডারে একবার ও জার্মাণ বর্ডারে একবার। এগুলো আমরা লণ্ডন থেকেই সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলাম। ইণ্ডিয়ার হাই কমিশানার অফিসের একটি প্যাসেজ ও পাশপোর্ট শাখা আছে ৯নং ক্লিফোর্ড ষ্ট্রীটে। শ্রীযুক্ত শর্মা এখানকার কর্ণধার। ইণ্ডিয়া হাউসের ল' অফিসার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সার ধীরেন্দ্র মিত্রের অনুরোধে তিনি আমাদের সর্বপ্রকার সাহায্যই করেছিলেন। এঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত ভদ্র। শ্রীযুক্ত শর্মা তাঁর অফিসের একজন ইংরেজ কর্মচারীকে দিয়ে আমাদের পাশপোর্টের জন্য ফটোগ্রাফ তোলানো, সমস্ত Application Form সই করানো, সবকিছু যথাসম্ভব সত্বর করিয়ে ঠিক যাত্রার আগের দিন 'পাশপোর্ট' একেবারে Bayswaterএ আমাদের ইয়র্ক হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই।
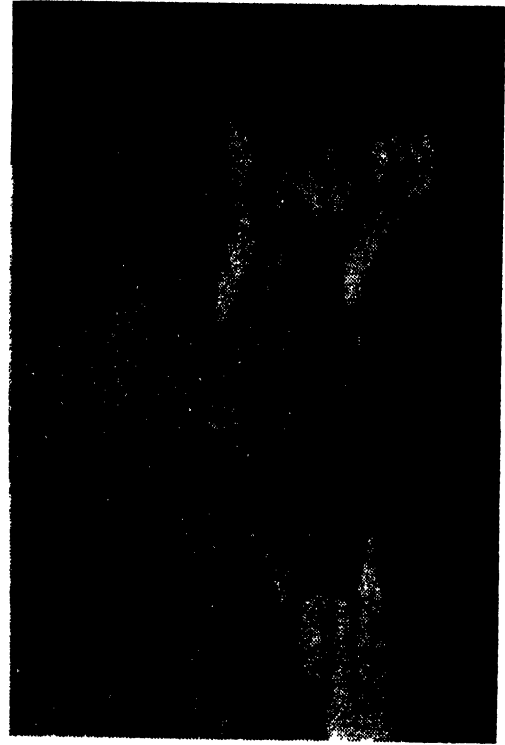
...গিন (খৃষ্টের ভক্ত শিষ্য) Miss Gropper Gabriele

জন দি ব্যাপটিস্ট (যীশুর শিষ্য) Mr. Magold Martin

সন্ধ্যার ঈষৎ আঁধার আবছায়ায় ওবারামারগাওয়ে

এসে মোটরকোচ থেকে যখন নামলাম হঠাৎ মনে হ'ল যেন দু'হাজার বছর আগের সেই বাইবেলে পড়া ন্যাজারেথ, গ্যালিলি, বেথেল্‌হেম বা জেরুজালেম নগরে এসে পড়েছি! যার সঙ্গে কেবল বইয়েই পরিচয়, যার রূপ শুধু ছবিতে দেখেছি—পাকা পাকা আপেল ও অজস্র পিয়ার্স গাছে ঘেরা বিচিত্র মুকুটাকৃতির সুন্দর গ্রাম। বিচিত্র রংকরা কাঠের বাড়ীগুলির দেওয়াল নানা বর্ণের আলপনায় চিত্রিত। পথের বাঁকে বাঁকে বড় বড় ক্রুস ও যীশুর ক্রুসবিদ্ধ মূর্তি

জুডাস্ (যীশু খৃষ্টের বিশ্বাসঘাতক শিষ্য) Mr. Schwaighofer Hans.

স্থাপিত রয়েছে। এখানে পোর্টার, গাইড, দোকানদার, হোটেলওয়ালা, সাইকেল রিক্‌শাওয়ালা, ট্যাক্সী ড্রাইভার, খবরের কাগজওয়ালা, ফেরিওয়ালা সবারই দেখি সেই য়্যুহুদীদের মতো লম্বা দাড়ী গোঁফ আর মাথায় বাব্‌রি চুল। শুধু পোষাকটি 'বাইবেলী' নয়। এতদিন য়ুরোপ ঘুরে এলুম, সর্বত্রই দেখেছি একেবারে চাঁচাছোলা কামানো মুখ। মাথায় সবারই ছোট বড় ছাঁটা চুল! অকস্মাৎ এখানে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার দেখে বেশ একটু চমক্

লেগেছিল বৈকি! ছোট ছোট বালকবালিকার পর্যন্ত সুদীর্ঘ সোনালী চুল ও অদ্ভুত বেশ।

মোটরকোচে আমাদের সহযাত্রিণী ছিলেন একটি জার্মান্ তরুণী, নাম—আইরীন কোলবেনার (Miss Irene Kohlbaner), স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। চমৎকার ইংরাজী ব'লতে পারেন। বেশ আলাপিনী মেয়ে। তিনি আমাদের পরিচয় পেয়ে এবং উদ্দেশ্য জেনে অভয় দিয়েছিলেন—'কোনও চিন্তা নেই, আপনাদের তিনখানা কেন—পঁচিশখানা টিকিট আমি যোগাড় করে দিতে

সেন্ট পিটার (যীশুর শিষ্য) Mr. Rutz Hugo Sen

পারবো। অনেক সীটই শেষ মুহূর্তে ক্যান্‌সেল হয়। এই অভিনয়ের উদ্যোক্তা বা কর্মকর্তাদের মধ্যে আমার আপনজনেরা আছেন।' মেয়েটির কাছে এই ভরসা পেয়ে আমাদের মনের মধ্যে 'পাবো কি পাবোনা'র যে উদ্বেগ থেকে থেকে বিঁধছিল তা' জুড়িয়ে গেল। এই সুদূর অপরিচিত বিদেশে এ মেয়েটিকে যেন আমাদের পরমাত্মীয় বলে মনে হ'ল। আত্মীয়ার মতো কাজও সে করলে। ওবারামার-গাও গ্রামে হোটেল মাত্র দু'একটি। সেগুলি আগেই ভরে

গিয়েছিল যাত্রীর ভীড়ে। মেয়েটি আমাদের টমাসকুকের অফিসে নিয়ে গেল। সেখানে তিনদিনের থাকা ও খাওয়ার খরচ ৪০ মার্ক এবং তিনখানি টিকিটের দাম—সেকেণ্ড ক্লাশ—১২ মার্ক হিসাবে জমা দিয়ে একখানি রসীদ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সর্ত ছিল যে—টিকিট যদি ক্যান্‌সেল হয় তবেই পাবো, নচেৎ—মূল্য ফেরত! পোর্টার আমাদের মালপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে চললো আমাদের ঠিকানায় পৌছে দিতে। মেয়েটি একটি জার্মান্ পরিবারে অতিথিরূপে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁদের বাড়ী খুব নিকটেই। আমরা যখন কৌতূহলী হ'য়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কি একটা জ্যুইশটাউন। হিটলারের অত্যাচারের ভয়ে জার্মানির সমস্ত য়ুহুদী বুঝি এইখানে পালিয়ে এসে এই পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে বাস করছিল?

মেয়েটি কলহাস্যে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত ক'রে বললে—'না না, এঁরা কেউ জ্যু' নয়। এঁরা সবাই অনেস্ট্ জার্মান ক্রিশ্চান। 'প্যাশান-প্লের' জন্য এ গ্রামের ছেলে বুড়ো প্রত্যেকেই একবৎসর ধ'রে দাড়ী গোঁফ ও চুল রাখেন। কেউ পরচুলা ব্যবহার করেন না! বর্ষকাল যথাসাধ্য পবিত্র ও সংযত জীবনযাপন করেন এঁরা। প্রত্যেক গ্রামবাসীকেই যে এ অভিনয়ে যোগ দিতে হয়। সুদীর্ঘ ছ'মাস ধ'রে অভিনয়ের প্রস্তুতি ও মহড়া চলে।

আর একটি প্রশ্ন আমরা করেছিলাম মেয়েটিকে। এই অভিনয়কে তোমরা 'প্যাশন-প্লে' (Passion-Play) বলো কেন? মেয়েটি বললে, নিখিল মানবের মুক্তির জন্য প্রভু যীশু যে তীব্র আবেগ ও সহানুভূতি নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, বাইবেলোক্ত খ্রীষ্টের সেই মানসিক ও শারীরিক প্রবল উত্তেজনা ও বেদনা এই নাটকে দেখানো হয়েছে ও সঙ্গীতেও সন্নিবিষ্ট হয়েছে যে!

রাত হ'য়ে যাচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায়, দোকানে ও বাড়ীতে আলো জ্বলে উঠেছে। মেয়েটি আমাদের কাছে পথ থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমরা যাঁদের বাড়ী অতিথি হলাম তাঁরা এ গ্রামের একটি মধ্যবিত্ত শিল্পী

হেরোদ রাজা। বাইবেলোক্ত যীশু বিদ্বেষী নৃপতি।
Mr. Zanterer Heinrich

অলিভ শৈলে (Mount of Olives) গভীর রাত্রে ভক্ত শিষ্য সেবকেরা নিদ্রিত। যীশুর কাতর প্রার্থনায় স্বর্গ হ'তে দেবদূতের আবির্ভাব

পরিবার। বাড়ীখানির নাম—'ভূনিবাস' (Landhaus), ছোট একখানি কাঠের-তৈরী দ্বিতল বাড়ী। কাঠের বারান্দা, কাঠের সিঁড়ি, টিনের ছাদ। কাঠের ঝালর ও কারুকায-করা বাড়ীখানি দেখতে ভারি সুন্দর। বড় ভাল লাগলো আমাদের। কাঠ খোদাইয়ের কাজে এ পরিবারের বেশ সুনাম আছে। এখানকার পথঘাট, বাড়ীঘর, উপাসনা মন্দির, দোকান-পাট সবই অতি সুন্দর এবং শিল্প রুচিসম্মত। 'মিউনিক্' এখান থেকে খুব নিকটেই। যুদ্ধ মিউনিক্ পর্যন্ত এসেছিল, কিন্তু এ গ্রামে প্রবেশ করেনি। তাই গ্রামখানি অক্ষত আছে। সোনালী অথচ পিঙ্গল তাম্রাভ-বর্ণের কেশযুক্ত নরনারী ও শিশু সমগ্র ওবা-রামারগাও গ্রামখানি-কেই এমন একটি বিশেষ প্রাচীন রূপ দান করেছে, যা দর্শকের মনে একটা গম্ভীর রহস্যের মতো মুদ্রিত হ'য়ে যায়।

আমরা যাঁদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলুম তাঁদের নাম শ্রীযুক্ত জোসেফ্ লামার ও শ্রীমতী ক্যাথারীনা লামার। এঁদের কন্যা শ্রীমতী এলিজাবেথ এ্যালজিংগার ও তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত হান্স এ্যালজিংগার এঁদের সঙ্গেই থাকেন। কর্তার দুই

প্রথম দৃশ্য—যীশু খৃষ্টের জেরুশালেমে প্রবেশ—জনতার কণ্ঠে জয়ধ্বনি

অভিনয়ের জন্য সুসজ্জিত লামার পরিবার (এর মধ্যে শুধু মা আর মেয়ে নেই। তাঁরা অতিথি পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকেন)

ছেলে জোসেফ ও ফ্রান্‌জ্‌ অন্য বাড়ীতে থাকে। এলিজাবথের দুই মেয়ে ও এক ছেলে দিদিমার কাছেই থাকে। এঁদের বাড়ীর দ্বিতলে এঁরা আমাদের দু'খানি

যীশু খৃষ্টের গৃহত্যাগ (মায়ের কাছে শেষ বিদায়)

বিশ্বাসঘাতকতা ! (জুডাস্‌ যীশুকে ধরিয়ে দেবার জন্য তাঁকে চুম্বন করে চিনিয়ে দিলে)

ঘর ছেড়ে দিলেন। একখানি 'ডবল্‌বেড' ঘর আমাদের দু'জনের জন্য এবং আমাদের পাশেই একখানি 'সিংগল রুম' নবনীতার জন্য। সুন্দর ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যথেষ্ট আলো বাতাস। ঝক্‌ ঝক্‌ তক্‌ তক্‌ করছে। খাট বিছানাও পরিপাটি। ওখানে পৌছতেই গরম চা এল। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নেমে গেলুম খাবার ঘরে বৈকালী ভোগ সারতে।

দারুণ শীত। পাহাড়ের কোলে গ্রামখানি। ইলেকট্রিক লাইট আছে কিন্তু এঁরা ইলেকট্রিক হীটার আনতে পারেন নি। ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। খাবার ঘরে তাই কাঠের আগুন জ্বলছিল, তবু যেন ঠাণ্ডা অসহ্য মনে হচ্ছিল। চা পানের সময় বাড়ীর কর্তৃ-ঠাকুরাণীদের সঙ্গে পরিচয় হ.ল। মা বাপ, মেয়ে জামাই, একসঙ্গে এক সংসারেই আছে। সুখী পরিবার। কর্তার দুটি ছেলে। পৃথক সংসার করছে তারা। মেয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তিনটি। বড় মেয়েটির নাম রোট্রান্‌। নবনীতার সমবয়সী। পরেরটি ছেলে। তারপর আবার মেয়ে। মা বুড়ো মানুষ। একবর্ণ ইংরিজী বোঝেন না। মেয়ে কিছু কিছু বোঝেন। বাকীটুকু ডিক্সনারী দেখে কাজ চালান। মেয়েটি অতিথি সৎকার করেন এবং মাকে রান্নায় সাহায্য করেন! নবনীতার সমবয়সী তার যে মেয়ে, সেও অল্প অল্প ইংরিজী জানে। তিনদিন আমরা

তাঁদের বাড়ী ছিলুম। এই তিনদিনের ভিতর নবনীতাকে মেয়েটি চলনসই জার্মাণ বলতে শিখিয়েছিল। নবনীতাও তাকে ইংরিজী ও বাংলা কিছু কিছু বলতে শিখিয়েছিল। 'নমস্কার' 'আসুন' 'বসুন' 'ভাল আছেন?' 'জয় হিন্দ' তার মুখে ভারী মিষ্টি লাগতো।

রাত্রে আমরা কি খেতে ইচ্ছা করি গৃহকর্ত্রী জানতে চাইলেন। আমরা আমাদের রুচিমত খাদ্য দেবার জন্য বলে দিলাম।

রাত্রে ওঁরা যা ডিনার দিয়েছিলেন তা যথার্থই উপাদেয়।

পাইলেট্ (রোমান শাসনকর্তা) Mr. Preitsamter Melchior

খাবার-টেবিলে দেখা গেল আমরাই একা শুধু এঁদের অতিথি হয়নি। আরও ৮ জন এঁদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। একটি আমেরিকান দম্পতি, একটি বেলজিয়াম দম্পতি, একটি সুইডিশ দম্পতি, একটি ফরাসী মেয়ে এবং একটি আইরিশ মেয়ে। সকলেই ইংরেজী বলতে পারেন বলে এঁদের সকলের সঙ্গেই আমাদের খুব আলাপ হ'য়ে গেল। বিশেষ করে নবনীতাকে নিয়ে এঁরা খুব আনন্দ করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন "তুমি খুব সৌভাগ্য-শালিনী। তোমার বয়সে আমরা শুধু দেশ ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেছি। কল্পনায় কন্টিনেণ্টে ঘুরেছি। তুমি সত্যিই এই বালিকা বয়সেই নিজের চোখে সব দেখে যাচ্ছো—তোমার কি মজা! বাড়ী ফিরে গিয়ে তোমার স্কুলফ্রেণ্ডদের কাছে সব গল্প করবে। তারা শুনতে শুনতে 'জেলাস্' হয়ে উঠবে। আচ্ছা—কোন দেশ তোমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে 'নীটা'? কোন দেশে তোমার আবার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে বলো।" 'নবনীতা' য়ুরোপের সর্বত্রই 'নীটা' নামে পরিচিত হয়েছিল। 'নবনীতা' এই পুরো নামটা তাঁরা কেউই বলতেন না। সবাই ছোট করে নিয়ে 'নীটা' বলে ডাকতেন।

কণ্টকমুকুটশিরে অস্থিবুক্ত যীশু খৃষ্ট ও তস্কর বারাব্বাস (এদের মধ্যে একজনের মুক্তি ও অন্যের প্রাণদণ্ড বেছে নেবার আদেশ দিয়েছিলেন রোমান পাইলেট)।

আহারান্তে আরও কিছুক্ষণ গল্প-সল্প করে আমরা যে যার ঘরে শুতে চলে এলুম। রাত্রি দশটা নাগাদ আমাদের ঘরের দরজায় 'নক্' করে বাড়ীর বুড়ো কর্তা এসে হাজির! দেখতে—যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া। ধবধবে সাদা গোঁফ দাড়ি আর লম্বা চুল! বললেন, "বড়ই দুঃখিত। তিনখানা সেকেণ্ড ক্লাস সীট পাওয়া গেল না। এ সপ্তাহে ক্যান্‌সিলেসান খুব কম হয়েছে। অভিনয়ের মাত্র এই

শেষ কয়েকরাত্রি কিনা ? দুটি সেকেণ্ড ক্লাশ ও ১টি থার্ডক্লাশ সীট যোগাড় করতে পেরেছি।" তাঁকে ও ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে টিকেটগুলি মাথার শিয়রে রেখে শুয়ে পড়লুম।

শালপ্রাংশু ব্যূঢ়স্কন্ধ বৃদ্ধ গৃহস্বামী আমাদের রাত্রে বলে গিয়েছিলেন—প্রাতরাশের পরই আমরা যেন অভিনয় মণ্ডপে যাই। কারণ, ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় অভিনয় আরম্ভ হবে। শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টায়। মধ্যে দু'ঘণ্টা মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বিরাম। ভোর ছ'টায় গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল। আমরা উঠেছি জেনে গৃহস্বামীর কন্যা এসে হাসিমুখে সুপ্রভাত জানিয়ে গেলেন এবং ৭টার মধ্যেই প্রাতরাশ প্রস্তুত থাকবে বলে গেলেন। তাঁর মুখে শুনলুম প্রতিদিন অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে ভোর ৬টায় সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী একত্রে মিলে গির্জায় এসে ভক্তিভরে উপাসনা ক'রে যান। ২১শে মে রবিবার থেকে অভিনয় শুরু হয়েছে। শেষ হবে ২৪শে সেপ্টেম্বর রবিবার। অর্থাৎ, সুদীর্ঘ চার মাস কাল প্রতি রবিবার ও বুধবার এই অভিনয় হবে স্থির ছিল। কিন্তু এবার ১৭ বছর পরে অভিনয় হওয়ায় পৃথিবীর চারিদিক থেকে এত বেশী দর্শক সমাগম হ'য়েছিল যে এঁদের শেষটা প্রায় প্রত্যহই অভিনয় করতে হয়েছিল।

খবর নিয়ে জানা গেল যে বিগত ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে এই এ্যাম্ফিথিয়েটার তৈরী হয়েছে। আগে দর্শকদেরও খোলা আকাশের নিচেয় বসতে হ'ত। অভিনয় যদিও গ্রীষ্মকালেই অনুষ্ঠিত হয়, তাহ'লেও মাঝে মাঝে হঠাৎ বৃষ্টি আসার ফলে দর্শকদের অসুবিধা ঘটে। তাই পূর্বের সেই উপাসনা মন্দিরের কাছাকাছি একটি বড় জমীতে এই বিশাল প্রেক্ষাগার নির্মিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের পাদপীঠ জমী থেকে প্রায় ১২ ফুট উঁচু, চওড়া প্রায় ১৭০ ফুট, গভীর প্রায় ৩৩ ফুট। পাদপীঠের উপর থেকে মঞ্চের উচ্চতা ৭৫ ফুট। অভিনয় কিন্তু খোলা আকাশের নীচেই হয়, কারণ, নাট্য পীঠের কোনও ছত্রাবরণ নেই। কিন্তু প্রেক্ষাগারটি সম্পূর্ণ ঢাকা। বিরাট সে প্রেক্ষাগার। পাঁচহাজার দু'শোজন দর্শকের প্রত্যেকটি আসন থেকেই দর্শকেরা সমগ্র

ক্রুশ স্কন্ধে বধ্যভূমির অভিমুখে চলেছেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত যীশু

ক্রুশ বহনে ক্লান্ত ও অশক্ত যীশুকে চাবুক মেরে—তাড়ন করা হচ্ছে

মঞ্চটি দেখতে পাবে। এটি নির্মাণ করতে খরচ হয়েছে এক মিলিয়ান আট হাজার মার্ক অর্থাৎ প্রায় বার লক্ষ ষাট হাজার টাকা। ঝড়বৃষ্টি এলেও অভিনয় বন্ধ হয় না। ভিজতে ভিজতেই এঁরা অভিনয় করেন। এই অভিনয়ের পিছনে একটা সকরুণ ইতিহাস আছে। এটা কোনও ব্যবসায়ী নাট্য সম্প্রদায়ের লাভের কারবার বা সৌখীন দলের নাট্যানুরাগজনিত অভিনয়-বিলাস নয়। এটা দেব-সন্নিধানে মানত করা একটি ব্রতের সমতুল্য। মারী ভয়ে ভীত অসহায় নরনারীর ভাগবত শরণাগতি হ'তেই এর উদ্ভব।

'ওবারামারগাও' গ্রামের এই ধর্মমূলক নাট্যাভিনয় জগদ্বাসীর কাছে যে বাণী বহন করে আনছে তা বিশ্বাসের বাণী; ভগবদ্ভক্তির প্রেরণা! পৃথিবীর নরনারীকে ডেকে এ বাণী যেন বলছে—হে বিশ্বপথের পান্থ; ক্ষণেক তোমার পথচলার অবকাশে স্থির হ'য়ে বসে যদি ভেবে দেখ, দেখবে জীবনের অতল অন্ধকার ভেদ করে একটা আলোকোজ্জ্বল পথের ইঙ্গিত এ তোমাকে এনে দিচ্ছে। এ সেই পথ, যে-পথ তৈরি হয়েছে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আকুল প্রার্থনায়—তাঁর ধ্যানের ভিতর দিয়ে—তাঁর ঐশী আকৃতি ও ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু-বরণের রক্তাক্ত বেদনায় মিশে। একে ঠিক নাট্যাভিনয় বলা চলে না। নাটকের রূপকে এ যেন একটি ভাগবত প্রার্থনায় ভরা ভক্তিপূর্ণ সকৃতজ্ঞ নমস্কার! যে আশ্চর্য ঘটনা—যে বিস্ময়কর ব্যাপার—একদিন তার অলৌকিক প্রভাবে অর্ধজগতের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল, এ নাটক আমাদের যেন সেদিনের সেই মহা আবির্ভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কেবলমাত্র রঙ্গমঞ্চের উপর প্রাচীন মানব গোষ্ঠীর একটা ঐতিহাসিক

শেষ ভোজ (Last supper)

শেষ ভোজের আগে যীশুর প্রার্থনা (Prayer on last supper)

দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র নয় এ নাটক। এ নাটক ভবিষ্যতের মানুষেরও পথপ্রদর্শক। মানুষের ধর্মে বিশ্বাস ও ভগবানে নির্ভরতা ফিরিয়ে এনে দেয় এ অভিনয়।

শোনা গেল এই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করতে প্রত্যেকবারেই প্রায় দশলক্ষ মার্ক ব্যয় হয়। তবে, সুখের বিষয় যে, এর দ্বিগুণ অর্থ বিশ্বের আন্তর্জাতিক দর্শকবৃন্দের কাছে পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল দেশেরই রস-পিপাসু, ধর্মানুরাগী ও ভগবদ্ভক্তেরা ছুটে আসেন এই অভিনয় দেখতে। সেই জন্য এঁদের প্যাশান প্লের প্রবেশ-পত্রের এত বেশী দাবী যে ৬ মাস আগে টিকিট কিনে 'সীট' বুক করে না রাখলে অভিনয় দেখতে পাবার আশা—দুরাশা মাত্র! কোনও বিশেষ দলের বা ধর্মসম্প্রদায়ের গোঁড়ামি নেই এর মধ্যে। ওবারামারগাওর এই 'প্যাশান প্লে' তাই সকল সম্প্রদায়ের মানুষকেই তৃপ্তি দেয়—আনন্দ দেয়। মানুষের আস্তিক্য বুদ্ধিকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে। জুডার অন্যায় কৃতকর্মের জন্য সমগ্র য়িহুদীদিগকেই ঘৃণ্য বলে ফতোয়া জারি করে না। এই নাটকাভিনয় আমাদের ভিতরের মগ্ন চৈতন্যকে জাগ্রত করে তুলে আমাদের কানে কানে বলে দেয়—'তোমার মনের ভিতর যে পাপ লুকিয়ে রয়েছে তাকে বর্জন করবার জন্য সচেতন হও। অন্যায়কে জয় করবারও নির্ভুল পথনির্দেশ পাওয়া যায় এর মধ্যে। খ্রীষ্ট বলেছেন :—"come unto me—put on your festive garments, I shall dwell within you—I have chosen you to be my temple!" মানুষের এই মনই হ'ল স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ মন্দির। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ গতি। একদা দুরন্ত দুর্দিনে মৃত্যুভয় ব্যাকুল মানুষ তার আকুল প্রার্থনায় সহসা যে সত্য উদ্ঘাটিত করেছিল এই নাট্যাভিনয়ে আমরা দেখতে পাই তারই অসামান্য সমুজ্জ্বল অভিব্যক্তি।

তিনশো বছর আগের কথা, ১৬৩৩ খ্রীঃ অব্দে এ জেলায় একবার প্লেগ মহামারী দেখা দেয়। গ্রাম বৃদ্ধেরা ভীত হয়ে উপাসনা মন্দির প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হন এবং সকলে মিলিত কণ্ঠে শ্রীভগবানের উদ্দেশে এই সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করেন যে—আমরা সমস্ত গ্রামবাসী একত্রে মিলিত হ'য়ে প্রতি দশবৎসর অন্তর শুচি মনে ও পবিত্র ভাবে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশুর অধ্যাত্ম জীবন, তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনা ও ভগবৎ প্রেম অবলম্বনে রচিত পুণ্য নাটকের ভক্তিভরে অভিনয় করবো।

রোমান রাজ্যপালের সম্মুখে বন্দী যীশুর বিরুদ্ধে য়িহুদী পুরোহিতদের অভিযোগ

আশ্চর্য যে সেইদিন থেকে এ অঞ্চলে আর কোথাও একজনেরও প্লেগের আক্রমণে মৃত্যু হয়নি। ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে সর্বপ্রথম এই 'প্যাশান-প্লে' অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই গ্রামের উপাসনা মন্দিরের প্রাঙ্গণেই। স্থানীয় লোকেরাই এর দর্শক ছিল সেদিন। সেই ১৬৩৪ খৃঃ অব্দ থেকে আজ পর্যন্ত—এই ষোড়শাধিক সুদীর্ঘ তিনশত বর্ষ ধরে, গগনস্পর্শী আল্পস্ পর্বতের চরণশায়ী এই ক্ষুদ্র গ্রাম ওবারামারগাও প্রতি দশবৎসর অন্তর তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতিশ্রুত এই অভিনয় নিয়মিত ক'রে আসছে। এই তিনশো বছরের মধ্যে পৃথিবীতে কত বিপর্যয়—কত ওলোট পালট হ'য়ে

গেল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ উন্নতির চরম শিখরে পৌছাল। পর পর দু'টি ভীষণ বিশ্ব-যুদ্ধ জগতের সভ্যতার মূল ভিতটা পর্যন্ত যেন নেড়ে দিয়ে গেল। দুঃখ দারিদ্র্য হতাশা ও বেদনায় সমগ্র মানব জাতি নিপীড়িত। কিন্তু ওবারামারগাও সে বিপদের মধ্যেও, সেই দুর্দিনেও, আপন সংকল্পিত ব্রত পালনে অবহিত ছিল।

ক্রমে সুদূর জার্মানির এক প্রান্তের একটি অপরিচিত গ্রামের অধিবাসীবৃন্দের এই আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রিয়-পুত্রের ভাগবত-জীবনের অভিনয়-খ্যাতি ধীরে ধীরে জার্মান সীমান্ত পার হ'য়ে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। এ খ্যাতি তারা কোনও দিনই চায়নি। এ অভিনয় ছিল নিতান্তই তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু আজ? পৃথিবীর দশদিক থেকে দলে দলে হাজার হাজার দর্শক ছুটে আসছেন এই গ্রামটিতে—বহু কষ্ট স্বীকার করে ও বহু অর্থ ব্যয় করে আসছেন—এঁদের এই অতুলনীয় 'প্যাশান-প্লে' একটিবার দেখে ধন্য হবার লোভে। অভিনয়ের মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য যে দু' ঘণ্টা ছুটি থাকে সেই সময় দর্শকেরা প্রেক্ষাগৃহ শূন্য করে চলে আসেন। আমরাও আসছিলাম। কিন্তু, পথের মাঝে পঞ্চাশটি ক্যামেরাধারী নর নারী আমাদের পঞ্চাশবার দাঁড় করিয়ে ছবি নিলেন। বিরক্ত বোধ করলেও, ওঁদের বিনীত অনুরোধ ও ভদ্রতার খাতিরে কিন্তু এড়ানো গেল না। অভিনয়ের কর্তৃপক্ষেরা এই সময় বিশাল এক খাতা এনে ভারতের Distinguished Visitors হিসাবে আমাদের স্বাক্ষর নিলেন তাতে।

প্যাশান প্লে দেখে ফেরার পথে একটি দোকানে অভিনয়ের ছবি বিক্রয় হ'চ্ছে দেখে আমরা কিনতে গেলাম। প্রিয়-দর্শন একটি জার্মাণ ছেলে দোকানে ছিল। ছেলেটি ইংরাজী বলতে পারে ও বুঝতে পারে জেনে ভারি আনন্দ হল। তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে জানা গেল সেও একজন তরুণ তক্ষণ-শিল্পী। কাঠের মূর্তি তৈয়ার করে। সে আমাদের নিয়ে গেল তার শিল্প সাধনার কক্ষে। দেওয়ালে তার হাতের

সমাধি গর্ভ হ'তে বিনিষ্ক্রান্ত যীশু ম্যাগদালীনকে দেখা দিচ্ছেন

কাজ। প্রতিভাবান শিল্পী সে। তার সৃষ্টির মধ্যে রোঁদা ও এপস্টিনের ভঙ্গীর আদল পেলাম। ছেলেটি আমাদের প্যাশান প্লের অভিনেতাদের 'অটোগ্রাফ-ছবি' সংগ্রহ করে দিয়েছিল। বেশ ছেলেটি। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ব্রাড্‌লে

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দেশ ও কাল প্রতিভাস হইয়াও যে অসঙ্গের অন্তর্গত, কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। যাবতীয় প্রতিভাস এক সংগতিপূর্ণ সমগ্রের অঙ্গীভূত, ইহাই সম্ভব। কাল যদি সত্য হইত, তাহা হইলে অসঙ্গ (absolute) বলিয়া কিছু থাকিত না। কিন্তু ইহা প্রতিভাস মাত্র। অসঙ্গ কালের অতীত; কিন্তু কাল তাহার একটা বিচ্ছিন্ন রূপ। যখন তাহার বিচ্ছিন্নতা বিদূরিত হয়, তখন তাহার নিজের রূপও থাকে না। অসঙ্গের মধ্যে কালের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সমগ্রের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাহার নিজস্ব রূপ নাই। কালের কোনও একত্ব নাই। অসঙ্গের মধ্যে অনেক কাল-শ্রেণীর (time series) অস্তিত্ব থাকিতে পারে; এই সকল শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে কালিক সম্বন্ধ নাই; কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর ঘটনাবলী কালিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে কালের গতি একই দিকে না থাকিতেও পারে। এই সকল শ্রেণী সকলেই অসঙ্গের অন্তর্গত। অসীমের মধ্যে তাহারা পরস্পরের ভারসাম্য বিধান করে এবং তাহাদের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হয়; ফলে তাহাদের মৌলিক প্রকৃতি থাকে না।

দেশ-সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। দেশ চেষ্টা করে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইতে, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় না। "আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকিবার এই অসামর্থ্য হইতে প্রমাণিত হয়, তাহার মধ্যেও বিরোধের মীমাংসা আছে। দেশ চায় একটি উচ্চতর জ্ঞানের মধ্যে আপনাকে বিসর্জন দিতে, যেখানে বৈচিত্র্য না হারাইয়াও ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

ব্রাড্‌লে অসঙ্গকে অভিজ্ঞতা (Experience) বলিয়াছেন। মানবীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা সকলই আছে। সকল মানবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অসঙ্গের অন্তর্গত—কিন্তু অসঙ্গের মধ্যে তাহাদের রূপের পরিবর্ত্তন হয়। মানুষের অভিজ্ঞতা ঠিক যেরূপ, অসঙ্গের মধ্যে তাহা সেরূপে বর্ত্তমানে নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, অসঙ্গ অভিজ্ঞতা ও মানবীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে ভেদ আছে। যাবতীয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অসঙ্গ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হইলেও, অসঙ্গ অভিজ্ঞতা কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমষ্টিমাত্র নহে। অভিজ্ঞতার সসীম কেন্দ্রসকলে যাহার অস্তিত্ব নাই, অসঙ্গ অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা, ব্রাড্‌লে তাহার আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সুস্পষ্ট মীমাংসা করেন নাই। সসীম অভিজ্ঞতার মধ্যে নাই, অসঙ্গ অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন-পদার্থের অভিজ্ঞতা যে থাকিতে পারে, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই সত্য, কিন্তু বিভিন্ন সসীম অভিজ্ঞতার একত্বই যে অসঙ্গ অভিজ্ঞতা, ইহাই তাহার মত বলিয়া প্রতীত হয়। অসঙ্গের মধ্যে এমন কিছুই থাকিতে পারে না, যাহার অভিজ্ঞতা কোনও সসীম কেন্দ্রে নাই। কিন্তু বিভিন্ন সসীম কেন্দ্রে অননুভূত বস্তুর অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহা হইলে অসঙ্গের মধ্যে তৎকর্ত্তৃক-অনুভূতরূপেই তাহাদের থাকিতে হইবে, কেননা অভিজ্ঞতা ভিন্ন অসঙ্গ অন্য কিছুই নহে। সুতরাং বলিতে হয়, বিভিন্ন সসীম কেন্দ্রের অভিজ্ঞতা (যেরূপই হউক না কেন) ব্যতীত অন্য কিছু যদি অসঙ্গের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে, সসীম কেন্দ্রে যাহা অনুভূত হয় নাই, এমন কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। কিন্তু যদি থাকে, তাহা হইলে অসঙ্গকে একটী স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার কেন্দ্র বলিতে হইবে। ব্রাড্‌লে অসঙ্গকে বিভিন্ন আত্মার (Souls) সমষ্টি বলেন নাই। আত্মা এবং অনাত্মার মধ্যে ভেদ (Self and notself) বুদ্ধির সৃষ্টি (intellectual construction), সসীম কেন্দ্রের মধ্যেই এই ভেদের সৃষ্টি; অসঙ্গের মধ্যে এই ভেদ থাকিতে পারে না; সুতরাং অসঙ্গ বিভিন্ন অহমের সমবায়ে গঠিত হইতে পারে না। অসঙ্গকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কেন্দ্রের সমবায়ও বলা যায় না। অসঙ্গের মধ্যে বস্তুসকলই যে কেবল নূতনভাবে সজ্জিত হয়, তাহা নহে। তাহাদের উপাদানসকলের সংস্থানেরও পরিবর্ত্তন হয়। তাহার মধ্যে সমস্তই ওলট পালট হইয়া যায়।

অসঙ্গ এক। কিন্তু এই একত্ব কিসের? উত্তর—অভিজ্ঞতার। ইহার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছা, চিত্তাবেগ (Emotion) অথবা তাহাদের সদৃশ কিছু নহে। অভিজ্ঞতার বাহিরে কিছুর অস্তিত্বই নাই।

অসঙ্গ পুরুষ কি না, তাহা ব্যক্তিত্বপ্রাপ্ত কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রাড্‌লে বলিয়াছেন আমরা যেরূপ পুরুষ (personal), অসঙ্গ সেরূপ পুরুষ নহে। কিন্তু তাহা নৈব্যক্তিকও নহে। পুরুষ সসীম, এবং অন্যান্য পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। অসঙ্গের বাহিরে কিছুই নাই, সুতরাং তাহাকে পুরুষ বলা যায় না। কিন্তু তাহাকে নৈর্ব্যক্তিক বলিলেও বিষম ভুল করা হইবে। অসঙ্গ সমস্ত ভেদের ঊর্দ্ধগত, তাহাদের নিম্নে নহে। ইহাকে অতি পুরুষ (superpersonal) বলিলেই ঠিক হয়।

অসঙ্গের সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্ভবপর নহে। তাহার স্বরূপ কি, তাহা "মোটামুটি" একপ্রকার বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা, তাহার সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় না, তাহা অপেক্ষা অনেক কম। আমাদের অভিজ্ঞতার যে প্রকার, তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতা আছে কিনা, তাহা আমরা জানি না। যদি থাকে, তাহা হইলে এই সকল বিভিন্ন প্রকারের অভিজ্ঞতা কিরূপে অসঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে মিলিত হয়, তাহাও আমরা জানি না। অসঙ্গের জীবনের যে রূপ তাহার নিজের নিকট প্রকাশিত, তাহা আমাদের অজ্ঞেয়। কিন্তু প্রতিভাস দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত নহে। প্রতিভাসে তাহা

আংশিকভাবে প্রকাশিত হয় ; সমস্ত প্রতিভাসে তাহা কিন্তু সমান পরিমাণ প্রকাশিত হয় না। প্রতিভাসের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ অনুস্যূত, কিন্তু বিভিন্ন পরিমাণে। বাহ্যিক সত্তার ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতেই আত্মা (spirit) পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত। সৎ বস্তু আত্মিক বস্তু। ব্রাড্‌লে বলিয়াছেন, সৎ বস্তু যে আত্মিক, হেগেল তাহা বলিয়াছিলেন। আত্মার বাহিরে কোনও সৎ বস্তু নাই, থাকিতে পারে না। যে বস্তু যে পরিমাণে আত্মিকভাবপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে তাহা সৎ।

ব্রাড্‌লে পরিচিত যাবতীয় বস্তুকেই প্রতিভাস বলিয়াছেন ; অহংকেও প্রতিভাস বলিয়াছেন। আবার সৎ-সম্বন্ধেও আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা নাই বলিয়াছেন। এই সৎকে—অসঙ্গকে—তিনি কোথায় কিরূপে পাইলেন, তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। হঠাৎ তাহাকে আনিয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। অসঙ্গ বলিয়া যে কিছু আছে, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তর, প্রতিভাসদিগের ও অস্তিত্ব আছে, অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেও, তাহারাও একেবারে অসৎ নহে। অসঙ্গের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে প্রতিভাসগণ থাকিবে কিসের মধ্যে? অসঙ্গের মধ্যে কোনও প্রকারে তাহাদের সামঞ্জস্য হয়, ইহাই ব্রাড্‌লে বলিয়াছেন। তিনি সত্তের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণ সত্তা-বিশিষ্ট বস্তুর (degrees of reality) কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সু-সম্বদ্ধ ব্যবস্থার (system) মধ্যে সত্তের বিভিন্ন রূপের স্থান নির্দেশের কোনও চেষ্টাই করেন নাই। হেগেলের অসঙ্গের মধ্যে তাহার বিভিন্ন category নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে, এবং প্রত্যেক category তাহার পরবর্তী উচ্চতর categoryর অন্তর্ভুক্ত তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। এই রূপে হেগেল ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিম্নতম category হইতে সর্ব্বোচ্চ categoryতে পৌঁছিয়াছেন, এবং সত্তের বিভিন্ন categoryদিগকে একাধিক-ক্রমবদ্ধ ব্যবস্থা (graded system)-রূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন। সসীম হইতে এইরূপে তিনি পূর্ণ অসীমে আরোহণ করিবার সোপান শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ এবং পরিচিন্তন দ্বারাই অসঙ্গকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাড্‌লে সে পন্থা অবলম্বন করেন নাই। ফলে প্রতিভাসের ও সত্তের মধ্যে কোনও সেতু তাঁহার দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বহু ও একের সংগতির একমাত্র উদাহরণ অহমের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ব্রাড্‌লে অহমকে প্রতিভাস বলিয়াছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশিত একত্ব কেবল অহমের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সংগতিপূর্ণ তন্ত্রের (system) প্রত্যয় আমরা অহম হইতেই প্রাপ্ত হই। অহংকে প্রতিভাসমাত্র বলিলে বৈচিত্র্যপূর্ণ একত্ব দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। অহংকে প্রতিভাস বলিয়া গণ্য করিয়াছেন বলিয়া ব্রাড্‌লেকে বলিতে হইয়াছে, যে অসঙ্গের মধ্যে বহুত্ব ও একত্বের কিরূপে সমন্বয় হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না।

সুনীতি অপেক্ষা ধর্ম্ম (religion) অধিকতর বাস্তব—ধর্ম্মেই সুনীতির শেষ পরিণতি। সুনীতির যাহা লক্ষ্য, ধর্ম্মেই তাহা অধিগত হয়। ধর্ম্মের দৃষ্টিতে জগৎ অসঙ্গ ইচ্ছার ব্যক্তরূপ, এবং সেই অর্থে পূর্ণ। ধর্ম্মের-দৃষ্টিতে ভ্রান্তি ও অশুভের অস্তিত্ব নাই, তাহাদের বাধ্যতেই জগতের পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। সসীম আত্মা জগতের অংশ, কিন্তু ঈশ্বরের সাযুজ্য অনুভব করিয়া আপনার সসীমত্ব অতিক্রম করে এবং ত্রুটীমুক্ত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্মাভিমুখী (parctical), সুতরাং তাহাতে বাস্তব ও আদর্শের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। যদিও চরিত্রনীতির ঊর্দ্ধে ধর্ম্মের স্থান, তথাপি ধর্ম্মের মধ্যেও চরিত্রনীতির স্থান যে একেবারে নাই, তাহা নহে। তবে সে স্থান নিম্নে। এই জগৎ ঈশ্বরের জগৎ, এই অর্থে জগৎ পূর্ণ হইলেও, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জগতের উৎকর্ষবিধান করা—তাহার সংস্কার করা—ধর্ম্মানুরক্ত লোকের নৈতিক কর্ত্তব্য। ধর্ম্মের দৃষ্টিতে সমগ্র জগৎ একদিকে যেমন পূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি তাহা পূর্ণতার অপেক্ষাও করে। ধর্ম্মবোধের (religious consciousness) মধ্যে এই দ্বন্দ্ব বিরোধ বর্ত্তমান। এই বিরোধের নিরসন অসম্ভব।

ধর্ম্ম বলিতে ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে সম্বন্ধ সূচিত হয়। সম্বন্ধ দ্বারা সংযোগ ও বিয়োগ উভয়ই সূচিত হয়। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত মানুষ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, আবার ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মানুষের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যখন মানুষের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধের কথা বিবেচনা করা যায়, তখন তাহাকে মানুষ হইতে স্বতন্ত্র এবং মানুষ কর্ত্তৃক অবচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়। আবার ঈশ্বরের আত্মজ্ঞান মানুষের সহিত সংযুক্ত অবস্থাতেই হয়, এবং তাঁহার ইচ্ছাও এই সংযুক্ত অবস্থার ফল। এই দ্বন্দ্ব হইতে ধর্ম্ম মুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মকেও প্রতিভাস বলিতে হইবে, যদিও সুনীতি অপেক্ষা ইহা সত্যের নিকটতর। ধর্ম্মের ঈশ্বর ও অসঙ্গ এক নহে। কেননা অসঙ্গের সহিত কিছুরই সম্বন্ধ নাই, এবং অসীম ইচ্ছার সহিত তাহার কোনও কার্য্যকর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অসঙ্গের উপাসনা করিতে হইলে তাঁহাকে রূপান্তরিত করিতে হয়। তখনই ইহা বিশ্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বস্তুতে পরিণত হয়।

প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের সহিত তাহার আধেয় (Content) থাকে। আধেয়হীন সত্তা কল্পনা মাত্র। বস্তুর যাহা স্বরূপ, যাহা তাহার সার, তাহাই তাহার আধেয়। প্রতিভাসের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাহার আধেয় নাই। প্রতিভাস দ্বারা আধেয় সূচিত হয় বটে, কিন্তু আধেয় তাহার মধ্যে নাই। প্রত্যেক প্রতিভাস যেমন অন্য প্রতিভাসের উপর নির্ভরশীল, তেমনি শেষোক্ত প্রতিভাসও তাহার উপর নির্ভরশীল। সমগ্রের মধ্যে প্রতিভাসগণ পরস্পরের পরিপূরক ; এবং তাহারা সমগ্রের অপরিহার্য্য উপাদান, সমগ্রের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিভাসই বর্ত্তমান ; কোন প্রতিভাসেরই বিনাশ নাই। সমগ্র (অসঙ্গ) হইতে কোনও একটি প্রতিভাস যদি অপসারিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র শূন্যে পরিণত হয়। কিন্তু প্রতিভাসদিগের সত্যতা এবং বাস্তবতার তারতম্য আছে। অসঙ্গ প্রত্যেক প্রতিভাসের মধ্যে অনুস্যূত, কিন্তু সমান পরিমাণে নহে। প্রত্যেকেই অপরিহার্য্য হইলেও, কোন কোনটি অন্যান্য প্রতিভাসের তুলনায় মূল্যহীন।

ব্রাড্‌লে অহমের সহিত তাহার আধেয়ের ভেদ দেখিতে পান নাই। সেই জন্য তিনি অভিজ্ঞতার সমষ্টিকে অহম্ বলিয়াছেন। কিন্তু কেয়ার্ড, গ্রীন প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদিগণ বিশ্বের ভিত্তি-মূলক তত্ত্বকেই আত্মা

বলিয়াছেন। তাহাদের মতে বুদ্ধি-গ্রাহ্য জগতের বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ-বর্জিত অস্তিত্ব নাই। বস্তু ও বস্তুর জ্ঞাতা মনের মধ্যে যে ভেদ, সেই ভেদের মূল কারণই আত্মা। কিন্তু ব্রাড্‌লে এই তত্ত্বের আলোচনা করেন নাই। সমস্ত বস্তুর একত্বের মধ্যে যে আত্মিক তত্ত্ব বর্তমান, ব্রাড্‌লে তাহার উল্লেখ করেন নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা এই জাগতিক একত্ব হইতে ভিন্ন হইলেও, তাহা হইতেই আমরা বিশ্বের আত্মার সন্ধান প্রাপ্ত হই। সেই আত্মা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমষ্টি হইতে ভিন্ন; তাহা দ্বারাই সেই অভিজ্ঞতার একত্ব সাধিত হয়। পূর্ণতর অবস্থায় এই ব্যক্তিগত আত্মাই বিশ্বের আত্মা। ইহার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয় একীভূত। ইহাকে প্রতিভাস বলা যায় না।

ব্রাডলে সৎকে দ্রব্য (Substance) বলিয়া গণ্য করেন নাই। হেগেলের মতো তিনি তাহাকে বিষয়ী ((Subject) ও বলেন নাই। তিনি অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমষ্টিকে অসঙ্গ বলিয়াছেন। কিন্তু সৎকে তিনি আত্মার পূর্ণ বাস্তবতা (Perfect realisation) ও বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "আত্মার বাহিরে কোনও সত্তের অস্তিত্ব নাই, থাকিতেও পারে না। যে বস্তু যত আত্মিক ভাবাপন্ন (Spiritual) ততই তাহা অধিকতর সত্য।" কিন্তু "সৎ" যদি আত্মিক বস্তু হয়, তাহা হইলে ব্যক্তির আত্মা (Self) হইতে তাহাকে ভিন্ন বলিবার কোনও যুক্তিই নাই। ব্রাডলে অসঙ্গকে চিন্তা বলিতে অস্বীকৃত, কেননা চিন্তা সম্বন্ধ-মূলক, বস্তুর সম্বন্ধই চিন্তার বিষয়। চিন্তায় বস্তুর সত্তা গুণ হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। কিন্তু অসঙ্গ এক সামঞ্জস্য-পূর্ণ সমগ্র বস্তু। কিন্তু এই সমগ্রের মধ্যে—তাহার অন্তঃস্থ প্রতিভাসের মধ্যে—যে সম্বন্ধ নাই, তাহা নহে। সুতরাং "অভিজ্ঞতা" শব্দ দ্বারাও অসঙ্গের বর্ণনা হয় না, কেননা "অভিজ্ঞতা" শব্দে প্রধানতঃ অক্ষজ অভিজ্ঞতাই (Sensuous Experience) বুঝায়। অন্যবিধ অভিজ্ঞতা যদি অসঙ্গের মধ্যে থাকে তাহা হইলে, এই শব্দ সম্যক প্রযোজ্য হয় না।

কলিকাতার প্রতি চেরাপুঞ্জী

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

অশ্রান্ত বর্ষণ মাঝে ক্লান্ত হিয়ে তিমির রাত্রির
অন্ধ পথে বদ্ধ গতি শ্লথপদ একাকী যাত্রীর
পদধ্বনি শুনিতে কি পাও?
কথনো কি তার ভাবনাও
মেঘমন্দ্রে মৃদু ছন্দে অলক্ষ্য গোপনে
ছায়া ফেলে যায় বন্ধু তোমার স্বপনে,
তৃষ্ণার্তের বাধা যায় খসে
বরষার মেদুর দিবসে?

হে নগরী, তোমার হৃদয়ে
যবে মরুসম দগ্ধ উষরতা ল'য়ে
উষ্ণ নিঃশ্বাসের ধূম ওড়ে নভপানে,
তৃষ্ণার্ত অধর আর ঘর্মাক্ত বয়ানে
নাহি ডাকো—আমি তব উত্তপ্ত শিরেতে
পাঠাইতে চাহি মেঘ, পথে শ্যাম শৈলের ভীড়েতে
বাদল ফুরায়ে যায়, বুঝিতে পারি না,
শেষ হয় মোর গান রিম ঝিম ঝিনা।

হে বন্ধু, জান না হেথা নাই
নব বরষার ভীরু বধূসম চিত্তদোলা, তাই
উদ্দাম হৃদয়বেগে মেঘ আসে নিষ্করুণ ধেয়ে
বিদ্যুৎ সরোষে হাসে, বজ্র ওঠে গেয়ে
ভীমা ভৈরবীর সুরে, পাইনের বনে
নহে কাজরীর গান, আর্তনাদ বায়ুবেগে স্বনে।

তারো মাঝে পাবে কি শুনিতে
অশান্ত আমার হিয়া যে ক্রন্দনে নিষ্ফলে ধ্বনিতে
চাহে? তারে অনাবৃত কঠিন সংসারে
পরাজিত জীবনের ক্ষীণ হাহাকারে
মিশাব না, যে গান ফুরালো পথে, গলিল যে মেঘ
তব তৃষ্ণা ঘুচাবার বিফল আবেগ,

সে ব্যথা আমারি থাক; শুধু তব উষ্ণ তপ্ত সাঁঝে
দূরে বেদনায় কাঁদি, সে কথাটি মর্মে মোরি বাজে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

"কিছু যদি না মনে করেন, তাহলে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে"

"করুন"

"আপনি ওই শবদেহে কেন প্রবেশ করতে চাইছেন"

"শুনেছি পিতামহ ব্রহ্মার ওইটি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। উনি নিজের ওই কীর্ত্তি-মন্দিরে বাসও করেন এও শুনেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করব, তাই ওই শবদেহে প্রবেশ করতে চাই"

"তাঁর কাছে আপনার কি প্রয়োজন জানতে পারি কি"

"তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাই"

"কিসের বোঝাপড়া"

"সে অনেক কথা। আমরা তাঁর পৌত্র কশ্যপের বংশধর। আমি জানতে চাই একই পিতার বংশধর কেউ দেব, কেউ দানব, কেউ নাগ হল কেন। একজনের স্থান স্বর্গে—আর একজনের পাতালে কেন, ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী বিশ্ববরেণ্যা অথচ আমার পত্নী বর্ণমালিনীকে কেউ চেনে না কেন। বর্ণমালিনী রূপে গুণে শচীদেবীর চেয়ে কম নন। তিনিও অনন্যা। তবে এ অবিচার কেন?"

চার্ব্বাক লক্ষ্য করিল কালকূটের চক্ষু দুইটিতে নিষ্ঠুর ভুজঙ্গ-ভাব প্রকটিত হইয়াছে। তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল ওই অনিন্দ্যসুন্দর মুখও হয়তো এখনই ফণায় রূপান্তরিত হইবে।

চার্ব্বাক বলিল, "আমিও পিতামহের দর্শনপ্রার্থী। আমিও শুনেছি যে পিতামহ ওই শবদেহে আছেন, এই মায়ানদী আমাকেও বাধা দিয়েছে ক্রমাগত। কিন্তু—"

চার্ব্বাক থামিয়া গেল। যে কথাটা মনে জাগিয়াছিল তাহা কালকূটের নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ হইল।

"কিন্তু কি, বলুন থেমে গেলেন কেন"

"আমি পিতামহকে দেখতে চাই সত্যভাবে, একটা ভোজবাজির চমৎকৃতির ভিতর দিয়ে নয়। আমার মনে হচ্ছে কি করে জানিনা আমি যেন মোহাচ্ছন্ন হয়েছি। যা আমি প্রত্যক্ষ করছি, মনে হচ্ছে তা অসম্ভব। কিন্তু এ অনুভূতিকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতেও পারছি না, প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করব কি করে'?"

"আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় হয়তো অভাবিত উপায়ে নূতন শক্তি অর্জ্জন করেছে। সেই শক্তি বলে আপনি অভিনব জগৎ প্রত্যক্ষ করছেন, পুরাতন যুক্তি দিয়ে বিচার করছেন বলেই অসম্ভব মনে হচ্ছে। নূতন যুক্তি দিয়ে বিচার করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে"

"পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শক্তি কি অভাবিত উপায়ে এ ভাবে বদলে যেতে পারে? এই মায়া নদী, বর্ণমালিনীর এই বিস্ময়কর জিহ্বা, ওই বিরাট শবদেহ, এ সমস্তই কি সত্য? পিতামহ কি সত্যই আছেন?"

"আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আগে আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি। আপনার শৈশবে আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাইরের জগৎকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করত এখনও কি ঠিক সেই ভাবেই করে? এখনও কি অন্ধকার রাত্রে গাছকে ভূত বলে' মনে করেন? মনোহরকান্তি সর্পের দিকে কি এখনও নির্ভয়ে হাত বাড়াতে পারেন?" "বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক ভ্রান্তি অপনোদিত হয়েছে মানছি। কিন্তু বৃক্ষের বৃক্ষত্ব বা সর্পের সর্পত্ব তখনও আমার কাছে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। আপনাকে আমি সর্প-বংশ-জাত বলে' মানতে প্রস্তুত নই। আমার মনে হচ্ছে আমি মোহগ্রস্ত হয়েছি"

"মোহগ্রস্তই হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই, আপনার যুক্তির অহঙ্কারই আপনার মোহ। আমাকে সর্পকুলজাত

বলে' মানতে প্রস্তুত নন আপনি? কেন? আমার আকৃতি মানুষের মতো বলে? দেখুন, প্রত্যক্ষ করুন—"

দেখিতে দেখিতে কালকূট এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্পে রূপান্তরিত হইলেন এবং তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কিছুদিন পরে আপনার দেহ যে ভস্মে ও বায়বীয় আকারে পরিণত হবে সে তখন যা প্রত্যক্ষ করবে তা এখন কল্পনা করাও আপনার পক্ষে অসম্ভব। আপনার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনি যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক, কিন্তু একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে অনুরোধ করছি। যুক্তির শৃঙ্খলে কখনও নিজেকে বন্দী করবেন না, আপনার যুক্তি হবে আপনার সত্য নির্দ্ধারণের উপায় স্বরূপ। তা যদি আপনার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে তাহলে আপনি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সত্য উদ্ধার করতে পারবেন না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আপনাদের মতো বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সম্বল, যদি কোনও কারণে, তা সে কারণ যত বড় যুক্তিযুক্তই হোক, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ জন্মায় তাহলেই আপনি দিশাহারা হয়ে পড়বেন। যা প্রত্যক্ষ করছেন তা আপনাকে মানতেই হবে"

কালকূট পুনরায় মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "প্রত্যক্ষ সত্যকে স্বীকার না করে' উপায় নেই, অন্ধকার রাত্রে ক্ষুদ্র প্রদীপ শিখার উপর নির্ভর না করে যেমন উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও বলছি ওটা খুব নির্ভরযোগ্য ব্যাপার নয়। আপনি পিতামহের দর্শনপ্রার্থী কেন তা জানতে পারি কি?"

চার্ব্বাক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিল, "কৌতূহল মাত্র। আমার ধারণা তিনি নেই, অনুসন্ধান করে' দেখছি আমার এ ধারণা ঠিক না ভুল"

"বেশ, তাহলে আসুন, বর্ণমালিনীর জিহ্বার উপর দিয়ে মায়া নদী পার হওয়া যাক"

"আপনার পত্নীর জিহ্বার উপর পদার্পণ করবার অধিকার আপনার হয়তো আছে কিন্তু আমার তো নেই"

"সে অধিকার আপনাকে আমি দিচ্ছি। আপনার সাহস আছে কিনা সেইটে আপনি ভেবে দেখুন। বর্ণমালিনীর ওই জিহ্বা শুধু স্পর্শ দ্বারা বিবর্ণ কুলকে ধ্বংস করেছে—"

"আমি চার্ব্বাক। সত্য নির্দ্ধারণের জন্য যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হতে আমি প্রস্তুত। আমার কিন্তু একটা খটকা লাগছে—সর্পের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত শুনেছি"

"ঠিকই শুনেছেন। অধিকাংশ সর্পের জিহ্বাই দ্বিখণ্ডিত, কারণ তারা সমুদ্র-মন্থনের পর অমৃতের লোভে কুশলেহন করেছিল। বর্ণমালিনীর পূর্ব্বপুরুষ শৃঙ্গনাসা এ হীনতা স্বীকার করেন নি, তাই তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জিহ্বা অখণ্ডিত আছে"

চার্ব্বাক নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"কি ভাবছেন"

"ভাবছি ওই শবদেহের মধ্যে যে সম্ভাব্য সত্য আছে তার মূল্য আমার জীবনের মূল্যের চেয়ে বেশী কিনা। বর্ণমালিনীর জিহ্বার বিষাক্ত স্পর্শে হয়তো আমার মৃত্যু হতে পারে, ভাবছি এই বিপদ বরণ করা যুক্তিযুক্ত কিনা"

"আপনি যদি বর্ণবিরোধী হন তাহলে আপনার মৃত্যু সুনিশ্চিত। বিবর্ণবাদীদের ধ্বংস করবার জন্যেই বর্ণমালিনী তপস্যা করে' ওই বিশেষ রাসায়নিক শক্তি লাভ করেছিলেন—"

"আমি বর্ণবিরোধী নই"

"তাহলে আপনি নির্ভয়ে আসতে পারেন। আসুন"

কালকূট সেই ধনুকাকৃতি সাঁকোর উপর আরোহণ করিয়া অনতিবিলম্বে পরপারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চার্ব্বাকও অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সহসা তাহার নজরে পড়িল মায়ানদী অদৃশ্য হইয়াছে, নদীর খাতে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে একদল আলেয়া। চার্ব্বাক আর বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া সাঁকোর উপর আরোহণ করিল। কিছুদূর উঠিয়াও সে কিন্তু কালকূটকে আর দেখিতে পাইল না। চার্ব্বাকের মনে হইল মায়ানদীর মতো কালকূটও কি তাহা হইলে মায়া? আর একটা কথাও চার্ব্বাকের মনে হইতে লাগিল। বর্ণমালিনীর জিহ্বায় কোনও কোমলত্ব নাই কেন? ক্ষুরধার লৌহকঠিন এই বস্তুটি কি কোনও জীবন্ত প্রাণীর জিহ্বা হইতে পারে? জিহ্বা যদি না হয় তাহা হইলে ইহা কি? চিন্তা করিতে করিতে চার্ব্বাক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুরধার পথে অন্যমনস্ক হইয়া চলা কঠিন, চার্ব্বাক স্খলিতচরণ হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল কিন্তু শূন্যপথে এক দ্যুতিমান বৃহদাকৃতি পতঙ্গ আবির্ভূত হইয়া কহিল, "চার্ব্বাক,

অন্যমনস্ক হোয়ো না। আমার উপর ভর দাও, আমি তোমাকে নির্বিঘ্নে পার করে দেব"

"তুমি কে"

"আমি তোমার মনীষা"

চার্ব্বাক পতঙ্গের উপর ভর দিয়া সেই ক্ষুরধার পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

৫

বিশ্বকর্ম্মা পিতামহের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন যে সকল অর্দ্ধসমাপ্ত স্বৈরচর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল তাহারাও কেহ নাই। ইহাতে কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার বিস্ময় হইল না। কৌতুকী পিতামহের বহুবিধ কৌতুক-পরায়ণতার পরিচয় তিনি ইতিপূর্ব্বে বহুবার পাইয়াছিলেন। পিতামহ নিজেকে নানারূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া বহুবার তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিয়াছেন। এই তো সেদিনের কথা, যখন তিনি হিমালয় নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিলেন তখন একদা গভীর নিশীথে ভয়ঙ্কর শব্দসহকারে গিরিগাত্র বিদীর্ণ হইয়া নিদারুণ অগ্নি উদ্গাত হইল, বৃক্ষলতা পশুপক্ষী দগ্ধ হইতে লাগিল, হিমালয়ের কিছু অংশ ভস্মীভূত হইয়া গেল, ধরিত্রীর অন্তঃস্থল হইতে গলিত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ তাম্র উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশপটে অভিনব জ্যোতির্ম্ময় উৎস সৃষ্টি করিতে লাগিল, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টিকার্য্য স্থগিত রাখিয়া আত্মরক্ষামানসে পলায়নপর হইয়াছিলেন এমন সময় গর্জ্জমান অগ্নিশিখার প্রচণ্ড গর্জ্জন প্রচণ্ড হাস্যে রূপান্তরিত হইল। অগ্নিশিখার ভিতর হইতে হাসিতে হাসিতে স্বয়ং পিতামহ আবির্ভূত হইলেন। বলিলেন, "ভয় পেলে না কি বিশু, ভয় পেও না, তোমার সৃষ্টি একটু বদলে দিলাম"

বিশ্বকর্ম্মা একটু রুষ্ট হইয়াছিলেন।

"বদলে দিলেন মানে?"

"তোমার মাপজোক বড় নিখুঁত হচ্ছিল। সৃষ্টি ব্যাপারে অত জ্যামিতি পরিমিতি মেনে চললে কি চলে? কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও ঠাণ্ডা, কোথাও গরম, কোথাও উষর, কোথাও ধূসর, কোথাও শ্যামল, কোথাও খেয়াল—খেয়াল খুশীর বৈচিত্র্য থাকা চাই; তুমি যা করছিলে তাতো একটা ঢিবি। এইবার দেখতো কেমন হল—"

আর একবার, বিশ্বকর্ম্মা যখন গভীর সমুদ্রের তলদেশে শুক্তি সজ্জিত করিতেছিলেন বিশালকায় এক জীব আসিয়া তাঁহার সম্মুখে মুখ ব্যাদান করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মস্তকের উভয় দিক হইতে তীব্র আলোকচ্ছটা নির্গত হইয়া সহসা সমুদ্রের অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতেছিল, মনে হইতেছিল সমুদ্রের জলে বুঝি সহসা আগুন লাগিয়া গেল। সেবারও বিশ্বকর্ম্মা ভয় পাইয়াছিলেন, সেবারও সেই ভীষণ জলজন্তু পিতামহের কমনীয় কান্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মৃদুহাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বিশু ভয় পেলে না কি, ভয় পেও না। আমি ভাবছিলাম তোমার এই চমৎকার মুক্তোগুলো পাহারা দেবার জন্য ভয়ঙ্কর একটা জানোয়ার সৃষ্টি করলে কেমন হয়? সুন্দরের ঠিক পাশেই ভয়ঙ্কর না থাকলে সুন্দর আর সুন্দর থাকবে না, খেলো হবে যাবে? কি বল—" পিতামহের নির্দ্দেশ অনুসারে বিশ্বকর্ম্মাকে বহুবিধ সামুদ্রিক জীবও সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল।

বিশ্বকর্ম্মার মনে হইল পিতামহ সম্ভবত অনুরূপ কোন কৌতুকে মত্ত হইয়া নূতন ক্রীড়ায় লিপ্ত হইয়াছেন। তখন সেই শূন্য কক্ষেই পিতামহ অবস্থান করিতেছেন ইহা ধরিয়া লইয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "পিতামহ, আমি আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে চার্ব্বাককে মায়ানদী পার করে' দিয়েছি, কিন্তু আমি নিজের বুদ্ধিতে আর একটা কাজও করেছি, জানি না আপনি তা সমর্থন করবেন কিনা"

শূন্য কক্ষের বায়ুস্তর কয়েকটি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের স্পর্শে ক্ষণিকের জন্য চমকিত হইয়া উঠিল এবং পরমুহূর্ত্তেই পিতামহের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"তুমি যা করেছ তা আমি জানি। তুমি নিজের বুদ্ধিতে যা করেছ তাও আমার অজানা নয়, কারণ সে বুদ্ধি আমিই তোমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছি। মুখরা বর্ণমালিনীর জিভটাকে তাক মাফিক খুব কাজে লাগানো গেছে। কালকূটের সঙ্গে চার্ব্বাকের দেখা হওয়াতেও খুব ভাল হয়েছে। দুই গোঁয়ারে জুটে কি ভীষণ কাণ্ড করে, দেখ না—"

"ভীষণ কাণ্ড করবে না কি"

"নিশ্চয়। সুন্দ-উপসুন্দের কথা মনে নেই, যার জন্তে তোমাকে তিলোত্তমা বানাতে হ'ল, যে তিলোত্তমাকে দেখতে গিয়ে আমি চতুর্মুখ হয়ে গেলাম এরাও সেই সুন্দ-উপসুন্দের জাত। তুলকালাম করে' তবে থামবে—"

বিশ্বকর্ম্মা ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "তাই না কি, কি করবে বলুন তো—"

"তা এখনও আমি ঠিক করি নি"

কথাটা বিশ্বকর্ম্মা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলেন না।

পিতামহ বলিলেন, "ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। সেদিন যে নূতন দ্বীপটি সৃষ্টি করেছ তার জন্তে কয়েক অক্ষৌহিনী ক্যাঙারু তৈরি করগে যাও। বেশ বড় বড় ক্যাঙারু চাই—"

বিশ্বকর্ম্মা ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "স্বৈরচর তৈরি তাহলে এখন স্থগিত রহিল ?"

"না, তাদের ভার আমি স্বয়ং নিয়েছি। তাদের নিয়ে আমি এখন বাস করছি ভবিষ্যৎ লোকে"

"ভবিষ্যৎ লোকের সৃষ্টি আবার কবে হল ?"

"হয় নি, হবে। তাই নিয়েই ব্যস্ত আছি আমি"

"কোথায় আছেন আপনি ?"

"ভবিষ্যৎ লোকে"

"ঠিক মাথায় ঢুকছে না আমার। যে লোক নেই সেখানে আপনি আছেন কি করে !"

"তাই যদি বুঝতে পারবে তাহলে তুমি বিশ্বকর্ম্মা না হয়ে ব্রহ্মা হতে। তোমার যেটুকু বুদ্ধি আছে তা অতিশয় কুচুটে বুদ্ধি, নিজের কাজ না করে' তাই তুমি বিষ্টুর সঙ্গে জুটে গোপনে আমার নামে যা তা আলোচনা কর—"

"আজ্ঞে না, যা তা আলোচনা তো কখনও করি নি। বিষ্ণুই বলছিলেন যে আপনি যদি সত্যিই স্বৈরচর সৃষ্টি করেন তাহলে সৃষ্টি আর থাকবে না—"

"এমনিতেই সৃষ্টি আছে না কি। বিষ্ণুকে বলে' দিও যে আমি একদিন আমার সমস্ত সৃষ্টির হিসাব তার কাছে দাবী করব। সে হিসাব তিনি যদি নিখুঁতভাবে না দিতে পারেন তাহলে এমন এক স্বৈরচর তৈরি করব যে তাঁর বিষ্ণুত্বই লোপ করে দেবে সে। বিষ্ণুকে বলে' দিও এ কথা—"

শুষ্ককক্ষের বায়ুস্তরকে চিরিয়া সশব্দে বিদ্যুৎ চমকিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা মুখব্যাদান করিয়া কি যেন বলিতে গেলেন কিন্তু বলিতে পারিলেন না। সশব্দে আর একটি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সর্পাকারে প্রলম্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ফণা বিস্তার করিয়া ঘুরিতে লাগিল। পিতামহের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। "বিশু, ভয় পেলে না কি, ভয় পেও না। যা বললাম তা কর গিয়ে। তোমার যেমন ভাবে খুশী তেমনি ভাবে কর, তোমাকে আমি আর বাধা দেব না, কারণ আমার বাধা দেবার সময় নেই! ভবিষ্যৎলোক নিয়ে আমি মহাব্যস্ত আছি। ঠিক করেছি ভবিষ্যৎলোক সৃষ্টি করব নানা মাপের বিদ্যুৎ তরঙ্গ দিয়ে, ওই তরঙ্গগুলোই হবে সেই লোকের নিয়ামক। সৃষ্টি ঠিক এমনিই থাকবে, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত হবে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রভাবে। নানারকম বিদ্যুৎতরঙ্গের সম্ভাবনা আমি সৃষ্টি করছি মহাকালে! তোমার সাহায্যের দরকার নেই এতে, কারণ কল্পনাই এ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। তুমি ক্যাঙারু তৈরি কর গে যাও। আর বিষ্ণুকে বোলো আমার সৃষ্টির হিসাবটা যেন ঠিক করে' রাখে, হঠাৎ একদিন গিয়ে হাজির হব আমি। পালনকর্ত্তা নিজের কর্ত্তব্যটা কেমন ভাবে করেছেন দেখতে চাই। তুমি যাও—"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, "পিতামহ, যদি অভয় দেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভবিষ্যৎলোক সৃষ্টি করবার এ অদ্ভুত প্রেরণা আপনি পেলেন কি করে ?"

"প্রেরণা জোগাচ্ছে ওই চার্ব্বাকের দল। ওদেরই জিজ্ঞাসায় বিচলিত হয়ে আমি নানারূপে বিবর্ত্তিত হয়ে আত্ম আবিষ্কার করছি। ওরা আমাকে ধরতে চাইছে, আর আমি নানা ছদ্মবেশে এড়িয়ে যাচ্ছি ওদের। এই লুকোচুরি খেলা চলছে, এই খেলাই আমার প্রেরণা—"

বিশ্বকর্ম্মা নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। (ক্রমশঃ)

খাদ্য-সমস্যা—

খাদ্য-সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ মধ্যে মধ্যে যে বলিতেছেন, সুদিনের আর বিলম্ব নাই, তাহাতে লোক আস্থা স্থাপন করিয়া বর্ত্তমানের অভাব-জনিত আশঙ্কা ও অসন্তোষ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। তাহা সম্ভবও নহে। পশ্চিমবঙ্গে গত চারি বৎসরে খাদ্য-সম্বন্ধীয় সঙ্কটজনক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে—

(১) গত বৎসর বহু মুসলমান কৃষক পূর্ব্ব পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ায় ১১ লক্ষ বিঘা জমীতে চাষ হয় নাই। অথচ গত বৎসর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ১৪ লক্ষ হিন্দুর আগমনে পশ্চিমবঙ্গে বার্ষিক খাদ্যের প্রয়োজন ৩ লক্ষ টন বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

(২) সরকারের ব্যবস্থায় অনেক জমীতে ধান্যের চাষ না করিয়া পাটের চাষ করা হইয়াছে এবং যে জমীতে আশুধান্যের চাষ হইয়াছে, তাহার অনেকাংশে, যথাসময়ে বৃষ্টির অভাবে, ফশল হয় নাই ; আশুধান্যের ফলন প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন হয়—তাহা শতকরা ৬০ ভাগ কমিয়াছে।

এই দুই কারণের দায়িত্ব কাহার? এ কথা যদি সত্য হয় যে, মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় ১১ লক্ষ বিঘা জমীতে চাষ হয় নাই, তবে জিজ্ঞাস্য, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ১৪ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে যে বহু কৃষক ছিল, তাহাদিগকে সেই ত্যক্ত জমী কেন—মেয়াদী বন্দোবস্তে—চাষ করিয়া খাদ্যোপকরণ উৎপন্ন করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিমৃশ্যকারিতার ও অযোগ্যতার পরিচায়কই নহে? যে সকল মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহারা অধিকাংশই ভয়ে যায় নাই—পাকিস্তানপ্রীতিতে গিয়াছে; অনেকে ফিরে নাই। সে যাহাই হউক, পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে যে লোকের আগমন অনিবার্য্য তাহা বুঝিয়াও সরকার কেন, মুসলমানদিগের ত্যক্ত জমী হিন্দু কৃষকদিগকে, অন্ততঃ সে বৎসরের জন্য, চাষ করিতে দেন নাই? ইহা কি সরকারের অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে? এ অপরাধ ইচ্ছাকৃত না-ও হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে অযোগ্যতার পরিচায়ক, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

অনাবৃষ্টির জন্য সরকার দায়ী না হইলেও, খাদ্যাভাবের সময় অনেক জমীতে ধান্যের চাষ কমাইয়া পাটের চাষ করান সঙ্গত কি না, তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। পাটের চাষে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ খাদ্য কম উৎপন্ন হইবে, কেন্দ্রী সরকার তাহা প্রদান করিবেন—এ কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোককে বলিয়াছিলেন। এখন কিন্তু তাঁহারাই বলিতেছেন, কেন্দ্রী সরকারের প্রতিশ্রুত খাদ্যশস্য যথাকালে পাওয়া যাইতেছে না।

বিহারের দুর্ভিক্ষ যে অতিরঞ্জিত, এমন কথা না বলিলেও এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষ অসাধারণ এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী হওয়ায় তাহা আরও ভয়াবহ। সে অবস্থায় যে পশ্চিমবঙ্গের দাবী অবজ্ঞাত হইয়াছে, তাহা বলিলে প্রাদেশিকতার পরিচয় প্রদান করা হয় না—সে দাবী জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গের সচিবরা বলিতেছেন, বাঙ্গালীরা অকারণ অধিক ভাত খায় এবং তাহাদিগের পক্ষে ভাত খাইবার অভ্যাস ত্যাগ করা কর্ত্তব্য! অথচ তাঁহারাই যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অভাব হইবার কথা নহে। যদি তাহাই হয়, তবে কি ব্যবস্থার ত্রুটিতেই সমগ্র বাঙ্গালী জাতি অপূর্ণাহারে থাকিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে না?

সাধারণতঃ ভাদ্র মাসেই নূতন আশুধান্য বাজারে আসিতে থাকে; এ বার তাহা আসে নাই বলিলেই হয়। সরকারের প্রচার-কার্য্যের ফলে ও পাটের দাম গত বৎসর অধিক হওয়ায় বহু কৃষক আশুধান্য চাষের জমীতে পাট বুনিয়াছে। এখন উপায় কি? এ বার বৃষ্টি সময়মত হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে আমন ধান্য ভাল হইবে না। সেইজন্য লোক মজুদ ধান ছাড়িতেছে না বা চোরাবাজারে বিক্রয় করিতেছে—সরকার তাহা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। কলিকাতার উপকণ্ঠেই ভাদ্র মাসের প্রথমে চাউল ৫৫ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে—মফঃস্বলের ত কথাই নাই।

সরকারের সংগ্রহকার্য্য আশানুরূপ হইতেছে না। গত বৎসর আগষ্ট মাসের প্রথম ৩ সপ্তাহে যে স্থানে ৪ হাজার ২ শত ৫১ টন সংগৃহীত হইয়াছে, এ বার সে স্থানে ৩ হাজার ৩ শত ৮৭ টনের অধিক সংগৃহীত হয় নাই। সংগ্রহনীতি সম্বন্ধেও বলিবার অনেক কথা আছে। গত বৎসর আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত যে স্থানে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টন সংগৃহীত হইয়াছিল সে স্থানে এ বার সংগৃহীত শস্যের পরিমাণ ৭২ হাজার টন কম হইয়াছে। সুতরাং অবস্থা শোচনীয়।

বেসরকারী হিসাবে দেখা যায়, এ বার শতকরা প্রায় ৬০ বিঘা জমীতে

...টির অভাবে আমন ধান্যের চাষ হয় নাই। ২৪পরগণা, হাওড়া, হুগলী, ...দিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, দার্জিলিং ও কুচবিহার—সর্বত্র এই অবস্থা। বর্দ্ধমান, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, দার্জিলিং ও কুচবিহার এই ৫টি জিলায় অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয়।

ময়ূরাক্ষীর খালে সেচের সুবিধা হইবে—দামোদরের জল নিয়ন্ত্রিত হইলে পশ্চিমবঙ্গ স্বর্গ হইবে—এ সব কথায় লোকের জঠরানল নির্ব্বাপিত হয় না। যেরূপ চেষ্টায়, যুদ্ধের সময়, বৃটেন তাহার খাদ্যাভাব দূর করিয়াছিল সেরূপ চেষ্টার অভাবই কি আজ পশ্চিমবঙ্গে ও সমগ্র ভারতে লক্ষিত হইতেছে না?

বিহার মৎস্য, তরকারী, ফল প্রভৃতি রপ্তানী বন্ধ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা শোচনীয় হইলেও তথা হইতে কোন খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী বন্ধ করা হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গে যে গত ৪ বৎসরই অন্নকষ্ট রহিয়াছে তাহার কারণ কি?

সেদিন ভারত সরকারের খাদ্য মন্ত্রী বলিয়াছেন, তিনি "ভুবন ভ্রমিয়া" চাউল সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পরে আর বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করিবে না ঘোষণা করায় ব্রহ্ম যে তাহার চাউল অন্যত্র বিক্রয় করিয়াছে, তাহার জন্য কি তিনি ও তাঁহার সহকর্মীরা দায়ী নহেন? পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে জিজ্ঞাসা করিয়া অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা ও প্রয়োজন অবগত হইয়া কি জওহরলাল ঐ ঘোষণা করিয়াছিলেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে বিষয়ে কি করিবেন?

যদি সরকারী হিসাব সত্য হয়, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে যদি চাউলের অভাব না থাকে, তবে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য বিভাগ এবং সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যসচিবের দপ্তর তুলিয়া দিয়া লোককে অসুবিধা ও অর্থ ব্যয় হইতে অব্যাহতি দিবেন?

পশ্চিমবঙ্গের এক জন সচিব কিছু দিন হইতে বলিতেছেন—তুলার চাষ কর। তিনি কি মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যোপকরণ এত অধিক উৎপন্ন হয় যে, সে জন্য আর কোন চিন্তা নাই—এখন সকলের পক্ষে "সুবোধ বালকের" মত তুলার চাষে মন দেওয়ার প্রয়োজন? তুলার চাষ কি তাঁহার বিভাগের কার্য্যক্ষেত্রে হইবে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ধান্যের উৎপাদন প্রয়োজনানুরূপ বর্দ্ধিত করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ জানিতে লোকের আগ্রহ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং তাহার সহিত যখন বিবেচনা করা যায়, ...দের স্বীকৃতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অভাব নাই, তখন প্রদেশে ...কের অবস্থা রহস্যসমাচ্ছন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই রহস্য ভেদ করা প্রয়োজন। যে স্থানে অভাব নাই, সে স্থানে অভাবের তাড়না লক্ষিত হয় কেন? পশ্চিমবঙ্গে যে এখনও বহু আবাদযোগ্য জমী "পতিত" রহিয়াছে, তাহার কারণ কি? অথচ "অধিক খাদ্য উৎপাদন কর"—আন্দোলনের ছিদ্রপথে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ছিদ্রকুম্ভে বারির মত বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহাও দেখা যাইতেছে!

প্রদেশের সীমা-পরিবর্ত্তন—

বিভক্ত বাঙ্গালার পুনর্গঠনকালে ইংরেজ যখন বিহার ও উড়িষ্যাকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করেন, তখন বাঙ্গালার কয়টি বঙ্গভাষাভাষী প্রধান অঞ্চল বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল—কেন না, বিহার ও উড়িষ্যা দরিদ্র প্রদেশ হইবে। তখনই কংগ্রেস বলেন, ভবিষ্যতে যেন বঙ্গভাষা-ভাষী ঐ সকল অঞ্চল একই শাসনাধীন করা হয় অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভুক্ত করা হয়। তদবধি কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজের নিকট হইতে শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করিয়াই কংগ্রেসের কর্তারা আর সে প্রতিশ্রুতিতে গুরুত্ব আরোপ করেন নাই; পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন—কেবল ভাষার বিষয় বিবেচনা করিলেই হইবে না, শাসনবিষয়ক সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। এমন কি গান্ধীজীও আর কংগ্রেসের পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সমধিক আগ্রহ দেখান নাই। আর বিহারে বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদ বিহারের বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলিকে হিন্দী-ভাষা-ভাষী করিবার জন্য যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন এবং বিহার সরকার সে জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিন্দনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা বিহারের বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলি বাঙ্গালা-ভুক্ত করিবার আন্দোলনে সাহায্য করিতে পারেন, এমন লোকের প্রতি খর দৃষ্টি রাখিবার জন্যও পুলিসকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মানভূম সত্যাগ্রহ প্রাদেশিকতার সংস্পর্শশূন্য হইলেও তাহা বাঙ্গালীর নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ায় সে সম্বন্ধে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মনোভাবও প্রশংসনীয় নহে।

বাঙ্গালার (এখন পশ্চিমবঙ্গের) এই দাবী সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন—পূর্ণিয়া জিলা ও সাঁওতাল পরগণা পশ্চিমবঙ্গকে প্রদান করা হউক। কমিটী কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষা করিতে বলেন নাই, বাঙ্গালীর দাবী হিসাবেও কোন কথা বলেন নাই—কেবল বলিয়াছেন, যে হেতু পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে, সেই জন্য দয়াদত্ত দান হিসাবে ঐ স্থানদ্বয় পশ্চিমবঙ্গকে প্রদান করা হউক। কমিটী খনিজ সম্পদবহুল মানভূম ও সিংভূমের কথায় উল্লেখ ও করেন নাই! কংগ্রেসে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—অন্য সম্বন্ধে হয়ত কিছু করা হইবে; বাঙ্গালা অবজ্ঞাতই থাকিবে। ইহাতে বাঙ্গালীর কি মনে করা সঙ্গত, তাহা বিবেচ্য। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সহানুভূতি দেখান নাই। তাঁহার পূর্ব্বে গান্ধীজী যদিও বলিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু মুসলমানে বিরোধ দূর করিবার জন্য নোয়াখালীতেই থাকিবেন—যদি প্রয়োজন হয়, তথায় তিনি প্রাণ ত্যাগ করিবেন। তথাপি বিস্ময়ের ও পরিতাপের বিষয়—তিনিও সে প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই—বিহারে হাঙ্গামার বিষয় অবগত হইয়াও নোয়াখালী ত্যাগ করিয়া তথায় গমন করিয়া তথা হইতে দিল্লীতে গমন করেন—নোয়াখালীতে আর গমন করেন নাই!

অল্প দিন পূর্ব্বে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্র সীমা-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেন। তাহাতে বলা হয়—

যদি বর্ত্তমান সময়ে প্রাদেশিক সীমা পরিবর্ত্তন সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের দাবী অবিলম্বে বিবেচনা করা সঙ্গত। কারণ, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আবার দলে দলে লোক আসিতেছে এবং প্রতিবেশী প্রদেশে যাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। যদিও প্রধান মন্ত্রী তাঁহার পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর মারফতে জানাইয়াছেন—বর্ত্তমান সঙ্কটকালে বাঙ্গালার সীমা-পরিবর্ত্তন বিবেচ্য হইতে পারে না, তথাপি কেহ কেহ মনে করেন, সেই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে সীমা পরিবর্ত্তনের বিষয় বিবেচনা করা সঙ্গত।

এই মন্তব্যে কেন্দ্রী বিহারী সমিতির সম্পাদক যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'ষ্টেটস্‌ম্যানের' কেন্দ্রী কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত বলিয়াই তিনি বাঙ্গালার দাবী অবিলম্বে বিবেচ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন—'ষ্টেটস্‌ম্যান' যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন, সে সকল পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সংবাদপত্রের যুক্তি—সে সকল সংবাদপত্রের পক্ষে স্বজনগণপ্রীতি অবশ্যম্ভাবী।

কেবল ইহাই নহে—বলা হইয়াছে, ইচ্ছা করিয়াই হাজার কয়েক পূর্ব্ববঙ্গাগতকে শিয়ালদহ হইতে নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পাঠাইয়া আবার ফিরাইয়া আনিয়া একটা "লোক-দেখান" ব্যাপার করা হইতেছে! এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালার উদ্বাস্তু-সমস্যা অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে।

আমরা জানি, কাহারও কাহারও অভিমত এই যে, বিহারের অন্ন-সমস্যা অতিরঞ্জিত; তথায় প্রকৃত অন্নাভাব তত প্রবল নহে। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতির প্রদেশ সম্বন্ধে অতিরিক্ত ও অকারণ মনোযোগী। এ কথা সত্য কি না, সে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না।

কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি এই অভিযোগ নতমস্তকে গ্রহণ করিবেন? হাজার কয়েক পূর্ব্ববঙ্গাগতকে শিয়ালদহ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারই বিহারে ও উড়িষ্যায় পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগের মধ্যে কতকাংশ ফিরিয়া আসায় তাঁহারা যে তাহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে বসতির জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহাতে মনে করা অসঙ্গত নহে—যে সকল কারণে তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, সে সকল ভিত্তিহীন নহে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ কি তাঁহারা করিবেন না? পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কি এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই?

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র প্রদেশে পরিণত হইয়াছে—অথচ তাহা সীমান্তবর্ত্তী হওয়ায় তাহার সমস্যা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। বিহারে যদি সত্য সত্যই এ বৎসর খাদ্যাভাব হইয়া থাকে, তবে কি পশ্চিমবঙ্গের চারি বৎসরব্যাপী খাদ্যাভাব বিশেষভাবে বিবেচ্য নহে? বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশ কৃষিপ্রধান ও পশ্চিমাংশ শিল্পপ্রধান। কাজেই বিভাগে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবী। অথচ কেন্দ্রী সরকার সেই পশ্চিমবঙ্গেই আউশ ধান্যের [illegible] কতকাংশ খাদ্যের পরিবর্ত্তে পাটচাষ করাইয়া শ্রমিকদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছেন। বিহার হইতে যে দলে দলে লোক আসিয়া অর্থার্জ্জন করিতেছে, তাহাতেও পশ্চিমবঙ্গের যে অন্ন অন্ন প্রয়োজন, তাহার কতকাংশ শোষিত হইতেছে। যদি পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানায় অবাঙ্গালীর নিয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে যে বাঙ্গালীর বেকার-সমস্যার বহু পরিমাণে সমাধান হয়, তাহা বলা বাহুল্য। এ কথা কি সত্য নহে যে, বিহার সরকার জামসেদপুরে কারখানায় বিহারীদিগের নিয়োগ করিতে বলিয়াছেন—এমন কি উপযুক্ত বিহারীর অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে পদ শূন্য রাখিতে হইয়াছে? পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন না, তাহার কারণ কি? বিহারে বাঙ্গালীরা যে ব্যবহার পাইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত থাকিবার কথা নহে। সুতরাং কিরূপে মনে করিব—বিহার বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদিগের প্রতি অকারণ সদয় ব্যবহার করিয়াছে বা করিবে?

এই সকল বিবেচনা করিলে স্বতঃই বলিতে হয়—বাঙ্গালীকে এক যোগে দাবী করিতে হইবে—বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করিতে হইবে—মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া পশ্চিমবঙ্গকে দিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি সে দাবী না করেন, তবে বাঙ্গালীকে আগামী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই এই সরকারের পতন ঘটাইতে হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, ভারত রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার যে কোন প্রদেশের আছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সে কথাও বিবেচনা করিতে পারে—কলিকাতা বন্দর পশ্চিমবঙ্গের এবং সেই বন্দরের প্রয়োজন ভারত রাষ্ট্রের অল্প নহে।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর অবস্থা—

পাকিস্তান—পতনের পূর্ব্বে মুসোলিনীর মত—বজ্রমুষ্টি দেখাইতেছে এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানে সমরায়োজনের অভিনয় চলিতেছে। ইহাতে যে পূর্ব্ববঙ্গে অবশিষ্ট হিন্দুদিগের মনে আতঙ্ক সঞ্চার অনিবার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। দিনের পর দিন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগের ভারত রাষ্ট্রে আগমনে এখন হিন্দুদিগের মনের অবস্থা প্রতিফলিত হইতেছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল যখন ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল—পশ্চিমবঙ্গের জনগণের অভিমতের অপেক্ষা না রাখিয়া পাকিস্তানের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন, তখনই সন্দেহের কারণ ছিল—সে চুক্তির সর্ত্ত রক্ষিত হইবে না অর্থাৎ পাকিস্তান চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিবে না। যখন চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ হইলে ভারত রাষ্ট্র যুদ্ধ করিতে আগ্রহশীল নহেন, তখন সে চুক্তিতে আপত্তি অবশ্যম্ভাবী এবং সে চুক্তি যে ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণজনক হইবে না—ইহাও অনেকে বলিয়াছিলেন।

সম্প্রতি ভারত সরকার পাকিস্তানকে যে পত্র লিখিতে হইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে, পাকিস্তান সরকার চুক্তির সর্ত্তবিরোধী নানা কাজ করিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে নির্ব্বিঘ্নতা ও আস্থা রাখিয়া হিন্দুর পক্ষে পূর্ব্ব পাকিস্তানে বাস বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তান সরকারের যে সকল কার্য্যে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সে সকলের উল্লেখও ভারত সরকার [illegible]

(১) সহরে গৃহ অধিকার করা। সহরে বহু হিন্দুগৃহ সরকার অধিকার করিতেছেন। যশোহরের মত ক্ষুদ্র সহরেই ৩ শত হিন্দুগৃহ অধিকার করা হইয়াছে। ঢাকায়, খুলনায়, ময়মনসিংহে ও চট্টগ্রামেও বহু হিন্দুগৃহ অধিকৃত হইয়াছে। যে সকল গৃহ অধিকার করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই হিন্দুর—অতি অল্পসংখ্যকই মুসলমানের। চুক্তির সর্ত্তে আছে যে, অধিকারী বা তাঁহার স্বজনগণ গৃহে থাকিলে সে গৃহ অধিকার করা হইবে না। পশ্চিমবঙ্গে সরকার সেই সর্ত্তানুযায়ী কাজ করিলেও পূর্ব্ব পাকিস্তানে সরকার তাহা ভঙ্গ করিতেছেন। আবার ঐ সকল গৃহ যে সরকারের জরুরী প্রয়োজনে অধিকৃত হইয়াছে, এমন নহে—অনেক গৃহই বেসরকারী মুসলমানদিগের ব্যবহারজন্য অধিকার করা হইয়াছে। এ বিষয় পাকিস্তান সরকারকে জানান হইয়াছে—কিন্তু প্রতীকার হয় নাই।

(২) সম্পত্তি হস্তান্তর। চুক্তিতে সম্পত্তির অধিকারীর সম্পত্তি বিক্রয় বা বিনিময়ের অবাধ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু পাকিস্তানে কালেকটারের অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও ১০ বিঘার অধিক খাস জমী হস্তান্তর করিতে দেওয়া হইতেছে না। ইহাতে চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করা হইতেছে। তদ্ভিন্ন সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে হস্তান্তরকারীর আয়-কর চুক্তির ছাড় দিতে হয়। ঢাকা হইতে সেই ছাড় পাইতে এত বিলম্ব হয় যে, হস্তান্তরকারীর পক্ষে বহু বিলম্ব ও অসুবিধা হয়। সহস্র সহস্র বাস্তুত্যাগী আবেদন করিলেও পূর্ব্ববঙ্গ-বাস্তুত্যাগী-সম্পত্তি-সংরক্ষণ-সমিতি তাঁহাদিগের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণভার গ্রহণ করেন নাই। তাহাতে বাস্তুত্যাগীরা বিশেষ বিব্রত হইতেছেন।

(৩) অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে গ্রেপ্তার। বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দুকে পূর্ব্ববঙ্গে অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্ডিনান্সের বলে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। তাঁহারা নাকি সরকারের অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে বহু লোককে গ্রেপ্তার করায় পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের মনে আতঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ময়মনসিংহ জিলার সীমান্তে—তাহারা কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত এই অভিযোগে বা সন্দেহে—বহু সংখ্যক গারো, হাজং প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোককে গৃহ ও জমী হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ফিরিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে সাহায্য করা ত দূরের কথা, এক হাজার ৪ শত টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড-কর দিতে বাধ্য করা হইয়াছে। রাজসাহী জিলায় নিচোল থানার যেসকল সাঁওতাল ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে জমী ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে না।

(৪) চাকরীতে বঞ্চিত করা। পূর্ব্ববঙ্গের শ্রম কমিশনার—শ্রম-পরামর্শ-পরিষদের মতানুসারে সকল সরকারী ও বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে—কারখানা প্রভৃতিকে—জানাইয়া দিয়াছেন, চাকরী খালি হইলে তাহাতে মুসলমান নিয়োগ করিতে হইবে। এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের চাকরীর পথ বন্ধ করা হইতেছে। এ স্থলে বলা প্রয়োজন, সরকারী চাকরীতে হিন্দুনিয়োগ পূর্ব্বেই একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(৫) শিল্প প্রতিষ্ঠান অধিকার। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই পূর্ব্ব-বঙ্গ সরকার ইচ্ছামত জারি করেন, [illegible] অনুপস্থিতিতে সরকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান অধিকার করিয়া লইতেছেন। এ বিষয়ে ভারত সরকারের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন্ত্রী বহু অভিযোগ পাইয়াছেন। কোন প্রতীকার হয় নাই।

(৬) বেসামরিক সেনাবাহিনী। আনসার বাহিনীতে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুর স্থান নাই। এই বাহিনী উগ্রভাবে হিন্দু-বিদ্বেষী এবং গৃহে খানাতল্লাস করা প্রভৃতি কার্য্যে ইহাদিগকে ব্যবহার করা হয়। সীমান্তে খানাতল্লাস প্রভৃতি যে সকল কার্য্যে আনসারদিগকে ব্যবহার করা হয়, সে সকল চুক্তির বিরোধী।

(৭) শিক্ষানীতি। পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা বিদ্যালয়ের জন্য যে পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে ভারত, কংগ্রেস, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে যে সকল গ্লানিকর উক্তি আছে, সে সকলে মুসলমান-দিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ঘৃণার উদ্রেক হয়। হিন্দু ছাত্র-দিগকেও এই সকল উক্তি পাঠ করিতে হয়।

এই সকল কথা ভারত সরকারের। ভারত সরকারই বলিয়াছেন—

(১) এ সকল ব্যাপার চুক্তির বিরোধী

(২) ইহার প্রতীকার হইতেছে না

আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ অবস্থায় কি মনে করিতে হয় না—চুক্তির সর্ত্ত যে ভাবে পাকিস্তান ভঙ্গ করিয়াছে, তাহাতে চুক্তি বাতিল হইয়াছে? ইহার পরেও কি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য এক জন মন্ত্রী রাখার কোন সার্থকতা আছে?

কেবল ইহাই নহে; চুক্তির সর্ত্ত কি ভাবে পালিত হইতেছে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা তাহা আলোচনা করিবেন—এই উদ্দেশ্যে যে সভা আহ্বান করা হইয়াছিল, পাকিস্তান তাহাতে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছে—সময় উপযোগী নহে!

চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের যে চাউল ও পাট যোগাইবার কথা ছিল—পাকিস্তান সে পরিমাণ চাউল ও পাট দেয় নাই। তবুও কি ভারত সরকার কয়লা প্রভৃতি যোগাইতে বাধ্য?

প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের বিশ্বাস, "আজিকে বিফল হলে হ'তে পারে কাল" এবং সেই বিশ্বাসে তিনি চুক্তি বাতিল না করিয়া বহাল রাখিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। তাঁহার এই বিশ্বাসের ভিত্তি কি এবং কোন ভিত্তি আছে কিনা, বুঝিবার উপায় নাই। কাশ্মীর সম্বন্ধে তাঁহার অনুসৃত নীতিও বুঝা যায় না। কাশ্মীরের একাংশ পাকিস্তান অধিকার করিয়া রহিয়াছে—অথচ জওহরলাল ঘোষণা করিতেছেন, কাশ্মীর ভারতরাষ্ট্র-ভুক্ত এবং কাশ্মীর আক্রমণ তিনি ভারত আক্রমণ বলিয়াই বিবেচনা করিবেন। যদি তাহাই হয়, তবে যে সময় ভারতীয় সেনাবল কাশ্মীর হইতে অনধিকার-প্রবেশকারী পাকিস্তানীদিগকে বিতাড়িত করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত তখন তিনি কেন বিদেশে জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতা চাহিলেন? আজ পর্য্যন্ত কেন তিনি কাশ্মীরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে পাকিস্তানী অধিকার সহ্য করিতেছেন?

কাশ্মীরের ব্যাপারের সহিত পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সম্বন্ধ মনে হয়।

কাশ্মীরের ব্যাপার লইয়াই আর পূর্ব্বপাকিস্তান হইতে—চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া অবশিষ্ট হিন্দুদিগকে বিতাড়িত বা ধর্ম্মান্তরিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

কংগ্রেসে মতভেদ—

কংগ্রেস এ দেশে সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা এবং তদবধি এ দেশের রাজনীতিক ইতিহাস কংগ্রেসের ইতিহাস। ভারতবাসীর রাজনীতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা ইহাতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কর্ম্ম-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার জন্য বহু ভারতীয় নানাবিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। একান্ত পরিতাপের বিষয়, দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবার সময় হইতে ইহাতে নানারূপ মতভেদ ইহাকে দুর্ব্বল করিতেছে এবং ক্ষমতামত্ততায় ইহাতে নানারূপ দুর্নীতি দেখা দিতেছে। কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন, যতদিন দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল না হইবে, ততদিন কংগ্রেসের প্রয়োজন শেষ হইবে না। গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবার পরে কংগ্রেস তাহার রাজনীতিক উদ্দেশ্য শেষ হওয়ায় গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলে তাহাই সঙ্গত হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। কংগ্রেস ও সরকার সংযুক্ত রাখা হইয়াছে। ফলে সরকারের দোষে লোক কংগ্রেসকে এবং কংগ্রেসের ক্রটিতে সরকারকে দায়ী করিতেছে। কংগ্রেসের দেশ বিভাগে সম্মতিতে এবং সেই বিভাগজনিত দুর্দ্দশায় বহু লোক—কংগ্রেসের বিরোধী হইয়াছে এবং কংগ্রেসও সরকারের—কাশ্মীরে অনুসৃত নীতি, পাকিস্তানের সহিত চুক্তি, মুদ্রামূল্য হ্রাস—এই সকল সমর্থন করায় কতক লোকের অপ্রীতিভাজন হইয়াছে। তাহার উপর দেশ বিভাগের পর হইতে সরকার দেশের খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব দূর করিতে না পারায় দেশে যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য লোক যেমন সরকারকে, তেমনই সরকারের সমর্থনকারী কংগ্রেসকে দায়ী করিতেছে। কারণ, দেখা যায়—যখনই জাতীয় কার্য্যে ক্রটি ঘটে তখনই জনগণ যে শাসনে তাহা হয় তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে।

কংগ্রেসের জনগণের নিকট অপ্রিয় হইবার অন্যতম কারণ—দুর্নীতি। যে সকল লোক এককালে কংগ্রেসকে সাহায্য করিয়াছে বা কংগ্রেসের কাজে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, আজ তাহারা কেহ কেহ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছে এবং তাহারা—অভিজ্ঞতাশূন্য হইলেও—"পারমিট", ঠিকাদারী, চাকরী প্রভৃতি পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে বলিতে হয়, আয়ার্লণ্ডে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। আয়ার্লণ্ডে—

"When the truce came and danger had disappeared, there was a startling increase in the number of patriots whose exploits had been hitherto unrevealed."

আর তাহারাই তখন পুরস্কারলোভে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল।

অল্পদিন পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে—শর্করা উৎপাদনকারীদিগের পক্ষ হইতে [illegible] নির্ব্বাচনে সরকার-কংগ্রেস পক্ষকে নির্ব্বাচন-ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের প্রচারপত্র প[illegible] জন্য যাহারা সরকারের নিকট বস্ত্র কণ্টেনের ছাড় পায় তাহাদিগকে প্রতি কংগ্রেসকে টাকা প্রদানের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে!

আবার কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া নূতন রাজনীতিক দল গঠিত করিয়াছেন; ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী রফি আহম্মদ কিদোয়াই মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন; প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ত্যাগ করায় কংগ্রেসে যেন ভূমিকম্প হইতেছে। সকলেই জানেন, কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি—পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন—পণ্ডিত জওহরলালের দলের লোক নহে এবং তাঁহার মনোনীত প্রার্থীকে পরাভূত করিয়া, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের চেষ্টায়, নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত জওহরলালের মতান্তর মনান্তরে পরিণতি লাভ করিয়াছে। কংগ্রেসে মতভেদহেতু পরিচালক-দিগের ব্যবহার কেবল যে কংগ্রেসকে ও সরকারকে দুর্ব্বল করিতেছে, তাহাই নহে—এই দুর্দ্দিনে দেশের লোকের মনে যে অবসাদ সৃষ্টি করিতেছে, তাহার ফল শোচনীয় হইতেছে। দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবার সঙ্গে সঙ্গে গণমনে যে আনন্দের ও আশার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে তাহা যে জাতির উন্নতির সহায় হইত, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সেই আনন্দ আজ নিরানন্দে ও সেই আশা আজ নিরাশায় পরিণত হইয়া জাতির মনে অবসন্নভাব প্রসারিত করিয়াছে ও করিতেছে। এই সময়ে যদি কেন্দ্রী সরকারের মন্ত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ পণ্ডিত জওহরলালকে জাতির একমাত্র নেতা বলিয়া প্রচারকার্য্য না করিতেন, তবে ভাল হইত। কারণ, তাঁহাদিগের জানা প্রয়োজন, যে জাতির নেতৃত্ব মাত্র একজনই করিতে পারেন, সে জাতির দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেও একদিন সেই নেতার তিরোভাব কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।

দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া আচার্য্য কৃপালনী, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি যেমন কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির নিন্দা করিতেছেন—কংগ্রেস ত্যাগ না করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও তেমনই তাহাই করিতেছেন। অর্থাৎ কংগ্রেস তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইতেছে:—

(১) কংগ্রেসের অতিরিক্ত রাজনীতিক দলসমূহ হইতে। ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—হিন্দু মহাসভা, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন জনসঙ্ঘ, কৃষক-প্রজা-মজদুর দল, কম্যুনিষ্ট দল, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি। এই সকলের পরে আবার পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা একটি দল গঠনের চেষ্টা—পাকিস্তানের সহিত ভারত রাষ্ট্রের বিরোধের সময়—করিতেছেন।

(২) কংগ্রেসের এক দল।

(৩) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও তাঁহার সমর্থকগণ।

এই অবস্থায় কেহ কেহ বলিতেছেন, যখন কংগ্রেসীরা একদা গান্ধীজীর মতানুবর্ত্তী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তখন তাঁহাদিগের পক্ষে কংগ্রেসের রাজনীতিক কার্য্য বর্জ্জন করাই ভাল। পণ্ডিত

হরলাল প্রভৃতি তাহা বলেন না ; তাঁহারা কংগ্রেসকে তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তিত করিয়া তাহার রাজনীতিক রূপ রক্ষা করিতে চাহিতেছেন।

দেখা যাইতেছে, একদল পণ্ডিত জওহরলালকেই কংগ্রেসের দলপতি করিতে ইচ্ছুক এবং তিনি নিজেও বলিয়াছেন, সাধারণ অবস্থায় প্রধান-মন্ত্রীর পক্ষে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করা অসঙ্গত হইলেও সঙ্কটকালে নহে। অধিক কংগ্রেসের সহিত সরকারের সম্বন্ধ কি বা কিরূপ হওয়া সঙ্গত তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই। কংগ্রেসে যে একাধিক মতের স্থান স্বীকার করিতে কংগ্রেসী নেতারা অসম্মত তাহাও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুই জানাইয়াছেন।

এই জটিল অবস্থায় নেহরুর সহিত ট্যাণ্ডনের মিলন ঘটাইয়া আপাততঃ সঙ্কট দূর করা অনেকের অভিপ্রেত বলিয়া সে পক্ষে নানা চেষ্টা হইতেছে কিন্তু সে সব চেষ্টা এখনও সফল হয় নাই। এখন অদূর ভবিষ্যতে—নির্বাচনের পূর্ব্বেই—কংগ্রেসের এক অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া কংগ্রেসের গঠন-পদ্ধতির পরিবর্তন করার চেষ্টা হইতেছে। গঠন-পদ্ধতির কিরূপ পরিবর্তন হইবে এবং তাহার পরে কংগ্রেসের নীতি কি হইবে তাহা দেশকে বিব্রত করিতেছে।

সরকারের অযোগ্যতা বা অক্ষমতা যেমন কংগ্রেসকে দুর্ব্বল করিয়াছে ও করিতেছে, কংগ্রেসের নেতৃগণের মধ্যে দলাদলি তেমনই সেই দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি করিয়া বিপদের সম্ভাবনা ঘটাইতেছে। সে বিপদ কেবল কংগ্রেসের ও সরকারেরই নহে ; তাহা জাতিরও বিপদ হইতে পারে।

খাদ্যোপকরণের উৎপাদন-হ্রাস—

গত ২৯শে আগষ্ট পার্লামেণ্টে খাদ্য-মন্ত্রী ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে ভারত রাষ্ট্রের খাদ্যোৎপাদনের যে হিসাব দিয়াছেন, তাহা দুঃসংবাদ ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। যদিও ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ "অধিক খাদ্য-উৎপাদন" আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং নানা পরিকল্পনা প্রচার করিতেছেন, তথাপি—আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ববৎসরে উৎপন্ন ৫৫,৩২৮ কোটি টন খাদ্যোপকরণের স্থানে মাত্র ৫১,৩১৫ কোটি টন উৎপন্ন হইয়াছে ! কৈফিয়তে বলা হইয়াছে ; অসাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগই ইহার জন্য দায়ী।

ভারত রাষ্ট্রের মত বিরাট রাষ্ট্রে যে স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, পঙ্গপালের আক্রমণ প্রভৃতি হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া হিসাব করাই সঙ্গত। সরকার যে তাহা করেন নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

ভারত সরকার যে হিসাব মধ্যে মধ্যে দেন সে সকল নির্ভরযোগ্য কি না, সিংহ মহাশয় সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের হিসাব নির্ভরযোগ্য হইলে যে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অভাব হইবার কথা নহে, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং বলিতে হয়, সরকারের হিসাবের উপকরণ সংগ্রহে ত্রুটি আছে।

বলা হইয়াছে, সরকার বাহির হইতে যথাসম্ভব অধিক চাউল আমদানীর চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না—১৯৫০ খৃষ্টাব্দে যে স্থানে ৪ লক্ষ টন চাউল আমদানী করা হইয়াছিল পরবৎসর সেই স্থানে ৯ লক্ষ টন আমদানী হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে ও মাদ্রাজে চাউলের অভাবে লোককে কি জন্য অপূর্ণাহারে থাকিতে হইতেছে ? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে ? আর দেশে "অধিক খাদ্যোৎপাদন" আন্দোলন পরিচালিত করিয়া যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা কি অপব্যয় বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে না ?

এই প্রসঙ্গে সরকারের ভূমিসেনা দল গঠনেরও উল্লেখ করিতে হয়। জাঁকজমক করিয়া—অর্থ ব্যয় করিয়া এই দলের উদ্বোধন করা হইতেছে। অথচ ইহারা অধিক খাদ্যোৎপাদনে কি সাহায্য করিতে পারে, তাহা জানিবার বিষয়। এ দেশের কৃষকরা যে সার, সেচ, উৎকৃষ্ট বীজ প্রভৃতির উপকারিতা বুঝে—তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু তাহারা সে সকলের ব্যবহার-সুযোগ পায় না অর্থাৎ সরকার সে সকলের সুবিধা করেন না এবং তাহারাও দারিদ্র্যহেতু সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। সরকারের কৃষি বিভাগ ও পরীক্ষাক্ষেত্র আছে। সে সকলের দ্বারা লোককে শিক্ষণীয় বিষয় শিখান যায় এবং সেই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ভূমিসেনা দল গঠিত করিয়া কেবল সরকারের ব্যয়, তরুণ-তরুণীদিগের উৎসাহ ও সময় ব্যয় করা সার হইবে বলিয়া মনে হয়।

১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন খাদ্য শস্যের হিসাব (১০০০ টন হিসাবে) এইরূপ :—

আসাম… ১৩০৮
বিহার… ৩৪৩১
বোম্বাই… ৩৬২৭
মধ্যপ্রদেশ… ৩২০৬
মাদ্রাজ… ৬৬৫২
উড়িষ্যা… ২৫০২
পঞ্জাব… ১৯৫৭
উত্তর প্রদেশ… ৮৪৬৬
পশ্চিমবঙ্গ… ৪০২০
হায়দ্রাবাদ… ১৩৩৬
জম্মু ও কাশ্মীর… ৩৩৭
মধ্য ভারত… ৮২৭
মহীশূর… ৭৯১
পেপসু… ৪৮৯
রাজস্থান… ১০৯০
সৌরাষ্ট্র… ২৩২
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন… ৪০০
আজমীর… ৩৮
ভূপাল… ১৩৩
বিলাসপুর… ১২
কুর্গ… ৪৪
দিল্লী… ২৮
হিমাচল প্রদেশ… ১২৬

কাছাড়··· ২৮
মণিপুর··· ৫৫
ত্রিপুরা··· ২০২
বিন্ধ্য প্রদেশ··· ৩৫১
আন্দামান ও নিকোবর··· ২

বিদেশ হইতে কতদিন খাদ্য আমদানী করিয়া দেশের অর্থ বিদেশে দিতে হইবে, তাহাই এখন জিজ্ঞাস্য।

বিদেশ হইতে যে খাদ্যোপকরণ আসিতেছে, সে সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হাস্যোদ্দীপক ও বৈষম্য-মূলক। রুশিয়া ও চীন বিনা সর্ত্তে গম ও চাউল দিয়াছে ও দিতেছে। কলিকাতা বন্দরে রুশিয়ার ও চীনের জাহাজ খাদ্য শস্য লইয়া আসিলে দেশের লোক যত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশই কেন করিয়া থাকুক না—সরকারের পক্ষ হইতে প্রশংসার তূর্য্যনাদ শুনা যায় নাই। কিন্তু নানা সর্ত্তে—বহুদিন বিলম্ব করিয়া আমেরিকা যে গম ঋণ হিসাবে দিতেছে, তাহা লইয়া যে জাহাজ কলিকাতা বন্দরে উপনীত হয়, তাহার অভ্যর্থনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রচার দপ্তর হইতে নানা ব্যবস্থা হইয়াছে; এমন কি যাহাতে সকল সংবাদপত্রে সে অভ্যর্থনার বিবরণ ও ছবি প্রকাশিত হয়, সে জন্য পত্র প্রেরিত হয় এবং রিপোর্টারদিগকে অভ্যর্থনাস্থানে লইয়া যাইবার জন্য যানের ব্যবস্থাও করা হয়! অথচ আমেরিকার গম দান নহে—মূল্য দিয়া কিনিতে হইতেছে। আজ মনে পড়ে, লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতে বড়লাট তখন ভারতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া জার্ম্মানীর সম্রাট বড়লাটকে তার করিয়াছিলেন :—

"Full of the deepest sympathy for the terrible distress in India. Berlin has, with my approval, raised a sum of over half a million of marks."

—ইত্যাদি।

মূল্য দিয়া যে গম কিনিতে হইতেছে, তাহার জন্য সম্বর্দ্ধনা কেন? বিশেষ—ভারত সরকার কমনওয়েলথের ব্যবস্থায় মুদ্রামূল্য হ্রাস করায় আমেরিকার গমের মূল্য ডলারে হিসাব করিয়া যে অধিক দিতে হইবে, তাহাও বিবেচ্য। অবশ্য পাকিস্তানের সহিত চুক্তিতেও ভারত রাষ্ট্রকে এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে।

গত চারি বৎসরে ভারত সরকার যে রাষ্ট্রকে খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। অথচ এই কৃষিপ্রাণ দেশে খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধি সহজেই হইতে পারে এবং এখনও রাষ্ট্রে যে বহু কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী জমী "পতিত" আছে, তাহা আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি। কাজেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে :—

"পানীমে মীন পিয়াসী—
দেখত দেখত লাগত হাসি।"

রাষ্ট্রে যে আশানুরূপ লাভ হয় নাই, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গে গভীর জলে মৎস্য সংগ্রহের কথা যে আর শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

আমরা দেশের লোককে ও দেশের সরকারকে সমবেত চেষ্টায় রাষ্ট্রকে খাদ্যোপকরণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করিতে বলিতেছি।

ভারত রাষ্ট্রে মুসলমান—

পাকিস্তানের সমরায়োজনে ও বজ্রমুষ্টি প্রদর্শনে ভারত সরকারকেও, যদি প্রয়োজন হয় সেইজন্য, প্রস্তুত হইতে হইয়াছে। ইহাতে ভারত রাষ্ট্রের নানা স্থানে মুসলমানরা পাকিস্তানের কার্য্যের নিন্দা ও ভারত রাষ্ট্রের আনুগত্য ঘোষণা করিতেছেন। আমরা আশা করি, এই সকল মুসলমানের কার্য্যে আন্তরিকতার অভাব নাই।

কিন্তু এই সময় পশ্চিমবঙ্গে কেন যে এক দল মুসলমান সৈয়দ বদরুদ্দোজার নেতৃত্বে এক নূতন দল গঠিত করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। কলিকাতায় সেই দলের যে অধিবেশন (গত ২৫শে ও ২৬শে আগষ্ট দুই দিন) হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যদিও ভারত রাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতি পূর্ণ আস্থার ও তাঁহাকে সম্পূর্ণ সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তথাপি কেন যে বলা হইয়াছে—"চতুর্দ্দিকে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে তাহার মধ্য হইতে নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল ইসলামের আছে" তাহা বুঝা যায় না।

যাঁহারা বিশ্বাস করেন, জগতের বা ভারতের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য হইতে কেবল ইসলামই নূতন জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে, তাঁহারা যে, প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষভাবে, ইসলাম রাষ্ট্র সমর্থন করেন, তাহা বলা অসঙ্গত নহে। যদি তাহাই হয়, তবে পাকিস্তানের বিঘোষিত নীতি তাঁহারা সমর্থন করেন। সে অবস্থায় তাঁহাদিগের ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নীতি সমর্থনের অর্থ কি?

অবশ্য বদরুদ্দোজা বলিয়াছেন, তিনি যে দল গঠিত করিয়াছেন, তাহা মসলেম লীগের বেনামদার নহে। কিন্তু দেশের লোকের অজ্ঞাত নাই যে, তিনি অতীতে একাধিকবার রাজনীতিতে মত-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বেও তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়াছেন। সুতরাং আজ যদি তিনি কংগ্রেসী সরকারের প্রধান-মন্ত্রীর সমর্থন ঘোষণা করেন, তবে কেহ কেহ তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে তাহা অসঙ্গত বলা যায় না। সেই কারণে আমরা মনে করি, এই নূতন দলের সম্বন্ধে সরকারের বিশেষ উৎসাহী হইবার কোন কারণ নাই।

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার-কার্য্য পরিচালনের কেন্দ্র ধরা পড়িয়াছে।

পাকিস্তানে যুদ্ধোদ্যমে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সহস্র সহস্র হিন্দু চলিয়া আসিতেছেন, তাহার কারণ অবশ্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কেন যে তথা হইতে দলে দলে মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন, তাহার কারণ বুঝা যায় না। ইহার কারণ—হয় মুসলমানরা আপনাদিগকে পশ্চিমবঙ্গে অধিক নিরাপদ মনে করেন, নহেত ইহা—ইংরাজীতে যাহাকে infiltration বলে তাহাই—অর্থাৎ কোন দেশে আসিয়া সে দখল দুর্বিধা।

গত ৩০শে আগষ্ট পার্লামেন্টে বলা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে একটি শহরের কয়েকটি গৃহে খানাতল্লাস করিয়া ভিন্ন রাষ্ট্রের গুপ্তচরের আড্ডার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি লোক বে-আইনী ভাবে পশ্চিমবঙ্গে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা করিতেছে, ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারত সরকার বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে আর অধিক সংবাদ প্রকাশ করিতে অসম্মত হইলেও—যে সংবাদ দিতে হইয়াছে, তাহাই অবস্থার গুরুত্ব বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট।

দিল্লী চুক্তির ব্যর্থতার ইহাও প্রমাণ বলিয়া বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে। দেখা যাইতেছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন্ত্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছেন না। তবে তিনি পদত্যাগ করেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে ভারত সরকার যে সতর্ক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জনগণকেও সতর্ক করা কি সঙ্গত নহে?

উদ্বাস্তু আগমন—

গত ১২ই ১৩ই ভাদ্র হইতে দলে দলে হিন্দু বসিরহাট সীমান্তস্থিত পাকিস্তান হইতে হাঁটিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছেন। ঐ পথে কয় দিনে যে ৩শত ৭৯ জন হিন্দু আসিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় (অর্থাৎ পোদ)। তাঁহারা আশাশুনী, পাইকগাছা, ডুমুরিয়া প্রভৃতি খুলনা জিলার নানাস্থান হইতে আসিয়াছেন।

তাঁহাদিগের অভিযোগ—

সীমান্তে তোমরা নামক স্থানে পাকিস্তানী পুলিস ও আনসাররা তাঁহাদিগের অর্থ ও তৈজসপত্র সবই বলপূর্ব্বক লইয়াছে।

তাঁহারা বলিয়াছেন—মানসম্ভ্রম লইয়া পাকিস্তানে বাস অসম্ভব বুঝিয়াই তাঁহারা গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাকিস্তানে গৃহপালিত পশু ও মাঠে শস্য চুরি প্রতিদিনের ব্যাপার হইয়াছে। তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগকে অসম্মানজনক কথা বলাও হইতেছে। প্রতীকার হয় না। পুলিসে জানাইলে পুলিস কিছুই করে না। আবার কিছুদিন হইতে হিন্দুদিগকে যুদ্ধের জন্য অর্থ দিতেও বাধ্য করা হইতেছে।

ভারত সরকারের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন্ত্রী, বোধ হয়, কলিকাতাতেই আছেন। তিনি যদি এই সকল আগন্তুকের অবস্থা দেখেন ও তাঁহাদিগের অভিযোগের বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারত সরকারকে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উপদেশ দেন, তাহা হইলে ভাল হয়। যখন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়, তখনও সেই দুই রাষ্ট্রে চুক্তি ভঙ্গ হয় নাই, মনে করা যায় কি না, তাহাই আজ ভারত সরকারকে বলিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের লোকই কেবল সে প্রশ্ন করিতেছে না—সমগ্র ভারত রাষ্ট্রের লোকের মনে আজ তাহা উদিত হইতেছে।

কাশ্মীর—

কাশ্মীরে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচন হইতেছে। ইহাতে পাকিস্তানের বিশেষ আপত্তি ছিল এবং যাহাতে এই নির্বাচন না হয়, সে জন্য পাকিস্তান বহবাস্ফোট গর্জন ও বিদেশে বিবেদন করিতে ত্রুটি করে নাই। এখন পাকিস্তান কি করিবে, তাহাই দেখিবার বিষয়। সে ভারত-রাষ্ট্রকে বজ্রমুষ্টি দেখাইয়াছে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতেছে—পশ্চিম বঙ্গে তাহার চরদিগের ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে—ইত্যাদি।

কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহে এবং কাশ্মীরের একাংশে যে পাকিস্তানীরা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধি "অনধিকার প্রবেশ" বলিতে দ্বিধানুভব করেন নাই। অথচ ভারত সরকার এখনও তথায় পাকিস্তানী প্রবেশ সহ্য করিয়া আছেন! আর পাকিস্তানের আস্ফালনে ভারত রাষ্ট্র নিজ সীমায় সেনা সন্নিবেশ করিয়াছে—এই অজুহাতে পাকিস্তান তাহাকে দোষী প্রতিপন্ন করিতে ব্যস্ত। সুখের বিষয়—ভারত সরকার, নানা বিষয়ে যেরূপ করিয়াছেন, এ বিষয়ে তাহা করেন নাই—পাকিস্তানের ব্যস্ততায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা শিথিল করেন নাই এবং ঘোষণা করিয়াছেন, যদি প্রয়োজন হয়, তবে ভারত রাষ্ট্র যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :—

"আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা অধর্ম্ম"

কারণ :—

"হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে ; বরং পরম ধর্ম্ম।"

জাপানের সহিত সন্ধি-সর্ত্ত—

ছয় বৎসর হইল জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরেই সামরিক অধিকার। এখনও তাহা শেষ হয় নাই। ভারত রাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ শান্তির সন্ধি সম্পাদিত করিয়া সেই অবস্থার প্রতীকার করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে মতভেদের জন্য বহুদিন সে কাজ হয় নাই। এতদিনে আমেরিকা ও বৃটেন সন্ধির ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। আমেরিকা ও বৃটেন দুইটি স্বতন্ত্র সন্ধিপত্র খসড়া করিয়াছিল। শেষে আমেরিকার খসড়ায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া উভয় দেশ তাহাই উপস্থাপিত করিয়াছে। ভারত সরকারকেও সেই সন্ধিতে সম্মতি দিয়া স্বাক্ষর দিতে বলা হয়। সান ফ্রান্সিশকোর সম্মিলনে তাহা চূড়ান্ত করা হইবে। আমন্ত্রিত হইয়া ভারত সরকার সে সম্মিলনে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইহার পরে ভারত সরকার জাপানী সরকারের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিবেন।

আমেরিকা ও বৃটেন যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাতে স্বাক্ষর দিতে ভারত সরকারের আপত্তি এই কয় দফা—

(১) রাইউকু দ্বীপ জাপানকে প্রত্যর্পণ করা হইতেছে না।

(২) জাপান হইতে বিদেশী সেনাবল অপসারিত করা হইতেছে না।

(৩) চীনকে ফরমোসা দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে না।

(৪) অন্য কোন দেশ, ইচ্ছা করিলে, পরে ঐ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে পারিবে, এমন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

ভারত সরকার অন্যান্য বিষয়ে যে ভাবে বৃটেন ও আমেরিকার অনুসরণ

করিয়াছেন, এই সময়ে যে তাহা করেন নাই, তাহার জন্য তাহারা প্রশংসার্হ। বিশেষ ভারত সরকার যে চীনকে কয়মোসা দিবার কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারত সরকার কম্যুনিষ্ট চীনের সম্বন্ধে যে মনোভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন, তাহা বৃটেনের ও আমেরিকার পক্ষে প্রীতিপদ হয় নাই এবং উভয় দেশের সংবাদপত্রের মন্তব্যে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। চীন যে দীর্ঘকাল যুদ্ধে বিব্রত হইবার পরে আপনার স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও আমেরিকার ধনিকবাদের নিকট মস্তক নত করে নাই, তাহা তাহার পক্ষে যেমন গৌরবজনক, বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষে তেমনই অপ্রীতির কারণ। বৃটেন ও আমেরিকা দীর্ঘকাল পৃথিবীর নানা দেশে শাসন ও শোষণ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে। চীনের ব্যাপারে যে বৃটেন ও আমেরিকা তাহাদিগের অনুগত চিয়াং কাইশেককে সর্ব্ববিধ সাহায্য দিয়া সমর্থন করিয়া আসিয়াছে, তাহা আর অপ্রকাশ নাই। এ দেশে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন চিয়াং কাইশেকের পক্ষাবলম্বন করেন, তখন শরৎচন্দ্র বসুই বলেন, চিয়াং কাইশেক বৃটেনের ও আমেরিকার অনুগত এবং সেইজন্য তিনি চীনের মুক্তিকামী নহেন। তখন জওহরলালের পক্ষ হইতে সেরূপ উক্তির জন্য শরৎচন্দ্রের নিন্দা করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে, শরৎচন্দ্রই অভ্রান্তভাবে অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চীন আজ স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারত রাষ্ট্রের সহিত তাহার বন্ধুত্ব উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর ও কাম্য। বিশেষ তিব্বত যে চীনের অধিকারগত তাহা বৃটেনও স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। তিব্বতের সহিত ভারতের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ—হিন্দুর তীর্থস্থান মানস সরোবর তিব্বতে অবস্থিত।

চীন ও ভারত যদি পরস্পরের সহিত প্রীতিবদ্ধ থাকে, তবে এশিয়া তাহার প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার অতি সহজেই করিতে পারে। তাহা যে শ্বেত জাতির পক্ষে আনন্দদায়ক নহে—তাহা বলা বাহুল্য।

মিশর—

মিশরের প্রধান মন্ত্রী মুস্তাফা নাহাস পাশা মিশরের নব জাগরণের প্রধান পুরোহিত জগলুল পাশার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সমবেত ব্যক্তিদিগের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন—মিশর অল্পদিনের মধ্যেই বৃটেনের সহিত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করিবে।

তিনি যে চুক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে লণ্ডনে সম্পাদন ও ২২শে ডিসেম্বর চূড়ান্ত করা হয়। ইহার পরমায়ু ২০ বৎসর। ইহার ফলে মিশরে বৃটিশ সামরিক অধিকার শেষ হয় ও সুয়েজখাল রক্ষার বৃটেনের বিশেষ স্বার্থ স্বীকৃত হয়।

মিশর প্রথমে তুরস্কের প্রদেশমাত্র ছিল এবং তাহার শাসক খদিব অর্থাৎ (তুরস্কের) কর্ম্মচারী নামে অভিহিত হইতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তৎকালীন খদিব তুরস্ক সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করায় মিত্রশক্তি তাঁহাকে স্বাধীন রাজা করেন। দুর্ব্বল তুরস্ক তাহাতে আপত্তি করিতে পারে নাই। তবে মিশরের সেই স্বাধীনতা নামমাত্রই; কারণ, মিশরে মিত্রশক্তির—বিশেষ বৃটেনের প্রাধান্য ছিল। সেই অবস্থার বিরুদ্ধ আন্দোলন করিয়া যাঁহারা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, জগলুল পাশা তাঁহাদিগের নেতৃস্থানীয়। তিনি মিশরের জনজাগরণের অগ্রদূত এবং তিনিই মিশরে স্বাধীনতার প্রেরণা আনিয়া ছিলেন। সে কার্য্যে তাঁহার পত্নীও তাঁহার সহায় ও সহকর্মী ছিলেন।

প্রাচী আজ নতভাবে ভাবিত হইয়াছে। সুতরাং মিশরের পক্ষে আর স্বাধীনতার নামে পরবশ্যতা ভোগ সম্ভব নহে। দিন দিন প্রাচীতে তাহাই লক্ষিত হইতেছে। জাপান প্রথমে জাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আজ চীন ও ভারত তাহাকেও অতিক্রম করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তুরস্ক কামাল পাশার চেষ্টায় নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়াছে। আজ পারস্য তাহার তৈলসম্পদ জাতীয়করণে কৃতসঙ্কল্প। মিশরের সঙ্কল্প স্বাভাবিক।

কোরিয়া—

কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা এ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই, পরন্তু তাহা সফল হইবার আশা ও সম্ভাবনা দিন দিন দূরবর্ত্তী হইতেছে। সম্প্রতি পেকিং রেডিও সম্মিলিত জাতিসমূহের সেনাধিনায়ক জেনারল রিজওয়েকে বোমাবর্ষণ সম্বন্ধে ঘটনা বিকৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি নাকি যুদ্ধ-বিরতির জন্য আলোচনার স্থান কেশিংএ বোমাবর্ষণ সম্বন্ধে মিথ্যা উক্তি করিয়াছেন। রিজওয়ে যে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানে অসম্মত হইয়াছেন, সেই সম্পর্কে বলা হইয়াছে—অপরাধী তাহার বিচারকে যেমন ভয় করে, রিজওয়ে অনুসন্ধানে সেইরূপ ভয় করিতেছেন কেন?

পিকিং রেডিওর এই মন্তব্য হইতেই কমুনিষ্টদিগের রিজওয়ে ও সম্মিলিত জাতিসমূহ সম্বন্ধে ধারণার ও মনোভাবের পূর্ণ পরিচয় প্রকট হয়। আর—

"Never can true reconciliation
grow
Where wounds of deadly hate have
pierced so deep."

যে স্থানে মতের অনৈক্য ঘৃণার উদ্ভব করে, তথায় মীমাংসা সম্ভব হইলেও সহজসাধ্য হয় না। আমেরিকা ও বৃটেন কম্যুনিষ্ট মতবাদের বিরোধী এবং সেই জন্যই তাহারা কোরিয়ার গৃহবিবাদের এক পক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। সে অবস্থায় তাহারা যে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বিনষ্ট না করিয়া মীমাংসায় সম্মত হইবে—বাধ্য না হইলে তাহা করিবে, এমন আশা করা যায় না। সেই জন্যই প্রথমাবধি অনেকে আশঙ্কা করিয়াছেন কোরিয়াতেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব হইবে। যখন লোক সত্য সত্যই শান্তির জন্য ব্যাকুল হইবে, তখনই জগতে "শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি রব" নিবৃত্ত হইবে; তাহার পূর্ব্বে নহে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

ছ-বৎসর পর।

উনিশ শো ছেচল্লিশ সাল।

দ্বারমণ্ডল জুড়িয়া আগুন জ্বলিতেছে: রাত্রিকাল, কৃষ্ণপক্ষ; রাত্রির শূন্য মণ্ডল আগুনের লেলিহান শিখায় রক্তাভ ধূমপুঞ্জে ভরিয়া উঠিয়াছে। ঊর্দ্ধ লোকের আকাশ দেখা যায় না। গোটা শহরটা জুড়িয়া উঠিতেছে বহু মানুষের সমবেত আর্ত্ত চীৎকার; বীভৎস হিংস্র চীৎকার, প্রচণ্ড ক্রোধের চীৎকার। সে ভয়াল চীৎকারে নিশীথিনী ক্ষণে ক্ষণে চকিত হইয়া উঠিতেছে। ধ্যানমগ্না তামসীর তপস্যা যেন মুহুর্মুহুঃ বিঘ্নিত হইতেছে। অথবা কোন এক প্রলয়ঙ্করীর মহালগ্নে রাত্রি হইয়া উঠিয়াছে কালরাত্রি। নিশীথিনী সৃষ্টির প্রথম ক্ষণের আদিম উল্লাসে আজ নৃত্যপরা হইয়া উঠিয়াছে। তার চারদিক ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে হিংসা-রক্ততৃষ্ণা-পৈশাচিক উল্লাস।

কার্ত্তিকের শেষ।

হেমন্তের আকাশে মধ্যে মধ্যে উল্কাপাত হয়। একটা উল্কা মধ্য আকাশ হইতে সুদীর্ঘ নীলাভ একটি রেখা টানিয়া পশ্চিম দিগন্তের কাছাকাছি আসিয়া মিলাইয়া গেল। রক্তাভ ধূমপুঞ্জের মধ্যেও সে একটি বিস্ময়কর রূপমাধুরীর রেখা টানিয়া দিয়া গেল কিন্তু তাহা দেখিবার কাহারও অবকাশ ছিল না। আকাশের দিকে চোখ তুলিবার কাহারও অবকাশ নাই। চোখ-কান-নাসারন্ধ্র ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিও আজ যেন আপন স্বভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। শুধু কি তাই? রাত্রিতে কুকুর ডাকে লোকালয়ে, মানুষ ঘুমায়। আজ কুকুরের ডাক শোনা যায় না। বোধ হয় আজ তারা রাত্রির এই ভয়াল রূপ দেখিয়া ওই ঘরের মাথার আগুনের আলোয় মানুষের মুখাবয়বের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে মহা জন্তুর প্রত্যক্ষ করিয়া, স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অথবা মানুষের কোলাহলে কুকুরের চীৎকার ঢাকা পড়িয়াছে।

দ্বারমণ্ডলে জ্বলিয়া উঠিয়াছে দাঙ্গার আগুন। উনিশ শো ছেচল্লিশ সালের নভেম্বর মাস। আজ অপরাহ্ন হইতেও সুরু হইয়াছে।

১৬ই আগষ্ট কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দাঙ্গার আগুন জ্বালাইয়াছে। কলিকাতার পর অক্টোবরে নোয়াখালি। তাহারই আগুন উল্কার টুকরার মত ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছে দ্বারমণ্ডলে। আগুন জ্বলিতেছে চারিদিকেই। চুড়ি পাড়ায়, ব্যাপারী পাড়ায়, টিকে পাড়ায়, তাঁতী পাড়ায়, তেলি পাড়ায়, নতুন পটিতে। পুরানো দ্বারমণ্ডলের সদর বাজারে জুতাপটির মোড়ে হিন্দু মুসলমান এলাকার সংযোগ স্থলে—গলির মুখে ছুরি—ডাণ্ডা—লাঠি—ভোজালি চলিতেছে। রেললাইনের ওপারে নতুন বাজার এলাকায় বসতি বিচিত্র; হিন্দু মুসলমান মিশিয়া গিয়াছে, সেখানে ছোরা লাঠী চলিতেছে—পাড়ার ভিতরে এখানে ওখানে।

এত বিস্ফোরক যে জমা হইয়াছিল—এ কে অনুমান করিয়াছিল? এত মিলনের চেষ্টা—এতকালের একত্র বসবাস—এত প্যাক্ট—এত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ সত্ত্বেও মনের ঘরে এত বারুদ এত বিষ ছিল?

দেবকী সেন অট্টহাস্য করিয়া বলিল—সোমনাথ, দেবগিরি, পানিপথ, মথুরা—তার আগে বৌদ্ধ সংঘারাম—বাংলার বৌদ্ধ পল্লীতে পল্লীতে যারা মরেছিল তাদের মেদ মজ্জা অস্থিচূর্ণে প্রস্তুত এই বিস্ফোরক। ওই ধ্বংসকাণ্ডের পরিমাণ যে অনুমান করতে না পারবে তারই কাছে বিস্ময়কর মনে হবে, সেই বলবে কোথায় ছিল এত বিস্ফোরক? কোটী মানুষের অশান্ত আত্মা মুক্তি না পেয়ে এ দেশের জলে বাতাসে মিশে ছিল—আজ তারা জেগে উঠেছে, উল্লাসে নেচে বেড়াচ্ছে। আমার সঙ্গে তো একজনের দেখা হয়েছে। আমার বিধবা বোনের!

উনিশ শো ছেচল্লিশ সাল।

বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ দৃশ্যত শেষ হইয়াছে। ইংরেজ যুদ্ধে জয়ী হইয়াও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে দেখিয়াছে ইউরোপে, প্রশান্ত মহাসাগরে যে বহ্নি নির্বাপিত করিল মনে করিয়াছিল—সেই বহ্নি ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার সাম্রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আগুন জলিবে। ভারতবর্ষ জুড়িয়া যে আগুন জলিবে—তাহাতে পুড়িয়া সে ছাই হইয়া যাইবে। পরিত্রাণের পথ অপসারণ।

আর এক পথ—ওই আগুনে ভারতবর্ষের আত্মাকে দগ্ধ করা।

ইতিহাস সে ভুলিয়া যায় না। তাহার শিক্ষাই—ইতিহাসের পাঠ।

আর একবার ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমনি আগুন জ্বলিয়াছিল। সেই কারণে কূটনৈতিক চেষ্টায় ইতিহাসের মুখ সে পিছনের দিকে ঘুরাইয়া দিতেছে। বর্ত্তমান ইতিহাসের ছক ভাঙিয়া দু শো বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাসের ছকে ঘুঁটি বসাইতেছে।

সতের শো পঞ্চাশ হইতে সতের শো একষট্টি সালের ইতিহাসের ছক।

ভারতবর্ষের মানুষের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সাম্রাজ্য শক্তি ভাঙিয়া পড়িয়াছে, শৃঙ্খলা নাই, দিকে দিকে অরাজকতা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ। তারই প্রতিক্রিয়ায় অবরুদ্ধ-শ্বাস মানুষ মুক্তি পাইবার জন্য জাগিয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মণ শূদ্র সিয়া সুন্নী শাক্ত বৈষ্ণব জৈন বৌদ্ধ চাষী মধ্যবিত্ত জমিদার সামন্ত রাজা সব এক নব জাগরণে জাগিতেছে। ওদিকে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া আসিতেছে অভিযানকারী বাহিনী। এর আগেই গিয়াছে ময়ূর সিংহাসন কহিনূর কোটী কোটী স্বর্ণ মুদ্রা। পাঞ্জাব সীমান্ত হইতে পার্বত্য দেশের ঘরে ঘরে দামড়ির দামে বিকাইয়াছে—হিন্দু মুসলমান কন্যাবধূ। ক্ষেতে খামারে হাজার হাজার ক্রীতদাস কাজ করিতেছে। নাদির শার বাহিনীর অশ্বারোহীরা ঘোড়ার লেজের সঙ্গে তাহাদের হাতে গলায় বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া বিক্রী করিয়াছে। আটক হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত পথের দুধারে মাটিতে এখনও কালো রঙ মিলায় নাই। গ্রাম সহর ক্ষেত খামার পুড়িয়াছিল তাহারই দাগ। ক্ষেত্র কর্ষণের সময় লাঙলের ফালের ডগায় আজ উঠে অজস্র হাড়—মানুষের মাথা। নাদিরের অভিযানের কালে এ পথে রক্ত-পঙ্কের কথা আজও মানুষ ভুলতে পারে নাই।

আবার তাহারা আসিতেছে।

এ দিকে দাক্ষিণাত্যের শক্তি-কেন্দ্র হইতে পূর্ব্ব বাঙলা বিহার উড়িষ্যা—উত্তরে অযোধ্যা দিল্লী পাঞ্জাব পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র বর্গী-বাহিনীর অশ্বক্ষুরে বিধ্বস্ত। প্রতি শত নরনারীর মধ্যে অন্তত পাঁচ জন অঙ্গহীন, কাহারও নাই নাক, কাহারও কান, কাহারও হাতের আঙুল।

সামন্তে সামন্তে এ উহার ঘরে আগুন দিতেছে, ও উহার ঘরে ডাকাতি করিতেছে।

ইহারই মধ্যে সেই যুগে যুগোপযোগী জাগরণে জাগ্রত হইয়া মানুষেরা দল বাঁধিতেছে। বিভিন্ন দল একটি নেতৃত্বে সংযুক্ত হইলেই বিরাট শক্তিতে পরিণত হইবে। পাঞ্জাবে শিখেরা, অযোধ্যায় জাঠ-চাষীরা দল বাঁধিয়াছে। দিকে দিকে পরমাণু মিলিয়া অণু, অণু মিলিয়া বস্তুখণ্ডের মত কঠিন পদার্থে পরিণত হইবার কামনা জাগিতেছে।

মহারাষ্ট্রে কামনাটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা নীতিগত আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া এই মিলিত শক্তির নেতৃত্ব করিতে ব্যস্ত।

ওদিকে দিল্লীর অভিজাত মুসলমান আমীরদের বিভিন্ন দলের গোপন বৈঠকে বৈঠকে মন্ত্রণা চলিয়াছে। পাঞ্জাবে রোহিলখণ্ডে, অযোধ্যায় ফয়জাবাদে বৈঠক বসিয়াছে। মনের তুলাদণ্ডে ওজন চলিতেছে মুসলিম বাদশাহী ভারী অথবা এই মারাঠা নেতৃত্বে বা মুসলমান বাদশাহী বাদ দিয়া অন্য কোন নেতৃত্বে এই জাগরণ প্রত্যাশিত মুক্তি ভারী? অভিযানকারীরা মুসলিম হইলেও তারা বিদেশী, তারা পর—ইসলামী নেতৃত্ব হইলেও সে যে হইবে পরাধীনতা-বন্ধন—এ সত্য তাহারা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু তবু নিজেদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানদণ্ডের যে দিকে চাপানো আছে মুসলিম বাদশাহী সেই দিকে পড়িতেছে একটি আঙুলের সুকৌশল চাপ। সেই দিকটাই ঝুঁকিয়া পড়িতেছে বার বার।

অন্যদিকে মহারাষ্ট্র শিবিরে চলিয়াছে অনুরূপ দ্বন্দ্ব। মহারাষ্ট্র নেতৃত্ব বড় অথবা এই সম্মিলিত জাগরণ বড়?

এই অবস্থার মধ্যে প্রতিদিন জীবন হইয়া উঠিতেছে উত্তরোত্তর উত্তপ্ত, অবস্থা হইয়া উঠিতেছে অসহনীয়। বহুদিন ঝঞ্ঝা নাই বর্ষণ নাই প্লাবন নাই—দিকে দিকে আবর্জ্জনাপুঞ্জ জমিয়া জমিয়া পাহাড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই মধ্যে জীবনও শুষ্ক রসহীন হইয়া পরিণত হইতে চলিয়াছে বস্তুপুঞ্জে। বিদ্রোহী প্রাণশক্তি বহ্নিরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া এই বস্তুপুঞ্জকে দগ্ধ করিতে চাহিতেছে।

পানিপথে সংঘর্ষ হইয়া গেল।

অভিযানকারী আফগান-শক্তি ও সম্মিলিত ভারতবর্ষের শক্তির মধ্যে নয়। সংঘর্ষ হইল অভিযানকারী আফগান মুসলিমবাহিনী ভারতীয় মুসলিম আমীরবাহিনীর সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে একক মহারাষ্ট্রবাহিনীর। অন্যান্য হিন্দুশক্তি সন্দিগ্ধ হইয়া মহারাষ্ট্রীয় ঔদ্ধত্যে তিক্ত হইয়া তাহার দূরে সরিয়া রহিল।

সংঘর্ষে সব ধ্বংস হইয়া গেল।

মহারাষ্ট্রশক্তি পরাজিত হইয়া পানিপথে পড়িয়া রহিল, আকাশ ছাইয়া উড়িয়া আসিল মৃতমাংসাশী খেচরের দল পঙ্গপালের মত, চারিদিকে শৃগাল কুকুর ছুটিয়া আসিল; শবগন্ধে বায়ুস্তর দূষিত হইল। ওদিকে দিল্লীতে ফিরিয়া মারাত্মক আহত আমীরশক্তি শেষ শয্যা পাতিল, আহত বাঘের মত পার্ব্বত্য কন্দরে আশ্রয় লইল আফগানশক্তি। সেও নখ দন্ত বাও হারাইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ সেইদিনকে স্মরণ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল—বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতার দুর্গে দুর্গে ইংরাজ সৈন্য প্রস্তুত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। ওদিকে বন্দরের ঘাটে ঘাটে বাঁধা রণতরীর কামানগুলির মুখ সমুদ্রের দিক হইতে ফিরাইয়া ভারতবর্ষের দিকে ঘুরিতেছে। প্রতীক্ষমান সৈন্যদল বন্দরের জেটিতে সিঁড়ি ফেলিতেছে। জাহাজের উপর রণবাদ্যের যন্ত্রে যন্ত্রে গান বাজিতেছে—

Rule Britannia, Rule the Waves,

* * * *

When Britain first at heaven's Command
Arose from out the Azure main
This was the Charter of Land.

ওই গান গাহিয়া তারা নামিল।

শতখণ্ডে বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ সেদিন হতাশায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

সেদিন তাহারা শূন্য আসনের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিয়াছিল—অদৃষ্টবাদী ভারতবর্ষ—ললাটে হাত রাখিয়া বলিয়াছিল—এই আমাদের ভাগ্য। বিধির বিধানেই বোধ হয় তোমরা আসিয়াছ। তোমরাই বস ওই শূন্য সিংহাসনে। তাহারা বসিয়াছিল।

আবার তাহারা সেই অবস্থার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষের মানুষের মনকে দু'শো বৎসর পশ্চাতের ইতিহাসের পটভূমিতে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে।

দু'শো বছর পিছাইয়া দিতে পারিলে—সেখানে দাঁড়াইয়া সোমনাথ—দেবগিরি মথুরা কাশী স্পষ্ট দেখা যাইবে।

বস্তুতান্ত্রিক ইংরাজ জৈব প্রকৃতি নিখুঁতভাবে বুঝিতে পারে। সে দর্শন তার দিব্য দর্শন না-হইলেও সূক্ষ্মতম দর্শন। সে জানে—সঙ্গে সঙ্গে সেই কালের লীলা প্রকটিত হইবে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে।

বন্দরে বন্দরে জাহাজ সাজানো রহিয়াছে।

দুর্গে দুর্গে রণক্লান্ত সৈন্য।

হোক। যুদ্ধের প্রয়োজন হইবে না। ক্ষতবিক্ষত ভারতবর্ষ আবার তাহাদের আহ্বান করিবে।—এস—বস।

তাহার আয়োজন নিখুঁতভাবে হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে মালবার গিরিগাত্রে জিন্নাভবনে বৈঠক শেষ হইয়া গিয়াছে। আঙুলের টিপে ইসলামের দাবী দেশ জাতি অপেক্ষা ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃষ্টি উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে সুউচ্চ গিরি-শিখর পার হইয়া আরবে নিবদ্ধ হইয়াছে। ওই তাহাদের দেশ—ওইখানে তাহাদের সমাজ। এ দেশে ওইখানকার মানুষের খণ্ডাংশ তাহারা। এখানে তাহারা স্বতন্ত্র পৃথক। এ দেশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাহারা স্বতন্ত্র জাতি। একত্রে বাস তাহাদের অসম্ভব। এই সত্য প্রমাণ করিবার জন্য বাংলাদেশে সুরাবর্দ্দির নেতৃত্বে রক্তাতাণ্ডব সুরু হইয়াছে।

হিন্দুও উঠিয়া দাঁড়াইয়া মরণতাণ্ডবে নাচিতে সুরু করিয়াছে।

দ্বারমণ্ডলে বাধিয়াছে সেই দাঙ্গা।

দ্বারমণ্ডলের ইতিহাসও যে ভারতবর্ষের ইতিহাসেরই খণ্ডাংশ। সেই ইতিহাসে ক্ষুদ্র অতিক্ষুদ্র সংস্করণ। সাত বৎসর পূর্ব্বে জয়তারার আশ্রমের অংশ লইয়া যে দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল, যে দাঙ্গার মীমাংসার জন্য ন্যায়রত্ন আসিয়া থাকিয়া গিয়াছেন এখানে সেই দাঙ্গা আজ নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

ন্যায়রত্ন স্থবির হইয়াছেন এইবার।

অজয় জেলে। মুক্তি তাহার আসন্ন। সম্ভবত দিন কয়েকের মধ্যেই।

সাত বৎসর জেল হইয়াছিল অজয়ের।

জয়া—অজয়ের মা নাই। তিনি দেহ রাখিয়াছেন। অরুণা তাঁহার সেবা করে।

দেবকী সেন আসিয়া বলিল—জয়তারা আশ্রম ওরা আক্রমণ করবেই।

তাহার হাতে একখানা তলোয়ার।

অরুণা শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—তলোয়ারে—ও দাগ—

—রক্তের। তিনজনকে কেটেছি আমি।

—কেটেছেন?

—উপায় ছিল না। নইলে তারা আমাকে কাটত। পাড়া বাঁচাচ্ছিলাম। ওরা আক্রমণ করতে এসেছিল। আপনাদের কিন্তু এখানে আর থাকা হবে না। ওরা এখানটা আক্রমণ করবে এবং ঠাকুর মশায়ের উপর ওদের কঠিন আক্রোশ। তারও চেয়ে আক্রোশ এবং ঘৃণা আপনার উপর।

(ক্রমশঃ)

বাংলা মরেছ?

শ্রীরামেন্দু দত্ত

বাংলা! আজো মর্‌লে না কো?
মহামারীর পরে ও
পেট ভর্ত্তি অপমানে
আধপেটা খাও ঘরে ও!
দাঙ্গা তোমায় চাঙ্গা করে
"ভঙ্গে" ভিটা-হীন
চিনির সঙ্গে কাচের কুচি
"দালদা" ভিটামিন্‌!
আটার সঙ্গে তেঁতুল বিচি
"শেয়াল-কাঁটা" তেলে
বঙ্গের সব 'সুবোধ' 'গোপাল'
ভাতের সঙ্গে গেলে!
তোমার রাজ্য পালন করে
পরের ছেলে এসে—
পর ভেবো না, 'ভূগোল' দেখ
কোথায় যাচ্ছ ভেসে!
'ইতিহাসের' পাতা ক'টার
ইতি হ'লেই হয়
"বাংলা বলে ছিল কিছু
পুরাতত্ত্বে কয়"!

নেতারা সব স্বয়ং-সিদ্ধ,
কত কষ্ট পেলে!
"ষ্টেট্‌ এক্স্‌প্রেস্‌" জোটেনি, হায়,
ব্রিটিশদের সেই জেলে!
"জয় হিন্দ্‌" হেঁকে 'নেতাজী' কে
বানাও মৃত ভূত
মর্‌লে নাকো? মরো, মরো,
ওহে বঙ্গ-সুত!
টাকা বাঁচায় সরকার সব
কেরাণীদের ছেঁটে
কোটি কোটি যায় দরিয়ায়
'প্রোজেক্ট' 'পেলান্‌' এঁটে
'ঘুষ' নেবে না? মদ খাবে না?
জাহান্নমে যাও!
দেখি, কেবল গুণের জোরে
চাকরী কোথাও পাও!
একে পাপী "বাঙ্গালী" জাত,
তার ওপরে সাধু
দিলাম তোমায় 'খতম্‌' ক'রে
খাও কি খাবে, যাদু!

চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীতে যতো প্রকারের ধর্ম আছে—যতো প্রকারের সাধনা আছে তার মধ্যে শরীর রক্ষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং শ্রেষ্ঠ সাধনা বোধ করি আর নেই। আমাদের পূর্ববর্তী মহাপুরুষরাও বলে গেছেন—শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং! কিন্তু এই শরীর-রক্ষার কাজটি অত্যন্ত দুরূহ; এমন কি অসম্ভবও বলা চলে। আধি ব্যাধি জরা-মুক্ত জীব সংসারে দুর্লভ। জন্মের প্রথম দিনটি থেকেই ব্যাধির সঙ্গে শুরু হয় আমাদের সংগ্রাম, তারপর আজীবন সেই ব্যাধির আক্রমণ আশঙ্কায় আতঙ্কিত অবস্থায় অতিবাহিত করতে হয়। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এ আতঙ্কেরও অবসান নেই আর।

কখন কি ভাবে কোন্ ব্যাধি যে সহসা এসে আমাদের এই যত্নলালিত দেহটিকে আক্রমণ করবে, তার কোনো নিশ্চয়তাই নেই। যুগে যুগে আমরাও তাই আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন ক'রে আসছি—দেহকে ব্যাধিমুক্ত রাখবার জন্যে আমাদের যত্নের অবধি নেই আর।

জীবজগতের যেমন জন্ম আছে মৃত্যু আছে—ব্যাধিরও তেমনি। তবে উপযুক্ত চিকিৎসা এবং উপযুক্ত প্রতিষেধকের প্রয়োজন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা যে ব্যাধিটির সম্বন্ধে আলোচনা করছি, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তার নাম 'কর্কট'। পৃথিবীতে যতোগুলি মারাত্মক এবং দুরারোগ্য রোগ আছে তার মধ্যে এই কর্কট বা ক্যানসার রোগ একটি। এমন কি এটিকে মারাত্মক-প্রধানও বলা চলে। কারণ এর আক্রমণ প্রথমাবস্থায় বোঝাই যায় না এবং যখন বোঝা যায় তখন আর প্রতিকারের বড় একটা উপায় থাকে না। সুতরাং এর আক্রমণ মৃত্যুর পরোয়ানারই শামিল। তবে একটু আশার কথা—অল্প-বয়সীদের চেয়ে বেশি-বয়সী লোকেদেরই এ রোগ সাধারণত আক্রমণ ক'রে থাকে। আমাদের ভারতবর্ষে এ রোগ কিছু নতুন নয়—চিরকালই আছে। তবে বর্তমানে রোগটি ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের কথা, বিলেত, আমেরিকা, জার্মান প্রভৃতি দেশে যখন এই ক্যানসার রোগ নিয়ে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক কোটি কোটি টাকা খরচ ক'রে, বছরের পর বছর গবেষণা ক'রে যাচ্ছেন—তখন আমাদের দেশ পরম নির্বিকার! আমাদেরও যে কিছু এ সম্বন্ধে করণীয় আছে, দেশের স্বাস্থ্যের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে সেটা আমাদের দেশের লোক তেমন চিন্তাও করেন না। অথচ আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিকেরও অভাব নেই—সুচিকিৎসকেরও অভাব নেই। যে দেশে, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মতো ডাক্তার জন্মায়—ডাক্তার সুবোধ মিত্রের মতো ডাক্তার জন্মায়! তা ছাড়া আরো কতো স্বনামখ্যাত ডাক্তার যে দেশের গর্ব—সে দেশের লোক বিনা চিকিৎসায় ক্যানসারে মারা যাবে এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি থাকতে পারে!

চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের নতুন ভবন ফটো—তারক দাস

কয়েক বৎসর পূর্বে পর্যন্ত আমাদের দেশে ক্যানসার রোগের কোনো উল্লেখযোগ্য চিকিৎসাই ছিল না। এ ব্যাধি যে ব্যক্তিকে আক্রমণ করতো, তার একমাত্র দৈবের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর তেমন কোনো উপায়ই থাকতো না। রোগক্লিষ্ট জীবনের যন্ত্রণাদায়ক, দুর্বহ দিনগুলি কোনক্রমে অতিবাহিত ক'রে একদিন ক্যানসার রোগীকে মৃত্যুর কোলেই আশ্রয় নিতে হতো। কারণ আমাদের গরীব দেশের গরীব লোকেদের পক্ষে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কিংবা ডাক্তার সুবোধ মিত্রকে দিয়ে রোগ চিকিৎসা করানো সম্ভবপর নয়। আমাদের সাধারণ গৃহস্থঘরে অসুখ হ'লে চার টাকার বেশি ফী দিয়ে ডাক্তার ডাকার কল্পনাই করতে পারি না। চার টাকা তাই কি কম! আর বাড়াবাড়ি হ'লে হাসপাতালের

শরণাপন্ন হই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বছর কয়েক আগে পর্যন্ত ক্যানসার রোগ চিকিৎসা হয় এমন কোনো ভালো হাসপাতালও আমাদের দেশে ছিল না।

বছর পঁচিশ আগে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন প্রভৃতি ভবন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সেই সঙ্গে ক্যানসার গবেষণা ও চিকিৎসাও আস্তে আস্তে চলছিল। কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে এ সামান্য ব্যবস্থা অকিঞ্চিৎকর।

প্রখ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীসুবোধ মিত্র মহাশয় এই সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সচেতন হ'য়ে ওঠেন এবং একটি আদর্শ ক্যানসার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। যদিও সেবা সদন প্রতিষ্ঠার প্রায় গোড়া থেকেই তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ক্যানসার সম্বন্ধে গবেষণা ও চিকিৎসার প্রচলন তিনি ওখানে করেছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁর পরিকল্পনা আরো প্রসার লাভ করলো। তিনি চিন্তা করলেন—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও একটি স্বতন্ত্র ক্যানসার চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু কোনো একক শক্তির দ্বারা কোন বৃহৎ কাজই সম্ভবপর নয়, তথাপি তিনি একাকীই এই সুবৃহৎ কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হলেন। সংকল্প করলেন তাঁর চিন্তাকে, তাঁর কল্পনাকে কার্যে পরিণত করবেনই। একদা—আজ থেকে প্রায় দশ বৎসর পূর্বে তিনি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের (বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী) কাছে গিয়ে তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন এবং নিজেই সর্বপ্রথম পকেট থেকে এক শত টাকা ডাক্তার রায়ের হাতে দিয়ে বললেন: প্রত্যেক মাসে মাসে আমি এক শো করে টাকা আপনার কাছে জমা রেখে যাবো।

ডাক্তার রায় হেসে বললেন: তাহলে কতো বৎসরে একটা হাসপাতাল হ'তে পারবে বলে তোমার বিশ্বাস?

ডাক্তার মিত্র উত্তর দিলেন: যতো দিনেই হোক, আমার কল্পনা একদিন সফল হবেই—এই আমার বিশ্বাস।—

বিশ্বাস তাঁর ভঙ্গ হয়নি, সত্যিই একদিন তাঁর কল্পনা সাফল্যের পথে পা বাড়ালো। অবশ্য পরিহাস ছলে যাই বলে থাকুন ডাক্তার রায়—আগাগোড়া ডাক্তার মিত্রের সহায়তাই ক'রে এসেছেন তিনি।—উপদেশ দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে এই বিরাট কর্মের পথে ডাক্তার মিত্রকে চালিত করে এসেছেন তিনিই। নইলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতো বড় একটা প্রতিষ্ঠান হয়তো গড়ে উঠতে পারতো না। ইতিমধ্যে দেশের কতিপয় অর্থবান খ্যাতনামা বিশিষ্ট ব্যক্তিও ডাক্তার মিত্রের সংকল্পের সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠলেন। তাঁদের

মিলিয়ান ভোল্ট এক্সরে অ্যাপারেটাস উদ্বোধন উপলক্ষে পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু। উভয়ের মধ্যভাগে ডাক্তার সুবোধ মিত্র

ফটো—তারক দাস

অকুণ্ঠ দান ব্যতীত এই বিপুল পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা কোনো মতেই সম্ভব হ'তো না। দেশের ধনী লোকেদের সহায়তা এবং সাহায্য ভিন্ন কোনো দেশে, কোনো কালে কোনো বড় কাজই সম্ভব হয়নি। এই নবপ্রতিষ্ঠিত ক্যানসার হাসপাতালটির পশ্চাতে যাঁদের অকৃপণ দান জড়িত হ'য়ে আছে তাঁদের সকলের নাম এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে উল্লেখ করা সম্ভবপর নয় এবং যাঁরা এই প্রকারের মহৎ অনুষ্ঠানে দান করেন

তাঁরাও নামের আশায় করেন না, এও ঠিক ; কিন্তু তবুও তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নামোল্লেখ না করলে নিজের কাছেই যেন অপরাধী হ'তে হয়। তাই মাত্র কয়েকজন হৃদয়বান ব্যক্তির দানের কথাই উল্লেখ করবো।

ডাক্তার সুবোধ মিত্র মহাশয়ের পরিকল্পনানুযায়ী ক্যানসার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি অট্টালিকার এবং সে অট্টালিকা সর্বাধুনিক হওয়া চাই। তারপর চাই উন্নত ধরণের বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি—যা ইতিমধ্যে তিনি বিলেত, আমেরিকা, জার্মান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ ক'রে দেখে এসেছেন। পৃথিবীর সব সেরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিই তাঁর হাসপাতালের জন্য প্রয়োজন। কারণ তিনি এমন এক ক্যানসার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে চান, যা শুধু ভারতবর্ষ কেন—সমগ্র এশিয়াতেও নেই। এর জন্যে বহু অধ্যবসায় ব্যয় করতে হ'য়েছে তাঁকে, সেই সঙ্গে অর্থও। প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা এযাবত তাঁকেও ব্যয় করতে হয়েছে।

হাসপাতাল পরিদর্শনে লেডি মাউন্টব্যাটেন—পশ্চাতে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দণ্ডায়মান। ডাক্তার সুবোধ মিত্র লেডি মাউন্টব্যাটেনের সহিত কথোপকথন রত

পুরাতন চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালকেই নতুন রূপ দেবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। এই ব্যাপারে শ্রীযুক্ত এন-এল-পুরী পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। এগিয়ে এলেন শ্রীযুক্ত এস-এম বসু এক লক্ষ টাকা সাহায্য নিয়ে এবং মেসার্স বি এন এলিয়স্‌ও লক্ষ টাকা এই মহান উদ্দেশ্যে দান করলেন। এছাড়া আরো অনেকের অনেক দানে দ্রুত সম্ভাবনার পথে এগিয়ে চললো হাসপাতালের কাজ। কিন্তু এঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত এস কে আচার্য্যর দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একটি হাই পাওয়ার এক্স-রে অ্যাপারেটাস্ ক্রয়ের জন্যে প্রতিষ্ঠানকে তিন লক্ষ টাকা দান করলেন। আধুনিক বিজ্ঞানমতে এই অ্যাপারেটাস্ ক্যানসার রোগ চিকিৎসার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। এই যন্ত্রটি রাখবার জন্য যে গৃহের প্রয়োজন বেঙ্গল টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশন সেই গৃহ নির্মাণের জন্য লক্ষাধিক টাকা দান করলেন। যন্ত্রটি বিদেশ থেকে আনার ব্যাপারে মেসার্স ভিক্টর এক্স-রে কর্পোরেশন (ইণ্ডিয়া) যথেষ্ট সাহায্য করেন। হাসপাতাল ভবনটি আমেরিকার ক্যানসার হাসপাতালের আদর্শে নির্মিত হয়েছে এবং এর নির্মাণ কার্যের ভার নিয়েছিলেন ভিয়েনার বিখ্যাত স্থাপত্যশিল্পী মিঃ এইচ-কে গ্লাশ্ ও মেসার্স মার্টিন বার্ণ লিমিটেড্।

পূর্ণ তিনটি বৎসরের মধ্যে এই বিরাট হাসপাতালের সমুদয় কাজ শেষ হ'য়ে গেল। বর্তমানে সমগ্র এশিয়ায় এতো বড় ক্যানসার চিকিৎসালয় আর নেই। শুধু তাই নয়—পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সমস্ত বড় বড় ক্যানসার হস্‌পিটাল আছে ভারতবর্ষের চিত্তরঞ্জন ক্যানসার
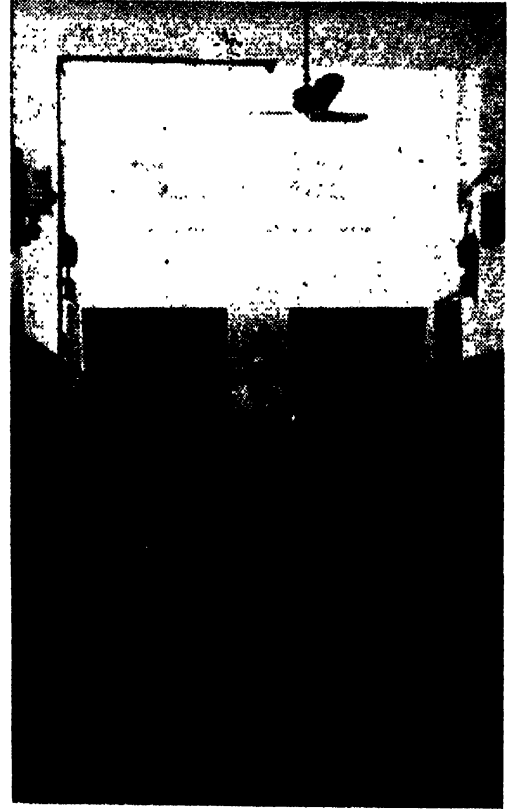
মিলিয়ান ভোল্ট সার্ভিস ফটো—স্টুডিও রেনেসাঁস

হস্‌পিটালও তার মধ্যে একটি। এই হাসপাতালের বিভিন্ন যন্ত্রগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করার উপলক্ষে আমেরিকার এই সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সব সময়ে পরামর্শ করা হয়েছে এবং মিলিয়ন ভোল্ট এক্স-রে অ্যাপারেটাস্ কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় সে সম্বন্ধেও আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের কাছে বিশেষরূপে হাতে কলমে শিক্ষা নেওয়া হয়েছে। এই অপূর্ব অদ্ভুত অ্যাপারেটাস্ মেশিন সারা পৃথিবীতে এক ডজনের বেশি নেই। এই যন্ত্রের সাহায্যে সর্বপ্রকার ক্যানসার রোগ আরোগ্য করা যেতে পারে—পৃথিবীর বিখ্যাত ক্যানসার চিকিৎসকরা এই মতই পোষণ করেন।

চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের কাজ ইতিমধ্যেই সুচারুরূপে চলতে শুরু করেছে। এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা মন্দির, গবেষণাগার বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই চালিত হ'চ্ছে। নতুন পদ্ধতিতে ক্যানসার রোগের চিকিৎসাও শুরু হ'য়েছে।

এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ডাক্তার সুবোধ মিত্র মহাশয় দেশের সামনে একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। দেশের লোক তাঁর এই অমিত অধ্যবসায়, এই শ্রম কোনোদিন ভুলবে না।

এইবার ক্যানসার রোগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে প্রবন্ধের শেষ করবো।

ক্যানসার রোগের কথা আমরা সকলেই কিছু না কিছু শুনেছি, কিন্তু এর সত্যিকার রূপ যে কি সে জ্ঞান আমাদের বিশেষ নেই। ডাক্তার মিত্র বলেন :—"ক্যানসার হ'চ্ছে একরূপ মারাত্মক টিউমার জাতীয় রোগ। সে জিনিষটা প্রথমত ছোট একটা আবের মতো দেখা দেয়, অথবা একটাছোট্ট ঘা থেকে শুরু হয়। একবার শুরু হলে ক্রমেই তা বাড়তে থাকে। এ বাড়ার বিরাম নেই, যতোক্ষণ পর্যন্ত না রোগীর শেষ নিশ্বাস বন্ধ হয়। ক্যানসার যখন আরম্ভ হয় তখন রোগের কোন যাতনাই থাকে না—তাই বেশির ভাগ সময়ে রোগ ধরা পড়ে না। ক্যানসার রোগ যখন বেশ খানিক বেড়ে যায় তখন রোগের যন্ত্রণা এত বেশি হয় যে চাক্ষুষ না দেখলে ধারণা করা যায় না। ভাষায় সে যন্ত্রণা প্রকাশ করা অসম্ভব। গোড়ার দিকে ক্যানসার রোগ ধরা পড়লে এবং ঠিকমত চিকিৎসা হ'লে বেশির ভাগ ক্যানসার রোগ নিশ্চয় ভালো হয়। বিলেতে, বিশেষত আমেরিকায়—সারা দেশ জুড়ে প্রচারিত যে কি ক'রে গোড়ার দিকে ক্যানসার রোগ ধরা পড়ে। খবরের কাগজে, সাময়িক পত্রিকায়, হ্যাণ্ডবিলে, সিনেমা, বেতারের সাহায্যে ওরা প্রত্যেক জনসাধারণকে জানিয়ে দিচ্ছেন—শরীরের কি ব্যতিক্রম ঘটলে ক্যানসার বলে সন্দেহ হবে এবং সন্দেহ হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে যাতে বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা এই রোগ ঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়—তার ব্যবস্থাও করেছেন। সারা দেশ জুড়ে এতো বেশি ডিস্‌পেনসারি আছে যে যতো দূর বেশই হোক না কেন—যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোক অতি অল্প সময়ে নিজেকে বেশ ভালো করে পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। এতে দুটি বিশেষ রকমের উপকার হয়। যেমন, যদি ক্যানসার শুরু হ'য়ে থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যায় এবং চিকিৎসা আরম্ভ হয়, আর ক্যানসার না হ'লে লোকেরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।...

হাসপাতাল মধ্যে রোগীদের শয্যা ও কর্মরত নার্সগণ ফটো—স্টুডিও রেনেসাঁস

হাসপাতালের গবেষণাগার ফটো—স্টুডিও রেনেসাঁস

ক্যানসার রোগ সাধারণতঃ একটু বেশি বয়েসেই দেখা দেয়। মেয়েদের ৩৫ কিংবা ৪০ বছরের পর যদি অকারণে মাসিকের ব্যতিক্রম ঘটে—অর্থাৎ অনিয়মিতভাবে স্রাব শুরু হয় তাহলে জরায়ুর ক্যানসার বলে সন্দেহ করতে হবে এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিশেষভাবে পরীক্ষা করে বলছেন যে এ ক্যানসার নয়—ততোক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। অনেক সময় মেয়েদের স্তনে আবের মতো শক্ত চাকা দেখা দেয়, বহু সময়ে তাই থেকে ক্যানসার শুরু হয়। জিবেতে হয়তো ছোট ঘা হ'য়েছে—কোনো কষ্ট নেই, অথচ ঘা ভালো হচ্ছে না—এরকম ঘা থাকলে ক্যানসার বলে সন্দেহ করতে হবে। গলার স্বর অনেক কারণে ভঙ্গ হ'তে পারে। সেই ভাঙা স্বর যদি থেকে যায় তো ক্যানসার বলে সন্দেহ করতে হবে। আবার বহুদিনের অজীর্ণ রোগ থাকলেও ক্যানসার বলে সন্দেহ করতে হবে। অবশ্য এইগুলি হ'চ্ছে মোটামুটি কথা। নইলে স্বরভঙ্গ হ'লে বা অজীর্ণ হলেই ক্যানসার হয় না। তবে সাবধানতার প্রয়োজন।"*

ক্যানসার রোগের চিকিৎসা কোনো একজন ডাক্তারের দ্বারা সম্ভব হয় না, এর জন্যে চাই একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। যেখানে অস্ত্রোপচার থেকে আরম্ভ ক'রে রেডিয়াম এবং বহু শক্তিসম্পন্ন এক্সরের ব্যবস্থা থাকবে। আমেরিকায়, লণ্ডনে, বার্লিনে, ভিয়েনায় ঠিক এইভাবেই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ডাক্তার সুবোধ মিত্রের অধ্যবসায়ে আমাদের ভারতবর্ষেও আজ ক্যানসার রোগের যে বিরাট হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে—পৃথিবীর যে কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ ক্যানসার হাসপাতালের সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে।

* 'ভারতবর্ষ' ১৩৫৭ পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ শ্রীসুবোধ মিত্রের 'ক্যানসার রোগ দুরারোগ্য নয়' প্রবন্ধ থেকে চিহ্নিত অংশ গৃহীত হয়েছে।

জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জ্ঞানবাদীর চক্ষে শ্রুতির অনুগত না হইলে স্মৃতির কোন মর্য্যাদা নাই। এ ক্ষেত্রে উদ্ধৃত শ্রুতি বচনটি নিতান্তই কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহাস্পদ। তা ছাড়া শ্রুতিটিও সাম্প্রদায়িক বলিয়া অনুপাদেয়। কানুপ্রিয় গোস্বামী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত দুইটি বচন সম্ভবতঃ কবিরাজ গোস্বামীর অজ্ঞাত ছিল। রূপ গোস্বামীও দুই স্থলে অর্ক ও কিরণের উপমা দিয়াই ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের সম্বন্ধের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, ব্রহ্মকে কৃষ্ণের পদনখের জ্যোতি বলেন নাই। তাঁহার দ্বিতীয় বচনটি এইরূপ—

ব্রহ্ম নির্দ্ধর্ম্মকংবস্তু নির্বিশেষমমূর্ত্তিকম্।
ইতি সূর্য্যোপমস্যাস্য কথ্যতে তৎপ্রভাসমম্॥

ভক্তিবাদী। আচ্ছা, তোমরা গীতা ত' মান? গীতাতেও ত আছে "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্"—আমিই (কৃষ্ণই) ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে কৃষ্ণ বড় হইলেন না? দুইটি এক তত্ত্বের দুই পৃথক্ নাম মাত্র হইল কি?

জ্ঞানবাদী। শাস্ত্রের অর্থ বিকৃত করিবার শক্তি তোমাদের অসাধারণ। গীতার টীকাকার শ্রীধরস্বামী ভক্তই ছিলেন, স্বয়ং চৈতন্যদেব যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "স্বামীকে যে না মানে সে ত বেশ্যা।" সেই শ্রীধর স্বামীজী "প্রতিষ্ঠা" শব্দের অর্থ দিয়াছেন প্রতিমা; ফলিতার্থ দিয়াছেন, "ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহম্"—ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রতিমা, উপাসনার প্রয়োজনে ব্রহ্ম তাঁহাতে ঘনীভূত হইয়া আছেন এই ব্যাখ্যা অনবদ্য এবং আমাদেরও স্বীকার্য্য।

ভক্তিবাদী ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এই তিন স্তরের উপরে আরও একটি স্তর মানেন এই কথা উপরে বলা হইয়াছে। সেটি হইতেছে স্বয়ং ভগবান্। ভাগবতে অবতার প্রসঙ্গে "কৃষ্ণও ভগবান্ স্বয়ং" এই কথাটি থাকাতে, তদ্দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া ব্রহ্ম-আত্মা ভগবান্—এই তিন তত্ত্বের উপরে নাকি আর একটি তত্ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। তিমিঙ্গিলগিলোহপ্যস্তি তদ্গিলোহপ্যস্তি রাঘবঃ॥ ব্রহ্ম, তিমি, আত্মা তিমিঙ্গিল, ভগবান্ তিমিঙ্গিলগিল; স্বয়ং ভগবান্ রাঘব। স্বয়ং ভগবান্ হইতেছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ শব্দের রূঢ় অর্থ, রূপ গোস্বামীর মতে, তমাল-শ্যামলকান্তি যশোদা তনয় যিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া এক পা'ও যান না। স্বয়ং ভগবান্ হইতেছেন ভগবান্ in his own right. তাহা হইলে শুধু ভগবান্ বলিতে কাহাকে বুঝিতে হইবে? না—রাম, বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব ইত্যাদি by reflected glory. ইহারা সব অবতার—অবতারী নন্দনন্দন কৃষ্ণ। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বলিয়া রাম, বিষ্ণু বা নারায়ণের উপাসক বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতাও এই জন্য স্বীকার্য্য।* (এই স্থানে বলা আবশ্যক যে নিম্বার্কসম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণোপাসক হইলেও, তাঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণই চরম তত্ত্ব, এবং রাধাকৃষ্ণের ধাম (গোলোক) প্রাপ্তিই তাঁহাদের চরম গতি, একথা বলেন না। তাঁহাদের মতে—পরম

* জ্ঞানবাদী ও রামোপাসক ৺রামদয়াল মজুমদার মহাশয় বলিতেন, এইরূপ যুক্তিবলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কলিসন্তরণোপনিষদের (এবং পুরাণেরও) হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥ এই মন্ত্রটি বিবৃত করিয়া প্রথমে পড়েন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি, তার পরে—হরে রাম, হরে রাম ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঅরবিন্দ
তিরোধানের পূর্বে গৃহীত শেষ আলোক-চিত্র

কার্ত্তিক—১৩৫৮

প্রথম খণ্ড | উনচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

মানব জাতির জন্ম-রহস্য

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

অষ্ট্রেলিয়া ও উত্তর আমেরিকায় কতগুলি আদিম জাতির বিশ্বাস—অতি প্রাচীনকালে মানুষ ও জন্তুর মধ্যে আকৃতির প্রভেদ ছিল না। পরে সৃষ্টি-দেবতারা তাদের সেই একই প্রকার জয়স্ত্রব রূপকে পৃথক বিভক্ত করে' পছন্দমত মানুষ, জন্তু ও পক্ষীর বিভিন্ন আকার দিয়েছিলেন। অনুন্নত জাতির নিম্ন স্তরের সংস্কৃতির মধ্যে যে বিবর্তন-সত্য স্থূলভাবে পরিস্ফুট, সে-সত্যকে আবিষ্কার করতে বৈজ্ঞানিকের দীর্ঘকাল লেগেছিল। বাইবেলে আছে—ঈশ্বর মানব-দম্পতিকে সৃষ্টি করে' স্বর্গের উদ্যানে রেখেছিলেন। জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ, অমৃতের পুত্র মানুষ—এ হেন মানুষকে নিকৃষ্ট জীব থেকে আলাদা করে' স্বতন্ত্র সৃষ্টির কথা প্রায় সকল সমাজের সৃষ্টিতত্ত্বে স্থান পেয়েছে।

মানব-সৃষ্টি সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস শুধু সৃষ্টিতত্ত্ব বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। এক শতাব্দী পূর্বেও বিজ্ঞান-জগত গ্রীক্ দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের মতবাদ অনুসরণ করে' এই মত পোষণ করতো,—প্রাণী-জাতির আকৃতি অপরিবর্তনীয় (Immutability of the species)। অর্থাৎ, জীব-জন্তুর বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি-কালে তাদের নিজ আকৃতি লাভ করেছিল, যে-আকৃতির রূপান্তর কোন কালে ঘটে নি। সৃষ্টিতত্ত্ব মানুষ এতকাল নির্বিচারে মেনে চলতো, অ্যারিষ্টটলের মতবাদ ছিল দুই সহস্র বৎসর ধরে' বিজ্ঞান-জগতের আলোক-স্তম্ভ—বিবর্তন-বাদ সে-স্তম্ভের মূলে কুঠারাঘাত করে' প্রমাণ করলে যে, উদ্ভিদ ও প্রাণী-জাতি পরিবর্তনশীল (Mutability of the species)। উদ্ভিদ, পশুপক্ষী, মানুষ, সব জাতির জন্ম ভিন্ন জাতীয় জীব বা জীবন্ত পদার্থ থেকে—জীবের রূপান্তর ও পরিণতি ঘটেছে বিবর্তনের বিজ্ঞান-সম্মত নিয়মের পথে এবং সেই নিয়মের ফলে মানবেতর নিম্ন-জাতীয় জীব থেকে মানুষের উৎপত্তি।

বিবর্তন-শব্দের সঙ্গে অনেকেই অল্প বিস্তর পরিচিত। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম সমাজ, ব্যবসা বাণিজ্য যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সকল রকম বিষয়-বস্তুর প্রগতি, রূপান্তর বা পরিণতির মধ্যে বিবর্তনের অস্পষ্ট ছায়া-রূপের কল্পনা অনেকের মনে জাগে। সাংখ্য-দর্শন যে পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে বিশ্ব-প্রকৃতির, মন ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলির ক্রম-বিকাশকে প্রতিপাদন করেছে, সেই দার্শনিক তত্ত্বকেও বিবর্তন বলা হয়ে থাকে। যে-বিবর্তন-প্রসঙ্গ আমরা এখানে আলোচনা করছি—তা দর্শন-তত্ত্ব নয়, জৈব বিবর্তন (organic evolutions)—যার নিয়মগুলি বহু পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এই বিবর্তন সকল ক্ষেত্রে প্রগতির পথ ধরে

চলে নি, জাতি পথে অনেক জাতির অধঃপতন ঘটেছে। বিবর্তন জীবনের অভিযান। সেই অভিযানের পশ্চাৎ অনুসরণ করেছে বিজ্ঞান, পৃথিবীর নানা স্তরে প্রস্তরীভূত ফসিলগুলিকে আবিষ্কার ও পরীক্ষা করে।' ধরিত্রীর বক্ষে ভূমিকম্প-আলোড়নে বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে অতি প্রাচীন যুগে—স্তরে স্তরে তার নিদর্শন পরিস্ফুট। সেই সব বিপর্যয়ের ফলে সে-কালের উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ চাপা পড়ে' যাকে বলা হয় 'ফসিল'—সেইরূপ পাথর বা কঠিন পদার্থে পরিণত হয়েছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, গহন বনে জলাভূমিতে, সাগর-গর্ভে ধাপের পর ধাপ, ঘাঁটির পর ঘাঁটি অতিক্রম করে' জীবন কেমন অন্ধকার বন্ধুর পথে অগ্রসর হয়েছে তার ইতিবৃত্ত পাই আমরা বিভিন্ন স্তরের ফসিল সংগ্রহ ও পরীক্ষা করে।' প্রাচীনকালের অশ্বের ফসিল থেকে জানতে পারা যায় যে, ঘোড়া ছিল একটি পঞ্চনখী জন্তু, তিন ফিট উঁচু। পরবর্তী কালে জলাভূমি শুকিয়ে মরুভূমি হল, যেখানে পঞ্চনখী ঘোড়ার অবস্থান হয়ে উঠলো কষ্টকর—তখন তার নখগুলি একে একে অন্তর্হিত হয়ে শেষে একটি মাত্র খুরে পরিণত হল। নখের অবশেষ (vestigials) ঘোড়ার পায়ে এখনও দেখা যায়। বিভিন্ন স্তরের ভিতর প্রাপ্ত হস্তী ও উষ্ট্রের ফসিলগুলি অশ্বের মতই দৈহিক বিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষণ বহন করছে।

জৈব বিবর্তনের অন্য প্রকার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, ভ্রূণ তত্ত্ব (embriology), জীব জন্তুর অঙ্গের তুলনা-মূলক পরীক্ষা এবং বিভিন্ন প্রাণী জাতির বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতির বিলি-ব্যবস্থা (distribution) থেকে। নারী-গর্ভের ভ্রূণ পরীক্ষা করে' জানা যায় যে, বিবর্তনের নানা অবস্থার পুনরাবৃত্তি ভ্রূণের মধ্যে ঘটে থাকে। মেরুদণ্ডযুক্ত জীবের উৎপত্তি মাছ থেকে হয়েছে, এই অবস্থাটি স্মরণ করিয়ে দেয় ভ্রূণের প্রথমাবস্থার শ্বাস-যন্ত্র (gillslits)—যা দেখতে ঠিক মাছেরই মত। যথাসময়ে সরীসৃপ ও জন্তুর লক্ষণ-স্বরূপ ল্যাজও দেখা যায়। মানব-শরীরে জন্তুর অঙ্গ-বিশেষের কিছু-কিছু অবশেষ আছে, যা বিবর্তনের সাক্ষ্য দিয়ে জীব-জগতের সঙ্গে মানুষকে ধারাবাহিক পারম্পর্যসূত্রে বেঁধে দিয়েছে।

জাতির পরিবর্তন (mutation) কিরূপে সম্ভব হয়েছিল তার বিশদ আলোচনা বিখ্যাত প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক চার্লস্ ডারুইন করে গেছেন। ১৮৩১ সালে 'বিগ্‌ল্' জাহাজে দক্ষিণ-আমেরিকা প্রদক্ষিণ কালে উপকূল থেকে পাঁচ শ' মাইল দূরবর্তী গ্যালাপাগোস্ দ্বীপের পক্ষীকুলের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। সেই থেকে তিনি বহুবর্ষ ধরে' নানা-জাতীয় উদ্ভিদ ও পশুপক্ষীর প্রাকৃতিক পরিবেশ, অবস্থান, দেহের গঠন, জীবন-ধারণের উপায় ও প্রণালী, অভ্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। যথাকালে তাঁর প্রচুর অধ্যবসায়, অপরিমিত শ্রম ও সুদীর্ঘ সাধনার ফল-স্বরূপ দেখা দিল দুইটি অমূল্য গ্রন্থ—origin of species ও descent of man. নানাবিধ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তিনি যে মতবাদ প্রবর্তিত করেছিলেন, তারই প্রকার ভেদ আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে Neo-Darwinianism রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে' জীবন-তত্ত্বের (biology) প্রধান সহায়ক হয়েছে। জন-সংখ্যা বিষয়ে ম্যালথাস্ On Population নামে যে বইখানি লিখেছিলেন, তার তথ্য ও সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে' ডারুইন তাঁর মতবাদ গড়ে' তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। ম্যালথাস্ বলেছিলেন, জনসংখ্যা যেখানে এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে সেখানকার উৎপন্ন খাদ্য সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, তখন দেখা দেয়—দুর্ভিক্ষ, জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence), প্রতিযোগিতা। উদ্ভিদ, প্রাণী, জীব-জন্তুর জন্ম অবাধে ঘটতে থাকলে তাদের সংখ্যা-বৃদ্ধির হার কল্পনাতীত রূপে বৃদ্ধি পায়। শামুক ও মাছের উর্বরা-শক্তি আশ্চর্য রকমের—কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকলে এই জাতীয় জীবেরা কয়েক বছরের মধ্যে সারা পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে। এমন কি হাতী—যে-জন্তু সুদীর্ঘ এক শ বছরের জীবনে ছয়টি মাত্র সন্তান প্রসব করে, ডারুইন্ গণনা করে দেখিয়েছেন, সেই হস্তীজাতির এক জোড়া হস্তি-হস্তিনী থেকে কিছুকাল অবাধ জন্মের ফলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে এক কোটি নব্বই লক্ষ। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক জাতির খাদ্যের অভাব ঘটতে বাধ্য। আর, সেই সঙ্গে সুরু হয় জীবন-সংগ্রাম—প্রত্যেকের সঙ্গে, অথবা ভিন্ন জাতীয় জীবের সঙ্গে, কিম্বা প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে। জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় সকল জীব টিঁকে থাকতে পারে না—যোগ্যতম বাঁচে, অযোগ্য লোপ পায়। সোজা ভাষায় হার্বার্ট স্পেনসার যাকে বলেছেন, যোগ্যতমের টিকে থাকা (Survival of the fittest), ডারুইন তাকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection) এই এই প্যাঁচালো নাম দিয়ে বিষয়টিকে একটু অস্পষ্ট করে তুলেছেন। বসন্তকালে আম গাছে বিস্তর মঞ্জরী ফোটে, তাই দেখে কেউ যদি কবির উচ্ছ্বসিত ভাষায় ব'লে উঠে—প্রতিটি শাখা প্রকৃতিদেবী মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়েছেন। কিন্তু সব মঞ্জরীকে তিনি স্বাদু ফলে পরিণত করেন না, বাছাই করে কয়েকটি বাঁচিয়ে রাখেন, বাকিগুলি অনাদৃত হা-হুতাশে শুকিয়ে ঝরে' পড়ে—তা হ'লে এই কাব্যের ভাষার মধ্যেই ডারুইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' কথাটির যথার্থ মর্ম বোঝা যাবে। প্রকৃতিকে সত্যি করে' কোন দেবতার আসনে বসিয়ে দেওয়া হয় নি, নিজের হাতে তিনি নির্বাচনের কাজও করেন না। আসল কথা,—প্রতিটি বৃক্ষশাখার অসংখ্য মঞ্জরীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা সুরু হয়, জীবন-সংগ্রাম বাধে, এবং দৈবক্রমে যে রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রব আর পোকা-মাকড় বা পক্ষীর ধ্বংস কার্য থেকে রেহাই পায়, সে-ই টিঁকে থেকে ফলে পরিণত হয় (এইরূপ পরস্পরে প্রতিযোগিতা প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে,' ঝড় ঝাপটা উপদ্রবকে কাটিয়ে উঠে যে বেঁচে থাকতে পারে সেই যোগ্যতম—তার বেঁচে থাকাকে ডারুইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল বলে অভিহিত করেছেন।

জীবের নবজাত সন্তানদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়, প্রত্যেকটির মধ্যে একটু-না-একটু বৈচিত্র্য বা বিশেষত্ব আছে, যাকে ব্যক্তিগত প্রভেদ (Variation) বলা যায়। ডারুইন এই সব প্রভেদকে বলেছেন, স্বতস্ফূর্ত (Spontaneous)। জন্ম তত্ত্ব (Eugenics) যে-সব নূতন তথ্যসমূহ আবিষ্কার করেছে তা' বিচার করলে মনে হয়, সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য বা প্রভেদগুলি স্বতস্ফূর্ত, অর্থাৎ আকস্মিকভাবে

আপনা থেকে দেখা দিয়েছে। এ-সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু বিষয়টির বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটু বলাই যথেষ্ট—উত্তর-পুরুষের অঙ্গের প্রভেদ, বৈষম্য বা পরিবর্তন, তা সে যেমন ক'রেই ঘটে থাক না কেন, যদি সে-সব পরিবর্তন জীবন-যুদ্ধের সহায়ক বা জাতির আত্মরক্ষা ও সমৃদ্ধির পক্ষে কল্যাণকর হয়, তবে সেগুলি রক্ষা পায় এবং পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত (transmitted) হয়ে থাকে। এইরূপে দৈহিক পরিবর্তনগুলি বংশের পর বংশে তিল-তিল করে' জমে উঠে বহু যুগ পরে এক নূতন জাতির (Species) সৃষ্টি করে- এবং সেই জাতি যদি প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে টি'কে থাকবার যোগ্য হয় তবেই রক্ষা পায় এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে। জীবনের পরিবর্তন পথে এমন সব জীবের আবির্ভাব হয়েছিল যারা প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরাট্ পরিবর্তনের জন্য বা অন্যান্য কারণে নিজেদের জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে নি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের 'ডাইনসর' (Dinosaur) নামে অতিকায় জীব-জন্তুর কঙ্কাল বা ফসিল দেহ পৃথিবীর অনেক স্থানে পড়িয়া আছে। অন্ধ গলির ভিতর অসতর্ক প্রবেশ তা'দিকে প্রকৃতির পাতা ফাঁদে এনে ফেলেছিল, বিপুল দেহবল থাকা সত্ত্বেও সেথান থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে নি।

বন-মানুষ (ape) বা ঐ জাতীয় (anthropoid বা simian) জীবের সঙ্গে মানব-জাতির যে একটা রক্তের যোগ আছে তা যে-কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন—যদি তিনি কোন চিড়িয়াখানায় কিছুক্ষণের জন্য গরিলা ওটাং শিম্পাঞ্জীদের লক্ষ্য করে চেয়ে দেখেন। জননীরা সন্তানদের কেমন বুকে ধরে দুধ খাওয়ায়, আদর করে, চুমু খায়—ঠিক যেন মানুষ। বিশেষ করে' শিম্পাঞ্জীর সঙ্গে মানুষের আঙ্গিক সাদৃশ্য খুবই বেশী—উভয়ের প্রতিটি অস্থিখণ্ডের মিল আছে। মানুষ ও বন-মানুষের অঙ্গ পরীক্ষা ও গঠন-প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে' স্যর আর্থার কিথ মানুষের সঙ্গে শতকরা সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন শিম্পাঞ্জীর ৯৮টি বিষয়ে, গরিলার ৮৭টি বিষয়ে, ওরাং-এর ৫৬টি বিষয়ে এবং গিবনের ৮৪টি বিষয়ে। মানুষ ও বনমানুষের লক্ষণগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করে' এক সময় ডারুইন-পন্থীরা মানুষকে simian জাতীয় জীবের বংশধর বলেই সাব্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু তাদের ও ধারণাটি যে ভ্রান্ত, আজ সকল বৈজ্ঞানিকই তা স্বীকার করেন। বনমানুষের মগজ মানুষের মত নয়, মস্তিষ্কের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত অল্প—চোয়াল, দাঁত, নাকের গহ্বর ইত্যাদিও ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রভেদ এই যে, বন-মানুষের ভাষা নাই—এবং শিম্পাঞ্জী যখন মানুষের মত বসে চা খায়, কাঁটা চামচ ব্যবহার করে, উঠে হ্যাণ্ড-সেক করে, সে তখন মানবীয় ব্যবহারগুলির অনুকরণ করে মাত্র, তার সেই কাজগুলির সঙ্গে বুদ্ধির যোগ অত্যন্ত সামান্য। বস্তুত মানুষের জন্ম হয়েছে Hominidae নামক কোন পরিবার (Family) থেকে, যার প্রকৃত পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নি। মানব-জাতির পূর্বপুরুষ ও বনমানুষ প্রভৃতি Simian জীবেরা একই পূর্বপুরুষ থেকে নেমে এসেছে, তারা এক বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা। ভাগ্যক্রমে মানুষ বুদ্ধিকে আশ্রয় করে প্রগতির রথে চড়ে প্রকৃতিকে জয় করেছে, সভ্যতা সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে। আর তারই নিকট-আত্মীয়েরা বুদ্ধির দোষে ভ্রষ্ট পথে চলে, বনে জঙ্গলে বৃক্ষ-শাখায় বাস করতে বাধ্য হয়েছে। মানুষের সুখ-সমৃদ্ধিকে আত্মীয়-সুলভ ঈর্ষার চক্ষে দেখবার মত শক্তিও তাদের জন্মে নি!

প্রাগৈতিহাসিক আদি-মানবের বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য আমরা দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের কাছে ঋণী—তাঁরা প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক (Archaeologist and Anthropologist); এই বিষয়ে ভূতত্ত্বের (geology) অবদানও আছে যথেষ্ট। নৃতাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ফসিল-মানবের কঙ্কাল, দন্ত, চোয়াল, নরকপাল, অস্থিখণ্ড প্রভৃতি পরীক্ষা করে প্রত্যেকটি আদি-মানবের জাতির দৈহিক আকৃতি পুনর্গঠন করতে সমর্থ হয়েছেন। এ-কৃতিত্ব বড় সামান্য নয়। নরকপাল, অস্থি প্রভৃতি মাপ করে' অঙ্কের সাহায্যে তাঁরা যে বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেখানে মাঝে মাঝে মত-দ্বৈধের অবসর থাকলেও, সে-গুলি মূলত সত্য, এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা অস্ত্র-শস্ত্র, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি খনন-কার্য দ্বারা ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করে পুরাতন ও নূতন প্রস্তর যুগের (Paleolithic ও Nealithic) মানব-জাতির আচার, জীবিকা, সংস্কৃতির যথাসম্ভব পরিচয় জন-সমক্ষে এনে ধরেছেন। অবশ্য আদি-মানব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও বহুলাংশে অসম্পূর্ণ, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এ-যাবত যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে করে' আমাদের ধারণা যে অনেকখানি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার সন্দেহ নেই।

আদি মানবের জন্ম সংস্কৃতি প্রভৃতির কাল নির্ধারণ ব্যাপারে ভূ-তত্ত্বের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। যুগ-যুগান্ত ধরে' পলি জমে' পৃথিবীর উপরি-ভাগে একটির পর একটি নানা প্রকার স্তরের সৃষ্টি হয়েছে—যাকে বলা হয় geological strata। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই স্তরগুলিকে পরীক্ষা করে' ভূতাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টিকাল নিরূপণ করেছেন। প্রত্যেকটি কালের এক একটি নামও দেওয়া হয়েছে।—যেমন Paleozoic, Mesozoic, Cinozoic ইত্যাদি। এই সব যুগে পর-পর চার বার মেরু অঞ্চল থেকে বরফ চেপে এসেছে বিষুব-রেখার দিকে, এবং তার ফলে পৃথিবী তখন বরফে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। এই যুগের নাম Glacial Age or Ice Age। প্রত্যেকটি বরফ যুগের শেষে স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরে এসেছে। দুইটি বরফ মধ্যবর্তী কালকে বলা হয়েছে,—Interglacial Age! আদি-মানবের ফসিল, অস্থি, কঙ্কাল, অস্ত্র-শস্ত্র, শিল্প প্রভৃতি যে-যে স্তরে পাওয়া গেছে সেই-সেই স্তর পরীক্ষা করে তাদের কাল নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। স্তরটা যে যুগের, সেই স্তরের মধ্যে প্রাপ্ত প্রস্তরীভূত ফসিলটাও যে সেই যুগের, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

আদি-মানবের দশটি বিভিন্ন জাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে কয়েকটির কিছু কিছু বিবরণ নিম্নে বলা হ'ল :

জাভা-মানব (Pithecanthropus Erectus)—জাভা দ্বীপে এই মানবের নরকপাল, কতগুলি অস্থিখণ্ড ও দন্ত পাওয়া যায়। আবিষ্কর্তা

Dr. Dubois নানা তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ করেন,—এই মানবের আকৃতি মানুষ ও বন-মানুষের মাঝামাঝি, তাই নাম দেওয়া হয়েছে, Ape-man। বহু প্রাচীন যুগের ফসিল, সম্ভবত pliocene যুগের, যখন কোন মানব-জাতির সৃষ্টি হয় নি—এই জীবের মানবত্ব সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মাথার খুলির আকার ও মস্তিষ্কের সম্ভাব্য পরিমাণ বিবেচনা করে মনে হয়, এই জাতীয় জীবের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছিল বনমানুষের চেয়ে বহু গুণ অধিক, কিন্তু সে যদি সত্যই মানুষের পর্যায়ে পড়ে থাকে তবে তাকে একজন অত্যন্ত নির্বোধ ব্যক্তি বলতে হবে।

পিলটডাউন মানব (Eoanthropus বা Dawn man)—চোয়াল মর্কটজাতীয় জীবের মত, দাঁত মানুষের মত। মাথার খুলি পরীক্ষা করে' জানা যায় যে মস্তিষ্ক মানবীয় এবং জাভা-মানব অপেক্ষা অনেক উন্নত। ফসিলের কাছে হস্তির অস্থি-নির্মিত একটি প্রহরণ পাওয়া গেছে, যা থেকে এই মানবের দৈহিক ক্ষমতা-কৌশল ও উদ্ভাবনী-শক্তি সহজে অনুমান করা যায়। ফসিলটি এই প্রমাণ করে যে, pleistocene যুগে এক জাতীয় জীবের আবির্ভাব হয়েছিল যাদের মস্তিষ্ক মানুষের মত, কিন্তু তাদের মুখের আদল, চোয়াল ও কতিপয় দন্ত মর্কট-জাতীয় জীবের অনুরূপ।

হিডেলবার্গ মানব—৮০ ফিট নীচে ভূগর্ভের একটি স্তরে এই মানবের চোয়াল ও দাঁত পাওয়া গেছে। চোয়াল দেখে মনে হয়, এটি গরিলার, কিন্তু দাঁতগুলি অবিকল মানুষের মত।

নিয়েন্ডারথ্যাল-মানব (Neanaderthalensis)—এই মানবের অন্তত ২০টি ফসিল ইউরোপের নানা স্থানে পাওয়া গেছে। অতি প্রাচীন যুগে সম্ভবত এই জাতি ইউরোপের এক মাত্র অধিবাসী ছিল। ইহাদের আকৃতি বহুলাংশে মর্কটের মত। জিব্রলটারে যে নরকপাল পাওয়া গেছে তার চোখের গর্ত দুটি পরস্পর থেকে এত তফাৎ যে তাই দেখে মানুষ বলে একেবারে মনে হয় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরা মৃতের সমাধি দিত। কয়েকটি ফসিল সমাধির ভিতর পাওয়া গেছে। সমাধিগর্ভে পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য মৃতের সঙ্গে প্রোথিত করত, যা দেখে মনে হয়, মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রেতাত্মায় বিশ্বাস এদের ছিল। এরা ছিল গুহাবাসী। গুহাগাত্রে এদের আঁকা ছবি দেখা যায়, যা থেকে আমরা এদের সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাই। এই সব গুহা-মানবদের আচার অনুষ্ঠান, কলা-শিল্প প্রভৃতি দেখে অনেকেরই প্রতীতি জন্মেছিল যে এরাই মানুষের পূর্বপুরুষ। এখন এ-বিষয়ে মত-দ্বৈধ দেখা দিয়েছে। প্রমাণ পাওয়া গেছে, ইউরোপে নিয়াণ্ডারথ্যালের স্থান অধিকার করে বসেছিল এক জাতীয় মানব, যারা দেখতে সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষের মতই—তাদের নাম Cro-Magnon—এবং সেই সঙ্গে নিয়াণ্ডারথ্যাল মানবের বিলোপ ঘটে। ক্রো-ম্যাগননের সঙ্গে নিয়াণ্ডারথ্যাল মিশে গিয়েছিল কি না, তার কোন প্রমাণ নেই। তবে এ-কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে যে, নিয়াণ্ডারথ্যাল ও আধুনিক মানব (Homo sapiens) একই পূর্বপুরুষ থেকে জন্মেছে।

চতুর্থ বরফ-যুগে নর-মানব Homo sapiens-এর আবির্ভাব। এই মানবের সঙ্গে নিয়াণ্ডারথ্যালের আকৃতিগত সাদৃশ্য নেই। এই যুগের মানবের ফসিলগুলি দেখলে বেশ উপলব্ধি করা যায়, মানবেতর জাতিকে এক লাফে ডিঙিয়ে মানুষ কেমন অন্ধকার থেকে স্ফুট দিবালোকে এসেছে।

মানবীয় জাতির আকৃতির পরিবর্তন যে যুগান্তর উপস্থিত করেছিল তার তুলনা ইতিহাসে নাই। মানবেতর জাতি (subman) নিজেকে মনুষ্য জাতিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে—সত্যই এ একটা মহা-বিস্ময়কর ব্যাপার। তার পর থেকে মানুষের প্রতিভা বহুমুখে প্রধাবিত হয়েছে। প্রকৃতির উপর আধিপত্য, জ্ঞানের চর্চা, বিজ্ঞানের উন্নতি—সে যে কত কি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তার সকল কীর্তি, সকল কৃতিত্বকে ছাপিয়ে ওঠে নব-সূর্যের আলোকে প্রতিভাত নব-মানবের প্রজ্ঞা-শক্তি—যার ইঙ্গিত আমরা পাই—যখন চিন্তা করি,—নিয়াণ্ডারথ্যালকে অতিক্রম করে দেখা দিয়েছিল মানব, আর আমরা এখনো মানবকে অতিক্রম করে অতি-মানবের স্তরে পৌঁছতে পারি নি।

প্রাক্ ইতিহাসের ডায়গ্রাম

প্রাকৃতিক অবস্থা	যুগ	মানবীয় জাতি
	নব প্রস্তর যুগ (Neolithic)	
চতুর্থ বরফ যুগ	উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Upper paleolithic)	ক্রো-ম্যাগনন আধুনিক মানবের আবির্ভাব (Homo-sapiens)
অন্তবর্তী কাল	মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Mid paleo-lithic)	নিয়ানডারথ্যাল মানব মানব গোষ্ঠীর আদি-জাতির আবির্ভাব (Genus Homo)
তৃতীয় বরফ যুগ		
অন্তবর্তী কাল	নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Lower Paleolithic)	হিডেলবার্গ মানব পিটলডাউন মানব পিকিং মানব জাভা মানব
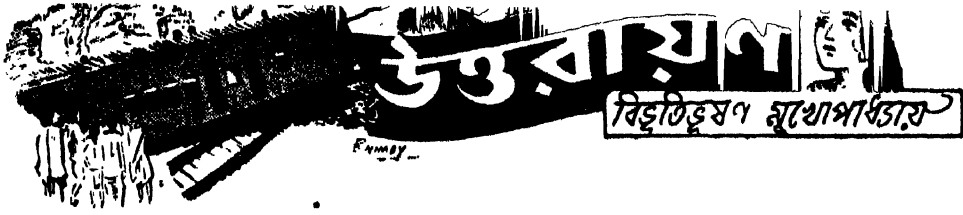
দশ

নূতন সংসার পাতা নিয়ে সরমার কাজ অনেকটা কমে এসেছিল, অন্তত তাতে বৈচিত্র্যের অভাব একটু এসেই পড়েছিল, আবার যেন জোয়ার ঠেলে এল। সাঁওতাল পরিবারটিকে সে বাড়িতেই টেনে নিলে, তারপর তাদের নিয়ে উঠল মেতে; বিশেষ করে মা আর মেয়েকে নিয়ে।

পুরুষটার নাম ঝড়ু; বয়স হোক, বুড়োই বলা চলে এক রকম, কিন্তু খুব কর্মঠ। এত বড় উপকারের জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞতাটুকু কি করে প্রকাশ করা যায় সেই নিয়ে একটা দিন গবেষণা করলে ঘুরে ফিরে একটু দেখে শুনে; তারপর দিন সকালে দেখা গেল, শালবন থেকে এক বোঝা ডালপালা কেটে নিয়ে এসে ফেলছে। জিগ্যেস করতে জানালে, বাগান করবে, ডাগদরবাবুকে যে তরিতরকারি কিনে খেতে হচ্ছে সেটা আর হতে দেবে না। এই থেকে সরমার কাজের পরিধিটা একেবারে অনেকখানি বেড়ে গেল। তরিতরকারির জন্যে ওর মাথাব্যথা ছিল না, প্রতিদিন সকালে বীরেন্দ্র সিংের বাড়ি থেকে যে ডালি আসে ফল-ফুল আনাজের—তা ওর সংসারের প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি। ঝড়ুর উৎসাহ থেকে ওর মাথায় নিজেদের একটি ছোটখাট ফুলের বাগানের কথা উদয় হোল।...বাসা থেকে আরম্ভ করে ঝিলের ধার পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটুকু নিজের বন্য আকৃতি থেকে এমন একটি সুষমায় বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল যে ওর রুচির আভিজাত্য দেখে সুকুমার, বীরেন্দ্র সিং সবাই বিস্মিতই হলেন। জায়গাটাকে বেশি যে খোঁড়াখুঁড়ি করলে এমন নয়, যেখানে একটি পুরানো গাছ আছে থাকতে দিলে; যেখানে কতকগুলা শিলার স্তূপ একটা ছোটখাট পাহাড়ের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নাড়াচাড়া করলে না; যেখানটা উঁচু, কাটলে না; যেখানটা নিচু, ভরাট করলে না; একটু আধটু চেঁচে-ছুলে, বীরেন্দ্র সিংের বাগান থেকে, হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে পছন্দ-মাফিক অল্প স্বল্প কয়েক রকমের গাছ আনিয়ে এখানে-ওখানে বসিয়ে, সমস্ত জায়গাটুকু একটু একটু করে সবুজ ঘাসে মুড়ে দিয়ে, জায়গাটার চেহারা বদলে ফেললে। সরমা এটা করলে একটা অদ্ভুত দরদ দিয়ে, মাটির প্রতিকণাটির আকাঙ্ক্ষা যেন ও বুক দিয়ে অনুভব করছে; বন্য প্রকৃতিকে এতটুকু রূঢ় আঘাত দিলে না, ওর মায়া স্পর্শে সে যেন নূতন হয়ে বেরিয়ে এল।

মানুষ ওর মতো একেবারে নিজেকে বিস্মৃত হলে এমনি করে আদি-জননী প্রকৃতির মর্মের কাছে গিয়ে পড়ে কিনা কে জানে?

ঠিক এই রকম একটি পরিবর্তন অন্যত্রও ঘটালে, ঝড়ুর পঁচিশ বছরের তরুণী বধূ রুম্মার মধ্যে।

সেদিন রাত্রে সরমা বাড়ির ভেতরের বারান্দায় বসেছিল সুকুমারের প্রতীক্ষায়। এই একটু আগে মোটরের হর্ণ শুনলে, সুকুমার তাহলে এসে গেছে হাসপাতালে। ও বেরিয়ে গেলে মালীটা থাকে বাড়িতে, তাকে খবর নিতে পাঠিয়ে হাতের বইটায় আবার মন দিয়েছে এমন সময় রুম্মাকে নিয়ে মালী এল, তার পাশে বছর আটেকের একটি মেয়ে। রুম্মা থমকে একটু দাঁড়াল, মনে হোল কিছু যেন বলবার আর করবার ছিল—বোধ হয় মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ে ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলতে বলা—ভুলে গিয়ে আস্তে আস্তে এসে সিঁড়ির নিচের একটা ধাপে মেয়েটাকে আলগা-ভাবে কোলে চেপে হাঁ করে চেয়ে বসে রইল।...

সরমারও সেই রকমই অবস্থা; চোখ ফেরাতে পারছে না। ওর মনে হোল অন্ধকারেই খানিকটা যেন অপরূপ এক মায়ারূপ ধরে কড়া বিদ্যুতের আলোর মাঝখানটাতে জমাট হয়ে বসল। একটুখানি বিভ্রম হয়েই ছিল ওর, তারপর মালী বললে—বাবু যে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই এরা এসেছে সবশুদ্ধ; রোগী এরই ছেলে। বুড়ো এখনও হাসপাতালেই আছে।

পরিচয় কতটা সরমার কানে গেল বোঝা গেল না,

হতো মাত্র বিভ্রমটুকু দিলে ভেঙে; ও কিন্তু চেয়েই রইল। স্বাস্থ্য-গঠনে এত সুন্দর এর আগে কাউকে দেখেনি। একটু আঁট-করে-পরা মোটা খাটো একখানি সাঁওতালী শাড়ী, দেহের জায়গায় জায়গায় একটু চেপে বসে গেছে, তাতে সুকুমার দেহের-রেখা-তরঙ্গ আরও বেশি করে তুলেছে ফুটিয়ে। চোখ দুটি টানা, একটু বিহ্বল, হয়তো এ-বিপদ মাথায় করে আসা তার জন্যেই; একটা টকটকে রাঙা জবা সুপুষ্ট এলো খোপার ওপর গোঁজা, তার ভেতরে পরতে বিজলির আলো সেঁদিয়ে সমস্তটাকে যেন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

দৃষ্টিটা বিহ্বল, সেই সঙ্গে অপলক। সেও তো সরমার মতো আর কাউকে এর আগে দেখেনি, রূপে এত সুন্দর, বেশভূষায় এত সমুজ্জ্বল, এই আলো, এই অপূর্ব পরিবেশ···

কথা কইলে প্রথমে সরমাই। মেয়েছেলের একটা স্বভাবই আগে তার দৃষ্টি যায় রূপের দিকে, তারপর রূপ থাকলে চরিত্র সম্বন্ধে কুতূহলী হয়ে ওঠে। সরমা মালীকে বললে—"জিগ্যেস করো, খোপায় ফুলের ঘটা কেন? ছেলের অসুখ এদিকে।—তাকে এই হাসপাতালে নিয়ে এল···"

প্রশ্নটাতে যে একটু ব্যঙ্গ ছিল, মালী সেটাকে আরও একটু ফুটিয়েই দিলে জিগ্যেস করবার সময়। মেয়েটা মালীর দিকেই বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে জানালে—বোঙা-ঠাকুরে পুজো করা ফুল, ছেলের কল্যাণে; মাথার নিচে তো কোথাও রাখতে নেই···

কথাগুলো বলেই তার যেন মনে হোল, মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি কোল থেকে এক রকম ঝেড়ে ফেলেই, সে সেইখানে বসেই সমস্ত শরীরটা সরমার পায়ের কাছে লুটিয়ে দিলে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে নিজেদের ভাষায় অনর্গলভাবে একরাশ কি বলে গেল।

ব্যাপারটা এতই আকস্মিক যে প্রথমটা সরমা কিছু যেন ভাববার সময়ই পেলে না, তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মালীর দিকে চাইলে।

মালী জানালে, বলছে—তুমি স্বর্গের দেবী, আমার ছেলেকে বাঁচাও, তোমার কাছে এনে ফেলেছি—আমার ঐ একটি ছেলে—ওর বাপের পর ওই সর্দার হবে, আমি সর্দারের মা-হব—ছেলের জন্তে আমরা সব বেচেছি, নগদ টাকা দিয়ে তোমাদের পুজো দেব, ফুরিয়ে গেলে ঐ ছেলেকে তোমাদের গোলাম করে দেব, ডাগডরবাবু—দেবতাকে বলে ওকে বাঁচাও—ততদিন আমরা স্বামী-স্ত্রীতে কায়ে খেটে তোমাদের দুজনের সেবা করব—একটি কুটো নাড়তে দেব না তোমাদের···

সরমা কি রকম যেন হয়ে গেছে; কি করা দরকার, কি বলা উচিত কিছু ঠিক করে উঠতে পারছে না, তারপর মেয়েটা একটু পরে মায়ের দেখাদেখি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এর-ওর মুখের পানে চেয়ে কেঁদে উঠতেই সে যেন একটা কিছু পেয়ে বাঁচল, তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে।

এই সময় সুকুমার এসে পৌছুল।

দৃশ্যটা নিশ্চয় অদ্ভুত, অনেকটা বিসদৃশই; একটু দাঁড়িয়ে দেখতেই হোল, কিন্তু ভালো লাগল কি মন্দ লাগল সে-সম্বন্ধে কিছু বললে না। জানালে ছেলেটির অবস্থা নিতান্ত খারাপ দেখে নিয়ে এল, এরা দুজনেও ছেলে ছেড়ে থাকতে চাইলে না, ঘর দোর বন্ধ করে চলে এসেছে; আজকের রাত্রিটা এদের একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, কাল থেকে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে ওরা।

সরমা একটু যেন নিরাশভাবে প্রশ্ন করলে—"কেন, ওদের এখানে থাকতে বললে থাকবে না?

সুকুমার একটু হাসলে, সরমাই এদের সাহচর্য পছন্দ করবে কি না করবে সেই ভেবে কথাটা বলা; শিশুটির দিকে চেয়ে বললে—"ঐ ওকে দেখেই বোঝ না, কোল পেলে কেউ যেতে চায়?"

ওর মা'টা পড়েই আছে, তবে কান্না নরম হয়ে এসেছে, সরমা একটু অপ্রতিভ হয়ে মেয়েটিকে তার পাশে বসিয়ে দিলে, বললে—"কি তুলতুলে! অথচ দেখতে যেন কালো পাথর কেটে তৈরি।···আমি বলছিলাম এরা থাক—যদি থাকতে চায়, বুবুয়া যে চাকরটাকে দিয়েছেন তাকে ফিরিয়ে দিলেই হবে।···আর বউটাকে দেখেছ? কী যে চমৎকার! অমন দেখনি কখনও!"

সুকুমার কান পেতে শুনছিল, যেমন ক'রে ওর এই ধরণের কথাগুলা শোনে, শেষের কথাটায় একটু স্পষ্টভাবেই হেসে উঠল, বললে—"আমি সেই ছুটোর পর আর কিছু

মুখে দিইনি; এর ওপর ওরা যদি থাকতে রাজি হয় তো আমার কথা আরও একেবারেই ভুলে যাবে দেখছি যে!"

এই সবের মধ্যে আবার শিক্ষকতাও করতে হয়, কোথায় কি ভুল-ত্রুটি হয়ে গেল দেখিয়ে দিতে হয়, কোনটা আগের, কোনটা পরের দিতে হয় বুঝিয়ে; সরমা একটু অপ্রতিভ হয়েই খাবারের আয়োজন করতে যাচ্ছিল, সুকুমার বললে—"তুমি ছেলেটির কথা একবারও জিগ্যেস কর নি।"

সরমা আবার একটু অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, সুধরে নেবার চেষ্টা করে বললে—"এই দেখো! এমন হাঁউ-মাঁউ করে কেঁদে পড়ল মাগিটা!...তাই ভাবছিলাম—কি যেন একটা দিলে ভুলিয়ে...সত্যি, কেমন আছে?...ভালো আছে নিশ্চয়...এমন পড়ল কেঁদে মাগি!...যেন কী!"

অথচ ছেলের জন্যেই তো কেঁদে পড়া।...সে-কথা অবশ্য সুকুমার বলে না। আহা, বেচারি সরমা, তবু ভগবানের দয়া, কতো পরিষ্কার হয়ে এসেছে ওর জগৎ—এরই মধ্যে।

বললে—"অনেকটা ভালো; মানে, এতটা নিয়ে আসবার জন্যে আমার যে একটা ভয় ছিল সে-দিক দিয়ে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। তুমি ততক্ষণ মালীকে দিয়ে কথাটা ওকে বুঝিয়ে বলাও, আমি ধড়াচুড়াগুলো খুলে নি।"

এগার

আরও মাস তিনেক কেটে গেল—তীব্রতর কর্মস্রোতের মধ্যে দিয়ে। বর্ষাঋতু শেষ হয়ে এসেছে। এবারে এ প্রান্তে বৃষ্টি ভালো হোল না, একেবারে এই শেষের দিকে একটু ঘটা করে নেমেছে। সকাল থেকেই আবার মেঘ বেশ জমে আসছিল, একটু তাড়াতাড়ি হাসপাতালে বেরিয়ে পড়বে এমন সময় মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। যাওয়া চলত, ছাতা রেনকোট সবই নিয়ে বেরিয়েছে, তেমন দূরও নয় হাসপাতাল, কিন্তু কি ভেবে আর গেল না, বৈঠকখানার বাইরের দিকের বারান্দায় একটা ডেকচেয়ার পেতে বসে রইল।

দূরের পাহাড়গুলো গেছে মুছে, ক্রমে ক্রমে কাছের গুলাও গেল; বৃষ্টির কুয়াসা ঝিলের ওদিককার তটরেখা গ্রাস করে ফেললে, তারপর ধীরে ধীরে ঝিলের সমস্তটাই, শুধু একেবারে এই কোলের কাছে খানিক রইল জেগে। পরন্তু বিকাল থেকে হচ্ছে বৃষ্টি, অনেকখানি উঠে এসেছে।

সুকুমার কি ভেবে একবার উঠল, ঘরের এদিককার দোরজানলা বাইরে থেকে সবগুলা দিলে টেনে বন্ধ করে। মনে হোল ভেতর-বার সবদিক থেকেই আলাদা হয়ে একটি নিরিবিলি অবসর রচনা করে বসল সে।

ভেতরে একবার সরমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"রুম্মা, তোর বাবু চ'লে গেল?"

"গেলেন তো দেখছি।" রুম্মা বাংলা শিখেছে একটু, ছোটখাট কথাগুলা আটকায় না, শিক্ষাটা চলছেও দু'দিক দিয়ে—নিত্য কথাবার্তা, তা ভিন্ন বই।

এর পরে আবার সরমার কণ্ঠস্বর—"মানুষের একটা আক্কেল থাকতে হয়; এই পাহাড়ে বৃষ্টি মাথায় করে... তুই দোরজানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আয়।"

সুকুমার একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে মনে মনে। রুম্মা কিন্তু দোরখুলে বাইরের দিকে দেখলে না; ভেতর থেকে ছিটকিনিটা তুলে দেবার সময় শুধু নিজের মনেই বললে—"আক্কেল থাকতে হয়!"

—হয়তো কথাটা নূতন তার পক্ষে, আয়ত্ত করে নিলে; কিম্বা ছিটকিনি দিতে যে শক্তিটুকু লাগল, তার সঙ্গে যুক্তাক্ষরের ঝোঁকটা মিলল ভালো, তাই বলে দিলে।

তা ভিন্ন আক্কেলের দোষটা তো দেওয়াও যায়, নানা কারণেই; কেউ শুনতে পাচ্ছে বলে যখন ভয় নেই।

যে-ভাবে—নিঃসংশয়ে—কথাটা এসে কানে পড়ল তাতে সুকুমারের ঠোঁটে আপনিই একটু হাসি ফুটে উঠল; তারপর এই রুম্মাকে অবলম্বন করেই তার চিন্তা স্রোত আরম্ভ হয়ে গেল।

রুম্মা সরমার জীবনে একটি অদ্ভুত পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে, শুধু, ও একা নয়, ওর ছোট সংসারটি নিয়ে, যার কেন্দ্র অবশ্য রুম্মাই। সরমার নারী-জীবনের একটা অভাব মিটেছে ওর দিক দিয়ে, ওর ছেলেটিকে আর মেয়েটিকে আশ্রয় করে, এরপর তাই থেকে অনুচরী, দাসী হয়েও রুম্মা সরমার সাথী হয়ে উঠেছে অনেকখানি একেবারে যে হয়ে ওঠেনি তার কারণ সরমার দিক থেকে

...ওর নিজের জীবনের অর্ধেকটা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে ...ভয় পার্থক্যটাও গেছে মিটে একরকম; পূর্ণ ...র মর্যাদায় রুম্মাই নিজেকে এসে দাঁড়াতে দেয়নি; ...টা সেদিকে খুব প্রখর, সীমাজ্ঞানটা খুব সজাগ।

...লে বুধাই আর মেয়ে তুলার এ-বালাই নেই, মায়ের ...বাবা-মায়ের কাছে আদর-আস্কারা বেশি পেয়ে তারা ...ন তারই অনুগত হয়ে উঠছে বেশি।

...য়ে উঠতে মাস খানেক লাগল, ছেলেটা এখন ...দম ছাত্র। সরমার নিজের স্কুলের দুটি ছাত্রী, রুম্মা ...তুলা। সবাইকেই নিজের মনের মতো করে গড়ে ... চলা-বসা, পোষাক-পরিচ্ছদ, সব দিক দিয়েই; ...নি শুধু ঝংড়ুকে, সে বাগান নিয়েই রইল, গাছপালা ...চাকরের মধ্যে ভদ্রতার অশুচি থেকে সন্তর্পণে নিজের ...বাঁচিয়ে রেখে।

...রে ধীরে কেমন করে পরিবর্তনটুকু হোল, ঝংড়ুর ...কেমন করে হোলও না, অনেকদিন পরে আজ এই ...টুকু পেয়ে তার ধারাটুকু সুকুমারের দৃষ্টির সামনে ফুটে

...রপরে, সংসারে যখন পরিপূর্ণতা এসে গেল (হোক ...তা পরকে নিয়েই) সরমার মনটা বাইরের উপরে ...। ততদিনে বাইরের যোগ্য অভিজ্ঞতা, শব্দ-সম্ভার ... বেড়েছে তার, স্বভাবের মধ্যে সেই নীরব দিশেহারা ... নেই, তাই থেকে সেই সঙ্কোচ—যার জন্য সরমাও ... সাহচর্য পরিহার করত, সুকুমারেরও তাকে ...নের মধ্যে নিয়ে যেতে মন সরত না। ইতিমধ্যে ওর ... অধিগত বিদ্যা স্মৃতির মধ্যে কোথায় একটু ছিদ্র ... যেন বন্যার স্রোতেই ওর কাছে এসেছে ফিরে। ... ইংরাজী বেশ ভালোই জানা; ইতিহাস, ভূগোল ...সাধারণ জ্ঞান বেশ গভীর, এর অতিরিক্তও দু'একটা ... এমন কথা মাঝে মাঝে বলে ফেলেছে, যার জন্যে ...হয় কলেজেও বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত এগিয়েছিল ও। ...টা ওর গোপন করবার চেষ্টা, তাই সেটা কতদূর কী ... টের পায়নি সুকুমার।

সংসার ছাপিয়ে আশ্রমে গিয়ে পড়েছে সরমা, আশ্রম ছাপিয়ে খানিকটা হাসপাতালেও, সেবার ...। অপরিসীম ওর উৎসাহ, আশ্রমের চেহারা দিয়েছে অনেক বদলে, সুকুমারকেও খানিকটা টেনে নিয়েছে এদিকে। ঠিক ব'লে ক'য়ে টানেনি; আশ্রমে সরমার এই যে রূপ তাইতে আকৃষ্ট হয়ে সুকুমারও কখন্ যেন অজ্ঞাতসারেই এই দিকে এসে পড়েছে।

এখন একটি সহজ কর্মময়, পরিপূর্ণ জীবন চলছে ওদের। দেখাশোনা, যাওয়া-আসা, আলাপ-পরিচয়; সবাই এক জায়গায় বসে আলোচনা, পরিকল্পনা—এই সব নিয়ে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, বোঝা যায় না। বৈঠক হয় তার বাসায়, মাস্টার মশাইয়ের বাসায়, কখনও বীরেন্দ্র সিঙের নিজের ভবনে, কখনও বা সন্ধ্যার মুখে হাসপাতালের প্রাঙ্গণটায়, বোগেন ভিলিয়া গাছটার সামনে চেয়ার পেতে। থাকেন বীরেন্দ্র সিং, মাস্টার মশাই, আশ্রমের কয়েকজন শিক্ষক, দু'জন যে শিক্ষয়িত্রী আছেন তাঁরা, আর সুকুমার সরমা তো থাকেই, বীরেন্দ্র সিং বলেন ওরা আশ্রমের প্রাণ। এ প্রশংসায় কথা কাটাকাটি চলে এক এক সময়। সামনে এতটা প্রশংসা সহ্য হয় না, একদিন সুকুমার বললে—"আমরা বনের পাখি, আটকে গেছি, আবার কবে উড়ে যাব, এত প্রশংসা করবেন না। আর প্রাণ যদি হয়ই তো সে আপনার মেয়ে।" ছল ধরার জন্যে মুখিয়ে থাকেন মাস্টারমশাই, উনি ছিলেন কলেজে বীরেন্দ্র সিঙের গৃহশিক্ষক আর অভিভাবক, সেই সম্পর্কে এদের ঠাকুরদাদা। বললেন—"প্রশংসার নিজের পাওনাটুকুও তুমি সরমার ওপর চাপিয়ে দাও আপত্তি নেই সুকুমার, আর দেওয়াই তো উচিত, তবে দুটো প্রাণ যেখানে এক—সেখানে আলাদা আলাদা নাম করে বলা বীরেন্দ্রের অন্যায় বৈকি।"

নিজে প্রচণ্ড বেগে হেসে ওঠেন, বয়স্থ দু'একজন যারা ঐ সম্বন্ধ ধরে আছে তারা যোগ দেয়, বাকি সবার মধ্যে একটা মৃদু সরসতা ছলছলিয়ে ওঠে।

আলোচনা হয় যেন এই ছোট্ট সহর লখমিনিয়া নিয়ে সমস্ত নূর-বেগম পরগণাটা সবার যৌথ সম্পত্তি—আশ্রম, হাসপাতাল, বাজার, পথঘাট সম্বন্ধে তো এই ভাবের আলোচনা হয়ই, এমন কি বীরেন্দ্র সিঙের প্রাসাদ নিয়ে কিছু পরিকল্পনার কথা উঠলেও আলোচনার ভাবটা বদলায় না।

অদ্ভুত এলোকটি। ইতিমধ্যে আরও জেনেছে এর সম্বন্ধে। লখমিনিয়া এ-প্রান্তের এক বড়

পরিবারের শাখা। কিন্তু বীরেন্দ্র সিঙের কানে কি এক মন্ত্র পড়েছে, উনি যেন সব শুদ্ধ নেমে এসে আপামর সবার মধ্যে চারিয়ে পড়লে বাঁচেন। ওঁর স্বপ্নের অন্ত পায়নি সুকুমার এখনও।

ভেবেই চলেছে।

বৃষ্টি আরও জোর হয়ে উঠেছে; হাত পঞ্চাশেক দূরে ঝিলের জলটুকুও আর দেখা যায় না। সমস্ত লখমিনিয়া যেন বাইরে মুছে গিয়ে সুকুমারের অন্তরে প্রবেশ করেছে। একটা মায়া বসে গেছে—সেটা, অবসরের অভাবেই, এতদিন ভালো করে উপলব্ধি করতে পারেনি, আজ করলে।…একে গড়ছে তাতে আর সরমাতে মিলে। আজকে এই তাদের এক কাজে মিলে যাওয়ার ব্যাপারটাও বড় অদ্ভুত মিষ্ট লাগছে।

সরমা বৈঠকখানায় কি কাজে এসেছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাজ নয়, ঘুরে বেড়ানর সঙ্গে সঙ্গে গুণ গুণ করে একটা গান ধরেছে, জোরে না হলেও বিশেষ আস্তেও নয়; সুকুমার তো নেই! যেন শোনা গান, কিন্তু ধরতে পারছে না সুকুমার বাইরে থেকে।

সরমার দিকেই মনটা গেল। আশ্চর্য এই যে সরমা অনেকখানিই ফিরে পেয়েছে আগের জীবনের, শুধু মূল জ্ঞানটা পেলে না এখনও। এরকম তো হবার কথা নয়। শিক্ষা, জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা—সব আসবে ফিরে, অথচ বুঝতে পারবে না কোথায় ছিল বাড়ি, কাদের সন্তান, কি ছিল আত্মীয়-স্বজন! এক এক সময় মনে হয় কে ইচ্ছা করেই ও এদিকটা লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু তা করবার উদ্দেশ্য কি হতে পারে? আর ওর মুখের সরলতা, ওর ব্যবহারের স্বচ্ছতা দেখে মনে হয় না ঠিক লুকোচুরি খেলার মানুষ সরমা।

এ-সম্বন্ধে বই পড়েছে অনেক আনিয়ে। একটা অপেক্ষাকৃত নূতন বিজ্ঞান, এখনও মণীষীরা হাতড়াচ্ছেনই পুরো সন্ধান কেউ দিতে পারেন না।…হয়তো সম্বন্ধ নির্ণায়ক কতকগুলা আলাদা কোষই মাথার মধ্যে আছে সেইগুলা গেছে নষ্ট হয়ে, কিম্বা আঘাত পেয়ে এখনও হয়ে আছে মুহ্যমান।

কবে আবার সেগুলা সজীব হয়ে উঠবে তার জন্য অসীম ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করে আছে সুকুমার। আজকাল সরমার মস্তিষ্কের ক্ষমতা বেড়েছে, তাকে ভাবতে বললে অন্যায় হয় না। দু'একদিন বলেছিলও; কি রকম এক ধরণের অন্যমনস্কতা এসে যায় ওর দৃষ্টিতে, বড় কষ্ট হয় দেখলে। ঠিক বুঝতে পারে না সুকুমার, ওর অসহায় ভাবটা কেন—যা ফিরে পাওয়া যাবে না তার জন্যে, না ফিরে পাওয়া গেলে এই যা ছেড়ে যেতে হবে তার মায়ায়?

আর ওকে বলে না ভাবতে।

ভেতরের গানটা আরও জোর হয়েছে; আর সরমাকেও বর্ষায় পেয়েছে। বৈঠকখানা থেকে ভেতরের দিকে চলে গেল, বারান্দা থেকে ডাকলে—"দুলা! বই রেখে এদিকে আয়, একটা গান শিখবি।" (ক্রমশঃ)

যুগাবতার

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মানুষের দেহ নিয়ে এলে জয়বাদী
উন-বিংশ শতাব্দীর মহাতমসায়।
আছেনই আছেন তিনি অনন্ত অনাদি—
এ বিপুল বিশ্বাসের প্রদীপ্ত শিখায়
দূর করি দিলে তুমি সংশয়-তিমির।
মেঘমন্দ্রস্বরে তুমি বাণী দিলে কানে

আর্য্য ঋষিকণ্ঠ হ'তে যে-বাণী গম্ভীর
উৎসারিত হোলো ঊর্দ্ধে বেদান্তের গানে।
স্বাধীনতা—দিলে তারে নূতন গরিমা
'যত মত তত পথ' করি উচ্চারণ;
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের তুমি ঘোষিলে মহিমা।
হে যুগাবতার, আমি লইনু শরণ

তোমার চরণপদ্মে। তোমার যে বাণী—
সেই বাণী অমৃতের—নিঃসংশয়ে জানি।

পশ্চিমবঙ্গে দুগ্ধ ও গোশালা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

বিজ্ঞানী বলে দুগ্ধ একটী পূর্ণ খাদ্য, কিন্তু শিশুর পক্ষে জল আলো ও হাওয়ার মত দুগ্ধ একটী গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য্য খাদ্য।

পশ্চিম বাংলার নিরানন্দ জীবনে, যেখানে দিনান্তে অন্ন আজ অনেক সময় মহোৎসব, খাদ্য হিসাবে 'দুগ্ধপান' ব্যবস্থা সেখানে আকাশ কুসুম। বাড়ন্ত ভাঁড়ারে প্রাচুর্য্যের স্বপ্ন অলসের পক্ষে বিলাস, কিন্তু কর্ম্মীর নিকটে কল্পনা সংগঠনের প্রাণ—ঠিক বৈজ্ঞানিকের ক্ষুদ্র গবেষণাগারে কোন বিরাট শিল্পের জন্মলাভের মত।

অনাদিকাল হইতে এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গ্রাম ছিল প্রধান, নগর ছিল নববিকশিত কুমুদ কহ্লারের মধ্যে শতদল। একান্নবর্ত্তী পরিবার ও সুবিন্যস্ত শ্রমবিভাগ (social guild) ছিল এই প্রাচীন সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। নদনদীবিধৌত দেশে খাদ্যশস্য, মৎস্য মাংস এবং দধি দুগ্ধের অবস্থা ছিল অঢেল, প্রচুর ছিল বলিয়া অপচয় সম্পর্কে দৃকপাত করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইত না। প্রাচুর্য্যে বর্দ্ধিত জনসাধারণ ধীর, আয়াসী ও শান্তিপ্রিয় হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

গ্রহবৈগুণ্যে এই শান্তিপ্রিয় জাতির জীবনেও নামিয়া আসিল মহাদুঃখ, ক্রমে নদনদী শুষ্ক হইল, মাঠ অনুর্বর হওয়ায় শস্যহানি হইতে আরম্ভ করিল। ডোবা, পুষ্করিণী হাজিয়া মজিয়া যাওয়ায় দেশ মৎস্যশূন্য হইল, কেবল শ্রীবৃদ্ধি হইল জনারণ্যের। খাদ্যাভাবে, বৃত্তি অভাবে দেশে দেশে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। বৈদেশিক শাসকের ভ্রুকুটী ও লাঞ্ছনা উপেক্ষা করিয়া গণজাগরণ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। তার পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

চাঞ্চল্যের কেন্দ্র এই বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংস করিবার জন্য বাংলাদেশের মানচিত্র বিদেশীর হস্তে বারংবার লঞ্ছিত ও লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে স্বাধীনতার পুণ্যমুহূর্ত্তে ত্রিধা বিভক্ত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে পরিণত হইল। সাম্প্রদায়িক মাৎস্যন্যায়ে 'পূর্ববঙ্গ' হইতে দলে দলে গৃহহারা লাঞ্ছিতের দল ক্ষুদ্র বঙ্গে ভীড় জমাইল। খাদ্যভাণ্ডার ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইতেছিল, এইবার একেবারে "ভাঁড়ে মা ভবানী," ভিক্ষা ব্যতীত উপায় রহিল না।

দেশের শাসনরশ্মি নির্য্যাতীত জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে আসিবার পরেই আরম্ভ হইল সংগঠন। নদনদী-শাসন, খালবিল, কূপ, পুষ্করিণী উদ্ধার, কৃষি পরিকল্পনা, গো-হাঁস মুরগী পালন, যোগাযোগ, রাস্তাঘাট, পরিবহন সমস্যা প্রভৃতি; দিকে দিকে কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। খাদ্যসমস্যা বিদূরিত করা, ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের আয়ত্বে যতদূর সম্ভব বাস্তুহারাদের গৃহ দেওয়া, দেশের আপামর স্বাস্থ্যসম্পদ ফিরাইয়া আনা, শিক্ষার আলোয় জনতাকে উন্নীত করা, নবসংগঠনে নূতন শক্তিকের ইহাই সাধনা, বিপুল শ্রম ও স্বার্থত্যাগের হোমানলে জাতির এই কল্পনা অগ্রগামী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ঈর্ষা, দ্বেষ ত্যাগ করিয়া সামাজিক নববিধান বরণ না করিয়া উপায় নাই। প্রাচীন দিনের স্মৃতি মনকে আপ্লুত ও অবশ করিয়া তোলা সম্ভব হইলেও প্রাচীন আর নবীন হইবে না, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই নবীনের উদ্ভব হইয়াছে এবং যতশীঘ্র এই নব ন্যায় স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয় জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল।

সমস্যাঘন জাতীয় জীবনে দুগ্ধ এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নানা কারণে দুগ্ধ-দুর্ভিক্ষ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভয়াবহ গোধন হত্যা, ১৯৪২ সালে মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪পরগণার সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে গৃহপালিত পশুর প্রাণহানি, শস্যহানি ও নিরন্ন নরনারীর কলিকাতার রাজপথে মৃত্যু, তার পরে বঙ্গ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর অভিযান, পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ও উভয় বঙ্গের স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতায় অন্যান্য সমস্যার সহিত দুগ্ধ-দুর্ভিক্ষ আজ নগ্নভাবে প্রকট হইয়াছে। হতাবশিষ্ট যে স্বল্পসংখ্যক গোধন এই অঞ্চলে বাঁচিয়া ছিল খাদ্যাভাবে তাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের ন্যায় সকল প্রাণীই তাহার সতেজ বংশধারার মধ্যে বাঁচিয়া থাকে এবং প্রাকৃতিক যোগাযোগ অনুকূল হইলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, পশুখাদ্যের দুর্মূল্যতার জন্য গোয়ালার হাতে গোবৎস শৈশবেই নিধনপ্রাপ্ত হয়, এমন কি দুধ ছাড়াইবার পরে পুনরায় বাচ্চা দেওয়ার সময়তক গোয়ালার কাছে গাভী অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। ফলে কসাই এর নিকটে অল্প দামে বিক্রীত হয়। নানা কারণেই গোধন আজ মরিতে বসিয়াছে। গৃহস্থ নিজেই যদি দুবেলা 'ভাত, না পায় গৃহপালিত পশুর খাদ্য সেখানে কোথায়।

যাঁহারা নগরে বাস করেন, ক্রীত দুগ্ধ যাঁহাদের অবলম্বন, তাঁহারা জানেন এই ব্যবসায়ে কিরূপ ভণ্ডকতা চলিতেছে, প্রতি পরিবারেই কিছু না কিছু দুধ দরকার হয়। গাভী দোহন হয় প্রত্যুষে, কাজেই প্রভাত হইতে এই অসামাজিক দৈন্যের মধ্যে আমাদের দিন আরম্ভ হয়। দুধের ভণ্ডকতা ভেজালে ও ওজনে। দুধের সহজ ভেজাল জল, এই জল যেখানকার হউক না—গোয়ালাদের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। গ্রামের দুধ রেল ষ্টেশনে আসিবার কালে কূয়ো, ডোবা কিম্বা নদীর জলে মিশ্রিত হয়। নগরের উপকণ্ঠে উপনীত হইবার পরে ব্যবসায়ীর হাত বদলের সহিত দুধেরও তারতম্য হয়। কলের জল, ড্রেনের জল এমন কি রেল ষ্টেশনের পয়ঃপ্রণালীর জল মিশ্রিত করিতেও এই ব্যবসায়ীদের আটকায় না। সহরতলীর ষ্টেশনে প্রভাতী গাড়ীর যাত্রীদের এই দৃশ্য অজানা নহে।*

---

* আরও চমৎকার এই যে, পচা ডোবা কিম্বা ড্রেনের জল মিশ্রিত-করণ আকস্মিক ব্যাপার নহে, বিশুদ্ধ জলের চেয়ে নোংরা জল ওজনে আপেক্ষিক ভারী বলিয়া ভেজাল হিসাবে বরং নোংরা জল ভাল। ভেজালের কি চমৎকার "আইডিয়া"!

দুধে জল কিম্বা জলে দুধ-মিশ্রিত হইবার পরে আরম্ভ হয় সহরের বাড়ী বাড়ী বিতরণের পালা, দুধ মাপিবার পাত্রের রকমারী বৈশিষ্ট্য কাহারও অজানা নাই। ঘটি, গ্লাস ও মগ নানা প্রকার পাত্র এই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। প্রায় বাড়ীর প্রত্যূষের গ্রহণকারী সাধারণতঃ দাসদাসী বলিয়া এই দুষ্ট ব্যাধি অচলায়তন হইয়া আছে। মধ্যবিত্ত ঘরে অন্য কারণেও এই সজল দুধের ব্যবসা অবাধে চলিয়া থাকে। দুধওয়ালারা সাধারণতঃ ধারে ব্যবসা চালাইয়া থাকে,মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকেই বাকী ধার শোধ করিয়া নগদী ক্রেতা হইতে অপারগ বলিয়া জলোদুধ বিক্রয় বন্ধ অসম্ভব, দুই এক ঘর খরিদদার 'মায়া' গেলেও "দুধওয়ালার দুধে হাত পড়ে না," উপমাটী সর্বজনবিদিত সত্বেও ব্যাধি দূরীভূত হয় না, দুষ্ট ব্যাধিতে সমাজ-জীবন আজ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

কথিত হইয়াছে মহাবীর দ্রোণ, পিটুলী মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ জলে পুত্রের দুধের অভাব দূর করিয়াছিলেন, ঘটনাটী সত্য। কিম্বা উপাখ্যান জানিবার উপায় নাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ দ্রোণ কিরূপে দুগ্ধ সংগ্রহ করিতেছেন তাহা কি কোন জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় প্রবুদ্ধ করা সম্ভব? মহিষের দুধ শাদা, বাতাসার জল কিম্বা গুড় সিদ্ধ জল মিশ্রিত করিলে শাদা দুধ লাল আভা ধারণ করে, দেখিতে খাঁটি গো দুগ্ধের মতনই ভারী ও লালচে দেখায়, পাতলা দুধে পিটুলী গোলা, খৈএর মণ্ড অবাধে চলে। কিন্তু ইহা বাহ্য। রুগ্ন গরুর দুধ, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত গবাদির দুধও বাজারে বাদ যায় না। যে দেশে মানুষের যক্ষ্মারোগ গোপন থাকে কিম্বা অর্থাভাবে চিকিৎসা হয় না, সেই দেশে গবাদি পশুর যক্ষ্মা সময় থাকিতে ধরা পড়িবে এবং অন্যান্য পশুর সংস্রব হইতে আলাদা রাখা হইবে ইহা দুরাশা। ফলে বিষাক্ত দুধে কত নয়নানন্দ পুত্তলী অকালে জননীর ক্রোড়হীন হইতেছে কে তাহা বলিবে, অনেক সময় মনে হয় শিশুর অকাল মৃত্যু, দুধ না পাইয়া যাহারা ব্যাধির কবলিত হয় তাহাদের অপেক্ষা হাজামজা ডোবা কিম্বা বিষাক্ত পয়ঃ-প্রণালীর মিশ্রিত জলদুগ্ধ খাইয়া বেশী।

শিশুদের পরেই দুধ প্রয়োজন সদ্য জননীদের, তারপরে পীড়িত, রুগ্ন নরনারী এবং বৃদ্ধের। কিন্তু যে পরিমাণ দুগ্ধ আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় তাহার সিকি অংশও খাদ্য হিসাবে বাজারে আসে না, অথচ মোট আমদানীর পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, ঘাটতি বাজারে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, মহানগরীর ধনীদের রসনা পরিতৃপ্তির জন্য বলিলে হয়তো অন্যায় বলা হইবে না। পাকিস্তান বৈদেশিক রাজ্য হওয়ায় সেখানকার দুধ, দৈ, ক্ষীরও ছানা কলিকাতার বাজারে আসে না বলিলেই চলে, অথচ খাবারের দোকানে ভীড় কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্ন নরনারীর আহার্য্য দুধ রসনা-বিলাসীদের 'খাবারে' পরিণত হওয়া দুগ্ধ-দুর্ভিক্ষের অন্যতম হেতু। শিয়ালদহ নর্থ, সাউথ, সেকসনের প্রভাতী ট্রেণ এবং লিলুয়ার লোকাল গাড়ী যাঁহারা দেখিয়াছেন তাহারা জানেন কলিকাতার প্রভাতী বাজারে দুধের সমারোহ।

আজকালের দুধের বাজার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে একেবারে টাটকা বিষের উন্মুক্ত পসরা, জাহান্নমে লওয়ার সোজা রাজপথ। শিশুর কলেরা আমাশয় টাইফয়েড ও যক্ষ্মার একটী বড় কারণ এই দুধ। এই জন্যই এখানে বিদেশী ননীতোলা কৌটার গুঁড়া দুধের এত কদর, ননীপূর্ণ গুঁড়া দুধ [illegible] সাধারণের ক্রয় শক্তির ক্ষমতার বহির্ভূত।

সহরের আশে পাশে কিম্বা জনপূর্ণ গলির মাঝখানে "খাটাল" দেখিয়াছেন কি? দেখিয়া থাকিলে এই খাটালের চতুর্দ্দিকে গোময়, গোমূত্র এবং মশা মাছি, ভন্ ভনে ডাঁশ ও কর্দম নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন? আর একটু বিশেষ দৃষ্টিতে খেয়াল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন, খাটালে দুগ্ধবতী মহিষ ও গাভী আছে কিন্তু জীবন্ত গোশাবক কদাচিৎ নজরে পড়িবে, জীবন্ত গো বৎসের পরিবর্ত্তে মৃত বৎসের লোমশ চামড়ায় আবৃত বিচালীর খেলনা বাছুর দেখিয়াছেন নিশ্চয়ই। এই খেলনা বাছুরের অভিনয়ে গোমাতা আমাদের জন্য অমৃত বিন্দু দান করেন এবং খাটালের মালিকের কৃপায় রাস্তার গঙ্গার জলে (হাই ড্রেণ্টের জলে) পবিত্র করা হয়। খরিদ্দারের ক্ষমতা অনুযায়ী জলের ভাগ বাড়াইয়া কলিকাতার বাজারে ২।৩ রকম দুধ বিক্রয় হয়। বাছুরে কিছু না কিছু দুধ খাইবেই, মালিক এই বৃথা অপব্যয় সহ্য করিবে কেন? কাজেই গোবৎসকে অনাহারে রাখিয়া, অবশ্য অহিংস উপায়ে মারিয়া ফেলা হয়—তারপরে উক্ত বৎসের লোমশ চামড়ায় বিচালীর খেলনা আবৃত করিয়া বাছুরের অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলা হয়, মূক গোমাতা নীরবেই এই অত্যাচার সহ্য করে! এখানেই কি যবনিকা পাত? দুধ ছাড়াইলে এই গাভীই বা যায় কোথায়? কশাইখানায় খোঁজ লইলে আংশিক সংবাদ পাইতে পারেন।

নগরীতে গৃহস্বামীর উপস্থিতিতে বাড়ী বাড়ী গাভী লইয়া দুধ দুহিয়া দেওয়া লক্ষ্য করিয়াছেন কি? খাঁটি দুগ্ধ পানে পরিতৃপ্ত গৃহস্বামীর নিকটে সংবাদটী অদ্ভুত বোধ হইতে পারে কিন্তু ইহা সত্য! গাভীকে রাত্রির খাদ্যের সহিত প্রচুর জল, অনেক সময় দানাগুড়ের জল খাওয়ান হয়, ফুকা দেওয়ায় গাভার সমস্ত দুধ "ওলনে" (গাভীর স্তনে) চলিয়া আসে, এই প্রথায় দুধ বেশী পাওয়া যায়, কিন্তু গাভী অল্পদিনেই শুকাইয়া মরিয়া যায়। 'ফুকা' প্রথা দণ্ডনীয় অপরাধ, তত্রাচ গোয়ালাদের মধ্যে গোপনে চলিয়া থাকে। ভোরে দুধ দুহিবার সময় তঞ্চকতার সহিত জল মিশান লইয়া অনেক গল্প চলিত আছে, জামার নীচে কিম্বা কোমরে চর্ম-পেটিকায় জল লইয়া, হাতার মধ্যে নলের সাহায্যে জল দেওয়া তন্মধ্যে প্রধান। দুধ দুহিবার সময় হস্ত সঞ্চালনে পেটিকায় টান পড়ে ও জল নল বহিয়া বালতীতে যায়। জনসাধারণ এ হেন পবিত্র দুগ্ধ প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে খাটালের নোংরা বীজাণুর আক্রমণে কিম্বা মশক দংশনে আকুল হইয়া চীৎকার করিয়া প্রতিবাসীর শান্তিভঙ্গের প্রয়াস কি ভদ্রতা সঙ্গত? বঙ্গভূমে এনোফিলিসের অত্যাচার নাই কোথায়? নগরপালকেরা এই চরম সত্য অবগত এবং বিশেষ কারণে কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় নিদ্রামগ্ন, তাই সহরের বুকে যত্রতত্র খাটালের সংখ্যা প্রতিদিবস বাড়িয়া যাইতেছে এবং নানারকম ভেজাল নিরোধ আইন সত্বেও বুক ফুলাইয়া ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে। প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে সংবাদপত্রে "খাটালের" বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হইয়া উঠে এবং কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়। ফলে কয়েকটী খাটালের মালিকের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা রুজু হয়, সাজাও হয় কিন্তু কোন অদৃশ্য হস্তের প্রভাবে

আন্দোলনে ভাটা পড়িয়াছে এবং এই ঘৃণিত পাপ ব্যবসায় মহানগরীর অভ্যন্তরে প্রকাশ্যে ও সভান্তরে চলিতেছে।

এই পরিস্থিতিতে খাদ্য হিসাবে দুগ্ধ প্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? আপামর সাধারণ হয়তো আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ শিশু, কিশোর, পীড়িত নরনারীর একমাত্র বিশুদ্ধ পূর্ণ খাদ্যের সম্ভাবনা কি সুদূরপরাহত?

কিছুদিন পূর্বে লেখকের সরকার পরিচালিত হরিণঘাটায় পোল্ট্রি, ডেয়ারী, ফার্মিং ও পশুপালনাগার দেখার সৌভাগ্য হইয়াছিল; এই প্রতিষ্ঠানের হাতে যে পরিমাণ ভূমি বাড়ী ও যন্ত্রপাতি আছে, গো-মহিষাদির পরিমাণ ও সংখ্যা তদনুপাতে নিরতিশয় অকিঞ্চিৎকর। বহু লক্ষ টাকা এই প্রতিষ্ঠানে ব্যয়িত হইয়াছে, লীগ শাসনের সময়ে সরকারী-লাল ফিতায় বহু লক্ষ টাকা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া শুনিলাম। বর্ত্তমানে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। দুধ, মুরগী ও ডিম বাজারে যাইতেছে, গবাদি পশুর খাদ্য চাষ হইতেছে। সরকারী বীজাগারের জন্য বীজ উৎপাদন হইতেছে, বিস্তৃত খালে মৎস্য চাষ আরম্ভ হইবে বলিয়া শোনা গেল। আরও জানা গেল প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যবসায়ের দিক হইতে স্বাবলম্বী করিবার জন্য সরকার হইতে আরও জমি সংগ্রহ করা হইবে এবং গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে এবং পশুপালনের সহিত বৈজ্ঞানিক প্রজনন ব্যবস্থাও হাতে লওয়া হইবে।

বিপুল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এই ডেয়ারী, পোল্ট্রি এবং গবাদি পশুপালন ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হইল—ভবিষ্যতের সুপ্রভাত হইয়াছে, যদিও অজানা নহে যে আরও দীর্ঘকাল আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। মনে হয় পথের রেখা স্পষ্ট হইয়াছে এবং যত্নের সহিত, ধৈর্য্যের সহিত, সততা ও ব্যবসায়ীসুলভ দৃষ্টির সহিত চলিলে আমাদের দীর্ঘ পথের ব্যবধান হ্রাস করিতে পারিব এবং জাতির সঞ্চিত প্রত্যাবৃত্ত হইবে।

সরকারী দুগ্ধশালা ব্যতীত ব্যক্তিগত দুগ্ধশালাও অনেকগুলি চলিতেছে ক্যাভেন্টার, আলপাইন ডেয়ারী, এক্সপ্রেস ডেয়ারী, করোনেশান ডেয়ারী, কোল্ড ষ্টোরেজ ক্রীমারী, কো-অপারেটিভ দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান, মিল্ক সাপ্লাইএবং আরও কত কি। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিই বহুকাল হইতে এই ব্যবসায় পরিচালন করিতেছেন এবং সকলেই দেশের দুগ্ধ দুর্ভিক্ষে অল্পবিস্তর সাহায্য করিতেছেন কিন্তু একদিক হইতে এই সকল প্রতিষ্ঠান বৃহৎ খাটাল ব্যতীত বড় কিছু নহে। ইঁহাদের কেহ কেহ বিমিশ্রিত দুগ্ধ (toned milk) বিক্রয় করেন এবং কেহ কেহ নিজস্ব দুগ্ধশালায় দুগ্ধের সহিত ক্রীত-দুগ্ধ একত্রিত করিয়া "পাষ্টুরাইজ" পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ করিবার পরে হাইজিনিক উপায়ে বোতল ভর্ত্তি করিয়া বিক্রয় করেন। হরিণঘাটার সরকারী দুগ্ধশালাও toned (টোনড্) দুধ বিক্রয় করিতেছে। বিলাতী গুঁড়া দুধ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাঁটী দুধের সহিত এমন ভাগে মিশ্রিত করা হয় যাহাতে মিশ্রিত দুধে একটা নির্দিষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় থাকে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড দুধে নবনীত, স্নেহ-জাতীয় পদার্থ, ননী, মিষ্টত্ব ও জলের ভাগ নির্দিষ্ট আছে। খাঁটী দুধ বিক্রয় না করিয়া এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড দুধ বিক্রয় করিবার কারণ এদেশের দুগ্ধদুর্ভিক্ষ।

হরিণঘাটার সরকারী দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকারীদের নিকট হইতে জানা গেল যে সরকারী পরিকল্পনায় কলিকাতা এবং সহরতলীর যাবতীয় খাটালকে এই স্থানে আনা হইবে এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে ও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে পৃথক পৃথক গোশালায় মালিকগণকে নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনা করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনা সম্ভব হইলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও জাতীয় সরকারের কর্ম্মিদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সম্মিলিত সাফল্য আশা করা যায়। গোধনকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ইহাই সর্বোত্তম উপায়। হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি ক্ষুদ্র দেশ সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারী ব্যক্তিগত প্রতিভায় ডায়েরী, পোল্ট্রি এবং শূকর পালন ব্যবসায়ে অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই ব্যবসায় হইতে দেশের আভ্যন্তরীণ অভাব দূরীভূত করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করিতেছেন। আমাদের বাঁচিতে হইলে এখানেও এই প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করিতে হইবে। "দুগ্ধ উপনিবেশ" পরিস্থাপনে অখণ্ড বাংলা ও বোম্বাই প্রায় একই সময়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু স্বাধীনতার তিন বৎসরের মধ্যে বোম্বাই দুইটা বৃহৎ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনিবেশ এর গৌরব অর্জন করিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা কেন্দ্রে "toned milk" দুগ্ধ উৎপাদনের দৈনিক হার অর্দ্ধ শত মনের কোঠা অতিক্রম করিল না। আফগানিস্থানের প্রধান অমাত্য সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশের দুগ্ধ উপনিবেশ পরিদর্শন করিয়া উচ্ছসিত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, আর প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ নগরীর বুকে "খাটালের" প্রেত নৃত্য কি অজর অমর হইয়া রহিল?

উল্লিখিত দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আরও কয়েকটী গোশালা আমাদের প্রদেশে বর্ত্তমান। তন্মধ্যে সোদপুর পিঁজরাপোল, লিলুয়া পিঁজরাপোল, কাঁচড়াপাড়া পিঁজরাপোল বিখ্যাত। মাড়োয়ারী সমাজের কতিপয় বদান্য ভদ্রলোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠানের দুগ্ধ বিভাগের সুবিধা হইতে বঞ্চিত। এই সকল প্রতিষ্ঠানের দুগ্ধ সরাসরি মাড়োয়ারী মহলে চলিয়া যায়। কেবলমাত্র গোপ্রজনন বিভাগ আংশিক-ভাবে সাধারণ্যে উন্মুক্ত।

হিন্দু গৃহস্থদের কেহ কেহ প্রকাশ্য বাজারে গরু বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক; ভয় প্রকাশ্য বিক্রয়ে তাহাদের গৃহপালিত গোধন পরে খাদ্য হিসাবে কশাইএর কবলে পতিত হইবে। অনেক গৃহস্থ দুগ্ধের জন্য বাড়ীতে গরু পালন করেন, কিন্তু দুধ ছাড়ালেই পরের ঝামেলা সহ্য করিতে অনিচ্ছুক। পিঁজরাপোল এই সকল গরু নিঃস্বত্বভাবে পাইলে অনেক সময় লইয়া থাকেন। খরচসহ বৃদ্ধ ও বন্ধ্যা গাভীর ভারও তাঁহারা লইয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রণালী দাতাগণের মনোমত না হওয়ায় সাধারণ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে নাই। ভাব্য খরচে গোবৎস কিম্বা দুধছাড়ান গাভী রাখিবার ব্যবস্থা থাকিলে ক্ষুদ্র পরিবারে ব্যক্তিগত গাভী পালনে আরও বেশী আগ্রহও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইত এবং গোধন ধ্বংসের একটী প্রধান কারণ বন্ধ হইতে পারিত। দুগ্ধবতী গাভী গোয়ালাকে নগদ মুদ্রা দেয়; দুধছাড়ান গাভী এবং গোবৎসের প্রতি তাহাদের মায়া হইবার আর্থিক কারণ নাই, কাজেই খাটালে গোবৎসকে বাঁচিতে দেওয়া হয় না

বয়ঃবৃত্ত বৎসরের জোরে আধুনিক বিজ্ঞানীর বান্ধুরে তাহার কোন ক্ষয় নাই, বল্টাটও নাই। দুধছাড়ান গাভী কসাইকে বিক্রয় করিলে তাহার মূলধনে গাটতি পড়ে না। আশ্চর্য্য এই যে, কসাইকে বিক্রয় করিবার সময় গোয়ালার ধর্ম নষ্ট হয় না। গোমাতাকে "ফুকা" দিতেও তাহার মরমে বাধে না, যত আপদ বিশেষ প্রণালীতে হত্যা লইয়া, এই সকল অসুবিধা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত গোধন বাড়িতে পারে না। দেশবাসীর সত্যিকার আগ্রহ ও রাষ্ট্রের বিধান উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পাপ বন্ধ হইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য জাতির প্রধান খাদ্য। জাতির স্বাস্থ্যের জন্য পশুপালন ব্যবস্থাকে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই জাতীয় কর্মনিষ্ঠার পরিচায়ক। একমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় এই সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্যকে আবালবৃদ্ধবনিতার নিকটে সুলভ, সহজ ও সুন্দর করিয়া তোলা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক ব্রায়াণ্ট (Bryant) বলেন সুস্থ গাভীর দুগ্ধ সহজপাচ্য ও স্বাস্থ্যসম্মত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে ইহা সহজেই বীজাণুদুষ্ট ও রোগের আকর হইতে পারে। কেননা দুধ বীজাণুরও সুন্দর খাদ্য এবং এইজন্য দুধের ভিতরে সহজেই বীজাণুর বংশবৃদ্ধি সম্ভব। আমেরিকা ও বিলাতে জননীদের আজ আর শিশুদের কলেরা ও 'স্ক্রোফুলা' (Scrofula) পীড়ায় অবহিত হইতে হয় না। কয়েকদশক পূর্বেও যেখানে দুগ্ধবাহিত পীড়ায় জন্য শিশুপালবধের ইয়ত্তা ছিল না আজ তাহা বিজ্ঞানীর কল্যাণস্পর্শে অতীতের দুঃস্বপ্নের ন্যায় চিরতরে বন্ধ হইয়াছে। আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধানদেশে প্রকৃতির এই সহজদানকে বিধাতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ শিশু, যুবক ও বৃদ্ধের নিকটে কিরূপে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় তাহাও এক বিপুল সমস্যা। শতাব্দীর এই সমস্যাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কিভাবে সমাধান করিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য।

ঐ সকল দেশে দুধ দুহিবার পরে সোজা বাজারে আনা সম্ভব নহে। গোশালা হইতে দুধ সোজা দুগ্ধশালায় 'ল্যাবরেটরী'ঘরে (বিশ্লেষণাগারে) আসে, এখানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিশোধিত হওয়ার পরে ক্রেতাদের নিকটে যায়। দোহনকালেও সাধারণতঃ হস্তস্পৃশ্য হয় না, পাম্প ও পাইপের সাহায্যে দুগ্ধাগারে আনীত হইবার পর স্বয়ংচালিত ছাঁকনী সাহায্যে দুগ্ধ পরিস্রুত হয়। তদনন্তর দুধের জলভাগ, ননী, ক্রীম, স্নেহ ও চর্বিজাতীয় পদার্থ, ছানার পরিমাণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয় এবং সর্বশেষে "পাস্টুরাইজ" (Pasteurise) হওয়ার পরে পুনরায় ঠাণ্ডা করা হয় এবং মেসিনের সাহায্যে পরিষ্কৃত বোতলে ভর্তি করা হয়। এইসকল দুধের বোতল বাজারে যাওয়ার সময় পর্য্যন্ত "রেফ্রিজারেটারে" ঠাণ্ডা রাখা হয়। পাস্টুরাইজ করার অর্থ গরম বাষ্প সাহায্যে দুগ্ধ ১৪৫°—১৫৫°F উত্তপ্ত করিয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা করিয়া ফেলা, ইহাতে দুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল ও অবিকৃত থাকে। মহামতি পাস্তুর এই পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অবিস্মরণীয় নামেই প্রথা চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

যে সকল পাম্প, পাত্র ও পাইপের মধ্য দিয়া দুগ্ধ প্রবাহিত হয় এবং দুগ্ধাগারে আনীত হইবার পরে যে সকল দুগ্ধাধার ব্যবহৃত হয়, সেই সকল যন্ত্রপাতি কিংবা বাসন পাত্রাদি কলঙ্কহীন লৌহে (Stainless Steel) নির্মিত হয়। ব্যবহারের পূর্বে ও পরে প্রত্যেকবার উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ধৌত রাখা হয়। কোনওরূপ দুর্গন্ধ কিম্বা ময়লা যাহাতে জমা করিতে না পারে তজ্জন্য বহুবিধ প্রতিবিধানমূলক সতর্কতা লওয়া হয়। ডেয়ারীর (দুগ্ধশালার) প্রাণই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং অত্যন্ত গোঁড়ামী সহিত ইহা অনুসৃত হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সুবিধার জন্য গোশালার বাসনপত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে যুগান্তর আসিয়াছে। দুধের সংস্পর্শে যে সকল বাসনপত্র আসি তাহা নিখুঁত, মসৃণ, জোড়াহীন ও ঔজ্জ্বল্যে ঝক্‌ঝকে হইবে কারণ চকচকে চিক্কণ বাসনপত্র পরিষ্কার রাখা সহজ, পরিষ্কৃত ও ধৌত হইবার পর ঐ গুলিকে বীজাণুশূন্য (Sterilize) করা হয়। সহজেই ধৌত হয় অথচ বাসনে কলঙ্ক তোলে না এইরূপ ক্ষারদ্রব্যই ব্যবহার করা উচিত। বীজাণুহীন (Sterilize) করিবার জন্য গরম বাষ্পের মধ্যে ক্লোরিন (Chlorine) জল ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক শোগ্রাণের (Shogran) মতে নিম্নোক্ত উপায়ে যন্ত্রপাতি সহজেই পরিষ্কৃত রাখা যায়। নল (পাইপ) দিয়া দুধ চলাচল করে সেই নল দুধ চলিবার অব্যবহিত পরেই ঈষদুষ্ণ জল দিয়া উত্তমরূপে বিধৌত (flush) করা হয় তারপর রাসায়নিক ক্ষার (Cleaning Compound) সহযোগে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া ১২৫°F গরম জলের সাহায্যে পুনরায় উত্তমরূপে ধৌত করা হয়, প্রতিবারই যন্ত্রপাতি ও বাসনের বহির্ভাগ বুরুশের সাহায্যে উত্তমরূপে মার্জিত হয়। যন্ত্রের বিভিন্ন ধৌত খণ্ড একত্র যোজনা করিবার পরে কিন্তু ব্যবহারের পূর্বে লক্ষে দুইশতভাগ ক্লোরিন (Chlorine) জল দিয়া পুনরায় ধুইয়া লওয়া হয়। বাজারের সাধারণ ক্ষার, সাবান কিম্বা সোডা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, সাধারণ ক্ষারে ধৌত হইতে প্রচুর সময় প্রয়োজন, বাসনে কলঙ্ক পড়িবার সম্ভাবনাও আছে।

বিভিন্ন দেশে রকমারী ধাতুতে তৈয়ারী যন্ত্রপাতির জন্য বিভিন্ন ক্ষার ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিক এণ্ডার্সন (Anderson) বলেন ময়লার রকম, দুধের পাতলা সর, ননীর সর, বাতাসে শুষ্ক দুধের দাগ, গরম বাষ্পে শুষ্ক দুধের দাগ কিম্বা শুষ্ক দুধের চূর্ণিকা ইত্যাদি ময়লার পৃথক আলাদা ধরণ দেখিয়া ক্ষার (detergent) বাছিয়া লওয়া উচিত। ইহাছাড়া ধুইবার জল ও নরম হওয়া দরকার, শক্ত জল (Hard water) ধোওয়ার হাঙ্গামা অনেক বাড়িয়া যায়। দুগ্ধ চূর্ণিকা (milk stone) বিশ্লেষণ করিলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি কঠিন জলের রাসায়নিক দ্রব্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দুধের ছানা (Casein) ও কঠিন জলের ময়লা মিশ্রিত হইয়া শক্ত দুগ্ধ চূর্ণিকা (milk stone) উৎপন্ন হয়। যন্ত্রপাতির মধ্যে এই milk stone পড়িয়া উঠিলে কেবল পরিষ্কার রাখাই দুরূহ নহে, সম্পূর্ণ শোধন (বীজাণুহীন) করাও কঠিন। কারণ milk tone কে কেন্দ্র করিয়া বীজাণু কেন্দ্র গড়িয়া উঠে, নলের চারিদিকে দুগ্ধচূর্ণিকা গড়িয়া উঠিয়া দুধের নলকে তাপসহ করিয়া তোলে, তখন ইচ্ছামত দুগ্ধ ঠাণ্ডা রাখাও দুরূহ হইয়া পড়ে, অবশেষে নলটাকে পরিত্যাগ করিতে হয়।

রাসায়নিক কারণজাত কিন্তু সামান্য মাত্রাধিক্য ঘটিলে দুধের আস্বাদ হওয়া স্বাভাবিক। এই কারণে ক্ষারজ দ্রব্য ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার এবং হিসাবের অতিরিক্ত ক্ষার ব্যবহার অনুচিত। আধুনিক বড় ডেয়ারীতে ক্ষারজ দ্রব্যে যন্ত্রপাতি ধৌত করিবার পরে পুনরায় জলে ধুইয়া লওয়া হয়। ইহাতে দুধের কোনও দাগ কিম্বা থাকে না। গ্লকোনিক কিম্বা লেভুলিনিক এসিড জল খুব অল্প পরিমাণে (P H. ৬) জলে গরম বাষ্প প্রবাহের সহিত মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিলে পাত্রে কলঙ্ক কিম্বা মরিচা পড়ে না। আমাদের দেশের গোয়ালীতে ঢুকিলে দুধের বোটকা গন্ধে নাসিকা বন্ধ করিতে হয়, কিন্তু উচিত ভাবে ও উত্তমরূপে পরিষ্কৃত রাখিলে দুগ্ধশালা ও স্বাভাবিক এবং নির্মল রাখা অসম্ভব নহে।

বক্তব্য শেষ হইবার পূর্বে পুনরায় স্মরণে আনা কর্ত্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে জমির অনুপাতে জনসংখ্যার আধিক্য খাদ্যদ্রব্যের প্রথর মহার্ঘ্যতা, সুস্থ দৈহিক গঠন করিবার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পূর্ণ খাদ্য দুগ্ধের তীব্র অভাব। ঐ দেখা যাইতেছে ইয়োরোপে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে খাদ্যাভাব তীব্র হওয়া সত্ত্বে দুগ্ধের প্রাচুর্য্য কত বেশী। শ্বেতাঙ্গ জাতির পক্ষে যাহা সম্ভব, গোমাতার ভক্ত জাতির পক্ষে তাহা কি একেবারে অসম্ভব। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী, পারস্পরিক সহযোগিতা, 'সততা এবং কৃষি ও পশুপালনকে অন্যান্য বৃহৎ ব্যবসায়ের পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিয়া তাঁহারা এই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন—তাই যুদ্ধোত্তর লণ্ডনেও টাকায় ./৩ সের দুধ বিক্রয় হয় এবং সেখানে বিভিন্ন দামের দুগ্ধ বিক্রয় অসম্ভব। আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার, জাতি হিসাবে সুস্থ ও উন্নত মস্তকে দাঁড়াইবার সার্থকতা আছে কিনা, বিভিন্ন বিপর্য্যয় ও ধ্বংসের মধ্যে আমাদের সংগঠনী ও সৃজনী প্রতিভা অক্ষুণ্ণ কিনা—অনাগত কালই তাহার সাক্ষ্য দিতে সক্ষম, নবজীবনের স্পন্দনে ঘুমন্ত সমাজ দেহে আজ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠিয়াছে, সূচীভেদ্য অন্ধকারে দিগ্‌বিদিক আকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, নির্ঝরের হঠাৎ স্বপ্ন ভঙ্গে দুকুল ভাসান ফেনিল জলের ন্যায় স্তূপীকৃত ও মূঢ়তায় নোংরামী সমাজ জীবনকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রভাতের পূর্বে অন্ধকারের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, হয়তো শতাব্দীর এই আবিলতা ঠিক তদ্রূপ নবারুণ উদয়ের অপেক্ষায় গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। ২৫।১২।৫০

কি শিখিলাম

শ্রীহরিহর শেঠ

লোকে আমাকে সাহিত্যিক বলেন বা মনে করেন এবং সাহিত্যিক সুলভ আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন এ আমি জানি। কিন্তু শুধু সার্টিফিকেটের জোরেই যে সাহিত্যিক হওয়া যায় না এও আমি জানি। আমি প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিয়া সাহিত্যিক। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাকে যাঁহারা সাহিত্যিক বলেন, সাহিত্যিকোচিত আচরণ বাক্য ও কার্য্যে দেখাইয়া থাকেন, বিনয়ের দ্বারা তাহাতে মৃদুভাবে যে প্রতিবাদই করি, শেষ পর্য্যন্ত তাহা যে আমার দিক হইতে মানিয়া লওয়া হয় একথা আমি বলিতে পারি না। এ দুর্ব্বলতা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। "author is a venerable name, very few deserves it though many it claim" ইহা আমার অজ্ঞাত নহে। তবে আমার জীবনের অনেকটা অংশ যে সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত একথাটা ঠিক।

আমার লেখার সখ বাল্যকাল হইতেই। আমার বেশ মনে পড়ে, যখন আমি হুগলি কলিজিয়েট স্কুলের সেভেন ক্লাশ অর্থাৎ বর্ত্তমানের ক্লাশ ফোরএ পড়ি, আমার বয়স তখন দশ বা এগার, তখনই আমি প্রথম লিখি একটি কবিতা, নাম 'শৈশব ও যৌবন'। তখনও আমি শৈশবসীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পা দিই নাই, সে কবিতার প্রথম দুই ছত্র—

"কোথা গেল আহা সেই মধুর শৈশব,
কোথায় সারল্য শান্তি কোমলতা সব।"

ইহা ইচড়ে পকতার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাহা হউক ইহা লইয়াই আমার সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ। পরবৎসর শারদীয়া পূজার সময় চন্দননগরের খলিশানি গ্রামের একটা ক্ষুদ্র সাহিত্য সমিতি হইতে 'প্রার্থনা' নামে আমার একটি কবিতা ছাপা হইয়া বিতরিত হয়। ইহাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত আমার প্রথম রচনা। তাহার প্রথম দুই ছত্র আমার মনে আছে।

কোথা মাগো মহামায়া মহেশ মোহিনী
কিঙ্করে করুণা কর করুণা কাহিনী।"

এখানে একটি কথা বলা দরকার, যে সময় এই কবিতাটি লিখি, তখন আমার গৃহশিক্ষক ছিলেন 'কথাবলি', 'বলিদান' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা স্বর্গীয় গৌরকিশোর কর মহাশয়। তিনি একজন সুকবি ছিলেন, তাঁহারই করস্পর্শে এই সুন্দর অনুপ্রাস। ছাপা হইয়াছিল তাঁহারই প্রিয় ছাত্র 'গৃহহারা', 'মণীষা' 'বুদ্ধ' প্রভৃতি প্রণেতা সুকবি বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায়।

এই সময় দুই একখানি ছোটদের মাসিকে কয়েকটা ধাঁধা লিখি। মাদ্রাজের 'Progress' নামক একখানি ইংরাজী মাসিকেও কয়েকটি লিখিয়াছিলাম। ইহার পর হইতেই যে বরাবর নিয়মিত ভাবে লিখিয়া আসিতেছি তাহা নহে, তবে মাঝে মাঝে কবিতা গল্প ও ইংরাজী সাময়িক-পত্রিকাদি হইতে বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। 'পূন্য,' 'প্রয়াস', 'প্রদীপ' প্রভৃতি মাসিকে তাহার অনেকগুলি

প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্রমে ছাপার অক্ষরে প্রবন্ধ প্রকাশের নূতন মোহযুক্ত হইয়া লেখার সখ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। লেখা পাঠাইয়া প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইলে তখন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতাম। কোনটি প্রকাশ না হইলে দুঃখিত হইতাম। সত্য বলিতে কি, এখন প্রবন্ধাদির জন্য সম্পাদক মহাশয়দের আগ্রহ অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও আজিও কোন লেখা প্রকাশ হইলে যে আনন্দ না হয় তাহা বলিতে পারি না। তবে পার্থক্যের মধ্যে, যেমন কোন কোন মূলধনহীন ব্যবসায়ী বিনা চিন্তায় বেপরোয়া আউতি অর্থাৎ ফরওয়ার্ড মাল সওদা করিয়া থাকেন—যাহা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ধনী ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভবপর হয় না, অনেক অগ্রপশ্চাৎ ভাবনা আইসে—তেমনই 'প্রবীণ সাহিত্যিক' হইয়া এখন কোন কিছু, বিশেষ করিয়া কোন চিন্তাশীল বা গবেষণামূলক প্রবন্ধ কোন কাগজে পাঠাইবার সময় চিন্তা হয়।

লেখার বাতিক বৃদ্ধির সহিত—বিদ্যালয়ের লেখাপড়া যাহাতে আমি কোন দিনই মনোযোগ দিতে পারি নাই তাহাতে শৈথিল্য বেশ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এমন কি আমার মনে হয়, এই জন্যই লেখাপড়া শিখিতে পারিলাম না। আমারি সেই সময় হইতেই ধারণা হইল, বিদ্যার্জ্জন বা যে কোন সাধনাকালে অন্য কোন সখ, তাহা ভাল বিষয়ের হইলেও—তাহা মনোমধ্যে প্রবেশ করিলে সে সাধনা ব্যর্থ হয়।

এম-এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলেজের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ হইল এবং কিছু দিনের পর পৈতৃক ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম। এই সময়েই ১৩১৫ সালে আমার 'অভিশাপ' নামক প্রথম উপন্যাস যাহা পূর্ব্বে 'বান্ধবে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাহারপর মাসিকপত্রিকাসমূহে প্রকাশিত আমার কতিপয় প্রবন্ধ 'প্রসাদ' নাম দিয়া এবং কুন্তলীনের পুরস্কার-প্রাপ্ত একটি ও অন্যত্র প্রকাশিত অন্য একটা ডিটেকটিভ গল্প 'অদ্ভুত গুপ্তলিপি ও অমৃতগরল' নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করি। এই পুস্তকগুলির বিবিধ সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকাদিতে অনুকূল সমালোচনা প্রকাশ হওয়ায় উৎসাহ বাড়িয়া গেল, কিন্তু পিতৃদেব প্রদত্ত ব্যবসা-কার্য্য পরিচালনার কর্ত্তব্যভার পড়ায় একান্ত ইচ্ছাবিরুদ্ধ হইলেও সাহিত্যসেবায় ভাঁটা পড়িল।

সমালোচনার কথা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হইতেছে! আমার 'প্রসাদ' নামক পুস্তক সম্বন্ধে মণীষীবর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—"গ্রন্থকারের বহু গ্রন্থ পাঠের পরিচয় পাওয়া যায়।..."

পুস্তকখানির বিষয় হইতেছে ভ্রম প্রমাদে মানুষের কত সর্ব্বনাশ হয় তাহা দেখান। এজন্য সত্যই তাহাতে বহু প্রসিদ্ধ দেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সংগৃহীত আছে। কিন্তু যেমন ভাষা-জ্ঞান বিষয়ে আমার যথাযথ বোধও ঠিকমত নাই, তেমনই পড়াশুনারও অভাব। বাঙ্গালীর ছেলের বাঙ্গলা লিখিতে তেমন ব্যাকরণ জ্ঞান না থাকিলেও একরূপ চলিয়া যায়, কিন্তু ভালরকম পড়াশুনা না থাকিলে ভাল লেখক হওয়া যায় বলিয়া আমি মনে করি না। উক্ত পুস্তকে যে সকল গ্রন্থ হইতে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রায় পনের ষোল আনা বইই আমি আদ্যোপান্ত পড়ি নাই। আমার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পাতা উল্টাইয়া আবশ্যকীয় উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র। সাহিত্যক্ষেত্রে এইখান হইতেই ফাঁকি আরম্ভ হয়।

পরবর্ত্তী কালে ঐতিহাসিক বিষয় লিখিতেও এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। চন্দননগরের ঐতিহাসিক পরিচয় সংগ্রহের জন্য ফরাসী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও অনেক ফরাসী ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যেখানে চন্দননগর নাম পাইয়াছি অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সেই সেই স্থান দেখাইয়া লইয়াছি। আদ্যোপান্ত বলিতে বঙ্কিমবাবুর পাঁচখানি, দামোদরবাবুর তিনখানি এবং 'মেজবৌ,' 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'মেজো ভগিনী' ও 'রায় পরিবার' এইমাত্র আমি পড়িয়াছি। শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের নামে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার 'চরিত্রহীন' খানি পড়িতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাহাও ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। তাঁহার 'বামুনের মেয়ের' প্লটটী তিনি যে সূত্রে পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিকট শুনিয়া উহা পড়িয়াছিলাম।

আমার এই ত্রুটীর জন্য আমার সাহিত্যিক জীবনেও ব্যর্থতা আমি অনুভব করিয়া থাকি, আর আমার জীবনের চরম উপলব্ধি—যেদিকই আজিকার যুগে চলিতেছে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও যেটুকু প্রতিষ্ঠা পাইয়াছি তাহা হইতেও ইহা সপ্রমাণিত হইয়া থাকে। এরূপ চক্ষে ধূলা দেওয়া কাজ আরও কোন কোন ক্ষেত্রে আমার দ্বারা হইয়াছে একথা অন্যে হয়ত না জানিতে পারেন কিন্তু আমি ইহা জানি।

ছোট বয়স হইতেই পুস্তক সংগ্রহের আমার একটু সখ ছিল। নিজে বই তেমন না পড়িলেও দশজনকে বই পড়াইবার জন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার সখ আমার বরাবরই আছে। যখন স্কুলে . পড়ি Sett's Family Library নাম দিয়া একটি ছোট অবৈতনিক পারিবারিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে পুস্তক পড়িতে দিতাম। পরে সে সখটা বাড়িয়া যাইতেই থাকে। সৌভাগ্যক্রমে পরে স্থানীয় পুস্তকাগারের পরিচালনার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে এবং সুদীর্ঘকাল হইতে তাহার সেবা লইয়া ছিলাম। এই পুস্তকাগারের সংশ্রবে আমার পর আমার সাময়িক পত্রিকাগুলি ভিন্ন অন্য সমস্ত পুস্তকগুলি চন্দননগর পুস্তকাগারে ও অন্যান্য লাইব্রেরীতে দিয়া দিলাম। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া পত্রিকা গুলির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে মোটা মোটা পুস্তকপূর্ণ অনেক-গুলি আলমারি আমার বসিবার ও পার্শ্ববর্ত্তী ঘরগুলির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতেছে। ইহা দেখিতে শুনিতে বেশ, ইহার দ্বারা লোক চক্ষে ধূলি দেওয়া অর্থাৎ যাহা নহি তাহা কৌশলে অন্যের কাছে প্রতিপন্ন করিয়া নিজেকে একজন অধ্যয়ন-পরায়ণ সুতরাং প্রকারান্তরে বিদ্বান প্রতিপন্ন করাই হইয়া থাকে। অনেক অপরিচিত ব্যক্তি আমার বসিবার ঘরে ঢুকিয়াই মনে করিয়াছেন আমি একজন ব্যবহারজীবী। আজ যখন জীবনপথের প্রান্তসমীপবর্ত্তী হইয়াছি, তখন বড় সাধ হয় ভাল ভাল বই পড়িয়া জ্ঞানলাভ করি, পড়া ও লেখা লইয়াই বাকি জীবনটা কাটাইয়াদি, কিন্তু অপটু শরীরে ছোট বড় নানা কাজে ও সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে আমার

[illegible] সে সময় পাই না। সময়ে অনেক বিষয়ই মানুষ মনোযোগ না দিয়া [illegible] অনুতাপ করে।

কারবারের মধ্যে পড়িয়া আমার আকৈশোর সাধের সাহিত্য-সাধনা [illegible] বৎসরের জন্ত খুবই কমিয়া আসিল। তৎপরে যখন পৈতৃক [illegible] বন্ধ হইয়া আসিল এবং পরে আমার নিজস্ব কারবারও বন্ধ করিয়া [illegible] তখন পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এটা যেন আমার [illegible]হিত্যিক জীবনের এক নব অধ্যায়। এতাবৎ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, [illegible] ও শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় যখন যাহা ইচ্ছা হইয়াছে লিখিয়াছি। ইংরাজি সাময়িক-পত্রিকাদি হইতে বহু প্রবন্ধ সঙ্কলন [illegible]রিয়াছি। আমার এই বিবিধবিষয়ক রচনার জন্ত "মানসী ও [illegible]বাণী"তে প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধের সমালোচনায় আমি সব্যসাচী আখ্যা পাইয়াছিলাম। এবার ঐতিহাসিক ও পুরাতন বিষয় লেখাতেই সমধিক মনোযোগ স্থাপিত হয়। মধ্যে মধ্যে আবশ্যকানুরূপ অভিভাষণাদিও লিখি।

সাময়িক পত্রিকার তাগিদে কখন কখনও প্রবন্ধাদি লিখিয়াছি, কিন্তু [illegible]দের অনুরোধে বিশেষ ভাবে যে রচনা আমার হাত হইতে বাহির হইয়াছে, তাহা একখানি নাটক—'প্রতিভা।' আমার 'অভিশাপ' নামক উপন্যাসখানি 'মোগল পতন', 'ঘরের বাপ' প্রভৃতি প্রণেতা বন্ধুবর [illegible] সুরের দ্বারা নাটকাকারে পরিণত হইয়া আমার পুস্তক অভিনয়ের [illegible] প্রতিষ্ঠিত 'ভেকেশন্ ক্লাবের দ্বারা ডুপ্লেক্স কলেজের হলে প্রথম অভিনীত হয়। উহাতে চরিত্র সংখ্যা এত বেশি ছিল না যাহাতে ক্লাবের সকল সভ্যের এক একটি অংশ লওয়া চলে। এজন্ত প্রধান উদ্যোক্তা [illegible] ৺আদিত্যনাথ চক্রবর্ত্তী যাহাতে সকলে মিলিয়া অভিনয় করিতে পারে এরূপ একখানি সামাজিক নাটক লিখিয়া দিবার জন্ত বিশেষ করিয়া অনুরোধ করায় আমি উহা লিখিয়া দিই। তাঁহারা এই বই-খানিও চন্দননগর স্পোর্টিংক্লাব ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে সাফল্যের সহিত নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে প্রথম অভিনয় করিয়াছিল।

কেহ কেহ আমাকে ঐতিহাসিক এবং কেহ কেহ প্রত্নতত্ত্ববিদ বলিয়া সম্মানিত করেন। এতদুভয়ের মর্য্যাদালাভের মত কোন কিছুই আমার মধ্যে নাই। প্রায় অৰ্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে রাজস্থান হইতে 'কৃষ্ণকুমারী' ও দিল্লীর শেষ রাজা পৃথীরাজ ও সংযুক্তার কথা লইয়া 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'ইতিহাসের একপৃষ্ঠা' 'প্রয়াস' নামক মাসিকে লিখি। ইতিমধ্যে অনেক দেশ বিদেশের বিবিধ বিষয়ের বিচিত্র তথ্যাদি সঙ্কলন করিয়া লিখি, তাহা ইতিহাস পর্য্যায় আইসে না। তৎপরে দুই যুগেরও পরে ধারা-বাহিকরূপে 'ভারতবর্ষ' 'মাসিক বসুমতী', 'প্রবাসী' ও 'বঙ্গবাণীতে' চন্দননগর পরিচয় নাম দিয়া নানাদিক দিয়া চন্দননগরের পরিচয় লিখি। ইহার জন্ত আমায় বহু ইতিহাস দেখিতে হয়। যে সকল গ্রন্থে প্রাচীন চন্দননগরের কথা আছে, প্রায়ই তাহাতে কলিকাতা এবং ভাগীরথী তীরে পাশ্চাত্য জাতিদের শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, হুগলী প্রভৃতি উপনিবেশ-গুলির কথাও আছে। চন্দননগর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে [illegible] তাহারও কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ইহাই আমার '[illegible]' নামক পুস্তকের প্রধান অংশ এবং পরে 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়ের' প্রধান উপকরণ হইয়া দাঁড়ায়। আমার ঐতিহাসিক আখ্যালাভের ইহাই ক্ষুদ্র ইতিহাস। আমার সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হয় তাহার মধ্যে অধিকাংশই অযথা।

আমি চন্দননগরকে ভালবাসি একথা সত্য। তার সেবাতেই আমি দেশ মাতার সেবার তৃপ্তি পাই। যদি এ জন্ত দেশ-প্রেমিক বলা চলে তবে তাহাই। এই ভালবাসার প্রতিদানে চন্দননগরই করিয়াছে আমাকে ঐতিহাসিক, সেই করিয়া দিয়াছে সাহিত্যিকদের নিয়ে একখানি ক্ষুদ্র আসন। কেহ কেহ যে আমাকে দাতা বলেন সে আখ্যার মূলও চন্দননগর। চন্দননগরের জন্ত—দান ঠিক বলা যায় না, মাতৃ-অঙ্গের শোভা সম্বর্দ্ধনের আকাঙ্ক্ষায় যেখানে যেটি মানায় সামর্থ্য-অনুসারে সেইরূপ কয়েকখানি আভরণ গড়াইবার চেষ্টা মাত্র করিয়াছি।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের কলিকাতায় ভবানীপুরে যে অধিবেশন হয়, তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্মিলনের পক্ষ হইতে আমার উপর ভারার্পণ করায় আমি কলিকাতা পরিচয় লিখিয়া দিয়াছিলাম। তাঁহারা কলিকাতার সহরতলির কোন কোন বিষয়ের বিবরণ উহার সহিত কিছু কিছু যোগ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুও বোধ হয় ধারণা পোষণ করিতেন সে ইতিহাস বিষয়ে—অন্ততঃ ইংরাজ আগমনের প্রারম্ভিক যুগের ইতিহাস বিষয়ে আমার কিছু জ্ঞান আছে। তাহার জন্ত প্রমাণও আছে। প্রবাসীতে সমালোচনার্থ একবার রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর প্রণীত 'কলিকাতার কথা' প্রবাসী অফিস হইতে আমার নিকট প্রেরিত হয়। ইহাতে আমি সম্মান বোধ করা অপেক্ষা লজ্জিতই হইয়াছিলাম, কারণ প্রমথবাবুর 'কলিকাতার কথা' যখন ধারাবাহিকরূপে 'সুবর্ণ বণিক সমাচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সে সময় আমার প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় লিখিতে আমি তাহা হইতে যে পরিমাণ উপকরণ গ্রহণ করিতে পাইয়াছি এত বোধ হয় আর কোন একখানি গ্রন্থ হইতে পাই নাই। এজন্ত তাঁহার নিকট আমি অশেষ ঋণী। সমালোচনা প্রসঙ্গে আমি সে কথা স্বীকার করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে একটু হাল্‌কা বোধ করিয়াছি।*

এরূপ ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় অন্যত্রও পাইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৯-শ অধিবেশনের ইতিহাস শাখার সভাপতি বারেন্দ্র অনু-সন্ধান সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক স্বর্গীয় কুমার শরৎ কুমার রায় মহাশয়েরও এরূপ ধারণা কিছু থাকিতে পারে। তিনি এই অধিবেশনে পাঠের জন্ত একটা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ চাওয়া প্রসঙ্গে বৃটিশ আগমনের প্রারম্ভিক যুগের আমার ইতিহাস বিষয় জ্ঞান সম্পর্কে যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন সে কথা উল্লেখ লজ্জাকর হইলেও তাহা আমি ভুলিতে পারি নাই। তিনি আমাকে এ বিষয় authority বলিয়াছিলেন।

একবার কাঁঠাল পাড়ায় বঙ্কিম ভবনে একটি সাহিত্য সম্মিলন হয়। তথায় শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মূল সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। তাহাতে ইতিহাস শাখার পরিচালন ভার লইবার জন্ত আমি অনুরুদ্ধ

---

* প্রবাসী মাঘ ১৩৩৬

হইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য সে পদ গ্রহণ করিয়া ভূমিকা প্রকাশের গৌরব সংবরণ করিয়াছিলাম। Calcutta Hiatorical Societyর সহকারী সভাপতির পদে স্থান দিয়াও আমাকে ঐতিহাসিকের গৌরব দিয়াছে।

ঠিক ইতিহাস না হইলেও গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া ঐতিহাসিক বিবরণ সকল লিখিয়াছি; সুতরাং কাহারও চক্ষে ঐতিহাসিক হইলেও প্রত্নতত্ত্ব বিষয় আমার অভিজ্ঞতার কথা কি করিয়া আইসে বুঝিতে পারি না। একবার বর্দ্ধমান জেলার সেনাদির সন্নিকট বিজুড় গ্রামের অধিবাসীদের দ্বারা [illegible] তাঁড়ায়পোতা নামক একটী স্থানের সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক [illegible] জন্ত আহূত হইয়া গিয়াছিলাম।* কিছুদিন হইল হুগলী জেলার হাটে [illegible] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত একটি শালা উদ্বোধনের জন্ত বিশেষরূপেই অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। এই সব মনে হয়, কাহারও কাহারও আমার সম্বন্ধে এ বিষয়েও একটা ধারণা আছে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

* "বিজুড়ের তাঁড়ায় পোতা"—পঞ্চপুষ্প ১৩৩৮, দ্রষ্টব্য।

বঙ্গবাণী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

লহ মা প্রণতি চির-ভাস্বতী বঙ্গ ভারতী জননী।
তোমার বীণার স্নিগ্ধ সুতানে মুগ্ধ নিখিল অবনী॥
কাষায়-বসনা যদি ও তাপসী
বিভূতিভূষণা, তবু মহীয়সী,
তবু শতমণি মুকুটে উজল তব ধূলি মাখা চরণই॥

বেদবেদান্ত পুরাণ তন্ত্র সার নির্যাস মিলায়ে,
তোমার চিত্ত করেছে শুদ্ধ সাধনা ঋদ্ধি বিলায়ে।
মহাভারতের বারিধি অতল
চিন্তামণিতে ভরেছে আঁচল,
স্নাত করে তোমা রামায়ণী ধারা পতিত পাতকি পাবনী।

দেবভাষা দিয়া তপের অংশ সঁপিল দৈবী ক্ষমতা,
মেনকা মায়ের বৎসলতার উৎসে পেয়েছ মমতা।
শত শত সাধু সন্ত সাধক,
যোগায়েছে তোমা পূত পাদোদক,
বৃন্দাবনের সুরভিরা তব যোগায় হোমের নবনী।

কে আছে ধরায় চিনে না তোমায়, শুচি হয় নাক স্মরণে?
রবি কবি তব সবার মৌলি নোয়ালো তোমার চরণে।
সারা ধরণীর জ্ঞান সাহিত্য
তোমার চরণে সঁপিতে বিত্ত,
দেশ দেশ হ'তে চিন্তার স্রোতে পাঠায় তথ্য তরণী॥
বাণ, কালিদাস, ভবভূতি, ভাস, সাদী, রুমী,
গেটে, দান্তে,
হ্যুগো, মিলটন, ওমার, হোমার মিলে আশ্রম প্রান্তে
করে কোলাকুলি প্রেমের হরষে,
তব শির 'পরে পুষ্পবরষে
তব গৌরব-গীতি-মুখরিত ভাবা পৃথিবীর সরণী॥

কণ্ঠে তোমার অভয় মন্ত্র, দৃষ্টিতে তব অমৃত,
পরশে তোমার লভে অপসার পাপ তাপ
শাপ অনৃত
চিত্তে মা তব অমেয় ভক্তি
সঙ্গীতে তব অজেয় শক্তি,
তব পদসেবা অপবর্গদা স্বর্গের অধি রোহণী॥

শুধু ভাবি নানা জ্বালা লাঞ্ছনা গঞ্জনা বোঝা বহিয়া
তব কৃপা বিনা বাঁচিতাম কিসে ব্যথা বঞ্চনা সহিয়া।
তুমি যদি পদে নাহি দিতে ঠাঁই,
হ'ত এ মানব জীবন বৃথাই,
পশুর মতন বেঁচে থাকা চেয়ে শ্রেয় হ'ত হায় মরণই॥

মহাজীবনের মহানাট্য

(ওবারামারগাওয়ের 'প্যাশান প্লে')

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(২)

যীশুখ্রীষ্টের ঐকান্তিক অধ্যাত্ম-সাধনা ও মহনীয় মৃত্যু-জীবন অবলম্বনে রচিত 'প্যাশন-প্লে' একখানি বিরাট নাটক। নাটকখানিতে ষোলটি অঙ্ক, পনেরোটি গর্ভাঙ্ক এবং ৬৬টি দৃশ্য আছে। এ ছাড়া, অতিরিক্ত একটি শেষ দৃশ্য বা সমাপ্তিকাও সংযুক্ত আছে। উপরন্তু মুখবন্ধ, প্রস্তাবনা, পূর্বাভাষ প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেক

যীশুর ভূমিকায় অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রায়সিংগার আন্তন সাধারণ জীবনে একজন শিশুদের চিত্র-শিক্ষক

অঙ্কেরই প্রারম্ভে পৃথকভাবে দেওয়া হয়েছে। আর আছে সমগ্র নাটক অভিনয়ের মধ্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনার বিষয়োপযোগী ২০টি 'অপূর্ব মূকঅভিনয়ের দৃশ্য! এই বিশাল নাটকখানি তিনটি পৃথক খণ্ডে বা ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একক, সমবেত ও দ্বৈত ইত্যাদি প্রায় ৪০টি সুমধুর সঙ্গীত ও ভজন বা প্রার্থনা এই নাট্যাভিনয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। নাটকের অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিত যে আবহ-সঙ্গীত ও ঐক্যতান-বাদন সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা' জার্মান সুর-শিল্পীদের ভুবনবিদিত অনুপম সাঙ্গীতিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

একটি পবিত্র গম্ভীর প্রার্থনার সঙ্গে নাটকের প্রথম

মেরীর ভূমিকায় অভিনেত্রী কুমারী মেয়ার আ-ত্রেবাই সাধারণ জীবনে একজন কাঠ-খোদাই শিল্পী

প্রস্তাবনা শুরু হয়। প্রার্থনা শেষ হ'তে না হ'তে দর্শকদের দৃষ্টি পথে ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য—"স্বর্গ হ'তে বিদায়। ইডেন উদ্যান থেকে ঈশ্বরের অবাধ্য নরনারী আদম ও ইভ্‌কে বিতাড়িত করা হচ্ছে। পাপের অনুতাপে ও মৃত্যুশাসনের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত তারা। যীশুর জন্ম

সন্নিকটে [illegible] অন্ধকার তারা হারিয়েছে। আরক্ত-অসি হাতে স্বর্গদূত সে তরু পাহারা দিচ্ছে। ঊষার আলোকে পূর্ব-দিগন্ত উদ্ভাসিত। রাত্রি শেষ হ'য়ে আসছে। জীবন-তরুর শাখা-পল্লব কিশলয় কাঁপিয়ে শান্তির স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে চলেছে পৃথিবীময়! সমবেত সঙ্গীতকারীদের কণ্ঠে ভজন গান শোনা যাচ্ছে—"করুণাময় জগদীশ্বর! তুমি তোমার আদেশঅমান্যকারী পাপীদের পরিত্রাণের জন্য, তাদের বিধাতার অভিসম্পাত থেকে মুক্ত করবার

যীশুর বন্ধু সাধু যোসেফের ভূমিকায় অভিনেতা শ্রীযুক্ত বায়ার্লিং
ইনি সাধারণ জীবনে একজন কাঠখোদাই শিল্পী

জন্য—তোমার একমাত্র পুত্রকেও বলি দিয়েছিলে। তোমার জয় হোক! জয় জগদীশ হরে!"

১২০০ অভিনেতা-অভিনেত্রী এই অভিনয়ে অবতীর্ণ হন। এ ছাড়া গানের দলে থাকেন তিরিশটি মেয়ে, আর ১৮টি ছেলে। অর্কেস্ট্রা বাজান ৫০ জন নরনারী ও বালকবালিকা। এক একটি দৃশ্যের অভিনয়ে এক সঙ্গে ৭০০ অভিনেতা অভিনেত্রীকে পর্যন্ত মঞ্চের উপর উপস্থিত [illegible] আর। [illegible] বলেছি এঁদের এ অভিনয় [illegible]

অপূর্ব নয়—এমন একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে এর [illegible] যে এর সঙ্গে আর অন্য কোনও দেশের কোনও অভিনয়ের তুলনা হ'তে পারে না। নিজের বিশেষ একটি স্বকীয়তা, আদর্শবাদকে অবলম্বন করে তিন শতাব্দীরও অধিক প্রাচীন এই ঐতিহাসিক অভিনয় স্ব-মহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এই নাট্যাভিনয়ে যিনি যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, শো[illegible] গেল তাঁদের স্ব স্ব ব্যক্তিগত জীবন স্বভাবতঃ সেই [illegible]

রোম্যান পাইলেটের ভূমিকায় অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাইটসামটার
মেলকিয়র্‌ সাধারণ জীবনে একজন ইঞ্জিনীয়ার

চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুকূল কি না জেনে তবে তা' বণ্টন [illegible] হয় তাঁদের মধ্যে। এবার খ্রীষ্টের ভূমিকা গ্রহণ করেছি[illegible] শ্রীযুক্ত Preisinger Anton, ইনি একজন চিত্র-শি[illegible] গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা শেখা[illegible] এঁর উপজীবিকা। এঁর সাত্ত্বিক অভিনয় আমাদের সাম[illegible] দুহাজার বছর আগের সেই পরম-ভাগবত প্রেমিককে [illegible] মূর্ত করে তুলেছিল। মুগ্ধ হয়েছি এঁর অভিনয় দে[illegible] [illegible], ইনি গম্ভীর, বিলাসী ও সদাচারী [illegible]

...দের প্রধান পুরোহিত Caiphas যিনি যীশু খ্রীষ্টকে ...ত ক'রে প্রাণদণ্ড দেবার ষড়যন্ত্রেরও প্রধান ... ছিলেন, সেই নিষ্ঠুর ভূমিকার জন্ম নির্বাচিত ...লেন শ্রীযুক্ত Stuck Benedikt Jr. ইনি গ্রামের ...মাংস-ব্যবসায়ী কসাই। অতি প্রাণবন্ত স্বাভাবিক ...য়ে হিংস্রতার যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন ইনি, তাতে ... দর্শকেরাও বিমুগ্ধ না-হ'য়ে পারেননি! যীশু খ্রীষ্টের ...কার জন্ম বহু চেষ্টা করেছিলেন যিনি, সেই

...য়াফাস য়িহুদী পুরোহিতের ভূমিকায় অভিনেতা শ্রীযুক্ত ষ্টায়েকেন্ বেনেডিক্ট, সাধারণ জীবনে একজন মাংসবিক্রেতা কসাই

...ান গভর্ণর Pilateর ভূমিকায় দেওয়া হয়েছিল শ্রীযুক্ত ...itsamter Melchiorকে। ইনি এখানকার একজন ...লাহা ইঞ্জিনীয়ার। এঁর সুঅভিনয় দর্শকদের সেই ...ত গৌরবদীপ্ত রোমান যুগে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ...৩০টি রৌপ্যমুদ্রার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন Judas, সেই পাপমতি খ্রীষ্ট-শিষ্য জুডাসের ভূমিকায় ...ছিলেন শ্রীযুক্ত Schwaighfoer Hans. ইনি ...র মিস্ত্রী, গ্রামের একজন কৃপণ লোক। খৃষ্টের ...য়ের পরই, এঁর অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য

উল্লেখযোগ্য। ইনি যে একজন শক্তিশালী নট, একথা সকলকেই স্বীকার করতে হয়েছে। মেরী-মাতার অংশের ভূমিকার জন্ম নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রীমতী Mayr Annemie ইনি একটি সুচরিতা কুমারী। নিপুণা কাঠ-খোদাই শিল্পী বলে গ্রামে এঁর বেশ সুনাম আছে। এঁর অভিনয় চলনসই হয়েছিল। মেরী ম্যাগদালীনের ভূমিকায় নেমেছিলেন শ্রীমতী Gropper Gabriele. ইনি এখানকার একজন রূপসী বিপনীবালা, (shop-girl); এঁর সুন্দর
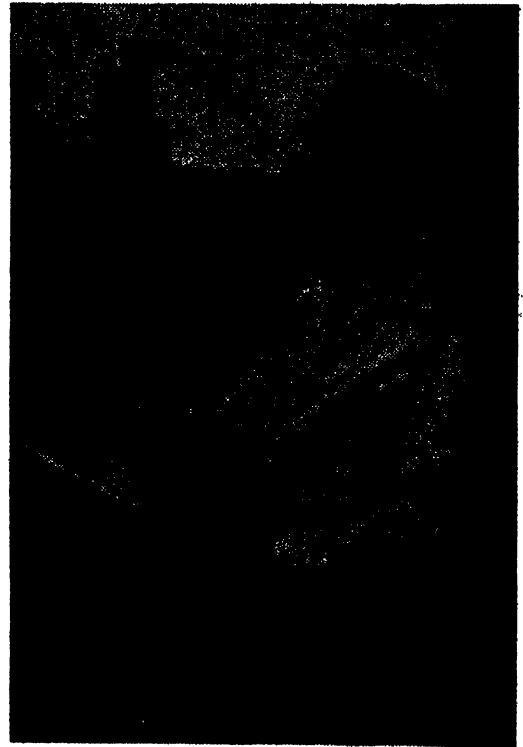
আনাস্ য়িহুদী পুরোহিতের ভূমিকায় অভিনেতা শ্রীযুক্ত ক্লট্‌কার্ জ্যাকব সাধারণ জীবনে একজন চিত্র-শিল্পী

সাবলীল অভিনয় সকলের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছিল। এ ছাড়া পিটার, জন প্রভৃতি খ্রীষ্টের বারোটি শিষ্য, জোসেফ, সাইমন, ল্যাজারাস প্রভৃতি আটজন অনুগত বন্ধু, হেরড রাজা, 'আনাস' প্রভৃতি য়িহুদী পুরোহিতের দল, 'সলোমন' প্রভৃতি ফ্যারিসীর দল, ব্যবসায়ীর দল, গ্রাম-বাসীরা, মেষপালকেরা, রোমান রাজপুরুষেরা, সৈন্যগণ, প্রহরীগণ, মন্ত্রীরা, পরিচারকগণ, মন্দির-ভাণ্ডারকেরা ইত্যাদি সকলেই সুন্দর অভিনয় করেছেন। ...

চরিত্র এবং সহস্রাধিক অপ্রধান চরিত্রসম্বলিত এই বিরাট নাটকাভিনয় এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

সমগ্র অভিনয়ের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং কয়েকটি মাত্র দৃশ্যের কথা এখানে উল্লেখ করবো। প্রথমেই বলেছি নাটকখানির অভিনয় শুরু হয়—সূত্রধার সদলে পাদপীঠে অবতীর্ণ হয়ে নান্দীপাঠ করেন। তাঁর পঞ্চাশজন স্ত্রীপুরুষ গায়ক-সহযোগী সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতের দ্বারা তাঁর বর্ণনাকে রূপ দেন। সেই সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যবনিকা সরে গিয়ে দর্শকদের
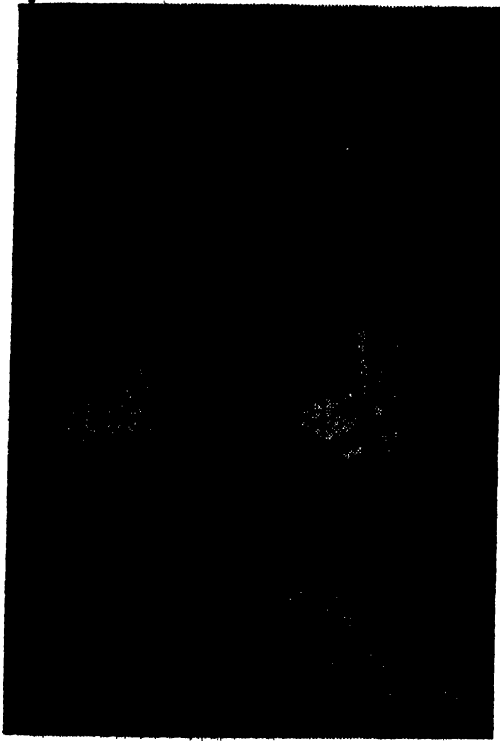
জুডাসের ভূমিকায় অভিনেতা শ্রীযুক্ত লোয়েযোকায় হাজ্, সাধারণ জীবনে একজন সূত্রধর মিস্ত্রী। এঁর কৃপণ বলে অখ্যাতি আছে।

বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে একটি অপূর্ব মূক-অভিনয়ের চিত্র! আদিমানব দম্পতির স্বর্গচ্যুতি। তার পর ত্রাণকর্তা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের জন্য আবাহন স্তোত্র-গীতি। তারপর পবিত্র ক্রুশার্চনের আর একটি মূক অভিনয় চিত্র। তারপর আবার গান। যাত্রার দলের জুড়িদের মতো মাঝে মাঝে সেই পঞ্চাশজন দোহার (Chorus) গায়কের ভিতর থেকে পৃথকভাবে এক একজন সুকণ্ঠ গায়ক বা গায়িকা এক একখানি গান একক (solo) গেয়ে শোনান। এই গানগুলি খুবই উপভোগ্য।

এরপর মূল নাটকের প্রথম খণ্ডের অভিনয় শুরু হয়। এতে দেখানো হয় যীশুখ্রীষ্টের জেরুজালেম প্রবেশ থেকে গেথ্সিমেন উদ্যানে তাঁর বন্দী হওয়ার দৃশ্য পর্যন্ত। প্রথম খণ্ডই ৭টি অঙ্কে ও ৬টি গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রতি অঙ্কের প্রারম্ভেই প্রায় প্রস্তাবনা ও গান আছে। ৭ অঙ্কের মধ্যে ৬টি তাব্লো (Tableau) বা মূক-অভিনয় চিত্র দেখানো হয়। এছাড়া ২৪টি দৃশ্যও অভিনীত হয়।
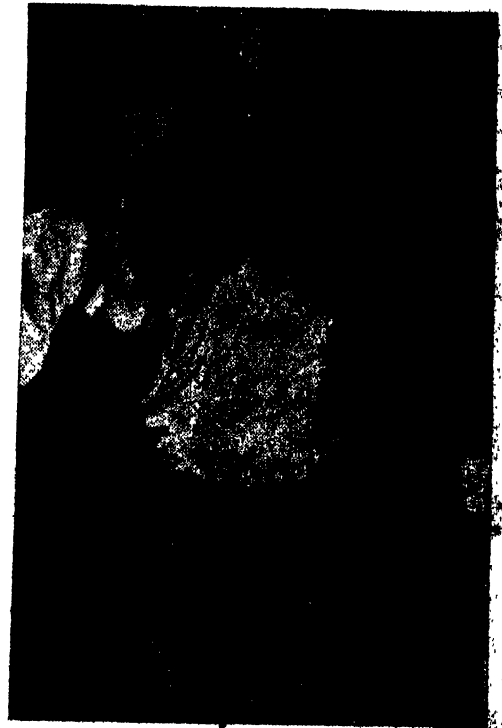
সেন্ট্ পিটারের ভূমিকায় অভিনেতা শ্রীযুক্ত রজ্ হিউগো (সিনিয়র) সাধারণ জীবনে একজন কামার মিস্ত্রী

দ্বিতীয় খণ্ডে দেখানো হয় গেথ্সিমেন উদ্যানে যীশুর বন্দী হবার পর থেকে 'পাইলেট' কর্তৃক তাঁর অভিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ডটি ৬টি অঙ্ক, আর পাঁচটি গর্ভাঙ্কে গ্রথিত। প্রস্তাবনা ও গান প্রায় প্রতি অঙ্কেই। প্রথম খণ্ডের মতো এর মধ্যেও পাঁচটি 'তাব্লো' সন্নিবেশিত হয়েছে। দৃশ্য অভিনীত হয় প্রায় তিরিশটি।

তৃতীয় খণ্ডে দেখানো হয়েছে রাজদ্বারে অভিযুক্ত

যীশুখ্রীষ্টের উপর অন্যায় অত্যাচার, চাবুক নিয়ে অমানুষিক প্রহার, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে হত্যা করা, তারপর সংগোপনে সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত হওয়া এবং কবর হতে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান। সেকি বিস্ময়, সেকি গৌরব! এ খণ্ডেও যথারীতি প্রস্তাবনা ও সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হয়েছে প্রায় প্রতি অঙ্কেই। এছাড়া তিনটি অঙ্ক, চারটি গর্ভাঙ্ক এবং সমাপ্তি দৃশ্য নিয়ে ১২টি দৃশ্য আছে। মূক অভিনয় চিত্রও একটি আছে—মোরিয়া পর্বতের উপর কাঠের গুঁড়ি ঘাড়ে নিয়ে আইজ্যাক চলেছে। (Gen 22, 1-10)

অশুচি ব্যাপার চলেছে দেখে ব্যবসায়ী ও মহাজনদের তিনি দূর করে দিলেন, তারপর বেথানি চলে গেলেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম দৃশ্যে উচ্চ বিচারালয়ে য়ুহুদি পুরোহিত, ব্যবসায়ীরা ও মহাজনেরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে আসছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্য ওদের মধ্যে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে আরও গভীর ষড়যন্ত্র। তৃতীয় অঙ্কে বেথানিতে যীশু কর্তৃক মেরী ম্যাগদালীনকে দীক্ষাদান, জুডাসের তাতে আপত্তি। যীশু তাঁর জননী মেরী-মাতা ও বন্ধুদের নিকট বিদায় নিয়ে জেরুজালেম রওনা হলেন।

সেন্টজনের ভূমিকার অভিনেতা শ্রীযুক্ত ম্যাগোল্ড্ মার্টিন সাধারণ জীবনে স্লেজ গাড়ীতে মালবহন করেন বরফের ভিতর দিয়ে

ম্যাগদালীনের ভূমিকার অভিনেত্রী শ্রীমতী গ্রোপার সেব্রিয়েল্ সাধারণ জীবনে কাচের জিনিসের পসারিণী

এখন এই তিন খণ্ডে বিভক্ত মহাজীবনের মহা-নাট্যের প্রত্যেক দৃশ্যটিতে কি কি দেখানো হ'য়েছে জানবার জন্য নিশ্চয় অনেকে উৎসুক হয়েছেন। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যীশুর আবির্ভাব কামনা ক'রে তাঁর আবাহন গান করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে অগণিত জনগণের আনন্দ উল্লাসের মধ্যে প্রভু যীশুখ্রীষ্ট জেরুজালেমে প্রবেশ করলেন। মন্দিরের মধ্যে

চতুর্থ অঙ্কে শিষ্যবর্গসহ খ্রীষ্টের জেরুজালেমে শেষবারের মত আগমন। নগরের অবস্থা দর্শনে যীশুর খেদ। দু'জন শিষ্যের উপর প্রায়শ্চিত্তের ভার অর্পণ। জুডার বিরূপ মনে গুরুর প্রতি বিদ্রোহের ভাব। পঞ্চম অঙ্কে সেই বাইবেল-প্রসিদ্ধ যীশুর 'লাস্ট্ সাপার' বা শেষ ভোজ। ষষ্ঠ অঙ্কে মাত্র তিরিশটি রজত মুদ্রার বিনিময়ে জুডাস বিশ্বাস-ঘাতকতা করে যীশুকে তাঁর শত্রু ও বিপক্ষ য়ুহুদী পুরোহিতদের হাতে ধরিয়ে দিতে রাজী হলেন। য়ুহুদীরা

খৃষ্টের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করলেন। সপ্তম অঙ্কে জুডাস যীশুকে ধরিয়ে দিলেন। এইখানে নাটকের প্রথম খণ্ড শেষ। দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয় অষ্টম দৃশ্য থেকে। এই অঙ্কে য়িহুদীদের নিষ্ঠুর প্রধান-পুরোহিতের কাছে বন্দী যীশুর বিচার ও লাঞ্ছনা। নবম অঙ্কে যীশুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা। জুডাসের অনুশোচনা ও যীশুর প্রাণরক্ষার চেষ্টা। দশম অঙ্কে জুডাসের ব্যর্থতা। একাদশ অঙ্কে রোমান পাইলেটের কাছে যীশুর বিচার। পাইলেট কর্তৃক যীশু নির্দোষ

প্রস্তাবনা ও নান্দিমুখ করেন যিনি শ্রীযুক্ত ল্যাঙ্, এনয় সাধারণ জীবনে তিনিও একজন কাঠখোদাই শিল্পী। সতেরো বছর আগের অভিনয়ে ইনিই খৃষ্টের ভূমিকায় অতি অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন শোনা গেল

সাব্যস্ত। দ্বাদশ অঙ্কে হেরোদ রাজার কাছে যীশুর বিচার। হেরোদ রাজা যীশুকে উপহাস করে পুনর্বিচারের জন্য পাইলেটের কাছেই পাঠালেন। ত্রয়োদশ অঙ্কে রোম্যান পাইলেট ভগবদ্ভক্ত যীশুখ্রীষ্ট ও দস্যু বারাব্বাস এই দুজনের মধ্যে একজনের প্রাণবধ ও অন্যের মুক্তি বেছে নেবার জন্য য়িহুদী পুরোহিতের দলকে আদেশ দিলেন। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যে ওঁরা বারাব্বাসের মতো একজন দুর্দান্ত দস্যুরই প্রাণদণ্ড চাইবেন। নিরীহ যীশুকে মুক্তি দেবেন। কিন্তু খ্রীষ্ট-বিদ্বেষী য়িহুদী পুরোহিতের দল দুশ্চরিত্র তস্কর বারাব্বাসের মুক্তি এবং ধর্মপ্রাণ যীশুর প্রাণদণ্ড বেছে নিলে। দ্বিতীয় খণ্ড এইখানেই শেষ। তৃতীয় খণ্ড চতুর্দশ অঙ্ক থেকে শুরু হয়। এ অঙ্কে যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশ বহন করে চলেছেন গলগাথায় তাঁর বধ্যভূমিতে। পথে মেরীমাতার সঙ্গে দেখা। সে কি করুণ দৃশ্য! ক্রুশ-বহনে ক্লান্ত যীশুর মূর্চ্ছা। অন্ধ পালোয়ান সাইমনের ঘাড়ে ক্রুশ চাপিয়ে যীশুকে টেনে নিয়ে যাওয়া বধ্যভূমিতে। পঞ্চদশ অঙ্কে যীশুকে বিদ্রূপ ও অপমান এবং আর দুজন চোরের সঙ্গে একত্রে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে হত্যা করা। এখানে বিশ্ব-মানবের প্রতি যীশুর শেষ-বাণী দান। ভক্তগণ কর্তৃক গোপনে তাঁর মৃতদেহ

রঙ্গমঞ্চের মাথায় খোলা আকাশ ছাড়া কোনও আচ্ছাদন নেই। পিছনটাও খোলা। সেখান দিয়ে ছবির মতো পিছনের প্রাকৃতিক দৃশ্য অরণ্য ও পর্বত দেখা যাচ্ছে।

সমাধিস্থ করা। ষোড়শ অঙ্কে যীশুর সমাধি হতে সগৌরবে পুনরভ্যুত্থান ও স্বর্গারোহণ। শেষ দৃশ্যে মৃত্যুঞ্জয় প্রভু যীশুখ্রীষ্টের জয়গান।···হালেলুয়া···Hallelujah! খুব সংক্ষেপে আমি বিরাট নাটকখানির বর্ণনা দিলুম। মনে রাখতে হবে, সমগ্র নাটকখানি অভিনয় হ'তে পুরো আটঘণ্টা সময় লাগে।

এই অভিনয়ে পূর্বেই বলেছি এক একটি দৃশ্যে সাত আটশ' পর্যন্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী একসঙ্গে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। নাটকখানি জার্মাণ ভাষায় রচিত এবং জার্মাণ ভাষাতেই অভিনীত হয়। খ্রীষ্টের জীবনকাহিনী সভ্যজগতের সকল মানুষেরই জানা বলে এবং এঁদের অভিনয় অত্যন্ত ভাবব্যঞ্জক ও মর্মস্পর্শী হওয়ায় জার্মাণ ভাষার

অনভিজ্ঞ দর্শকেরাও এ অভিনয়ের রস পরিপূর্ণ রূপেই উপভোগ করতে পারেন। ওবারামারগাওর কোন এক অজ্ঞাত লেখকের পুরাতন নাটকের পাণ্ডুলিপিখানির সংস্কার করেন নাট্যকার স্বর্গীয় জে, এ, দায়সেন বার্গার (J. A. Daisenberger) ১৮৬০ খৃঃ অব্দে। অবশ্য নাটকীয় কাহিনীর বাইবেলোক্ত ভিত্তি বরাবরই অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। এই নাটকে প্রথম সুর ও সংগীত সংযোজন করেন স্বর্গত জার্মাণ সুরকার ডেড্‌লার (Rochus Dedler) ১৮১৫ খৃঃ অব্দে। আগে এ নাটকের সঙ্গে সঙ্গীত হ'ত না। শুধু প্রার্থনা হ'ত। বর্তমান প্রয়োগ-কর্তারা প্রার্থনার সেই প্রাচীন সুর ও ঠাট আজও বজায় রেখেছেন নাটকের ক্লাসিক রূপটি অবিকৃত রাখবার জন্য। পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশ থেকে সমাগত
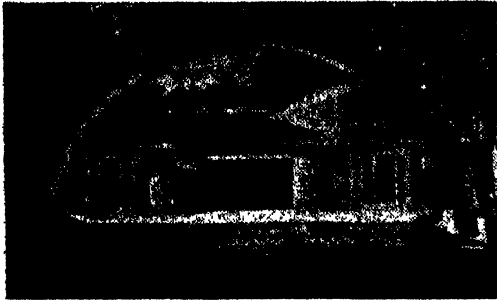
দর্শকদের জন্য আবৃত বিশাল প্রেক্ষাগার

পাঁচ হাজারেরও বেশী দর্শকের সঙ্গে আমরা মন্ত্রাভিভূতের মতো নিস্পন্দ হয়ে সারাদিন বসে এই বিরাট ও মহান অভিনয় দর্শন করেছি! দর্শকদের সেই বিপুল জনতার করতালিধ্বনি নেই, ধূমপান নেই, শ্বাসপ্রশ্বাসের মৃদুধ্বনি পর্য্যন্ত কানে আসে না। চিত্রার্পিতের মতো বসে আছেন সেখানে হাজার হাজার দর্শকেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আত্মবিস্মৃত বিভোর হয়ে। তাঁদের চিত্ত ও চক্ষু বেদনাভারাতুর করে তোলে এশিয়ার এক মহামানবের আবেগময় পুণ্যজীবন এবং মানুষের কল্যাণ কামনায় তাঁর সেই মহান আত্ম-বলিদানের মর্মন্তুদ্ কাহিনী!

দৃশ্যের পর দৃশ্য চলেছে—বদলে বদলে। একবারও মনে হয় না যে আমরা অভিনয় দেখছি। এই অভিনয়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব বাস্তব আবহাওয়া রক্ষা করার সযত্ন প্রচেষ্টা থাকায় দর্শকদের মনে এ অভিনয়ের রূপ ও রস গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়।

য়িহুদী পুরোহিত কাইফাসের নেতৃত্বে রোম্যান শাসন-কর্ত্তার প্রাসাদ সম্মুখে ক্ষিপ্ত জনতার দৃশ্যে অগাণিত বর্ম চর্ম ও হেলমেটধারী সশস্ত্র রোমান সৈনিক তাদের অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষসহ উত্তেজিত জনতাকে বার বার ধাক্কা দিয়ে সংযত রাখবার চেষ্টা করছে দেখা যায়। মনে পড়ে যায়, আমাদের দেশের স্বাধীনতাকামী সত্যাগ্রহীদের উপর অশ্বারোহী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারের নির্মম দৃশ্য। দৃশ্যটির অভিব্যক্তি এতই বাস্তব হয় যে রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনয় হ'চ্ছে বলে একবারও মনে হয় না। এই দৃশ্যে অন্ততঃ ৭।৮শ' অভিনেতা অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে একত্রে অভিনয় করেন।

যীশুখ্রীষ্টের জেরুজালেম প্রবেশের দৃশ্যটি প্রথম আরম্ভেই দর্শকদের বেশ একটু চমক দেয়। পটভূমিকায় বিশাল মন্দির। অসংখ্য উপাসক ও উপাসিকাদের ভীড়। মন্দিরের বিস্তৃত সোপানশ্রেণীর উপর ও মন্দির প্রাঙ্গণে ব্যবসায়ীদের দোকানপাট ও হাটবাজার বসে গেছে। কেনাবেচা চলছে। তার মধ্যে জুয়াখেলাও হচ্ছে। মহাজনদের তেজারতি কারবারও চলছে। গাধার পিঠে চড়ে যীশুর প্রবেশ। অসংখ্য ভক্ত তাঁর জয়ধ্বনি দিতে দিতে পিছু পিছু আসছে। মন্দিরের মধ্যে এই সব অন্যায় অনুষ্ঠিত হচ্চে দেখে যীশুর মর্মান্তিক ক্ষোভ। তিনি এর প্রতিকারে উদ্যত হয়ে সমস্ত দোকানদারদের হটিয়ে দিলেন। বিক্রয়ের জন্য আনীত পশুপক্ষীদের ছেড়ে দিলেন। মহাজনদেরও তাড়ালেন। একটি কুকুর, একজোড়া বিড়াল এবং একঝাঁক পারাবত এ দৃশ্যটিকে এমন একটা বাস্তব রূপ দেয় যে দর্শকেরা অভিভূত হয়ে পড়ে।

যন্ত্রসংগীত ও কণ্ঠসংগীত এত সুন্দর যে সমগ্র অভিনয়টিকে তারা যেন একটি স্বর্গীয় সুরে প্রাণবন্ত করে তোলে। এ অভিনয় দেখতে দেখতে আমাদের কেবলই এই কথা মনে হয়েছে যে, এ না-দেখে গেলে য়ুরোপ ঘুরে যাওয়া আমাদের বৃথা হয়েছে মনে হ'ত!

ভাগ্যচক্র

চাঁদমোহন চক্রবর্তী

শহরের চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে অসংখ্য উদ্বাস্তু কলোনী। বড়লোকের সাজানো বাগানবাড়ী যুদ্ধের সময় কেড়ে নিয়েছিল মিলিটারী কর্তৃপক্ষ—সেই সব জায়গা এখন দখল করে বসে আছে বাস্তুহারার দল। খোলা জায়গায় তৈরী হয়েছে কাঁচা-বাড়ী অসংখ্য—কোন রকমে মাথা গুঁজে আছে বালক-বালিকা যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। এদের সমাবেশে মাঠ আজ হয়েছে শহর—বাস্তুহারার শহর। উলঙ্গ অর্দ্ধ-উলঙ্গ নরনারীর আবাস-স্থান—দারিদ্র্যের পূর্ণ লক্ষণ সূচিত হচ্ছে তাদের বেশ বাসে, চালচলনে। ভগবানের অভিশাপে আজ তারা সর্ব-প্রকারে রিক্ত—অসহায়। মৌখিক সহানুভূতি অনুকম্পা অনেকে দেখান তাদের প্রতি, কিন্তু মনে মনে বলেন—এই পঙ্গপালের দল উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এই দেশে। এদের জন্যই এই দেশের লোকদের হয়েছে দুর্গতি—অন্ন বস্ত্র জিনিস-পত্রের—এই পাপ বিদায় হলেই বাঁচি! কিন্তু তারা ভুলে গেছে কিসের জন্য এই পঙ্গপাল ছেড়ে এল তাদের পৈতৃক ভিটে বাড়ী—প্রিয় জন্মভূমি! যত দিন এগুচ্ছে ততই সহানুভূতি অন্তর্হিত হয়ে এদের প্রতি মন বিষিয়ে উঠছে। স্থানীয় লোকেরা বলছে আপদ এসে জুটেছে! কর্তৃপক্ষ মনে করছে রাজ্যের ভার! জনসাধারণ ভুলে যাচ্ছেন এদের ভিতরও ছিল জমিদার—জোতদার, ধনী ব্যবসায়ী—সুদক্ষ শিল্পী ও মিস্ত্রী।

বিশ্বনাথ চলছিল একটি কলোনীর মধ্য দিয়ে—কলোনীটির নাম "নলিনী কলোনী"। সে উদ্বাস্তু না হলেও এদেরই ছেড়ে আসা দেশের অধিবাসী—তার বাপ পিতা-মহের ভিটা জমি জায়গা বাল্য-কৈশোরের লীলাক্ষেত্র সেই ছেড়ে-আসা দেশের একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে। মনে পড়লো কত পুরাতন স্মৃতি—ছেড়ে-আসা গাঁয়ের কত কথা! পিতার মৃত্যুর করুণ কাহিনী। সে আত্মবিস্মৃত হয়ে দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় চলছিল 'কলোনী'র রাস্তা দিয়ে। যেন অনুভব করছিল কিসের একটা অব্যক্ত যাতনা। তার তন্ময় ভাব কাটল একদল লোকের বীভৎস চীৎকারে।

"ওরে দ্যাখ্ রাজাবাহাদুর যাচ্ছেন—এ রাজাবাহাদুর!" ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করবার পূর্বেই একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি এসে দাঁড়াল বিশ্বনাথের সামনে—পরিধানে মলিন বসন, তবে কাপড়খানিতে ছিন্ন জরীর পাড়, গায়ে ছিন্ন সার্ট, চুলগুলি উসকো খুসকো, চোখ দুটি কোটরাবিষ্ট—দারিদ্র্যের ছাপ চোখে মুখে। বিশ্বনাথ তীক্ষ্ণ ভাবে সেই আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। যেন কোথায় দেখেছে সে লোকটিকে—খুব চেনা মনে হচ্ছে। অথচ—বিশ্বনাথ চেষ্টা করছিল স্মরণ করতে তার পরিচয়, কিন্তু সেই সময়ে আগন্তুক তার ম্লানমুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল: তুমি!—বিশু—এখানে! বিশুর মাথা আপনা হতে নত হলো সেই মূর্তির পদমূলে। তিনি সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বিশু জলভরা চোখে ধরা গলায় বলল: মামাবাবু—আপনার এই চেহারা হয়েছে! তিনি মলিন মুখে বললেন: বাবা, আমি সর্বহারা—অন্নহীন গৃহহীন উদ্বাস্তু!

সেই মুহূর্তে সেখানে এসে তাদের ঘিরে দাঁড়াল জনতা—সকলের মুখে উল্লাসের ছাপ। বিদ্রূপ কণ্ঠে ঠাট্টা বিদ্রূপ বর্ষণ করতে লাগল চতুর্দিক থেকে 'রাজা-বাহাদুর' বলে। বিশ্বনাথের অসহ্য বোধ হলো জনতার এই ইতর ব্যবহার। সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল: আপনারা আজ যাকে "রাজা বাহাদুর" বলে ব্যঙ্গ করছেন পূর্বে তিনি সত্যিই রাজার হালে ছিলেন—হয়তো অনেকে এঁর নাম শুনেছেন—এঁর নাম বিশ্বপতি চৌধুরী—পরগণার লোক জানতো এঁদের পূর্ব-পুরুষেরা ছিলেন চণ্ডীগড়ের রাজা। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ আপনাদের ন্যায় ইনিও হয়েছেন সর্বস্বান্ত "রিফিউজি"।

একজন এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল ইনিই সেই বিখ্যাত সংগীতবিদ বিশ্বপতি চৌধুরী? বিশ্বনাথ মাথা নেড়ে জানাল, ইনিই সুরসাগর বিশ্বপতি।—তারপর .....

বিশ্বপতি বিশ্বনাথের বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছেন। বিশেষ আপত্তি জানিয়ে ছিল বিশ্বপতি বিশ্বনাথের

বাড়ী আসতে প্রথমে। এর কারণও ছিল। একদিন বিশ্বপতি সত্যিই ছিল তার ক্ষুদ্র গ্রামের রাজা—পূর্ব-পুরুষেরা ছিল পরগনার জমিদার। তারপর বংশ-বৃদ্ধির সংগে সংগে বিরাট জমিদারী হল বহু বিভক্ত—শরিকগণের মধ্যে কয়েকজন অর্থাভাবে তাদের অংশ বিক্রয় করল বিশ্বনাথের পিতামহ লোকনাথ চাটুয্যের কাছে। চৌধুরী বংশের আশ্রিত কুলীন লোকনাথ পাটের দালালী করে বেশ দু'পয়সা করেছিল। লোকনাথের পুত্র রমানাথ বিবাহ করল বিশ্বপতির খুড়তুত ভগ্নী সরলা দেবীকে। খুড়া নরহরি চৌধুরীর পুত্র সন্তান ছিল না বলে তাঁর একমাত্র কন্যা সরলা দেবী পেলেন পিতার জমিদারী ও বাড়ীর অংশ। পিতার অবর্তমানে রমানাথ চৌধুরীদের জমিদারীর হলেন মোটা অংশীদার। বিশ্বপতি মোটেই শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি এই রমানাথ চাটুয্যেকে—পরিণামে বেঁধে গেল বিবাদ—উভয় পক্ষে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা। সামান্য দু' কাঠা জমীর জন্য এক একপক্ষ খরচ করল দশ হাজার! মুন্সেফ কোর্ট, ফৌজদারী কোর্ট, জজ কোর্ট, হাই-কোর্ট অবধি চলল মোকদ্দমা। ঠিক সেই সময়ে বাধল পূর্ববংগে দাঙ্গা—হিন্দুর বিরুদ্ধে জেহাদ—'ডিরেক্ট য়্যাকশন'। রমানাথ চাটুয্যে কলিকাতায় পুত্র বিশ্বনাথের গৃহে এসে পৌছলেন বটে কিন্তু দাঙ্গার যে বীভৎস নগ্নমূর্তি তাঁর হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিঁধেছিল—কিছুদিন পরে তিনি মারা গেলেন সেই 'শকে'ই। পিতার মৃত্যু বিশ্বনাথের অন্তঃকরণে এনেছিল এক নবীন প্রেরণা। যে ভূ-সম্পত্তির জন্য পিতা রমানাথ অকাতরে অর্থ বৃষ্টি করেছেন আজ কোথায় সেই সম্পত্তি!

তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বপতির অবস্থা বৈগুণ্য দেখে বিশ্বনাথ হল ব্যথিত—ভুলে গেল গৃহ-বিবাদ। তার হৃদয় কেঁদে উঠল বিশ্বপতির করুণ মুখচ্ছবি দেখে। সে তাই কাকুতি মিনতি করে নিয়ে এল বিশ্বপতিকে তার বাড়িতে।

কিছুদিন পর। বিরাট জলসার আয়োজন হয়েছে 'এক' রঙ্গমঞ্চে। কাশী লক্ষ্ণৌ থেকে সব ওস্তাদ শিল্পীগণ—যন্ত্র-সংগীতের কসরৎ হবে—সংগীত হবে বিভিন্ন বাংগালী ও অবাংগালী বিখ্যাত গায়কদের। এই অনুষ্ঠানের পরিচালক নরেশ ঘোষ একজন সংগীত-বিশারদ—ধনীর পুত্র—গুণী ব্যক্তি। একদিন শুক্রবার সন্ধ্যায় জলসায় আসর বসেছে—মঞ্চের উপরে বসেছেন ভারতের বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ। মঞ্চের একাংশে সাজান রয়েছে হরেক রকম যন্ত্র। কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর যন্ত্র-সংগীতের পর দেখা গেল 'শরদ' যন্ত্র-শিল্পী ওস্তাদ গুলাম খাঁ অনুপস্থিত—তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন। পরিচালক ঘোষ মশাই পড়লেন বিপাকে। তিনি মঞ্চে উপবিষ্ট কয়েকজন শিল্পীকে 'শরদ' সংগত করতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু এই বিরাট অনুষ্ঠানে গুলাম খাঁ'র স্থলে এই যন্ত্র হাতে করতে ভয় পেলেন তাঁরা। ঘোষ মশাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রেক্ষাগৃহে লোক পাঠালেন যন্ত্র-শিল্পীর সন্ধানে, কিন্তু লোক ফিরে এল হতাশভাবে। সেই সময়ে ঘোষ মশাইর সামনে এসে দাঁড়ালেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক—আধ-মলিন বেশ—দীর্ঘাকৃতি, মলিন মুখ—ভগ্নস্বাস্থ্য, কিন্তু মুখে চোখে একটা আভিজাত্যের ছাপ। নরেশ ঘোষ বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বলল: কি চাই আপনার?

আগন্তুক দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন: আপনি অনুমতি দিলে আমি 'শরদ' সংগত করতে পারি।

নরেশ সন্দিগ্ধভাবে একবার আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। তারপর অবজ্ঞাভরে বলল: দেখুন, এটা ছেলে-খেলা নয়—এই বিরাট অনুষ্ঠানে আপনি এই কঠিন যন্ত্র-সংগীত করতে পারবেন? কে আপনি? আগন্তুক দৃঢ় কণ্ঠে বললেন: দেখুন আমি ছেলেমানুষ নই—একবার আমার সংগত শুনুন—পরে পরিচয় পাবেন।

নরেশ আগন্তুকের দৃঢ় সংকল্প লক্ষ্য করে বিস্মিত হলেন; আগন্তুককে মঞ্চে আসন দেওয়া হল। শরদ যন্ত্রে তার সংগীতের ঝংকার শুনল শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়—যন্ত্র-সংগীত শেষ হলে শ্রোতৃবৃন্দ অনুরোধ করল, আর একখানি যন্ত্র-সংগীতের। নরেশ ঘোষ মুগ্ধ হল আগন্তুকের শিল্প-চাতুর্যে—সে কাছে এসে অভিনন্দন জানাল আগন্তুককে—অনুরোধ করল আর একটি সংগতের জন্য। আগন্তুক প্রস্তাব জানাল সে এবার সংগত করবে 'বেহালা' যন্ত্রের। নরেশ শ্রোতৃবৃন্দের মত নিয়ে অনুমোদন করল বেহালা সংগতের। কি অপূর্ব যন্ত্র-সংগীত ঝংকৃত হল বেহালার সূক্ষ্ম তারে! কি করুণ বিলাপ-সংগীত স্ফুরিত হল যন্ত্রের

ঝংকারে। সেইসংগীতের মূর্ছনায় শ্রোতাদের চোখে দেখা দিল অশ্রুকণা। বিরাট প্রেক্ষাগৃহ নিস্পন্দ—নির্বাক! সেই সংগীতে ধ্বনিত হল একটি দেশের ধ্বংস-বিলাপ। দস্যু প্রবেশ করল রাজপুরীতে, নৃশংস ভাবে হত্যা করল রাজপুরীর নরনারী, লুণ্ঠন করল রাজার ধন-দৌলং—ধর্ষিতা রাজকন্যা আর্তকণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করছে তাকে বাঁচাতে সেই নিষ্ঠুর দস্যুর কবল হ'তে—কিন্তু কেহ এলো না তাকে রক্ষা করতে। করুণ আর্ত ধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে হঠাৎ উচ্চ বিলাপ ধ্বনি করে থেমে গেল চিরতরে—নিভে গেল জীবন-প্রদীপ। যন্ত্র-সংগীত শেষ হবার সংগে সংগে শিল্পী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন মঞ্চের উপর। শ্রোতারা স্বপ্নাবিষ্ট বাহ্যজ্ঞানশূন্য—চোখে তাদের অশ্রুধারা। তাদের স্বপ্ন ভংগ হল মঞ্চের কর্তৃপক্ষের কোলাহলে। মূর্চ্ছিত শিল্পীর চেতনা ফিরে এল অল্পক্ষণ পরে—নরেশ ও তার সহকর্মীদের সেবা যত্নে। আবার জলসা চলল, কিন্তু আসর আর জমল না—শ্রোতাদের মনের ভিতরে শুধু বাজছিল সেই রাজকুমারীর করুণ কাহিনী—ঝংকৃত হচ্ছিল যন্ত্র-সংগীতের মূর্ছনা। অনুষ্ঠানের পরে পরিচয় পেল সেই আগন্তুকের—বিশ্বপতি চৌধুরী। পূর্ববংগের বিখ্যাত যন্ত্র-শিল্পী ও সংগীতানুরাগীর এই দুরবস্থা দেখে সকলের চোখ হল বাষ্পাকুল—সহানুভূতির বাক্য শোনা গেল প্রত্যেক শ্রোতার মুখে। সেদিন সভায় পৌরোহিত্য করছিলেন রাজ্যপাল। তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন বিশ্বপতির যন্ত্র-সংগীত আলাপনে—ব্যথিত হয়েছিলেন বিশ্বপতির ভাগ্য বিপর্যয়ে। বিশ্বপতি বন্ধুত্ব লাভ করল রাজ্যপালের—শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জন করল কর্মকর্তা নরেশ ঘোষের—

তার পর। বিশ্বপতির ভাগ্য পরিবর্তন হল। সুধী-সমাজে পেল সম্মান সমাদর। রাজ্যপালের অনুগ্রহে পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট তার সম্পত্তি কোর্ট-অফ-ওয়ার্ডসে নিল—সেখান থেকে আসতে লাগল অর্থ, কিন্তু হায় তার হৃদয়ের ক্ষত শুকাল কই? নিভৃতে তার চোখে ঝরে অশ্রুবারি—একমাত্র কন্যা সুলতার স্মরণে।

ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণ-বৈষম্যের জন্য বিখ্যাত। সিনেমা, হোটেল, লাইব্রেরী, সাধারণ হল প্রভৃতিতে তো নয়ই—এমন কি ট্রেণ, বাস, ট্রাম প্রভৃতির যে কোন কামরায়ও শুধু ভারতীয়ই নয়—এশিয়ান বা আফ্রিকানরাও প্রবেশ করিতে পারে না। কেপ-প্রদেশে এই ধরণের বর্ণ-বৈষম্য একটু কম। জোহেনস্‌বার্গ, প্রিটোরিয়া, অরেঞ্জফ্রীষ্টেট্‌, নাটালে খুব বেশী। জোহেনস্‌বার্গের ফুটপাত দিয়া ভারতীয়গণ চলিতে পারে না। হয় তাহাদের অনুমতি লইতে হয় সরকারের নিকট হইতে—নতুবা ফুটপাতের নীচ দিয়া যাইতে হয়। প্রদেশের শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতেই কেবল নহে, এমন অনেক প্রদেশই আছে যেথানে কোন এশিয়ান্ মাথা গুঁজিবার জন্য এক কাঠা জমিও ক্রয় করিতে পারে না। প্রদেশের বহু-স্থানই কেবল শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত; ট্রান্সভাল প্রদেশে ইউরোপীয়ান বাজারে এশিয়ানরা যাইতেই পারে না। অবশ্য কেপ-প্রদেশে এ সবের এত বালাই নাই।

হে পাশ্চাত্য! বিংশ শতাব্দীতে ইহাই নাকি তোমার সভ্যতার চরম উৎকর্ষতা। ইহাই তোমার Golden Age (সুবর্ণ যুগ) এর সংস্কৃতি। এই সভ্যতার গর্ব্বভরেই তুমি নাকি ভারতের ঐতিহ্যকে আমল দিতে চাও না। বিচার কর দেখি—মানুষগুলির গায়ের রং কালো বলিয়া তাহাদিগকে পশুর মত গণ্য করিয়া, একটি জাতিকে পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট করিয়া যাহারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জনে সমুৎসুক—তাহারা সভ্য—না সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ, সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাক্ ভবেৎ—যাহাদের জীবনের ব্রত, পৃথিবীর সকলের মঙ্গল তথা উন্নতি যাহাদের অনুক্ষণ চিন্তনীয় বিষয়—তাহারা সভ্য? অপরকে বঞ্চনা করিয়া নিজে সুখী হওয়ার প্রবৃত্তিকে সভ্যতা বলিবে—না "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই মনোভাবকে সভ্যপদবাচ্য বলিবে? যেথানে জ্ঞানের আলো এখনো পৌঁছায় নাই, মহান্ সভ্যতার সংস্পর্শে যাহারা এখনও স্বীয় শক্তিকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহাদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখাটাই সভ্যতার পরিচায়ক—না স্বীয় উপলব্ধ সত্য বা জ্ঞানকে তিলে তিলে অপরের কল্যাণে বিলাইয়া দেওয়াটা সভ্যতার পরিচায়ক? তুমিই নাকি পরাধীন ভারতের জাতিভেদের কথাটা জোর গলায় প্রচার কর, কিন্তু নবজাগরণের তূর্য্য নিনাদের সাথে সাথে জাতিভেদের শৃঙখল সে টুটিয়া পড়িতেছে—

তাহা দেখিয়াও চক্ষু ফিরাইয়া বর্ণ-বৈষম্যকে ক্রমশঃ দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবার প্রয়াস পাইতেছ কেন ?

যাক্ কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা পোষ্ট অফিস এবং ব্যাঙ্কের কাজ সমাপ্ত করিয়া পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। ফেজধারী জনৈক ভারতীয় মুসলমান আমাদের দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া আমাদের 'ইতিবৃত্ত' জানিয়া তাঁহারা মোটরে করিয়া এমন একটি জায়গায় আমাদের লইয়া গেলেন, যেখানে অনেকগুলি ভারতীয় দোকান এবং বসত-বাটি দেখিতে পাইলাম। অর্থাৎ এইটিই ভারতীয়-মহল্লা। একটি দোকানে নামাইয়া দিয়াই মুসলমান ভদ্রলোক অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন যে "আমি এখানের হিন্দুদের সংবাদ দিয়া আবার আপনাদের সাথে সাক্ষাত করিব।" মোটর হইতে অবতরণ করিবার কয়েক মিনিট পরেই একখানি মোটরে দুইজন লোক আসিয়া আমাদের বলিলেন—"আপনারা কি আমাদের সঙ্গে একবার "Argus" অফিসে যাইবেন ?" জিজ্ঞাসা করিলাম—"Argus" আবার কি ? উত্তরে জানিলাম—এখানের শ্বেতাঙ্গগণের একটি বিখ্যাত দৈনিকপত্র এবং তাঁহারা সেই পত্রিকার রিপোর্টার।

ভদ্রলোকদ্বয়ের সহিত মোটরে Argus অফিসে পৌঁছিতেই—সম্পাদক, সহ-সম্পাদকগণ সকলেই আমাদের নিকট আসিয়া হাজির হইলেন। শান্ত-ভাবে একজন মিশনের আদর্শ উদ্দেশ্য হইতে সুরু করিয়া, আমাদের পরিধেয়ের বর্ণ-গৈরিক কেন, কি আমাদের আহার, পায়ে জুতা না দিয়া স্যাণ্ডেল দেই কেন—ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া সমস্ত জানিয়া লইলেন। আমাদের কঠোর তপপূর্ণ জীবন, বাহ্যিক চাকচিক্যশূন্য বেশভূষা, নিরামিষ আহারাদির কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—এবং বৈকালে পত্রিকা খুলিয়া দেখি, অন্যান্য সংবাদ এবং আমাদের চিত্রসমেত নিম্নোক্ত 'বিশেষ পরিচয়টুকুও' বাহির হইয়াছে—"Four "dead" men stepped ashore at Capetown today from cargo liner "Betwa" to have a look at the city. They were Swamijis of an Indian cultural Mission on their way from Calcutta to West Indies and South America.

Dressed in bright orange turbans and gowns and wearing Sandals they aroused the interest of Passers-by as they walked up Adderley Street.

"Dead to the world"

The Party is in charge of the Bharat sevasram Sangha an elderly Hindu organisation of India, who said that they are the monks who are dead to his world. They have been reborn and baptized for the purpose of helping humanity. They wear orange colour because this is the colour of dead and fire. As they no longer belong to this world they cannot marry, their only food is vegetables, fruit, rice, curry and milk. Their work is entirely religious and cultural and broadly is to visit Indians living in other countries to help them in Indian culture, custom and religion. They have nothing to do with the political life of India—আমাদের আজ জাহাজ হইতে অবতরণে কোন সরকারী বাধা হয় নাই—সেই সংবাদটি আরও ফলাও করিয়া ছাপা হইয়াছে—তাহা এই—"To-day they had no trouble landing at Capetown and they said "In fact the authorities were very nice and helpful."

পত্রিকা অফিস হইতে বিদায় লইয়া বাজার হইতে কিছু কাঁচা তরী তরকারী খরিদ করিলাম। তাহা একটি দোকানে রাখিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে অন্য একটি হিন্দুর দোকানে পৌঁছিলাম। সন্ন্যাসী দেখিয়াই তো অবাক্। ভদ্রলোক জনৈক গুজরাটি। ভারত হইতে আসিয়াছি আজই জাহাজ হইতে নামিয়াছি, ইত্যাদি শুনিয়াই তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে চাহিলেন। আমরা নিজেদের অত্যন্ত ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের নিতান্ত কষ্ট হইবে ভাবিয়া আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বোধহয় তাঁদের স্পৃষ্ট আহার্য্য গ্রহণ করিব না এই চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা রন্ধন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন সন্ন্যাসী গৃহ হইতে মধ্যাহ্ন সময়ে অনাহারে ফিরিয়া যাইবে—তাহা তিনি কোনক্রমেই হইতে দিবেন না। তখন বাধ্য হইয়া আমরা আতিথ্য গ্রহণ করিলাম এবং তিনি রান্না করিলেই চলিবে—বলায় স্বয়ং রন্ধনে লাগিয়া গেলেন। আমরা ইত্যবসরে আবার একটু ঘুরিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। দারুণ শীত, ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রাস্তা হাঁটিতে হইতেছে।

ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়াছি—এমন সময় স্থানীয় ইউনাইটেড হিন্দু এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রীগোবিন্দভাই প্যাটেল, সম্পাদক শ্রীসি সি পলসেনিয়া, স্থানীয় ভারতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজি-বি প্যাটেল এবং আরও অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম যাঁহার গৃহে অতিথি, তিনিই সকলকে টেলিফোনে সংবাদ দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কী অপার করুণা ! মাতা যেমন পুত্রের অনুক্ষণ কল্যাণ কামনা করেন এবং তাহার সুখ-সুবিধার জন্য সর্ব্বদাই তৎপর থাকেন, শ্রীশ্রী সদ্‌গুরুও তেমনই তাঁর শরণাগত শিষ্যের জন্য প্রতিনিয়ত তৎপর থাকেন—তাহা ভক্ত ব্যতীত কেহ আর বিশ্বাস করিবেন কিনা জানিনা। বিদেশে আমাদের এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা তাঁহার কৃপাকরুণা ব্যতীত কোনক্রমেই ঘটা সম্ভব নয়। একথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবেন কি, যে এই গুজরাটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে আহার্য্য গ্রহণের কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা রাস্তায় বলাবলি করিতে-ছিলাম-যে দুপুরে পেটভরিয়া খাইতে না পাইলে বৈকালে আর এক পা হাঁটা যাইবে না।"

আমরা সকালে ব্যাঙ্ক হইতে যে চেকটি ভাঙ্গাইয়াছিলাম—তাহা প্রায় খরচ হইয়া গিয়াছে অথচ এখনও কিছু ফলমূল বা খাদ্যদ্রব্য না: ক্রয়

করিলে রাস্তায় খাওয়ার অভাব হইবে—অথচ Capetown এর পরের বন্দরে পৌঁছিতে তিন সপ্তাহের বেশী সময় লাগিবে। তাই কী করা যায় তাহা আমরা বলাবলি করিতেছিলাম। খাওয়ার পর মুখহাত ধুইয়া বসিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত কথাবার্তা বলিতেছি এমন সময় এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর কয়েকটি শিলিং রাখিয়া বলিলেন—"আমার একান্ত ইচ্ছা, এই কয়টি শিলিংএর ফলমূল আপনারা জাহাজে খাওয়ার জন্য যেন লইয়া যান। একজন নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া টাকা দিতেছে—তাই আমরা বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আপনি কী বলিতেছেন, আমাদের ফলমূল তরীতরকারী সব খরিদ করা হইয়া গিয়াছে।" ভদ্রলোক বলিলেন—"সন্ন্যাসীর যদি কোন সেবা হয় এই সামান্য অর্থে, তবে আমার শ্রমলব্ধ অর্থের সার্থকতা হইবে।" যাই হোক টাকা কয়টি টেবিলের উপর হইতে গ্রহণ করিলাম। টাকা কয়টি গ্রহণ করাতেই তিনি আমাদিগকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

নাস্তিক! এই ঘটনাগুলিকে তুমি কী বলিবে? হয়তো তুমি বলিবে এইগুলি "ঘটনামাত্র।" কিন্তু জানিয়া রাখিও, ইহাই শ্রীশ্রী-ঠাকুরের তাঁর সন্তানের প্রতি আন্তরিক স্নেহের বহিঃপ্রকাশ। কৃতজ্ঞ সন্তান তাহা স্বীকার করিয়া মাথা নত করিবে—আর কৃতঘ্ন তুমি, তাই অবিশ্বাসভরে এইগুলিকে accidental বলিয়া উড়াইয়া দিবে।

এই ভদ্রলোকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা শ্রীযুত প্যাটেল এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত তাঁহাদের মোটরে সহর প্রদক্ষিণে বাহির হইলাম। কেপটাউন দক্ষিণ-আফ্রিকার একটি বৃহৎ সহর। প্রায় ২০ মাইল ব্যাপী সহরটি শুধু শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশে পূর্ণ। আমাদের প্রত্যেক মোটরে এক একজন স্থানীয় লোক থাকিয়া মহল্লার নাম ইত্যাদি বলিয়া দিতেছেন। বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে সহরটি—রাস্তায় কাগজটি পর্য্যন্ত ফেলিবার জন্য ইলেকট্রিকের থামে থামে পাত্র সংরক্ষিত রহিয়াছে। এমনই অভ্যাস, কেহ সিগারেটের অবশিষ্টাংশটুকুও রাস্তায় ফেলিতেছে না। তাহা নিভাইয়া সেই পাত্রে ফেলিতেছে। যদি বা কেহ কিছু ভুল করিয়া রাস্তায় ফেলে, তবে সঙ্গে সঙ্গে কুড়াইয়া লইবার জন্য রাস্তায় ভ্রাম্যমান লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা নিজেদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনবরত রাস্তা পরিষ্কার করিতেছে।

ঘণ্টা দুই ঘুরিয়া আসিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। আমরা শ্রীযুত গোবিন্দভাই প্যাটেলের বাড়ীতে রাত্রের মত আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। শ্রীযুত প্যাটেল এখানের বিখ্যাত ফল-ব্যবসায়ী। আমাদের দেশের মত এখানে ফলের ব্যবসায় কম মূলধনে হয় না। এখানের হিন্দুরা সকলেই প্রায় ফলের ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং আর্থিক অবস্থা সকলেরই সচ্ছল।

গোবিন্দভাইয়ের বাড়ীতে পৌঁছিয়া শুনিলাম, আমাদের ভ্রমণের অবসরে হিন্দু এসোসিয়েশন একটি জনসভার আয়োজন করিয়াছেন তাহা সাড়ে আটটায়। এখানে দেখিলাম, সন্ধ্যা হইল প্রায় সাড়ে সাতটায়। তাই হাত মুখ ধুইয়াই সকলে সভাস্থলের দিকে রওনা হইলাম। সভাটি হইতেছে শ্রীযুত জলদাসী রাখা নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখিলাম—ছোট্ট হলঘরটি স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

জাতীয় সঙ্গীতে সভা শুরু হইল। এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর বক্তৃতার পর স্বামীজি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ বক্তৃতা করিলেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীঅরবিন্দের আকস্মিক তিরোধানে ব্যথিত জনতা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের দুঃখ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

সভার পরে মিঃ ডি-ফ্রীমান্ এবং তাঁর স্ত্রী আমাদের সঙ্গে হিন্দুধর্ম বিষয়ে আলোচনায় রত হইলেন। মিঃ ফ্রীমান্ জনৈক ইংরাজ। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। তাই সন্ধ্যাকালীন পত্রিকায় আমাদের আগমন সংবাদ দেখিয়া দর্শনপ্রার্থী হিসাবে গিয়াছিলেন জাহাজে। সেখানে 'আমরা সহরে রাত্রিবাস করিব' শুনিয়া বিশেষরূপে খোঁজ করিয়া আমাদের বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। বক্তৃতা শুনিয়া বেশ মুগ্ধ হইয়াছেন। আমেরিকার কাজ সমাপনান্তে যাহাতে পুনঃ আমরা এখানে আসি, তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

রাত্রে আহারান্তে প্রায় দেড়টা পর্য্যন্ত ভজনগান চলিল। আফ্রিকার ন্যায় দক্ষিণ-আফ্রিকার বেতার কেন্দ্রে কোন হিন্দী কার্যক্রম না থাকায় এখানের হিন্দুগণ হিন্দী ভজন শুনিবার ভারী আগ্রহী। সভার পরও ভজন-প্রিয় ব্যক্তিগণ গোবিন্দ ভাইয়ের বাড়ীতে সমবেত হইয়াছেন। রাত্রি প্রায় দেড়টায় গৃহস্বামী সকলকে বিদায় লইতে বলিলেন—স্বামীজিদের বিশ্রাম করিতে দেওয়া প্রয়োজন নয় কি? যেন নিতান্ত বাধ্য হইয়া ধীরে ধীরে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শয়নকক্ষে লইয়া যাইতে যাইতে গোবিন্দভাই বলিলেন—এই সময়ের মধ্যেই ২০।২৫ মাইল দূরের সহর হইতেও কতিপয় হিন্দু আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং দু'একজন সহরে থাকিয়া কাল সকালে ফিরিবেন। শুনিয়া বিস্মিত হই টেলিফোনে সংবাদ পাইয়াই এই রাত্রে ২৫ মাইল দূর হইতে আসিয়াছে। কী গভীর শ্রদ্ধা সন্ন্যাসীর প্রতি এবং ভারতের সংবাদ শুনিতে কী আকুল আগ্রহ।

পরদিন প্রাতে সকলের ঘুমভাঙার পূর্ব্বেই উঠিয়া আমরা স্নান সারিয়া জাহাজে যাইব বলিয়া বসিয়া আছি—এমন সময় গৃহস্বামী আসিয়া বলিলেন—"কাল যাঁর বাড়ীতে সভার আয়োজন হইয়াছিল আজ ওখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর জাহাজে যাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।" আমরা বলিলাম—"সে কী, জাহাজের chief officer যে আমাদের দশটার মধ্যে জাহাজে পৌঁছাইতে বলিয়াছেন!" "তাই না কি"—বলিয়া শ্রীযুত গোবিন্দভাই উঠিয়া গেলেন। মিনিট দশেক পরে ফিরিয়া বলিলেন—"জাহাজের এজেন্টএর নিকট টেলিফোন করিয়া দু'টায় জাহাজে উঠিবার অনুমতি লইয়াছি, সুতরাং আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নাই।"

প্রায় ৯টায় ২খানি মোটরে পুনরায় বাহির হওয়া গেল—

া দেখা হয় নি—এমন সব স্থানগুলি দেখিতে। বিশ্ববিদ্যালয়, াগান, চিড়িয়াখানা, সহরের ভিত্তিস্থাপক বা নির্ম্মাতা মিঃ রোড্‌সএর প্রাসাদ প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া আমরা বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার যমমালী রাখার বাড়ীতে পৌঁছিলাম। এখানেই আমাদের মধ্যাহ্ন-ন। শ্রীযুক্ত রাখা একজন বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী। ভারতের বিষয়ে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতে করিতে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া জ-ঘাটের দিকে সকলে রওনা হইলাম।

ক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতীয়গণের আমাদের এমন একটা ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল—যাহা পূর্ব্বে আমরা করতে পারি নাই। এখানে ভারতীয় হিন্দু বা মুসলমানের মধ্যে প্রকার মতদ্বৈধ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না—এদেশের মুসলমানরাই দের বলিয়াছে যে ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে যে সামান্য মতভেদের দেখা যায় তাহারই সুযোগ লইয়া এদেশের সরকার এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে, ভারত এবং পাকিস্থানে যদি এমন একটা বুঝাপড়া বা বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়—যাহাতে সেখানে কোনরূপ ভিন্ন মতের লক্ষণ না দেখা যায়—তবে এদেশেও ভারতীয়দের মধ্যে কেহ কোন রকম ভেদের সৃষ্টি করিতে পারিবে না। তাহা হইলেই এখান হইতে ভারতীয়দের উচ্ছেদ একেবারেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।"

জাহাজে আসিয়া দেখি অনেক লোকজনের সঙ্গে মিঃ এবং মিসেস্ ক্রীম্যানও আসিয়াছেন। নানারকম কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইয়া অপরাহ্ন ৫টায় জাহাজ ছাড়িবার প্রাক্ মুহূর্ত্তে সকলে বিদায় লইলেন। জাহাজ ছাড়িয়া ঘন্টাখানেকের মধ্যে আটলান্টিকের বক্ষে আসিয়া পড়িল। আমরা আমাদের 'কেবিনে' যাইয়া ক্রীত এবং প্রদত্ত ফলমূলাদিগুলি সাজাইয়া গোছাইয়া ঠিকঠাক্ করিয়া রাখিলাম। আবার কতিপয় দিবস সাগর-বক্ষে কাটাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

নজরুল-গীতি

শ্রীজয়দেব রায় এম্-এ, বি-কম্

রীতে composer বলে তাঁহাদের, যাঁহারা সুর সৃষ্টি করেন। গানে অপেক্ষা সুরের প্রাধান্য, সুরই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বাংলাদেশের অতিরিক্ত কাব্যভাবাপন্ন, তাই চিরকালই বাংলার কবিরাই বাংলা র ও রচয়িতা, কাজী নজরুল সেই ধারার শেষ composer কবি। র পর হইতেই বাংলা গানে কথা ও সুরের কর্তৃত্ব পৃথক হইয়া ছে।

নজরুলের হাতে বাংলা গানের আধুনিক যুগের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ র গানে অপরকে সুর দানের ক্ষমতা দেন নাই, তাঁহার মতে—"এমন র সহজ মীমাংসা এই যে, যে ব্যক্তি গান রচনা করেছেন তাঁর সুরটিকে ন রাখা। কবির কাব্য সম্বন্ধেও এই রীতি প্রচলিত, চিত্রকরের চিত্র রও। রচনা যে করে—রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই, তার াধন বা উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব যদি আর কেউ নেয় তাহ'লে কলা ত্র অরাজকতা ঘটে। ললিত কলাতেও ধর্ম্ম নীতির অনুশাসন এই যে, যেটি কীর্ত্তি তার সম্পূর্ণ ফলভোগ তার একলারই।" নজরুল ইস্‌লাম র গানে অপরকে সুরদানের ক্ষমতা দান করিয়া 'আধুনিক' নামে খ্যাত র বিরাট সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত করিয়াছেন; তাঁহার বহু গানে বিশেষতঃ রা সঙ্গীত' প্রভৃতির সুর অন্যের দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথের সময়ে বাংলার সুর জগতে একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা। তিনি এবং তাঁহার সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এবং নীকান্তের হাতে বাংলার গান নিজস্ব পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। উচ্চাঙ্গের র কৌশলে অতুলপ্রসাদ, গম্ভীর উদাত্ত সুরের প্রবর্ত্তনে দ্বিজেন্দ্রলাল, ভাগবতী-গীতির আন্তরিকতায় রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সুর প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাংলার গানকে সমৃদ্ধতর করিয়া তোলে। নিধুবাবুর টপ্পা রীতি, রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ রীতি, দ্বিজেন্দ্রলালের খেয়াল রীতি, অতুলপ্রসাদের ঠুংরি রীতির সঙ্গে নজরুলের গজল অঙ্গের গানে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সকল ঢঙের গানই বাংলার কাব্য-সঙ্গীতে বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। কাজী নজরুল ইস্‌লাম তাঁহাদের সকলেরই গীতির উত্তরাধিকারী!

বাংলাদেশের কাব্যের উৎকর্ষ সাধনে মুসলমান কবিরা প্রাচীনকাল হইতেই তাঁহাদের যথাসাধ্য করিয়া আসিতেছেন। আলাওল, দৌলৎকাজী, শেখ ফয়জুল্লাহ্, মোহম্মদ খাঁন প্রভৃতি কবিরা ইস্‌লামীয় দৃষ্টিতে কাব্যের রচনায় বাংলা সাহিত্যের নূতন অঙ্গের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু লোক-সঙ্গীত, বিশেষতঃ বাউল, সারি, ভাটিয়ালী, মুর্শিদী প্রভৃতি গানে মুসলমান গায়কগণ বাংলার গ্রামের আকাশকে আজও মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। বাংলার নিজস্ব সুর সংস্কৃতিও তাহাতেই আছে। নজরুল তাঁহাদের সব সঞ্চয়কে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন!

কাজী নজরুলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি গজল এবং ইস্‌লামী গানে। 'গজল' পারস্য দেশের প্রেম-সঙ্গীত, ভারতের মাটিতে মোগল আমলে তাহার আমদানী। বাংলাদেশে গত শতাব্দীতে তাহার সুর আসিলেও ঢঙের জন্ম, বাণীর সঙ্গে সুরের যথাযথ সংযোগ নজরুলের হাতে। লক্ষ্ণৌপ্রবাসী অতুলপ্রসাদও গজল গান রচনা করিয়াছেন, তবে তাঁহার গান উর্দ্দুগজলের অনুকৃতি, যেমন—

কত গান ত হ'ল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়া ও ?
যদি দেখা নাহি দিবে তবে মিছে কেন চাওয়া ও ?

প্রভৃতি। নজরুল কিন্তু পারসীয় গজলের বিদেশী সুরটিকে বঙ্গদেশীয় পরিচ্ছদে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গজলের মধ্যে সুপরিচিত—

(১) বাসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চল লো গোরী।
(২) বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে
দিস্ নে আজি দোল।
আজো তা'র ফুল কলিদের ঘুম্ টুটেনি
তন্দ্রাতে বিলোল্॥ (ভৈরবী)
(৩) আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায়
কে গো দরদী॥ (ভৈরবী)

বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী পদ্ধতির উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের আমদানী হয় সপ্তদশ শতকের শেষে নিধুবাবুর হাতে। তাহার পূর্বে বাংলা গান বলিতে কীর্তন ও অন্যান্য লোক-সঙ্গীতকেই বুঝাইত। মুসলমান অধিবাসীরা এই দেশের মাটির সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাঁহাদের দ্বারা অজস্র গান রচিত হইয়াছিল এবং আজও হইতেছে। নজরুল এই লোক সঙ্গীতের ধারায় অজস্র গান রচনা করিয়া বাংলায় সেই প্রাচীন সংস্কৃতির নব অভ্যুদয়ের সূচনা করেন। হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা তাঁহার কাব্য এবং গানের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ্। কীর্তন, শ্যামা-সঙ্গীত, রামপ্রসাদী প্রভৃতি গানও তিনি রচনা করিয়াছেন অভিনব ভঙ্গীতে। এই শ্রেণীর গান—

(১) লুকাবি মা কোথায় কালী
আমার বিশ্বভুবন আঁধার করে, তোর রূপে সব ডুবালি॥
(রামপ্রসাদী)
(২) আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ॥ (বাউল)
(৩) আমি কি সুখে লো গৃহে রব
শ্যামা যদি হল যোগী ওলো সখি, আমিও যোগিনী হব॥
(কীর্তন)

'শ্যামা সঙ্গীত' তাঁহার পূর্বেও অন্য মুসলমান কবিরাও রচনা করিয়াছিলেন। মীর্জা হোসেন আলি প্রভৃতি কবিদের শ্যামা-গান সুপ্রসিদ্ধ, যেমন—

যা রে শমন এবার ফিরি'।
বলে মুজা হোসেন আলী, যা করে মা জয়কালী,
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি॥

মুসলমান কবিদের চিরাচরিত মার্সিয়া ও ইসলামী গানের রচনার সঙ্গে তাঁহার গানের বিশেষ মিল নাই, ভারতীয় রাগিনীসম্মত বিশুদ্ধ ইসলামী সঙ্গীত, তাঁহার অন্যতম পরিচয়। যেমন—

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই-ইস্লামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে, তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল্॥
(খাম্বাজ)

পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গের হইতে স্বতন্ত্র। সেখানে সঙ্গীতের প্রেরণা হয়ত বিভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান এবং হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে মিলিত বঙ্গীয় সংস্কৃতি রচিত হইয়াছিল নজরুল পশ্চিমবঙ্গের সেই জাতীয় সাংস্কৃতিক কবি। তিনি সার্থক শিল্পী—বাঙ্গালীর কবি আমাদের সাহিত্যের মুখপাত্র তিনি, তাঁহার গানে বাঙ্গালীর পরিচয়, বাংলাদেশের মাটির গন্ধ রহিয়াছে।

তাঁহার গানের কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। কবি [illegible] কাব্য প্রতিভার পরিচয় এই গুলির মধ্যে রূপ পাইয়াছে। তাঁহার বি[illegible] মনোভাব এবং কাব্য প্রতিভার সম্বন্ধে হয়ত একটু অত্যুক্তিই হই[illegible] বাংলা সাহিত্যে তাঁহার যাহা দেবার শেষ হইয়াছে, এখন তাঁহার বিষয় একটু নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখার প্রয়োজন। তাঁহার রচনার অপেক্ষা তিনি যে পরিবেশে সাহিত্য সৃষ্টি করি[illegible] তাহার সম্বন্ধেই উচ্ছ্বাস বেশী হইয়া থাকে, তবে সুরের ক্ষেত্রে তাঁহা যে কাব্যের অপেক্ষা বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপ রায়ের মতে—"কাজী নজরুল ধরে দিলেন এ সত্য, কিন্তু তাঁর [illegible] সুরপ্রতিভা ব্যাহত হ'ল ঠিক্ সেই সময়েই যে সময় তাঁর সৃষ্টিশক্তি [illegible]পলব্ধি করবার কিনারায় এসেছিল। আমাদের গানের দিক্ দিয়ে [illegible]কাল ব্যাধিকে আমি আমাদের দেশের পরম দুর্ভাগ্য বলে মনে করি

নজরুল সুরের ক্ষেত্রে যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন তাহার [illegible]কাংশেরই রবীন্দ্রনাথের হাতে সুরু হইয়াছিল। নজরুল প্রতি[illegible] সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

জাতীয় সঙ্গীতে নজরুলের দৃপ্ত গম্ভীর উদাত্ত সুর বাংলার গানে নূতন। Marching সুর বা 'অভিযান সঙ্গীতে' তাঁহার অসামান্য। এই শ্রেণীর গান—

(১) চল্ চল্ চল্ ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
(২) টলমল্ টলমল্ পদ ভরে বীর দল চলে সমরে
থরধার তরবার কটিতে দোলে রনন ঝনন রণ ডঙ্কা বে
(৩) দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে।

নজরুলের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি আধুনিক বাংলা [illegible] প্রবর্তক। আধুনিক গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি (১) বাণীর [illegible] (২) মিশ্র সুর (৩) নাটকীয় গায়কী। নজরুলের হাতেই সেইগুলির সার্থকতা। তিনি নানা রাগিনীর মিশ্রণে যে নব নব সুর সৃষ্টি ক[illegible] তাহাই আধুনিক বাংলা গানের প্রথম ফসল। তিন চারটি রাগিনীর [illegible] তাঁহার গান, যেমন—কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি (তিলোক কামোদ এবং পাহাড়ের মিশ্রণ); রং মহলের রং-মশাল (ভৈরবী, আশাবরী এবং ভূপালীর মিশ্রণ) প্রভৃতি।

আধুনিক গান কেবল আধুনিক যুগেরই গান নয়, জনগণেরও [illegible] সঙ্গীতের সুর জগতে এতদিন সাধারণের প্রবেশ অধিকার ছিল না, নানারূপ convention সুরকে দূরে সরাইয়া দিয়াছিল। নজরুল সুরের মিশ্রণে যুগের উপযোগী করিয়া নূতন রীতির প্রবর্তনা করিয়া চটুল স্বাচ্ছন্দ্যগতি দান করেন, তাহাতেই তাহা সবার অধিগম্য হইয়া উঠিয়াছে।

নজরুলের গানে কোন বিশেষ গীতিরীতি নাই। গায়ক ইচ্ছা [illegible] প্রয়োজন মত রীতির পরিবর্তন করিতে পারেন, এইটি মস্ত বড়ো স্বা[illegible]

রবীন্দ্রনাথের পরে গানের ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছুটা [illegible] হইয়াছি, নজরুলের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইয়াছে। বাংলা দেশে অ[illegible] গানের স্রোত বহিতেছে, নজরুল ইস্লামকেই তাহার প্রবর্তক [illegible] যাইতে পারে।

শঙ্করা—তেতালা

[illegible] খ্যাল

পদতলে কারে রেখেছ জননী
তব মায়া কে বুঝিবে বিশ্বজন তারিণী।
যার অঙ্গপ্রভা জগতে বিকাশিছে
তুমি তার হয়েছ অর্দ্ধাঙ্গিনী॥

সুর—সদারঙ্গ কৃত খ্যালের অনুকরণে

কথা—গীতসম্রাট গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরলিপি—গীতসরস্বতী অমিয়া মুখোপাধ্যায়

১ ২ ৩ ০
{ গা পা না ধা | র্সা । না পা | পা গা । পা | গা রে সা । } |
{ প দ ত লে কা - রে রে খে ছ - জ ন ০ নী - }

১ ২ ৩ ০
ন্া প্া ন্া সা | সা গা হ্মা পা | না ধা র্গা না | ধা পা হ্মাগা হ্মা
ত ব মা য়া কে বু ঝি বে বি ০ শ্ব জ ন তা রি০ ণী

১ ২ ৩ ০
{ পা । পা র্সা | । র্সা র্সা র্সা | না র্সা নাধা পাহ্ম | পা নাধা সা না } |
{ যা - র অ - ঙ্গ প্র ভা জ গ তে০ বি০ কা ০০ শি ছে }

১ ২ ৩ ০
র্সা র্গা র্গা পা | র্গা র্রা র্সা না | পানা পানা র্সা র্রা | র্সানা ধাপা ধাগা রাসা
তু মি তা র হ য়ে ছ অ র্দ্ধা০ ঙ্গি০ ০ ০ নী০ ০০ ০০ ০০

তান

২ ৩
১। গাহ্মা পানা নপা র্সনা | ধাপা হ্মগা রসা ন্সা |
আ০ ০০ ০০

২। র্সনা পনা র্সার্সা র্রর্সা | নধা পাহ্মা গা রাসা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০

১ ২ ৩ ০
৩। ন্সা গাহ্মা পপা পাপা | -গাপা হ্মাগা রসা ন্সা | গহ্মা পনা ননা নগা | ধাপা হ্মাগা রসা ন্সা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

১ ২ ৩ ১
৪। পাহ্মা গাহ্মা পা না | । । । । | পাহ্মা গাহ্মা পা সা | । । । । |
আ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

বাট

১ ২ ৩ ০
৫। ন্সা গাহ্মা পা পা | পাহ্মা গপা গরা সা | ন্সা গহ্মা পানা র্সার্গা | র্রসা নধা পহ্মা গহ্মা |
পদ তলে কা রে রেখে ছজ ন০ নী তব মায়া কে বু ঝি বে বি০ শ্ব জ নতা রি ণী

১ ২
গা পা না ধা ‖ র্সা ।
প দ ত লে কা রে

(চিত্রনাট্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

ডিজল্‌ভ্‌।

রাত্রি। লিলির ড্রয়িং রুম।

দাশু, ফটিক ও লিলি বসিয়া সরবৎ খাইতেছে। লিলির পরিধানে নৃত্য-বেশ; দাশু ও ফটিকের সাহেবী পোষাক।

দাশু গেলাস হাতে লইয়া রাস্তার দিকের জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

দাশু: খোকার আসবার সময় হ'ল। রাস্তার ওপর নজর রাখি। আচম্‌কা এসে না পড়ে।

ফটিক: লিলি, আর দেরী নয়। অনেক খেলিয়েছ, এবার মাছ ডাঙায় তোলো।

লিলি: উহুঁ, আরও খেলবে।

ফটিক: খেলালে খেলবে না কেন? কিন্তু আর খেলাবার দরকার আছে কি? আমার তো মনে হয়, এবার টান দিলেই মাছ ডাঙায় উঠবে।

লিলি: উহুঁ, আরও সময় চাই। তুমি ওদের ধাত জান না ফটিক, ওরা বড়মানুষের ছেলে; চুনোপুঁটি নয়, রুই-কাৎলা, হঠাৎ টান মারলে সুতো ছিঁড়ে যাবে।

ফটিক: বেশ, তোমার কাজ তুমি জানো। কিন্তু মনে রেখো, চোরাবাজারেও সূর্যমণির দাম দু' লাখ টাকা। শেষে ফ'স্কে না যায়।

লিলি: ফস্কাবে না।

জানালা দিয়া মোটর হর্ণের আওয়াজ আসিল।

দাশু: এসেছে—

লিলি: এবার আমাদের অভিনয় আরম্ভ হোক।— দাশুবাবু, আর এক পেয়ালা সরবৎ—

মন্মথ প্রবেশ করিল। দাশু ও ফটিককে দেখিয়া তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

লিলি: এই যে মন্মথবাবু! আসুন।

মন্মথ লিলির পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—

মন্মথ: ভেবেছিলাম আজ আপনি একলা থাকবেন—

দাশু একটা মুখভঙ্গী করিল; ফটিক যেন শুনিতে পায় নাই এমনিভাবে সিগারেট ধরাইল। লিলি মিষ্ট হাসিয়া বলিল—

লিলি: একলা থাকবার কি যো আছে মন্মথবাবু! এই দেখুন না, ফটিকবাবু নেমন্তন্ন করেছেন, গ্র্যাণ্ড হোটেলে যেতে হবে। সেখানে আজ বল্‌ ডান্স্‌ আছে।

মন্মথ: (নিরাশকণ্ঠে) বল্‌ ডান্স্‌!

লিলি: বসুন না, এখনো আমাদের বেরুতে দেরী আছে। এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ আনতে বলব?

মন্মথ: না, থাক—

মন্মথ একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। এই সময় লিলির গলায় একটি সুন্দর জড়োয়া কণ্ঠী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া লিলি নিজের গলায় হস্ত দিল।

লিলি: কী সুন্দর পেণ্ডেণ্ট্‌ দেখেছেন মন্মথবাবু? আজ ফটিকবাবু উপহার দিলেন।

মন্মথ এ পর্যন্ত লিলিকে কোনও দামী জিনিষ উপহার দিতে পারে নাই; তাহার মুখে ঈর্ষামিশ্রিত লজ্জা ফুটিয়া উঠিল। ফটিক সবিনয় তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—

ফটিক: তুচ্ছ জিনিষ, তুচ্ছ জিনিষ, লিলি দেবী। আপনার মরাল-গ্রীবার যোগ্য নয়।

দাশু আসিয়া টেবিলের উপর শূন্য গেলাস রাখিল।

দাশু: আমার কথাটা ভুলবেন না লিলি দেবী।

আসছে হপ্তায় আমার পার্টিতে যেতেই হবে, না গেলে ছাড়ব না। আপনার জন্যই এত আয়োজন করছি।

লিলি : তা যাবার চেষ্টা করব। জানেন মন্মথবাবু, দাশুবাবু এত চমৎকার পার্টি দেন যে কী বলব। চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেন।

দাশু : চার পাঁচ হাজার টাকা আর এমন কি বেশী! আমার সমস্ত জমিদারীটাই আপনার পায়ে তুলে দিতে রাজি আছি, লিলি দেবী। কিন্তু আপনি নিচ্ছেন কৈ?

লিলি : তা কি আমি নিতে পারি? মন্মথবাবু, আপনিই বলুন তো, এ রকম উপহার কি কোনও ভদ্র-মহিলার নেওয়া উচিত? তাতে কি নিন্দে হয় না?

ফটিক : ও আলোচনা এখন থাক। দেরী হয়ে যাচ্ছে। মন্মথবাবু, আপনি যদি আসতে চান তো আসুন না। নাচতে জানেন নিশ্চয়?

মন্মথ : (অপ্রতিভ ও মর্মাহত) আমি—আমি নাচ্‌তে জানিনা—

ফটিক : তাতে কি? আমরা আপনাকে নাচাব অখন—মানে, আমাদের নাচ দেখতে দেখতেই শিখে যাবেন।

মন্মথ : (শুষ্কস্বরে) না, আজ আমাকে সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে হবে। কাল রাত্রে বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল।

দাশু : (চমকিয়া) চোর!

ফটিক : চোর!!

লিলি : কিছু চুরি গেছে নাকি?

মন্মথ : না, চুরি যায়নি। কিন্তু সাবধান থাকা দরকার। আচ্ছা আজ আমি চললাম, আর একদিন আসব।

লিলি : নিশ্চয় আসবেন, ভুলবেন না যেন।

মন্মথ প্রস্থান করিলে তিনজনে উদ্বিগ্নভাবে পরস্পর মুখের পানে চাহিল।

ফটিক : এ আবার এক নতুন ফ্যাসাদ। চোর! হয়তো সূর্যমণির ওপর আর কারু নজর পড়েছে—

দাশু : আমরা তোড়জোড় করে কাজটা বেশ গুছিয়ে এনেছি, এখন যদি আর কেউ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়ে যায়—

ফটিক : লিলি, আর নয়, চটপট্ জাল গুটিয়ে ফ্যালো। নৈলে জেলের মাছ চিলে ছোঁ মারবে। কলকাতা সহরে আমাদের মতন অনেক ঘাগী জাল পেতে ব'সে আছে।

লিলি : হুঁ। আমি ভাবছি, সূর্যমণির দিকে হাত বাড়াবে এত বুকের পাটা কার?—কানামাছি নয় তো?

দাশু : কানামাছি—!

তিন জনের মুখেই আশঙ্কার ছায়া ঘনীভূত হইল।

ডিজল্‌ভ্।

পরদিন প্রাতঃকাল। যদুনাথের লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া দিবাকর এক তাড়া নোট গুণিতেছে; তাহার সম্মুখে একটি বাঁধানো হিসাবের খাতা। নোট গোণা শেষ হইলে সে নোটগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া হিসাবের খাতা টানিয়া লইল। কিন্তু কি করিয়া সংসারের হিসাব লিখিতে হয় তাহা তাহার জানা নাই; সে খাতাটা কয়েকবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শেষে তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় পেন্সিল দিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল।

এই সময় ঠাকুর ঘর হইতে পূজারতির ঘণ্টা ও নন্দার গানের আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। দিবাকর কয়েক মুহূর্ত স্থির হইয়া শুনিল, তারপর নোটগুলি পকেটে পুরিয়া এবং হিসাবের খাতাটি বগলে লইয়া লাইব্রেরী হইতে বাহির হইল।

ঠাকুর ঘরে তখন সূর্য-দেবতার পূজা আরম্ভ হইয়াছে। যদুনাথ এক হাতে ঘণ্টা নাড়িয়া পূজা করিতেছেন; নন্দা সূর্যের স্তব গাহিতেছে।

নন্দা : নমো নমো হে সূর্য,
তুমি জীবন জয়-তূর্য।
জবাকুসুমসঙ্কাশম্,
সকল কলুষ-তম নাশম্,
নমো নমো হে সূর্য।
চির-জ্যোতির্ময়, অন্তর-পঙ্ক
বহ্নিপ্রবাহে কর অকলঙ্ক।
তব কাঞ্চন লাবণ্য
যুগে যুগে ধন্য হে ধন্য,
সুন্দর, ত্রিভুবন পূজ্য
নমো নমো হে সূর্য॥

দিবাকর দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। যদুনাথ তাহাকে দেখিতে পাইয়া হস্ত সঙ্কেতে তাহাকে ভিতরে আসিয়া বসিতে বলিলেন। দিবাকর এক কোণে আসিয়া বসিল এবং দেবতাটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

গান শেষ হইলে যদুনাথ [illegible] প্রণাম করিলেন। নন্দা গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল, দিবাকর অবনত হইয়া যুক্ত কর কপালে ঠেকাইল। যদুনাথ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন—

যদুনাথ : দিবাকর, আমার ঠাকুরকে চিন্‌তে পারলে ?

দিবাকর : আজ্ঞে না, এমন ঠাকুর আমি কখনো দেখিনি। কে ইনি ?

যদুনাথ : (ঈষৎ হাসিয়া) ইনিও দিবাকর।

দিবাকর : আজ্ঞে !!

যদুনাথ : দিবাকর, সূর্য, হিরন্ময় পুরুষ, জগতের প্রাণ, জীবের জীবন। সোনার মণ্ডলের মধ্যে পদ্মরাগ মণি ; বিগ্রহ দেখে চিনতে পারলে না ! ইনিই আমার কুলদেবতা।

দিবাকর : পদ্মরাগমণি ! এতবড় পদ্মরাগমণির তো অনেক দাম !

যদুনাথ : দাম ! টাকা দিয়ে এর দাম হয়না দিবাকর। এই সূর্যমণি আমার বংশে সাতপুরুষ ধ'রে আছেন। ইনি যতদিন আছেন, ততদিন কোনও অনিষ্ট আমার বংশকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সকলে ঠাকুর ঘরের বাহিরে আসিলেন। যদুনাথ দরজায় তালা লাগাইয়া চাবির গোছা কোমরে গুঁজিলেন।

যদুনাথ : তোমাকে সকালে খরচের টাকা দিয়েছি। যেমন যেমন খরচ হচ্ছে, হিসেব রাখছ তো ?

দিবাকর : আজ্ঞে রাখছি। কিন্তু হিসেবটা ঠিক রাখা হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। যদি একবার দেখিয়ে দেন—

যদুনাথ : সংসারের খুঁটিনাটি হিসেব রাখা শক্ত বটে। —আমার চশমা—(চশমা খুঁজিলেন) কোথায় রেখেছি। নন্দা, তুমি দেখিয়ে দাও কি করে হিসেব রাখতে হবে।

নন্দা : আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে—

নন্দার পিছু পিছু দিবাকর ড্রয়িং রুমে গেল। নন্দা একটা সোফায় বসিয়া বলিল—

নন্দা : কৈ দেখি, কি হিসেব লিখেছেন।

দিবাকর সোফার পাশে দাঁড়াইয়া হিসাবের খাতা নন্দাকে দিল।

নন্দা : দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন না। এইখানে ন।

নন্দা নিজের পাশে নির্দেশ করিল। দিবাকর বিহ্বল হইয়া পড়িল।

দিবাকর : আমি—না না—আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—

নন্দা : কি মুস্কিল ! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ? এত সঙ্কোচ কিসের ?

দিবাকর : না না, সঙ্কোচ নয়। কিন্তু আপনার পাশে—

নন্দা : আমার পাশে বসলে কোনও ক্ষতি হবে না, আমার সংক্রামক রোগ নেই। আপনি দেখছি ভারি সেকেলে।

দিবাকর : মোটেই না। তবে—

নন্দা : তবে আপনার মনে নিজের সম্বন্ধে ক্ষুদ্রতা-বোধ আছে।—দিবাকরবাবু, নিজেকে ছোটো মনে করবেন না, অতীতের কথা ভুলে যান। ভাবতে শিখুন, আপনি কারুর চেয়ে হীন নয়। তবেই অতীতকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

দিবাকর : তাহলে বসি—? (সঙ্কুচিতভাবে বসিল)

নন্দা : (হাসিয়া) হ্যাঁ, অনেকটা হয়েছে। এবার দেখি খাতা।

নন্দা খাতা খুলিল।

কাট্

উপরে নিজের ঘরে মন্মথ সাজগোজ করিতেছিল। কোট পরিয়া ড্রেসিং টেবিল হইতে মণি-ব্যাগ লইয়া খুলিয়া দেখিল তাহাতে মাত্র দুই-তিনটি টাকা আছে। মন্মথর কপালে উদ্বেগ-রেখা পড়িল। সে অধর দংশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

কাট্

নীচে ড্রয়িং রুমে নন্দা দিবাকরের হিসাব দেখিয়া কলকণ্ঠে হাসিতেছে।

নন্দা : এ কী লিখেছেন ! এ-রকম ক'রে বুঝি হিসেব লেখে ?

দিবাকর : (লজ্জাবিমূঢ়) আমি জানিনা ; আপনি শিখিয়ে দিন।

নন্দা : (সদয় কণ্ঠে) আপনি কখনো লেখেন নি তাই ভুল করেছেন। নৈলে হিসেব লেখা খুব সহজ ; তার জন্যে বি-এ এম্-এ পাশ করতে হয় না। এই দেখুন।—যে পাতায় হিসেব লিখবেন তাকে দু' ভাজ করুন। এই ভাবে —কেমন ? এটা হ'ল জমার দিক, আর এটা খরচের

দিক। বুঝলেন? এখন পাতার মাথায় আজকের তারিখ দিন। (নিজেই তারিখ লিখিল)—হয়েছে? আচ্ছা, আজ দাদু আপনাকে কত টাকা দিয়েছেন?

দিবাকর: পঞ্চাশ টাকা। তার মধ্যে খরচ হয়েছে—

নন্দা: খরচের কথা পরে হবে। এখন জমার পঞ্চাশ টাকা এই দিকে লিখুন—(নিজেই লিখিল)—আজ যদি দাদু আপনাকে আরও টাকা দেন তাহলে এই দিকে জমা করবেন—

দিবাকর: এইবার বুঝেছি। খরচের হিসেব এই দিকে থাকবে। আমায় খাতা দিন, এবার আমি লিখতে পারব।

নন্দা হাসিতে হাসিতে তাহাকে খাতা ফিরাইয়া দিল।

এই সময় মন্মথ সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছিল। সে অর্ধেক সিঁড়ি নামিবার পর নন্দা হাসিমুখে ড্রয়িংরুম হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং উপরে উঠিতে লাগিল। মন্মথকে সকালবেলা সাজ-গোজ করিয়া বাহির হইতে দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করিল না।

মন্মথ হল্ ঘরে নামিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, যেন কাহাকেও খুঁজিতেছে। তারপর ড্রয়িংরুমের পর্দা সরাইয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে জানিল না, নন্দা সিঁড়ির অর্ধপথে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে।

দিবাকরকে ড্রয়িংরুমে দেখিয়া মন্মথ প্রবেশ করিল। দিবাকর মনোযোগের সহিত খাতা লিখিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মন্মথ: তুমি নতুন বাজার-সরকার না? কি নাম তোমার—

দিবাকর: দিবাকর।

মন্মথ: হ্যাঁ হ্যাঁ। ছাখো, আমার হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হয়েছে। তোমার কাছে টাকা আছে তো?

দিবাকর: আছে—

মন্মথ: আমাকে আপাতত গোটা পচিশ দাও তো।

দিবাকর: আজ্ঞে—তা—হিসেবে কী খরচ লিখব?

মন্মথ: হিসেবে কিছু লেখবার দরকার নেই। তুমি নতুন লোক, তাই জানো না। দাও দাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে—

দিবাকর: কিন্তু কর্তাবাবু যখন হিসেব চাইবেন, তখন এই পঁচিশ টাকার কী হিসেব দেব?

মন্মথ: আঃ, তুমি দেখছি একেবারেই, খবরদার দাদুকে এ টাকার কথা বলবে না। হিসেবের খাতা তোমার হাতে, তুমি adjust ক'রে নেবে—বুঝলে? ভুবনবাবুও তাই করত—

দিবাকর ফ্যাল্ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। ইতিমধ্যে নন্দা যে নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছে তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই; তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল।

নন্দা: দাদা—!

নন্দা কাছে আসিয়া তীক্ষ্ণ তিরস্কারের চক্ষে মন্মথর পানে চাহিল। ধরা পড়িয়া গিয়া মন্মথ কাঁচুমাচুভাবে চক্ষু নত করিল।

নন্দা: দাদা, এ তুমি কী করছ, নিজের কর্মচারীকে জুচ্চুরি করতে শেখাচ্ছ?

মন্মথ: আমি—আমার কিছু টাকার দরকার।

নন্দা: টাকার দরকার! মাসের পয়লা হাত-খরচের টাকা তুমি পাওনি?

মন্মথ: এঁ—পেয়েছিলাম। কিন্তু—

নন্দা: এই এগারো দিনে একশ' টাকা খরচ করে ফেলেছ! কিসে খরচ করলে? (মন্মথ নীরব) দাদা, কি করো এত টাকা নিয়ে? দাদু যদি জিগ্যেস করেন, তখন কী জবাব দেবে?

মন্মথ: (ভয় পাইয়া) না না, দাদু জানতে পারবেন কেন? আমার পকেট থেকে টাকা চুরি গিয়েছিল—তাই—

নন্দা: কেন মিছে কথা বলছ দাদা, তুমি খরচ করেছ। কিসে খরচ করেছ তুমিই জানো। কিন্তু এসব ভাল কথা নয়।

নন্দার তিরস্কার মন্মথর অসহ্য বোধ হইতেছিল, কিন্তু এ সময় মেজাজ দেখাইবার সাহস তাহার নাই; সে প্যাঁচার মত মুখ করিয়া দ্বারের দিকে চলিল।

নন্দা: শোনো। বাইরে যাচ্ছ দেখছি। হাতে কি একটিও টাকা নেই?

মন্মথ: না।

নন্দা: দিবাকরবাবু, দাদাকে পাঁচটা টাকা দিন।

দিবাকর: (টাকা দিয়া) হিসেবে কি লিখব?

নন্দা: আমার নামে খরচ লিখুন; আমি এখন

হাত-খরচের টাকা নিই নি।—কিন্তু দাদা, মনে থাকে যেন!

মন্মথ: আচ্ছা আচ্ছা—

মন্মথ একরকম রাগ করিয়াই চলিয়া গেল। ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে এই কলহের সাক্ষী হইয়া দিবাকর বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল এবং হিসাবের খাতার আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছিল। নন্দা তাহার ভাব দেখিয়া একটু হাসিল, বলিল—

নন্দা: দিবাকরবাবু, দাদা টাকাকড়ি সম্বন্ধে বড় আল্গা। দাদুকে আজকের কথা যেন বলবেন না।

দিবাকর: না না।

নন্দা: আর একটা কথা। রাত্রি দশটার পর আমাদের কেউ বাড়ীর বাইরে থাকি দাদু পছন্দ করেন না। কিন্তু দাদা প্রায়ই দেরী ক'রে বাড়ী ফেরে। একথাটাও দাদুর কানে না ওঠে। দাদু সেকেলে মানুষ—

দিবাকর: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাউকে কোনও কথা আমি বলব না। কিন্তু মন্মথবাবু যদি আবার টাকা চান?

নন্দা: (দৃঢ়স্বরে) আপনি দেবেন না।

ওয়াইপ্।

(ক্রমশঃ

নীলাচল

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

সংসার-সমুদ্রে প্রতিনিয়ত হাবুডুবু খাওয়ার মাঝে সমুদ্রের ডাক শোনা নিতান্তই কাল্পনিক মনের বাতুলতা। তবুও এই বাতুলতাকে কবি এবং দার্শনিকসম্প্রদায় প্রশ্রয় দিয়েছেন বলেই আমাদের মতন সাধারণ সংসার-কীটদের মাঝে মাঝে বাতিক চেপে ওঠে। ডাক শুনি সমুদ্রের।

কলমন্দ্রমুখরিত মহাসমুদ্র, উর্মি-মুখর নীল জলরাশি চেতনার আহ্বানে মাটির জগতের মানুষকে জাগিয়ে তোলে—

"স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন,
জলে তব এক গান, অব্যক্তের অস্থির গর্জন।"

মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সমুদ্র-দর্শনের অভিলাষে। কথাটি প্রকাশ ক'রলুম গৃহিণীর কাছে। তিনিও মেতে উঠলেন। আমার তবু সমুদ্র-দর্শনের ভাগ্য ঘটেছে দু'চার বার; কিন্তু তিনি অভাগিনী। সংসার-সমুদ্র তাঁকে বেঁধে রেখেছে আষ্টেপিষ্টে অক্টোপাশের বন্ধনে। বাউলের সুরে তিনিও নিজ মনোভাব ব্যক্ত ক'রলেন—

"হায়রে ছয় বলদের হাম্বারবে
শ্রবণ আমার ছিল বধির;
এবার খোঁজ পেয়েছি, তাই ছুটেছি
পরশ পেতে প্রাণ-বারিধির।"

গৃহিণীর কথা শুনে সমুদ্র দেখার সখ যেন কমে এলো। এযুগের পত্নীরা এ মহাবাক্য আর স্বীকার করেন না—

পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য!

কিন্তু খরচ বাড়ার দায় থেকে রক্ষা ক'রলেন শ্রদ্ধেয় কণিদা। পুরী দর্শদ্বারে সমুদ্রের ওপর সুরম্য অট্টালিকা ভারত-সেবাশ্রম, সুন্দর যাত্রী-নিবাস। সেখানে যাতে স্থান পাই কয়েকদিন, কণিদা তার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়ায় শরতের শুভ প্রসন্ন সন্ধ্যায় যাত্রা ক'রলুম পুরীর পথে।

পুরী এক্সপ্রেস ছুটে চ'লেছে উর্ধ্বশ্বাসে।

চন্দ্রালোকিত রাত্রে নদীর পর নদী পার হ'তে যেন সেই ছেলেবেলায় শোনা রূপ-কথার তের নদীকে দেখ্‌তে পাই। দামোদর, রূপনারায়ণ কংসবতী, সুবর্ণরেখা, বুড়ীবলং, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, বিরূপা, কোয়াখাই মহানদী, কাটজুড়ি, ভার্গবী এবং প্রাচী পার হ'য়ে পুরীর পথে বন্ধু এক্সপ্রেস ছুটে চ'লেছে তখন রাত্রি অতিক্রান্ত প্রভাতের অরুণালোক উড়িষ্যার দিগন্তকে আলোকিত ক'রে তুলেছে। এরপর আরম্ভ অসীম জলরাশির প্রাণ-চাঞ্চল্যে মুখর। উৎকলবাসী অনেক পাণ্ডা কিন্তু বাংলায় ট্রেণে এক তীর্থযাত্রী পরিবারকে ঘিরে ধ'রে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্যকে প্রকাশ ক'রছেন—

"উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজা ক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরব॥"

জীবের ভববন্ধন বিমোচনের জন্যে পুরুষোত্তমক্ষেত্র অপেক্ষা আর যে শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র নেই। শ্রীক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভগবান দারুময় রূপ ধারণ ক'রে বিরাজিত। এই কারণে জগন্নাথ ক্ষেত্রকে ভূস্বর্গ বলা হয়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অপর একটি নাম দশাবতার ক্ষেত্র। এই নামের তাৎপর্য এই যে এই জায়গাতেই ভগবান পর্যায়ক্রমে দশবিধ অবতার হ'য়ে পৃথিবীর জন্য স্থানে লীলা ক'রেছেন। মানুষ, পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ যে কোনও হোক্ না কেন, এখানে মৃত্যু হ'লে তার মুক্তিলাভ হ'য়ে থাকে।

...একালের মেয়ে আমার মনে পাণ্ডাঠাকুরের গভীর ধর্ম-বিশ্বাসের উদ্রেক ক'রেছে দেখে আমি এক্ষেত্রে বিস্মিত হ'লাম না, কারণ আমার মনও তখন চেতনা-সমুজ্জ্বল। পাণ্ডাঠাকুর ব'লেছেন—"উৎকলে ভগবতীর নাভী পতিত হয়। একে বিরাজ ক্ষেত্র বলে। বিরাজমণ্ডল হ'তে সমুদ্রতীর পর্যন্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের দশযোজন। চারিমণ্ডলে এই ক্ষেত্র বিভক্ত। নীলাচলের সহিত তীরবর্তী জায়গা পাঁচ ক্রোশ শঙ্খমণ্ডল। মহানদীতীরস্থ ভুবনেশ্বর মণ্ডল। বৈতরণী তীরবর্তী রাজপুর গদামণ্ডল। চন্দ্রভাগা নদীতীরবর্তী ক্ষেত্র পদ্মমণ্ডল। বৈষ্ণবের ভগবান স্বয়ং এখানে প্রাদুর্ভূত। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই মহাসমুদ্রেই আত্মসমাহিত হ'য়েছেন।'

পুণ্যার্থী মনে আমি স্মরণ ক'রলুম মহাকবি বৈষ্ণবের পদ—

> "কত চতুরানন মরি মরি যাওত
> ন তুয়া আদি অবসানা।
> তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত
> সাগর লহর সমানা॥"

পুরী এক্সপ্রেস এসে থামলো পুরী স্টেশনে। মহাকলরব ক'রতে ক'রতে যাত্রীরা সব নেমে প'ড়লো।

পাণ্ডাদের আক্রমণকে প্রতিহত ক'রে আমরা যুগলে সাইকেল রিক্সায় চেপে বসলাম। খানিক অগ্রসর হ'তেই সমুদ্রের ডাক শোনা গেল। মহাকালের আহ্বান নিয়ে মহাসমুদ্র গর্জন ক'রছে—যে সমুদ্রের ডাক শুনেছিলাম নিশীথের স্বপ্নে গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রায়—এ ডাকে তার ধ্বনি নেই। এ ডাকে শুনি মহাজাগরণের উদাত্ত ধ্বনি—

> "...নাই, নাই, তোমার সান্ত্বনা;
> যুগ যুগান্তর ধরি' নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
> তোমার রহস্য গর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ আবরণ
> প্রকাশ সন্ধান করে।..."

তারপর সমুদ্র জেগে উঠলো আমাদের নয়ন পথে। নীল জলরাশি দিগন্ত নীলাম্বরে দূরে সমাহিত। তার শেষ নেই। তীরের বালুকাতটে প্রচণ্ড ঢেউএর মাতামাতি। শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গ হুঙ্কারে ছুটে আসছে। সাপের-ফণা বিস্তার ক'রে আপন আবেগকে ধ'রে এনে তটভূমিতে নিজেকে প্রকাশ ক'রে সফিত ভাবাবেগকে ভেঙে ভেঙে দিয়ে। দেখতে দেখতে চ'লতে চ'লতে এই অবিরাম ভাঙা-গড়ার লীলাকে উপভোগ করতে লাগলুম।

স্বর্গদ্বারে ভারত সেবাশ্রমে পৌঁছে স্বামীজীর সাক্ষাৎলাভ ক'রলুম। তিনি পরম সমাদরে আমাদের আবাসস্থল ঠিক ক'রে দিলেন। বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। সমুদ্রে স্নান সেরে আহারাদি ক'রে স্বামীজীর কাছে গেলুম। যাত্রী পরিবেষ্টিত হ'য়ে তিনি তখন স্থান সঙ্কুলানের চিন্তায় মগ্ন।

ভারত সেবাশ্রম যাত্রী-নিবাস—পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা ক'রলে এখানে যাত্রীরা থাকতে পারেন। কিন্তু পুরীর যাত্রীসংখ্যা যেমন তাতে সকলকে স্থান দেওয়া অসম্ভব। তবুও স্বামীজী অন্যত্র স্বল্প ভাড়ায় বাসস্থান ঠিক ক'রে দিয়ে যাত্রী সাধারণের অশেষ উপকার সাধন করেন। ক'দিন ভারত-সেবাশ্রমে থেকে সন্ন্যাসীর গৃহীরূপ এবং সমাজ-চেতনাকে লক্ষ্য ক'রে আমরা বিস্মিত হ'য়েছি। গভীর রাত্রেও নিরাশ্রয় যাত্রীদের জন্য আতিথেয়তার তিনি যে রকম শ্রম স্বীকার করেন প্রতিনিয়ত তাতে তাঁর চারিত্রিক মহিমা আদর্শ ব'লে স্বীকার ক'রতে হয়। কয়েক দিনের সস্নেহ ব্যবহারে এবং তাঁর কর্ম-কুশলতার তিনি আমাদের মনে গভীর শ্রদ্ধার আসন অধিকার ক'রেছেন। প্রবাসে ভারত সেবাশ্রম বাঙালী হিন্দুদের শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রই নয়—সমস্ত তীর্থযাত্রীর সুখ-সুবিধা, আপদ-বিপদের প্রতি সজাগ। এই প্রতিষ্ঠানের সমাজ-সেবা দেখে আমরা মুগ্ধ হ'য়েছি। সমস্ত প্রবাসীদের এবং তীর্থযাত্রীদের অভিভাবকত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ভারত সেবাশ্রম ধর্মের বাইরে সমাজ-সেবায় এখানে আত্মনিয়োগ ক'রেছেন।

আমাদের দর্শনীয় স্থানের তালিকা শুনে স্বামীজী আশ্রমের পাণ্ডা নিযুক্ত ক'রে দিলেন।

পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে শ্রীমন্দিরে এসে সমুপস্থিত হলুম পরদিন সকালে। মন্দির সমুদ্র হতে এক মাইল দূরস্থ নীলাচলে অবস্থিত। মন্দিরের চারি দ্বার। পূর্বে-প্রধান বা সিংহদ্বার। উত্তরে-হস্তীদ্বার। পশ্চিমে খানা দ্বার। দক্ষিণে অশ্বদ্বার। মন্দিরের চতুর্দিকস্থ প্রাচীর মেঘনাদ নামে খ্যাত। মেঘনাদ ২৪ ফিট উচ্চ, ২২ ফিট প্রস্থ। মেঘনাদ উত্তর দক্ষিণে ৬৬৬ ফিট ও পূর্ব পশ্চিমে ৬৮৭ ফিট। মন্দির ৪ ভাগে বিভক্ত। মূল-মন্দির, নাট-মন্দির, ভোগমন্দির, জগমোহন। অন্তঃ-প্রাঙ্গণ এবং বহি-প্রাঙ্গণে ঘেরা মন্দির বিরাট ধর্ম-ঐতিহ্যের পরিচয় দেয়।

১২০টি মন্দির এখানে আছে। জগন্নাথের সর্বপ্রধান মন্দিরের শুণ্ড ভাগ ১৯২ ফিট উচ্চ। এই শুণ্ড ভাগ বিষ্ণুচক্র ও ধ্বজা দ্বারা শোভিত। উৎকলের রাজা গজপতিবংশীয় সদাই ভীমদেবের অধিকার কালে ১১১৯ শকাব্দে জগন্নাথদেবের প্রধান দেউল নির্মিত হয়। পাণ্ডাঠাকুরের কাছ থেকে এই সব তথ্য জ্ঞাত হলাম। মন্দিরের বাইরে স্থপতি-শিল্পের মনোহারিত্বও চমৎকার। মন্দির পরিদর্শন ক'রে গম্ভীরায় গিয়ে পৌঁছুলাম। মহাপ্রভু এখানে যে সাধনায় বড় হ'য়েছিলেন—বিশ্ব-প্রেম, মৈত্রী, জীবে দয়া—আজকের অশান্ত পৃথিবীতে তার মর্মকে উপলব্ধি ক'রতে লাগলুম। তারপর নানা দর্শনীয় তীর্থস্থান পর্যটন ক'রে আশ্রমে ফিরলুম।

সন্ধ্যা সূর্য সিন্ধু জলে অস্তমিত।

আকাশ আর সমুদ্রে অভিনব রঙের সমাবেশ। এ দৃশ্য দেখে ভুলে গেলুম জাগতিক বাস্তব পরিবেশ। সংসার-সমুদ্র থেকে সাত-সমুদ্রের অতলায়তনে মনের প্রকৃত মানুষ তখন আত্ম-নিমজ্জিত হ'য়েছে। স্থান মাহাত্ম্যকে আমরা অনুভব করলুম সমুদ্রের নিতান্ত এক নির্জন বালুকাময় উপকূলে। আমাদের সমস্ত সত্তা তখন বিলীন হ'য়ে গেছে সামুদ্রিক সত্তায়।

> "আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
> শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
> কিছু কিছু মর্ম তার—বোবার ইঙ্গিত ভাষা-হেন,
> আত্মীয়ের কাছে।......"

এই পরম জগতের মহা-আত্মীয়কে ছেড়ে আজ চ'লে এসেছি পুনরায় সংসার-সমুদ্রের আবর্তে। দিনগত পাপক্ষয়ের গ্লানির মাঝে থেকে থেকে তবুও সমুদ্র ডাক দেয়।

> "হে জলধি বুঝিবে কি তুমি
> আমার মানব ভাষা। জান কি তোমার ধরা-ভূমি
> পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ-ওপাশ;
> চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস......"

সমাধান

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভোরের আকাশ তখনো স্বচ্ছ হয়নি,মেঘ করেছে। অন্ধকার তখনো রাস্তাটার এখানে ওখানে জমাট বেঁধে আছে যেন।

বাড়ির গলিপথটা আস্তে আস্তে অতিক্রম ক'রে বড়-রাস্তায় এসে দাঁড়ালো স্বরপতি। একবার আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালে—একবার সদ্য-জাগা শহরের মূর্তিটা দেখে নিলে, যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে। তারপর একটা সশব্দ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলে।

এবার এরই মধ্যে শীতের আমেজ দিয়েছে। বেশ শীত শীত করছে যেন।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে সে। তারপর গোটা কয়েক টান দিয়ে ধূম উদ্গার করতে লাগলো।

করালীর সঙ্গে আজ তার দেখা করা চাই-ই। যেমন ক'রে হোক আজ করালীকে ধরতেই হবে। শুধু ধরা নয়—আজ শেষ বোঝাপড়া ক'রে আসবে সে, সেই নিমক-হারাম করালীর সঙ্গে। তারপর কি ক'রে জব্দ করতে হয়, কেমন ক'রে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে হয় দেখিয়ে দেবে।

রাগে চোখ দুটো জ্বালা করতে লাগলো স্বরপতির। কানের গোড়া অবধি গরম হ'য়ে উঠলো যেন। হাতের সিগারেটটায় একটা অন্তিম টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেটাকে আঙুলের টোকা মেরে। তারপর এক মুখ ধোঁয়া উদ্গার করতে করতে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা ট্রাম স্টপেজের তলায় দাঁড়ালো। হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলে—ছটা বাজতে এখনো মিনিট পাঁচেক বাকী। আটটা নাগাত নিশ্চয়ই পৌঁছতে পারবে সে করালীর কালীঘাটের বাসায়। তারপর......

একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো স্বরপতির ঠোঁটের কোণায়। রাস্কেলটা খুব আশ্চর্য হ'য়ে যাবে তাকে দেখে নিশ্চয়ই। সে হয়তো নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে, ভেবেছে তার অজ্ঞাত-বাস জানতে পারবে না কেউ—কেউ আর খুঁজে পাবে না তার কালীঘাটের নতুন বাসা! খুব একখানা চাল চেলেছিল যা হোক! বলা নেই, কওয়া নেই—হঠাৎ একদিন সকালে দেখা গেল, সপরিবারে করালী উ[illegible] শোভাবাজার থেকে। করালীর শোভাবাজারের বাড়ি[illegible] মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো—এক বছরের ওপর [illegible] বাকী। কয়লাওলা দুধওলা মুদী, মায় মোড়ের [illegible] পানবিড়িওলা পর্যন্ত বাকী রইলো না ফাঁকি পড়তে। [illegible] সব চেয়ে বেশি ফাঁকি পড়লো স্বরপতি নিজে। ফাঁকি পাঁচ দশ টাকার ফাঁকি নয়—হাজার দুই টাক[illegible] ফাঁকি। কিন্তু তাও হয়তো উপেক্ষা করতে পার[illegible] স্বরপতি—হয়তো এটাকা কটা মাফ্ ক'রে দিতো সে, [illegible] করালী তার বন্ধুতা স্বীকার করতো, যদি সে তার শ্রী[illegible] মূলে কুঠারাঘাত না করতো। শুধু অর্থের ফাঁকিই [illegible] দেয়নি করালী তাকে?—ফাঁকি দিয়েছে অনেক কি[illegible] সে ফাঁকির বোঝা অর্থ দিয়ে হালকা করা যায় না। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা হয় [illegible] বোঝাতে পারা যায় না, তার জীবনের কতোখানি অপচয় ক'রে দিয়েছে করালী।

করালী, স্বরপতির প্রাণের বন্ধু করালী! কি না কর[illegible] সে করালীর জন্যে? নিজের অশেষ ক্ষতি স্বীকার ক[illegible] করালীর সুখের সন্ধান করেছে। আপদে বিপদে [illegible] না করেছে? আর করালী কি দিয়েছে তাকে [illegible] পরিবর্তে?—নিমক-হারাম, বেইমান!

দেহের সমস্ত পেশীগুলো শক্ত হ'য়ে উঠলো স্বরপ[illegible] ভাবতে ভাবতে। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে গেল, দাঁ[illegible] দাঁত ঘোষে নিলে বার কয়েক।

ঠিক এমনি সময়ে কালীঘাটগামী একখানি দো[illegible] বাস রাজ-পথ কাঁপাতে কাঁপাতে সগর্জনে সামনে [illegible] দাঁড়ালো। কতকটা অন্যমনস্কের মতোই এগিয়ে [illegible] বাসটায় উঠে পড়লো স্বরপতি। সামনের দিকের এ[illegible] সীটে বসে পড়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে [illegible] ঘড়িটা দেখে নিলে একবার। তারপর আবার ফিরে এ[illegible] করালীর চিন্তায়।

বাস্তবিক করালী যে এমন ব্যবহার করবে।

[শো]ধ করা যায়নি। মানুষের একটা কৃতজ্ঞতা-বোধও [থা]কে, করালীর কি সে বালাইও নেই? অথচ এই করালী [এদ্]দিনও দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে টাকা নিয়ে গেছে তার [কা]ছে। আবার বড়াই কতো।—টাকা নেবার সঙ্গে সঙ্গেই [সু]বিধামতো পরিশোধ ক'রে দেবার প্রতিশ্রুতি।—[মিথ্যে]বাদী, জোচ্চোর! ধার শোধ করার মুরোদ যে কতো [করা]লীর তা জানতে আর বাকী নেই তার। মুরোদ যদি [থা]কতো তাহ'লে আর এমন ক'রে পালিয়ে বেড়াতে হতো [না] তাকে দেশশুদ্ধ পাওনাদারের ভয়ে।

রাগে সর্ব-অঙ্গ জ্বালা করতে থাকে সুরপতির।—[করা]লী—করালী তাকে ঠকিয়েছে, ভয়ংকর ঠকিয়েছে! [তা]র প্রীতির মূলে নিদারুণ আঘাত হেনেছে। জীবনে [আ]র বন্ধুত্ব করবে না সে কারো সঙ্গে এরপর থেকে।

একে একে অনেক কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে [খুঁ]টিনাটি অনেক ঘটনা। সুরপতির একটা কথা [আ]জ কেবলই মনে হয়—কেবলই মনে প্রশ্ন জাগে, কোন্ [গু]ণে সে অমন ক'রে আকৃষ্ট হয়েছিল করালীর প্রতি? [জী]বনে এমন ক'রে তো মেশেনি সে আর কারো সঙ্গে? [আত্ম]ীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধব এমন কি নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও [বো]ধ হয় এমন প্রাণ খুলে মেশেনি সে কোনদিন। মালতী [তা]কে নিয়ে অনেক সময় অভিযোগও করতো। বলতো: [এক]দিন তোমার ওই বন্ধুর জন্যে অনেক দুর্দশা ভোগ [কর]তে হবে, দেখে নিও। বন্ধু বন্ধুই থাক—তাই বলে [এ]তো বাড়াবাড়ি ভালো নয়।—কিন্তু সুরপতি বুঝতেই [পা]রতো না, কি এমন বাড়াবাড়ি করে সে করালীকে [নি]য়ে। গরীব বন্ধুকে সাহায্য করা কি বাড়াবাড়ি? না, [স্ত্রী]-পুত্র নিয়ে বিপন্ন বেকার বন্ধুর একটা সামান্য চাকরী [ক'রে] দেওয়া অন্যায়?

কিন্তু আজ মনে হ'চ্ছে সত্যিই অন্যায় করেছে সে [ক]রালীকে প্রশ্রয় দিয়ে। আজ বুঝতে পারছে, বাড়াবাড়িই [হ]য়েছিল সে করালীর সঙ্গে মেলা-মেশায়। সমস্ত কিছুই [আ]জ যেন কাচের মতো পরিষ্কার হ'য়ে গেছে চোখের [সাম]নে। করালী যে এই দীর্ঘকাল তার সঙ্গে বন্ধুত্বের [অ]ভিনয় ক'রেই এসেছে সেটা বুঝতে আর এখন কষ্ট [হ]য় না মোটেই। তার টাকার সঙ্গেই বন্ধুত্ব করেছিল [করা]লী, তার সঙ্গে নয়।

একটু নড়ে চড়ে বসলো সুরপতি। ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমার ডগায় ধরে রাখা সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে কখন নিভে গেছে। রাশিকৃত ভাবনার মাঝে সেটার কথা মনেই ছিল না এতক্ষণ। এইবার সেটার প্রতি হঠাৎ সচেতন হ'য়ে উঠে একটা টান দিলে। তারপর সেটাকে ফেলে দিয়ে আর একটা ধরিয়ে নিয়ে আবার ভাবনার রাজ্যে ফিরে এলো।

একটা দিনের স্মৃতি আজও ভুলতে পারেনি সুরপতি। করালীর মেয়ের বিয়ে, সমস্তই স্থির হ'য়ে গেছে কিন্তু হাতে একটি পয়সা নেই তার। অথচ এ বিয়ে না দিলেও নয়! পাত্রটি লোভনীয়। খাঁইও কিছু নেই তেমন। অবস্থাও ভালো। এমন পাত্র হাত-ছাড়া করলে ভবিষ্যতে আপসোস্ ছাড়া আর কিছুই করবার থাকবে না। তা ছাড়া মেয়েরও বয়েস হ'য়েছে—বিয়ে না দিলেই নয়। করালীর স্ত্রী বলেছে যে, এ পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে যদি না দেওয়া হয় তো সে আত্মহত্যা করবে।—করালীর সেই ব্যথিত নিরুপায় মুখের ভাব আজও ভোলেনি সুরপতি। আজও স্পষ্ট মনে আছে সে কথা।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও সন্ধ্যার পর তার বৈঠকখানা ঘরে এসে বসেছিল করালী—তবে একটু দেরি করেছিল সেদিন আসতে। বিলম্বের হেতু জিজ্ঞাসা করায় ম্লান একটু হেসে করালী বলেছিল: মেয়েটার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে বড় বিব্রত হ'য়ে পড়েছি, ভাই। সবই তো জানিস—এক পাই-পয়সারও সংস্থান নেই আমার। আপিসে লোন চাইলুম, ম্যানেজার বললে—আগেকার লোন পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আর লোন দেওয়া হবে না। অথচ—একটু থেমে, একটা উদ্‌গত দীর্ঘনিশ্বাসকে আস্তে আস্তে পরিত্যাগ ক'রে বলেছিল: ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই মেয়েটাই আমার বড় অনুগত, বড় প্রিয়। এই পাত্রটির হাতে একে দিতে পারলেই যেন সুখী হ'তে পারতাম। কিন্তু তার কোন উপায়ই দেখছি না।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিল সুরপতি—করালীর ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে, তার পরে একটা বড় রকমের নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলেছিল: আমাকে কি কোনদিনই আপনার ভাবতে পারলি না করালী। সামান্য টাকার জন্যে তোর মেয়ের বিয়ে আটকে যাবে! আমি

থাকতে! তোর মেয়ে কি শুধু তোরই মেয়ে, আমার কেউ নয় রে?

খপ্ ক'রে করালী তার হাতটা ধরে ফেলে বলে উঠেছিল: ছিঃ! ওসব কি বলছিস সুরো! তোকে আমি পর ভাবি! তুই না থাকলে আজ আমার কি দুর্দশা হ'তো বল্ দিকি? কিন্তু ভাই তোর ওপর কতো জুলুম করবো আর? তাও পাঁচ দশ টাকা হ'লেও বা কথা ছিল—এ যে একেবারে দেড় হাজার দু' হাজারের ধাক্কা।

—বেশ তো, ধাক্কাটা না হয় আমিই সামলাবার চেষ্টা করি।—সুরপতি তার দিকে চেয়ে বলেছিল।

করালী অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারেনি, বিহ্বলের মতো তাকিয়েছিল শুধু। তারপর মাথা নিচু ক'রে আস্তে আস্তে বলেছিল: তাই করো। তোমার অনেক আছে, দু' হাজার তোমার কাছে কিছু নয়। কিন্তু শোধ করা আমার পক্ষে শক্ত। যাই হোক, আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে দেব।

—হ্যাণ্ডনোট! তুই লিখে দিবি আমাকে? এ তুই কী বলছিস করালী?

—হ্যাঁ ভাই। এ না হ'লে আমি তোমার টাকা নিতে পারবো না। আমি পরে আপিস থেকে লোন নিয়ে তোমার টাকা শোধ ক'রে দেব।

সমস্ত ঘটনাগুলো যেন আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সুরপতি। দেখতে পাচ্ছে যেন করালীর সেদিনকার সেই মুখের ভাব। কিন্তু সে মুখে তো প্রতারকের কোন ছাপ ছিল না! বাস্তবিকই মানুষের চরিত্র দুর্বোধ্য! মাত্র দু' হাজার টাকার জন্যে যে করালী এ রকমটা করবে এ ধারণাই করা যায়নি।

পরদিন যথা সময়ে দু' হাজার টাকা সংগ্রহ ক'রে এনে দিয়েছিল সুরপতি কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন করালীকে। কিন্তু আশ্চর্য! সে টাকায় মেয়ের বিয়ে করালী দেয়নি। অধিকন্তু তার চার পাঁচদিন পরেই অকস্মাৎ সে শোভাবাজারের বাড়ি থেকে রাতারাতি সকলের চোখে ধূলো দিয়ে পরিবারবর্গ নিয়ে সরে পড়লো। কদিন পরে সুরপতির নামে ডাকে একটা চিঠি এলো—করালী লিখেছে:—সুরপতি, তোমার কাছে টাকা নিয়েও পদ্মর বিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ল না এবং তোমার টাকাও ফিরিয়ে দিতে পারলুম না এখন। কেন, সেকথা সময় হ'লে জানাবো—তোমার টাকাও সেই সময় শোধ করবো। তুমি আমার অনেক ক'রেছ, অনেক দিয়েছ; কিন্তু আমি তোমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই করতে পারিনি। ক্ষমা করো।—

অনেকবার চিঠিখানা পড়েছিল সুরপতি। অথচ বুঝতে পারেনি কিছুই। কেন পদ্মর বিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ল না এবং বিয়ে যখন হ'ল না তখন টাকাগুলো কেন ফেরত দেওয়া গেল না, কিছুই বুঝতে পারেনি সে। আরো বুঝতে পারেনি—কি জন্যে করালী কাউকে কিছু না বলে এমন আকস্মিকভাবে অন্তর্ধান করলে!

হঠাৎ যেন মনের মধ্যে সন্দেহের একটা শিহরণ বয়ে গেল। তবে কি করালী প্রতারণা করেছে তার সঙ্গে? তবে কি এতোদিন বন্ধুত্বের অভিনয় ক'রে এসেছে সে—নানা ছলে তার টাকা ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে? কিন্তু—

সঙ্গে সঙ্গে জোর ক'রে মনের সন্দেহ দূর ক'রে দিয়েছিল সুরপতি। মনে মনে বলেছিল—অসম্ভব। করালীর সম্বন্ধে এমন সন্দেহ অসম্ভব।

কিন্তু তারই কদিন পরে সেই সন্দেহ আরো ঘনীভূত হ'য়ে এলো। অসম্ভব আর কিছুই মনে হ'ল না করালীর সম্বন্ধে। নানা দিক থেকে নানা সংবাদ কানে আসতে লাগলো। স্তম্ভিত হ'য়ে গেল সুরপতি সে সব শুনে।

করালী শুধু সুরপতিকে নয়, অনেককেই ফাঁকি দিয়ে গেছে। এই সঙ্গে আরো একটা সংবাদ জানতে পারলে সুরপতি এবং জানতে পেরে বজ্রাহতের মতো বসে পড়লো।—করালী তার সঙ্গে এতো বড় প্রবঞ্চনা করতে পারলে!

শোনা গেল সুরপতির নাম ক'রে সুরপতিরই এক বিশেষ আত্মীয়ের কাছ থেকে প্রায় হাজার বারোশো টাকা নিয়ে এসেছিল করালী, বছরখানেক আগে। যার বিন্দু-বিসর্গও কোনদিন প্রকাশ করেনি সে সুরপতির কাছে। মনে পড়লো সুরপতির—ঠিক বছরখানেক আগেই করালীর স্ত্রীর এবং তার ছোট ছেলেটার মরণাপন্ন অসুখ হয়েছিল। করালী তাদের রাজকীয় চিকিৎসার আয়োজনই করেছিল তখন যেন। অসুখ সারার পর কিছুদিন চেঞ্জেও পাঠিয়েছিল। সম্ভবত ওই টাকাতেই সেই খরচা চালিয়েছিল সে।

সেদিন সেই আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা হওয়ায় কথায় কথায় প্রকাশ হ'য়ে পড়লো সমস্ত ব্যাপার। সমস্ত শুনে আগুন হ'য়ে উঠলো সুরপতি। প্রতিজ্ঞা করলে—এর শোধ সে নেবেই। জব্দ সে করবেই করালীকে। কিন্তু করালীর সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না। করালী ইতিমধ্যে চাকরীও ছেড়ে দিয়েছে, কি একটা গণ্ডগোল ক'রে; সুতরাং সেখানেও কেউ তার সন্ধান দিতে পারলে না। করালীর যে সব পরিচিতদের চিনতো সুরপতি, তাদের কাছে গিয়েও পলাতক করালীর খোঁজ পাওয়া গেল না।

অবশেষে দীর্ঘ একটি বছর অনুসন্ধানের পর মাত্র গতকাল আকস্মিকভাবেই জানতে পারা গেছে করালীর কালীঘাটের বর্তমান ঠিকানা।

আর আজ প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাই ছুটেছে সুরপতি সেই পাজী বেইমান প্রতারকটাকে শাস্তি দিতে। এমন শাস্তি দেবে, যা করালী কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ভাবতেও পারেনি যে শান্তস্বভাব বন্ধুবৎসল সুরপতির মধ্যে এতোখানি নিষ্ঠুরতা থাকতে পারে! আজ কড়ায়-গণ্ডায় সমস্ত পাওনা উশুল ক'রে নেবে সুরপতি। মায়া নেই, দয়া নেই, ক্ষমা নেই। হয়তো অবস্থা বুঝে করালী তার পায়েও ধরতে পারে—হয়তো নিজের অপরাধ স্বীকার ক'রে আরো কিছু সময় ভিক্ষা করবে ঋণ পরিশোধ করার জন্যে—হয়তো সেই আগেকার মতো তেমনি ক'রে দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে চোখের জলে তার মন ভেজাবার চেষ্টা করবে; কিন্তু না—আজ সুরপতি কিছুতেই রেহাই দেবে না তাকে। সেদিন চলে গেছে—রেহাই দেবার দিন আর নেই। করালী নিজেই তার মূলোচ্ছেদ ক'রে দিয়েছে। নইলে আজ এ ভাবেই বা তাগাদায় আসতে হবে কেন সুরপতিকে। সহস্র অপরাধ ক'রেও যদি করালী সেদিন সুরপতির হাত দুটো ধরে বলতো: সুরো, দুঃখের জ্বালায় ক'রে ফেলেছি ভাই একটা অন্যায়—তুই কিছু মনে করিসনি।—তাহলে সুরপতি তৎক্ষণাৎ ভুলে যেতো তার সমস্ত অপরাধ। তাহলে শুধু দু'হাজার কেন—দশ হাজার টাকা ফাঁকি দিলেও কোন আফসোস থাকতো না—কোন অভিযোগ থাকতো না তার করালীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তা না ক'রে করালী পালিয়ে বাঁচতে গেল—তার টাকা মেরে, তার আত্মীয়স্বজনের টাকা মেরে। নিমকহারাম!

আজ সুরপতি হেস্তনেস্ত একটা ক'রে তবে ফিরবে। এর জন্যে বুড়ো বয়সে যদি মার-ধোর করতে হয় তাও স্বীকার। ছেলেবেলায় অনেক মারামারি করেছে—এবার বুড়ো বয়সেও একবার করবে না হয়। আজ হয় এস্পার নয় ওস্পার—করালীর সঙ্গে তার চরম বোঝাপড়া। মামলা মকর্দমা করতে হয় তাও না হয় করবে এবং দু'তিন হাজার টাকার জন্যে দশ পনেরো হাজার না হয় খরচাও করবে। বুঝিয়ে দেবে যে সুরপতি বন্ধুকে ভালোবাসতেও যেমন জানে, আবার বেইমান বন্ধুকে তেমনি নির্যাতনও করতে পারে।—

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মালতী বলেছিল: তোড়-জোড় ক'রে যাচ্ছ বটে, কিন্তু যাওয়াই সার হবে। বন্ধুর মুখখানি দেখে সব ভুলে যাবে তুমি। এক করতে গিয়ে, এক ক'রে বসবে, দেখো।

পাগল! মুখ দেখে ভুলে যাবার দিন ছিল অবশ্য একদিন, আজ আর নেই। মালতী এখনো চিনতে পারেনি তাকে ঠিক মতো—তার প্রকৃতির পরিচয় এখনো বোধহয় পায়নি। নইলে এমন কথা ভাবতেই পারতো না। আজ একবার করালীকে হাতের কাছে পেলে—

কিন্তু এ কোথায় এলো সে!

বাস কখন কালীঘাটে এসে পৌচেছে, কখন বাস থেকে সে নেমে এই অজানা রাস্তাটা ধরে হাঁটা শুরু করেছে জানতেও পারেনি। অন্যমনস্ক হ'য়েই হাঁটছিল সে। হঠাৎ একটা বহুশ্রুত পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে চমকে উঠলো।

—কাকু!

—কে রে—চকিতে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখতে পেলে—একটা ছেঁড়া ময়লা পা পর্যন্ত ঝুল প্রকাণ্ড পাঞ্জাবী গায়ে—পরণে কিছু আছে কি না বোঝা গেল না, একটি আট দশ বছরের শীর্ণ ছেলে রাস্তার ওদিকটায় দাঁড়িয়ে আছে জড়সড় হ'য়ে। কণ্ঠস্বর পরিচিত মনে হ'লেও ঠিক চিনতে পারলে না সে ছেলেটাকে। তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ছেলেটা বোধ হয় একটু সাহস পেলে, দু এক পা ক'রে এগিয়ে এলো তার কাছে।

—কাকু, আপনি!

কাছে আসতেই চিনতে পারলে সুরপতি ছেলেটাকে। ছেলেটা করালীর মেজ ছেলে বাঁটুল! কিন্তু এ কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে বাঁটুলের—চেনাই যায় না একেবারে। আর এই ঠাণ্ডায় একটা জামাও গায়ে নেই এর! যেটা গায়ে রয়েছে ওটা সম্ভবত এর বাপের ছিন্ন পরিত্যক্ত। ওটা মনে হচ্ছে সুরপতিই তৈরি করিয়ে দিয়েছিল যেন, করালীকে বছর তিনেক আগে।

—কোথায় যাচ্ছেন কাকু এদিকে?

তোমার বাবার শ্রাদ্ধ করতে! কথাটা বলতে গিয়েও কিন্তু বলতে পারলে না সুরপতি। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলে: কোথায় থাকিস তোরা?

—এই তো কাছেই, ওই মোড়টা পার হলেই—আপনি আর আসেন না কেন কাকু?

—তোর বাবা বাড়ীতে আছে?

—হ্যাঁ। বাবার যে খুব অসুখ।

—অসুখ! কি হয়েছে রে?

—খুব অসুখ হয়েছে। দিদি চলে যাবার পর থেকেই তো—

—দিদি!—সবিস্ময়ে ভ্রূকুটি করলে সুরপতি।—দিদি কোথায় চলে গেল তোর আবার?

বাঁটুলও খুব বিস্মিত হ'ল তার প্রশ্নে।

—বারে, আপনি বুঝি কিচ্ছু জানেন না! দিদির বিয়ে দেবে বলে বাবা যে টাকা নিয়ে এলো আপনার কাছ থেকে, সেই টাকা চুরি ক'রে সদুকাকা পালিয়ে গেল না! আর তার পরের দিন সকাল থেকে তো দিদিকেও আর পাওয়া গেল না। সবাই বলছে, দিদি নাকি গঙ্গায় ডুবে মরেছে।

শিউরে উঠলো সুরপতি। একি শুনছে সে? পাথরের মূর্তির মতো খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো সে বাঁটুলের মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে। কি একটা যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও পারলে না, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করলে। তারপর আস্তে আস্তে বললে: তাইতো—আচ্ছা চল্, কোনদিকে তোদের বাড়ি আমায় নিয়ে চল্।

—এই তো একটুখানি—আসুন না।—বাঁটুল এগিয়ে চললো, পেছনে পেছনে সুরপতি।

হাজারখানেক চিন্তা মাথার ভেতর পাক খেতে লাগলো সুরপতির। করালীর বিশন্ন রুগ্ন মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভেসে উঠলো পদ্মর মুখখানা। আহা, মেয়েটা শেষে আত্মহত্যা করলে? আর না ক'রেই বা করবে কি! বাপকে বড় ভালোবাসতো, তাই তাকে মস্ত বড় একটা ভাবনার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু সদু? করালী এই বাপ-মা-মরা দূর সম্পর্কের খুড়তুতো ভাইটাকে খাইয়ে পরিয়ে বুকে ক'রে মানুষ করেছিল! চমৎকার প্রতিদান দিয়ে গেল ছোকরা। একেই বলে দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষা!—আহা,বেচারা করালী! সারা জীবনটা কেবল দুঃখের গোলামী ক'রেই—

—কাকু!

হঠাৎ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়লো বাঁটুল। সুরপতির দিকে তাকিয়ে মিনতিভরা করুণ গলায় বললে: আমাকে চারটে পয়সা দেবেন কাকু? বড্ড খিদে পেয়েছে। ওই দোকানটা থেকে—

সুরপতির ভ্রূকুঞ্চিত হ'ল। তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এসে তার কাঁধে একটা হাত রাখলে।

—সকালে বুঝি কিছু খাসনি?

মাথা নিচু ক'রে মৃদুস্বরে বাঁটুল বললে: না। কালকে দু'পয়সা মুড়ি কিনে খেয়েছিলুম সবাই। পরশু থেকে তো আমাদের রান্না হ'চ্ছে না কি না।

—রান্না হচ্ছে না? কেন রে?

—বারে! বাবার যে অসুখ। মা বলেছে, ঘরে কিচ্ছু নেই—বাবা না সারলে আর রান্না হবে না। আচ্ছা কাকু, বাবা কতোদিনে ভালো হবে বলতে পারেন?

—কতোদিনে আবার, কালপরশু ভালো হয়ে যাবে। —বুকটার মধ্যে কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো সুরপতির। কান্না পেতে লাগলো যেন! সবলে দুর্বলতা রোধ ক'রে বললে: আর তোর বাবা ভালো না হ'লে রান্না হবে না একথা কে বলেছে? চল্ না আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে চল্ ওই দোকানটা থেকে কিছু খেয়ে নিবি।

তারপর কোথা থেকে যেন কি হ'য়ে গেল সব! কি করতে এসে কি ক'রে বসলো শেষে সুরপতি।

বাটুলের সঙ্গে সেদিন যখন একটা নোংরা সংকীর্ণ গলির ভেতরে একটা জীর্ণ বহুদিনের সংস্কারবর্জিত বাড়িতে প্রবেশ করলে সুরপতি, তখন সেই বাড়িরই একাংশে অনেকগুলি লোককে জমায়েৎ হ'য়ে চেঁচামেচি করতে শোনা গেল। হঠাৎ বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো সুরপতির। কি একটা আশঙ্কায় সারা দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো তার। তবে কি করালী—

বাটুলকে একটা কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল সম্ভবত সে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা পরুষ-কণ্ঠের আস্ফালন কানে এসে বাজলো: দয়া অনেক করা হয়েছে, আর না। আজকে কড়ায় গণ্ডায় আমার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তোমরা বিদেয় হও। একমাস থাকবে বলে ঢুকে বছর ঘুরিয়ে দিলে, অথচ একটি পয়সা ভাড়া দেবার নাম নেই। তা ছাড়া আমার বাড়িতে ও রকম বদ্-রোগ নিয়ে থাকাও চলবে না—আমার অন্য ভাড়াটেরা ঘোরতর আপত্তি করছে—

একটি রোরুদ্যমান নারী-কণ্ঠ শোনা গেল এবং শুনে বোঝা গেল নারীটি করালীরই স্ত্রী।

—আপনার পায়ে পড়ি পিসেমশাই—আর কিছুদিন সময়—

—আর একদিনও নয়, তোমরা আজই, এখুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। যদি ভালোয় ভালোয় না যাও তো বেইজ্জৎ হ'য়ে যাবে এই বলে দিলুম। ও পিসেমশাই ফিসেমশাই বলে আত্মীয়তা কাড়ানো আর চলবে না।

কটা লোক ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে সুরপতির পাশ দিয়ে বলাবলি করতে করতে চলে গেল: লোকটা আস্ত চামার। নিজের শালার মেয়ে জামাই—বিপন্ন হ'য়ে তোর আশ্রয়ে এসে পড়েছে—তায় জামাইটার অতো বড় অসুখ, একটু দয়ামায়াও কি শরীরে নেই!

পিসেমশাইয়ের কণ্ঠ আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: বলি কথা কানে যাচ্ছে কী? এমনিতে যাবে? না—

—এই অবস্থায় ছেলেপুলের হাত ধরে ওঁকে নিয়ে কোথায় যাবো পিসেমশাই!

—যেখানে খুশি।

—কিন্তু উনি একটু না সামলালে—

—উনি তোমায় একেবারেই সামলাবেন। যক্ষ্মায় আবার কেউ সামলায় নাকি।

সুরপতির মনে নেই, কখন পায়ে পায়ে গিয়ে সে পিসেমশাই এবং করালীর স্ত্রীর মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। করালীর স্ত্রী ঘরের মধ্যে কবাটের অন্তরালে দাঁড়িয়ে তার বাড়িওলা এবং পাওনাদার পিসেমশাইয়ের করুণা-উদ্রেকের চেষ্টা করছিল। সুরপতির উপস্থিতি বোধ হয় জানতে পারেনি।

অকস্মাৎ এই সময় ঘরের ভেতর একটি বালিকা-কণ্ঠ ব্যাকুল চিৎকার ক'রে উঠলো: ওমা, শিগ্গির এসো—বাবা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে!—তোমার পায়ে পড়ি বাবা, উঠো না—

পিসেমশাইয়ের মুখে একটা বীভৎস হাসি ফুটে উঠলো।

—কতো রকম বদমাইশিই জানিস তোরা বাবা! ওই টুকু টুকু ছেলে মেয়েগুলোকে পর্যন্ত জোচ্চুরিতে পোক্ত ক'রে দিয়েছে। যেদিনেই আসি, এমনি একটা না একটা ছল ক'রে আমায় তাড়ায়।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বললে: আমরা কিন্তু মশাই ওরকম রুগীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করতে পারবো না। শেষে কি—

বাধা দিয়ে পিসেমশাই বললেন: না না, সে ব্যবস্থা আজই আমি ক'রে তবে ফিরবো। লোকজন আমি নিয়ে এসেছি—সিধে কথায় না যায় তো জিনিসপত্র রাস্তায় টেনে ফেলে দিয়ে ওদের ঘাড় ধরে বাড়ির বার ক'রে দেব।

বিস্ময়ে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল এতোক্ষণ সুরপতি। মানুষের দুঃসময়ে মানুষ যে এমন হৃদয়হীনের মতো ব্যবহার করতে পারে এ যেন কল্পনাই করা যায় না। বিশেষ ক'রে এই লোকটি আবার করালীর আত্মীয়।

পিসেমশাইয়ের শেষ কথাটি কানে যেতেই সে কেমন শিউরে উঠলো। একবার ইচ্ছে করলো—লোকটার গালে ঠাস্ ক'রে একটা চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু তা না ক'রে সে আরো একটু এগিয়ে গেল তাঁর কাছে। ভ্রূকুটি ক'রে জিজ্ঞাসা করলে: ঘাড় ধরে বার ক'রে দেবেন? কিন্তু ওরা না আপনার আত্মীয়?

পিসেমশাইও ভুরু কোঁচকালেন। একজন অপরিচিত লোককে হঠাৎ এইভাবে প্রশ্ন করতে শুনে বেশ একটু বিরক্ত ও রাগান্বিত হ'লেন বোঝা গেল। মুখখানা বিকৃত ক'রে বললেন: আত্মীয়? শালার মেয়ে-জামাই আত্মীয়

আত্মীয়! আর হ'লই বা আত্মীয়; তাতেই বা কি এসে যায়? দেনা-পাওনার ব্যাপারে ও আত্মীয়-বন্ধু আমার কাছে নেই মশাই। ফেল কড়ি মাখ তেল—নিজের ছেলের সম্বন্ধেও আমার সেই ব্যবস্থা।—হ্যাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি তোরা?—পাশের কতকগুলি লোককে উদ্দেশ ক'রে বললেন: ওদের ঘর থেকে জিনিসপত্র টেনে রাস্তায় ফেলে দে। দেখি যায় কি না।

ধমকের স্বরে সুরপতি বললে: খবরদার, দাঁড়ান। এটা মঘের মুল্লুক নয়! কতো টাকা পাবেন আপনি এদের কাছে?

—কেন, আপনি দেবেন নাকি?

—নিশ্চয়ই। আত্মীয়ের প্রতি আপনার না দরদ থাকতে পারে, কিন্তু বন্ধুর প্রতি আমার যথেষ্ট দরদ আছে। কতো টাকা পাবেন আপনি?

—আঁ্যা, তা—তা অনেক—একটা ঢোক গিলে একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে পিসেমশাই বললেন: প্রায় তিনশো। তা ছাড়া এঁদের মধ্যেও অনেকে কিছু কিছু পাবেন।

—বেশ। যার যা পাওনা আছে সব পাবেন। কাল সকাল দশটার পর এই ঠিকানায় গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।—একটা নাম-ঠিকানা লেখা কার্ড পকেট থেকে বার ক'রে সুরপতি পিসেমশাইয়ের হাতে দিলে।—অবিশ্বাসের কিছু নেই, কাল ওখানে গেলেই টাকা পাবেন। যান, এখানে আর ভিড় করবেন না।

পিসেমশাইর দল কেমন যেন হতভম্ব হ'য়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সুরপতির দিকে তাকিয়ে। তারপর কি ভেবে আস্তে আস্তে বিদায় হলেন।

একটি সপ্তাহ অতীত হ'য়েছে তারপর। এই একটি সপ্তাহ কতোবড় দুশ্চিন্তা, আর কতো ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কেটেছে সুরপতির তা শুধু সুরপতিই জানে। এমন ঝঞ্ঝাট ইতঃপূর্বে আর কোনদিন ভোগ করতে হয়নি সুরপতিকে।

করালীকে সে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি ক'রে দিয়েছে মাত্র গত পরশুদিন। করালীর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা কালীঘাটের বাসাতেই এখনো আছে, অবশ্য তার নিজের রক্ষণাবেক্ষণে।

সপ্তাহটা ভোর নিজের সম্বন্ধে একটু চিন্তা করবার পর্যন্ত ফুরসুৎ ছিল না তার। সমস্ত চিন্তারাজ্য অধিকার ক'রে বসেছিল করালী আর তার পরিবারবর্গ। কিন্তু কেন?

আজ যখন সমস্ত দিকটা সামলে নিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পেলে সুরপতি, তখন সর্বাগ্রেই মনে ওই প্রশ্নটা প্রকট হয়ে উঠলো—কেন? কেন সে করালীর জন্যে এই প্রাণপাত পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করছে? করালী তার কে?—করালী নিজেও তাকে ওই প্রশ্ন করেছিল সেদিন হাসপাতালে যাবার পথে। তার হাত দুটো ধরে কাঁদতে কাঁদতে অনেক কথা বলেছিল। বলেছিল: সুরো স্বভাব-জোচ্চোর আমি নই। মানুষকে ফাঁকি দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু অভাবে পড়ে অনেককেই ফাঁকি দিতে বাধ্য হ'য়েছি ভাই। সামান্য মাইনের চাকরি ক'রে এ বাজারে কি সংসার চালানো যায়, তুই বল্? তার ওপর আমার মতো লোককে ফাঁকি দেবার লোকেরও অভাব নেই সংসারে।—একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে বলেছিল: তোর আমি কতো নিয়েছি, কতো ক্ষতি করেছি—এক্ষুণি দিয়ে যাবো বলে কতো টাকা নষ্ট ক'রে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হ'য়ে, লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে পালিয়ে আত্মগোপন করেছিলুম। ভেবেছিলুম মরে যাবো—তবু এ মুখ আর তোকে দেখাবো না। কিন্তু তুই কেন আমার জন্যে এতো করছিস ভাই। আমার মতো নেমখারাম বেইমান—

সুরপতি হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল তার কথা চাপা দিয়ে। হাসতে হাসতে বলেছিল: তোর কাছে যে আমি অনেক টাকা পাই রে। সে টাকা আদায় করতে হবে না বুঝি? সেইজন্যেই তো তোকে সারিয়ে তোলা আমার আগে প্রয়োজন। তুই না সারলে আমার টাকা শোধ দেবে কে বল? আর যতোদিন না আমার টাকা সুদ-সমেত শোধ দিতে পারবি ততোদিন তোর ছেলে-মেয়ে-বউ আমার কাছে বাঁধা রইলো।—পুরুষানুক্রমে আমরা বন্ধকী ব্যবসা করি, সুতরাং গচ্ছিত জিনিসের যত্ন আমরা নিতে জানি। তুই সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিস্।

কদিন পরে আজ একটু আসান পেয়ে নিজের ঘরে বসে ওই সব কথাই তোলাপাড়া করছিল সে মনে মনে। ভাবছিল, সপ্তাহ পূর্বের এক প্রত্যূষে কি সংকল্প নিয়ে করালীর কাছে গিয়েছিল সে, আর কি হ'ল? মালতী কিন্তু সেদিন ঠিকই বলেছিল। তার কথাই ফলে গেল শেষ পর্যন্ত।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগলো—মৃত্যুপথযাত্রী রোগাতুর বন্ধু করালীর কথা। ভাবতে লাগলো—তার পরিবারবর্গের কথা, নিজের কথা, আর সেই সঙ্গে স্ত্রী মালতীর কথা।

দ্বিজেন্দ্র নাট্য-পরিক্রমা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(২)

ঐতিহাসিক নাটক

দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইতেছে তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক। তবে এই ঐতিহাসিক নাটকও ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হইতেছে তারাবাই (১৩১০) ; টডের রাজস্থানের অনুকরণ করিতে যাইয়া ঘটনাগুলি বহুধা বিভক্ত হইয়া নাটকের সমগ্রতা নষ্ট করিয়াছে। এখনও কবি অপটু অমিত্রাক্ষর ছন্দে সংলাপ করিতেছেন, দীর্ঘ ক্রিয়াপদের প্রয়োগে রচনা মাঝে মাঝে হোঁচট্ পাইতেছে। কবি এখনও প্রহসন ও হাসির গানের যুগের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই জন্য ঐতিহাসিক নাটকের গাম্ভীর্য্য ও ভাবের একমুখিতা হাস্যরসের উচ্ছাসে স্থলে স্থলে ব্যাহত হইয়া পড়িতেছে!

তারাবাই ও পৃথ্বীরাজের মূল কাহিনীটি সূর্য্যমল ও তাহার পত্নী তমসার কাহিনীতে প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঐতিহাসিক নাটকের প্রথম চেষ্টা হিসাবে ইহাতে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিলেও ইহার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবী সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্র নাট্যের যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাত—সেই জিনিষটি সূর্য্যমলের চরিত্রের মধ্যে চমৎকার ভাবে ফুটিয়াছে। রাজ্যলাভের জন্য তাঁহার মনে দুর্নিবার উচ্চাশা আছে, কিন্তু এই উচ্চাশার প্রতিবন্ধক হইতেছে তাঁহার মনের বাৎসল্য ভাব। মনের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বাহিরের শক্তির প্রভাবে আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী তমসার উত্তেজনা তাঁহার রাজ্যলিপ্সাকে আরও শক্তিশালী করিয়া তাঁহার হৃদয়ের বাৎসল্যের বিপরীত দিকে আকর্ষণ করিতেছে। তমসার মধ্যে লেডি ম্যাক্‌বেথের প্রভাব আছে, চারিণীর ভবিষ্যবাণীও ম্যাক্‌বেথের ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়।

দ্বিতীয় নাটক দুর্গাদাস (১৩১০) : ইতিহাসের জটিল ঘটনা-পুঞ্জের মধ্য হইতে দুই একটি মাত্র ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সুসংহত নাটক রচনা করা খুব কঠিন কাজ। এই কার্য্যে দ্বিজেন্দ্রলাল খুব সফল হন নাই। বহু পরিহার্য্য উপকাহিনীকেই তিনি নাটকের মধ্যে গ্রথিত করিয়াছেন। নাটকটি সম্বন্ধে তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন "ইহার ট্রাজিডিত্ব চির-জীবনের উপাসনার নিষ্ফলতায়, আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতায়, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত চেষ্টার পরাজয়ে। ইহার ট্রাজিডিত্ব ঐ এক কথায়, "ব্যর্থ হয়েছে—পার্লাম না এ-জাতিকে টেনে তুলতে।" দুর্গাদাসকে তিনি দোষত্রুটির অতীত মানুষ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন বলিয়াই তাহা যেন খানিকটা অমানবীয় হইয়া পড়িয়াছে, বীরত্বের সুলভ আস্ফালনও অনেক ক্ষেত্রে অতি-নাটকীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলেও সে যুগের দেশাত্মবোধের প্রেরণায় ইহার অবদান সামান্য নহে। ঔরঙ্গজেবের শেষ জীবনের ব্যর্থতা ও বিষাদময়তা ইহাতে চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে। গুলনেয়ারের চরিত্রটিও খুব জীবন্ত হইয়াছে।

প্রতাপসিংহের (১৩১২) মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধের সুরটি—আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। মোঘল ব্যাঘ্রের বিরুদ্ধে রাজপুত জাতির সংগ্রামের ভিতর দিয়া সুকৌশল ব্যঞ্জনায় কবি বৃটিশ-সিংহের বিরুদ্ধে আমাদের বিপ্লবকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা এই সমস্ত নাটকের মধ্য দিয়া করিয়াছিলেন। প্রতাপের অলৌকিক বীরত্ব, অতুলনীয় দেশপ্রেম, অসামান্য ত্যাগ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য অচপল নিষ্ঠা সেদিন বাঙ্গালীর নব-জাগ্রত দেশাত্ম-বোধকে একটা অদ্ভুত প্রেরণা দিয়াছিল। এই নাটক রচনার পাঁচ বৎসর পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রতাপের দুঃখের সাধনার গৌরব বাঙ্গালীর আদর্শকে কতখানি শক্তিশালী করিয়া সেদিন আমাদিগকে সংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা আজ ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। শক্তসিংহের চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেও গ্রন্থকারের যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। টডের রাজস্থানে যাহা অপরিণত রেখা চিত্র হইয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে তাহা বর্ণে ও সুষমায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বীরত্ব, ঔদ্ধত্য, জীবনের প্রতি অনাসক্তি, পাণ্ডিত্য, ব্যঙ্গপ্রিয়তা, সমাজ ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার মধ্যে সে যুগের নব্য-বাংলার প্রাণ-চঞ্চল জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

নূরজাহান (১৩১৪) নাটকে কবি ঐতিহাসিক ঘটনা রাশিকে দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া একটা অখণ্ড শিল্পসৃষ্টির শক্তি দেখাইয়াছেন। ইতিহাসের শুষ্ক ঘটনার উপর মনস্তত্বের সূক্ষ্ম ঘাতপ্রতিঘাত এবং ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দেখাইয়া তিনি নূরজাহানের চরিত্রটি অদ্ভুতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। হৃদয় বৃত্তিও ধর্ম্মবুদ্ধির বিভিন্ন-মুখী আবেদনে, বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে, চরিত্রের জটিলতায়, রাজনৈতিক ঘটনার ইতিহাস হৃদয়ের গোপন ইতিহাসের আলোকে আরও সত্য, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শেষ দৃশ্যে এই শক্তি-শালিনী প্রভুত্বময়ী নারীর নানা শক্তির দ্বন্দ্বে ভাঙ্গিয়া পড়িবার দৃশ্যটি বড়ই করুণ। ইহা লেডী ম্যাক্‌বেথের নিঃসহায় অপ্রকৃতিস্থতার মতই মর্ম্মস্পর্শী।

ইহার পর রচিত হয় "সোরাব রুস্তম" (১৩১৫) ; ইহা প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। লেখক ইহার নাম দিয়াছিলেন নাট্য-রঙ্গ ; কিন্তু ডাঃ সুকুমার সেন ইহাকে Romantic melodramaর বেশী উচ্চ স্থান দিতে স্বীকার করেন নাই। নৃত্য গীতের প্রাচুর্য্যে ইহার মধ্যে সোরাব রুস্তমের করুণ কাহিনীটি অনেকটা লঘু ও তরল হইয়া গিয়াছে। এই নাটকটি সম্বন্ধে ডাঃ সেন মন্তব্য করিয়াছেন—"দুই রাজার ভূমিকা

carricature মাত্র, সোরাব চিত্রিত হইয়াছে অভিমন্যুর আদর্শে, রুস্তম বিলাসী যুবা, রাজান্তঃপুরের নারীরা গান গাহিতেছেন—"ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে।"

সোরাব রুস্তমের পর লিখিত হয় "মেবার-পতন" (১৩১৭); গ্রন্থের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন—"এই নাটকে আমি এক মহা নীতি লইয়াছি, সে নীতি বিশ্বপ্রেম, কল্যাণী সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী"। গ্রীক নাটকের মত একটা দুর্নিবার এবং দুর্জ্ঞেয় নিয়তি এই নাটকের চরিত্র-গুলিকে একটা অনিবার্য্য পরিণতির দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। গোবিন্দসিংহ অমরসিংহ প্রভৃতি তাহার বিরুদ্ধে অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহা দুর্নিবার তাহাই শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। তাহা হইলেও অন্ধ নিয়তি হার্ডির (Hardy) উপন্যাস-গুলিকে যেমন নিঃসহায় করুণ পরিণতি দান করে, ইহার পরিণতির মধ্যে সেইরূপ আলোক-রশ্মিহীন নিরন্ধ্র-অন্ধকার ও শ্বাসরোধকারী আব-হাওয়া নাই—"নাটকের দুঃখময় ক্রন্দনের সুর এক সান্ত্বনাময় শান্তিতে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে।"

দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার চরম পরিণতি হইতেছে সাজাহান (১৩১৭) ও চন্দ্রগুপ্তে। এই দুইটি নাটক জনপ্রিয়তায় এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পণ্ডিত সমালোচকেরা যাহাই বলুন না কেন, এই নাটকদ্বয়ের জনপ্রিয়তা যে শুধু ইহার গানগুলির মাধুর্য্যের জন্যই, তাহা হইতে পারে না। ইহার মধ্যে অন্য গুণও নিশ্চয়ই কিছু আছে। এমন শক্তিপূর্ণ কাব্যময়ী ভাষা ইহার পূর্ব্বে আর আমরা দেখি নাই; ব্যঞ্জনার গভীরতায়, গতির আবেগে, মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের উচ্ছ্বাসে, অলঙ্কারের বৈচিত্র্যে ইহারা যেন মহিমময়ী হইয়া আপন গৌরবে ঝলমল্ করিতে থাকে। কালোপমা প্রয়োগ করিয়া কবি নাটকের কুশীলবদের উক্তিগুলির মধ্যে এমন একটা ক্রমোচ্চতা (climax) সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার আবেদন অনিবার্য্য। উৎকৃষ্ট গদ্যের মধ্যে যে একটা সঙ্গীতের অজস্র মাধুর্য্য ও গূঢ় ব্যঞ্জনা থাকে, তাহার উদাহরণ দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান, চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে প্রচুর আছে।

উপমার সার্থক প্রয়োগ কবিত্বের একটা চরম পরিচয়। মহাকবি কালিদাসের উপমা জগদ্বিখ্যাত। বাংলায় দ্বিজেন্দ্রলালের উপমাও একটা পরম উপভোগ্য জিনিষ। শুধু উপমা কেন, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারেরও সার্থক প্রয়োগ তিনি বহুলভাবে করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইংরাজী Epigram ও Oxymoran অলঙ্কার দুইটিরও সুনিপুণ প্রয়োগের দ্বারা তিনি বাক্যের তীক্ষ্ণতা, আকস্মিকতা ও ইঙ্গিতকে অনেক বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে কাহারও কাহারও মতে দ্বিজেন্দ্রলালের বাগ্‌বিধি অনেকটা ইংরাজী-ঘেঁষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় তিনি ইংরাজী অলঙ্কার দিয়া জননী বঙ্গভাষার দেহশ্রী যে ভাবে সাজাইয়াছেন তাহাতে জননীর গৌরব বৃদ্ধিই পাইয়াছে এবং উত্তরকালে এই সমস্ত অলঙ্কার আমাদের জাতীয় সম্পদেই পরিণত হইবে। বাস্তবিক দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষাটিই কাব্য—তাঁহার নাটকের পাত্রপাত্রীর উক্তিপ্রত্যুক্তিগুলিই কাব্য। বলিবার মত করিয়া বলিতে পারিলে এক একটি বাক্যই যে কাব্যের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে, তাহা পাশ্চাত্য আলঙ্কারিক Croceও স্বীকার করিয়াছেন। প্রাকৃত নাটক "কর্পূরমঞ্জরী" রচয়িতা রাজশেখরও বলিয়াছেন—"উক্তি বিসেসো কাব্বো ভাসা সা হোই সা হোউ" (উক্তি বিশেষঃ কাব্যং ভাষা যা ভবতি সা ভবতু) অর্থাৎ উক্তির মত উক্তি হইলে তাহাই কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ভাষা সংস্কৃতই হউক, অথবা প্রাকৃতই হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? নাটক হিসাবে যে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর এবং বিশিষ্ট গঠনের সাহিত্য আছে—তাহার বিচারে এই বই দুইটির মধ্যে অনেক ত্রুটি দেখা গিয়াছে, দোষজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহাদের মধ্যে প্রচুর দোষের সন্ধান পাইয়াছেন, ইহাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে—

প্রথম অভিযোগ হইতেছে এই—ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। এই সম্বন্ধে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র-জীবনী-প্রণেতা দেবকুমার রায়চৌধুরী বলিয়াছেন—"তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক-গুলি অতিসাবধানতার সহিত লিখিত। কোনও স্থলেই তিনি ইতিহাসকে অতিক্রম করেন নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, সেই খানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুণতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে।"

কিন্তু সমালোচকদের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ; অধ্যাপক মন্মথ বসু বলিয়াছেন, সাজাহান নাটকের প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়—দারার মুখে ঔরঙ্গজেবের বিদ্রোহের কথা শুনিয়া সাজাহান বলিতেছেন—"এ রকম ভাবিনি, ভাবতে অভ্যস্ত নই। তাই ঠিক করতে পাচ্ছি না"। ইহা ঠিক ঐতিহাসিক সাজাহানের উপযুক্ত কথা নয়, কারণ ঐতিহাসিক সাজাহান সিংহাসনপ্রাপ্তির পর ভ্রাতা শাহরিয়ারকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য রাজপুত্রকেও বধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই জাতীয় অসঙ্গতি ইতিহাসে অমার্জ্জনীয় হইলেও ঐতিহাসিক নাটকে অমার্জ্জনীয় নহে। ঐতিহাসিক সত্য-নিষ্ঠা সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন—"নাটক রাজনৈতিক প্রবন্ধ নহে…যে সময়ের ঘটনা লইয়া যে নাটক রচিত, সেই সময়ের চরিত্রগত অভিব্যক্তি লইয়াই সেই নাটক ব্যাপৃত, ইতিহাসে কর্ম্মের পরিচয়ই মুখ্য, কিন্তু নাটকে হৃদয়ের পরিচয়ও কিছুটা থাকে।" মূল ঘটনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাট্যকারগণ ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে এই হৃদয়ের দিক দিয়া সৃষ্টি করেন" (নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা, বিভাস রায় চৌধুরী পৃ ৭২)।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

"ইতিহাসের সংস্রব উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে। ইতিহাসের সেই রসটুকুর উপর ঔপন্যাসিকের লোভ, সত্যের প্রতি তাহার কোনও খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে সেই বিশেষ গন্ধটুকু

এবং খানটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি অন্ন ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে ধনে হলুদ সর্ষের সন্ধান করেন। মশলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি ভিন, যিনি বাটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাহার সঙ্গেও আমাদের বিবাদ নাই, কারণ স্বাদই এখানে লক্ষ্য, মশলা উপলক্ষ মাত্র।" (সাহিত্য)

Hudson প্রভৃতি ইংরাজ সমালোচকও এই জাতীয় কথাই বলিয়াছেন। Hudson বলেন, ইতিহাসকে অটুট রাখিয়া যদি ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে পারা যায় তাহা হইলে খুবই ভাল হয়, নতুবা কাব্যের খাতিরে ইতিহাসকেই খানিকটা ছাড় দিতে হইবে।

বাস্তবিক সাহিত্যিকেরা বাহিরের সত্যের চেয়ে অন্তরের সত্যটাকেই বড় করিয়া দেখেন এবং পরিণামে দেখিতে পাওয়া যায়—যা ঘটে তাহার চেয়ে অধিকতর সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় কবি যাহা কল্পনা করিয়াছেন। "ভাষা ও ছন্দে" বাল্মীকির রচনা সম্বন্ধে নারদ যাহা বলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সেই বাণীটি সমস্ত ভাল কবি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি ;
যা ঘটে সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো"

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধেও এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন—"নাটক কাব্য, ইতিহাস নহে"। তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা আছে। ইতোপূর্বে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যে "সিদ্ধরসের" উল্লেখ করিয়াছি,—ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধেও দেখিতে হইবে সেই রসের ব্যতিক্রম হইয়াছে কিনা। দেখিতে হইবে, লোকপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে কল্পনার আতিশয্যে কবি সেই "সিদ্ধরসের" বিরোধিতা করিয়াছেন কিনা। আমাদের মনে হয়, সে হিসাবে তিনি রসভঙ্গ করেন নাই ; তাঁহার নাটকের মধ্যে আমরা সাজাহান আওরঙ্গজেব জাহানারা প্রভৃতির যে চিত্র পাই, আমাদের চির-লালিত ইতিহাসসিদ্ধ ধারণার দিক দিয়া তাহার বিপরীত কিছু তিনি অঙ্কিত করেন নাই, বরং ইহাদের মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের যে চিত্র পাই, হৃদয়ের দিক দিয়া তাহা বাস্তবোত্তর সত্য।

সাজাহান সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হইতেছে—ইহার মধ্যে সময় ও সংযোগস্থলের ঐক্য (Unity of time and place) নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, গ্রীক নাটক সম্বন্ধে আরিষ্টটল্‌এর ত্রিবিধ ঐক্য (three unities)গুলির নির্দেশ কি এখনও মানিয়া চলিতে হইবে? সেক্সপিয়ার হইতে বহু নাট্যকারই সময় ও সংযোগ স্থলের ঐক্য স্বীকার করেন নাই, অথচ তাঁহাদের নাটক রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। বর্তমানের বনফুলের শ্রীমধুসূদন প্রভৃতি জীবনী-নাটকে, তারাশঙ্করের দুই-পুরুষ প্রভৃতিতেও এই সময় ও স্থানের ঐক্য মানিয়া চলা হয় নাই, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ নাটকগুলি ব্যর্থ হয় নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে, ক্রিয়া প্রবাহের ঐক্যের (unity of action) অভাব নাটকটির রসহানি করিয়াছে কিনা। সমালোচকেরা বলেন, তাহা করিয়াছে। নাটকটিতে সমগ্রতা নাই, ইহা আলগাভাবে গ্রথিত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমষ্টি মাত্র। সাজাহান নাটকটি দারা-নাটক সুজা-নাটক ও সাজাহান-নাটক। শুধু তাহাই নহে, ইহার মধ্যে প্রথম অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কের ৬ষ্ঠ দৃশ্য ও চতুর্থ অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্য অর্থাৎ যোধপুর-রাজ যশোবন্ত সিংহ ও তাঁহার পত্নী মহামায়ার দৃশ্যগুলি মূল নাটক হইতে অনায়াসেই ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সমালোচকেরা ভুলিয়া গিয়াছেন যে মহামায়ার দৃশ্যগুলি এখনকার নির্জলা রসবিচারে বাদ দেওয়া যাইলেও সে যুগের চাহিদার বিচারে তাহাকে বাদ দেওয়া যায় না। এই দৃশ্যগুলি হইতেই সে যুগে আমরা দেশাত্মবোধের খোরাক পাইয়াছি, এই দৃশ্যগুলির মধ্যেই আমরা "ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" অথবা "সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির" প্রভৃতি প্রাণমাতান গানগুলি পাইয়াছি। এই গানগুলির জন্যই সে যুগের শ্রোতারা উৎকীর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিত এবং এই গানগুলি শুনিলে তাহাদের ধমনীতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি হইত। সে যুগে শত আলঙ্কারিকের নির্দেশেও তাহারা এই দৃশ্যগুলি সাজাহান হইতে বাদ দিতে রাজী হইত না। বস্তুতঃ সাজাহানের ভাগ্য-বিপর্যয়ে অথবা দারা সুজা আওরঙ্গজেব প্রভৃতির ভ্রাতৃ-বিরোধে আমাদের আগ্রহ ততটা নাই, যতটা আছে মহামায়ার তেজস্বিতায় ও দেশাত্মবোধের প্রেরণায়। শ্রোতারা সেইদিন এই জিনিষটিই চাহিয়াছিল এবং দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাই দিয়াছিলেন।

সাজাহান সম্বন্ধে তৃতীয় অভিযোগ হইতেছে, ইহার মধ্যে সংলাপের কৃত্রিমতা। তাঁহারা বলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা সব সময়েই দরবারী পোষাকে সজ্জিত থাকে, আটপৌরে শাড়ী পরিতে জানে না। হিন্দু মুসলমান, পণ্ডিত মূর্খ, দাসী ভৃত্য সকলেই প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করে। ইহার ফলে ভাষাটা অনেকটা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। কথাটা হয়ত খানিকটা সত্য হইতে পারে। তবে একথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কুশীলবদের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার পাচক, মেদিনীপুর জেলার ঝি, কিংবা চট্টগ্রাম জেলার মাঝি-মাল্লা প্রভৃতির ভাষার বিভিন্নতার অবকাশ নাই। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ অথবা গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকে সংলাপের বৈচিত্র্যের যে সুযোগ ছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের তাহা ছিল না এবং সাজাহান নাটক উপভোগ করিবার সময় এই বৈচিত্র্যের অভাবটুকু আমরাও ঠিক বুঝিতে পারি না। বাস্তবিক সাধারণ লোকের নিকট মোঘল সম্রাট্ সাজাহানের জগৎ একটা অতি-প্রাকৃত জগৎ, সুতরাং তাহার ভাষাও একটু অসাধারণ না হইলে যেন ঠিক মানায় না।

চতুর্থ অভিযোগ হইতেছে—সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকা মাত্র, সুতরাং ইহার নামকরণ ঠিক হয় নাই, ইহার নাম হওয়া উচিত ছিল 'জাহানারা' নাটক। নামকরণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের যে আপত্তি—এই জাতীয় আপত্তি একদিন সেক্সপীয়রের "জুলিয়াস সীজার" নাটক সম্বন্ধেও হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছিলেন, ঐ নাটকটির নাম হওয়া উচিত ছিল "ব্রুটাস্" নাটক, আবার কেহ বলিয়াছিলেন ইহার নামকরণ হওয়া উচিত ছিল "ক্যাসাস্" নাটক। কিন্তু পরে

দেখা গিয়াছে, পণ্ডিত সমালোচকদের চেয়ে কবির দৃষ্টিই অন্তর্দৃষ্টিতর ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। নাটকটি সাজাহান না হইয়ে দারা সুজা আওরঙ্গজেব জাহানারা মোরাদ প্রভৃতির কাহিনীর গাঁথুনি আলগা বলিয়া মনে হইত। বৃহৎ পরিবারের একান্নবর্তিতা যেমন বৃদ্ধ গৃহস্বামীর শুধু অস্তিত্বের জন্যই বজায় থাকে, সাজাহানের প্রভাবও সেইরূপ আওরঙ্গজেব প্রভৃতির পরস্পর-বিরোধী শক্তিগুলিকে একত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছে। লক্ষঝম্প হানাহানি না করিলেও তাহাকে নিষ্ক্রিয় বলা যায় না। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে ষাঁড় মহেশের কোনও সক্রিয় অস্তিত্ব নাই, প্রভাতকুমারের 'আদরিণী' গল্পে আদরিণী হাতীটিও কাজ বিশেষ কিছুই করে নাই, অথচ ইহাদের নামেই গল্পের সার্থক নামকরণ হইয়াছে। কাজ না করিলেও কাব্য-রসের প্রাণকেন্দ্র বলিয়াই তাহাদের নামেই গল্পগুলি যথার্থনামা হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পে "আসলে" খোকাবাবু বাস্তবিক প্রত্যাবর্তন করে নাই অথচ রবীন্দ্রনাথ গল্পটির নামকরণ "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন"ই করিয়াছেন স্রষ্টা সাহিত্যিকের রসবোধ দোষজ্ঞ আলঙ্কারিকের চেয়ে বেশী সাজাহান নাটকের নামকরণ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়।

(ক্রমশঃ)

গৌর-পূর্ণিমা

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

হে প্রভু, তোমার জন্মবাসরে তোমারে প্রশ্ন করি,
মিথ্যা কি হবে প্রেম?
কয়লার মত ময়লা হইয়া র'বে কি গৌর হরি
মানব-হিয়ার হেম?
চোখের সামনে দেখি দিকে দিকে
হেলায় হারায়ে হৃদয়-মাণিকে
হারায়ে শ্রদ্ধা প্রীতি-ভালবাসা বিত্তেরে লয়ে তুলি
লোভাতুর নর সাজিছে পিশাচ, ঠাকুর, তোমারে ভুলি!
ভালোবাসিবারে শিখাইলে তুমি, এ কি তার পরিণাম?
মিথ্যা কি হোলো শিক্ষা তোমার, বৃথা কি হে হরিনাম?

যেবা যারে পায় আগে পাছে পাশে
বিকারবিহীন হয়ে তারে নাশে
স্বার্থের আশে বলি দেয় সদা মানুষের অধিকার
নিবু নিবু হয় প্রদীপ তোমার, ঘনায় অন্ধকার।
হে প্রভু তোমার জন্মবাসরে আজি এ পূর্ণিমায়—
গ্রহণ-লাগা এ আঁধার আকাশে সবে বারে বারে চায়,
ভাবে, পুন হবে তব আগমন
মলিন পংক হবে চন্দন
দুর্বার লোভ দূর করি দিয়া পূত-প্রেম-মহিমায়
জন্মিবে তুমি মূঢ় মানুষের হৃদয়ের নদীয়ায়।

অনাগত

আশা দেবী

কোনো একদিন
ম্লান ছায়া শীতার্ত সন্ধ্যায়
বিশীর্ণ নদীর ধারে মৃত ঝাউবনে
ম্লান আঁখি অশ্রু ছল ছল
কিংশুকের কঙ্কাল শাখায়
ঝরে-পড়া কুঁড়ি আর গানহারা পাখীদের ডাকে
তুমি যেন ডেকেছিলে কাকে।
তুমি যেন ডেকেছিলে কাকে:
অহল্যা মাটির বুকে শ্যাম-শস্য স্বপ্ন-কামনায়—
অন্ধকার রুদ্ধ-দ্বার ঘরে
জ্বেলে দিতে গন্ধ দীপ—খুলে দিতে দক্ষিণের দ্বার।

সে তবু আসেনি ফিরে কাছে
পলাতক পদধ্বনি পূর্ণ করে রাতের প্রহর
বিন্দু বিন্দু ঝরে যাওয়া শিশিরে শিশিরে
কুয়াশার যবনিকা বিচ্ছেদের আবরণ টানে;
পাণ্ডু চাঁদ নিভে আসে মৃত মুখে হাসির মতন,
শুধু কোন্ বৈতরণী অন্ধকারে ঝিল্লীমন্দ্র কোলে—
বসন্তের শরাসনে মৃত্যু-মন্ত্র জপে কাপালিক।
হিমার্ত মাটির বুকে পড়ে থাকে কবন্ধ-কামনা
ছিন্ন শীর্ণ বক্ষে তার উঁকি মারে পিশাচ প্রভাত।

ওলন্দাজের দেশে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

গত ১১ই ভাদ্র নিরানন্দময় জার্মানীর কলোন সহর ছেড়ে আমরা ওলন্দাজের দেশে যাত্রা করলাম। রাইন নদীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম সুইজারলাণ্ডে। সাফহাউজেনের সন্নিকটে তার বিরাট দেহের উল্টে পড়া দেখেছিলাম। সে বিশাল জল-প্রপাত। নদীর কুলে কুলে জার্মানীর ব্ল্যাক ফরেষ্টের ভিতর দিয়ে ঐ প্রখ্যাত দেশের যে জীর্ণরূপ দেখেছি সে কথা অন্য একদিন বলব। লোকের মুখে হাসি নাই। কোনো সহরে শতকরা পঁচিশখানা পূর্ণাঙ্গ বাড়ি নাই। কৃষ্ণ-কাননের ঘনবনের এক ভাব—আলোকে

চারদিকে জল-বেষ্টিত ছোট ছোট বাগিচা ও বাড়ি

রোধ ক'রে ছায়াকে প্রাধান্য দিচ্ছে। বহুদিনের বন, তাই প্রফুল্ল নব-হরিত বর্ণ নাই। সেই কারণে এই উপভোগ্য বন-রাজির নাম—ব্ল্যাক ফরেষ্ট, কৃষ্ণ-বন।

বিলাতের অটোমোবিল এসোসিয়েসন আমাদের যে পথের নির্দেশ দিয়েছিল, সে পথে কলোনে রাইন পার হ'য়ে তার পূর্ব-কুলের পথে হলাণ্ড প্রবেশ করা যায়। প্রায় ১০০ মাইল দূরে হলাণ্ডের সীমানা। সেখান থেকে আন্দাজ ৬০ মাইল দূরে এমস্টারডেম্—রাজধানী।

ডোম হোটেলের অধ্যক্ষ বল্লেন—আমাদের দুরবস্থা তো অনেক সহরে দেখেছেন। এপথে মাত্র বড় সহর ডুসেলডর্ফ। এপার দিয়ে গেলে পরপারে তারও দুর্দশা দেখবেন, আরও দেখবেন—নয়েস, কেফিউজ, ক্লেভ প্রভৃতি। অথচ ভিড় কম পাবেন। পথও কিছু কম।

সোজা পথ। রাস্তার নির্দেশ দিলে। আমাদের গাড়ি অপেক্ষাকৃত কম-ভিড়ের পথে বেশ সবেগে ছুটলো। যা' বলেছিলেন ভদ্রলোক তাই। ধ্বংশ! ধ্বংশ! ধ্বংশ! মহাত্মা গান্ধীই সত্য। কিন্তু অকস্মাৎ প্রায় চল্লিশ ক্রোশ ছুটে এসে দেখলাম, রাইন নদী বামে মোড় ফিরে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অপর রাস্তা বা সেতুর কোনো সন্ধান নাই। কী সর্বনাশ! হোটেলের অধ্যক্ষ কি রসিকতা করলে নাকি?

সন্নিকটে একটা ভোজনালয় ছিল। তার দুয়ারে আঘাত করলাম। এক ম্লান-মুখ মহিলা এলেন—জার্মান ভিন্ন অন্য ভাষা বোঝেন না। আমি অমন ক্ষেত্রে বাংলা বলি। কিন্তু বিপদের সময় পুত্র আমার ইংরাজি এবং হাত-নাড়া ভাষায় বিপত্তির মাত্রা বোঝালে। এবার তাঁর শীর্ণ-মুখে হাসি ফুটলো। তিনি আমাদের একটা পারঘাটা দেখালেন। সত্যই তো এক বৃহৎ জাহাজে একখানা মোটর এপারে আসছে। মোট কথা আমরা সেই জাহাজে স-পরিবার গাড়ীসহ ওপারে গেলাম। পারের কড়ি দু'টাকা মূল্যের মার্ক।

রাইন বেঁকে পশ্চিমমুখে বহে যাচ্ছে। পরে দু-ভাগ হ'য়ে, অন্য স্রোতস্বতীর সঙ্গে মিশে উত্তর সাগরে দেহ মিলিয়েছে।

রাইন উপত্যকা মনোরম। এবার আমরা ঐ নদীর কুল ছেড়ে অনতিদূরে ওলন্দাজের দেশে প্রবেশ করলাম।

আমাদের এবারের ভ্রমণে বহু কাষ্টমস্ বেষ্টনী পার হ'তে হয়েছে। দুবার ফ্রান্সে, দুবার সুইজারল্যাণ্ডে এবং এক একবার ইটালি, জার্মানী, হলাণ্ড, বেলজিয়ামে প্রবেশ করতে হয়েছে। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড বা এয়ারাতে আমি একেলা গিয়াছিলাম। সুতরাং তিনবার ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করতেও হ'য়েছিল। ওসব দেশের কর্মচারীদের ব্যবহার বড় মধুর। কথায় বিশ্বাস করে, কখনো একবার একটা বাক্স খোলে। হাত দিয়ে দু একটা কাপড় উল্টে, যতশীঘ্র সম্ভব বিদায় দেয়। দেশের লোকেদের একটু অধিক পরীক্ষা করে, কারণ তারা স্থায়ী বাসিন্দা। লোকে দু'একটা মাল বিনা শুল্কে দেশে আনে নিশ্চয়। কিন্তু আমরা মাত্র ভ্রমণকারীর দল—আমাদের মাল পরীক্ষা নাম মাত্র। দমদমার বিমান ঘাঁটি থেকে বাহিরে আসতে আমাকে এক ঘণ্টা কষ্টভোগ করতে হ'য়েছিল, যদিও আমি ছেলেদের জন্য কি খেলনা এনেছি তার তালিকা দিয়েছিলাম এবং একত্র করে দেখিয়েছিলাম। গ্রামের যোগীর ভাগ্যে ভিক্ষালাভ অসম্ভব।

আমরা এল্টেনে প্রথম ওলন্দাজদের সহর দেখলাম। য়ুরোপের যেমন সর্বত্র—তকৃতকে টক্‌টকে সহর, কতক সেকালের বাড়ি, কাঠের কাঠামো কিন্তু সিমেণ্ট বালিতে তৈরি, আর কতকগুলি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নূতন ধরণের। কিন্তু অন্যান্য বহু সহরের মত সেখানেও এক পঞ্চদশ শতাব্দীর পুরাতন ধর্মভবন বিদ্যমান।

তার পর বড় সহর আরণহাইম। কিন্তু পথের দুদিকে চাহিলে মনে হয় যেন বাংলাদেশ দিয়ে যাচ্ছি। পথে চাষের ক্ষেত—নদী-মাতৃকা দেশ। পথের ধারে টেউলিপ ফুটে আছে। এক একটা মাঠে অজস্র টিউলিপ কিন্তি। কিন্তু সর্বদাই মাঠ যেন ভিজে।

বলছিলাম হলাণ্ড বাংলাদেশ স্মরণ করিয়ে দেয়। সে কথা বিস্তৃত শস্য-ক্ষেত্র সম্বন্ধে সত্য। ভারতের কুটীর পাশ্চাত্যের কোথাও নাই। ওরা যাকে কুটীর বলে, আমাদের ভাষায় সে অট্টালিকা। অত্যন্ত গরীবের ঘর কাঠের তৈরী। যেমন দার্জিলিঙ প্রভৃতিতে দেখা যায়। তেমন গৃহও দৃঢ় এবং সুদর্শন। সুইস কটেজ—চমৎকার কাঠের সুদৃশ্য গৃহ, কাঠের গড়ানে ছাদ, কাঁচের জানালা, আর সুন্দর পালিসকরা প্রাচীর। ঘরের ভিতর রঙীন কাগজ আঁটা, কিম্বা তেলের রঙ করা।

মধ্যবিত্ত ঘরের রমণীরাও তাদের ছেলে-মেয়েরা বাজারের সেরা পোষাক পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারাদিতে সুসজ্জিত অবস্থায়

আর পথের কথা। হলাণ্ডের যে পথে গেলাম সেটি পরিষ্কার। উপরে টার দেওয়া এবং দুদিকে ঘন গাছের বেড়া। পথে গরুর গাড়ি নাই এবং পথচারী যাত্রী পথ ছেড়ে গাড়ির পথে চলেনা। কোথাও কোথাও ফেরো-কনক্রিট রাস্তা। দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করে রাজপথের প্রাচুর্যে। রাজপথের শৃঙ্খলা এবং পরিচর্যার ব্যবস্থা সভ্য দেশে এক প্রধান কর্তব্য বিবেচিত হয়। তার ফলে দেশের সর্বত্র পণ্য সরবরাহ এবং তাদের মূল্যের সমতা রক্ষা হয়।

হলাণ্ড নাম কেবল উত্তরাংশের। ও দেশের লোক নিজেদের দেশকে বলে নেদারল্যাণ্ডস—নিম্নভূমি। কারণ ভিতরে সমুদ্রের ধারে গেলে বোঝা যায় যে ওলন্দাজেরা নেদারল্যাণ্ডস হতে বাঁধ বেধে সমুদ্রকে সরিয়ে রেখেছে। দেশের অধিকাংশ ভাগ সমুদ্রের জলের উচ্চসীমা হ'তে দশ ফিট নীচে। তাই এদেশের নাম—হলোল্যাণ্ড—গর্তের দেশ বা নেদারল্যাণ্ড—নিম্নভূমি। জাতি—ডচ। আমরা সমাস ক'রে শব্দের রদ-বদল ক'রে করেছি ওলন-দাজ বা হলাণ্ড ডাচ।

একদিন উত্তর সাগর অভিযান করে হলাণ্ডের এই অংশ ভাসিয়ে দিয়েছিল। তার পর সাগরে আর ডাচে দ্বন্দ্ব প্রবল। বহু শতক যুদ্ধ—এক এক জায়গায় সুবিধা পেলেই মানুষ বাঁধ বাঁধে। সাগরের জল ছেঁচে ফেলে দেয় নদীতে বা সাগরে। জমিতে শস্য ছড়ায়, বীজ হতে আবার শস্য হয়, ফুল হয়। এইরূপে বহু জমি সাগরের গ্রাস হ'তে উদ্ধার হ'য়েছে। তারপর যেমন সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি হ'ল—বাঁধের রূপও হ'ল বিশাল ও দৃঢ়।

এই অবিরাম দ্বন্দ্বের চিহ্ন দেশে দেখতে দেখতে আমরা রাজধানীর দিকে চললাম। নদী এবং খালের প্রাচুর্য। তাদের মাঝে কলের জাহাজ চলছে। মাঝে মাঝে গ্রাম—গাছে-ঘেরা কুটীর। কিন্তু সর্বত্র উইণ্ড-মিল বা পবন চক্র।

জল ছেঁচার কাজে এই বায়ব যন্ত্রের সহায়তা ডাচের শ্রম লঘু করেছে। হাওয়ায় প্রকাণ্ড পাখা ঘুরছে। তার সঙ্গে সংযুক্ত পাত্র কূপ হতে জল তুলে নদী বা খালে ফেলছে। মাঠের জল গড়িয়ে গিয়ে কূপে পড়ে। সুতরাং একটু হাওয়া চললেই সেচ-কার্য বেশ চলে। হলাণ্ডের এই কার্য্য বিখ্যাত। ইটালীতে পবন-চক্র দেখেছি লম্বার্ডিতে। তার কাজ নদী নালা হ'তে জল ছেঁচে মাঠে ছড়ান।

আমষ্টারডামে পৌছবার পথে দু'একটা গ্রামে দেখলাম—ইন্দোনেশীয়। এরা বোধহয় আমাদের দেশের এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানের মত ইন্দো—ডচ। ডাচ যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি হারিয়েছে, তাদের খৃষ্টীয় বন্ধুরা হলাণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা পথে তেমন একজনের নিকট হ'তে বেনজীন বা পেটেল নিলাম। লোকটি বললে সে যোগর্তা হ'তে পালিয়ে এসেছে। আমষ্টারডাম সহরে ঐ জাতীয় বহু ব্যক্তি দেখলাম—পুরুষ ও স্ত্রীলোক। ওদের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে কলোনী আছে। সেখানকার ঘোর কৃষ্ণবর্ণের নারীও জন কতককে রাজধানীতে দেখা যায়। লণ্ডনে ইংরাজের উপনিবেশ হ'তে দলে দলে কালো ছেলেমেয়ে পড়তে আসে।

আমষ্টারডামে পৌছে হোটেলের পাড়ায় গিয়ে মনে হ'ল—ভেনিস। সহরের মাঝে বহু খাল ও নদী। জাইদারজির সঙ্গে তাদের সংযোগ, একটা বড় পল্লী একেবারে ভেনিস। নদীর দু'দিকে বড় বড় প্রাসাদ। মাঝে বহু জাহাজ ও নৌকা চলছে। কতকগুলি ট্যাক্সির কাজ করে। তবে ভেনিসের খালে মোটর বোট যেমন বাসের বা ট্রামের কাজ করে তেমন রীতিমত যাত্রীবাহী জাহাজ নাই। এরা সখের যাত্রীকে আধঘণ্টা অন্তর সহর ঘুরিয়ে, জাহাজ ঘাঁটি দেখিয়ে নিয়ে আসে। সেদিন বৃষ্টি হ'চ্ছিল, আমাদের বেশী ছবি নেবার সুবিধা হয়নি। (ক্রমশঃ)

গান

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

আকাশ তুমি কোন ইসারায় আমায় ডাকো এমন ক'রে,
শিশির-ধোওয়া, সমীর-ভরা, শিউলি-ঝরা শরৎ-ভোরে।
তোমার বুকে নীলের মায়া,
আমার চোখে ঘনায় ছায়া,
সেই ছায়াতে বেদন-বাণী ধরার বুকে পড়ুক ঝ'রে।

তোমার বুকে ভাসায় সুখে ওই যে ভাসে মেঘের ভেলা,
আমার বুকে হেথায় রাজে শতেক স্মৃতি বিষাদ-মেলা।
আকাশ তুমি আমায় ডাকো,
আঁখির আলোয় বেদন ঢাকো,
বাঁধন-হারা জীবন-আলোয় ধরার বাতাস উঠুক ভ'রে।

(পূর্বানুবৃত্তি)

ন্যায়রত্ন হাসিলেন। বলিলেন—হবারই কথা। আক্রোশ আমার উপর অরুণার উপরিই হবে। কিন্তু স্থান ত্যাগ তো করতে পারব না সেন মহাশয়।

দেবকী সেন বলিল—আপনি কি জয়তারা আশ্রমের কথা ভাবছেন ?—

—ভাবছি বই কি।

—সে ভাবতে আপনাকে হবে না। আশ্রম আমরা রাখব। জঙ্গলের চারিদিকে এরই মধ্যে অন্ততঃ একশো লোক এসে গিয়েছে। আরও আসছে। এখানে যদি ঢোকে তবে জানবেন জংসনের সমস্ত হিন্দু মরে গিয়েছে। কেউ বেঁচে নেই।

—তবে আমাকে যেতে বলছ কেন ?

—বলছি—অন্য কারণে। বন্দুক বেরিয়েছে, বন্দুক আরও বেরুবে। গুলি ছুটবে। তা ছাড়া এই রক্তারক্তির মধ্যে আপনি কি শান্তি পাবেন ?

—তা হয় তো পাব না। পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু তবু থাকব আমি সেন। তুমি বরং অরুণাকে কোন নিরাপদ স্থানে রেখে এস।

অরুণা বলিল—না দাদু, আমি যাব না। আমিও এইখানেই থাকব।

দেবকী সেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, বলিল—দেখুন আমার কিন্তু সময় নেই। যা' স্থির করবার ক'রে ফেলুন। আমার অনেক কাজ! আজই শেষ রাত্রে সে কাজ আমাকে শেষ করতে হবে।

তাহার চোখ দুইটা ঝকমক করিয়া উঠিল। একটা নিষ্ঠুর সংকল্প সে ঝকমকানির মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া আবার মুখ লুকাইল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—সেন!

—ঠাকুর মশাই।

—তুমি কি—

—আপনার কাছে লুকোবার কিছু নাই—আমি ওই যে কানপুরিয়া মুসলমান ফৈজুদ্দিন—যার খুব বড় মনিহারীর দোকান আছে, তার বাড়ীতে আগুন ধরাব। তার সঙ্গে আমার বুঝা পড়া আছে। অনেক দিনের।

অরুণা এবার বলিয়া উঠিল—না—না—। এ আপনি কি বলছেন দেবকীবাবু? এই সর্বনাশা-দাঙ্গা—এই গৃহবিবাদ—

—মিটে যাক। শান্ত হোক হিন্দু মুসলমান। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। কিন্তু ওর সঙ্গে বুঝা-পড়াটা আমার ব্যক্তিগত। এই তার সময়। এ গেলে আর আসবে না। পাব না। এই বোঝাপড়ার জন্যে আন্দামান থেকে ফিরে বহু সন্ধান করে এসেছি এখানে। অরুণা দেবী, আমার নালিশের আপোষ নাই, আমার যুদ্ধের সন্ধি নাই, মার্জ্জনা নাই। জানেন আমি যখন আন্দামানে ছিলাম তখন আমার একটি মাত্র বিধবা ভগ্নী—সংসারের একমাত্র বন্ধন—তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল একদল বর্বর, তার সন্ধান আর পাই নি, জানেন ?

—জানি দেবকীবাবু, কিন্তু—

—কিন্তু কিছু নেই অরুণা দেবী, ওই ফৈজুদ্দিনের বড় ছেলে—সেই—সেই ছিল দলের নেতা। আমাদের ওখানে তখন ওদের চামড়ার ব্যবসা ছিল। আমি যখন ফিরলাম তখন ওদের চামড়ার ব্যবসা ফেল হয়েছে। ওরা নাই। কানপুর গিয়ে সন্ধান করলাম—সেখান থেকে এখানে। এখানে ওরা এসেছে তখন। আমি এলাম এখানে। আজ চৌদ্দ বছর এখানে বসে আছি দেখা করবার জন্য। দেখা করব না? —শুধু তাই নয়। শুধু ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই যাচ্ছি না। ভাই-ফোঁটা আনতে যাচ্ছি। আমার

বোন আজও ওর বাড়ীতে রয়েছে। তার হাতে একটা তিলক পড়ে আসব। চন্দন ঘষতে হবে না। আমি যাই, আপনারা সাবধানে থাকবেন।

পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল—তাই বা বলা কেন? মানুষের অহঙ্কার! যা হয় করবেন আপনারা। দেবকী সেন দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। অরুণা বিস্ময়ে আবেগে অভিভূত হইয়া তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমার নালিশের আপোষ নাই, আমার যুদ্ধের সন্ধি নাই, মার্জ্জনা নাই; কথা কয়টা তাহার কানের পাশে বাজিতে লাগিল। এত বড় আঘাত যা এই সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছরেও এতটুকু মিলাইয়া যায় নাই! মানুষ লইয়াই তো সমাজ, সমাজ লইয়াই জাতি। মানুষে মানুষে সমাজে সমাজে এমন ঘাত প্রতিঘাতের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ফলেই আজ এই পরিণতি! তবু তাহার বিশ্বাস আছে, বিগত এক শতাব্দীর ইতিহাসে যে মিলনের চেষ্টা হইয়াছে তার ফল এই দুর্দ্দিনের পর দূর ভবিষ্যতে একদিন ফলিবেই।

এক জন কেহ আসিয়া দাঁড়াইল।

—কে?

—আমি গৌর।

অরুণা তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তরুণ বনে উপনীত গৌর দেবকী সেনের মতই একখানা রুমাল হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার রুমালেও রক্তের চিহ্ন! গৌর দেবুর শিষ্য; অরুণা জানে দেবু আজও এই মুহূর্ত্তে তাহার দল লইয়া এই দাঙ্গা নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। হিন্দু মুসলমান নেতাদের লইয়া শান্তি কমিটি গঠন করিবার জন্য দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেছে। শ্লোগান তৈয়ারী করিতেছে। পোষ্টার লিখিতেছে। সে মনশ্চক্ষে দেখিতেছে—স্বর্ণ তাহাকে সাহায্য করিতেছে। তীব্রকণ্ঠে কঠিন নিন্দা এবং সমালোচনা করিতেছে—এই সাম্প্রদায়িকতার। শ্রমিক অঞ্চলে তাহাদের কর্ম্মীরা ফিরিতেছে এবং এখনও পর্য্যন্ত সেখানে তাহারা দাঙ্গা বাধিতে দেয় নাই। সে চেষ্টা সফল হইবে বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস, কিন্তু অরুণা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ওখানেও বাধিবে। আর দেবুদের এই চেষ্টার কোন বড় মূল্যও দেয় না অরুণা। কি করিয়া দিবে বড় মূল্য? তাহারা তো রক্তপাত—হত্যায় অবিশ্বাসী নয়। সে শিক্ষা তো তাহারা কোনদিন দেয় নাই। তাহারা তো এর চেয়েও বড় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চায়, রক্তের নদী বহাইয়া দিয়া সমস্ত কিছু ভাঙিয়া চুরিয়া সমান করিয়া দিতে চায়! তবে? তবে তাহাদের বক্তব্য সেই বড় রক্তপাতের প্রতীক্ষায়—এই ছোট রক্তপাতটা স্থগিত রাখা। এই রক্তপাতের উন্মাদনাটাকে আরও লালিত করিয়া সবল করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বদলে রাজনৈতিক বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ডে পরিণত করিতে চায়।

ফল তাহার আছে!

বৃহৎ—বিপুল এক সাম্যবাদী দেশ।

অরুণার প্রিয়তম—বিশ্বনাথের জীবন স্বপ্ন, অরুণার জীবন স্বপ্ন! কিন্তু তবু অরুণার ওই রক্তপাতে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। রক্তপাত, যুদ্ধ, একটা আর একটাকে টানিয়া আনে। আনিবেই। আজ, না হোক—কাল। একটা যুদ্ধ আর একটা যুদ্ধের ভূমিকা রচনা করে। একটা বিপ্লব আর একটা বিপ্লব আনে। আদর্শের জন্য না হোক—দলগত প্রাধান্যের জন্যও আসে।

এই কয়েক বছরের জীবনে—এই বৃদ্ধের কাছে সে অনেক শুনিয়াছে; সব সে যুক্তি দিয়া সত্য বলিয়া—মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই, কিন্তু হৃদয় দিয়া না মানিয়া পারে নাই। একদিন কাব্যালোচনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—ভাই—তোমরা অনেক বিদেশী সাহিত্য কাব্য পুরাণ পাঠ করেছ। আমি তা পড়ি নাই। কিন্তু এক মহাভারত পড়েই মনে হয়েছে এরপর আর হয় না। সমস্ত জীবনটা ওই ভারত-কথা উপলব্ধি করতে করতেই কেটে গেল। ব্যাসদেবের তুল্য দিব্য-দ্রষ্টার সার্থক-বিধাতা স্রষ্টা আর কেউ হয় না। কৃষ্ণ চরিত্রের কথা ভাবি আর বিস্ময় লাগে। ব্যাসদেব তাঁকে পরমপুরুষ বলে সৃষ্টি করলেন। তাঁর কল্পনার তাঁর অনুভূতির দিব্য-দর্শনের পরম পুরুষ। তিনি বিভীষণকে—অর্জ্জুনকে—বিশ্বরূপ দেখালেন। কুরুক্ষেত্রে গীতা শোনালেন অর্জ্জুনকে। বললেন—আমি এদের মেরে রেখেছি—তুমি মাত্র নিমিত্ত—শরক্ষেপ ক'রে লৌকিক মৃত্যু ঘটাবে মাত্র। বললেন আমিই সেই—সব ভাবনা পরিত্যাগ করে আমার স্মরণ নাও। বললেন—যুগে—যুগে আমি—লোকক্ষয়ের জন্য আবির্ভূত হই। যুদ্ধ তুমি

কর, এর কোন পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের পর গান্ধারী যখন অভিসম্পাৎ দিলেন—যে আমাকে যেমন তুমি দিলে বংশনাশের নিষ্ঠুর সন্তাপ—আমার অভিসম্পাতে তোমাকেও পেতে হবে অনুরূপ সন্তাপ। বিধাতার স্রষ্টা—ব্যাসদেব, কি সূক্ষ্ম তার বিচার, তিনি তাঁর কল্পনায় পরমপুরুষকে এই আঘাতের ফলে প্রতিঘাতের অমোঘ নীতির ফল থেকে অব্যাহতি দিলেন না। জ্ঞাতি কলহে—কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধে কুরুক্ষেত্র, তাতে পঞ্চপাণ্ডব ছাড়া বাকী সব শেষ হয়েছিল। এ যুদ্ধের মূলে ছিলেন—কৃষ্ণ। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে—সমুদ্রতটে দ্বারকায় হ'ল প্রভাস। এক নিজের কুলে—আত্মকলহে যদুবংশ একদিনে ধ্বংস হয়ে গেল। শুধু তাই নয়। দ্রোণ মিথ্যা পুত্রশোকের সংবাদে বিচলিত হয়ে অস্ত্র ফেলে দিলেন, চোখ থেকে নেমে এল পুত্রশোক সন্তাপের অতি উষ্ণ শোকাশ্রু। তিনি যোগাসনে বসলেন রথের উপর। তবু ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়ে তাঁর শিরচ্ছেদ করলে। কর্ণ নিরস্ত্র—পৃথিবী গ্রাস করেছে রথচক্র, তিনি টেনে তুলছেন, অর্জ্জুনকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন প্রতিজ্ঞা, বললেন,—সূতপুত্র এবং ক্ষত্রিয়ে সমান নয়, পশুকে যেমন নিরস্ত্র বধে পাপ নাই তেমনি কর্ণকে নিরস্ত্র বধেও তোমার পাপ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণকে তিরস্কারের ছলে—স্মরণ করিয়ে দিলেন—দ্যূত-সভা, যাজ্ঞসেনীর লাঞ্ছনা ইত্যাদির কথা। কর্ণকে বধ করলেন অর্জ্জুন। বিধাতার স্রষ্ট ব্যাসদেব—পরমপুরুষকে—এর প্রতিফল থেকেও নিষ্কৃতি দেন নি। নিরস্ত্র চিন্তামগ্ন যদুপতি যখন বৃক্ষকাণ্ডে দেহভার রেখে—সম্মুখের দিকে চেয়ে আছেন—তখন তাঁর রক্তাভ পদযুগল দেখে মৃগভ্রমে শরাঘাত করলে জরা ব্যাধ। তাতেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। অমোঘ যে প্রকৃতির নীতি, যাতে ধ্বনিতে তোলে প্রতিধ্বনি, আঘাতে তোলে অনিবার্য্য প্রতিঘাত, উত্তাপে আনে বর্ষণ, বর্ষণে আনে শৈত্য, সেই নীতিকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ব্যাসদেব; তাই তিনি তাঁর রচনার বিধাতাকেও এই নিয়মের ক্রিয়া থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন নি। এর চেয়ে বড় শাস্ত্র—শাস্ত্র বল শাস্ত্র, পুরাণ বল পুরাণ, সাহিত্য বল সাহিত্য—আমার কাছে আর কিছু নাই।

অভিভূত হয়ে গিয়েছিল অরুণা।

ভাগবত কথকের অপূর্ব্ব কথকতায় যে পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল তাতে বহুক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। কানের পাশে অহরহ ওই কথাগুলিই গুঞ্জন করে ফিরেছিল। পরে ভাবনা যখন তার ক্রিয়াশীল হল, তখন বিস্মিত না হয়ে পারে নাই। ধ্বনির প্রতিক্রিয়ায় প্রতিধ্বনি, উত্তাপের প্রতিক্রিয়ায় বর্ষণ, বর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় শৈত্য, কুরুক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়ায় প্রভাস, কৌরব-বংশের ধ্বংসের প্রতিফলে যদুবংশ ধ্বংস, নিরস্ত্র দ্রোণ কর্ণের অস্ত্রাঘাতের মৃত্যু-ফলে নিরস্ত্র কৃষ্ণের শরাহত হয়ে দেহত্যাগ অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রেখে সৃষ্টি! ঘটনায় সত্য হোক বা না-হোক পৃথিবীর সত্যকে এমন ক'রে ঘটনায় সাজিয়ে মহাসত্যরূপে প্রকাশ সত্যই সুদুর্লভ। বঞ্চনার প্রতিক্রিয়ায় ক্ষোভ, ক্ষোভের প্রতিক্রিয়ায় আত্মঅজ্ঞাত দ্বন্দ্ব, মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, সমাজে সমাজে! তার নূতন দিনের উপলব্ধিতে অপরূপ ভাবে মিলিয়ে পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয় মেনে নিয়েছিল—এই চিরাচরিত রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে মানুষের জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে যে পরিবর্ত্তিত রূপই আসুক—যত সার্থকতাই সে লাভ করুক—আজ হোক কাল হোক তবু আর একটি রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম সেখানে আসবেই।

তাই দেবুদের ওই বড় রক্তাক্ত সংগ্রামের স্বপ্নের সঙ্গে তার স্বপ্ন আর মেলে না। তার স্বপ্ন আজ কিছু পৃথক।

কিন্তু সে কথা যাক। দেবুদের এই ছলনাময় শান্তি প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করিবে না, সে জানে। সে জানে—মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করিবে না। যারা উৎকট রকমের শাক্ত—সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে—তারা বৈষ্ণব সাজিয়া অহিংসার কথা বলিলে কেউ বিশ্বাস করিবে না। ওই প্রাকৃতিক নিয়মে পারিবে না।

কিন্তু গৌর এল কেন? গৌরের তো আসার কথা নয়

সে কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই ন্যায়রত্ন বলিলেন—ভাই অরুণা, রাত্রি হয়েছে বিশ্রাম কর। উৎকণ্ঠা হবেই। কিন্তু তার তো উপায় নাই। সতর্ক থাকলেই হবে। বিশ্রাম কর।

ইঙ্গিতে ন্যায়রত্ন নিজের বিশ্রামের সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। অরুণা লজ্জিত হল। তাঁর বিছানা করতে হবে। আহার অবশ্য সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই করেন তিনি; সামান্য আধপোয়া দুধ। সে সারা হয়ে

হয়ে উঠল সে। বললে—এই যে—বিছানা করে দিই।

ন্যায়রত্নর আশ্রমে ছোট তিন-কুঠারী মাটির একখানি ঘর, সামনে একটুকরা বারান্দা—ন্যায়রত্ন তৈয়ারী করাইয়া লইয়াছেন। একখানিতে তিনি নিজে থাকেন, একখানি রান্নার জন্য, অপর খানিতে থাকে অরুণা। পূর্ব্বে থাকিতেন অজয়ের মা জয়া।

ঘরের মধ্যে কাঠের পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বালিয়া—অরুণা তাড়াতাড়ি বিছানা করিয়া ফেলিল। বিছানাই বা কি? দুইখানা কম্বল, একটা নামমাত্র বালিশ, দুইখানা চাদর, একখানা পাড়িবার, অপরখানা তসরের—সেখানা পায়ের কাছেই ভাঁজ করা থাকে, কোনদিন শরীর অসুস্থ বোধ করিলে বা বর্ষায় বাদলে শীত অনুভব করিলে গায়ে দেন ন্যায়রত্ন। বৃদ্ধ হইয়াছেন। বয়স হল চুরাশী, সুতরাং শীত অনুভবের দোষ কি? আবার ঘরের সব জানালাগুলা খোলা থাকা চাই। তবে এইবার শরীর যেন ঘন ঘন অসুস্থ হইতেছে। অজয়ের গর্ভধারিণীর মৃত্যুর পর হইতেই এটা হইতেছে। এই লইয়া অরুণার মনে আত্মগ্লানি আছে—লজ্জা আছে, আবার অভিমানও আছে। সে কি তাঁর মত পরিচর্য্যা করে না? বা করিতে পারে না? অরুণা এদিক দিয়া যত প্রকার বৈজ্ঞানিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন—তাহা করিয়া থাকে। জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লয়। রান্না বান্না—আঢাকা রাখে না। আশপাশ—মেঝে এগুলি ফিনাইল দিয়া শোধন করিয়া লয়।

মধ্যে মধ্যে মনে হয়—অজয়ের গর্ভধারিণীর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহটাই ইহার হেতু। তাঁহার অভাবেই তিনি মনে মনে মৃত্যু কামনা করিতেছেন। সে একটা কথা বুঝিয়াছে, এই মানুষটির মনে একটি এমনি ইচ্ছাশক্তি আছে—যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি প্রায় ইচ্ছামৃত্যু। জয়ার অভাব—সেই ইচ্ছার ধাপ কি মনের গভীরে উপ্ত হইতেছে? সে জয়ার অভাব পূর্ণ করিতে পারে নাই! ন্যায়রত্ন তাহাকে জয়ার আসনে বসাইতে পারেন নাই!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বাহিরে আসিয়া বলিল—আসুন দাদু, বিছানা হয়ে গেছে। উঠুন।

ন্যায়রত্ন উঠিলেন। ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

অরুণা বাহিরে আসিয়া, এবার গৌরকে ডাকিয়া বলিল—গৌর!

হাসিয়া অরুণা বলিল—তুই এমন ক'রে তরোয়াল হাতে—? বাকীটা বলিবার প্রয়োজন বোধ করিল না অরুণা। বলা তাহার ঐটুকুতেই হইয়া গিয়াছে।

গৌর বলিল—থাকতে পারলাম না অরুণাদি! দেবুদার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। এ আমার সহ্য হয় না। আমি দেবকী-দাদার সঙ্গে চলে এলাম।

একটা ট্রেণের হুইসিল বাজিল।

রাত্রি এগারটার ট্রেণ। ব্র্যাঞ্চ লাইনের ট্রেণ। সদর শহর হইতে আসিবার ট্রেণ।

অরুণা চমকিয়া উঠিল।—অজয় যদি নামে! সে তো যে কোনদিন খালাস পাইবে। সে বলিল—হ্যাঁরে! ষ্টেশনে—লোক আছে তো?

গৌর বলিল—সে ঠিক আছে। আর অজয় আজ আসবে না। আমি খবর নিয়েছি। আরও সাতদিন দেরী হবে। তার রেমিশন কাটা গিয়েছে হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের জন্য। অজয় জেলে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করিয়াছিল। তখন একবার অরুণা তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। অজয় তাহাকে স্মিতমুখেই সম্ভাষণ করিয়াছিল।—তাহাকে—মা—সে অনেকদিন আগেই স্বীকার করিয়াছে। যেদিন সে ওই দরবারী হালদারকে গুলি করিয়াছিল সেইদিন।

জেলখানায় যেদিন তাহাকে মা বলিয়া হাত ধরিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিলে সে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অনন্ত সার্থকতা লাভ করিবে।

হঠাৎ একটা দুরন্ত চীৎকারে সে চমকিয়া উঠিল।

কোথাও একটা প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইল।

রাত্রির অন্ধকার যেন চিড় খাইয়া গেল।

দেবকী সেন?

ন্যায়রত্ন ডাকিলেন অরুণা!

—দাদু!

—ভিতরে এস। বাইরে থেকে উৎকণ্ঠা বাড়িয়ো না।

—ঘুম যে আসবে না দাদু! সে যে আরও কঠিন উৎকণ্ঠা ভোগ করব।

—ভিতরে এস। আমার কাছে বস। গল্প বলি।

বাহিরে আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে। আগুন লাগিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

মত-প্রকাশ-স্বাধীনতা সঙ্কোচ—

মত প্রকাশের স্বাধীনতা যে দেশে যত অধিক, সে দেশ তত সভ্য ও গণতন্ত্রের অনুরাগী বলিয়া বিবেচিত হয়। এ দেশে রামমোহন রায় হইতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের মত-প্রকাশ-স্বাধীনতার সঙ্কোচ চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। বার্ক বলিয়াছেন :—

"A Government against which a claim of liberty is tantamount to high treason, is a Government to which submission is equivalent to slavery."

এ দেশে শাসক ইংরেজরা যখনই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-সঙ্কোচের চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই দেশের জাগ্রত জনমত সে চেষ্টা ব্যর্থ করিতে প্রয়াস করিয়াছে এবং সেই প্রয়াসে বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু দেশে যখন স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন দেশের লোক স্বভাবতঃই আশা করিয়াছিল, ইংরেজের শাসনকালীন যে সকল বিধিবিধান সে স্বাধীনতার বিরোধী, জাতীয় সরকারের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল দুঃস্বপ্নের মত দূর হইয়া যাইবে—জাতীয় সরকার সে সকল দূর করিয়া জাতীয় সরকার বলিয়া আত্মপরিচয় দানের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান জাতীয় সরকার—ভারতের নূতন শাসন-বিধানে নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের প্রতিনিধি না হইয়া—তাহার বিপরীত কাজই করিতে উদ্যত হইয়াছে। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার প্রয়াসে অনেকে যে বিশেষ উদ্দেশ্য আরোপ করিতেছেন, তাহা না করিয়াও বলা যায়, প্রস্তাবিত আইনে কেবল যে সংবাদপত্রাদির মতপ্রকাশ-স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হইবে তাহাই নহে, পরন্তু তাহাতে ভারত রাষ্ট্রে স্বাধীনতার যে স্বরূপ সপ্রকাশ হইবে, তাহাতে পৃথিবীর গণতন্ত্রানুরাগী দেশসমূহে ভারত রাষ্ট্রের মর্য্যাদাহানি অনিবার্য্য হইবে।

এই আইন প্রবর্ত্তনের প্রথম প্রয়াসে এ দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ ইহার প্রতিবাদে ১২ই জুলাই পত্র প্রচার বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিতাপের বিষয়, তাঁহারা সকলে সেই প্রস্তাবের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। তাঁহাদিগের সেই দৌর্ব্বল্য যে সরকারের পক্ষে উৎসাহের কারণ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। তাঁহারা এবং পার্লামেণ্টে তাঁহাদিগের দলের সংখ্যাধিক্যে সে কাজ করিতেও পারিবেন—তাহা, বোধ হয়, বৃটিশ আম[illegible] তত্রও বিধিবদ্ধ করিতে দ্বিধায় বিচলিত হইতেন। যে দিন শাসন-[illegible] সংশোধক বিল পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়, সে দিন স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী বলিয়াছিলেন সরকার সংবাদপত্রসম্বন্ধীয় আইন পরিবর্ত্তিত করিবেন। তখন কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, সংবাদপত্রের মতপ্রকাশ-স্বাধীনতার পরিধি-বি[illegible] হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সরকার সংস্কারের নামে সংহার ক[illegible] উদ্যত। তাঁহারা সংবাদপত্রে (অপরাধে উত্তেজক) আইনের [illegible] পার্লামেণ্টে পেশ করিয়া তাহা আইনে পরিণত করিবার জন্য [illegible] ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন।

এই বিল পূর্ব্বাহ্নে সংবাদপত্রদিগকেও দেখিতে দেওয়া হয় নাই [illegible] পার্লামেণ্টে ইহা লোকের মত-প্রচারের জন্য প্রচারের প্রভাব [illegible] হইয়াছে। এই দুই কার্য্যেই সরকারের মনোভাব ও প্রস্তাবিত আই[illegible] স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা বলিয়া সরকার যে সকল [illegible] তন্ত্রবিরোধী ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন—২০ বৎসর পরে—পরিব[illegible] অবস্থান, যখন অবস্থা সঙ্কটকালীন নহে—তখন ভারত রাষ্ট্রের জাতী[illegible] সরকার বৃটিশের সেই সব ক্ষমতা আপনারা রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন[illegible] তাঁহারা সে চেষ্টায় লজ্জানুভবও করিতেছেন না।

স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারত রাষ্ট্রে এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়াসে নিন্দা করিয়া ইংরেজ-চালিত 'ষ্টেটস্‌ম্যান' লিখিয়াছেন :—

"স্বাধীন সংবাদপত্রই স্বাধীন ভারতের উপযোগী। If there is a risk it is one well worth taking".

যে ইংরেজের শাসনে বহু ত্রুটি ছিল, সেই ইংরেজও মনে করিত, সংবাদপত্রে লোকমত প্রতিফলিত হয় ; আর আজ পার্লামেণ্টে কংগ্রেসী সদস্যরা মনে করেন—তাঁহারাই লোকমতের প্রতীক। কিন্তু দেখা যাইতেছে কংগ্রেসকেও প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইতেছে এবং তাহার পরিচালনা জন্য সরকার যে সকল ব্যক্তির অর্থার্জনে সাহায্য করেন, তাঁহাদিগকে অ[illegible] দিতে বাধ্য করা হইতেছে! সংবাদপত্র যখন সরকারের অনুগত হয়, তখন আর তাহার দ্বারা লোকমত প্রকাশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না এ[illegible] সংবাদপত্রকে সেই অবস্থায় পরিণত করিবার জন্যই বর্ত্তমান সরকার আগ্র[illegible] প্রকাশ করিতেছেন। আর সরকারের অনুগত কংগ্রেসী সদস্যরা [illegible]

রাজাজীর প্রদেশের এতদ্বারাও বিরোধিতা করিয়া যে ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা—আগামী নির্বাচনে তাঁহাদিগের কংগ্রেসের ছাড় ও সরকারের সমর্থনপ্রাপ্তির পথ সুগম করিতে পারিলেও, দেশের লোক তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে পারে না। কংগ্রেস ও সরকার এখন অভিন্ন হইয়াছে বলিয়া এ কথা বিশেষভাবে বলিতে হয়।

আজিম জনাব, আপত্তিকর সংবাদ বা মত প্রকাশের সংজ্ঞা প্রভৃতিতে এই আইনে যে ভাব দেখান হইয়াছে, তাহাই গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের ভয়ের কারণ হইতে পারে। কিন্তু এ দেশে তাহা হয় নাই। যতদিন দেশ ইংরেজ শাসনাধীন ছিল, ততদিন সরকার সাংবাদিকদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। আর আজ স্বদেশী সরকার যেন তাঁহাদিগকে অপরাধপ্রবণ বলিয়া শাসন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন!

'ষ্টেটস্‌ম্যান' যথার্থই বলিয়াছেন—ইহা সংবাদপত্রের পক্ষে অপমানজনক—"a badge of ignominy."

মাসিকপত্রের স্বল্প স্থানে প্রস্তাবিত আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্ভব নহে। নহিলে আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারিতাম যে, প্রস্তাবিত আইন জনমতের কণ্ঠরোধজন্য পরিকল্পিত।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উদ্ধতভাবে বলিয়াছেন, তিনি এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়া যাইতে চাহেন। তিনি কি জানেন না, লর্ড লিটনও এইরূপ মনোভাব লইয়া ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে ব্যবস্থা—ঘৃণ্য ও অসঙ্গত বলিয়া—তাঁহার পদত্যাগের পরেই প্রত্যাহৃত হইয়াছিল।

আগামী নির্বাচনে কি হইবে, তাহা দেখিবার বিষয়। কিন্তু স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী রাজাগোপালাচারী আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত হউন বা না হউন—এ বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহমাত্র নাই যে সরকার লোকমতের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে সে সরকার সর্বপ্রথমে সংবাদপত্রের মত-প্রকাশ-স্বাধীনতা সঙ্কোচক আইন প্রত্যাহার করিয়া আপনাদিগের ও ভারত-রাষ্ট্রের সম্ভ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। যে সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মত পদদলিত করিয়া এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ করিতেছেন। সে সরকার যাঁহাদিগকে লইয়া গঠিত, তাঁহারা কখনই সংবাদপত্রের সমর্থনলাভ করিতে পারেন না—তাঁহাদিগকে সংবাদপত্র কখন ক্ষমা করিতে পারিবে না। যাঁহারা সত্যপ্রকাশ স্বাধীনতার শত্রু, তাঁহারা যে গণতন্ত্রের মূলনীতির শত্রু তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহাদিগের কার্য্যের কলঙ্ক সপ্তসিন্ধুর সম্মিলিত সলিলেও প্রক্ষালিত হইতে পারে না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কর্তব্য কি, তাহা ভারতের সংবাদপত্র সকলকে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

খাদ্য-সঙ্কট—

ভারত রাষ্ট্রে খাদ্য-সঙ্কট দূর হওয়া ত দূরের কথা, তাহার তীব্রতা ও ব্যাপকতা যেন বর্দ্ধিতই হইতেছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নহে—ভারত রাষ্ট্রের নানা প্রদেশে অবস্থা। ভারত সরকার যে সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র খাদ্যসম্বন্ধে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে বলিয়াছিলেন, সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদিগের উক্তির মিথ্যাত্বমাত্র তাঁহাদিগের অযোগ্যতাকে উপহাস করিতেছে। বিস্ময়ের ও লজ্জার বিষয়, কোন কংগ্রেস নেতা এখন বলিতেছেন:—

"খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে অন্তরায় আমাদের নিজেদের মন। আমাদের মন তৈরী নয়; দেশকে খাদ্যে আত্মনির্ভরশীল হ'বার কথা আমাদের মন চিন্তা করতেই পারে না।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই "আমরা"র মধ্যে সরকারের লোকদিগকে বাদ দেওয়া যায় না। তাঁহাদিগের মন অপ্রস্তুত থাকাতেই কি তাঁহারা স্বয়ং-সম্পূর্ণতার সময় সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অসত্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে?

আবার পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপরিষদে জলপাইগুড়ীতে চাউলের মূল্য এখনও ৪৮ টাকা মণ স্বীকার করিয়াও খাদ্য-সচিব বলিয়াছে—তথায় দুর্ভিক্ষ নাই। তিনি দুর্ভিক্ষের নূতন সংজ্ঞা দিয়াছেন—যখন খাদ্যশস্যের একান্ত অভাব ঘটে এবং লোক না খাইয়া মরে! কিন্তু দুর্ভিক্ষ বলিতে বুঝায়।—

"That dreadful state of things, when food is not obtainable at any price or that scarcely less dreadful condition when the enhancement of price is practically prohibitory to all but the wealthy."

অর্থাৎ যে অবস্থায় মূল্য দিলেও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না; অথবা যে অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের দুর্মূল্যতাহেতু তাহা ধনী ব্যতীত আর কেহই তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না।

পশ্চিম-বঙ্গের খাদ্য-সচিব কেন যে অনাহারে মৃত্যু স্বীকার করেন না, তাহার কারণ, বোধ হয়, তাঁহার মতে অনাহারে মৃত্যু ঘটিলে দুর্ভিক্ষ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞা যে স্বীকার্য্য নহে, তাহার প্রমাণ—অনাহারে মৃত্যু নিবারণই সরকারের উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত।

এ বার পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে কয়জন সদস্য প্রদেশে খাদ্যসঙ্কটের আলোচনা করিতে চাহিলে প্রধান-সচিব—পরদিন সে সম্বন্ধে বিবৃতি দিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু পরদিন তিনি বিবৃতি দিতে অস্বীকার করেন। কারণ, বিপক্ষদল বিবৃতির আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং পরিষদের সভাপতি বলিয়াছিলেন—তিনি সে বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি দিবেন না—আলোচনার জন্য বিরোধীদলকে সরকারের কাছে অনুমতি চাহিতে হইবে। বিরোধীদলের পক্ষে এই সর্ত্ত মানা অসম্ভব বিবেচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন যখন প্রধান-সচিব বলিয়াছিলেন, সরকারের গোপন করিবার কিছুই নাই, তখন পরদিন তিনি কেন যে আলোচনায় আপত্তি করিলেন, তাহা বুঝা যায় না।

এই প্রসঙ্গে বক্তব্য, খাদ্য-সচিব সংবাদপত্রে অনাহারের সংবাদ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা শোভন কি না তাহা না বলিয়া এ কথা বলা কর্তব্য যে, সংবাদপত্রসমূহ কি এই উক্তি বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন?

কুচবিহারে ভগীরাভাম্মা সম্পর্কে খাদ্য-কমিশনার মিষ্টার বনাক যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে দেখা গিয়াছে :—

(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মজুদ শস্তের পরিমাণ অধিক থাকে না ;

(২) যখন কুচবিহারে অন্নাভাব তখনও ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিহারে ৫ হাজার মণ খাদ্যশস্য পাঠাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন ;

(৩) ভারত সরকার মিষ্টার বনাকের আগ্রহ-ব্যাকুল আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, আমাদিগের দিবার মত শস্য নাই। আপনারা আরও শস্য সংগ্রহ করুন—পশ্চিম বঙ্গের লোককে খাদ্য দিন।

এই অবস্থায় আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়—সরকারের হিসাবে যখন পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অভাব হইবার কথা নহে, তখন অভাব হয় কেন এবং কিরূপে ? কি ভাবে অভাব সৃষ্ট হয় ?

পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অভাব হইবার কথা নহে এবং ধান্যের উৎপাদন-বৃদ্ধিও অসম্ভব নহে। যে সময় পশ্চিমবঙ্গে অভাব এত তীব্র, তখন যে ধানচাষের জমীতে পাটের চাষ করান হইতেছে, তাহাও সঙ্গত কি না, তাহা বিবেচ্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাহাই কেন বলুন না—এ কথা কি তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন যে—

বসিরহাট "বাড়তি" অঞ্চল হইলেও তথায় চাউলের মূল্য প্রতি মণ ৪০ টাকা হইতে ৪৫ টাকা থাকিয়া গত ৯ই সেপ্টেম্বর ৭৫ টাকা হইতে ৮০ টাকায় উঠিয়াছিল এবং এখনও তথায় মূল্য ৫২ টাকা ৮ আনা মণ ? ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দেও কখন তথায় চাউলের মূল্য এত অধিক হয় নাই।

কলিকাতার কোন ইংরেজ-পরিচালিত পত্রের প্রতিনিধি অনুসন্ধান করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তথায় যে পদ্ধতিতে সাহায্য প্রদান করা হয়, তাহাও সময় সময়, চাউলের অভাবে, অচল হয়, এ কথা তথায় মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীকার করিয়াছেন।

অল্পদিন পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে কৈফিয়ত দেওয়া হইয়াছে, কারণ চতুষ্টয়ে পশ্চিম বঙ্গের আজ দুর্দশা—

(১) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তাহেতু লোক মজুদ ধান ছাড়িতেছে না।

(২) এ বার আশু ও আমন ধানের ফসল ভাল হইবে না—এই জন্য লোক ভীত হইয়া সংগৃহীত শস্য মজুদ করিয়া রাখিতেছে।

(৩) ভারত সরকার যাহা দিতেছেন, তাহার অধিকাংশ গম ও মাইলো ; বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ তাহা খাইতে চাহে না।

(৪) মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার ও আসামও ভারত সরকারের নিকট শস্য চাহিতেছে।

লোক যে শস্য মজুদ করিতেছে, তাহা কি সরকারের সম্বন্ধে আস্থার অভাবহেতুই নহে ? আর গম ও মাইলো কেন দিতে হয় ? চাউলের অভাব হইবার কথা নহে।

সরকার আশা দিয়াছেন—কয় বৎসর না হয় অনাহারে থাকিবে, কিন্তু নদীর জল নিয়ন্ত্রিত হইলে আর কোন ভাবনা থাকিবে না। এ [illegible] আমরা এঞ্জিনিয়ার শ্রীকুমুদভূষণ রায়ের মত বিশেষ বিবেচক বলিয়া মনে করি। তিনি বলেন, জল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় যে [illegible] তাহার আনুমানিক হিসাব ভুল। তিনি দেখাইয়াছেন, হীরাকুদ বাঁধে যে ৪৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলা হইয়াছিল, তাহা ৯৪ কোটিতে দাঁড়াইবে। দামোদর পরিকল্পনাতেও ব্যয় ঐরূপ বর্দ্ধিত হইবে, সরকার স্বীকার করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে ; আমেরিকায় যে সকল নদীর জল নিয়ন্ত্রণের জন্য জল বন্ধ করা হইয়াছে সে সকলে বাহিত পলি অনেক কম ; সুতরাং এ দেশে পলিতে শীঘ্র শীঘ্র নির্ম্মিত আধার পূর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি হিসাব করিয়া যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা যে নির্ভরযোগ্য নহে, সরকারকে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে।

যে সকল অল্পব্যয়সাধ্য ব্যবস্থায় আপাততঃই ফসল বর্দ্ধিত হইতে পারে পশ্চিম বঙ্গ সরকার সে সকলে কি আবশ্যক মনোযোগ দিতেছেন ? তাঁহাদিগের খাদ্য-সঙ্কট নিবারণের ব্যবস্থা যে রহস্যাচ্ছন্ন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

খাদ্য শস্য ও সরকার—

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টে সরকার পক্ষের স্বীকৃতিতে দুইটি বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে :—

(১) লোক-প্রতি আবাদী জমীর পরিমাণ কমিতেছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ জমীর পরিমাণ মাথা পিছু—০·৯৩৫ একর, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে দাঁড়ায়—০·৮৩৬ একর, এখন হইয়াছে—০·৭৫৭ একর। কেন এমন হইল—যে সময় কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজন এত অধিক, তখন কেন জমী কমিল তাহা কিন্তু সরকার নিশ্চিত বলিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, বোধ হয়—

(ক) লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধি

(খ) লোকের গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আগমন

(গ) হায়দ্রাবাদে হাঙ্গামা

(ঘ) পঞ্জাবে অবস্থার অনিশ্চিততা।

তৃতীয় ও চতুর্থ দফার অসুবিধা আর নাই। লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধি অবশ্য হইয়াছে ও হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, লোক গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আসিতেছে কেন ? কেবল কি সহরের আকর্ষণে ? কৃষিজ পণ্যের যে মূল্য সরকার কৃষিদিগকে দেন—সেই মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে যে কৃষি কার্য্যে আশানুরূপ লাভ হইতে পারে না—এমনও হইতে পারে। পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে তাহাই মনে হয়।

(খ) সরকার যে মূল্যে খাদ্যশস্য কৃষকদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন, তাহা স্থির করিবার সময় উৎপাদনের ব্যয় হিসাব করা হয় না। অথচ ক্রয়ের মূল্য হিসাব করিবার সময় তাহাই সর্ব্ব-প্রথম বিবেচ্য। সরকার এখনও নানা ফসলের উৎপাদনব্যয় স্থির করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই ! যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন সরকার ক্রয়ের মূল্য নির্দ্ধারণে উৎপাদন ব্যয় হিসাব করিতে পারিবেন না।

অর্থাৎ সরকার কৃষিজপণ্য ক্রয়ের সময় যে মূল্য দেন, তাহা কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তিতে নহে।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গ সরকারের খাদ্য কমিশনার মিষ্টার [illegible] কুচবিহারে গুলী চালনার তদন্তে সাক্ষ্য দান কালে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন—সরকারের সংগ্রহ বিভাগ শস্যের যে মূল্য দেন, তাহা কি উৎপাদনকারীদিগের পক্ষে লাভজনক? তিনি স্বয়ং সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশ না করিয়া বলিয়াছিলেন :—

পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য সচিব সংগৃহীত সংবাদ হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাহা যে লাভজনক নহে—এমন নহে।

আমরা দেখিতেছি, ভারত সরকার স্বীকার করিতেছেন—

(১) সরকার উৎপাদনব্যয় নির্দ্ধারণের কোন উপায় উদ্ভাবিত করিতে পারেন নাই; সুতরাং—

(২) সরকার যে মূল্য দেন তাহা উৎপাদন ব্যয় বিবেচনা করিয়া দেওয়া হয় না।

হয় ভারত সরকারের কথা নির্ভরযোগ্য নহে, নহে ত পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য-সচিবের হিসাব "বেবনিয়াদ"। কোনটি বিশ্বাসযোগ্য?

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সচিব কি পশ্চিমবঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জিলায় ও মহকুমায় উৎপাদনব্যয় সঠিক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন? না—যথেচ্ছা ক্রয়ের মূল্য স্থির করেন?

ভারত সরকার এ কথাও বলিয়াছেন যে, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে পাট, তুলা ও তৈল বীজের চাষের জমীর পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। একদিকে খাদ্য শস্যের জমীর পরিমাণ হ্রাস, আর এক দিকে খাদ্য-শস্যের স্থানে অর্থকরী ফসলের চাষ বৃদ্ধি আর—লোকের গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে গমন এই ত্র্যহস্পর্শের অনিবার্য্য ফল কি তাহা আমরা অনুমান করিতেছি না—অনুভবই করিতেছি। উপায় কি?

প্রাদেশিক সরকারের ঋণ—

ভারত সরকারের পরে প্রাদেশিক সরকারগুলি—আপনাদিগের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার প্রত্যেকে ৩ কোটি টাকা, মধ্যপ্রদেশের সরকার এক কোটি টাকা ও যুক্তপ্রদেশের সরকার ২ কোটি টাকা—মোট ১০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিলেন। এই ঋণের বার্ষিক সুদ—শতকরা সাড়ে ৩ টাকা এবং ইহা ১১ বৎসরে পরিশোধ্য। প্রদেশের যে সকল আশু প্রয়োজনীয় কাজ লাভজনক সে সকলের জন্য অধিবাসীদিগকে করভার পীড়িত না করিয়া ঋণগ্রহণই সঙ্গত। বাজারের অবস্থা বিবেচনায় ১১ বৎসরে পরিশোধের ব্যবস্থাও সমর্থনযোগ্য। চোরা বাজারে যে পর্ব্বত-প্রমাণ লাভের টাকা কতকগুলি লোকের সম্পদ বর্দ্ধিত করিয়াছে তাহাতে এই ঋণ যে দেখিতে দেখিতে পাওয়া যাইবার কথা তাহা বলা বাহুল্য। হইয়াছেও তাহাই। ঋণ গ্রহণের ফলে কি লোকের করভার হ্রাস করা সম্ভব হইবে?

তাহার পরে আসিবার বিষয়—এই ঋণের টাকা কি কাজে প্রযুক্ত হইবে? বলা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের ঋণের এক কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা নিম্নলিখিত উন্নতিকর কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে—

(১) পথ-বিস্তার

(২) যানবাহন ব্যবস্থা

(৩) উত্তর-কলিকাতা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সর-বরাহের ব্যবস্থা।

বলা হইয়াছে, মোটর যানের ও পেট্রলের উপর ধার্য্য করে প্রচুর টাকা পাওয়া যায়—তাহা হইতে প্রথম দফায় প্রযুক্ত টাকা পরিশোধ করা হইবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় সরকার লাভবান হইতেছেন। মোটর যানের উপর ও পেট্রলের উপর করে যে টাকা আয় হয়, তাহা এতদিন সরকারের নিত্যবর্দ্ধনশীল সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এবার কি তাহা পথ-নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইবে? কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহে সরকারের কিরূপ লাভ হইতেছে, তাহা জানা যায় নাই। তবে তাহার প্রয়োজন যেমন অস্বীকার করা যায় না, তাহাতে লাভের সম্ভাবনাও তেমনই অধিক। কিন্তু সরকারী যান-ব্যবস্থা যাহা হইয়াছে, তাহাতে যে প্রযুক্ত মূলধনের তুলনায় লাভ যৎকিঞ্চিৎ হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সব কার্য্যে ঋণে লব্ধ টাকা প্রযুক্ত করিবেন, সে সকলের মধ্যে সমুদ্রে মৎস্য-সংগ্রহের জন্য আরও ট্রলার ক্রয়ের উল্লেখ করেন নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। সে বাবদে যে টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কি ক্ষতির খাতেই লিখিতে হইতেছে না? কাজেই যান ব্যবস্থায় যে অর্থ প্রযুক্ত হইবে, তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে যদি সরকার তাঁহাদিগের যানগুলি কি মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে, তাহার হিসাব দেশের লোককে জানাইয়া দেন, তবে ভাল হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রথম প্রাদেশিক ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ হয়ত আসন্ন নির্ব্বাচনের পরে আর স্বস্থানে থাকিবেন না—কিন্তু তাঁহারা যে ঋণ রাখিয়া যাইবেন, তাহা প্রদেশকে পরিশোধ করিতে হইবে। সেই জন্য ঋণ-লব্ধ অর্থের প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহারা যদি দেশের লোকমত গ্রহণ না করেন, তবে সে কাজ গণতন্ত্রের নীতি-সম্মত হইবে না। ক্ষমতা লাভ করা ভাল—কিন্তু সেই লব্ধ ক্ষমতার অপব্যবহার করা ভাল নহে।

ঋণের টাকা সুপ্রযুক্ত করিবার জন্য কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি পরামর্শ দাতা সমিতি নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন?

ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান—

পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে হিন্দুর ভারত রাষ্ট্রে আগমন সমভাবেই চলিতেছে। পশ্চিম পাকিস্তান অমুসলমান-শূন্য হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুদিগের আগমন দেশ বিভাগের পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় সময় আরম্ভ হয়। তথায় হিন্দুর অবস্থা দেখিয়া গান্ধীজী বলিয়াছিলেন :—

"I must bury myself, if necessary, in East Bengal. If I am the only person in Bengal, even then I must fight it (communal trouble) out."

কিন্তু [illegible] তাহা করিতে পারেন নাই এবং তিনিও পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। দেশ বিভাগের পরে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের হাঙ্গামার পর হইতে গত ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৫০ লক্ষ ২৭ হাজার ৬ শত ১৯ জন হিন্দু পূর্ব্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ৩০ লক্ষ ১৯ হাজার এক শত ৫২ জন দিল্লী চুক্তি সফল হইবে মনে করিয়া ও ভারত সরকারের সংখ্যালঘিষ্ঠ মন্ত্রীর পরামর্শে ফিরিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেকেই তথায় থাকিতে পারেন নাই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, দিল্লী চুক্তিতে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের অবস্থার কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুর আগমনে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতেছে—হিন্দু অধিবাসীদিগকেও যুদ্ধের জন্য কর দিতে বাধ্য করিতেছে। যুদ্ধের আয়োজন কিসের জন্য? যুদ্ধ কাহার সঙ্গে? মিষ্টার লিয়াকৎ আলী যে বদ্ধমুষ্টি দেখাইতেছেন, তাহা কাহাকে? যুদ্ধ যে ভারত রাষ্ট্রের সহিত তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ভারত রাষ্ট্র ধর্ম্মনিরপেক্ষ বলিয়া মুসলমানদিগকেও হিন্দুর সহিত তুল্যাধিকার প্রদান করে। কিন্তু জিন্নার মৃত্যুদিনে সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিষ্টার লিয়াকৎ আলী সে সম্বন্ধে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন:—

আপনার দীর্ঘ বক্তৃতাবলীতে আপনি ভারতের ধর্ম্মনিরপেক্ষতার জন্য গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মতে যাহার ধর্ম্মমতে বিশ্বাস নাই, তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য—এই ধর্ম্মনিরপেক্ষতাই ভারতের ধ্বংস সাধন করিবে।

ইহার পরে তিনি তাঁহার বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন—ধর্ম্মের ভিত্তিতে শক্তিমান হইয়া ইস্লামের পতাকাবাহী পাকিস্তান তাহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিবে। কোথায় সে পতাকা উড্ডীন করা মিষ্টার লিয়াকৎ আলীর অভিপ্রেত তাহা বলা বাহুল্য। যুদ্ধোদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব পাকিস্তান স্থানে স্থানে ভারত রাষ্ট্রের সহিত সংযোগ-সেতু ভাঙ্গিয়া দিতেছে—সংযোগ-পথ নষ্ট করিতেছে। যুদ্ধ যদি অনিবার্য্য হয়, তবে অবশ্য ভারত রাষ্ট্রকে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে হইবে—তবে সে যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ নহে—ধর্ম্ম্য যুদ্ধ। কিন্তু সেই যুদ্ধের জন্যই কি আরও বহু হিন্দু পাকিস্তান ত্যাগ করা প্রয়োজন মনে করিবে না? নিষ্প্রদীপ করিয়া পরীক্ষা চলিতেছে। পাকিস্তান তাহার কাশ্মীরের অধিকৃত অংশ হইতে সেনাবল অপসারিত করিয়া পূর্ব্ব-পঞ্জাবের (ভারত রাষ্ট্র) সীমান্তে ও পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তে সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গেও পাকিস্তানের গুপ্তচর ও ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। কাজেই ভারত রাষ্ট্রকে প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে। যুদ্ধ, শেষ পর্য্যন্ত, হউক আর না হউক, প্রস্তুত থাকা অনিবার্য্য। দূরদর্শী রাজনীতিক শরৎচন্দ্র বসু ভারত সরকারকে ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাব আজও কার্য্যকর [illegible] নাই।

[illegible] শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে, বলা যায় না। কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তানে যে হিন্দুর বাস অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ [illegible] নাই, তখন যে সকল হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিতে [illegible] তাঁহাদিগকে স্থানাভাবের যুক্তি দেখাইয়া বা চুক্তির ভরসা দিয়া পূর্ব্ববঙ্গে থাকিতে প্ররোচিত করার অনিবার্য্য ফল তাঁহাদিগকে বিপন্ন ও ধর্ম্মান্তরিত হওয়ায় বাধ্য করা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

পাকিস্তান যে চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই, সে চুক্তি বাতিল করা কি অসঙ্গত? আর পাকিস্তানের ব্যবহারে, যুদ্ধোদ্যমে ও ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে ভারত-রাষ্ট্র যদি তাহার সম্বন্ধে অর্থনীতি-সম্বন্ধচ্ছেদ (অর্থাৎ economic sanction গ্রহণ) করেন, তবে তাহা কি আইন-বিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ হইবে?

পাকিস্তানীরা যে কোন কোন স্থানে ভারত রাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন করিতেছে—ভারত রাষ্ট্রের নৌকা ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—চুক্তির সর্ত্ত অবাধে ভঙ্গ করিতেছে—এই সকলের ফলে যুদ্ধ বাধা অসম্ভব নহে। যখন বারুদের স্তূপ সজ্জিত থাকে, তখন যে কোনরূপে স্ফুলিঙ্গপাতে বিস্ফোরণ হয়, তাহা সকলেই জানেন। যাহারা শান্তির মর্য্যাদা বুঝে না ও রক্ষা করিতে আগ্রহশীল নহে, তাহারা যে শান্তি রক্ষা করিবে, এমন মনে করা যায় না।

যে তোষণ নীতির ফলে আজ দেশ বিভক্ত—সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত এবং আজ আমাদিগের দুর্দ্দশার অন্ত নাই, সেই তোষণ নীতি ভারত রাষ্ট্রকে ত্যাগ করিতে হইবে। তাহাতেই ন্যায়ের মর্য্যাদা ও আত্মসম্মান রক্ষিত হইবে এবং তাহাতেই লোকসমাজে জাতির সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কথা অবশ্য স্মরণীয়।

কংগ্রেস—

কংগ্রেসের সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উভয়ে যে মতভেদ ছিল, তাহার কারণ, পুরুষোত্তমদাস মত পোষণ করিতেন—কংগ্রেসের ছাড়ে যখন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত, তখন সরকারকে কংগ্রেসের মতানুবর্ত্তী হইতে হইবে; আর জওহরলালের মত—সরকারই প্রবল পক্ষ, কংগ্রেসকে সরকারের মতানুবর্ত্তী হইতে হইবে। এই মতভেদহেতু জওহরলাল কংগ্রেসের পরিচালক সমিতি ত্যাগ করেন এবং মিষ্টার আবুল কালাম আজাদ তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করেন। উভয় সজ্ঘর্ষ যেন ধাতুপাত্রে ও মৃৎপাত্রে সজ্ঘর্ষ হইয়াছিল। ফলে পুরুষোত্তমদাসকে সকল সদস্যসহ পদত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং জওহরলালই কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। ইহাতে কংগ্রেসের সম্ভ্রম বর্দ্ধিত হইল কি না, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। জওহরলাল বলিয়াছিলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে কংগ্রেস সভাপতি হওয়া অসঙ্গত, কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহা হইতে পারে। তিনি যখন কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহার মতে বর্ত্তমান অবস্থা অস্বাভাবিক। কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া আবার তিনি বলিতেছেন, প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে; তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব ও কংগ্রেসের সভাপতিত্ব উভয়ই ত্যাগ করিয়া—বাহিরে হইতে কাজ করিতে

...লীন ; তবে সবই অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। অবশ্য অবস্থা ...রের ভার তাঁহার।

কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া তিনি কংগ্রেসত্যাগীদিগকে কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আহ্বান অধিকাংশ কংগ্রেসত্যাগীর দ্বারা গৃহীত হয় নাই। রফি ... কিদোয়াই কি করিবেন বলা যায় না, কিন্তু আচার্য্য ... বলিয়াছেন, কংগ্রেসে ফিরিয়া যাইবার কথা উত্থাপিত ...তেই পারে না। কারণ, কংগ্রেস দুর্নীতিদুষ্ট বলিয়াই তিনি ও তাঁহার সমমতাবলম্বীরা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন। জওহরলাল সেই দুর্নীতি দূর করিতে পারিবেন না ; বরং দুর্নীতিদুষ্ট সরকারের সহিত ... হইয়া কংগ্রেসের পক্ষে হইবে—"what is fine within the growing course to sympathise with clay." বর্ত্তমান সরকার যে দুর্নীতিদুষ্ট তাহা জওহরলালও অস্বীকার করিতে পারেন নাই ; পরন্তু তিনি সরকারের নিয়ন্ত্রণকারী হইয়াও দুর্নীতি দূর করিতে পারেন নাই ... করেন নাই। চোরা-বাজারের কারবারীদিগের সম্বন্ধে তাঁহার কথা ও ... অসামঞ্জস্যই তাহার প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা হয়। যাঁহারা ... করেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জওহরলালই নেতৃত্ব করিবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি তাঁহারা জাতির উপযুক্ত ব্যক্তির দৈন্য সম্বন্ধে যে মত পোষণ করেন, তাহা জাতির পক্ষে গৌরবজনক নহে। জওহরলাল কংগ্রেসেরও কর্তৃত্ব লাভ করিয়া কি ভাবে নেতৃত্বের দ্বারা দেশের কল্যাণ-সাধন করেন, তাহা তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবেন।

গান্ধীজীর মত ছিল—দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবার পরে শাসন ... কংগ্রেসের আর কোন কাজ থাকিতে পারে না। সুতরাং কংগ্রেসের ... গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করাই সঙ্গত। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার ... ভক্ত তাঁহারাও তাঁহার মতানুবর্ত্তী হ'ন নাই। যাহাকে "পাওয়ার পলিটিক্স" বলে তাহাই অর্থাৎ কে ক্ষমতা পরিচালন করিবেন তাহা ...ই সকলে ব্যস্ত—ত্যাগের পথ তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করে না। "পারমিট", "লাইসেন্স" প্রভৃতি কংগ্রেসের কর্ম্মীরা পুরস্কাররূপে সরকারের নিকট লাভের আশা করেন এবং কংগ্রেসও প্রচারপত্র পরিচালনজন্য ... সকল অনুগৃহীত লোকের নিকট অর্থ-সাহায্য দাবী করেন—ইহা কংগ্রেসের পক্ষে গৌরবজনক নহে। কংগ্রেসের সহিত সরকারের ঘনিষ্ঠ ...ের ইহা কুফল। কংগ্রেসকে যাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করেন, তাঁহারা কংগ্রেসের আদর্শের মর্য্যাদা নষ্ট করেন। কংগ্রেস বহু ...ের ত্যাগপূত দেশসেবার প্রতীক। সে যদি তাহার প্রয়োজন ... পরে লুপ্ত হয়, সে-ও ভাল, কিন্তু তাহার আদর্শভ্রষ্ট হইয়া থাকা ...নীয় নহে। সেই জন্যই গান্ধীজী মনে করিয়াছিলেন—স্বায়ত্ত-শাসনশীল ...তের রাজনীতিক কার্য্যভার যখন জাতীয় সরকার গ্রহণ করিলেন, ... কংগ্রেস বিরাটতর ও মহত্তর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করুক—কংগ্রেস ...কাল পরাধীনতার পিষ্ট, অজ্ঞতার অন্ধকারে স্থিত—দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত ...দের উন্নতির জন্য গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করুক। দেশে সে ... প্রয়োজন ও সুযোগ যে কত অধিক, তাহা সকলেই অনুভব করেন।

কংগ্রেস একদিন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, তাঁহার আশা ও বিশ্বাস, কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানই থাকিবে। কংগ্রেসের মণ্ডপে পূর্ব্বে সমাজ-সংস্কার সম্মিলন হইত। কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান—সুতরাং তাহার সহিত ঐ সম্মিলনের ঘনিষ্ঠতা বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া বাল গঙ্গাধর তিলক মণ্ডপে সে সম্মিলনের অধিবেশনে আপত্তি করিয়াছিলেন। ঐ সকল মনীষী জানিতেন সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে মতভেদ অনিবার্য্য। কংগ্রেস মতভেদে বিপন্ন হইতে চাহে না। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আজ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। দেশ আজ স্বায়ত্ত-শাসনশীল।

এখন কংগ্রেস যদি ইচ্ছা করে, তবে জনসেবার আদর্শ লইয়া দেশে গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। সে কাজ আজ দেশের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের বর্ণনা—

"অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জ্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দ্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতিহীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি—আমাদের জন্মভূমি।"

জন্মভূমির এই দুরবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজন বুঝিয়া দেশ আবার "সন্তান"-সেনাদল গঠনের কার্য্যে দেশসেবককে আহ্বান করিতেছে। সেই "সন্তানগণ" দেশকে আবার "আনন্দ মঠ" করিবে। কংগ্রেস সে কাজ করিবে কি ?

এই সম্পর্কে কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণ দুই কেন্দ্রে উপনির্ব্বাচন উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ কলিকাতায় দেশনেতা শরৎচন্দ্র বসু বিপুল বহুমতে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকে পরাভূত করিয়া ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুর পর এতদিন সে আসন শূন্য ছিল। এ বার তাঁহার বিধবা সেই পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উত্তর কলিকাতায় কংগ্রেসী সদস্য কংগ্রেসের সহিত মতভেদহেতু পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং উপনির্ব্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে প্রার্থী হইয়াছিলেন। সে কেন্দ্রে তিনিই পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কোন কেন্দ্রেই কংগ্রেস কোন প্রার্থী মনোনীত করেন নাই। কোন প্রার্থী যে কংগ্রেসের ছাড় লইয়া দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হ'ন নাই, তাহাতে মনে করা যায়—সেরূপ প্রার্থীর জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না বুঝিয়াই সেরূপ কোন প্রার্থী দেখা দেন নাই।

এই বার সাধারণ নির্ব্বাচনের আয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে ও অন্য অনেক স্থানে বহু পরিচিত কংগ্রেসকর্ম্মী কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ স্বতন্ত্র দলে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু স্বতন্ত্র দলও একটি নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

প্রবেশিকা পরীক্ষা নূতন গঠিত শিক্ষা বোর্ডের অধীন করিবার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নূতন আইন করিয়াছেন। এই আইনে এক দিকে যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ... হইয়াছে, ...

এক দিকে তেমনই সরকারের কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্জিত হইয়াছে। ব্যবস্থায় ভাইস-চ্যান্সেলার অনন্যকর্মা হইবেন এবং বেতন পাইবেন। তবে প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে জজীয়তী হইতে (আগামী আগষ্ট মাসে?) অবসর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত অজও থাকিবেন এবং ভাইস-চ্যান্সেলারীর জন্য কোন বেতন লইবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বাড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং অনন্যকর্মা ভাইস-চ্যান্সেলারের প্রয়োজন অনেক দিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। বর্ত্তমান সিনেট আর থাকিবে না।

এবার একাধিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য পরীক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্যে নানা দিকে আলোচনা আন্দোলনে পরিণতিলাভ করিতেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বক্তব্য, পরীক্ষা ও পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে। সে সকল নিয়ম বহুশিক্ষাবিদের সমবেত চেষ্টায় রচিত হইয়াছিল এবং তাহার পরে সে সকলের অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তন এই প্রায় শত বৎসরে—অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবধি—হইয়াছে। যদি দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতে—সে সকল বিধিনিষেধ বর্জ্জন করা প্রয়োজন হয়, তবে আবশ্যক বিচার-বিবেচনার ফলে তাহা করিতে হইবে। কিন্তু যতদিন সেই সকল নিয়ম অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, ততদিন সেই সকল নিয়মানুসারেই কাজ করিতে হইবে এবং তাহা না করিলে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব অনিবার্য্য। এ বার পরীক্ষায় যদি প্রচলিত নিয়মানুসারে কাজ হইয়া থাকে, তবে সে জন্য ব্যক্তিবিশেষকে বা পরিচালকসঙ্ঘকে নিন্দা না করিয়া সমর্থন করাই সঙ্গত। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যের সংখ্যাই কেবল বিবেচ্য নহে—পরীক্ষার সাফল্যের মর্য্যাদাও বিবেচনার বিষয়। শিক্ষার ও পরীক্ষার মান যাহাতে উপেক্ষণীয় না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—তাহা না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিরও আদর থাকে না। আমাদিগের মনে হয়, এ দেশে ইংরেজ সরকার যখন প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তখন দেশে শিক্ষাবিস্তার দ্রুত করিবার জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার মান খর্ব্ব করিয়াছিলেন। যদি সে অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত ও বিবেচিত হয়, তবে তাহাই করণীয় এবং দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ও শিক্ষাবিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের মত লইয়া সে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু যতদিন সে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত না হয়, ততদিন বর্ত্তমান নিয়মেই কাজ করিতে হইবে এবং যখন সে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইবে, তখনও কতকগুলি বিধিনিষেধ রচনা করিতে হইবে ও সেই সকল পালন করিতে হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানে—বিশেষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জ্ঞান বিস্তারজন্য পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানে—নিয়ম-লঙ্ঘন কেবল বিশৃঙ্খলার উদ্ভব করিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে। কাজেই নিয়মানুবর্ত্তিতা কখন গুণ হইয়া দোষ হইতে পারে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের মূল্যবান প্রতিষ্ঠান এবং দেশে শিক্ষাবিস্তারের সর্ব্বপ্রধান উপায় বিবেচনা করিয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তাহার সেবায় ও [illegible] উন্নতি সাধনে পরস্পরের সহিত সহযোগ করাই প্রয়োজন।

কাশ্মীর—

কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান হয় নাই। তবে কাশ্মীরের যে [illegible] পাকিস্তান অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পাকিস্তানীরা ত্যাগ করে নাই—ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় নাই। সে অংশে যে পাকিস্তানের কোন অধিকার নাই, তাহা জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধি স্বীকার করিয়াছেন; তথাপি জাতিসঙ্ঘ পাকিস্তানকে তাহা ত্যাগ করিতে বলেন নাই এবং ভারত সরকারও সেই অংশে কাশ্মীরের অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্রের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় অবলম্বন করেন নাই। ইহা অনেকের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

এদিকে প্রতিবেশী মুসলমান রাষ্ট্রসমূহ পাকিস্তানের সহিত যোগ দিতে অসম্মত।

কাশ্মীরে জাতীয় দলের নির্ব্বাচনে সাফল্যলাভে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার লিয়াকৎ আলী এতই অধীর হইয়াছেন যে, বলিয়াছেন, "কাশ্মীর কি সেখ আবদুল্লার পৈতৃক সম্পত্তি?" সেখ আবদুল্লা উত্তরে বলিয়াছেন, "কাশ্মীর তাঁহার ও তাঁহারই মত লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরবাসীর পৈতৃক সম্পত্তি।" অর্থাৎ তাহা মিষ্টার লিয়াকৎ আলীর পৈতৃক সম্পত্তি নহে এবং এক্ষেত্রে তিনি সেই "প্রজায় মানে না, তবু আপনি মণ্ডল" হইয়াছেন। আর তিনি যে জাতিসঙ্ঘের চরণে শরণ লইয়াছেন, সেই জাতিসঙ্ঘেরও কাশ্মীরে কোন অধিকার নাই। শেখ আবদুল্লার উক্তি যেন চাবুকের মত মিষ্টার লিয়াকৎ আলীর মুখে প্রহার করিয়াছে। কিন্তু তিনি কি করিবেন? ১ই সেপ্টেম্বর ত কাটিয়া গিয়াছে—এখন কি হইবে?

পাকিস্তান যাহাই কেন করুক না—ভারত সরকার কি করিবেন? তাঁহারা কাশ্মীরের একাংশে পাকিস্তানের অবস্থিতি কতদিন সহ্য করিবেন? যখন তাঁহারা কাশ্মীরের কোন অংশে পাকিস্তানের অধিকার স্বীকার করেন না, তখন তাঁহারা একাংশে পাকিস্তানের অবস্থিতি কি কারণে সহ্য করিবেন? কেহ কি আপনার অধিকার ত্যাগ করে? আর যতদিন কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান না হইবে, ততদিন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশাও দুরাশা। কাশ্মীর লইয়া পাকিস্তান বিদেশে ভারত রাষ্ট্রের সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা প্রচার করিতেছে, তাহা ভারত সরকারের অবিদিত নাই। তাহাতে যে বিদেশে ভারত সরকারের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে, তাহাও দেখা যাইতেছে। আমেরিকায় পাকিস্তানের ভারতবিরোধী প্রচার এত প্রবল যে, আমেরিকার কোন কোন পত্র তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব মনে করিয়া বলিয়াছেন—পাকিস্তানের প্রচার সাহিত্য তাঁহারা আবর্জ্জনা বোধে ফেলিয়া দেন। পাকিস্তানের বোধ হয়, বিশ্বাস, মিথ্যাও পুনঃ পুনঃ পুনরুক্তিতে সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যতদিন কাশ্মীরের জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার প্রদত্ত না হইবে, ততদিন কাশ্মীরের পাকিস্তান কর্ত্তৃক অধিকৃত অংশে হিন্দু অর্থাৎ মুসলমানাতিরিক্ত অধিবাসীদিগের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা দেখা যাইতেছে। [illegible]

হিন্দু নারীকে বলপূর্ব্বক মুসলমানগণ বিবাহ করিয়াছে। এই সব অভিযোগ সম্বন্ধে যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘ অনুসন্ধান না করেন, তবে কোন্ অধিকারে তাঁহারা কাশ্মীরের ব্যাপার মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইতে পারেন?

এখন জিজ্ঞাস্য—এই অবস্থায় যাহাকে prolonging the agony বলে তাহা না করিয়া ভারত সরকার কি কাশ্মীর সমস্যায় জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতার ব্যবস্থা বাতিল করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইবেন? যে ভুল হইয়াছে এখন তাহার সংশোধন করাই প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দু সংহিতা আইন—

পার্লামেণ্টে হিন্দু কোড আইনের একাংশ গৃহীত হইয়াছে। ডক্টর আম্বেদকার সমগ্র বিপদ বুঝিয়া—ভোটের আধিক্য থাকিলেও সমগ্র আইন বিধিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। জানা গিয়াছে, এই আইন বিধিবদ্ধ করিতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের আপত্তি আছে। তিনি সে বিষয় মন্ত্রীদিগকেও জানাইয়াছিলেন। কিন্তু নেহরু-আম্বেদকার সঙ্ঘ তাহার মত গ্রহণ করেন নাই। মিষ্টার আবুল কালাম আজাদ নেহরু-আম্বেদকার সঙ্ঘের সমর্থক কি না, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় নাই।

ভোটের আধিক্যে আইনের যে অংশ পার্লামেণ্টে গৃহীত হইল, তাহাতে সম্মতি দানে অস্বীকৃতি জানাইবার সাহস রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের হইবে কি না, বলা যায় না। কিন্তু যে পার্লামেণ্ট নূতন সংবিধান অনুসারে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদলে গঠিত নহে, তাহার হিন্দু কোড বিধিবদ্ধ করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে কি না, তাহা সন্দেহ। কিন্তু যে স্বৈর মনোভাব পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু পোষণ করেন, তাহাই তাঁহাকে বিলম্ব করিতে নিবারণ করিতেছে। যে অংশ পার্লামেণ্টে গৃহীত হইল, তাহাতেও আপত্তির বিশেষ কারণ আছে। ধর্ম্মসম্পর্কিত রীতির পরিবর্ত্তন অনেক সময় বিপদের কারণ হয়—সে বিবেচনাও যাঁহাদিগের নাই, তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের কল্যাণকর কার্য্য সিদ্ধির আশা দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। এই ব্যাপারে সরকার যে জিদের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কখনই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। নির্ব্বাচনের পরে কি হয়, তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

ছাত্র-চিকিৎসালয়—

কলিকাতার কয়জন খ্যাতনামা চিকিৎসক অগ্রণী হইয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, কলিকাতার ছাত্রদিগের জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হউক। কলিকাতার ছাত্রসংখ্যা বিরাট; ব্যাধির বিস্তারও অসাধারণ। সেই জন্য অন্য হাসপাতালের মত ছাত্রদিগের জন্য স্বতন্ত্র হাসপাতালের প্রয়োজনও অত্যন্ত অধিক। যে প্রাথমিক হিসাব আমরা পাইয়াছি, তাহাতে—

প্রারম্ভিক ব্যয়—১,৭৩,০০০ টাকা

বার্ষিক ব্যয়— ১,৫০,০০০ ,,

কিন্তু এই হিসাবে গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় ধরা হয় নাই।

সুতরাং বহু অর্থ সংগ্রহ না করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। কলিকাতার দক্ষিণে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল সংলগ্ন ভূমিতে বা উত্তরে সাগর দত্ত হাসপাতালের জমীতে হাসপাতালের গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে। কলিকাতার কলেজের ছাত্রদিগের নিকট হইতে বার্ষিক এক টাকা গৃহীত হইলে বার্ষিক ব্যয়ের প্রায়-এক তৃতীয়াংশ নির্ব্বাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রাথমিক ব্যয়ের ও অবশিষ্ট বার্ষিক ব্যয়ের জন্য যেমন, গৃহ নির্ম্মাণের জন্যও তেমনই দানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রী সরকার এই কার্য্যে কিরূপ সাহায্য করিবেন, তাহাও দেখিবার বিষয়। ইহার তুলনায় অল্প প্রয়োজনীয় বহু কার্য্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যে অর্থ-ব্যয় করেন নাই বা করিতেছেন না, এমন নহে। কিন্তু লেক হাসপাতালের উচ্ছেদসাধন তাঁহারা যেরূপ নির্ব্বিকারভাবে দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের সাহায্যে কতটুকু নির্ভর করা যায়, বলা অসম্ভব।

কলিকাতা কর্পোরেশন—

ভারতবর্ষ যখন ইংরেজের শাসনাধীন ছিল, তখনই এ দেশে জাতীয়তার জনক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী হইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয়, ভারত রাষ্ট্র স্বায়ত্ত-শাসনলাভের পরে পশ্চিম বঙ্গের "জাতীয় সরকার" তাহাকে সরকারের অধীন একটি বিভাগে পরিণত করিতেছেন। কর্পোরেশনে কেবল যে সরকারী কর্ম্মচারীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারা তুষ্ট হইয়াছেন, তাহাই নহে—কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগকে বিদায় দিয়া যে স্বৈরাচারের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিন্দার্হ। তাহার উপর আয় বর্দ্ধিত করিবার জন্য তাঁহারা কলিকাতার জমীর ও বাড়ীর মূল্য নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত করিতেছেন। সে কার্য্যের ভার তাঁহারা যাঁহাকে দিয়াছিলেন, তাঁহার কলিকাতার সহিত কোন পরিচয় বা কলিকাতায় কোন স্বার্থ আছে—এমন বলা যায় না। যেভাবে মূল্যবৃদ্ধি ধরা হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার অধিবাসীদিগকে পীড়িত ও পিষ্ট করিয়া সরকারের অধীন কর্পোরেশনের আয় বর্দ্ধিত করা হইবে। আর সরকার ব্যবস্থা পরিষদে অনুবর্ত্তীদিগের সংখ্যাধিক্যের সুযোগ লইয়া যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে কেবল এই কথাই বলা যায় যে, পরবর্ত্তী সরকার গণতন্ত্রের মর্য্যাদারক্ষাপ্রয়াসী হইয়া সেই নিন্দিত আইন কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত না করিলে কলিকাতাবাসীর অব্যাহতি লাভের উপায় হইবে না।

আমরা ৪নং ওয়ার্ডের করদাতৃসঙ্ঘের সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত একখানি পুস্তিকা পাইয়াছি। তাহাতে সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদ বিশদভাবে করা হইয়াছে। সেই প্রতিবাদে যাঁহারা যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কর্পোরেশনের দুই জন ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী আছেন—যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি এক সভায় প্রস্তাবিত আইনের ৩০টি ধারায় আলোচনা করিয়া সে সকলের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ঐ পুস্তিকায় পরিস্ফুট করা হইয়াছে :—

(১) কলিকাতা কর্পোরেশন জল সরবরাহের, ড্রেণের, আলোকের, রাস্তার কোনরূপ উন্নতি সাধন করেন নাই।

(২) কলিকাতার পার্কগুলির অবস্থা শোচনীয়।

(৩) কলিকাতার অধিকাংশ অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা জলে ডুবিয়া যায়।

(৪) দুগ্ধ, খাদ্যদ্রব্য, তৈল, ঘৃত প্রভৃতিতে ভেজাল চলিতেছে।

(৫) অপরিস্কৃত জলের অভাবে শৌচাগার পরিস্কৃত করা অসম্ভব হয়।

তদ্ভিন্ন—রাস্তা হইতে আবর্জ্জনা লইয়া যাইবার ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। অপ্রকাশ্য কারণে অযোগ্য লোককে অনায়াসে উচ্চ বেতনের চাকরী দিয়া লোকবিশেষকে তুষ্ট করা হইতেছে, আর কাজের ক্ষতি করা হইতেছে।

কলিকাতায় করবৃদ্ধি অসঙ্গত—বিশেষ যে সময় কর্পোরেশনে জনগণের প্রতিনিধি নাই সে সময় তাহা বাঁধিয়া মারা—বলিয়া প্রতীকারার্থ করদাতাদিগের পক্ষ হইতে আদালতে নালিশ করা হইয়াছে। কিন্তু কর্পোরেশন তাহার ফলের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বর্দ্ধিত কর আদায় করিতেই শক্তি প্রযুক্ত করিতেছেন। ইহা আমলাতন্ত্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ব্যবহার। এই মোকর্দ্দমার ফল কি হয় দেখিয়া করদাতৃগণকে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ততদিনে, বোধ হয়, ব্যবস্থা-পরিষদেও নূতন নির্ব্বাচন শেষ হইয়া যাইবে।

যে ভাবে কলিকাতা কর্পোরেশনকে সরকারী বিভাগে পরিণত করিবার চেষ্টা নূতন আইনে হইতেছে, তাহাতে আইন-প্রণয়নকারীদিগের স্বৈরাচারি-মনোভাবের পরিচয়ই সপ্রকাশ।

পারস্য ও কোরিয়া—

পারস্যে যেমন কোরিয়ারও তেমনই অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না; বরং অবস্থায় জটিলতাবৃদ্ধি অনুভূত হইতেছে। পারস্য তাহার তৈলসম্পদে পরবশ্যতা জাতীয় পরবশ্যতারই চিহ্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহা দূর করিতে যেমন বদ্ধপরিকর, কোরিয়া তেমনই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদ অসহ্য বুঝিয়া তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। উভয়েরই বিবাদ মারণাস্ত্র-বিশারদ বহুধনশালী দেশসঙ্ঘের সঙ্গে। সুতরাং উভয়কেই হয়ত বিঘ্নকণ্টক-কণ্টকিত ত্যাগের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া জন্মগত অধিকার লাভ করিতে হইবে। একদিন হেমচন্দ্র অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান।" তাহারা কেহই আর অসভ্য নহে এবং বিদেশীর শাসনের বা শোষণের অথবা উভয়ের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া জন্মগত অধিকার লাভ করিয়াছে। আজ তাহারা সেই অধিকারের মূল্য বুঝিয়াছে এবং মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্ববিধ ত্যাগে প্রস্তুত।

পারস্য তাহার তৈল-সম্পদ জাতীয় করিতেছে—তাহাতে তাহার জাতীয় গঠনকার্য্যের জন্য আবশ্যক অর্থ লাভের সুবিধা হইবে এবং যদি কোন বিপদ ঘটে সে জন্য প্রস্তুত থাকিবার ব্যবস্থা করিতেও হইবে।

কোরিয়ার বিপদ ঘটিয়াছে। তাহাকে বিপদমুক্ত হইতে হইবে। সে জন্য সে যদি, মতবাদের কারণে, চীন ও রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করে, তাহা হইলে যে আশঙ্কা অনেকে করিয়াছেন, তাহাই হইবে—কোরিয়া হইতেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ব্যাপ্ত হইবে—যুদ্ধের লেলিহান অনলশিখা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া ধ্বংস আনিবে।

৫ই আশ্বিন, ১৩৫৮

মর্ত্তে দেবদূত

আশা গঙ্গোপাধ্যায়

নব প্রভাতের ভালে দেখেছি তোমারে যেন
তরুণ ভাস্কর,
জ্বলিতেছ রাজটীকা সম দিগ্বলয় উদ্ভাসিয়া
হে চির-ভাস্বর!
কুঞ্জে কুঞ্জে বনস্পতি বুকে যে নব মঞ্জরী ফোটে
কচি কিশলয়,
তোমার সবুজ প্রাণ সতেজ অন্তর সাথে
তুলনা কি হয়?
নবারুণ-রাগ লাগি পংকজের বুকে জাগে
যে হাসি সম্ভার,
মায়াজাল-পাতা তব সরল হাসির কাছে
মনে হয় ছার।
ভুলাল সবার হিয়া বাণী ভরা দুইটি আঁখির
মায়াময় দিঠি,
কমলের নীলাভ কোরক বৃথা কেঁদে মরে বুঝি
পদতলে লুটি।
বনমর্মরের মাঝে ওঠে যদি কভু চঞ্চলিয়া
খঞ্জনার পাখা

তারুণ্য তরল তনুমন তারও চেয়ে ওঠে উচ্ছলিয়া
কী মাধুরী মাখা!
সীমাহীন পারাবারে ভাঙ্গে যত তরংগের রাশি
ক্ষুব্ধ নতশির,
তোমার হৃদয় তটে গুমরিয়া ওঠে তত সুর
না-বলা বাণীর।
গোধূলির ধূসর আকাশে শত নক্ষত্রের মাঝে
তুমি শুকতারা,
তোমারে দেখিয়া বুঝি দিশা পায়, আলোর দিশারী,
কত পথহারা?
মধুরজনীর কোলে জ্যোৎস্না ঢালে দিকে দিকে
যে রজতধার,
সেই মত মন মাধুরিমা বিলায়েছ অন্তর ভরিয়া
বুকে সবাকার।
ধরিত্রী যেমতি দেয় নিজ বক্ষ উজাড়িয়া
সন্তানের লাগি
সেই মত প্রেমমন্ত্রে জনগণে জাগাবারে
সাজিয়াছ ত্যাগী॥

(পূর্বানুসরণ)

পিতামহ ব্যঙ্গ করিয়া উঠিলেন।

"অমন হাঁ করে আছ কেন। এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা অস্থির হচ্ছ কেন। এ সব তোমার মাথায় ঢুকবে না। যে যাতে আনন্দ পায়, তাই তার মাথায় ঢোকে। জোঁক তাই রক্ত বোঝে, ভ্রমর বোঝে মধু আর বিশ্বকর্ম্মা বোঝে মিস্ত্রিগিরি। এ নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি—ক্যাঙারু তৈরি শেষ হলে' তিমি বানিয়ে দিও কিছু। কিছুক্ষণ আগে উত্তর মেরুতে গিয়েছিলাম দেখলাম তিমি খুব কমে গেছে। সেখানে এমন একদল মানুষ জুটেছে যে বড় বড় তিমিগুলোকে ধরে' ধরে' সাবাড় করে' দিচ্ছে। এই মানুষগুলোকে নিয়ে অস্থির হয়ে পড়া গেছে, তছনছ করে' ফেললে সব। ওই যে সরো এসে গেছে, ওর জন্যই অপেক্ষা করছি, তুমি যাও এবার।"

একটা অপরূপ সুর দ্বার পথে প্রবেশ করিল। বিশ্বকর্ম্মা বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু প্রস্থান করিলেন না, তিনি দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেবী বীণাপাণির অভিনব আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। সুর ক্রমশ ঘনীভূত হইতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল অসংখ্য ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। সহসা সুর থামিয়া গেল, আলোক বিকশিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সবিস্ময়ে দেখিলেন—সহস্রবর্ণ এক শতদল শূন্যে বিকশিত হইয়াছে, ক্রমশ দেবী বীণাপাণি তাহার উপর মূর্ত্ত হইলেন।

পিতামহ পুলকিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুখে তিনি বলিলেন—"সরো, বড্ড বেশী ভড়ং করছ তুমি আজকাল। চার্ব্বাককে ভোলবার জন্যে এসব দরকার হতে পারে কিন্তু আমার কাছে অতটা না-ই করলে। আচ্ছা সরো, ভবিষ্যৎ যুগেও চার্ব্বাক থাকবে না কি"

সরস্বতীর অধরে একটি মৃদু হাস্য কম্পিত হইতেছিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তিনি উত্তর দিলেন—"অনন্ত জিজ্ঞাসাই তো যুগে যুগে চার্ব্বাকের রূপে মূর্ত্ত হয়েছে পিতামহ। আপনারই প্রেরণা তো সৃষ্টি করেছে তাদের। ভবিষ্যৎ যুগেই বা সে থাকবে না কেন। জিজ্ঞাসার তো অন্ত নেই"

পিতামহ হাসিয়া বলিলেন—"জিজ্ঞাসার অন্ত থাকলেও বা থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কোনও অন্ত নেই। তুমিই তো নাচাচ্ছ আমাকে। শুধু আমাকে কেন বিষ্টুকেও। মহাদেবকেও। যিনি সরস্বতী, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই দুর্গা। তুমি কম না কি!" পিতামহ আবেগভরে অগ্রসর হইয়া বীণাপাণিকে চুম্বন করিলেন।

"কি বলছেন পিতামহ, লক্ষ্মীর সঙ্গে তো আমার ঝগড়া—"

"ওসব বাইরের মৌখিক ঝগড়া। আসলে তুমি, লক্ষ্মী আর দুর্গা তিনজনেই এক। ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরের জন্যে এককে ভেঙে তিন করতে হয়েছে। একটাকে নিয়ে তিন জনে তো আর কাড়াকাড়ি করা যায় না। ওঃ এককালে কি মারপিটই করা গেছে—"

"কি হয়েছিল বলুন না"

"সে অনেক কথা, অত কথা বলবার এখন সময় নেই"

"একটু বলুন না—"

"কি হবে সে সব শুনে। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাক এস। ভাবীকালের চার্ব্বাক কেমন হবে, তার পরিণতি কি হবে, তারই একটা আঁচ দাও বরং তুমি"

"তা দেব। কিন্তু আপনি আগে ওই কথাটা বলুন"

"কি মুশকিল। ছাড়বে না যখন শোন তবে। ডিম ফেটে আমি যখন বেরুলাম তখন দেখি কোথাও কেউ নেই। চতুর্দ্দিক খাঁ খাঁ করছে। ভাবলাম ভালই হয়েছে, আমাকে যখন সৃষ্টি করতে হবে তখন চারিদিকে ফাঁকা

থাকাই ভাল। নিজের সৃষ্টি দিয়ে চারিদিক পরিপূর্ণ করে' তুলব। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম চারিদিকে। ভাবতে লাগলাম প্রথমে কি সৃষ্টি করা যায়। অনেকক্ষণ ভেবে স্থির করলাম সৃষ্টির প্রাণ হচ্ছে রস। সুতরাং প্রথমে রস-সৃষ্টি করতে হবে। যেমনি কথাটি মনে হওয়া আর অমনি চারিদিক জলে থৈ থৈ করতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই জলে ভাসতে ভাসতে বিষ্ণু এসে হাজির হলেন। বিষ্ণুকে জিগ্যেস করলাম—তুমি কে হে। বিষ্ণু উত্তর দিলেন—আমি সৃষ্টিকর্তা। আমি বললাম, কি রকম, সৃষ্টিকর্তা তো আমি। আমার কথা শুনে বিষ্ণু এত চটে' গেলেন যে চড়াৎ করে' তাঁর কপালটা ফেটে গেল, আর সেই ফাটল থেকে বেরিয়ে এলেন রুদ্র। ইনিই পরে মহাদেব হয়েছেন। এঁকেও জিগ্যেস করলাম—বাবাজি, তুমি কে। বাবাজি উত্তর দিলেন—'আমি সৃষ্টিকর্তা'। আমি তো অবাক। দুজনকে দেখেই তখন অবাক হয়েছিলাম। তেত্রিশ কোটি তখনও জোটে নি। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মহাশূন্য অতি মধুর কলহাস্যে শিউরে উঠল যেন! ঘাড় তুলে দেখি অপরূপ এক জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি আমাদের তিনজনের দিকে চেয়ে বললেন, "আমি মহাশক্তি। আমাকে যিনি লাভ করতে পারবেন তিনিই হবেন সৃষ্টিকর্তা, কারণ আমার সহায়তা ভিন্ন কোনও সৃষ্টিই হতে পারে না।" তিনজনই তখন উদ্বাহু হয়ে ছুটলাম তাঁর পিছু পিছু। তিনিও ছোটেন, আমরাও ছুটি। কিছুদূর ছোটবার পর বিষ্ণু জাপটে ধরে' ফেললে তাকে। তারপর আমি এসে দুজনকেই জাপটে ধরলুম। ময়শা মোটা মানুষ, অনেক পিছিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেও শেষকালে এসে আমাদের তিনজনকেই জাপটে ধরলে। চরম জাপটা-জাপটি চলছে জলের ভিতর, হঠাৎ আমার মনে হল এই ধস্তাধস্তিতে অমন সুন্দর মেয়েটি বোধহয় মারা গেল। আহা, ওকে যদি কোনরকমে সরানো যায়! আমার একটা ক্ষমতা আছে, তোমরা বোধহয় জান না, আমি যক্ষুণি যা মনে করব তক্ষুণি তাই হয়ে যাবে। আমি মনে করবামাত্র মহাশক্তি অন্তর্দ্ধান করলেন, কোথায় বা কি ভাবে তা আমি এখনও জানি না। তিনজনে মিলে বহুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে' যখন আমরা গলদঘর্ম্ম এবং পরিশ্রান্ত তখন বিষ্ণু সকাতরে মহাদেবকে বললেন—আপনি আমার পিঠের উপর থেকে নামুন, আমার মনে হচ্ছে মেয়েটি সরে' পড়েছে। মহাদেব আমাকে বললেন, আমার কোমরটা ছাড়ুন তাহলে। তিনজনেই উঠে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দেখি সত্যিই মহাশক্তি নেই। বিষ্ণু আর কথাবার্ত্তা না বলে' চিৎ সাঁতার কাটতে কাটতে সরে' পড়লেন। মহাদেব আমার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন—আপনি কে বলুন দেখি। বললাম, আমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। মহাদেব হেসে বললেন, তাই না কি। আপনিও সৃষ্টিকর্তা? আচ্ছা, আমার জন্যে বেশ নধর একটি ষাঁড় তৈরি করুন দেখি। আমি বললাম—কেন ষাঁড় নিয়ে কি হবে? মহাদেব বললেন—এই জলে ছপ ছপ করে কাঁহাতক হেঁটে বেড়ানো যায়। একটা ষাঁড় পেলে তার পিঠে চড়ে বেড়াতাম। আমি বললাম, তুমি তো নিজেই সৃষ্টিকর্তা বাবাজি, নিজেই নিজের ষাঁড় সৃষ্টি করে নাও না। ময়শা কি বললে জান? বললে—আমি নিজের জন্য কখনও কিছু সৃষ্টি করব না। যা কিছু করব পরের জন্যে। কি ধূর্ত্ত দেখ। আসলে ও দেখতে চাচ্ছিল যে আমি সত্যি কিছু সৃষ্টি করতে পারি কি না। দিলাম একটা ষাঁড় সৃষ্টি করে'। বিরাট এক ষাঁড়। ময়শা টপ করে চড়ে বসল তাতে। আমার দিকে ফিরে বললে—আমি চললুম। আবার দেখা হবে। পারেন তো আমার জন্যে একটা ভালো পাহাড় তৈরি করে' দেবেন। আমিও কম ধূর্ত্ত নই, সঙ্গে সঙ্গে বললাম—'তোমার জন্যে তো ষাঁড় তৈরি করে' দিলুম, তুমি আমার জন্যে কিছু একটা করে' দিয়ে যাও। নিজের জন্যে কিছু করাটা সত্যিই ভাল দেখায় না।' ময়শা বললে, বেশ আপনি কি চান বলুন। আমি বললাম, আমার জন্যে একটি হাঁস করে' দাও বাপু। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র চলবে। ময়শার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলুম। আকাশের দিকে চেয়ে তিনটি তুড়ি মারলে কেবল, আর পাখা ঝটপট করতে করতে বিশাল এক রাজহংস নেমে এল আকাশ থেকে। ময়শা ষাঁড়ে চড়ে চলে গেল। আমিও চড়ে' বসলুম হাঁসের পিঠে। হাঁস উড়ে চলল মহাশূন্যে, অন্ধকার মহাশূন্যে, তখনও সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র কিছুই সৃষ্টি হয় নি, বাতাসও সৃষ্টি হয় নি। সেই নিবাত নিষ্কম্প অন্ধকারে হাঁসের পিঠে চড়ে আমি উড়ে চললুম। কতকাল যে চলেছিলুম তা জানি না।

সৃষ্টি তখনও হয় নি সেই সৃষ্টির স্বপ্নে মশগুল হয়ে চলেছিলুম। হঠাৎ দেখলাম—খানিকটা অন্ধকার কাঁপছে, থর থর করে' কাঁপছে। আর একটু কাছে যেতেই কথা শুনতে পেলাম। অন্ধকার মহাশূন্য বাণীর আবেগে কাঁপছিল। শুনতে পেলাম—কোথায় তুমি, আমাকে প্রকাশ কর, আমাকে সফল কর, সৃষ্টির উল্লাসে আমাকে বিকশিত কর, অন্ধকারের অন্তরালে আমাকে সংহরণ করে' রেখেছ কেন স্রষ্টিকর্তা। নব নব সৃষ্টির বৈচিত্র্যে মুক্তি দাও আমাকে। আমার হাঁস মহাশূন্যে পক্ষ বিস্তার করে' থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হল—এরই উদ্দেশ্যে সে যেন উড়ে আসছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, কে তুমি? কাকে ডাকছ? উত্তর পেলাম—আমি মহাশক্তি। তোমাকেই ডাকছি। তোমারই কল্পনার নির্দ্দেশে আমি এই অন্ধপুরীতে অজ্ঞাতবাস করছি। আমাকে মুক্ত কর, তুমি বললেই আমি মুক্তি পাব। তোমাদের তিনজনের কলহ-নিবারণের উপায়ও আমি ভেবে রেখেছি। আমাকে মুক্তি দাও, সব বলছি। অপরূপ এক কল্পনায় আমার চিত্ত উদ্বেলিত হয়েছে, আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে প্রকাশ কর—। আমি বললাম—মুক্ত হও। অন্ধকারের আবরণ সরে' যাক। তোমার সম্পূর্ণ মহিমায় তুমি প্রকাশিত হও। সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি প্রকাশিত হলেন। মহাশূন্যের প্রগাঢ় অন্ধকার উদ্ভাসিত করে' আবার আবির্ভূত হলেন সেই জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। আমি বললাম—কলহ নিবারণের কি উপায় ভেবেছ এইবার বল। মহাশক্তি বললেন—বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও সৃষ্টিকর্তা, ওঁদেরও বঞ্চিত করলে চলবে না, ওঁদের বঞ্চিত করলে তোমারই সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং ঠিক করেছি আমি ত্রিধাবিভক্ত হব। আমার এক একটি ভাগ এক একজনের কাছে থাকবে। আর একটি ব্যবস্থাও করতে হবে। তোমাদের তিনজনের কাজ ভাগাভাগি করে' নিতে হবে। তোমার অফুরন্ত সৃষ্টির কাজ যদি অনাদিকাল অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও তাহলে তোমার এই বিশাল সৃষ্টির দেখাশোনা করবার ভার আর একজনকে নিতে হবে। তুমি নিজে যদি সে ভার নিতে যাও তাহলে তুমি বৈষয়িক হয়ে পড়বে আর স্রষ্টা থাকবে না। আমার মতে বিষ্ণুকে তুমি পালনকর্তা করে' দাও। আর মহেশ্বরকে কর সংহারকর্তা। কারণ সৃষ্টিকে চিরনবীন রাখতে হ'লে পুরাতনকে অপসারিত করতে হবে। মহেশ্বর সেই কাজ করুন। সৃষ্টি ব্যাপারকে অনাবিল অব্যাহত রাখতে হলে এই তিনটি জিনিসই দরকার। তোমরা তিনজন সৃষ্টিকর্তা এই তিনটি বিষয়ের ভার নাও, তাহলে তোমাদের ঝগড়াও থাকবে না, সৃষ্টিও নব নব বৈচিত্র্যে ভরে' উঠবে। আমি বললাম—কল্পনাটি করেছ মন্দ নয়, কিন্তু এসব হবে কি করে'। মহাশক্তি বললেন; তুমি ইচ্ছা করবামাত্রই হবে। তুমি বললেই আমি ত্রিমূর্ত্তি হয়ে যাব। বলেই দেখ না। আমি বললাম—মহাশক্তি তুমি তিনরূপে আবির্ভূত হও। বলবার সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি অন্তর্হিত হলো। একটু পরেই দেখি তুমি, লক্ষ্মী আর দুর্গা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছ—"

সরস্বতী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "কি যা তা বলছেন বানিয়ে বানিয়ে"

"এসব তোমার বেদে পুরাণে নেই। দু'একজন ঋষি তপোবলে খানিকটা খানিকটা জেনেছিলেন তাই বাড়িয়ে কমিয়ে খাদ মিশিয়ে সাতকাহন করে' লিখেছেন। কিন্তু আমি যেটা বলছি সেইটেই হচ্ছে আসল কথা।"

"বেশ, তারপর কি হল বলুন"

"তারপর আমি তোমার মুখের দিকে চাইলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি চোখ নীচু করলে। বুঝলাম আমাকেই পছন্দ হয়েছে তোমার। আমি আর কালবিলম্ব না করে' বললাম হৃদয়েশ্বরি, আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ কর। বলবামাত্রই কিন্তু তুমি যা করলে তা আমি প্রত্যাশা করিনি। আমি কথাটা বলেছিলুম রূপক ছলে, কিন্তু তুমি সত্যি সত্যি এসে আমার হৃদয় জুড়ে বসে' পড়লে। অর্থাৎ বাইরে তোমার আর কিছু রইল না। বহুকাল পরে নদীরূপে তোমাকে যখন ব্রহ্মাবর্ত্তের সীমারেখা করে' সৃষ্টি করেছিলাম তখন যেমন তুমি বালির মধ্যে ঢুকে অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত হয়েছিলে—আমার কাছে প্রথম যখন এলে তখনও তুমি একেবারে আমার অন্তর্লীনা হয়ে গেলে। আমার কল্পনায় ওত-প্রোত হয়ে বিরাজ করতে লাগলে—"

"তারপর?"

"তারপর যা ঘটেছে তাতো তোমার অজানা নয়। তারপর থেকে আমি যা করেছি তোমারই প্রেরণায় করেছি। লক্ষ্মী আর দুর্গার দিকে আমি [illegible]

চেয়েছিলাম তাই প্রথমেই সমুদ্র আর হিমালয় সৃষ্টি করতে হল।"

"কেন—"

"তুমি মনের ভিতর বসে' খোঁচা দিতে লাগলে কেন! ক্রমাগত বলতে লাগলে—ওদের সবাও চোখের সামনে থেকে। সমুদ্র সৃষ্টি করে' লক্ষ্মীকে রেখে এস তার তলায়, আর হিমালয় সৃষ্টি করে' দুর্গাকে পাঠিয়ে দাও সেখানে—"

সরস্বতীর নয়নযুগলে হাস্য টলমল করিতেছিল। তিনি আরও ক্ষণকাল পিতামহের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমার কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না"

"তোমার তো মনে থাকবার কথা নয়। তুমি আমার কল্পনায় ভর করে' যা কিছু কর তা আমার মনে থাকে। তোমার থাকবে কি করে'? তোমার কি তখন এই কুন্দেন্দুকান্তি দেহ থাকে, না মন থাকে? কখনও আলোর মতো—কখনও শিখার মতো—কখনও দেহ-হীন প্রেরণার মতো এসে আমার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ কর তুমি। তখন তোমার ভাবগতিক একেবারে অন্য রকম থাকে যে"

"বিষ্ণু আর মহেশ্বরের সঙ্গে আবার দেখা হল কবে"

"মনে মনে তাঁদের আহ্বান করলুম। তাঁরা আমার মানসলোকে এসে হাজির হলেন। মশাই ষাঁড়ে চেপে প্রথমে এল। আমার সব কথা শুনে বললে, বেশ আমার কিছুতেই আপত্তি নেই, বিষ্ণুকে ডেকে একটা পরামর্শ করুন। কিন্তু তার আগে খানিকটা দাঁড়াবার জায়গা দরকার যে। জলে ছপছপ করে' কাঁহাতক ঘুরে বেড়ানো যায়। আমাকে যে কাজ দেবেন তাতেই আমি রাজি আছি। একটি বেশ উঁচু দেখে পাহাড় করে' দিন আমাকে, আর আমি কিছু চাই না। এই বলে' মহেশ্বর তো অন্তর্দ্ধান করলেন। আমি তখন সেই বিরাট সমুদ্রের মাঝখানে তেকোনা একটি স্থলভাগ সৃষ্টি করলুম, আর তার একদিকে করলাম একটা পাহাড়। তোমার ভারতবর্ষ আর হিমালয় গো। সেই তেকোনা জায়গায় বিষ্ণু একদিন ঠেকলেন এসে ভাসতে ভাসতে। মহাদেবও এলেন। সেই ত্রিভুজাকৃতি স্থানের উপর দাঁড়িয়েই আমাদের তিনজনের চুক্তি—আমি হব সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হবেন পালনকর্তা এবং শিব হবেন সংহারকর্তা। তবে বিষ্ণুর সঙ্গে আমার কথা রইল যে আমি যখন খুশী আমার সৃষ্টির হিসাব তার কাছে একদিন দাবী করতে পারব। বিষ্ণুও রাজি হল তাতে। এইবার বিষ্ণুর কাছে হিসাবটা একদিন দাবী করব ভাবছি। আগে ভবিষ্যৎ লোকটা সৃষ্টি করে' ফেলি, তারপর সেই ভবিষ্যৎ লোকেই বিষ্ণুকে টেনে আনা যাবে একদিন।"

বিশ্বকর্ম্মা এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

সরস্বতী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভবিষ্যৎলোকে কিন্তু আর একটি জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি"

"কি বল তো"

"দেবসেনা এবং দৈত্যসেনা বলে' আপনার দুটি মুখরা পত্নী জুটবে"

"তাতো জানিই। আসলে ও দু'টি স্বৈরচর। ওরা নানারকম হবে। অপ্সরী হয়ে দেবতাদের ভোলাবে, মাছ হয়ে সমুদ্রে নদীতে সাঁতরে বেড়াবে, খেঁকি কুকুর হয়ে পথে ঘাটে ঝগড়া করবে? শেষকালে কিছুদিনের জন্যে ওদের সখ হবে স্বয়ং ব্রহ্মার পত্নী হয়ে ব্রহ্মার উপর প্রভুত্ব করতে। তাই হবে"

"তারপর ওদের পরিণতি কি হবে"

"সে তো ঠিক করবে তুমি। চার্ব্বাকের কাছে যে ইচ্ছেটি প্রকাশ করেছ তাতো সাংঘাতিক। তাই যদি তোমার প্রাণের বাসনা হয় তাহলে তাও পূর্ণ করতে আমি ইতস্তত করব না। তোমার বা তোমার চার্ব্বাকের ছুরির তলাতেই গলা বাড়িয়ে দেব"

ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া দেবী বীণাপাণি বলিলেন, "আমি চার্ব্বাকের কাছে কোনও ইচ্ছে তো প্রকাশ করি নি"

"বাঃ, তাকে বল নি যে পিতামহকে হত্যা না করলে সৃষ্টি রক্ষা পাবে না?"

"বলেছি। বলা প্রয়োজন মনে করেছি বলে' বলেছি। কিন্তু আপনি কি করে' মনে করলেন যে ওটা আমারই প্রাণের ইচ্ছে? যান আপনার কোন ব্যাপারে আর আমি থাকব না"

পিতামহের মুখমণ্ডল হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বীণাপাণির কটিদেশ বেষ্টন করত পুনরায় তাঁহাকে চুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন, "একটু রাগলে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায় তাই একটু রাগিয়ে দিলুম। আমি কি তোমার মনের কথা জানি না? তোমারও কি আমাকে চিনতে বাকী আছে সখি? তোমার বীণার সুরই যে আমি, আর আমার বীণারও সুর যে তুমি। আমরা পরস্পরকে বাজাচ্ছি। চিরকাল বাজাব। ভাবী যুগের চার্ব্বাকের ছবি কি রকম এঁকেছ একবার একটু দেখাও"

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীনাম-সাধনা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

জগতে জন্মগ্রহণ করে যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি, তাঁর জীবন অ-ধন্য।

"হর্ষে প্রভু কহে—শুন স্বরূপ রাম রায়।
নামসংকীর্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্তনযজ্ঞে করে কৃষ্ণে আরাধন।
সেই ত সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

সংসার-সাযুজ্যের জন্য কলিতে অন্য যজ্ঞের প্রয়োজন নাই, সংকীর্তনযজ্ঞই একমাত্র যজ্ঞ।

"সংকীর্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্ত শুদ্ধি, সর্বভক্তি সাধন উদ্‌গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্‌গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥"

সংকীর্তন থেকেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি—এই মহাপ্রভুর শিক্ষা। বলা বাহুল্য, শ্রীমহাপ্রভু নিজেই সংকীর্তন প্রবর্তন করেছিলেন, তাই কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

"সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সংকীর্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞ সার॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ)।

মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ উপাসক শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণ-চৈতন্যের এই শিক্ষা কত প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার অন্যতম বিশিষ্ট প্রমাণ আমরা পাই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ষট্‌-সন্দর্ভের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে, যেখানে তিনি সংকীর্তনাদির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন—

"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

অন্যত্রও মহাপ্রভুর কৃপাভিক্ষা করে সাধক শ্রেষ্ঠ বলেছেন—"কলৌ ... নিবাসঃ স্ফুটমভিবাজন্ত দ্যুতিভরা, দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎ-কীর্তনময়ৈঃ"—ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই চৈতন্যের কৃপাভিক্ষা করে, সংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা কলিযুগে পণ্ডিতগণ যাঁর সাক্ষাৎ অর্চনা করেন।"

(১) নাম ও নামীর অভেদ-তত্ত্ব

নাম ও নামীতে কোনও পার্থক্য নাই। যিনিই নিরন্তর নাম-কীর্তনে নিরত, তিনি নিরন্তর ভগবানকে নিয়ে থাকেন।

নাম ও নামীর অভেদ সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাসের একাদশ বিলাসে ২৬৯ অঙ্ক ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর বচনে উল্লেখ আছে—

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো-ভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃতটীকা দুর্গমসঙ্গমনীতে উপরিলিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন—নামই চিন্তামণি, কারণ নামই সর্বাভীষ্টদাতা শ্রীকৃষ্ণ, নামই কৃষ্ণের স্বরূপ। 'চৈতন্যরসবিগ্রহ' প্রভৃতি কৃষ্ণের বিশেষণ। নাম ও নামীর অভিন্নতা হেতু ঐ সব শ্রীনামেরও বিশেষণ। (১)

নামচিন্তামণি তাই শ্রীকৃষ্ণের মতই সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত।

(২) নামের অশেষ শক্তি

হরিভক্তি বিলাসের একাদশ বিলাসে ২৩৪ শ্লোকাঙ্কে পদ্মপুরাণের প্রভাস খণ্ড হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে:—

"মধুরং মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলচিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম"

অর্থাৎ নামের এমনি মহিমা যে এই নাম কেহ যদি শ্রদ্ধায় তো কথাই নাই, এমন কি হেলাভরেও গ্রহণ করেন, তা'হলে তাঁকেও কৃষ্ণনাম তারণ করবেন।

পদ্যাবলী'র ষোড়শ শ্লোকে কথিত আছে যে জগন্মঙ্গল হরিনাম তিমিরজলধির তরণি সদৃশ—

"তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।"

পদ্যাবলীর নামমাহাত্ম্য অধ্যায়ে ৩২ অঙ্কে শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুকৃত একটী শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে—

"নাম্নামকারি বহুধা, নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা, নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ"।

অর্থাৎ ভগবান্ নিজ নামসমূহের অনেক প্রকার প্রচার করেছেন এবং সেই নামে নিজ শক্তিসমূহ অর্পণ করেছেন, সেই নাম স্মরণে সময়ের কোনও নিয়ম নাই।

---

(১) নামৈব চিন্তামণিঃ সর্বাভীষ্টদাতা যতস্তদেব কৃষ্ণঃ, কৃষ্ণস্য স্বরূপমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য বিশেষণানি চৈতন্যাদীনি, তস্য কৃষ্ণস্যে হেতুঃ অভিন্নত্বাদিতি (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগ, ২য় লহরীর উদ্ধৃত শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকা)।

নামের কি অপূর্ব শক্তি—তা' শ্রীমদ্ভাগবত-প্রোক্ত অজামিলের উপাখ্যান থেকে জানতে পারা যায়। পাতকী অজামিলও পুত্রকে ডাকবার ছলে "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করে বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন :—

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥"

(ভাগবত, ৬,২,৪১)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাপনাশ বিষয়ে নামের অসাধারণ শক্তি বিষয়ে উল্লেখ আছে। জ্ঞানে হোক্ বা অজ্ঞানে হোক—নামকীর্তন করলে মানুষের পাপ বিনষ্ট হয়—

"অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃ শ্লোক নাম যৎ।
সংকীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥"

(ভাগবত ৬,১৩,৫)

(৩) নামকীর্তনাদির বিধান

নামের মহিমায় জগতের সমস্ত পাপী তাপী উদ্ধার পেতে পারে। অশেষ ভক্তিসহকারে নাম উচ্চারণ করতে করতে ভক্তহৃদয় শ্রীহরির নিবাস হয়ে দাঁড়ায়। আকাশে বাতাসে চিরনভোনীলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তছবি ভক্ত মুহুর্মুহুঃ নিরীক্ষণ করেন। হরিনাম কীর্তনের ফলে দিগ্‌দিগন্ত থেকে ভয় অপসৃত হয়ে যায়—

"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্॥"

(ভাগবত, ২,১,১১)

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগে ভগবতি তন্নাম-গ্রহণাদিভিঃ॥" (ভাগবত, ৬,৩,২৩)

হরিভক্তিবিলাসের একাদশ বিলাসে উদ্ধৃত জাবালি-সংহিতার বচনে পূর্ণ শান্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত নিরন্তর হরির নাম জপ, ধ্যান, গান ও কীর্তনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে—

"হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্।
কীর্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা॥"

চৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলায় ৭ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত নারদীয় বচনে কথিত হয়েছে যে কলিতে হরিনাম ব্যতীত আর গতি নাই, একমাত্র হরির নামই সম্বল—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

হরিভক্তিবিলাসের একাদশ বিলাসে উক্ত শ্লোকটি নিম্নলিখিত ভাবে উদ্ধৃত হয়েছে—

"হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

কলিতে জনগণের সাধনার বিনা—সেবাপরাধ নামাশ্রয়ে দূর হয়। নামাপরাধ হলে অর্থাৎ নামে অর্থবাদাদি কল্পনা করলে নিস্তার নাই। হরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত পদ্মপুরাণ বচন তার প্রমাণ।

নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

উপরিলিখিত ভাগবতোক্ত "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্" (ভাগবত ৬,৩,২২) প্রভৃতি শ্লোক থেকে জানা যায় যে নামসংকীর্তনরূপ যে ভক্তিযোগ, উহাই সাক্ষাদ্ ভক্তি। কর্মের অঙ্গরূপ অর্থাৎ ফলাধিক্য লাভের জন্য নাম গ্রহণ করলে নামাপরাধ হয়। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভের ৯২ শ্লোকাঙ্কের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের উপরিলিখিত শ্লোকের এই তাৎপর্যার্থ নির্ণয় করেছেন।

(৪) নামই পরম সাধন

(ক) নামই যে পরম সাধন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ আদিপুরাণের কৃষ্ণার্জুন সংবাদের অনবদ্য শ্লোক—

ন নামসদৃশং জ্ঞানং ন নামসদৃশং ব্রতম্।
ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশং ফলম্॥
ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশঃ শমঃ।
ন নামসদৃশং পুণ্যং ন নামসদৃশী গতিঃ॥

নামের সদৃশ জ্ঞান নাই, ব্রত নাই, ধ্যান নাই, ফল নাই, ত্যাগ নাই, শান্তি নাই, পুণ্যও নাই, গতিও নাই। এই সব কিছুর সেরা হচ্ছে নাম।

নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা স্থিতিঃ॥
নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতির্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ॥
নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরুঃ॥

নামই পরমা মুক্তি, গতি, শান্তি, স্থিতি, ভক্তি, মতি, প্রীতি, স্মৃতি। নামই জন্তুর কারণ, নামই প্রভু, নামই পরম আরাধ্য, নামই পরম গুরু। নামই সব কিছু।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—সত্যযুগে বিষ্ণুধ্যানে, ত্রেতাতে যজ্ঞসম্পাদনে, দ্বাপরে পরিচর্যায় যে ফল, কলিযুগে হরিনাম কীর্তনে সেই ফল—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥ ভাগবত, ১২,৩,[illegible]

ভাগবত সত্যই বলেছেন যে কলি অশেষ দোষের আকর হলেও একটি গুণে তার সমস্ত দোষ খণ্ডন হয়ে গেছে—শ্রীকৃষ্ণ নামকীর্তনে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥ ভাগবত, ১২,৩,[illegible]

[illegible]তে কীর্তনের মহিমা দিয়েছেন [illegible]—"নামলীলাগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্"। প্রবক্তার [illegible] বারংবার নারদপঞ্চরাত্রের (৪,৮,৯) অমূল্য বাণী জগজ্জনকে [illegible] :—

> "হরের্নামৈব কেবলম্।
> কলৌ বিমুক্তয়ে নৃণাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥";

[illegible] নামের প্রভাবে একদিন বঙ্গদেশে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান সকলে [illegible] সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। চাঁদ কাজী, সৈয়দ মর্তুজা, [illegible] মামুদ, ফকির হবিব, অলিরাজা, আকবর সাহা, সেখ ভিখন, সেখ [illegible] প্রভৃতি মুসলমান কবিরাও গোরাচাঁদের ও কানুর প্রেমে মাতোয়ারা [illegible]ছিলেন এবং বঙ্গ জননীর দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে গেয়েছিলেন—

> "শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি।
> কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে
> পাসরিতে নারি আমি।"

[illegible] চরণ শরণ করে চট্টগ্রামের মুসলমান কবি গেয়েছিলেন—

> "আগম নিগম বেদসার, লীলা যে করত গোঠবিহার।
> নসীর মামুদ করত আশ, চরণে শরণ দানবি ॥"

নামের প্রভাবে অখণ্ড বঙ্গদেশ নিখিল বিশ্ব মাতোয়ারা করেছিল। বুদ্ধিমন্ত [illegible] ঐ মহাপ্রভুর প্রধান সেবক হয়েছিলেন ঐ নামের প্রভাবেই, ঐ নামের প্রভাবেই যবন হরিদাস তাঁর প্রিয় শিষ্য হয়েছিলেন। নাম ভুলে গিয়ে [illegible] আজ আর কানুর বাঁশী শোনে না ; তাই আজ আর বঙ্গবাসী [illegible] কাজীরাও গায় না—

> "ও পার হতে বাজাও বাঁশী, এ পার হইতে শুনি।
> আর অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি ॥
> যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী, সে ঝাড়ের লাগি পাঁও।
> জড়ে মূলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাও ॥
> চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
> জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি ॥"

হতভাগা বঙ্গদেশ নামের মহিমা ভুলেছে। নাম-মহিমায় রত্নাকর দস্যু "মরা মরা মরা" করে রামকে পেয়েছিলেন ; নামের মহিমা ভুলে বর্তমান দস্যুরা "টাকা টাকা টাকা" করে সমস্ত বিশ্বসংসার "কাটা কাটা কাটা" করে ফেল্‌লো। নামের প্রভাবে ত্রিখণ্ড বঙ্গদেশ কবে আবার অখণ্ড হবে? পিশাচী ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা বঙ্গবাসী ভ্রাতৃমণ্ডলীর হৃদয় থেকে কবে বিদূরিত হবে—হৃদয়ে তাঁদের ডাক্‌বে প্রেমের ও ভক্তির বান, হরি পুনরায় সকলের কানে অমৃত বর্ষণ করে শোনাবেন—

> "সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ।
> অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ ॥
> ত্যক্তবন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্।
> একস্তস্যাস্মি স চ মে, ন চান্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃদ্ ॥"

(হরিভক্তি সুধোদয়)

তাঁরা আবার বুঝতে পারবেন—

> "ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।
> কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
> তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন।
> নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥"

দুই দিক

দেবনারায়ণ গুপ্ত

১

জীবনের মধ্য পথে এসে ;
সমস্তারে করিয়াছি জড়ো—
সব স্বপ্ন গেছে আজ ভেসে,
ভাবি আমি, কত ক্ষুদ্রতর।

২

এ বিশাল পৃথ্বীতলে হায়।
আসা-যাওয়া করে যারা শুধু ;
মরীচিকা দেখে ছুটে যায়—
নিরাশার বালু হেরে ধূ-ধূ !

৩

পান্থ-পাদপে দেখি যারা
ছুটে যায় মিটাইতে তৃষা ;
প্রকৃতির সেবায় তুষ্ট তারা ;
দিশাহারা পায় যেন দিশা।

৪

আশা ও নিরাশা আছে ; দিনরাতসম ;
মরু আছে, জল আছে, একই মাটীতে।
বিগত দিনের স্মৃতি শুধু মনোরম।
আজ দেখি, মিশে আছি ভেজাল-খাটীতে

পশ্চিম বাঙলার রাস্তাঘাট

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

দী-মাতৃকা বাঙলায় রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়েছে সত্য, কিন্তু পশ্চিম বাঙলার সুবিধে-অসুবিধের কথা বিবেচনা করলে এ খণ্ডিত বাঙলায় নূতন রাস্তাঘাটের পরিকল্পনা অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে র্তমানে। আজকাল পশ্চিম বাঙলায় বাস্তহারারা এসে পড়ায় এ রাষ্ট্রের য় সকল অংশেই জন-বাহুল্য দেখা দিয়েছে। ১৯৫১ সালের জনগণনার পূর্ব্বে অধুনা-কথিত পশ্চিম বাঙলা রাষ্ট্রের জনসংখ্যার যে হিসেব করা যায় তাতে এখানে ২ কোটির উপর লোক বসবাস করছে। এ রাষ্ট্রের মোট আয়তন প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গ মাইল। কিন্তু রাস্তাঘাটের মোট পরিমাপ হল ২ হাজার মাইলের কিছু উপরে। প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র দশমিক ৪ মাইল রাস্তা পশ্চিম বাঙলায় বর্ত্তমান। সেরূপ বিচারে ভারতীয় রাষ্ট্রের রাস্তা ০·১৯ মাইল, যুক্ত রাজ্যের ২ মাইল, আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মাইল।

বাঙলায় রাস্তার এক বিশেষ পত্তনি হয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের রে। শের সাহ ছিলেন একজন আফগান সেনানায়ক। তিনি এক য় এমন ক্ষমতাবান হয়ে দাঁড়ান যে মোগল-সম্রাট হুমায়ুন তাঁর ভয়ে ল্লীর সিংহাসন ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। শের সাহ পাঞ্জাব থেকে ঙলা পর্য্যন্ত সারা উত্তর ভারতের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন বেশ কিছুদিনের য। পূর্ব্ব বাঙলায় সোণারগাঁ বলে যে লোকালয় আজও আছে সেই-নে ছিল শের সাহের এক ঘাঁটি। এ' ঘাঁটির সঙ্গে পাঞ্জাবের শেষ সৈন্য-াঁটির যোগাযোগ রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন শের সাহ এক রাস্তা তৈরী রিয়ে। সেকালের আরও বিশেষ বিশেষ শহর ও লোকালয়গুলোকে তার শেকলে বাঁধা হয়েছে।

শের সাহের তৈরী রাস্তার বর্ত্তমান সংস্করণ হল গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, লর্ড ড্যালহাউসি তখন ভারতের বড় ট, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের আমূল সংস্কার সাধন করা হয়।

হাওড়া থেকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সুরু হয়েছে; এ' রাস্তা ধরে উত্তর রতের দিকে এগিয়ে গেলে পেশোয়ার পর্য্যন্ত এক সময় যাওয়া সম্ভব ল। আজ রাজনৈতিক কারণে এই রাস্তার গুরুত্ব খানিকটা কমে য়েছে।

শের সাহ ছাড়া আর একজন বাঙলায় রাস্তা তৈরীর কাজে সহায়তা রেছিলেন। ইনি হলেন রাণী অহল্যাবাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ল্যাবাই ইন্দোরের শাসনভার প্রায় ৩০ বছর কাল খুবই সাফল্যের সঙ্গে ন করেন। সেকালে মারাঠাদের অত্যাচার, অনিয়ম. দেশে অরাজকতার করেছে; সেই অরাজক অবস্থার মাঝে অহল্যাবাই শান্তি-শৃঙ্খলার এক গড়ে তুলেছিলেন ইন্দোর রাজ্যে।. তাই তাঁর নাম সারা দেশ জুড়ে। লায় বর্গীর হাঙ্গামা ঘটেছে মোগল আমলের শেষ থেকে অনেক দিন পর্য্যন্ত। বর্গীরা এদেশে আসা যাওয়ার ফলে এক রাস্তার রেখা পড়ে থাকবে বাঙলা আর উত্তর ভারতের মাঝে। হাওড়ায় বেনারেস রোড বলে যে রাস্তা রয়েছে সেইটে অহল্যাবাইয়ের নামের সঙ্গে বিজড়িত আছে আজও। বোধহয় বর্গীরা এ রাস্তায় আসা যাওয়া করত, পরে তাদের হাঙ্গামা কমে এলে এ রাস্তাটির সঙ্গে রাণী অহল্যাবাই এর নাম সংযুক্ত হয়ে পড়ে মন্দকে ভালোর আবরণে ঢেকে দেওয়ার প্রচেষ্টায়।

প্রতি বর্গ মাইলে পশ্চিম বাঙলায় রাস্তার গড় হিসেব দাঁড়ায় ·৪১ মাইল। এরূপ হিসেবের অঙ্ক ভারতবর্ষ, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দাঁড়ায় ·০১৯, ২·০, ১·৯ এবং ১·০ মাইল। আয়তনের তুলনায় পশ্চিম বাঙলায় ভারত অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ লোক বসবাস করে। প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ·৫৬ মাইল রাস্তার যে হিসেব পাওয়া যায় সেই হিসেব ভারত সম্পর্কে দাঁড়ায় ·৭৫ মাইল-এ। পশ্চিম বাঙালার মোট রাস্তার প্রায় শতকরা ৯৪ ভাগই কাঁচা, তারপর আবার কাঁচা রাস্তাগুলোর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগই কেবলমাত্র গরুর গাড়ী যাওয়ার পক্ষে উপযোগী।

বাঙালার রাস্তা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে গেল দেশ বিভাগের সময় থেকে। ১৯৪৩ সালে নাগপুর সম্মেলনে দেশের রাস্তাঘাট উন্নয়ন সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় দেশ বিভাগের পর সে-প্রস্তাবের অনেক অদল-বদল করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। বিভাগের পর সীমান্তস্থিত লোকালয়-গুলো যাতে দেশের অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে তার সুব্যবস্থা করার আবশ্যকতা দেখা দিল।

বর্ত্তমানে পশ্চিম-বাঙলা ভৌগলিক ও রাজনৈতিক বিচারে তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। উত্তর বিভাগে রয়েছে দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার। এ' বিভাগ অন্য দু'টী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্য দু' বিভাগ থেকে এ' বিভাগে যেতে হলে অনেক ঘুরে ফিরে রেলের সাহায্যে এগুতে হবে। তাতে যেমন হবে সময় ব্যয়, তেমনি পথের শ্রম আর পয়সা খরচ। মধ্য বিভাগে রয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ। আর দক্ষিণ বিভাগে রয়েছে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলি, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া। মধ্য আর দক্ষিণ, এ' দু'বিভাগের যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুব ভাল নয়। সারা বছরের উপযোগী রাস্তা এ দু'বিভাগের মাঝে একটিও নেই।

তাই, আজ পশ্চিম বাঙলার সরকারের সর্ব্বপ্রধান কাজ হল সমস্ত ঋতুর উপযোগী এক রাস্তা তৈরী করা, যে-রাস্তা দেশের দক্ষিণ, মধ্য ও উত্তর বিভাগকে সংযোজিত করবে। কলকাতা থেকে এক রাস্তা মুর্শিদাবাদ হয়ে মালদহ পর্য্যন্ত যাবে, তারপর সে-রাস্তা কাটিহার-পূর্ণিয়া হয়ে যাবে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত। শিলিগুড়ি থেকে দার্জ্জিলিং ও ভূটান যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। কলকাতা-শিলিগুড়ি রাস্তার যে গতিবিধি স্থির করা গেল, এ

প্রতিবিধির সমর্থনে কলকাতা থেকে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত রাস্তা বর্ত্তমানে তৈরী আছে।

১৯৪৮ সালে পশ্চিম বাঙলার সরকার নানা নূতন রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা ও রাস্তা তৈরীর কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে করার উদ্দেশ্যে এক বিভাগ সৃষ্টি করেন। এ' বিভাগ ১৯৪৯ সালের শেষভাগ থেকে কাজ সুরু করে দিয়েছে। প্রথম পাঁচ বছরের জন্য যে পরিকল্পনা এ' বিভাগ তৈরী করেছে তার সামান্য পরিচয় দেওয়া যেতে পারে এ ভাবে। এ' পরিকল্পনায় ১৩টি বড় রাস্তা, আর কতকগুলো গ্রাম্য-রাস্তা তৈরী করার নির্দ্দেশ আছে। তেরোটি বড় রাস্তাকে ভাগ করা হয়েছে দু'ভাগে,—প্রথম ভাগ হচ্ছে জাতীয় রাস্তা, আর দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে প্রাদেশিক রাস্তা। বর্ত্তমানে জাতীয় রাস্তার অন্তর্ভুক্ত রাস্তাগুলোর মোট পরিমাপ ৩৫১ মাইলের মত। আর প্রাদেশিক রাস্তার মোট পরিমাণ ৩৪৪ মাইল। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী যে জাতীয় ও প্রাদেশিক রাস্তা তৈরী করার প্রস্তাব হয়েছে তাতে প্রায় ২১ মাইল জাতীয় রাস্তা ও ৩৯২ মাইল প্রাদেশিক রাস্তার উন্নয়ন করতে হবে। আর যে-পরিমাণ নূতন রাস্তা তৈরী করতে হবে তার হিসেব হচ্ছে এরূপ:—জাতীয় রাস্তা—৩২১ মাইল; প্রাদেশিক রাস্তা—৩৫০ মাইল, আর অন্যান্য রাস্তা—প্রায় ১,৪০০ মাইল।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করা হলে দেশে জাতীয়, প্রাদেশিক ও অন্যান্য রাস্তার মোট হিসেব দাঁড়াবে প্রায় ২,৮৬৯ মাইলে। নূতন রাস্তা তৈরী, পুরোণ রাস্তার উন্নয়ন আর রক্ষণাবেক্ষণের মোট খরচ অনুমান করা গিয়েছে প্রায় ৩২ কোটি টাকা। পরিকল্পনাটির সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হলে পশ্চিম বাঙলার রাস্তাঘাটের দুর্দ্দশা অনেকাংশে কমে আসবে সত্য, কিন্তু এ' রাষ্ট্রের নানা সমস্যা বিচার করে দেখলে যে-পরিমাণ টাকার প্রয়োজন—পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করতে সে টাকা জোগাড় করা বোধ করি বর্ত্তমানে সম্ভব নয়। অবিশ্যি ৩২ কোটি টাকাই একবারে আবশ্যক হবে না; প্রতি বছরে প্রায় ৫।০ কোটি টাকা হলেই কাজ চালু রাখা যেতে পারে। কিন্তু এ টাকাও পশ্চিম বাঙলার সরকার সহজে সংগ্রহ করতে পারবেন না বলেই মনে হয়।

যে সামান্য টাকাই সরকার ব্যয় করতে সক্ষম সে-টাকাতেই যাতে কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাস্তাঘাটের বিশেষ বিভাগ কেবলমাত্র একান্ত প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাটগুলোর কাজ ক্রমান্বয়ে করে যাওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

সে যাই হোক, পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাটির একটু বিশদ পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। তাই, নীচে তালিকাটি দিলাম।

জাতীয় শড়ক

(১) কলকাতা দিল্লী শড়ক—হাওড়া থেকে সুরু হয়ে হরিপাল হয়ে রাস্তাটি মেমারী। সেখানে মিশেছে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড বড় শড়কের সঙ্গে।

(২) কলকাতা-বোম্বাই শড়ক; কলকাতা-মাদ্রাজ শড়ক—কলকাতা দিল্লী শড়কের সঙ্গে মিশে চলবে হরিপাল পর্য্যন্ত। সেখানে আর একটি নূতন শড়কে গিয়ে পড়বে। এ শড়ক মেদিনীপুর, খড়্গপুর হয়ে পশ্চিম বাঙলায় দিনাজপুরের সীমান্তবর্ত্তী শহর রায়গঞ্জে গিয়ে বিহারের মধ্যে প্রবেশ করবে। কলকাতা-বোম্বাই অথবা কলকাতা-মাদ্রাজ শড়ক পশ্চিম বাঙলায় একই শড়ক হয়ে থাকবে।

(৩) বিহার-আসাম শড়ক—পশ্চিম বাঙলায় এ শড়ক কলিকাতা-শিলিগুড়ি শড়কের একাংশ।

(৪) কলকাতা-শিলিগুড়ি শড়ক—এ শড়কটির বৃত্তান্ত আগেই দেওয়া গিয়েছে।

(৫) কলকাতা বনগাঁও শড়ক—এ শড়ক পাকিস্থান সীমান্তে পৌঁছে কলকাতা যশোহর শড়কের সঙ্গে মিশেছে।

প্রাদেশিক শড়ক

(১) প্রথম শড়কটি বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের জিলা শহরগুলোকে সংযোজিত করবে। মোড়গ্রাম, নলহাটি, সাঁইথিয়া, শিউড়ি, রাণীগঞ্জ শহরগুলোও এ রাস্তায় পড়বে।

(২) কলকাতা-কাকদ্বীপ শড়ক—এ রাস্তা ডায়মণ্ডহারবার হয়ে আসবে কলিকাতায়। পরে এ রাস্তাই নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জিলার প্রধান প্রধান শহরগুলোকে করবে শৃঙ্খলিত। এ রাস্তায় পড়বে কৃষ্ণনগর, পলাশী, বহরমপুর, লালগোলা ও রঘুনাথগঞ্জ। রঘুনাথগঞ্জে এ রাস্তা কলকাতা-শিলিগুড়ি-শড়কের সঙ্গে মিশবে।

(৩) বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার শহরগুলো তৃতীয় শড়কের উপর এসে পড়বে। কলকাতা-শিলিগুড়ি শড়কের উপর অবস্থিত সাঁইথিয়া শহর থেকে এ রাস্তাটি চলতে সুরু করে বহরমপুরে এসে থেমেছে কাকদ্বীপ-রঘুনাথগঞ্জ রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

(৪) বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার ভেতর দিয়ে যাবে এক শড়ক, যে শড়ক পশ্চিম বাঙলা ও উড়িষ্যার মাঝে যে প্রাদেশিক সীমান্ত শড়ক আছে তার সঙ্গে কলকাতা-দিল্লী জাতীয় শড়কের সংযোগ সাধন করবে।

(৫) কলকাতা আর মেদিনীপুর শহরের মাঝে থাকবে এক শড়ক। এ শড়ক হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার যোগাযোগ রক্ষা করবে।

(৬) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহর থেকে আরম্ভ হয়ে দিনাজপুর ও মালদহের জেলা শহরগুলোর গা ঘেঁসে এক রাস্তা এসে দাঁড়াবে গাজোল বলে এক স্থানে। এখানে রাস্তাটি মিশবে কলকাতা-শিলিগুড়ি শড়কের সঙ্গে।

(৭) দার্জ্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলার সদর একটি নূতন শড়কের সাহায্যে সংযুক্ত হবে। এ শড়কটি শিলিগুড়ি শহরে কলকাতা-শিলিগুড়ি শড়কের সঙ্গে মিশবে।

এসব জাতীয় ও প্রাদেশিক শড়ক ছাড়াও অনেক উপশড়ক ও গ্রাম্যরাস্তা তৈরীর কাজ পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত হয়েছে। সেগুলোর বিশদ বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করছিনে।

এখানে পশ্চিম বাঙলায় রাস্তাঘাটের কাজে যেসব অসুবিধে উপস্থিত

হতে পারে তারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বর্ত্তমান আলোচনা শেষ করব।

পশ্চিম বাঙলার এক এক অংশের জমি এক এক ধরণের; এক এক স্থানের বৃষ্টিপাত এক এক রূপ। এ' সব কারণে রাস্তা তৈরীর উপকরণগুলো দেশের এক এক অংশে বিশেষ বিশেষ ধরণের হওয়া আবশ্যক। দেশে যাতায়াতের যথেষ্ট অসুবিধে বর্ত্তমান থাকায় রাস্তা তৈরীর মালমশলা, যন্ত্রপাতি, লোকলস্কর একস্থান থেকে অন্যত্র আনা-নেওয়া করার সমস্যা বড় কম নয়। তারপর, যে সব কুলীমজুর কাজের জন্য আবশ্যক, তাদের কতটা অংশ স্থানীয় লোকেরা পূরণ করতে পারে তাও ভাববার বিষয়। আরও ভাববার বিষয়, যদি স্থানীয় জনমজুর না পাওয়া যায় তবে বাইরে থেকে আনা শ্রমিকদের থাকবার ব্যবস্থা করা কতদূর সম্ভব হবে।

অল্প সময়ে কাজের অগ্রগতি সম্পাদন করতে চাই বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি। মাটি কেটে তা সরিয়ে ফেলা চাই; তারপর জমি সমতল করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ' সব করবার উপযোগী নানা যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যেই কাজে লাগান হয়েছে। যেসব রাস্তা কন্‌ক্রীট দিয়ে তৈরী করতে হবে তার জন্য চাই কন্‌ক্রীট মেশাবার যন্ত্র, পাথর ভাঙবার যন্ত্র। যেসব রাস্তা পিচ্ আর আলকাতরা দিয়ে তৈরী করা যাবে তার জন্য চাই রোলার, পিচ্ গলাবার ব্যবস্থা। আর খোয়া দিয়ে, কিম্বা পাথরের কুচি দিয়ে যে রাস্তা তৈরী হবে তার জন্য কেবল রোলারই যথেষ্ট।

মালদহের পাকুড় ও পশ্চিম দিনাজপুরের রাজগৌড়ে পাথর পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে পাথর স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার খরচ এবং অসুবিধে অনেক। সেই জন্য রাস্তাবিশারদেরা নাকি ঠিক করেছেন যে খোয়ায় রাস্তা তৈরী করে তার উপরে পাথর ও পিচ ঢেলে দিয়ে সে রাস্তাকে বেশ মজবুত করে গড়বেন।

পশ্চিম বাঙলায় রাস্তাঘাট তৈরী করার পথে প্রধান বাধা নদীনালা। প্রতিটি জাতীয় ও প্রাদেশিক শড়কের গতি একাধিকবার ব্যাহত হবে নদীনালার উপর সেতু বন্ধনের তাগিদে।

সকল বাধা অতিক্রম করে দেশকে শক্তিশালী, সম্পদশালী করে তোলার দায়িত্ব যখন আমাদের নিজেদের উপরই বর্ত্তেছে তখন বাধা সামনে দেখে সংকিত হওয়ার কোন অর্থই হয় না। সব প্রতিকূল অবস্থার ভেতরেও আমরা দেশের সব প্রধান প্রধান শহর বন্দরকে শড়কের সুতোয় বেঁধে ফেলব, এ হবে আমাদের পরম লক্ষ্য।

শারদ স্বপ্ন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

স্বপ্ন, মোহন স্বপ্ন আমার, স্বপ্ন হয়নি শেষ,
মমতা-মেদুর জীবন-মাধুরী হয়নি নিরুদ্দেশ।
আজো ভালবাসি স্বর্ণোজ্জ্বল শারদ সুপ্রভাত,
তারকা-আকুল আকাশ, অমল-জ্যোৎস্না-জাগর রাত,
শান্ত সাগর—সাদা-মেঘ-ভাসা সুনীল গগন তল,
আজো ভালবাসি কর্ম্ম মুখর—নগরীর কোলাহল।

বস্তু জগতে বাস করি, বহু দুঃখ-বিড়ম্বিত,
সংশয়-ভরা, সঙ্কট-ভরা, শঙ্কা-নিয়ন্ত্রিত।
দিকে দিকে ঘেরা সীমার প্রাচীর, বিরাট বন্দীশালা,
ছায়ালোকে লোকে করে ঘোরাফেরা স্তিমিত-
প্রদীপ-জ্বালা,
পদে পদে তার বাধা ও নিষেধ, ক্ষুধার কাতর রব,
তীব্র বিরোধ, আর সংগ্রাম—এই শুধু বাস্তব?

জীবনের সীমা ততটুকু নয় যতটুকু সংসার,
বৃহত্তর সে, কোন্ অনন্তে বিলীন পরিধি তার।
মনের আকাশ মুক্ত, কোথাও বাধা-বন্ধন নাই,
অজানা জগতে কল্পনা তার নিত্য উধাও তাই।
নিত্য নূতনে অভিব্যক্ত মানব-জীবন—জানি,
ঋষির বাক্য, কবির কাব্য তাইতো দৈববাণী।

ক্ষণভঙ্গুর বস্তু নিয়ত ছায়া-সম যায় ছলি,
তাই শাশ্বত স্বপ্ন দিয়া যে ছন্দ রচিয়া চলি।
রাত্রি দিবার রজত-কনক বর্ণে পাত্র ভরি'
আকাশের নীলে তুলিকা ডুবায়ে চিত্র রচনা করি।
প্রাণের উৎস খুঁজিতে—পেয়েছি স্বপ্নের সন্ধান,
সেথা বার বার উচ্ছ্বসি উঠে নব জীবনের গান।
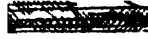
নিরালম্ব স্বামীর স্মৃতিতর্পণ—

গত ৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা মহাবোধী সোসাইটী হলে খ্যাতনামা বিপ্লবী-নেতা স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তথা নিরালম্ব স্বামীর ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি ঐ দিনে ৫৩ বৎসর বয়সে বরাহনগরে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। যৌবনে যতীন্দ্রনাথ বরোদায় গিয়া সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীহেমন্তকুমার বসু, শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কেদারবাবু যখন এলাহাবাদে ছিলেন, তখন যতীন্দ্রনাথ নারায়ণানন্দ স্বামী নাম লইয়া এক বৎসর তাঁহাদের গৃহে বাস করিয়াছিলেন। ২০ বৎসর বয়সে তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়া ও শ্রীঅরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' গ্রন্থ লইয়া বাংলা দেশে ফিরিয়া আসেন—১৯০৭ সালে তিনি সোহং স্বামীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার দেহ ও মনের বল অসাধারণ ছিল। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন-কথা প্রকাশিত হইলে দেশের তরুণের দল সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ মহা-সম্মিলন—

গত ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সিটিটিউট হলে পশ্চিম বঙ্গ সম্মেলন কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মহা-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের সকল জেলার অধিবাসী তথায় উপস্থিত ছিলেন—পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী (মালদহ) সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ও প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (বাঁকুড়া) সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলন সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (মেদিনীপুর) প্রতিনিধিবর্গকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। দ্বিতীয় দিনে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বীরভূম) সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (হুগলী), শ্রীসতীনাথ রায় (নদীয়া), শ্রীকামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান) প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। পশ্চিম বঙ্গের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা সৃষ্ট হইয়াছে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় সম্বন্ধে সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গবাসিগণের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা দ্বারা বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে জনকল্যাণ-মূলক কার্য্য সম্পাদনের সুযোগ হইবে আশা করা যায়।

কংগ্রেস-ত্যাগীদের প্রতি আহ্বান—

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজহরলাল নেহরু এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন—"সম্প্রতি যাঁহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন, কংগ্রেসের লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় থাকিলে তাঁহাদের পুনরায় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। অতীত বিষয় লইয়া বিতর্ক সৃষ্টি করিয়া কোন লাভ নাই। লক্ষ্য আমাদের ভবিষ্যতের দিকে এবং সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইবার জন্য ছোট-খাটো বিরোধ-বৈষম্য পরিহারের ইচ্ছাকে আমাদের সযত্নে সুসংহত করিয়া তোলা অত্যাবশ্যক। কংগ্রেসের বাহিরে এমন বহু নরনারী আছেন, যাঁহারা দেশ ও জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—নানা বিষয়ে তাঁহাদের সহিত কংগ্রেসীদের মতানৈক্য থাকিলেও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে তাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সহিত ঐক্যবদ্ধ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে পারেন।" পণ্ডিতজীর আবেদন সকলের বিবেচনা করার সময় আসিয়াছে।

বাঘা-যতীনের স্মৃতি প্রতিষ্ঠা—

গত ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার সকালে কলিকাতা হেদুয়া পার্কের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বিপ্লবী বীর যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে ঐ দিনে বালেশ্বরে বুড়ী বালাম নদীতীরে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি জীবন দান

করেন। তিনি বাংলা দেশে বাঘা যতীন নামে খ্যাত ছিলেন। কোমাগাটাগারু-খ্যাত ৯২ বৎসর বয়স্ক বিপ্লবী-নেতা বাবা গুরুজিৎ সিং ঐ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীহেমন্তকুমার বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস ও শ্রীকালীচরণ ঘোষ স্মৃতিরক্ষা সমিতির যুগ্ম-সম্পাদকরূপে সকল উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিলেন।

তিনলক্ষাধিক টাকা লুণ্ঠন—

গত ১০ই সেপ্টেম্বর সকালে জামসেদপুরে টিন প্লেট কোম্পানীর ৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা একখানি মোটর গাড়ী হইতে ৪ জন ডাকাত কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। ডাকাতরা গুলীবর্ষণ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিয়াছিল। পরে ১ মাইল দূরে পরিত্যক্ত গাড়ীতে দেড় লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এরূপ ডাকাতি এ দেশে দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। দেশে খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি এই সকল ডাকাতির অন্যতম কারণ। ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার অভাবও মানুষকে বিভ্রান্ত করিতেছে।

কংগ্রেসের নূতন সভাপতি—

গত ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বিশেষ অধিবেশনে শ্রীপুরুষোত্তমদাস টাণ্ডনের পদত্যাগ গৃহীত হয় ও শ্রীজহরলাল নেহরু সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে কংগ্রেস সভাপতি হন। সেখানে স্থির হইয়াছে যে দিল্লীতে আগামী ১৮ই ও ১৯শে অক্টোবর কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সে জন্য ইতিমধ্যেই দিল্লীতে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে ও উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

ভগ্নী নিবেদিতার স্মৃতিবাসর—

গত ৯ই সেপ্টেম্বর বিকালে দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের নূতন আন্তর্জাতিক অতিথি ভবনে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যপালের কন্যা শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসারের সভানেত্রীত্বে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি উৎসব সম্পাদন করা হইয়াছে। মহামণ্ডলের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী, অধ্যাপক কালিদাস নাগ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ ও সভানেত্রী নিবেদিতার জীবন ও দানের কথা বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার জীবন কথা বর্ত্তমান যুগের তরুণগণের বার বার স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

যুগান্তরের বাণিজ্য-সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
(গত আশ্বিন সংখ্যায় ইহার সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে)

পতিতাদের সমস্যা—

গত ১২ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা ৮৯ ইলিয়ট রোডে বঙ্গীয় মহিলা সংঘের বার্ষিক সভায় পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল কলিকাতায় পতিতা মহিলাদের সমস্যার কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। সংঘের এক আশ্রমে ১৭৯ জন পতিতা মহিলাকে রাখা হইয়াছে—তাহা ছাড়া অনাথ আশ্রম, মাতৃ-মঙ্গল কেন্দ্র ও কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জে মহারাণী সুচারু দেবী উক্ত সংঘের সভানেত্রী ও শ্রীমতী এস-ডাভার উহার সম্পাদক। সংঘের মহিলা-কর্ম্মীরা তাঁহাদের কার্য্যে মহিলা পুলিসের সাহায্য অধিক প্রার্থনা করিয়াছেন। কলিকাতার পতিতাদের উদ্ধার করিয়া তাহাদের সৎ জীবন যাপনের জন্য উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করাই উক্ত সংঘের উদ্দেশ্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড—

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হইয়া মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা ছিল, আগামী বৎসর হইতে

তাহা বোর্ডের অধীনে 'স্কুল ফাইনাল শিক্ষা' নামে অভিহিত হইবে। স্কুল সমূহের পরিচালন, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র গ্রহণ, সরকারী অনুমোদন প্রভৃতি ব্যবস্থা বোর্ড হইতে করা হইবে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত স্কুল-সমূহ তথা মাধ্যমিক শিক্ষার আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। নূতন ব্যবস্থায় দেশে নূতন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন।

শহীদ যতীন দাস স্মৃতি পূজা—

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতার নানা স্থানে শহীদ যতীন দাসের বার্ষিক স্মৃতি পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—২২ বৎসর পূর্ব্বে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ৬৩ দিন অনশন করিয়া যতীন দাস মৃত্যুবরণ করেন—তাঁহার আদর্শের কথা আজ সকলের স্মরণ করা প্রয়োজন। হাওড়া টাউন হলে খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে এক সভায় যতীন দাসের চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। নির্য্যাতিত কর্মী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক ঐ চিত্রখানি দান করিয়াছেন।

কলিকাতায় উপ-নির্ব্বাচন—

গত ১২ই সেপ্টেম্বর বুধবার উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার দুইটি উপনির্ব্বাচনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর পরলোকগমনে ও শ্রীহেমন্তকুমার বসুর পদত্যাগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের দুইটি আসন খালি হইয়াছিল। দক্ষিণ কলিকাতায় শরৎবাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু ও উত্তর কলিকাতায় পুনরায় শ্রীহেমন্তকুমার বসু নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন। ঐ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস কোন প্রার্থী স্থির করেন নাই।

কলেজে সামরিক বিদ্যা-শিক্ষা—

১৯৪৮ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইণ্টার-মিডিয়েট ও গ্রাজুয়েট পাঠ্যবিষয়ের সহিত জুনিয়ার ও সিনিয়ার 'সামরিক বিদ্যা শিক্ষা' অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কলিকাতার প্রায় সকল কলেজে 'সামরিক বিদ্যা শিক্ষা' প্রদানের জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে—১৯৫২ সালে আই-এ ও আই-এসসি পরীক্ষায় তিনটি ইচ্ছাধীন বিষয়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীরা সামরিক বিদ্যা বিষয়ে পরীক্ষা দিবেন। ১৯৫৩ সালে প্রায় সকল কলেজ হইতেই পরীক্ষার্থী পাওয়া যাইবে। শিক্ষার্থীদের তৎপূর্ব্বে ন্যাশানাল ক্যাডেট কোরের সদস্য হইতে হইবে। দেশে যত অধিক যুবক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গলের কথা। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার ফলে তাঁহাদের মধ্যে নিয়মানুগ ও সংঘবদ্ধ হইবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া যাইবে।

পশ্চিম তিব্বতে কম্যুনিষ্ট অধিকার—

কম্যুনিষ্টরা পশ্চিম তিব্বত অধিকার করিয়া তথায় প্রভুত্ব স্থাপন করায় মধ্য এসিয়ার ৫ শতাধিক কাজাক ও তিব্বতীদের একটি দল কাশ্মীরের উত্তরপূর্ব্বস্থ লাডাক সীমান্তে আগমন করিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের ভয়ে বহু ধনী তিব্বতী ও কাজাক শরণার্থী দেশত্যাগ করিতেছে। আগষ্ট মাসে ১১৫ জন কাজাক লাডাকে প্রবেশ করিয়াছে। এখন আর কাহাকেও কাশ্মীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ফলে সীমান্ত-গ্রামগুলিতে বহু লোক জমা হইয়াছে। তিব্বত ও চীনের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।

জাপানকে গাভী উপহার দান—

একদল জাপানী শিল্পী ভারতে আসিয়া একটি মন্দিরের প্রাচীর-চিত্র অঙ্কন করিয়া দেওয়ায় বিরলা পরিবার হইতে জাপানকে তিনটি শ্বেতবর্ণা গাভী উপহার দেওয়া হইয়াছে। গত ১১ই সেপ্টেম্বর টোকিও জেনকোজি মন্দিরে অনুষ্ঠানের সহিত গাভীগুলিকে গ্রহণ করা হয় ও মন্দিরের মধ্যে একটি বিশেষভাবে নির্ম্মিত গোশালায় তাহাদের রাখা হইয়াছে। একদল বৌদ্ধ গায়ক শোভাযাত্রা করিয়া গাভীগুলিকে রাজপথ দিয়া মন্দিরে লইয়া যান। টোকিওর নাগরিকগণ পথের ধারে সর্ব্বত্র সমবেত হইয়া এই দৃশ্য দেখিয়াছিলেন এবং ভারতের সহিত জাপানের মৈত্রীর কথা আলোচনা করিয়াছিলেন।

বার্ণার্ড শ জন্মবার্ষিকী—

গত ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা কলেজস্কোয়ার ষ্টুডেণ্টস্ হলে রবীন্দ্র-ভারতীর উদ্যোগে এক সভায় বিশ্ব-উপন্যাসিক জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র ৯৫তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগ সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উৎসবে কয়েকটি কলেজের

অধ্যক্ষ এবং শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বহু সুধী উপস্থিত ছিলেন। শ' এর সকল রচনা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণে আমেরিকার বর্তমান কারুশিল্প ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতে যাইবেন। রমেন্দ্রবাবু তথায় যাইয়া শিল্পশালাসমূহ দেখিবেন,

শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
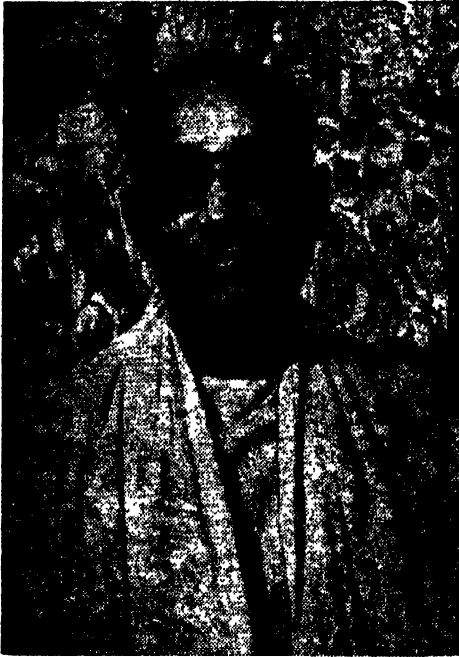
শিল্পীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন ও ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন কেন্দ্রে বক্তৃতা করিবেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি হিসাবে প্যারিসে জাতি সংঘের শিল্প প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৩৭-৩৯ সালেও ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শুভ যাত্রা কামনা করি।

রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি—

গত ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে পশ্চিম বঙ্গে রেশন এলাকায় রেশনের পরিমাণ সপ্তাহে ১০ ছটাক বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে প্রতি সপ্তাহে মাথা পিছু এক সের চাল ও এক সের গম দেওয়া হইতেছিল—অতিরিক্ত ১০ ছটাক রেশন গম হিসাবেই পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালী গম খাইতে অভ্যস্ত না হইলেও চাল যখন দুর্লভ, তখন গম খাইতে অভ্যাস করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। গমজাত খাদ্যের সহিত অধিক পরিমাণে শাক সবজী খাইলে উহা সহজে হজম হইয়া থাকে। সপ্তাহে ২ সের ১০ ছটাক খাদ্য পাইলে কোন রকমে বাঙ্গালীর খাদ্যের সংস্থান হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—

কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, মেট্রোপলিটনে ইন্সিওরেন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীদেবেন্দ্রনাথ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ভট্টাচার্য্য গত কয় মাস ইউরোপের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বয়সে তরুণ, তাঁহার অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্পসমূহকে সমৃদ্ধ করুন, দেশবাসী তাহাই কামনা করে। তিনি সমাজ-সেবা কার্য্যেও আগ্রহশীল, সে বিষয়েও তাঁহার বিদেশ ভ্রমণ তাঁহাকে অধিকতর সুযোগ দান করিবে।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—

সোভিয়েট রাশিয়ার মিনিষ্ট্রি অফ্ সিনেমেটোগ্রাফির আমন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গের তরুণ ফিল্মপরিচালক শ্রীমান সৌম্যেন্দ্র-

মোহন মুখোপাধ্যায় গত ২রা আশ্বিন দিল্লী হইতে প্লেনে মস্কো যাত্রা করিয়াছেন। সোভিয়েট ফিল্মের নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ তাহার এ পর্য্যটনের উদ্দেশ্য। পশ্চিম বঙ্গ হইতে বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চিত্র পরিচালক শ্রীনিমাই ঘোষ তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছেন। সৌম্যেন্দ্রমোহন খ্যাতনামা প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীসৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমরা সৌম্যেন্দ্র-মোহনের জয়যাত্রা কামনা করি।

ভারত-পাক সীমান্ত নির্দ্ধারণ—

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত ৮৯০ মাইল দীর্ঘ—তন্মধ্যে মাত্র ১৪০ মাইল সীমান্ত স্থির হইয়াছে—তথায় উভয় দেশ পৃথক করা হইয়াছে। আরও ২৬৫ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। ত্রিপুরার সহিত পূর্ববঙ্গের সীমান্ত এখনও পরীক্ষা আরম্ভ করা হয় নাই। আসামের সহিত পূর্ববঙ্গের সীমান্তের উভয় দিকে মাইল দেশ দেখা হইয়াছে—সীমান্ত রেখা এখনও স্থির হয় নাই। (১) ২৪পরগণা—খুলনা সীমান্তে ২০ মাইল (২) নদীয়া—কুষ্টিয়া সীমান্তে ৪৪ মাইল (৩) মালদহ—রাজসাহি সীমান্তে ১০ মাইল ও (৪) জলপাইগুড়ি—দিনাজপুর সীমান্তে ৩০ মাইল সীমান্ত রেখা স্থির হইয়াছে। ফলে (১) মৌজা জয়নগর পাকিস্তানে গিয়াছে (২) মৌজা বেতাই ও ভাটুপাড়া ভারত রাষ্ট্রে আসিয়াছে (৩) কুসুম-ডাঙ্গা মৌজার অংশ পাকিস্তানে গিয়াছে। (৪) সুলতান-পুর মৌজার অংশ ভারত রাষ্ট্রে আসিয়াছে। এতদিনে মাত্র এইটুকু সীমান্ত সম্বন্ধে উভয় পক্ষ শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন—বাকি অংশ কত দিনে শেষ হইবে বলা কঠিন। আসাম সীমান্তে পাথারিয়া বন-অঞ্চল লইয়া বাগে সিদ্ধান্তের অর্থ এখনও স্থির হয় নাই। সকলেই আশা করেন, উভয় গভর্ণমেণ্ট একটু অধিক পরিমাণে এ বিষয়ে অবহিত হইয়া সত্বর সীমানা মীমাংসার ব্যবস্থা করিবেন।

শরৎচন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী—

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৭৫তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে শরৎ সমিতির উদ্যোগে কলিকাতায় সপ্তাহ-ব্যাপী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে এক বিরাট জনসভায় তাহার উদ্বোধন হয়। শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালক শ্রী এ-ডি-খান প্রধান অতিথি ছিলেন ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বক্তারূপে বক্তৃতা করেন। কর্পোরেশন প্রদত্ত ১৬ কাঠা জমীর উপর দক্ষিণ কলিকাতায় যে শরৎ স্মৃতি মন্দির স্থাপিত হইবে, তাহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করাই সপ্তাহ-ব্যাপী উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। শরৎ সমিতির সম্পাদক শ্রীক্ষেত্রপাল দাসঘোষ মহাশয় সে দিনের সভায় সকলকে এ বিষয়ে মুক্তহস্ত হইতে আবেদন জানাইয়াছিলেন।

ভারত-ভুটানে মৈত্রীচুক্তি—

ভারতের সহিত আসাম সীমান্তবর্ত্তী স্বাধীন ভুটান দেশের মৈত্রী চুক্তির ফলে আসাম হইতে ৩২০৮১ বর্গ মাইল পরিমিত কামরূপ জেলায় দেওয়ান গিরি নামক স্থান ভুটান দেশকে প্রদান করা হইতেছে। দিল্লীর পার্লামেণ্টে এই বিষয়ে আলোচনার সময় আসাম হইতে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ আপত্তি করিয়াছিলেন—কিন্তু শ্রীজওহরলাল নেহরু সে সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন। ভুটানের সহিত মৈত্রীর ফলে ব্যবসার সুবিধা হইবে—কাজেই তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—

সম্প্রতি 'মিউজিক এডুকেশন বোর্ড অব ঝঙ্কার' বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ডক্টর অব মিউজিক' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। গোপেশ্বরবাবুর জীবন, সঙ্গীত সাধনা ও সঙ্গীতজগতে দানের কথা আজ সর্ব্বজনবিদিত।

নিউ ব্যারাকপুর কলোনীতে মন্দির—

১৯৩৮ সালে শ্রীজ্ঞানদানন্দ তীর্থস্বামী কাশীধাম হইতে একটি প্রস্তরময়ী কালী মূর্তি আনিয়া তাহা খুলনা জেলার ব্যারাকপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। খুলনার ব্যবসায়ী শ্রীসতীশচন্দ্র ভৌমিকের অর্থ সাহায্যে ও খুলনার তৎকালীনজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের চেষ্টায় সে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯৫০ সালের প্রথমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ঐ মূর্তি নৌকাযোগে ২৪ পরগণা জেলার মধ্যমগ্রামের নিকটস্থ নিউ ব্যারাকপুর কলোনীতে আনিয়া নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় রাখা হইয়াছে। ঐ কলোনীতে খুলনা ব্যারাকপুরের প্রায় ৫শত ঘর অধিবাসী আসিয়া বাস করিতেছে। উহা খড়দহ থানার অন্তর্গত বিলকান্দা ইউনিয়নের আহারামপুর, মাসুন্দা ও কোদালিয়া গ্রামে অবস্থিত। হিন্দু যে চিরদিনই ধর্মপ্রাণ—তাহা এই কালী মূর্তি আনয়ন ও মন্দির প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

নিউ ব্যারাকপুর কলোনীতে কালী-মন্দির

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী—

শ্রীজহরলাল নেহরু নূতন কংগ্রেস সভাপতি হইয়া নিম্নলিখিত ১৫ জন সদস্য লইয়া নূতন ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়াছেন—(১) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (২) শ্রীপুরুষোত্তমদাস টাণ্ডন (৩) শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ (৪) শ্রীমোরারজি দেশাই (৫) শ্রীকামরাজ নাদার (৬) শ্রীশঙ্কররাও দেও (৭) শ্রীনীলাম সঞ্জীব রেড্ডি (৮) শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী (৯) শ্রীপ্রতাপ সিং কাইরণ (১০) শ্রীবি-এস-হীরে (১১) শ্রীগুলজারিলাল নন্দ (১২) শ্রীমাণিক্যলাল বর্ম্মা (১৩) শ্রী ভি-আই-মুনিস্বামী পিলে (১৪) শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী (১৫) শ্রীইউ-শ্রীনিবাস মল্লায়া। শ্রীমোরারজী দেশাই কোষাধ্যক্ষ হইবেন এবং শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীইউ-শ্রীনিবাস মল্লায়া সাধারণ সম্পাদক হইবেন। পরে কমিটীতে আরও ৫ জন সদস্য গ্রহণ করা হইবে। পশ্চিম বাংলা হইতে কাহাকেও গ্রহণ করা হয় নাই, তাহার কারণ কি? উপযুক্ত লোকের অভাব, না অন্য কিছু?

কেন্দ্রে নূতন মন্ত্রী নিয়োগ—

ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটী চেয়ারম্যান শ্রীগুলজারিলাল নন্দকে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি বহুদিন আমেদাবাদে কাপড় কল শ্রমিক সমিতির সম্পাদকের কাজ করার পর ১৯৩৭ হইতে বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ও মন্ত্রীর কাজ করিয়াছেন। মন্ত্রীর কাজ ছাড়াও বিনা বেতনে তাঁহাকে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটী চেয়ারম্যানের কাজ করিতে হইবে। শ্রীজহরলাল তাঁহাকে কংগ্রেসের

কার্য্যকরী সভাপতি নিযুক্ত করিয়া কংগ্রেস-কার্য্যালয় দেখিবার ভারও প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুত নন্দের কার্য্যের ফলে দেশ উপকৃত হইলেই, এই সকল নিয়োগ সার্থক হইবে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

বাংলার প্রবীণতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে সম্প্রতি তাঁহার

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্র-জন্ম তিথি উৎসবে শিল্পী ও অমরনাথ মুখোপাধ্যায়
ফটো—রমেন্দ্রনাথ

বরাহনগরস্থ বাসভবনে বহু সুধী ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। চিত্রে শিল্পীর সহিত উত্তরপাড়ার জমীদার শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাইতেছে।

কলিকাতায় কৃত্রিম দন্ত নির্ম্মাণ—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটি কৃত্রিম দন্ত নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনের আয়োজন করিয়াছেন—সে জন্য সুইজারল্যাণ্ড হইতে ৫ লক্ষ টাকার যন্ত্রাদি আনিয়া কলিকাতার সরকারী দন্ত চিকিৎসা কলেজে স্থাপন করা হইবে—ফলে বৎসরে ২০ লক্ষ কৃত্রিম দন্ত প্রস্তুত হইবে। ১৯৪৯ সালে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ১৯৫১ সালে খ্যাতনামা দন্তচিকিৎসক, বর্ত্তমানে মন্ত্রী ডাঃ আর-আমেদ সুইজারল্যাণ্ডে যাইয়া সকল ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। দন্তনির্ম্মাণ শিক্ষা করিবার জন্য ডাঃ এচ-এন-বসুকে জুরিকে প্রেরণ করা হইবে। ফলে ভারতে একটি নূতন শিল্প প্রবর্ত্তিত হইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—

বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক, আনন্দ বাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্প্রতি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

সোভিয়েট সরকারের নিমন্ত্রণে রুসিয়ায় যাইয়া সে দেশের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। রুসিয়া সম্বন্ধে অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা বর্ত্তমান; সত্যেন্দ্রবাবুর অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তিনি সেই ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। তিনি কলিকাতায় নানা স্থানে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন।

কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

আগামী ২রা হইতে ৯ই জানুয়ারী কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৯ তম অধিবেশন হইবে। শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ ডাক্তার কে-পি-বিশ্বাস, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ জে-সি-সেনগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ ডি-চক্রবর্ত্তী, কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এসোসিয়েসনের রেজিষ্টার শ্রী এস-সেন কংগ্রেস-অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক

হইয়াছেন ও কলিকাতা ৯২ আপার সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজে ইহার কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যে কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞান চর্চ্চা হয়—কাজেই কংগ্রেসের অধিবেশন এখানেই অধিক আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন।

কলিকাতার নূতন ভাইস চ্যান্সেলার—

বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে নূতন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার করা হইয়াছে। তিনি আইন সদস্য হওয়ার পূর্ব্বে ঐ কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন—সে জন্য তাঁহাকেই ঐ কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া রাষ্ট্রপাল স্থির করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন দল বিশেষের কবলিত—তাহার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই নূতন ভাইস চ্যান্সেলারের প্রথম ও প্রধান কার্য্য হইবে।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১৯৫১ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। অচিন্ত্যকুমার পণ্ডিত ব্যক্তি—কাজেই ঐ অধ্যাপকরূপে তিনি বাংলা সাহিত্যকে নূতন কিছু দিবেন বলিয়া সকলে আশা করেন। আমরা অচিন্ত্যকুমারের এই সম্মান-লাভে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

'স্বদেশী ক্রয়' আন্দোলন—

গত ৭ই আগষ্ট আবার কলিকাতা সিনেট হলে এক সভায় স্বদেশী ক্রয়ের আন্দোলন নূতন করিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ঐ দিনেই (৭ই আগষ্ট) কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিলাতী বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমতিলাল রায় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন ও কলিকাতার সেরিফ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন উহার উদ্বোধন করেন। বহু বক্তা স্বদেশী আন্দোলনের যুগের ঘটনা বিবৃত করিয়া সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের তিরোভাব দিবস উপলক্ষে সভায় তাঁহাদের কৃত কার্য্যের কথাও সভায় আলোচিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের নূতন করিয়া স্বদেশী ব্রত গ্রহণের দিন আসিয়াছে।

লণ্ডনে হিন্দু মন্দির—

লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়ান-ইউরোপীয়ান সমিতির উদ্যোগে তথায় একটি হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থসংগ্রহ করা হইতেছে। হার্লি ষ্ট্রীটের খ্যাতনামা চক্ষুচিকিৎসক ঐ সমিতির সভাপতি ডাক্তার ডি-তাহের সে জন্য চেষ্টা করিতেছেন ও কাশ্মীরের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা আশা করা যায়। লণ্ডনে ভারতীয়গণের কোন মিলনস্থান নাই—নূতন মন্দির নির্মিত হইলে সে অভাব দূর হইবে।

ডাক্তার শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—

'বঙ্গশ্রী' মাসিকপত্র সম্পাদক ডাক্তর শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নাট্যশালার বিশ্বকোষে ভারতের একমাত্র লেখক নিযুক্ত হওয়ায় গত ১৫ই সেপ্টেম্বর কালীঘাটে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয় হলে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। অধ্যক্ষ শ্রীজিতেশচন্দ্র গুহ সভাপতি হন এবং শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী (মহারাজ), শ্রীসুধীর মিত্র প্রভৃতি তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। বাঙ্গালী লেখকের এই সম্মানলাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

বারাসত বসিরহাট রেল—

২৪পরগণার সীমান্তে অবস্থিত বারাসত বসিরহাট রেলের কর্ম্মীরা গত ৩রা এপ্রিল হইতে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল—শেষ পর্য্যন্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ রেলের পরিচালন ভার গ্রহণ করায় গত ৭ই আগষ্ট হইতে ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করা হইয়াছে ও রেল চলিতেছে। রেলটি ৫২ মাইল দীর্ঘ—উহা দ্বারা গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতিদিন বহু পরিমাণ তরিতরকারী, দুধ, ডিম, মাছ, পক্ষী প্রভৃতি কলিকাতা সহরে বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের ট্রান্সপোর্ট বিভাগ উক্ত রেলের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত আশ্বিন সংখ্যায় এবং এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীনরেন্দ্র দেব লিখিত 'মহাজীবনের মহানাট্য' নামক প্রবন্ধের চিত্রগুলি প্যাশান প্লে কমিটির অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫১ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল একাধিক কারণে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফাইনালে ওঠে দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পাশাপাশি অতি নিকট প্রতিবেশী মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ফাইনাল খেলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দুই দলের সমর্থক এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে একটানা স্নায়ু যুদ্ধ চলে। ফাইনাল খেলার ফলাফলের
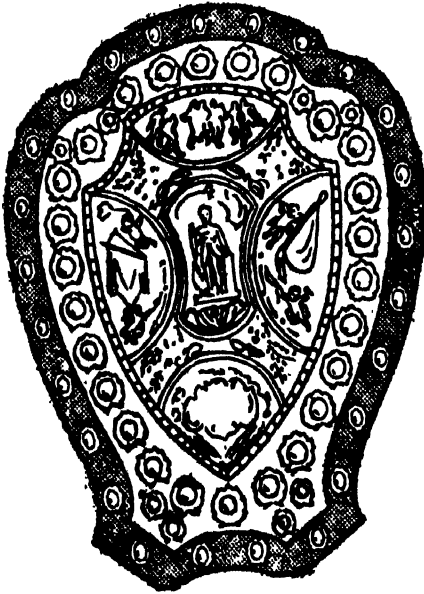
আই এফ এ শীল্ড

উপর মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে রেকর্ড নির্ভর করছিলো, একই বছরে হকি ও ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং আই এফ এ শীল্ড জয়লাভ, যার রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করা কোন দলেরই পক্ষে ইতিপূর্ব্বে সুযোগ মিলেনি। অপরদিকে ভারতীয় দলের পক্ষে পর পর তিনবার আই এফ এ শীল্ড জয়লাভের রেকর্ড করার সুযোগ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, ১৯৪৯ সালে মোহনবাগান যা করতে পারেনি। সুতরাং ফাইনালে উভয় দলের খেলোয়াড়দের মাথার উপর গুরু দায়িত্বের বোঝা নিয়ে মাঠে নামতে হয়। মোহনবাগান দলকে বেশী রকম কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। লীগের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খেলার আগেই সেণ্টার ফরওয়ার্ড বসিথ এবং লেফট-হাফ অভয় ঘোষ আহত হয়ে পরবর্ত্তী কোন খেলাতে আর যোগদান করতে পারেননি। এই দু'জন নামকরা খেলোয়াড়ের শূন্য স্থানে একাধিক খেলোয়াড়কে দিয়ে পরীক্ষা চলে কিন্তু সমস্যার সুমীমাংসা হয়নি। বসিথের অভাবে মোহনবাগান দলের আক্রমণ ভাগ দুর্ব্বলই থেকে যায়। বসিথ আহত হওয়ার পর তাঁর বদলী হিসাবে বিভিন্ন দলের বিপক্ষে এই ছ'জন সেণ্টার ফরওয়ার্ড খেলেছিলেন—এ মুখার্জ্জি, নবাগত ধনবাহাদুর এবং চানসীন, প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে অবসরপ্রাপ্ত বিজন বসু এবং বাবলু কুমার এবং ভবানীপুরের রাইট আউট রবিদাস। রবিদাস শীল্ডের সেমি-ফাইনালে মহমেডান দলের বিপক্ষে প্রথম খেলতে নেমে প্রথম দিনই যা ভাল খেলেছিলেন। লেফট হাফে বি এন রেলদলের রবি দে শীল্ডের চতুর্থ রাউণ্ডে প্রথম খেলেন কিন্তু তাঁকে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা যায়নি; মান্নাকে দু'দিক সামলাতে গিয়ে অনেক সময় বেসামাল হতে হয়। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলায় কোন পক্ষই গোল না করতে পারায় খেলাটা অমীমাংসিত থেকে যায়। প্রবল বারিপাতের ফলে মাঠের অবস্থা দর্শনীয় ফুটবল খেলার অনুকূলে ছিল না। প্রথম দিনের খেলায় মোহন-বাগান দলের পক্ষে বাবু এবং রবিদাস গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন, অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে

সালে। দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে মাঠের অবস্থা ভাল ছিল এবং এই দিনের খেলার ১৮ মিনিটের মধ্যে সালে একাই

ব্যোমকেশ বসু (ইষ্টবেঙ্গল)

দুটি গোল করেন এবং এই দু' গোলের ব্যবধানেই মোহনবাগানকে শেষ পর্য্যন্ত হার স্বীকার করতে হয়। খেলায় প্রতিষ্ঠা লাভের আগেই মোহনবাগান খেলার দু' মিনিটে এবং ১৮ মিনিটে ২টো গোল খেয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গল দলের খেলার সূচনার মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম থেকেই তারা দ্রুতগামী আউট খেলোয়াড়কে বল দিয়ে সমর্থকদের উৎসাহিত ধ্বনির মধ্যে মোহনবাগানের গোল সীমানায় বল নিয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ খেলার সূচনাতে এই ধরণের আক্রমণ যথেষ্ট কাজের—বিপক্ষ দলের পক্ষে মনের দৃঢ়তা হারানো স্বাভাবিক। মোহনবাগানের পক্ষে তাই ঘটেছিল। রাইট হাফে সারা মরসুমটা ভাল খেলে রতন সেন এইদিন ভুল খেলেন এবং তাঁরই ত্রুটিপূর্ণ খেলার দরুণই সালের পক্ষে দুটি গোল দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং অপর একটির সুযোগ অফ্ সাইডের জন্যে নষ্ট হয়। বাংলায় একটা কথা আছে, 'সব ভাল যার শেষ ভাল'। রতন সেনের খেলা সম্পর্কে এ কথা খুবই প্রযোজ্য। গোলের পূর্ব্বে টাচ-লাইনে বল মারায় কিম্বা কর্ণার করার সময়ও তিনি

এবং বড়ুয়া পেয়েছিলেন কিন্তু তা তাঁরা নষ্ট করেন। সজাগ হয়ে খেললে তাঁর দ্বিতীয় দিনের খেলার ত্রুটি সম্পর্কে কোন

সালে (ইষ্টবেঙ্গল) ফটো : কে কে সান্যাল

প্রশ্ন উঠতো না। মোহনবাগান প্রথম গোল খেয়ে অনেকক্ষণ ছন্নছাড়া হয়ে খেলেছে। তারপর ধীরে ধীরে খেলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা প্রথমার্দ্ধের থেকে অনেক উন্নত হয়। কিন্তু খেলায় জয়-পরাজয়ের মানদণ্ড গোল দিতে পারেনি আক্রমণ ভাগের একই পদ্ধতিতে খেলার দরুণ। কদাচিৎ আউট দিয়ে খেলানো হয়েছে এবং যখনই তা হয়েছে খেলায় একটা না একটা ভাল movement হয়েছে। আউটের খেলোয়াড় বাবু এবং দাশগুপ্ত একাধিক সময় ফাঁকা দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তাদের বল না দিয়ে 'ইন' দিয়ে বল খেলিয়ে বারম্বার বাধা পেয়েছে। মোহনবাগানের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের এ দুর্ব্বলতার সুযোগ পেয়ে তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে বিপক্ষদলের রক্ষণভাগকে বেশী বেগ পেতে হয়নি। সেণ্টার ফরওয়ার্ড রবিদাসকে সাত্তার অসংখ্য বল দিয়েছেন কিন্তু ঠিকমত পাশগুলি ধরতে না পারায় কিম্বা যথাযথ স্থানে নিজেকে রাখতে না পারায় সেগুলি নষ্ট হয়েছে। আক্রমণ ভাগে একমাত্র সাত্তারের খেলাই উল্লেখযোগ্য ছিল। গুহ-ঠাকুরতার খেলায় আড়ষ্টভাব ছিল অথচ এবছরের অন্যান্য

খেলায় একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাইন-ইনের খেলা খেলেছিলেন ! অযথা বল ড্রিবল করার অভ্যাস না ত্যাগ করলে তাঁর

এম ঘটক (ইষ্টবেঙ্গল)

সহযোগিতায় দল লাভবান হবে না। নতুবা ভাল খেলোয়াড়ের প্রয়োজনীয় অপর সকল গুণাবলী তার আছে। আউটের খেলোয়াড় দু'জনকে বল না দিয়ে পঙ্গু করা হয়েছিলো সুতরাং তাঁদের খেলার গুণাগুণ বিচারের কথা উঠে না। রক্ষণভাগে মান্নাকে খুবই পরিশ্রম ক'রে খেলতে হয়, হাফ লাইনের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতার কারণে।

প্রথমেই ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়দের মনোবলের প্রশংসা করতে হয়, তারপর খেলার পদ্ধতির। অবস্থা বুঝে খেলার ধারা পরিবর্ত্তনের দূরদর্শীতা যদি না থাকে তাহ'লে তা প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলা নয়। ইস্টবেঙ্গল দলের খেলায় সে দূরদর্শীতা ছিল। রতন সেনের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য ক'রে তারা সালেকে দিয়ে বেশী খেলিয়েছে। রাইট হাফে রবি দের একমাত্র কাজ ছিল ভেঙ্কটেশকে আটকে রেখে খেলা নষ্ট করা। তা ছাড়া সেদিক ছিল মান্না। বা দিকে মোহনবাগান বেশী নজর দেওয়ায় ডান দিকে সালের পক্ষে প্রথমেই গোলকরার সুযোগ সদ্ব্যবহার করা সহজ হয়ে পড়ে। লীগের খেলার থেকে শীল্ডে আমেদ খাঁর খেলা অনেক উন্নত হয়েছে। খেলায় আমেদ-সালের মধ্যে বেশ একটা বোঝাপড়া আছে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আপ্পারাও তাঁর নিজের খেলা খেলেছেন।

চন্দনসিং (ইষ্টবেঙ্গল) ফটো : ডি রতন

ধনরাজের খেলা চোখে লাগেনি। হাফ লাইনে পন্ট, রায় এবং চন্দন সিংয়ের খেলা উল্লেখযোগ্য। রক্ষণভাগে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন অধিনায়ক ব্যোমকেশ বসু। দুই দলের অধিনায়কই নিষ্ঠার সঙ্গে খেলেছিলেন। এবং খেলা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মাঠের মধ্যে শৈলেন মান্না ছুটে গিয়ে স্বহাস্যে ব্যোমকেশ বসুকে আলিঙ্গনে অভিনন্দন করেন।—এ অভিনন্দনের অর্থ, তোমারই অধিনায়কত্বে ভারতীয় ফুটবল দল উপর্য্যুপরি তিনবার শীল্ড জয়লাভের প্রথম সম্মান লাভ করলো। মান্নার এই খেলোয়াড়চিত আচরণ উপস্থিত দর্শকদের চোখে প্রীতির রেখাপাত করে।

ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে বুঝপড়া সুপ্রতিষ্ঠিত। এর কারণ, গত ১৯৪৯ সালে আক্রমণ ভাগে যে পাঁচজন খেলোয়াড় নিয়ে দল তৈরী হয়েছে তাঁরাই নিয়মিতভাবে খেলে এসেছেন, অসুস্থতা বা অনুপস্থিতির কারণে কেউ হয়ত বাদ পড়েছেন।

এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পাঁচবার শীল্ড বিজয়ী হ'ল। তারা শীল্ড পেয়েছে, ১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯-৫০-৫১ সালে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৪৯ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করায় পরপর তিনবার

শীল্ড বিজয়ের রেকর্ড থেকে মোহনবাগান ক্লাব বঞ্চিত হয়। ১৯৫১ সালের শীল্ড ফাইনালে সেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব

খেলায় কাঠফাটা রোদ মাথায় নিয়ে কয়েকশত দর্শক টিকিটের জন্যে ১০৮ ঘণ্টা আগে থেকে সারি দেয়। খেলা

সাত্তার (মোহনবাগান) ফটো : জে কে সান্যাল

রবি দে (মোহনবাগান)

মোহনবাগানকে ২-০ গোলে হারিয়ে নিজেরাই ভারতীয় দলের পক্ষে সে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। ইস্টবেঙ্গল দলের কৃতিত্ব দুই দিক থেকে—রেকর্ড করা থেকে অপর দলকে বাধা দেওয়া এবং নিজেদের পক্ষে রেকর্ড করা।

খেলার শেষে মোহনবাগান ক্লাবের নিমন্ত্রণে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়রা মোহনবাগান তাঁবুতে জলপান করতে যান। এ ছাড়া ইস্টবেঙ্গলদলকে সাফল্য উপলক্ষে মোহনবাগান ক্লাব মিষ্টান্ন উপহার দেয়।

ইস্টবেঙ্গল :—এম ঘটক, বি বসু এবং আন্সারী, গোকুল, চন্দন সিং এবং এস রায়, ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ এবং সালে।

মোহনবাগান :—সি ব্যানার্জি, পি বড়ুয়া এবং এস মান্না, আর সেন, টি আও এবং আর দে বাবু, আর গুহঠাকুরতা, আর দাস, সত্তর এবং এ দাসগুপ্ত।

রেফারী—মেজর আপ্ ফোল্ড।

চ্যারিটিম্যাচ ও ষ্টেডিয়াম ঃ

এই শীল্ড ফাইনাল উপলক্ষ্যে আরও উল্লেখযোগ্য, খেলা দেখার জন্য দর্শকদের সহনশীলতা এবং অদম্য আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলায় সারাদিন প্রবল বারিপাত হয়। এই দুর্য্যোগের মধ্যেও খেলা আরম্ভের আগের দিন রাত্রি থেকে টিকিটের জন্যে সারিবদ্ধ অবস্থায় সুদীর্ঘ সময় দর্শকদের অপেক্ষা করতে হয়। দ্বিতীয় দিনের

দেখার জন্য দর্শকদের অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং সহনশীলতার পরিচয় ইউরোপের ক্রীড়াক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি, কিন্তু সময়ের স্থায়িত্বের দিক থেকে আমরা বোধ করি রেকর্ড ক'রলাম। বর্ত্তমানে সমস্যা বহুল সামাজিক জীবনে দর্শকদের পক্ষে এই ধরণের সহনশীলতা এবং আনন্দ লাভের এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা কোনদিক থেকেই আদর্শমূলক দৃষ্টান্ত নয়। যে সময়ে সমগ্র দেশ অন্ন-বস্ত্র সমস্যার মধ্যে কোন প্রকার আধপেট খেয়ে এবং অর্দ্ধ নগ্ন থেকে দিনাতিপাত করছে সে সময়ে শরীর ধর্ম্মের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে এতখানি উদাসীন থাকা সমাজ এবং জাতির পক্ষে মঙ্গল নয়। এ ব্যাপারে আমাদের জাতীয় সরকার এবং ক্লাব প্রতিষ্ঠানগুলির যে গুরুদায়িত্ব আছে তা কোন প্রকারে উপেক্ষা করা যায় না। খেলাধূলার প্রয়োজন উপেক্ষা ক'রে, পুষ্টিকর খাদ্য, পরিমিত বস্ত্র এবং স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের ব্যবস্থায় কখনই শক্তিশালী সুসভ্য রাষ্ট্র গঠন করা যে যায় না ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। রাষ্ট্র জীবনে খেলাধূলার প্রয়োজন যে কতখানি, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় প্রাচীন ঈজিপ্ট এবং গ্রীস সভ্যতার ইতিহাসে এবং আধুনিক কালে ইউরোপ্ এবং আমেরিকার সমাজ জীবনে।

ফুটবল খেলা উপলক্ষ্যে টিকিট সংগ্রহের জন্য ক'লকাতার ময়দানে যে পরিমাণ দর্শকদের সময় এবং কর্ম্মশক্তি নষ্ট হয় তা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি নয়, সমগ্র জাতি এবং

রাষ্ট্রের। এ অপব্যয় জাতীয় ভাণ্ডারের এবং প্রতিরোধ না করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের পক্ষে চরম অক্ষমতা এবং লজ্জার কারণ। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান 'ষ্টেডিয়াম'—যার প্রয়োজন আলাপ আলোচনা এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দানের মধ্যে ধামাচাপা হয়ে আছে। ফুটবল খেলা দর্শনেচ্ছু অগণিত জনসাধারণের রক্ত জল ক'রে তাঁদেরই দেয় অর্থ দ্বারা হাসপাতাল তহবিল স্ফীত করার নীতি, 'ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার' মত ভুল নীতি নয় কি? শরীর ধর্ম্ম পালন সম্পর্কে যদি জনসাধারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকে তাহ'লে রোগ নিরাময়ের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা কাজের কথা নয়। রোগ যাতে না হয় তারই ব্যবস্থা আগে, রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা তার পর। দুই প্রয়োজন; কিন্তু শুধু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ক'রে সমস্যার সমাধান হয় না। এ যেন ঠিক অযত্নে এবং বিনা চিকিৎসায় মৃত মা-বাপের শ্রাদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কর্ত্তব্য পালনের দৃষ্টান্ত। নৈতিক দিক থেকে একই মরসুমে আটটি চ্যারিটি ম্যাচ খেলানোর কোন যুক্তি নেই। এমনিতে কেউ হাসপাতালে অর্থ দান করবে না। সুতরাং চাপ দিয়ে অর্থ সংগ্রহেরও চেষ্টা অশুভ এবং নিন্দনীয়। জনসাধারণ অকৃপণ দক্ষিণ হস্তে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করতে যে আজ পরাঙ্মুখ হয়েছে তার একাধিক কারণ আছে। প্রধানতঃ বেশীর ভাগই প্রতিষ্ঠান জনসাধারণকে বঞ্চনা করেছে অর্থের সদ্ব্যবহার না ক'রে। সংবাদপত্রাদিতে বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মুখোস খুলে গেছে। হাসপাতাল জনসাধারণেরই। কিন্তু সেখানে জনসাধারণ কিরূপ ব্যবহার পান তার প্রমাণের অভাব নেই। হাসপাতালে যাবার নাম শুনলেই শিক্ষিত লোকও আতঙ্কগ্রস্থ হ'ন। এ ভয় অহেতু নয় এবং মনের কুসংস্কারের জন্যেও নয়। চিকিৎসায় অব্যবস্থা এবং চিকিৎসা বিভ্রাটে দাঁত তুলতে গিয়ে ইন্‌জেকসন নেবার পর রোগীর মৃত্যু সংবাদ এবং ঐ একই কারণে আরও কয়েকজনের অসুস্থতার সংবাদ পাওয়ার পরও কোন রোগী হাসপাতালে গিয়ে রোগ নিরাময়ের কথা ভাবতেই পারে না। রোগীদের সম্পর্কে উপেক্ষা এবং দুর্ব্যবহার আজ অতি সাধারণ অভিযোগে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্ত সত্ত্বেও হাসপাতালে অর্থদান করার আবেদন অন্যায় নয়। কিন্তু সকল কাজকরণের মত অর্থ দানের আবেদনেরও একটা সীমা আছে। ফুটবল খেলা যাঁরা দেখতে যান তাঁদের বেশীর ভাগই স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং কেরাণীকুল। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর কেরাণীদের ফুটবল খেলা দেখা আজ বহুদিনের অভ্যাস এবং মনের বিলাস বলতে পারেন। কিন্তু যে ভাবে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ চ্যারিটি ম্যাচের তালিকা বাড়িয়ে চলেছেন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাল খেলাগুলি দেখা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কথায় হয়ত উত্তর আছে, খেলা না দেখলেই হয়। কিন্তু এর পরও প্রশ্ন আছে, কাদের আগ্রহে ফুটবল খেলা আজ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং কারা চ্যারিটি ম্যাচে এ পর্য্যন্ত মোটা টাকা দিয়ে এসেছে। তাদের বেশীর ভাগই তো স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং কেরাণী সমাজ। সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যেই যদি চ্যারিটি ম্যাচ, তাহলে অত্যধিক চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে জনসাধারণ যে আর এক সমস্যার উন্মুখীন হ'তে বাধ্য হচ্ছে—তার প্রতি কর্তৃপক্ষ মহলের দৃষ্টি নেই কেন?

সাহিত্য-সংবাদ

মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রণীত নাটক "মনপ্যাখি" (২য় সং)—২.
সুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "পদ্মা নদীর ডাক"—১৸০
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "অমর কাহিনী"—২.,
সম্পাদিত গ্রন্থ "মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত"—১৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "দণ্ডধারী মোহন"—২৲,
"রহস্যলোকে মোহন"—২৲, "অপহৃতা শান্তা"—২৲,
"অনুসন্ধানে মোহন"—২৲
মিশিকান্ত বসু রায় প্রণীত নাটক "পথের শেষে" (১৪শ সং)—২৲
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত উপন্যাস "যৌবনশ্রী"—২৲,
পাঁচালী "শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী"—৸০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "চন্দ্রগুপ্ত" (২৫শ সং)—২।০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "চন্দ্রনাথ" (২২শ সং)—১॥০
যজ্ঞেশ্বর রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ফাঁসীর ফাঁড়া"—৩৲
শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "দম্পতির রতি-জীবন"—২৲,
"নীড়"—৩৲, "কালগ্রাস"—১৲
চূণীলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙলা ও বাঙালী"—১৲

বিজ্ঞপ্তি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে 'মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' এবং 'ভারতবর্ষ কার্যালয়' ২০শে আশ্বিন হইতে ২৮শে আশ্বিন পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পশ্চিম বাংলার নূতন রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ফটো—তারক দাস

অগ্রহায়ণ—১৩৫৮
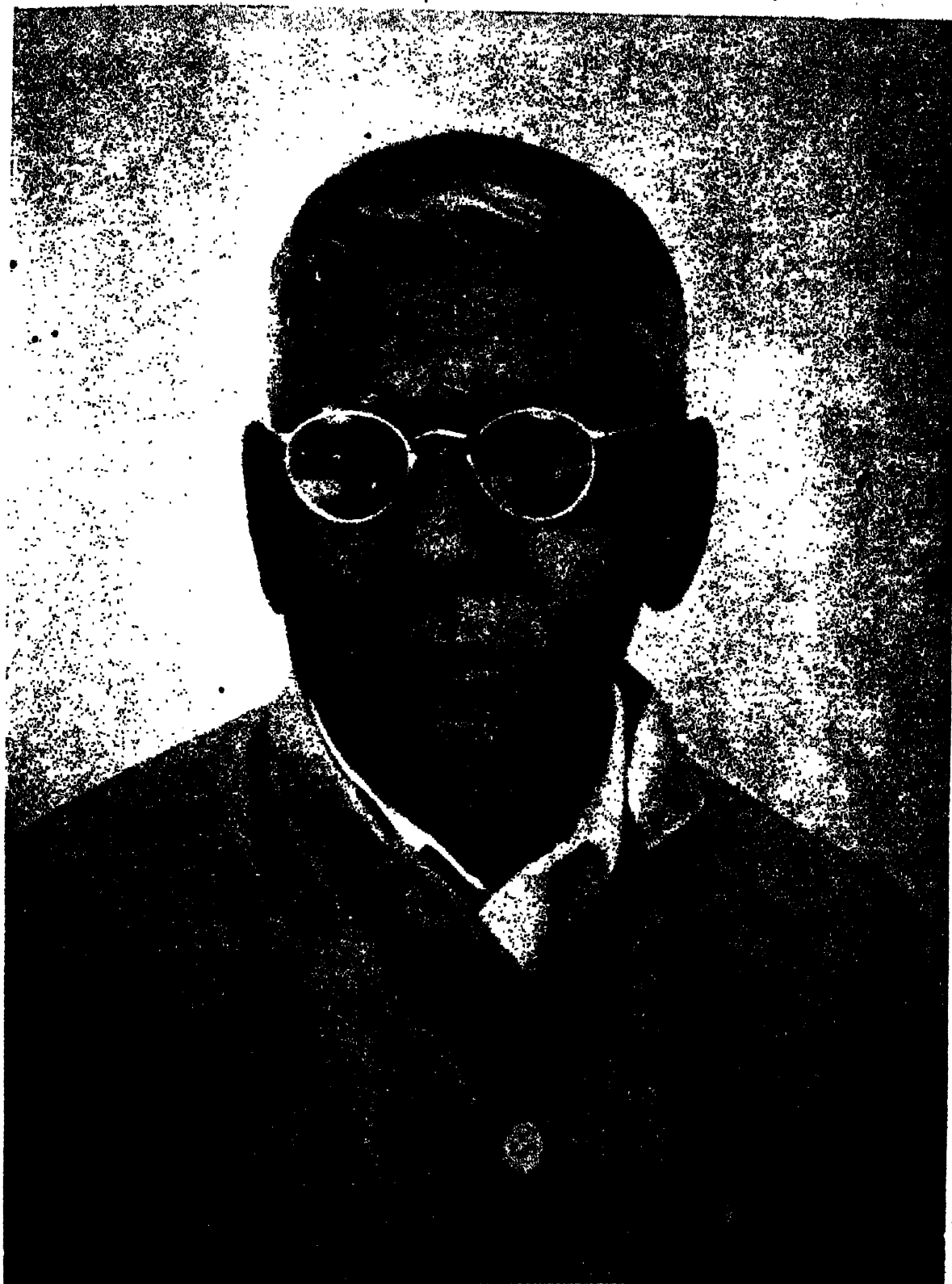
প্রথম খণ্ড　　　　উনচত্বারিংশ বর্ষ

সতীর পূর্বরাগ ও অভিসার

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

ভগবদ্ভক্তি বা ভগবদ্প্রেমের আকর্ষণ দুর্বার, শুধু দুর্নিবার নয়, অনিবার্য্য। নদীর প্রতি সমুদ্রের যেমন সীমাহীন আকর্ষণ, অনিবার্য্য আহ্বান; মধুর প্রতি মধুকরের যে সুবিপুল আকাঙ্ক্ষা, শারদ-চাঁদিনীর জন্য চকোরের যে উদ্‌ভ্রান্ত অভিযান; এই ভগবদ্প্রেমের আকর্ষণও ঠিক তেমনি। এ আকর্ষণ লোক, লজ্জা, ভয়; সম্ভোগ, বিলাস, সৌন্দর্য্যের মোহ; মায়া, মমতা, পশ্চাতের বন্ধন কিছুই মানে না, শুধু ছুটে চলে অশান্ত উন্মাদের মত, শান্ত হয় তখনই যখন পায় তা'র বাঞ্ছিত সম্পদকে। এই উন্মাদ আকর্ষণেই তথাগত রাজদুলাল হ'য়েও পতিপ্রাণা রূপসী গোপা ও নবজাত শিশুপুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ ক'রে ছুটেছিলেন পথে-প্রান্তরে, বনে-উপবনে, পর্ব্বতে-জঙ্গলে; প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য এই অনিবার্য্য আকর্ষণেই বৃদ্ধা-মাতা, কিশোরী-জায়া, আত্মীয়-স্বজন, অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, পাণ্ডিত্যের অভিমান, মান, যশঃ, প্রতিপত্তি ত্যাগ ক'রে ছুটেছিলেন বৃন্দাবনের তাল-তমাল-শ্যামায়িত যমুনার তীরে, আর এই আকর্ষণেই রূপ-সনাতন-লালাবাবু গৃহত্যাগী, রামপ্রসাদ বিবাগী, রামকৃষ্ণ পাগল, বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী। এ আকর্ষণ যে কী তা' আমরা বুঝিনা, বোঝবার শক্তিও আমাদের নেই, তবে এই আকর্ষণ যে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি ক'রেছে, অশান্ত চঞ্চলতায় উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে যে তা'র সন্ধান ক'রতে পেরেছে, 'যে সেই আকর্ষণকারীর সর্ব্বনাশা প্রেম আস্বাদন ক'রেছে, সেই ব'লতে পারে সে জিনিষ কী; কিন্তু তা'রও ব'লবার ক্ষমতা নেই—কেননা তা' অনির্ব্বচনীয়, অপ্রকাশ্য, শুধু অন্তরে অনুভূতির, হৃদয়ে উপলব্ধির বস্তু। তাই এই সূক্ষ্ম অনুভূতি-সাপেক্ষ ভগবদ্প্রেম বা ভাগবতী আকর্ষণ মনুষ্য-সংবেদ্য করবার জন্য পরমভাগবত বৈষ্ণব মহাজনগণ

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার অবতারণা ক'রেছেন, সেই পরকীয়া-রসমাধুরীর উৎসস্বরূপ রাধা-কৃষ্ণকে মানুষী কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের আধার স্বরূপ ক'রে আমাদের সঙ্গে একত্বের বন্ধনে গ্রথিত ক'রেছেন; আমরা বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধা ও নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর প্রেমাকর্ষণের তীব্র বিরহ-মণ্ডিত অনবদ্য কাল্পনিক কাহিনী পাঠে সেই অবক্তব্য প্রেমের কথঞ্চিৎ উপলব্ধি ক'রতে পারি।

পৃথিবীতে মানুষ মায়া, মোহ ও ভোগে নিমজ্জিত; এখানে সে তা'র চতুর্দ্দিকে বন্ধনের বেড়াজাল বিস্তৃত ক'রে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত মুক্তিবিহীন, বদ্ধ জীবনযাপন করে, ভুলে যায় সে তা'র সৃষ্টিকর্ত্তাকে, ভুলে যায় যে সে অমৃতের সন্তান, ভুলে যায় যে পৃথিবীর সে সম্পূর্ণ নয়, সে অসীমের, অনন্তের; সে তা'র জীবন-দেবতার। তাই জীবনদেবতা অন্তর্য্যামী ভগবান মানুষকে অহরহঃ আহ্বান করেন—কিন্তু মোহগ্রস্ত মানুষের কর্ণে সে আহ্বান পশে না, পার্থিব ভোগসুখের নিরবচ্ছিন্ন কোলাহলের মধ্যে সে আহ্বান প্রবেশ ক'রতে পারে না, কিন্তু যখন প্রবেশ করে তখন মানুষ তীব্র ব্যাকুলতায় উন্মত্তের মত ছুটে চলে তা'র জীবন-দেবতার উদ্দেশে, শত বাধা-বিঘ্ন তা'র পথরোধে অসমর্থ হয়, সে অভিযান তা'র শেষ হয় অন্তর্য্যামীর পদপ্রান্তে, জীবনদেবতা আলিঙ্গন করেন তা'র অভিসারী ভক্তকে, সার্থক হয় ভক্তের জীবন, পথের কষ্ট হয় তা'র আশীর্ব্বাদ।

এই নিগূঢ় দার্শনিক অভিব্যক্তিটি কুল-ললনা বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার জীবনে প্রকটিত হয়েছে। তিনি কুলবধূ, শ্বশুরালয়ে স্বামী, শ্বশ্রূমাতা, ননদিনী, আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হ'য়ে সংসার ক'রছেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন নীপবন হ'তে এক অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'রল, তিনি অভিভূত হ'য়ে প'ড়লেন। এ রকম বাঁশীর স্বর তিনি কখনও ত শোনেন নি, এ যে সমস্ত ভুলিয়ে দেয়, এ যে নারীর সংসারের পথে কাঁটা দেয়, মনকে উদাস ক'রে তোলে, আত্মসুখ, পরিজনের সুখবিধান—কুলস্ত্রীর সমস্ত কর্ত্তব্য থেকে যে বিচ্যুত করে! এ ত ভয়ানক জ্বালা হোল! কেবলি মনে হয় সেই বংশী-বাদকের সান্নিধ্য লাভ করি, কিন্তু তা'রই বা উপায় কি? কুলবধূ এক পরপুরুষের সঙ্গ কামনা ক'রে, এর চেয়ে আর কী লজ্জা, কী কলঙ্ক থাকতে পারে? কিন্তু গৃহেও ত মন টেঁকেনা—ভাল লাগেনা কিছুই, ধৈর্য্যের বাঁধ যে আর থাকেনা! এ ধ্বনিতে যে বিষ আর অমৃত একসঙ্গে মিশানো, সারা অঙ্গ থর-থর ক'রে কাঁপে, হৃদয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণা, শ্রীরাধিকা সখী ললিতাকে বল্‌লেন—

> কদম্বের বন হৈতে
> কিবা শব্দ আচম্বিতে
> আসিয়া পশিল মোর কানে
> অমৃত নিছিয়া ফেলি
> কি মাধুর্য্য-পদাবলী
> কি জানি কেমন করে প্রাণে॥
> সখি হে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
> হা হা কুলাঙ্গনামন
> গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
> যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥

ললিতা জানতেন এই ভুবনমোহন, জগজ্জনমনোহারী বংশীবাদক কে। তিনি বল্‌লেন "সখি, এ শব্দ আর কিছু নয়, এ হচ্ছে নন্দ-নন্দন শ্যামের সর্ব্বনাশা মুরলীধ্বনি। এ ধ্বনি কানে গেলে সংসারে আর মন থাকেনা সখি, মনে হয় ছুটে যাই সেই ব্রজবালকের সুখসান্নিধ্যে, সঁপে দিই আপনার জীবন, যৌবন, দেহ, প্রাণ, মন, সর্ব্বস্ব তাঁর পায়ে।"

"কি বল্‌লে তুমি, সখি? শ্যাম, ব্রজ কিশোর শ্যাম, কী সুন্দর, কী স্নিগ্ধ, কী আনন্দময় নাম! তাঁরই বাঁশীর স্বর! মরি, মরি, কী মধুর! শ্যাম নামে কী গভীর আকর্ষণ, কী অনাস্বাদিত পুলক-শিহরণ, কী অমৃতময় ধ্বনি! মনে হয় এখুনি ছেড়ে যাই এই বন্ধন, কুলবতীর সম্মান, মর্য্যাদা, সতীত্ব, সব কিছু, কী স্নিগ্ধ নাম সখি? শ্যাম, শুধু নামই যে আমাকে পাগল ক'রে তুল্‌লে! সখি, না জানি তা'র অঙ্গস্পর্শে কী আনন্দ! শ্রীরাধিকা ব্যাকুল হ'য়ে বলেন—

> সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
> কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
> আকুল করিল মোর প্রাণ॥
> না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
> বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তা'র নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥

ললিতার কাছে শুনে পর্যন্ত শ্যামের প্রতি শতধারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো শ্রীরাধার অনুরাগ, কিন্তু কিরূপেই বা কুলললনা হ'য়ে, সমাজের সমস্ত বাধা নিষেধ তুচ্ছ ক'রে যাওয়া যায় সেই পরমতম দয়িতের কাছে। সকালে, সন্ধ্যায়, দুপুরে, অপরাহ্নে, শ্রীরাধিকাকে আহ্বান জানায় সেই বাঁশী।

শ্রীরাধা সখীকে বলেন—

সজনি, লো সই,
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশীটি দুপুরা ডাকাতি
সরবস হরি' লেল।
হিয়া-দগদগি পরাণ পুড়নি
কেন বা এমতি কৈল॥

কিন্তু শ্রীরাধা যেতে পারেন না সেই পুলকিত নীপবনে, তাঁর বাঞ্ছিত দয়িতের সন্নিধানে, বাধা দেয় তাঁর কুল, শীল, মান। তাই তিনি উদাসিনীবেশে ব্যাকুল হ'য়ে ঘর থেকে বাইরে আসেন, আবার ঘরে যান, এমনি যে কতবার আসেন যান, তা'র ঠিক নেই। তৃষিত নয়নে ঘন ঘন কদম্ব-কাননের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, বসন আলুলায়িত, বস্ত্রাঞ্চল দেহ থেকে খ'সে প'ড়লেও পুনরায় বরতনু আবৃত করেন না, বসে থেকে থেকে আচমকা চমকে ওঠেন, সর্ব্বদা উন্মনা, উদাসী, অস্থির। এর মধ্যে বিশাখা শ্রীরাধিকাকে পটেতে এঁকে এনে দেখিয়েছে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি—নবদূর্ব্বাদল তুল্য অমিয়কান্তি, খঞ্জননিন্দিত, স্নিগ্ধ, কমনীয় শ্যামরূপ। শ্রীরাধিকা মুগ্ধ হলেন, সার্থক ক'রলেন তাঁর নয়ন, সঁপে দিলেন নিজেকে সেই ব্রজ-কিশোরের পায়ে। সেই থেকে তিনি নীলাকাশে সঞ্চরণশীল কাজল-মেঘের পানে তাকিয়ে থাকেন, দু'হাত বাড়িয়ে বুকে ধরতে চান সেই নীলাভ্রকে, মনে করেন ঐ বুঝি তাঁর দলিত-অঞ্জন-তনু, জলদবরণ 'কাঙ্ক্ষিত শ্যাম, হৃদয়ের পরমতম নিধি রূপের ছটায় সারা আকাশ বাতাস ব্যেপে বুঝি আসছেন! ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠে নিরীক্ষণ করেন নন্দ-নন্দন নীলমণির অঙ্গকান্তি!

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥
আউলাইয়া বেণী ফুলয়ে গাঁথনী,
দেখয়ে খসায়া চুলি।
হসিত বদনে চাহি মেঘপানে
কি কহে দু'হাত তুলি॥

এর পর শ্রীমতী যমুনায় জল আনতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী পান ক'রে এসেছেন। এসে তিনি সখিকে বলছেন—

তরুমূলে কি রূপ হেরিনু কালা কানু।
যে রূপ দেখিনু সই, স্বরূপ তোমারে কই
জল ভরিতে বিসরিনু॥
একে সে কালিন্দীকূল ত্রিভঙ্গিম তরুমূল
সজল-জলদ শ্যাম তনু।
জল ভরিয়া যাই, ফিরিয়া ফিরিয়া চাই,
হাসি হাসি পূরে মন্দ বেণু॥

শুধু তাই নয়, শ্রীমতী শ্যামনামে এতাদৃশ মুগ্ধ হ'য়েছেন, তাঁর সঙ্গকামনায় এতাদৃশ ব্যাকুল হ'য়েছেন যে রাত্রে ননদিনীর পাশে শয়ন করে শ্যাম ভ্রমে তাকেই আলিঙ্গন ক'রেছেন। ননদিনী যা' শুনেছিল শ্রীরাধার চরিত্র সম্বন্ধে—আজ তা'র চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে ভ্রাতৃবধূকে ভর্ৎসনার অন্ত রাখলে না—

ননদী উঠিয়া কহিয়া বলিছে
বঁধুয়া পাইলি কারে॥
এত চীটপনা জানে কোন জনা
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হৈয়া পরপতি লৈয়া
এমতি করহ নিতি॥

যে শুনি শ্রবণে পরের বদনে
নয়ানে দেখিনু তাই
দাদা ঘরে এলে করিব গোচর
ক্ষণেক বিরাজ রাই ॥

আরে ছিঃ ছিঃ, রাই আজ একি করলে? সবই ত জানাজানি হয়ে গেল। কী কলঙ্ক, কী অপবাদ! কুলের বধূ হয়ে পরপুরুষের প্রেমাসক্ত সে!

শ্রীরাধিকা অনেক বুঝে দেখলেন। কালিয়া বঁধু শ্যামের প্রেমে তাঁর জাতি, কুল, শীল সবই কলঙ্কিত হ'য়েছে, কলঙ্কের পসরা নিয়ে তাঁর লোকসমাজে মুখ দেখানো ভার, লোকে তাঁকে স্বৈরাচারিণী ব'লে গালি দেবে, তবু তিনি শ্যামের স্বপ্ন, শ্যামের কথা, শ্যামের মুরলীধ্বনি ভুলতে পারবেন না। তিনি যে শ্যামের পীরিতি মুগ্ধ, তাঁর প্রেমের জন্য তিনি কলঙ্কের হার পরতেও প্রস্তুত, আর সতীত্ব, কুলগৌরব ও চরিত্র? এ তিন ছাড়াই যে শ্যামের প্রেম! তিনি সখিকে বল্লেন—

শ্যামরূপ দেখিয়া আকুল হইয়া
দুকুল ঠেলিলাম হাতে।
ভুবন ভরিয়া অপযশ ঘোষণা
নিছিয়া লইনু মাথে ॥
সজনি কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বয়ানে নয়ান ভুলল
আর মনে নাহি লয় ॥
অপযশ ঘোষণা যাক্ দেশে দেশে
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যামের রাঙ্গা পায় এ তনু সঁপেছি
তিল তুলসীদল দিয়া ॥

কিন্তু আর নয়। তিনি অনেকদিন ধৈর্য্য ধ'রেছেন। লোকলজ্জার ভয়ে, গুরুজনের গঞ্জনায়, পাড়া-প্রতিবেশীর অপবাদে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে আপনাকে সংযত ক'রেছেন; কিন্তু এবার যে পিরীতির সুতীব্র আকর্ষণ, অননুভূত ব্যাকুলতা, অচিন্তিতপূর্ব্ব তীব্রতা। এ আকর্ষণ রোধ করা তাঁর সাধ্যাতীত। তিনি মনস্থ ক'রলেন, তিনি অভিসার ক'রবেন কালিয়া বঁধুর সকাশে, সেই যমুনাতীরস্থ বৃন্দাবনে, মুরলী-মুখরিত, মলয়ানিল-হিল্লোলিত সেই নীপবনে। কিন্তু পথের বাধা-বিঘ্নও অজস্র। একে সূচীভেদ্য অন্ধকার রাত্রি, তা'র ওপর যদি বর্ষণ-বিধৌত পিচ্ছিল পথ হয়! পথে কত কাঁটা, কত সাপ, কত হিংস্র প্রাণী! তিনি রাজনন্দিনী, কুলবধূ, বন্ধুর পথে তাঁর ত চলা অভ্যাস নেই! পথের কাঁটায়, সুচল উপলখণ্ড বা কাঁকরে তাঁর স্থলকমলোপম চরণতল যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। তবে উপায়? উপায় আছে। পথের বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হ'বার, পথের কষ্ট সইবার যে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও অভ্যাস থাকা প্রয়োজন, তা' তাঁকে নিজবাসে অনুশীলন করতে হবে; তা' না হলে সহসা বিঘ্নবহুল তামসী রজনীতে বাড়ীর বা'র হ'য়ে জীবন সংশয়াপন্ন হ'তে পারে, জীবন নষ্ট হলে ত শ্যামের সঙ্গসুখ লাভ হবে না, তাপিত হৃদয় প্রাণসখার আলিঙ্গন পাশে শীতল হ'বে না, পথের সমস্ত কষ্ট-সহন ত বিফলে যাবে! তাই তিনি নিজ আবাসে, সবার অলক্ষ্যে, নিজ কক্ষে বিনিদ্র রজনীতে অভিসার-সাধনা আরম্ভ ক'রলেন। এ সাধনা যে কী নিদারুণ, কী দুঃসহ, কী আত্মনির্য্যাতনে-ভরা—প্রাণ-প্রিয়ের সঙ্গলাভার্থে ব্যাকুলা দয়িতার চূড়ান্ত সাধনার কী সুনিবিড় অভিব্যক্তি তা' বৈষ্ণব মহাজন রসিকচূড়ামণি গোবিন্দ দাস বর্ণনা করেছেন।

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভামিনী
তিমির-পয়ানক আশে।
মণি-কঙ্কণ-পণ ফণি মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরুপাশে ॥
গুরুজন বচনে বধির সম মানই,
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

এইরূপে নিদারুণ সাধনা ক'রে শ্রীমতী বহির্গত হ'লেন প্রাণদয়িতের সন্ধানে। শ্যামের অনুরাগে তিনি সর্ব্বশরীর নীল মৃগমদে অনুরঞ্জিত ক'রেছেন, নীল নিচোলে বরতনু

আবৃত ক'রেছেন, হাতের কঙ্কন, তাও নীল, নিরন্ধ্র অন্ধকারও নীল, তাই তাঁর আর রাত্রিতে পথ অতিবাহনে ভয় নাই, নিবিড় রাত্রির বুকে শ্রীমতী যেন একটি সচল নীল শতদল, শ্রীকৃষ্ণের অতলস্পর্শ প্রেমসিন্ধু নীরে শ্রীমতী যেন শতদলরূপে বিকশিত হ'য়েছেন।

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়গণে ভুজযুগ মণ্ডিত,
পহিরণ নীল নিচোল॥
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি
নব অনুরাগে গোরী ভেলি শ্যামরী
কুহু-যামিনী ভয় ভাগি॥
নীল অলকাকুল অলিকেহিলোলিত
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু শ্যামর সায়রে
লখই না পারই কোই॥

শ্রীরাধার এখন আর ভয় নেই, বর্ষণমুখর ঘনান্ধকার যামিনীতে তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে পথ অতিবাহিত ক'রছেন, লোকের দৃষ্টি পথে পড়ার আর কোন শঙ্কা নেই। যে বিষধর ভুজঙ্গ দেখলে ভয়ে সারা হ'তেন, সেই বিষধর সর্পের ফণাস্থিত উজ্জ্বল মণিকে বস্ত্রাবৃত ক'রতে যান, যে নবনীত কোমল পদতল মৃত্তিকাস্পর্শে কাতর হোত, সেই চরণকমলে কণ্টকাকীর্ণ বনপথও অন্ধকারে একাকিনী অতিক্রম ক'রছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে আজ তিনি বিভোর, নিঃশঙ্ক, অবাধ।

* * * *

পথ আর বেশী বাকি নেই, ওই দেখা যায় ব্রজকিশোর নন্দ-নন্দনের পুষ্পিত লতাবিতান। শ্রীমতীর বক্ষ দুরু দুরু কম্পিত হ'য়ে উঠছে। আঃ কী আনন্দ আজ! আজ তাঁর জীবন, যৌবন—দেহ, প্রাণ সার্থক। তিনি প্রাণবঁধুর অঙ্গ স্পর্শ লাভ ক'রবেন, কোটি কোটি চন্দ্রের সুধা-মাখানো জগজ্জনমনোহারী পরমদয়িতের মুখাবলোকন ক'রবেন, সুধানিন্দিত কণ্ঠস্বরে কর্ণকুহর শীতল ক'রবেন, জাতি, কুল, শীল, মান—সব তুচ্ছ, সব অকারণ, কোন ভয় আজ তাঁর নেই, নিখিলজনের পরমাশ্রয়, পরমপ্রিয় তাঁকে আজ বরণ ক'রে নেবেন, এ'র চেয়ে আর কি সুখ আছে তাঁর!

দূর থেকে গোপীজন-মনোহারী শ্রীকৃষ্ণ দেখতে পেয়েছেন যে শ্রীমতী আসছেন, ব্যস্তপদে অগ্রসর হ'য়ে শ্রীমতীকে আলিঙ্গন ক'রলেন, নিজ করকমলে শ্রীমতীর শোণিতাক্তরঞ্জিত চরণযুগল মুছিয়ে দিলেন, পথশ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত মুখখানির পানে বিস্ময়-বিস্ফারিত, আনন্দ-বিগলিত নয়নে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। সজল পদ্মপত্রে বীজন ক'রতে লাগলেন বাঞ্ছিত দয়িতাকে, গদগদ বচনে জিজ্ঞাসা ক'রতে লাগলেন শ্রীমতীর পথের কষ্ট, বিঘ্ন ও ভীতির কথা। নিমিলিত নয়না শ্রীমতী ধীরে ধীরে উত্তর ক'রলেন—

মাধব, কি কহব দৈববিপাক।
পথ-আগমন-কথা কত না কহিব হে
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥
মন্দির তেজি যব পদ চারি আওলু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ হেরই না পারয়ে
পদযুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥

একে কুলকামিনী তাহে কুহুযামিনী
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর,
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু
চির দুখ সব দূরে গেল॥

প্রতিবেশী

শ্রীভোলানাথ গুপ্ত

সামান্য একটা সেলাইয়ের কলের জন্য যে তাকে এত বড় ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে নমিতা কোনদিন তা কল্পনাও করতে পারেনি। তার দিদির একটা সেলাইয়ের কল আছে; তাই নমিতারও ইচ্ছে হয়েছিল একটা কল কেনে। কথাটা শুনে মনোজ বলেছিল, কি হবে কল কিনে? একটা কাজ বাড়বে বইত' নয়।

স্ত্রীর এ অনুরোধ মনোজ এড়াতে পারেনি। তাই শেষ পর্য্যন্ত একটা কিনেও দিয়েছিল। কিন্তু বিপদ করলে সামনের বাড়ীর রায়-গিন্নী। প্রথম দিন কলের শব্দ পেয়েই জানালা দিয়ে ডেকে বললেন, বৌমা কল কিনেছ বুঝি?

—হাঁ মাসীমা—অজানা আশঙ্কায় কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলে নমিতা।

বেশ করেছ। ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করতে গেলে কি কল না কিনলে চলে। দরজিকে আর কত পয়সা দেওয়া যায়। বড় বৌমাও বলছিল—তা এখনও কেনবার সুবিধে হয়নি। কথা এইখানেই শেষ হল বটে, কিন্তু তার জের চলল আরও অনেক দূর। তুপুর বেলা রায়-গিন্নী কাপড় ও মাপ নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, খোকার দুটো প্যান্ট আর সুমির একটা ফ্রক করে দিও ত' বৌমা।

—রেখে যান, রাত্রে করে রাখব।

রায়-গিন্নী খুশী হয়ে ফিরে গেলেন। রাত্রে অপরের জিনিষ সেলাই করতে দেখে মনোজ বললে, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। অহেতুক কাজ বাড়ালে ত?

সেলাই-রতা নমিতা বললে, এই ত কটা জিনিষ। মাসীমা দিয়েছেন তাই করে দিচ্ছি।

মনোজ বললে, মাসীমা পিসীমা এখন ঢের জুটবে, কিন্তু সাবধান। শরীর একবার ভাঙ্গলে তখন ভুগতে হবে তোমায়—আর বিপদ হবে আমার। মিথ্যে ঝঞ্ঝাট বাড়িও না।

এই কলকে কেন্দ্র করে প্রত্যহই মধ্যাহ্ন-অতিথির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। কেউ অনুরোধ জানিয়ে যান সেলাই করে দেবার জন্য, কেউ আবার নিজেই সেলাই করে নিয়ে যান। নমিতাও ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পাছে কেউ অসন্তুষ্ট হয় এই ভয়ে কিছু বলতে পারত না। কিছুদিন এমনি ভাবে কাটবার পর নতুন এক বিপদ দেখা দিল। রায়-গিন্নী, চক্রবর্ত্তী-গিন্নী প্রভৃতি প্রবীণাদের অনুরোধ শেষ পর্য্যন্ত উপরোধে পরিণত হল। সেদিন জানালা দিয়ে ডেকে রায়-গিন্নী বললেন, বৌমা আজ একবার কলটা পাঠিয়ে দিও ত—কয়েকটা জিনিষ সেলাই করবার আছে, ক'দিন ধরে বলি বলি করে আর বলা হয়ে ওঠেনি। নমিতা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও মুখে বললে, নিয়ে যাবেন।

মনোজ এ খবর শুনে বললে, কলের পরমায়ু শেষ হ'য়ে এলো দেখছি।

—আমি কি করব বলো?

—না, করবার কিছুই নেই। শুধু একটা উপায় আছে কলটা বিক্রী করে দেওয়া। দেখি শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তাই দিতে হবে।

নমিতা বললে, কি জ্বালাতন বলো ত!

মনোজ মৃদু হেসে বললে, ওদের ওই রকমই স্বভাব। প্রতিবেশীদের এড়িয়ে চলাও যেমন যায় না, তেমনি বিপদও তাদের নিয়ে কম নয়।

তাই বলে একটা কলও ব্যবহার করতে পাব না? যা দেখবে তাতেই লোভ! এমন লোকও কখনও দেখিনি বাবা! অভিমান-উদ্বেলিত কণ্ঠে নমিতা বললে!

মৃদু হেসে মনোজ বললে, বলে দিও যেন আর না চায়।

—সে কেমন করে হবে? তা কি বলা যায় কাউকে!

—অন্য কোন উপায়ও ত আর দেখছি না।

নিজেরা ত একটা কল কিনে নিতে পারেন? ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে নমিতা বললে।

—কিন্তু সে বুদ্ধিটুকু যদি তাদের মাথায় না জোগায় ত' আমি কি করব?

বিরক্তি শেষ পর্য্যন্ত চরমে পৌছল। সেদিন চক্রবর্ত্তী-গিন্নী কল ফেরৎ না দিয়ে জানালেন—কলটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছে, আর চলছে না। খবর শুনে নমিতার চোখ ফেটে জল এলো। তার এত সাধের কলটা শেষ পর্য্যন্ত কিনা আনাড়ির হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। নমিতা কলটা সারাবার জন্য চেয়ে আনলে। চক্রবর্ত্তী-গিন্নীর সেলাইগুলো শেষ হয়নি তাই বললেন, কাজ শেষ না হতেই কলটা বিগড়ে গেল। মনোজ বুঝি দেখে-শুনে কেনেনি ?

নমিতা কোন জবাব দিলে না।

চক্রবর্ত্তী-গিন্নী পুনরায় বললেন, আমার ভাগ্নে শৈলেশ একটা কল কিনেছিল। সেটা কিন্তু অনেক দিন চলেছিল।

নমিতার মুখে একথাটার একটা জবাব এসেছিল কিন্তু অশান্তি এড়াবার জন্য সে নিজেকে দমন করে নিলে। মনে মনে শুধু বললে—কি বেহায়া, লজ্জার যেন লেশ মাত্র নেই !

মনোজ খবরটা শুনে বললে, ভালই হল। এখন আর কেউ জালাতে আসবে না।

নমিতা বললে, কলটা সারিয়ে বিক্রী করে দিও।

বেশ। অফিসে দীরেন বলছিল সে বাড়ীর জন্য একটা কল কিনবে। তাকে বিক্রী করে দিলেই হবে।

সপ্তাহখানেক পরে রায় ও চক্রবর্ত্তী গিন্নীদ্বয় বেড়াতে এলেন। উদ্দেশ্যটা দেখে যাওয়া কলটা সারান হয়েছে কিনা। কলটা না দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করলেন, কলটা সারাওনি বৌমা ?

নমিতা বললে, সারিয়ে বিক্রী করে দিয়েছি।

চক্রবর্ত্তী-গিন্নী বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, ওমা সেকি কথা ! কল কি কখনও বিক্রী করতে আছে ?

রায়-গিন্নী যাবার সময় বললেন, কলটা অনেকের কাজে লাগছিল বৌমা। তা বিক্রীই যখন করে দিয়েছ তখন ত আর উপায় নেই। মুখ ভারী করে তু'জনেই চলে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা নমিতা শুনতে পেলে রায়-গিন্নী পাশের বাড়ীর গিন্নীকে ডেকে বলছেন, দেখলেন বৌটার কাণ্ড ?

—কি হল দিদি ?

হবে আর কি। একটা কল ছিল জানেন ত ?

শুনেছিলাম বটে।

শুনতে হবে কেন আমি নিজেই ত জানি। দশজনার কাজে লাগছিল, তা ওর চোখে সইল না। রাতারাতি কলটা বিক্রী করে দিলে, কি একচোখা বৌ বাবা ?

মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে কথাটা এমনি একটা রূপ ধারণ করলে যে অনেকে ভাবলে বৌটা হয়ত সত্যই ভারী সয়তান, ভারী এক চোখো। একদিন নমিতার সমবয়সী একটি বৌ এসে জিগ্যেস করলে, কি সব শুনছি, সত্যি নাকি ভাই ?

নমিতার মুখটা শুকিয়ে গেল। সে জানত রায়-গিন্নীর অসাধ্য কাজ কিছু নেই। মুখে তার কোন মিথ্যাই আটকায় না। তাই ভয় চকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কি শুনছ ?

বৌটি চুপি চুপি যেকথা বললে তার অর্থ হল এই : নমিতার স্বভাব ভাল নয়, সে নাকি পরপুরুষের সঙ্গে হাসাহাসি চলাচলি করে—মিথ্যে নয়, রায়-গিন্নীর নাকি এসব নিজের চোখে দেখা।

হেসেছিল নমিতা সত্যই, কিন্তু পরপুরুষের সম্মুখে নয়, মনোজের কাছে। তার একটা কারণও ছিল। মনোজ সেদিন অফিস থেকে এসে খবর দিলে যে, অফিসের যে বন্ধুটি কলটা কিনেছিল তার বাড়ীতেও নাকি পাড়ার লোক ভীড় জমিয়েছে। তাই তার বৌ বলেছে—কলটা বিক্রী করে দিও, আমার সখ মিটেছে। কল না হলে আমার চলবে, কিন্তু এ ঝঞ্ঝাট আমি পোহাতে পারব না।' কথাটা হাসবারই মত তাই সে হেসেছিল। কিন্তু এর মধ্যেই রায়-গিন্নী খুঁজে পেয়েছিল নমিতার স্বভাবের দোষ।

নমিতার মুখে সব কথা শুনে বৌটি বললে, আমি জানতাম সব মিথ্যে, তাই বিশ্বাস করিনি। অনেকের পিছনেই ওঁরা লাগেন ওটা ওঁদের স্বভাব। যাবার সময় বৌটি বললে তার স্বামী কোথায় একটা ভাল বাড়ী পেয়েছে। বাড়ীটা তাদের এক আত্মীয়ের। নমিতা ইচ্ছে করলে সে বাড়ীতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে পারে।

নমিতা রাজী হয়ে গেল।

মনোজ এলে সমস্ত ঘটনাটা নমিতা তাকে বললে। শেষে বাড়ী ঠিক করার কথা জানিয়ে বললে, উঠে গেলে ভাল হয় না ? কে এই সব নিন্দুকদের মধ্যে থাকবে ?

মনোজ বাধা দিলে না। বললে চলো, তবে সেখানে গিয়ে আবার কল কিনতে চেয়ো না যেন।

দিন কতক পরেই তারা সে পাড়া ছেড়ে চলে গেল।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার-এট-ল্

(শ্রীমদ্ভাগবত হইতে)

তিনি যে অমানী মান নেই তাঁর,
প্রিয় কেহ নাই, নাই অপ্রিয়,
অধমোত্তম সকলি সমান
নাই মাতা পিতা সুত আত্মীয়।

ভার্য্যাও নাই পরও কেহ নাই
দেহ নাই তাঁর জন্মহীন,
ইহলোকে তাঁর কর্ম্মও নাই,
সাধু বা অসাধু, ধনী বা দীন—

সকলি সমান সদা তাঁর কাছে
কখন কখন ক্রীড়ার তরে,
জন্ম লভেন ভিন্ন যোনীতে
সাধুজন পরিত্রাণের তরে।

নির্গুণ তবু সত্ত্ব রজাদি
ভজনা করেন সগুণ হয়ে,
ক্রীড়ার অতীত তথাপি ক্রীড়ায়
মগ্ন সৃজন-পালন-লয়ে।

নয়নের যদি কভু দোষ হয়
মনে হ'তে পারে পৃথিবী ঘোরে,
কর্ত্তা যদিও চিত্তে রহেন
আত্মাই চিতে রূপটি ধরে।

ভগবান্ হরি কেশব কেবল
আপনাদেরই আত্মজ নয়,
সকলেরই তিনি মাতা পিতা সুত
তিনিই আত্মা বিশ্বময়।

স্থাবর অথবা জঙ্গম আদি
মহৎ অল্প যাহাই বলি,
বর্ত্তমান কি ভবিষ্যকালে
দৃষ্ট অথবা শ্রুত সকলি—

নামে হ'তে পারে পরিচিত তারা
বস্তুমাত্র এ চরাচরে,
তথাপি জানিও অচ্যুত বিনা
প্রাণীগণ নাহি জীবন ধরে।

হে রাজন্, কৃষ্ণসখা উদ্ধবের সাথে
বাক্য আলাপনে নন্দ কৃষ্ণ-প্রেমে মাতে।
দেখিতে দেখিতে শুভ রাত্রি হ'ল শেষ
নিশা অবসানে গোপী পরে শুভ্র বেশ।

প্রদীপ জ্বালিয়া করে অঙ্গ প্রসাধন,
প্রবৃত্ত হইল দধি করিতে মন্থন।
অরুণ-বরণ মুখে কুঙ্কুমের শোভা,
কপোলে কুণ্ডল-ভাতি অতি মনোলোভা।

দীপের আভায় দীপ্ত কাঞ্চীমণিগণ
দধিমন্থনের রজ্জু ধরে আকর্ষণ,
মালিকা কঙ্কন পরা—চারু ভুজদ্বয়,
দোলে পীন স্তন হার নিতম্ব নিচয়।

কৃষ্ণগুণগান তারা গায় সুমধুর,
দধিমন্থনের শব্দে মিলিল সে সুর,
মন্দ্রিত হইল দিক্ কৃষ্ণ প্রেমগানে,
সর্ব্ব অমঙ্গল দূরে গেল সেই স্থানে।

উদিলে সূর্য্য পূর্ব্বতোরণে নন্দ দুয়ারে হেরি'
সুবর্ণময় রথখানি যত গোপীরা পরস্পরে
বলাবলি করে কে এল এ রথে অক্রূর এল নাকি ?
কংসের যিনি কার্য্যসাধক তারি প্রয়োজন তরে—

কমললোচনে নিল মথুরায়, এবার কি কাজ হবে
মোদের মাংসে ঊর্দ্ধদেহিক হবে কি সম্পাদন ?
গোপাঙ্গনারা এইরূপে যবে বলাবলি করে সবে,
আহ্নিক শেষে উদ্ধব এসে দিল তথা দরশন।

কি শিখিলাম

শ্রীহরিহর শেঠ

(২)

আমার এ সব আত্মকাহিনী হয়ত অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি আনিবে। কিন্তু পূত সাহিত্যক্ষেত্রেও মেকির স্থান কিরূপ, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা বা শিক্ষার কথা জানাইবার উদ্দেশ্যেই আমার এই প্রয়াস। আমার মনে হয় বুঝি বা এখানেই মেকির চলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমি যখন লিখি তখন লেখক একথা বলিতেই হয়। বয়স প্রায় সপ্ততি বৎসর, বাল্যকাল হইতেই লিখিয়া আসিতেছি সুতরাং প্রবীণ লেখক কেহ বলিতে পারেন। লিখিবার সখ আছে, ইতিহাস আমার আদরের জিনিষ, পুরাতত্ত্ব বিষয় আলোচনা ও গবেষণা আমি ভালবাসি—তাই বলিয়া সাহিত্যিকের উচ্চ সম্মান দাবী করিবার অধিকার আমার আছে বলিয়া মনে করি না। সাহিত্যের মন্দিরে আমি একজন অতি দীন নগণ্য সেবক, একজন হরিজন মাত্র। একবার প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিজেকে সাহিত্য কাননের মালি বলিয়া উল্লেখ করেন। তৎপরে আমি কিছু বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে, আমি বলি 'দাদা যদি মালি হন, সত্য বলিতে হইলে আমিও সেখানে চোর ছাড়া আর কিছু নয়।' একথা আজিও সত্য, প্রধানতঃ পাঁচ জায়গা হইতে চুরি করিয়া রচনা করাই ত আমার কাজ। অবশ্য পুরাতন ইতিহাস সৃষ্টি করিবার সামগ্রী নহে, সংগ্রহ ও গবেষণার দ্বারাই ইতিহাস রচিত হইয়া থাকে। "প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়" ইতিহাস নহে, একখানি পরিচয় পুস্তক, বহু গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া অবান্তর যাহা কিছু পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুধু জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি একটি পদ্ধতি ধরিয়া সাজাইয়াছি সেই জন্যই হয়ত ইহা অনেকের ভাল লাগিয়াছে। আমার এই সংগ্রহের কথা সর্ব্ব প্রথমেই স্পষ্ট স্বীকার করিয়া পুস্তক আরম্ভ করিয়াছি, তথাপি কলিকাতার কয়েকজন প্রাচীন খ্যাতনামা মনিষীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিতে সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান' হইতে সাহায্য লওয়ায় 'অবতার' পত্রিকায় আমাকে সাহিত্যিক সমাজে এবং সাধারণের কাছে হেয় করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। অপরের গ্রন্থাদি হইতে আমি অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছি সত্য কিন্তু কখনও তাহা অস্বীকার বা গোপন রাখিবার প্রবৃত্তি হয় নাই।

যাহাই হউক আমি কোন শ্রেণীর সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমাজে আমার স্থান কোথায় তাহা আমি ভালরূপই জানি। পাঠক পাঠিকা সমীপে আমার ঐতিহাসিক বা পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা যে ভাবেই গৃহীত হউক, মৌলিকত্ব তাহার মধ্যে কমই আছে। যদি কাহারও তাহা ভাল লাগিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে আমার অদৃষ্ট-গুণেই হইয়াছে। ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইতিহাস, ইতিবৃত্তাদি ভিন্ন অন্যান্য…প্রধানতঃ ব্যবসায় ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি আমার নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধিপ্রসূত। ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলির মধ্যেও অবশ্য আমার নিজের কথা অনেক আছে। 'স্রোতের ঢেউ' পুস্তকখানিতে আমার চিন্তা স্রোতের ভিতর দিয়া যে ঢেউগুলি দেখা দিয়াছে তাহার অনেকই হয়ত পুরাতন চর্ব্বিত চর্বণ, কিন্তু প্রত্যেকটিই জীবনের পথে চলিতে আমার কুড়ান রতন। ইতিহাসের প্রসঙ্গে আমার সাধনালব্ধ সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের ও গর্ব্বের বিষয় হইতেছে, ফরাসীদের বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রথম যে জমিখণ্ড লাভ হয় সে বিষয়, গবেষণা। * আর বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান না থাকিলেও, কাগজের নেগেটিভে ফটোগ্রাফ তোলার উপায় বিষয়ক আমার অভিজ্ঞতামূলক প্রবন্ধটিই আমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা আদরের। † আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন সহজ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য এবং কার্য্য বিশেষে ইহাতে এমন সুবিধা সত্ত্বেও প্রক্রিয়াটি আজিও চলিতে দেখিলাম না, অথচ আমার বিশ্বাস কি ইউরোপ কি আমেরিকা সকল দেশের ফিল্ম ও ড্রাইপ্লেট কারখানাওয়ালারা এ তথ্য জ্ঞাত আছেন।

কি কুক্ষণেই আমি চন্দননগরের পরিচয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কি কুক্ষণেই ফরাসীদের বঙ্গে আদিস্থান নিরূপণের গবেষণায় মনোনিবেশ করিয়াছিলাম। প্রধানতঃ এই সূত্রে ধরিয়া অগ্রসর হওয়াতেই পাঠক পাঠিকা সমাজে আমার কিছু পরিচিত হইবার সুযোগ হইয়াছে বটে এবং এই সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠাই শুধু আমার অপূর্ণ অঙ্গের অনেক কালিমা চিহ্ন ঢাকিয়া দিয়াছে। তাহাতে আমার পরকালের জন্য না হউক ইহকালের যথেষ্ট পাথেয় আনিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই। এটুকু না থাকিলে আজ আমি কোথায় থাকিতাম বলিতে পারি না। আমার নগ্নরূপের ও মনের পরিচয়ে হয়ত জনসমাজে আমার স্থান অনেক নিম্নেই নির্দ্ধারিত থাকিত। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার আমার ইহার দ্বারা যে দুঃখ পাইতে হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বিস্মৃত হইবার নয়।

শত ত্রুটির আধার হইলেও চন্দননগর আমার জন্মস্থান, আমার কত আদরের তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব। অনিষ্ট শুধু আমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলেও কোন কথা ছিল না, কিন্তু তাহাতে প্রকারান্তরে চন্দননগরেরই ক্ষতি হইয়াছে। আমার দীনা চন্দননগরের প্রতি আমার

* চন্দননগরের আদি পরিচয় ও বঙ্গে ফরাসীদের আদিস্থান নির্ণয়।" —প্রবাসী ১৩৩১ "an enquiry into the Early History of Chandernagore and the problem of the location of the first French Settlement in Bengal." The Modern Review, 1927.

† "সহজ উপায়ে ফটোগ্রাফী"—প্রবাসী ১৩৩৮

যথাশক্তি কর্ত্তব্য পালনে যে বাধা—কোন কোন বন্ধু, স্থানীয় রাজনীতি ক্ষেত্রের দলাদলি হইতে উদ্ভূত একথা বলিলেও, তাহা আমার চন্দননগর সংক্রান্ত রচনা হইতেই আসিয়াছে ইহাই আমার বিশ্বাস। কথাটা খুবই ছোট কথা, তাহা হইলেও আমার বিশ্বাসের কথা না বলিয়া পারিলাম না। আর একটী অতি দুঃখের কথা, আমার খুবই মনে হয়, আমার এই কার্য্যের ফলে চন্দননগরের একখানি প্রকৃত ইতিহাস হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। চন্দননগরের পরিচয় দিতে অগ্রসর না হইলে তাহা প্রকাশিত হইত বলিয়াই মনে করি।

দলাদলির কথায় সাহিত্যিক সমাজে একবার যে দলাদলির পরিচয় পাইয়াছিলাম সেকথা মনে হইতেছে। ১৩৪০ সালে চন্দননগরে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক মনীষী ও খ্যাতনামা সাহিত্যিকের সহিত দেখা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সে অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সাহিত্যের কোন শাখায় বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইলে তিনি বলেন,—তাঁহার জেলায় হইতেছে তিনি সম্মিলনে উপস্থিত থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার কথা, একজন অসাহিত্যিককে সভাপতি করা হইয়াছে সেজন্য একটি সাহিত্যিকও আসিবেন না। বলা বাহুল্য কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হয় নাই, বাংলার বহু স্থান হইতে বহু প্রথিতনামা সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে সভা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্মিলন উদ্বোধন প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রবাবুর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আবার একজন উপস্থিত কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা ঔপন্যাসিক পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বজনবরেণ্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীর প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলিলেন, তিনি যদি সাহিত্যশাখার সভাপতি হন তাহা হইলে তিনি আসিবেন না। এইরূপ পরিচয় আরও পাইয়াছিলাম। তাহা হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে দলাদলি রাজনীতিক বা অন্য দলাদলি অপেক্ষা যে কোন অংশে হীন নহে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কোন জগদ্বরেণ্য কবি কোন প্রথিতযশা মহিলা ঔপন্যাসিক—যিনি বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকা বলিয়া পরিচিতা, তাঁহার রচনার কথায় একবার একটী কথায় যে অবজ্ঞার পরিচয় দিতে দেখিয়াছিলাম তাহাও সত্যই মর্ম্মান্তিক। তিনি বলিয়াছিলেন—'একেবারে অচল।' এসব মন্তব্য যদি সত্যও হয় তাহা হইলেও এরূপ বরেণ্য ব্যক্তিদিগের মুখে কখন শোভন হইতে পারে না। এসকল উক্তি বা ব্যবহার যাহা হইতেই উদ্ভূত হউক তাহা কোন উচ্চ বৃত্তির পরিচায়ক হইতে পারে না। ইহার তুলনায় 'অবতারের' অপপ্রচেষ্টার কথা ভাবিলে আমার মত লোকের দুঃখিত হইবার কিছুই থাকে না।

এসব হইতে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় না কি, যে জ্ঞানী মানী বিদ্বান ব্যক্তি হইলেও সংকীর্ণতা হইতে একেবারে মুক্ত হইবেন এমন কোন কথা নাই। পৃথিবীতে বর্ত্তমানের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তথাকথিত নীচ জাতিদের হাড়ি মুচি না বলিয়া অন্য একটী আখ্যা দেওয়ায় তাহাদের প্রতি কি সহানুভূতি দেখান, কি উপকার করা হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারি না। এই নূতন পদবী প্রদত্ত হইবার পর তাঁহাদিগের জন্য কোথাও কোথাও স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইল বা হয়ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিল, কিন্তু এই নূতন উপাধি পাইয়া তাহারা সমাজে কি কিছু উচ্চ স্থান পাইল? হয়ত ইহার মধ্যে কিছু ভুল থাকিতে পারে নচেৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্য কিছু থাকিতেই পারে না, কিন্তু অহিংস অসহযোগ নীতির প্রবর্ত্তক ও উপাসক হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েলসের কলিকাতায় আগমনকে উপলক্ষ করিয়া সারা ভারতে কিনা মনে নাই, বাঙ্গলায় সর্ব্বত্র হরতাল ঘোষণা করিলেন কেন? তাঁহার নীতির সহিত ইহার ত সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার ছোট মুখে এই সব কথা হয়ত মক্ষিকাবৃত্তিরই পরিচায়ক, হয়ত এজন্য অশেষ ঘৃণিত হইব; কিন্তু এইসব মনীষী আমারও অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, তাহা হইলেও আমি যে ভাবে চিন্তা করিয়া থাকি, যেভাবে চলিতে চেষ্টা করিয়া থাকি তাহাতে আমার মনের এসব কথা প্রকাশ করিতে বাধে না।

অপ্রিয় সত্য কথা বা বিরুদ্ধ সমালোচনাও যে কত মিষ্ট করিয়া বলা যায় তাহারও পরিচয় এক পণ্ডিতের কাছে পাইয়াছিলাম তাহাও ভুলিতে পারি না। পূর্ব্ব বঙ্গের সাহিত্য সম্রাট স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার প্রথম রচিত উপন্যাস 'অভিশাপের' সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"* * আপনার লেখায় এখানে সেখানে ভুল আছে; এরূপ ভুলে বঙ্গের কোন ঔপন্যাসিকই মুক্ত নহেন। যথা, 'নিরানন্দ' শব্দ চির-পরিচিত বিশেষণ আপনি উহাকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু আপনার পক্ষে নজির না আছে এমন নহে, 'নীরব' শব্দ চিরপরিচিত বিশেষণ কিন্তু স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র উহার বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তবে, ন্যায়ের অনুরোধে ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে এ সকল সৌখীন ভুল সত্ত্বেও আপনার লেখায় সুখপ্রীতিকর সৌন্দর্য্য আছে। সুতরাং আপনি ব্রত পরিত্যাগ না করিয়া আরও দুই চারিখানি পুস্তক লিখিলে বাঙ্গালা সাহিত্য উপকৃত হইবে।"

এই যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সহিত সংযুক্ত হইবার, বহু মনীষী ও সাহিত্যিকদিগের সহিত মিলিত হইবার, তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ হইয়াছিল, ইহাকে আমি আমার সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। ইহাতে স্পর্দ্ধার কথা কিছু নাই কিন্তু আমার পক্ষে গৌরবের কথা যথেষ্টই আছে। যত নগণ্যই হউক, আমার তথাকথিত সাহিত্য সেবা হইতেই এ গৌরব লাভ হইয়াছিল এবং চন্দননগরে এসব বিরাট সাহিত্য-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে একজন উপলক্ষ হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম তাহাতে নিজেকে ধন্য মনে করি। আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালক সভায় যে সম্মানের আসন লাভের সৌভাগ্য লাভ ঘটিয়াছে, বা বিভিন্ন সাহিত্য সভা হইতে সম্মানিত উপাধি লাভ হইয়াছে, অথবা বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির শীর্ষপদ গ্রহণের ভার লইয়াছিলাম ইহার অন্যতম কারণও উহাই। শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ স্নেহপ্রীতি বশেই তাঁহাদের রচিত কতিপয় পুস্তক আমার নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

তাহা জানি, কিন্তু তাঁহারা সাহিত্যের একজন সেবক হিসাবেই আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

এক্ষণে কয়েক বৎসর যাবত সাহিত্য সেবা বলিতে প্রায় কিছুই নাই। ইচ্ছার অভাব না থাকিলেও সময়াভাব ও বিশেষ করিয়া শরীরের অপটুতার জন্যই প্রধানতঃ ইহা বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এখন নিতান্ত কথা এড়াইতে না পারায় যেখানে কোন সভা পরিচালনার ভার লইতে হয়, বক্তৃতার দক্ষতার অভাবে সাধারণতঃ সেখানে একটু লিখিয়া লইয়া যাইতে হয়। মোটামুটি ইহাই এখনকার সাহিত্য সেবা।

নূতন রচনাদিতে হাত দিতে না পারিলেও কতিপয় অসমাপ্ত কার্য্যের জন্য মনটা সময় সময় বড়ই খারাপ হয়। তন্মধ্যে ছড়া ও প্রবন্ধ প্রবচন সংগ্রহ ও সাময়িক সাহিত্যের প্রবন্ধ সূচী প্রণয়নই প্রধান। বাঙ্গলা সাময়িকের প্রথম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিষয় বিভাগ করিয়া প্রবন্ধাদির একটি সুবিন্যস্ত সূচী প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। এখনও সে ইচ্ছা যায় নাই, কিন্তু বুঝিতেছি তাহা আর আমার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। বাঙ্গলা ভাষায় কাব্য উপন্যাস বা কথা সাহিত্য ছাড়া অন্য অনেক বিভাগের এখনও গ্রন্থাদির যথেষ্ট অভাব থাকিলেও সাময়িক পত্রে বহু বিভাগের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার একটি সূচী প্রকাশিত হইলে, যাঁহারা গবেষণাদি কার্য্যে রত বা কোন কিছু বিষয় বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অশেষ উপকার হওয়া সম্ভব।

আমার সাহিত্য সাধনার কথা প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলিলাম। সাহিত্য সাধনার মধ্যে বেশ একটা মাদকতা আছে। আমার মত সাধারণ লেখকদের প্রথম প্রথম নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখিবার জন্য একটা খুব আগ্রহ হয় এবং বার বার লেখার ঝোঁক বাড়িয়া যায়। আমার সাধনা যদি অত্যল্পও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে কত সহজে কত স্বল্পে কতটা প্রতিষ্ঠা লাভ হয় তাহা অল্পায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

শেষ করিবার পূর্ব্বে একটা কথা বলা প্রয়োজন। সেরূপ করিয়াই লিখি, ইহার মধ্যে যদি আত্মপ্রশংসার গন্ধ কেহ পান তাহা আশ্চর্য্য নহে। নিজের প্রতিষ্ঠার কথা নিজমুখে ব্যক্ত করা কত বড় বেয়াদপি তাহা আমি অজ্ঞাত নহি। তবে আমার এই প্রতিষ্ঠা অহেতুকী, মূলে সার-বস্তু বিশেষ কিছু নাই। সাহিত্যের পবিত্র-ক্ষেত্রেও মেকি কিরূপে চলিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে নিজ জীবনে যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহাই লিখিলাম।

কেহ কি ভাবিবে তার ফিরাতে চেতনা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সুন্দরের ইন্দ্রজালে ভরেছে ভুবন,
বাণীর বর্ষণ ধারা ভাবাবেগে বহে।
আনন্দের অভিসারে জীবন স্বপন
অসীমের উৎস হোতে উৎসারিত রহে।
সভ্যতার বিক্ষোভের দীর্ঘ অভিশাপ
হৃদয় সাগর হোতে বাষ্প সম ওঠে:
বহ্নি সম অন্তরের অসহ উত্তাপ
মেঘ হয়ে ভাগ্যাকাশে তারা সবে ছোটে।
কভু বজ্র শিখা জ্বলে ভেদি মেঘ জটা
ছত্রভঙ্গ ভয়াতুর বাসনার ব্যূহ।
ঝটিকায় মৃতপ্রায় রবি রশ্মিচ্ছটা
সংসারের কাঁদে কত মহামহীরুহ!
মানব মনের ঢেউ বাণী বরষণে
উদ্বেলিয়া বন্যাসম দিকে দিকে ধায়:
জীবন নদীর কূল ভাঙে গরজনে
শিহরিয়া চক্রবাল তড়িৎ প্রভায়।

সে বন্যার স্পর্শে কত চিত্তভূমিতলে
উর্ব্বর শ্যামলক্ষেত্রে সমারোহে জাগে:
নিখিলজনের পথে সোনার ফসলে
আগামী দিনেরে ডাকে প্রীতি অনুরাগে।
ভাষার অতীত হয়ে আজো কত ভাব
সুন্দরের অনুরাগ করে সুরে সুরে,
তুলিতে ভাস্কর্য্যে শিল্পে পড়ে তার ছাপ
কল্পনার ইন্দ্রধনু ওঠে দূরে দূরে।
বঞ্চিত রহিল যাহা রসস্রোত হোতে,
অনুর্ব্বর চিত্তে যার তৃষিত বেদনা,
মাধুরী আতিথ্য যার নাহিক জগতে
কেহ কি ভাবিবে তার ফিরাতে চেতনা!
মরু হয়ে আছে যেথা মানুষের মন,
যেথায় নামেনা ধারা, নাহি ভাবাবেগ,
ভুলেও হোলো না যেথা ক্ষণ বরিষণ
সেথা কি যাবে না বাণী-বাদলের মেঘ?

(চিত্রনাট্য)

(পূর্বানুবৃত্তি)

ওয়াইপ্।

লিলির ড্রয়িং রুম। লিলি সোফায় অঙ্গ এলাইয়া চকোলেট্ চিবাইতেছে এবং একটা সচিত্র বিলাতী পত্রিকার ছবি দেখিতেছে। ঘরে আর কেহ নাই।

মন্মথ প্রবেশ করিল। তাহার দুই হাত পিছনে লুক্কায়িত, মুখে হাসি।

মন্মথ : মিস্ লিলি, আপনার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি।

লিলি হাস্যোজ্জ্বল মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

লিলি : মন্মথবাবু! কি জিনিষ এনেছেন! দেখি দেখি—

একটি গোলাপী ফুলের তোড়া মন্মথ লিলির সম্মুখে ধরিল। লিলির মুখ দেখিয়া বোঝা গেল সে নিরাশ হইয়াছে, কিন্তু সে চকিতে মনোভাব গোপন করিয়া হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল।

লিলি : বাঃ! কী সুন্দর ফুল! আমি গোলাপ ফুল বড্ড ভালবাসি।

মন্মথ : আমি কিন্তু অন্য ফুল ভালবাসি।

লিলি : সত্যি? কী ফুল ভালবাসেন?

মন্মথ : কমল ফুল—যার বিলিতি নাম লিলি।

লিলি : (সলজ্জ মুখভঙ্গী করিয়া) কী দুষ্টু আপনি!

মন্মথ গদ্‌গদ মুখে লিলির একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

মন্মথ : লিলি! সত্যি বলছি, তোমাকে আমি লভ্ করি। এত দিন মুখ ফুটে বলতে পারিনি; যখনি বলতে চেয়েছি, হয় দাশুবাবু নয় ফটিকবাবু—

এই সময় যেন ডাক্ বুঝিয়া দাশু প্রবেশ করিল। লিলি তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইল।

লিলি : ওঃ! দাশুবাবু—

মন্মথ ক্রোধে মুখ বিশঙ্কর করিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দাশু লিলির কাছে আসিয়া ছদ্ম বিরক্তির সহিত বলিল—

দাশু : ভেবেছিলাম আপনি একলা থাকবেন, কিন্তু—। (তোড়া দেখিয়া) ফুল কোথা থেকে এল? মন্মথবাবু এনেছেন নাকি?

লিলি : হ্যাঁ, কি সুন্দর ফুল দেখুন দাশুবাবু!

দাশু : (অবজ্ঞাভরে) ফুল আমি অনেক দেখেছি লিলি দেবি। ফুল মন্দ জিনিষ নয়; কিন্তু তার দোষ কি জানেন? শুকিয়ে যায়, বাসি হয়ে যায়; দু'দিন পরে আর কেউ তার পানে ফিরে তাকায় না।—

মন্মথ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া গভীর ভ্রূকুটি করিয়া দাশুর পানে তাকাইয়া ছিল; দাশু কিন্তু তাহার ভ্রূকুটি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া বলিয়া চলিল—

দাশু : কিন্তু দুনিয়ায় এমন জিনিষ আছে যা শুকিয়ে যায় না, বাসি হয়না; যার সৌন্দর্য চিরদিন অম্লান থাকে—এই দেখুন।

দাশু পকেট হইতে একটি মখমলের ক্ষুদ্র কৌটা লইয়া লিলির চোখের সামনে খুলিয়া ধরিল; সোনার আংটিতে কমলকাট্ হীরা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। দাশু মন্মথর দিকে মুখ বাঁকাইয়া একটু হাসিল।

দাশু : ফুলের চেয়ে এর কদর বেশী, লিলি দেবী।

লিলি আগ্রহাতিশয্যে ফুলের তোড়াটা টেবিল লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল, তারপর আংটির কৌটা হাতে লইয়া উদ্দীপ্তচক্ষে দেখিতে লাগিল। তোড়াটা টেবিলের কানায় লাগিয়া মেঝেয় পড়িল।

লিলি : কি চমৎকার হীরের আংটি। মন্মথবাবু, দেখুন দেখুন—

মন্মথ অবজ্ঞার মুখে ফুলের তোড়া তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল এবং লিলির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

লিলি: দেখছেন, হীরেটা জলজল করছে! নতুন কিনলেন বুঝি, দাশুবাবু?

দাশু: না, আমার ঠাকুরমার গয়নার বাক্সে ছিল; কত দিন থেকে আমাদের বংশে আছে তার ঠিক নেই। স্যাকরাকে দেখিয়েছিলাম, সে বললে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিতে রাজি আছে। আমি দিলাম না। হাজার হোক বংশের একটা 'এয়ারলুম্'—

মন্মথ মনে মনে জ্বলিতেছিল, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; বিকৃতমুখে বলিয়া উঠিল—

মন্মথ: কী 'এয়ারলুম্' দেখাচ্ছেন আপনি! এ আবার একটা হীরে! আমার বাড়ীতে যে-জিনিষ আছে তা দেখলে ট্যারা হয়ে যাবেন।

দাশু ভ্রূভঙ্গী করিয়া কিছুক্ষণ মন্মথর পানে চাহিয়া রহিল।

দাশু: বটে? কি জিনিষ আছে আপনার বাড়ীতে?

মন্মথ: স্যমন্তক মণির নাম শোনেন নি কখনো? লিলি দেবি, আপনিও শোনেন নি?

লিলি: না। সে কী জিনিষ মন্মথবাবু?

মন্মথ: অ্যাতবড় বিলিতি বেগুনের মতন একটা পদ্মরাগ মণি—যাকে রুবি বলে। আমাদের বংশে সাত পুরুষ ধ'রে আছে।

লিলি: অ্যাঁ—সত্যি! টমাটোর মতন রুবি! কত দাম হবে তার, মন্মথবাবু?

মন্মথ: দাম তার সাত পয়জার। টাকা দিয়ে কিনবে এমন লোক ভারতবর্ষে নেই।

লিলি: উঃ! এত দামী রুবি! আমার যে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। মন্মথবাবু, একবারটি দেখাতে পারেন না?

মন্মথ: (থতমত হইয়া) সে—সে আমাদের গৃহ-দেবতা, ঠাকুর ঘরে থাকে। দাদু সর্বদা ঠাকুর ঘরে চাবি দিয়ে রাখেন।

দাশু: (ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া) বিলিতি বেগুনের মতন রুবি দেখা আমাদের কপালে নেই। কি আর করবেন, লিলি দেবি, আপাতত এই মটরের মতন হীরেটাই দেখুন। —পছন্দ হয়?

লিলি মুগ্ধভাবে হীরা নিরীক্ষণ করিল।

লিলি: খুব পছন্দ হয়। কিন্তু—

দাশু: তাহলে ওটা আপনিই নিন্। আপনাকে উপহার দিলাম।

লিলি: অ্যাঁ—না না, এত দামী জিনিষ—

দাশু জোর করিয়া লিলির আঙুলে আংটি পরাইয়া দিল।

দাশু: দামী জিনিষই আপনার হাতে মানায়। আমি আমার দামী জিনিষ ঠাকুর ঘরে বন্ধ করে রাখিনা—

লিলি: ধন্যবাদ দাশুবাবু। আপনার মতন উঁচু মেজাজ—

দাশু: থাক থাক, আমাকে লজ্জা দেবেন না। বরং তার বদলে চলুন নদীর ওপর বেড়িয়ে আসা যাক। আমার মোটর লঞ্চটা তৈরি ক'রে রেখেছি। দু'জনে গঙ্গার বুকে —খুব আমোদ হবে।

লিলি: শুধু আমরা দু'জন—আর কেউ নয়?

দাশু: কেন, তাতে দোষ কি? আমি ভদ্রলোক, আপনি ভদ্রমহিলা—এতে আপত্তির কী আছে?

লিলি: না না, আপত্তি নয়, কিন্তু—। মন্মথবাবু, আপনিও চলুন না।

এই সব কথা শুনিতে শুনিতে মন্মথ একেবারে নিভিয়া গিয়াছিল। লিলির প্রস্তাবে তাহার মুখে একটা একগুঁয়ে ভাব ফুটিয়া উঠিল।

মন্মথ: না। আমি চললাম—

সে দ্বারের দিকে চলিল। দাশু ও লিলির মধ্যে একটা চোখের ইসারা খেলিয়া গেল। লিলি দ্রুত গিয়া মন্মথকে দ্বারের কাছে ধরিয়া ফেলিল।

লিলি: মন্মথবাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে, শুনুন।

মন্মথকে হাত ধরিয়া আড়ালে লইয়া গিয়া লিলি চুপিচুপি বলিল—

লিলি: দেখুন, দাশুবাবু খুবই ভদ্রলোক, সচ্চরিত্র সজ্জন ব্যক্তি। তবু, ওঁর সঙ্গে যদি একলা যাই, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে। কিন্তু আপনি সঙ্গে থাকলে কারুর কিছু বলবার থাকবে না। আপনি চলুন, মন্মথবাবু।

মন্মথর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মন্মথ : তুমি যখন বলছ, লিলি, নিশ্চয় যাব।

লিলি তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে আনিল।

লিলি : দাশুবাবু, এঁকে রাজি করিয়েছি। আমরা তিনজনেই যাব।

দাশু কৃতজ্ঞতার অভিনয় করিয়া বলিল—

দাশু : তা—আপনার যখন ইচ্ছে—উনিও চলুন। তাহলে আর দেরী নয়, চট্‌পট্‌ বেরিয়ে পড়া যাক।

ডিজল্‌ভ্‌।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। যদুনাথের লাইব্রেরী ঘরে দিবাকর একাকী বই-ভরা আলমারীগুলির কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; দু'একটা বই খুলিয়া পাতা উল্টাইতেছে, আবার রাখিয়া দিতেছে। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, বইগুলি তাহার পড়িবার ইচ্ছা, কিন্তু সাহস নাই।

এই সময় বাহিরে গাড়ী-বারান্দার সম্মুখে মোটর হর্ণের শব্দ হইল। দিবাকর উৎকর্ণ হইয়া শুনিল—

কাট্‌।

গাড়ী-বারান্দায় যদুনাথের মিনার্ভা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; ইঞ্জিন সচল। যদুনাথ গাড়ীর দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া অধীর ভাবে সদর দরজার দিকে তাকাইতেছেন। তাঁহার গলায় চাদর, হাতে আবলুশের লাঠি। বাহিরে যাইবার সাজ।

যদুনাথ : ওরে নন্দা, আয় না। আর কত সাজ-গোজ করবি? দেরী হয়ে যাচ্ছে যে—

নন্দা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহারও সাজপোষাক বহির্গমনের উপযোগী, কিন্তু মুখে একটু উদ্বেগের ছায়া।

যদুনাথ : আয় আয়, কত দেরী করলি বল দিকি! সন্ধ্যের পর হয়তো দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। আয়।

নন্দা আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল—

নন্দা : দাদু, আজ তুমি একাই যাও, আমি আর যাবনা—

যদুনাথ : যাবিনে? কেন? কি হ'ল আবার—

নন্দা : হয়নি কিছু। তবে, বাড়ীতে কেউ থাকবেনা, দাদাও বেরিয়েছে—

যদুনাথ : তাতে কি হয়েছে? আমরা তো যাব আর আসব; বড় জোর এক ঘণ্টা! তাছাড়া ঠাকুর ঘরের চাবি আমার পকেটে।

নন্দা : তবু—

যদুনাথ : দিনের বেলা তোর এত ভয় কিসের? চাকর-বাকর রয়েছে, দিবাকর রয়েছে। না না, চল, তুইও না হয় দু'চারখানা বই কিনিস!—(উচ্চকণ্ঠে) ওহে দিবাকর!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দিবাকর ভিতর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল।

দিবাকর : আজ্ঞে!

যদুনাথ : হ্যাঁ—দ্যাখো, আমি আর নন্দা একটু বেরুচ্ছি, গোটা কয়েক বই কিনতে হবে। তা—তুমি চারদিকে নজর রেখো।

দিবাকর : যে আজ্ঞে—

যদুনাথ : আয় নন্দা।

নন্দা পলকের জন্য দিবাকরের পানে অনিচ্ছা-সংশয়-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তারপর গাড়ীতে উঠিল। যদুনাথও উঠিলেন।

গাড়ী চলিয়া গেল; দিবাকর দাঁড়াইয়া দূরায়মান গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। গাড়ী ফটকের বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেলে, তাহার মুখের ভাব অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইতে লাগিল; একটা কঠিন সতর্ক তীক্ষ্ণতা তাহার চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; নাসাপুট চাপা উত্তেজনায় স্ফুরিত হইতে লাগিল।

পকেট হইতে একটা চক্‌চকে নূতন চাবি বাহির করিয়া সে মুঠি খুলিয়া দেখিল; তাহার মুখে একটা ত্বরিত সঙ্কল্পের অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইল। সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

হল্‌ ঘরে তখন সন্ধ্যার ম্লানিমা নামিয়াছে। দিবাকর একবার চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল, কেহ নাই। তখন সে অলস পদে ঠাকুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

ঠাকুর ঘরের দ্বারে নিরেট মজবুত তালা ঝুলিতেছে। আর একবার চারিদিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দিবাকর নিঃশব্দে তালাতে চাবি পরাইল।

হঠাৎ এই সময় অদূরে টেবিলের উপর টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তাহার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ দিবাকরের কানে বজ্রনাদের ন্যায় মনে হইল। সে ত্বরিতে তালা হইতে চাবি বাহির করিয়া ছুটিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিল, বিকৃতস্বরে বলিল—

দিবাকর : হ্যালো—

কিছুক্ষণ শুনিয়া তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল।

দিবাকর : (দাঁত চাপিয়া) না।

টেলিফোন রাখিয়া ফিরিতেই সে দেখিল সেবক কখন পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সেবক : কে টেলিফোন করছিল, ছ্যাকড়াগাড়ী বাবু ?

দিবাকর : রং নম্বর।

সেবক : ও। আচ্ছা ছ্যাকৃড়াগাড়ীবাবু, আপনি টেলিফোন করতে জানেন ?

দিবাকর : (সন্দিগ্ধভাবে) কেন বল দেখি ?

সেবক : তাহলে একবার থানায় টেলিফোন ক'রে দেখুন না, চোরের কোনও স্থলুক সন্ধান পাওয়া গেল কিনা।

দিবাকর কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে সেবককে নিরীক্ষণ করিল।

দিবাকর : চোরের জন্যে তুমি ভারি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছ দেখছি। কিন্তু মনে কর, চোর যদি হঠাৎ এম্‌নি ক'রে তোমার সামনে হাজির হয়, তখন কি করবে ?

দিবাকর এমন মুখভঙ্গী করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল যে সেবক দুই পা পিছাইয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—

সেবক : কি করব ? আমাকে চেনেন না, ছ্যাকৃড়াগাড়ী বাবু! চোরকে লেঙ্গি মেরে মাটিতে ফেলে তার বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে বস্‌বো, আর চেঁচাব—পুলিস! পুলিস!

দিবাকর সেবকের পিঠ চাপড়াইয়া গম্ভীরমুখে বলিল—

দিবাকর : বেশ বেশ। বীর বটে তুমি।

সন্তুষ্ট সেবক কাঁধ হইতে ঝাড়ন লইয়া টেবিল ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। দিবাকর ধীরপদে উপরে উঠিয়া গেল।

ডিজ্‌লভ্‌।

ঘণ্টাখানেক গত হইয়াছে। হল্‌ ঘরে আলো জ্বলিয়াছে, কিন্তু ঘরে কেহ নাই। ঘড়িতে পৌনে সাতটা।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল ; তারপর সদর দরজা ঠেলিয়া নন্দা প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে কয়েকটা নূতন বই হাতে লইয়া যদুনাথ।

যদুনাথ লাইব্রেরী ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন ; নন্দা কিন্তু হল্‌ ঘরে দাঁড়াইয়া চারিদিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। ঘরে কেহ নাই কেন ? সব গেল কোথায় ?

একটি ভৃত্য কয়েকটা খালা গেলাস হাতে লইয়া ভিতরের দিক হইতে ভোজনকক্ষে যাইতেছে দেখিয়া নন্দা তাহাকে ডাকিল—

নন্দা : বেচু, সেবক কোথায় ?

বেচু : তা তো জানিনে দিদিমণি। আমি রান্না ঘরে ছিলাম।

নন্দা : আর—দিবাকর বাবু ?

বেচু : ভেনারে তো বিকেল থেকে দেখিনি।

বেচু চলিয়া গেল। নন্দার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পাইল। সে গিয়া ড্রয়িংরুমের পর্দা সরাইয়া উঁকি মারিল, কিন্তু সেখানে কাহাকেও না দেখিয়া লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিল। লাইব্রেরী ঘরে যদুনাথ নূতন বইগুলি সযত্নে আলমারীতে সাজাইতেছিলেন, বলিলেন—

যদুনাথ : কী রে নন্দা ? কিছু খুঁজছিস ?

নন্দা : না দাদু, অমনি—

আবার বাহিরে আসিয়া নন্দা ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

কাট্‌।

দ্বিতলে আপন ঘরে দিবাকর টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছে। তাহার সামনে চকচকে পর-চাবিটি রাখা রহিয়াছে দিবাকর একদৃষ্টে চাবির পানে তাকাইয়া আছে। তাহার ললাটে সংশয়ের ভ্রূকুটি।

দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল। দিবাকর বিদ্যুদ্বেগে চাবি পকেটে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

দ্বারের বাহিরে নন্দা। দিবাকরকে দেখিয়া তাহার চক্ষুদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তারপর সে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

দিবাকর : আপনারা ফিরে এসেছেন! আমি জান্‌তে পারিনি!

নন্দা : কি করছিলেন একলাটি ঘরে ব'সে ?

দিবাকর : কিছু না। হিসেবের খাতাটায় চোখ বুলোচ্ছিলাম।—কিছু দরকার আছে কি ?

নন্দা : না, দরকার আর কি ? নীচে আপনাকে দেখতে পেলাম না, তাই ভাবলাম—(লজ্জিতভাবে ঢোক গিলিয়া) বাজারে একটা কলম দেখলাম, পছন্দ হল তাই কিনে আনলাম—

নন্দা একটি ফাউন্টেনপেন্‌ দিবাকরকে দেখাইল। দিবাকর কলম হাতে লইয়া দেখিতে দেখিতে হাসিমুখে বলিল—

দিবাকর : সুন্দর কলম। কিন্তু আপনার তো আরও অনেক কলম আছে—।

নন্দা : (অপ্রস্তুত ভাবে) এটা আপনার জন্যে এনেছি।

দিবাকর : (বিস্ফারিত চক্ষে) আমার জন্যে!

নন্দা : হ্যাঁ। (জড়িত স্বরে) আপনাকে হিসেব লিখতে হয়—তাই—। কলমটা পছন্দ হয়েছে তো ?

দিবাকর ভদ্গতমুখে নন্দার পানে চাহিয়া নম্রকণ্ঠে বলিল—

দিবাকর: নন্দা দেবি, আপনাকে কী ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব? আমার ঋণ ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে—

নন্দা: না না, এই সামান্য জিনিষের জন্যে—

দিবাকর: শুধু এই সামান্য জিনিষের জন্যে নয়। আপনার বিশ্বাস, আপনার সমবেদনা—আমাকে আমার অতীত ভুলিয়ে দেবার এই চেষ্টা—এ ঋণ আমি শোধ করব কি করে? পারব না; কিন্তু আমি যেন এর যোগ্য হ'তে পারি।

কলমটি দু'হাতের মধ্যে লইয়া সে মাথা নত করিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

গভীর রাত্রি। দূরে গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিতেছে।

দিবাকর নিজের ঘরে টেবিলের সম্মুখে বসিয়া আছে; তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, সে যেন জীবনের চৌমাথায় পৌঁছিয়া কোন্ পথে যাইবে ভাবিয়া পাইতেছে না।

নবলব্ধ কলমটা তাহার বুক-পকেটে আটকানো ছিল, সে তাহা বাহির করিয়া নিবিষ্ট চক্ষে নিরীক্ষণ করিল। কলমের শিরস্ত্রাণ খুলিয়া হিসাবের খাতার একটা পাতায় ধীরে ধীরে লিখিল—সুর্যমণি।

কিছুক্ষণ লেখার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে লেখাটা কাটিয়া দিল, তাহার নীচে লিখিল—নন্দা। তারপর আবার লিখিল—নন্দা নন্দা—

ফেড্‌ আউট্‌।

পশ্চিম-বাংলার গ্রাম

শ্রীরমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গ্রামকে সজীব করে তুলতে হলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হবে গ্রাম-বাসীদের সমবেত প্রচেষ্টা; ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হবে না। কিন্তু যেখানে সমবেত প্রচেষ্টা দরকার, সেখানে কেউ বড় এগিয়ে আস্তে চায় না। সবাই চায় অপরে আগে এগিয়ে আসুক। ফলে কোন কিছুই হয় না। ব্যাপারটা হয়ে ওঠে দুধ দিয়ে রাজার পুকুর ভরার মতন। রাজা হুকুম দিলেন প্রত্যেক প্রজা রাত্রে এসে এক ঘটি দুধ পুকুরে ঢেলে দেবে। সবাই মনে করলো—আর সবাই তো দুধ দেবে আমি এক ঘটি জল দি'না? রাজা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলেন পুকুরটি জলে ভর্তি হয়ে আছে।

গ্রামের রাস্তাটা ভেঙ্গে পড়েছে; মেরামত করবে কে? একটা গাছ পড়ে গিয়ে রাস্তাটা আটকে আছে, গাছটা সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করবে কে? পুকুরে আবর্জনা জমে জল নষ্ট করছে, সে জল খেয়ে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে; পরিষ্কার করবে কে? গাছের পাতা ও ময়লা পড়ে কুয়োর জল দূষিত হচ্ছে অথচ একটি ঢাকনি জোগাড় করার কেউ নেই। টিউবওয়েলটা ভেঙ্গে পড়ে আছে,মেরামত করবে কে? পাশের গ্রামে বসন্ত লেগেচে, গ্রামের প্রত্যেককে টিকা নিতে বাধ্য করবে কে?

ঘরবাড়িগুলো এমন ভাবে তৈরী যে ভেতরে এতটুকুও আলো বাতাস যায় না। স্বাস্থ্যের পক্ষে যে আলো বাতাস নিতান্ত দরকার ঘর নির্মাণের সময় সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দেবে কে? একটু নির্দোষ আমোদ প্রমোদের (যাত্রা, কবি, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি) ব্যবস্থা করা ব্যক্তিগত ভাবে কারুরই সামর্থ্য নেই, অথচ সমবেত চেষ্টায় কি করে হতে পারে সে দিকে ত কারো লক্ষ্য নেই। গ্রামে একটি ছোট পাঠাগার, এক আধখানা খবরের কাগজ ও একটি রেডিও থাক্‌লে গ্রামবাসীরা কত কিছু জানতে পারেন ও আনন্দ উপভোগ করতে পারেন কিন্তু সে সব ব্যবস্থা করবে কে?

গ্রামবাসীদের ইচ্ছা থাক্‌লেও কেন এ সব সম্ভবপর হয় না জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই বল্‌বেন "যদি আর সবাই নিশ্চেষ্ট থাকে শুধু আমি একলা সচেষ্ট হয়ে কি করবো?" কথাটা অনেকটা সত্য। সমবেত চেষ্টার কাজ কখনও ব্যক্তিগত চেষ্টায় সফল হয় না। অবশ্য বাইরে থেকে সরকারী কর্মচারী বা কোন পরিদর্শক এসে গ্রামের ভাঙ্গা রাস্তা বা অপরিষ্কার পুকুর দেখে গ্রামবাসীদের রাস্তা মেরামত বা পুকুর পরিষ্কারের জন্য চাপ দিতে পারেন এবং হয়তো সময়ের জন্য কিছুটা কাজও হতে পারে; কিন্তু সে কর্মস্পৃহা কখনও স্থায়ী হতে পারে না। বাইরে থেকে যারা উপদেশ দিতে এসেছেন তাঁরা চলে গেলে গ্রামবাসীদেরও উৎসাহ চলে যায়। তা ছাড়া বাইরের লোক কিছুক্ষণের জন্য গ্রামে এসে ঠিক বুঝতেও পারেন না গ্রামে সবচেয়ে বেশী কি দরকার এবং কি উপায়ে সে দরকার মেটান সম্ভব হতে পারে।

গ্রামকে উন্নত করতে হলে গ্রামবাসীদেরই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গ্রাম-উন্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। অবশ্য যে কোন প্রতিষ্ঠান হলেই চল্‌বে না—এমন একটি প্রতিষ্ঠান দরকার যার পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রশক্তি। গ্রামকে উন্নত করার উদ্দেশ্যে অনেক পল্লীমঙ্গল সমিতিই তো গড়ে উঠেছে কিন্তু সফল হয়নি, কারণ তার পেছনে ছিলনা এ রাষ্ট্রশক্তি। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হবে ভাল ভাবে থাক্‌বার জন্য প্রত্যেক গ্রামবাসীর মনে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা এবং যাতে গ্রামবাসীর সমবেত চেষ্টায় এ উদ্দেশ্য সফল হয় তার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ গ্রামকে উন্নত করতে হলে প্রয়োজন হবে লুপ্ত গ্রামপঞ্চায়েতি শাসনকে বর্তমানের উপযোগী করে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

নিম্নতম সরকারী প্রতিষ্ঠান গ্রামকেই কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় এরূপ নিম্নতম প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন বোর্ড—কয়েকটি গ্রাম নিয়ে সংগঠিত। প্রত্যেক ইউনিয়নে গোটাকতক গ্রাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কেন যে সেই কয়েকটি গ্রামই জুড়ে দেওয়া হল তার বিশেষ কোন কারণ নেই। এ জন্য ইউনিয়ন ও ইউনিয়নবাসীদের মধ্যে কোন একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারেনি। কাউকে তার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলে সে বলে কোন গ্রামে, দরকার হলে কোন মহকুমায় বা জেলায়—কিন্তু কোন ইউনিয়নে তার বাড়ি একথা স্বেচ্ছায় কাউকে বলতে শোনা যায় নি। গ্রামবাসী ও গ্রামের মধ্যে যে যোগাযোগ ইউনিয়ন ও ইউনিয়নবাসীদের মধ্যে সে যোগাযোগ নেই। এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান করতে হলে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে গ্রামকেই কেন্দ্র করে উন্নতিমূলক সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। প্রত্যেক গ্রামবাসীরই তার নিজের গ্রামের প্রতি একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে—গ্রামের সব কিছুতেই সে একটা গর্ব অনুভব করে—তার গ্রামের স্কুল থেকে একটি ছেলে এবার বৃত্তি পেয়েছে—তার গ্রামের ফুটবল টিমকে আশে পাশের কোন টিমই হারাতে পারেনি—তার গ্রামে প্রতি বৎসর ধুমধাম করে বারোয়ারী দুর্গাপূজা হয়ে থাকে—এ আকর্ষণ, এ গর্ব কোন ইউনিয়নবাসীরই তার ইউনিয়ন সম্বন্ধে পোষণ করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে গ্রামকে কেন্দ্র করে যদি কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, সে প্রতিষ্ঠানকে সফল করার জন্য গ্রামবাসী যতটা সচেষ্ট হবে, ইউনিয়ন বোর্ডকে সফল করতে ততটা সচেষ্ট ইউনিয়নবাসী কখনও হবে না।

একথা আগেই বলা হয়েছে গ্রামে গ্রামে অতীতের সেই পঞ্চায়েতি প্রথাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে বর্তমানের উপযোগী করে। আগেকার দিনে গ্রামের শ্রদ্ধেয় পাঁচ জন নিয়েই গঠিত হত পঞ্চায়েত—তাঁদের আদেশ গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধার সহিত মেনে নিতেন। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে অবশ্য সেটা সম্ভবপর হবে না—গণতন্ত্রপ্রথা অনুসারেই তাঁদের নির্বাচিত হতে হবে এবং সংখ্যাও হয়তো বাড়াতে হবে। তবুও গ্রামবাসীদের দৃষ্টি রাখতে হবে গ্রামে যাঁরা শ্রদ্ধাভাজন, কর্মনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থপর—যাঁদের নির্দেশ মেনে নিতে গ্রামবাসীদের দ্বিধা বা আপত্তি থাকবে না তাঁরাই যেন শুধু নির্বাচিত হন—তা না হলে গ্রামের উন্নতি কখনও সম্ভবপর হবে না।

গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য শাসন ক্ষমতা জন-সাধারণের হাতে তুলে দেওয়া; সবারই হাত থাকবে শাসন কার্যে, কিন্তু সমগ্র দেশের লোক এক জায়গায় মিলিত হয়ে আলোচনা করা সম্ভবপর নয় বলেই প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা। নির্বাচিত ব্যক্তি জন সাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন। কিন্তু প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যবস্থায় একটি বিশেষ গলদ দেখা দিয়েছে। কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় এই "প্রতিনিধি" সম্বন্ধ থাকে শুধু নির্বাচনের সময় নির্বাচনের পর নির্বাচিত ব্যক্তি তার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে ফেলেন। যারা তাকে নির্বাচিত করেছেন তাদের মতামতের দিকে বিশেষ কোন লক্ষ্য রাখেন না।

সমগ্র দেশ বা জেলায় বা একটি থানার লোক এক জায়গায় মিলিত হয়ে আলোচনা করা অবশ্য সম্ভবপর নয় কিন্তু একটি গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক সবাই এক জায়গায় আলোচনার জন্য সহজেই মিলিত হতে পারেন। গ্রামবাসীরা যদি মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে—গ্রাম পঞ্চায়েৎকে ভবিষ্যৎ কার্যাবলী সম্বন্ধে নির্দেশ দেন এবং অতীতের কার্যাবলী সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ নেন—তা তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েতগণ যে গ্রামবাসীর প্রতিনিধি—গ্রামবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের কোন কিছুই করার যে ক্ষমতা নেই তা তাঁরা কখনও ভুলতে পারবেন না। কারণ গ্রামবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করলে পরবর্তী গ্রামসভার বৈঠকে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। এই গ্রামসভাও অবশ্য আইন অনুসারে গঠিত হতে হবে গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক সবাইকে নিয়ে। পঞ্চায়েত দায়ী থাকবেন উন্নতি পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য; সে পরিকল্পনা কি হবে, কি ভাবে কার্যকরী করা হবে—কি ভাবে অর্থসংগ্রহ হবে সে বিষয়ে নির্দেশ দেবেন গ্রামসভা। সত্যিকারের ক্ষমতা থাকবে গ্রামবাসীদেরই হাতে, পঞ্চায়েতের হাতে নয়। তা হলে কোন গ্রামবাসীরই গ্রাম সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট বা উদাসীন থাকা চলবেনা না এ কথা বলা চলবে না গ্রামের কোন কিছু হচ্ছে না অপরের দোষে। কারণ তিনিও গ্রামসভার সভ্য। অপরের কোন ত্রুটি থাকলে গ্রামসভায় তা আর সবার নজরে আনবার এবং প্রতিবিধান চাইবার দাবী তারও রয়েছে। এর ফলে গ্রাম সম্পর্কে গ্রামবাসীর সবার উপরই একটা দায়িত্ব এসে পড়বে এবং কোন কিছু প্রশ্ন উঠলে অপরের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে নিজেকে নিতান্ত অসহায় বা নির্দোষ প্রতিপন্ন করার বিশেষ সুযোগ থাকবে না।

মাঝে মাঝে গ্রামসভার বৈঠক বসলে আর একটি বিশেষ সুবিধা হবে। বাংলার গ্রামের বৈশিষ্ট্য দলাদলি; এমনি কোন গ্রাম নেই যেখানে অন্তত দুতিনটি দল নেই। গ্রামের সবাই গ্রাম সভার আলোচনায় যোগ দিলে দলাদলির ভাবটা ক্রমশঃ কমে আসবে। গ্রাম সভার সবাই যে একমত হবেন না নয়; মতভেদ নিশ্চয়ই থাকবে কিন্তু যারা একমত হতে পারবেন না তারা গ্রামসভা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি গ্রামসভা গঠন করতে পারবেন না—তাদের এর ভেতর থাকতেই হবে—যতই মতভেদ হোক না কেন। এই ভাবে নিজের মতামত সম্বন্ধে তারা অপরের কাছ থেকে যতটা শ্রদ্ধা আশা করেন, অপরের মতামতের প্রতিও তারা ততটা শ্রদ্ধা দেখাতে শিখবেন। আমরা নিতান্তই অসহিষ্ণু, আমাদের কেউ প্রতিবাদ করলে আমরা যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। আমিই সব চেয়ে বেশী বুঝি, আমি যেটা মনে করি সেটাই ঠিক, সবাই এ ভাব পোষণ করলে সমবেত চেষ্টায় কোন কিছুই হবার উপায় নেই। এ মনোবৃত্তি পরিবর্তন করার নিতান্তই দরকার হয়ে পড়েছে এবং গ্রাম থেকেই সে প্রচেষ্টা শুরু করা সমীচীন হবে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ধারা হঠাৎ যেন একটা মূর্তি পরিগ্রহ করে ঝিলের জল থেকে উঠে এল।···ছাতাটা স্পষ্ট হোল, তারপরেই টুপি, রেন-কোট; কাঁকরের পথ বেয়ে ছপ ছপ করতে করতে বীরেন্দ্র সিং এগিয়ে এলেন, ছাতা মুড়ে বারান্দায় উঠলেন।

"একি কাণ্ড!"—বলে অতিরিক্ত বিস্ময়ে সুকুমার উঠে দাঁড়াল। "এ বৃষ্টিতে মানুষে বেরোয়!"

বন্ধ দোরজানলার দিকে বীরেন্দ্র সিং একবার ঘুরে চাইলেন, হেসে বললেন—"বাড়ি থেকে নিজেকে বের ক'রে এনে একরকমভাবে বারান্দায় বসে থাকাটা আরও অদ্ভুত নয় কি?"

নিজেই গিয়ে জোরে কয়েকবার কড়া নাড়লেন। এসে খুলে দিলে সরমাই। দৃষ্টিতে তার বিস্ময়ের আর সীমা নেই।

"একি কাণ্ড বুবুয়া আপনার!—এই পাহাড় বৃষ্টিতে··· আর তোমার একি!—একেবারে শুকন, অথচ—"

বীরেন্দ্র সিং ঠাট্টা করে কিছু বলবার আগেই সুকুমার তাড়াতাড়ি আমতা আমতা করে বলে দিলে—"বেরুই নি তো; বেরুব কিনা ভাবছিলাম।"

"শুনুন কথাটা একবার বুবুয়া! বেরুবে কিনা মানুষে তা ঘরে ব'সে ভাবতে পারে না!···দাঁড়ান্, জল লেগে যাবে, আমি আলগাভাবে খুলে দিচ্ছি রেনকোটটা···"

ছাতা, কোট, টুপি বারান্দার র‍্যাকে টাঙিয়ে—চটি, তোয়ালে এনে দিলে, রুক্মাকে শীঘ্র চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে নিজেই আবার দেখতে যাচ্ছিল, বীরেন্দ্র সিং বললেন—"তুমি থাকো বিটিয়া, ও করছে; একটা দরকারি কথা আছে।"

কুশন চেয়ারে বসে হাত পা মুছতে মুছতেই আরম্ভ করলেন—"দেখলে তো কি ধরণের জায়গা এটা?—বর্ষা নেই তো নেই, মাঠ ফেটে চৌচির হচ্ছে, নামল তো এই দুদিনের জলেই সব ভাসিয়ে দেবে নদীগুলো উপচে পড়ে!···আমি ঠিক করে ফেলেছি—ঝিলের ওদিকের পাহাড় দুটো এইবার বেঁধে ফেলব মাঝখানে একটা দেয়াল তুলে; এত অপচয় আর সওয়া যায় না।"

সুকুমারও রেশ ধরতে পারেনি, কিন্তু সরমা আর নিজের মূঢ়তাকে চাপতে পারলে না, চোখ দুটো বড় বড় করে প্রশ্ন করে উঠল—"এই বৃষ্টির মধ্যে!"

বীরেন্দ্র সিং স্নেহভরে তার মাথায় হাতটা দিলেন, বললেন—"তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কবে যে হবে বিটিয়া!··· আমার সেই হাইড্রো-ইলেট্রিক প্রজেক্টের কথা···আপনাকে বোধ হয় বলে থাকব এর আগে ডাক্তারবাবু—সামনের ঐ পাহাড় দুটোর মাঝখানে একটা ড্যাম তুলে দিয়ে পাশের আরও দু-একটা জায়গা বন্ধ করে দিলে এই ঝিলের তিনগুণ একটা ঝিল হবে, তার জলটা কনট্রোল করতে পারলে সারা নূর-বেগম চাকলায় সেচের অভাব কখনও হবে না, তেমনি থাকবে না বন্যারও ভয়। এটা গেল ইরিগেশনের দিক। হাইড্রো-ইলেট্রিক পাওয়ার যে পাওয়া যাবে তাতে সহরটাতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা তো হবেই (সহর বাড়বেও আরো)—আমার আরও বড় প্রজেক্ট আছে—একটা কাপড়ের কল—আপাতত ছোটখাট— তারপর···বিটিয়া তুমি হাঁ করে রয়েছ—কেন বেশ মনে ধরছে না?"

"তা নয় বুবুয়া, সবই তো ভালো—আমি শুধু ভাবছি আপনি এইটুকু বলতে এই বৃষ্টি মাথায় করে এসেছেন!"

আবার সস্নেহে মাথায় হাত দিলেন বীরেন্দ্র সিং, বললেন—"তাই কেউ আসে রে পাগলী? আমি এসেছিলাম, মাস্টার মশাইয়ের কাছে, বৃষ্টির আগেই। বৃষ্টি দেখেই আলোচনাটা উঠল ওখানে, ভাবলাম ডাক্তারবাবুকে একবার বলতে হয়। বৃষ্টি ধরে না দেখে চলেই এলাম, এইতো দু'রশি পথ। মোটর?···ইয়ে···নেমে পড়বার

পর মনে পড়ল মোটরটাও রয়েছে—তখন কিন্তু অনেকটা এগিয়ে পড়েছি।"

বারো

বর্ষার পরেই বাঁধের কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছিল, শীতের শেষাশেষি এসে কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেল। পরিকল্পনাটা বরাবর বীরেন্দ্র সিংহের মাথার ভেতর ছিল, ওঁর একটা 'স্বপ্নের' মধ্যে, কিন্তু আশ্রম আর হাসপাতাল সামলে উঠতে পারছিলেন না বলে ওদিকে মন দিতে পারেননি, নিতান্ত আল্গাভাবে এক আধবার কথাটা তুলে থাকবেন মাষ্টার মশাইয়ের কাছে। এবার এদিককার চিন্তা থেকে অনেকটা মুক্ত; সামনে ছিল বর্ষা, সেটাও গেল কেটে, বীরেন্দ্রসিং বাঁধের কাজ নিয়েই পড়লেন একেবারে। কাজও এমন নয় যে একবার হাত দিয়ে গড়িমসি করা চলে, আবার বর্ষা নামবার আগেই সব শেষ করে ফেলতে হবে।

এতদিন পর্যন্ত কতকটা পুরাতন যা ছিল—রাজবাড়ি, রাজার কেন্দ্র করে ভালোয়-মন্দয় খানিকটা বসতি, তারপর নূতনে-পুরাতনে আশ্রম-বিদ্যায়তনটুকু, তারপরে হাসপাতাল—ঝিলটিকে অর্ধচন্দ্রাকারে পরিবেষ্টন করে এই যে একটু সহরের মতো, এটা নিতান্ত অলসভাবে ধীরে সুস্থে নিজেকে প্রসারিত করছিল, হঠাৎ এল এই আধুনিক। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাসের মধ্যে সহরটুকু ফেঁপে উঠল। বাঁধ প্রায় শেষ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে উঠছে তার আফিস, তার পাশেই পাওয়ার হাউস; বাঁধ আর ঝিলের মাঝখানে যে জমিটুকু তারই একপাশে। তার পাশেই সহরের উল্ট দিকে ঝিলের ধারে উঠছে কাপড়ের কল; খুব বড় নয়, আপাতত অল্পসংখ্যক তাঁত নিয়ে। কলের পাশে শ্রমিকদের বস্তি। সব মিলিয়ে ঝিলের চারিদিকের বৃত্তটি প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে, ব্যবধান মাত্র বুলানী নদীর ধারটুকু, যেটা ঝিল থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের নিচে দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে।

কলের যন্ত্রপাতি অনেক এসে পড়েছে, আরও আসছে! অনেক লোক খাটছে, অনেক লোক খাটাচ্ছে তাদের—ইঞ্জিনিয়ার থেকে আরম্ভ করে কারকুন মেট পর্যন্ত। জার গেছে বেড়ে একের টানে অন্যের আমদানি, এই করে বাজারের পেছনের চাষ জমিও বাড়িতে উঠছে ভরে। লখ্‌মিনিয়ার চেহারা যাচ্ছে দিন দিন বদলে।

এরই একপাশে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের ইতিহাস দিনের পর দিন রচিত হয়ে চলেছে। এদের কেউ কারুর নিজের নয়—সুকুমার, সরমা, আর স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে রুক্মা, এরা তিনজনেই পাহাড়ে তিনটি ধারার মতো তিন দিক থেকে এসে এক জায়গায় হয়েছে; তারপর এখন এক। এই সংসারের বাইরের রূপটা আনন্দের রূপ; পরস্পরের স্বার্থকে আপন করে নিয়ে, পরস্পরের জীবনকে পূর্ণ করে এদের বেশ কাটছে। এইভাবেই কেটে যেতে পারত শেষ পর্যন্ত—সুকুমারের মনে কি বেদনা আছে, সরমার মনে কিছু আছে কিনা, পরিবর্ধমান কর্মের আনন্দের মধ্যে এ প্রশ্নটা ওদের জীবনেই একদিন বোধ হয় অবান্তর হয়ে পড়ত। কিন্তু হঠাৎ এই বাইরের রূপটিতে এক দিক দিয়ে বাধা এসে উপস্থিত হোল—

বাঁধের দিকে আর ভালো জায়গা নেই, নূতন যে কৃত্রিম হ্রদটা হোল তাইতেই সব টেনে নিয়েছে, সেইজন্য বাজার আর আশ্রমের মাঝামাঝি যে শালবনের টুকরাটুকু দাঁড়িয়েছিল সেটাকে একটু কাট-ছাট করে তার মধ্যে বিদ্যুৎ আর কাপড়ের কলের অফিসারদের গুটিকয়েক বাসা করতে হোল। সবার ওপরের অফিসার—জেনারেল ইনজিনিয়ার, একজন পাঞ্জাবী ছিলেন। বিলাত-ফেরৎ আর মোটামুটি বেশ কাজের লোক। কিন্তু তার কায়দাও ছিল অতিরিক্ত বিশেষ ধরণের; বীরেন্দ্রসিংহের এই যে পদ্ধতি সবাইকে নিয়ে সব ব্যাপারের আলোচনা, আর সব আলোচনাই ঘরোয়া—এটা সে বরদাস্ত করতে পারছিল না। তার মনের ভাবটা যখন একটু স্পষ্ট হোল, সুকুমার, মাস্টারমশাই দুজনেই তার যুক্তির সারবত্তা বীরেন্দ্রসিংকে বোঝাবার চেষ্টা করে সরে দাঁড়াতে চাইলেন। বীরেন্দ্রসিং বললেন—"আপনাদের দুজনকে বাদ দিয়ে লখ্‌মিনিয়ার কোন কাজই হয় না; না হয় নিতান্ত যা টেক্‌নিক্যাল তা আপনারা নাই বুঝলেন—সে তো আমিও বুঝি না—কিন্তু সাধারণভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কি হওয়া উচিত—এসব তো বোঝেন……আর বিটিয়া তো থাকবেই—কতো দরকার চারিদিক দিয়ে ওর মনের খোরাক।"

মাস পাচেক কাজ করবার পরে একটা ভালো জায়গায় কাজ পেতেই লোকটা চলে গেল। তারপরে এল একজন বাঙ্গালী, মৃন্ময় চৌধুরী, বৈদ্যুতিক আর সাধারণ দুদিকেরই কলকজার সম্বন্ধে জার্মানির শিক্ষা আছে, উভয় কাজেই কিছু অভিজ্ঞতাও সংগ্রহ করেছে এদিকে এসে, বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ এই রকম।

একটা দিকে সুকুমারের দৃষ্টি খুব সতর্ক, এই যে এতগুলা লোক রাখা হোল—অফিসার থেকে কেরানি পর্য্যন্ত—এতে সাধ্যমতো বাঙ্গালী বাদ দিয়েই রেখেছে বা রাখিয়েছে—আর কলিকাতা থেকে তো একজনও আমদানি হতে দেয় নি। খুব সন্তর্পণে করে এটা, চেনা মুখের বা মুখচেনে এমন লোকের ভয়, তারই হোক বা সরমারই হোক। একদিক দিয়ে এটা যে অন্যায় তা বোঝে। সরমার কবে বাকি স্মৃতিটুকু ফিরে আসবে, ও সেই প্রতীক্ষায় আছে, ধীরে সুস্থে একটা ব্যবস্থা করবে, প্রয়োজন হয় তো এখান থেকে চলে গিয়েও, কিন্তু হঠাৎ এই অবস্থার মধ্যে, এতখানি সম্মান প্রতিষ্ঠার মধ্যে চেনাচেনি হয়ে একটা কদর্য সোরগোল ওঠে—এটাকে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে ভয় করে, যতদূর সাধ্য ওপথ বন্ধ করেই চলেছে এখন পর্য্যন্ত।

মৃন্ময় এসেছে এলাহাবাদ থেকে, সেইখানেই বাড়ি। বীরেন্দ্র সিঙের নিয়ম—নূতন যারা আসবে তাঁর অতিথি হয়েই উঠবে তাঁর ভবনে। দুপুর বেলা এলো, বিকালে একটু তাড়াতাড়িই আলাপ পরিচয় করতে গেল সুকুমার, নাই হোক কলকাতার, তবুও বাঙ্গালীই তো, একটা ধুকপুকুনি লেগেই থাকে।...নাঃ, কখনও দেখে নি; এটাও বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল, তারও মুখ নবাগতের এই প্রথম দেখা। একটু পরিচয়েই বেশ ভাল লাগলো; খুব স্মার্ট, একটু বোধ হয় বিদেশী স্টাইল আছে, কিন্তু সেটাও মনে হোল প্রথম পরিচয়ের জন্যেই, একটু দহরম-মহরম হোলে কেটে যাবে। কাজের লোক বলেই মনে হোল, খানিকটা আলাপ পরিচয় হবার পর নিজেই উদ্যোগী হয়ে একবার ঘুরে আসবার কথাটা বললে। পাওয়ার হাউস আর কাপড়ের কল যতটা বসেছে, বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে, বেশ টের পাওয়া যায় বোঝে। ওইখানেই এতটা সময় কেটে গেল যে আশ্রম আর হাসপাতালের দিকে সেদিন আর যাওয়া হোল না। সন্ধ্যার পরে ওরা ফিরলো। সুকুমার আরও খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে ওঠবার সময় বীরেন্দ্র সিংকে উদ্দেশ্য ক'রে বললে—"তাহলে মিস্টার চৌধুরীকে ছাড়বেন কবে?"

বীরেন্দ্র সিঙ হেসে বললেন—"কই আমি তো কাউকে ধরে রাখি নি।"

"সেই জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি, মুক্তি দিয়ে বেঁধে রাখেন বলেই তো বেশী ভয় কিনা, আমি তো ভুগেছি।"

হেসেই জবাবটা দিয়ে মৃন্ময়ের পানে চাইলে। সেও হেসে বললে—"নিমকের বাঁধন আরও শক্ত, যত কম হয়, কি বলেন?...এমনি অবশ্য যেখানেই থাকি, ওঁর নিমকই পেটে যাবে..."

ওঠবার মুখের কথা, ওখানেই শেষ হোল, মনে চমৎকার একটি ছাপ নিয়ে ফিরছিল, নেমে মোটরের কাছে এসেছে, মৃন্ময় ওপর থেকে নামতে নামতে বললে—"একটু অপেক্ষা করবেন ডক্টর সেন, একটা প্রফেসনাল এডভাইস্ নিতে হবে।"

নেমে এসে একটু চাপা গলাতে বললে—"আমি কালই বাসায় চলে আসছি একটা ছুতোনাতা ক'রে, হাজার ভাল হোক, কেমন যেন পোষায় না মশাই...বুঝতেই তো পাবেন...বাঙ্গালীর জন্যে মনটা কেমন হাঁপিয়ে পড়ে।...সকালের ব্যবস্থা আপনার ওখানেই ক'রে রাখবেন।"

মনে যে শিষ্টতাটুকু নিয়ে ফিরছিল সেটা অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গেল। সুকুমার কোন রকমে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে—"সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।"

বাঙ্গালী বলে আর সবাইকে বাদ দিয়ে যে আত্মীয়তা সে সম্বন্ধে কিছু বললে না, আর প্রফেসনাল এডভাইস্ সম্বন্ধে তো ভেবেই আকুল হতে লাগল—এতগুলো কথার মধ্যে কোনটে তার মধ্যে পড়ে।

তারপর দিন এল সকালে, কিন্তু বীরেন্দ্র সিঙের সঙ্গে, তিনি প্রাতঃভ্রমণ উপলক্ষ ক'রে ওকে এদিকটা দেখাতে নিয়ে এসেছেন। আশ্রম হয়ে যখন সুকুমারের বাসায় এসে পৌছলো, সে তখন বেরুবার জন্যে তোয়ের হচ্ছে। মৃন্ময় নমস্কার করে প্রথমেই বললে—"আজ মনে করেছিলাম চলে আসবো ডাক্তারবাবু, এদিকটা যা চমৎকার, লোভও

বেড়ে গেছে শীগ্‌গির চলে আসবার, কিন্তু রাজভোগ কপালে আছে, খণ্ডাবে কে?"

কোন রকম ব্যবস্থা করতে ইঙ্গিতে মানা ক'রে দিয়ে বীরেন্দ্র সিঙের পানে চেয়ে প্রশ্ন কোরলে—"এবার ওঁর হাসপাতাল তো?" বীরেন্দ্র সিঙ সুকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—"আপনি তো তোয়েরই রয়েছেন..." সুকুমার উত্তর করলে—"তা তো রয়েছি...কিন্তু একটু বসবেন না? প্রথম এলেন মিস্টার চৌধুরী..."

মৃন্ময় বললে—"না, এখন আর বসব না ডাক্তারবাবু, তবে আপনার বাগানটা একবার না ঘুরে দেখে পারছি না।...বসার কথা—আপনাদের আশ্রয়েই তো আসছি—একলা মানুষ, পাঁচজন প্রতিবেশীর দয়াই ভরসা আমার—এত বেশী এসে বসব যে আপনারাই পালাই পালাই করবেন।"

নেমে পড়তে ওঁরা দুজনেও নেমে এলেন। বাগানটি সত্যই চমৎকার হ'য়ে উঠেছে। একটু ঘুরে ফিরে মৃন্ময় প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠলেন—বললেন—"অল্প একটুখানি জায়গাকে এত সুন্দর ক'রে তোলবার ক্ষমতা আমি এক শুধু জাপানীদেরই দেখেছি—শুধু তো সুন্দর নয়, অল্পর মধ্যে বিরাটের প্রতিচ্ছবি এনে ফেলা। আপনার বাগানে আপনি তাই এনেছেন ডাক্তারবাবু, আপনার রুচির জন্যে কন্‌গ্রাচুলেট করছি আপনাকে।"

যেখানে একবার যায়, যেন নড়তে পারে না। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আকাশ, ঝিল, দূরের কাছের পাহাড়—সমস্ত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কি মিলিয়ে দেখে, তারপর আবার সুকুমারের রুচির প্রশংসা। সুকুমার কি রকম হয়ে গেছে—কালকের সেই অভিজ্ঞতা, অথচ আজকে সেই মানুষেরই মন স্বচ্ছতায় যেন জ্বল জ্বল করছে। তারও সৌন্দর্য্যমুগ্ধমন, বেশ বুঝতে পারছে আজ মৃন্ময়ের মনে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই। বীরেন্দ্র সিঙ আস্তে আস্তে পেছনে পেছনে চলেছেন। মুখে একটু হাসি লেগে আছে, আর প্রশংসার সময় সেটা মাঝে মাঝে অধর কুঞ্চনের সঙ্গে একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, দাঁতে নখ খুঁটছেন—যেন কি একটা বলতে চান, অথচ মনস্থির করে উঠতে পারছেন না; শেষে বলেই ফেললেন—

মৃন্ময় একবার ঐরকম প্রশংসার সঙ্গে আবেগভরে সুকুমারের হাতটা একটু চেপে ধরেছে—একটা কৃত্রিম ক্ষুদ্র পাহাড়ের গায়ে কতকগুলা নূতন ধরণের ফার্ণ দেখে, সুকুমারও লজ্জিত হয়ে কি রকম হয়ে গেছে, বীরেন্দ্র সিঙ হাসিটা একটু স্পষ্ট ক'রে বললেন—"নাঃ, আর পারা গেল না, বলতেই হোল আদৎ কথাটা, আপনি যে এরকম ক'রে পরের প্রশংসা আত্মসাৎ ক'রে যাবেন ডাক্তারবাবু...এ বাগানের ষোল আনার মধ্যে অন্তত বারো আনা যশ আমার মেয়ের মিস্টার চৌধুরী; আমার বাগানও—এখন যা—তা তারই রুচির পরিচয় দেয়।"

সুকুমার বেশ জোরে হেসে উঠলো, বললে—"আপনি বাঁচালেন, প্রশংসার বোঝা অসহ্য হয়ে উঠছিল আমার।... কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি জ্ঞানতঃ পাপটা করিনি, মিস্টার চৌধুরী যে এত সৌন্দর্য্যভক্ত এইটেই আমায় অবাক করে রেখেছিল। নৈলে, ও বাকি চারআনাও তো আমার প্রাপ্য নয়, প্রাপ্য হচ্ছে ঝংড়ু সর্দ্দারের।"

তারপর তার নজর গেল মৃন্ময়ের মুখের পানে, বীরেন্দ্র সিঙের কথায় একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেছে, বললে—"বুঝেছি, ওঁর মেয়ের কথায় আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন। সেটা—কি বলব?—এমন অনেক জিনিষ আছে তা প্রশংসাও আর নাগাল পায় না...আমার স্ত্রীর কথা বলেছেন উনি। ওঁর অসীম দয়া, উনি তাকে ওঁর মেয়ে হবার গৌরব দিয়েছেন।"

"গৌরবটা কার বুঝতেই তো পারছেন মিস্টার চৌধুরী ...এ'রকম একটি মেয়ের বাবা হতে পারা ফাঁকতালে..."

এই সময় খানিকটা দূরে বাসার কাছাকাছি বাগানের একটা ছোট ফটক ঠেলে রুমা প্রবেশ করলে। বেড়ার বাইরে ঝংড়ুর ঘরটা, স্বামীর প্রাতঃকালীন তদারক সেরে আবার ফিরে যাচ্ছিল, বাগানে অপরিচিত লোক দেখে কৌতূহলভরে একটু দাঁড়িয়ে পড়ল; তারপর আবার বাসার দিকে চলে গেল।

বাগানের ঐখানটায় যেন কিছু একটা ঘটে গেল, ওরা তিনজনেই একটু না চেয়ে থেকে পারলে না। রুমার পরণে একটা সাঁওতালী সাড়ি, সাঁওতালী ঢঙেই দেহের অনেকখানি অনাবৃত করে পরা, পায়ে রূপার কড়া, হাতে রূপার কাঁকন, এলো খোপায় বোধহয় জবার অভাবেই বেশ বড় একটা রাঙা গোলাপফুল। বীরেন্দ্র সিঙের তাকিয়ে থাকার একটু অন্য কারণও ছিল, এবেশে রুমাকে এই

কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রথম দেখলেন; বাঙালী মেয়ের বেশেই থাকে ও। সুকুমারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"রুম্মা না?"

সুকুমার একটু হেসে বললে—"হ্যা, রুম্মা সর্দারণী।··· জানেন না?—"

রাত্তির থেকে নিয়ে আর এই সকালে আমাদের বাসায় ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত ওর এই বেশ—বোধহয় তো ঝংড়ু সর্দারের শাসন—ওরা আবার জাতের মোড়ল কিনা—তার পর ওখানে পা দিয়েই আপনার মেয়ের শাসনে ওকে ত্রয়োদস্তর বাঙালী মেয়ে হয়ে যেতে হবে।"

একটু হাসি উঠল; তাতে মৃন্ময় যে একটু অন্যমনস্ক হয়েই যোগ দিলে এটা এরা কেউ টের পেল না, কেননা সঙ্গে সঙ্গে একটা মন্তব্য ক'রে সে হাসিটা একটু বাড়িয়েই দিলে, বললে—"দ্বৈতশাসনে বেচারা নাজেহাল হ'চ্ছে দেখুন!"

সুকুমার বললে—"সেই আমাদের হয়েই গেল একটু দেরি, অথচ মিস্টার চৌধুরী বসলেন না; আর কিছু না হোক আপনার মেয়ের কাছে এর জন্য জবাবদিহি দিতে হবে।"

বুধাই আর তুলা এসে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছে, সুকুমার জিজ্ঞেস করলে—"তোদের রাঙামা কি করছে রে?"

বুধাই বললে—"একটু আগে স্নানের ঘরে গেলেন।"

বীরেন্দ্র সিং বললেন—"তাহলে চলুন যাওয়া যাক হাসপাতালে, দেরী হবে, নয় আমরা এসেছি টের পেলে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসবে।"

বাগান থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন—"ঐ দেখলেন তো?—রুম্মার ছেলে আর মেয়ে, চেনবার জো আছে? এই বুনো জমির মতো, বনের মানুষকেও রি-ক্লেম্ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা মায়ের আমার।"

এই সময় একহাতে নিড়ানী আর এক হাতে ডালকাটা একটা বড় কাঁচি নিয়ে ঝংড়ু বেরিয়ে এল, হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত মালকোঁচা করে কাপড় পরা, ডান ওপর হাতে একটা রূপার অনন্ত, কাঁচাপাকা বাবরি চুল, চওড়া লাল সালু দিয়ে বাঁধা, বোধহয় সর্দ্দারীর মানচিহ্ন; দূর থেকেই সেলাম ক'রে একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল।

সুকুমার বললে—"এইখানে কিন্তু আপনার মেয়ে হার মেনেছে···"

আবার একটু মৃদুহাসি উঠল।

মৃন্ময় আগেকার চেয়েও আশ্চয্য হয়ে চেয়েছিল, বেটাছেলে ব'লে তত সঙ্কোচেরও কারণ নেই; ওদের হাসিতে ঘুরে বললে—"কি বললেন?···ও!···তা ওকে মিসেস সেনের হার বলা যায় না, বুড়ো তোতাকে কেউ পড়াতে পারেনা।"

খুব সতর্ক থেকে বরাবর যোগ দিয়ে গেল, কাউকে সন্দেহ করবার অবসর না দিয়ে; কিন্তু খুবই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। (ক্রমশঃ)

নবায়মানা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এত পুরাতন তুমি তবুও নূতন!
অনাঘ্রাত পুষ্প নহ, নহ কিশলয়
নখর-অক্ষত! কত পান, আস্বাদন,
কত যে তুম্বন—হায়, তবু মনে হয়
আস্বাদিত নহে সীধু! হৃদয়-ভ্রমর
তৃপ্তিহীন কামনায় ফিরিছে গুঞ্জরি
ঐ দেহ মধুপাত্র ঘেরি' নিরন্তর।

আরো মধু—আরো আরো শুধু পান করি
আকণ্ঠ নিয়ত। কহ কোন্ ইন্দ্রজাল
জানো তুমি?—পুরাতন বিশুষ্ক লতায়
নবপত্র পুষ্পদল! এ কি এ উত্তাল
কৈশোরের ঢেউ তোলা মর্ম্মতটে হায়,
নিশিদিন! বাসি ফুলে কত যে সুরভি—
এ মুগ্ধ পূজারী তব—জানে শুধু কবি!

ভারতের দক্ষিণে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে আমাদের যাতায়াত অনেক কম। ফলে এ বছর যখন শোনা গেল যে নিখিল ভারত বাস্তুকার সংসদের বার্ষিক সম্মেলন হবে মহীশূরে, তখন আমার বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই অধিবেশনে উপস্থিত হবেন বলে ভয় দেখালেন।

২৯শে জানুয়ারী সোমবার ৭-৪০মিঃ মাদ্রাজ মেল ধরার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা ৭টায় হাওড়া ষ্টেশনে হাজির হলাম। এত আগে ষ্টেশনে উপস্থিত হবার দুটী কারণ—প্রথম ভিড়ের ভয়, দ্বিতীয় দলীয় লোকের ঠিক মত ব্যবস্থা করা। দলে থাকবার কথা—শ্রীতিনকড়ি মিত্র, অক্ষয় ও ভক্তিময়ী বসু, কালাচাঁদ ও উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ দত্ত, (ইংরাজ আমলের রায় সায়েব), প্রিয় ও শান্তা গুহ, ভূপতি চৌধুরী এবং বিনয়কৃষ্ণ বসু। দলের মধ্যে জগন্নাথবাবুর সঙ্গে কালাচাঁদের মামা সম্পর্ক থাকায় তাঁকে মামা সম্বোধনে আপ্যায়িত করা হত। তারাপদবাবু সম্প্রতি সরকারী চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। সকলের চেয়ে বয়সে তিনি বড়, সুতরাং তাঁকে সম্বোধন করা হ'ত—সরকারী আমলের রায় সাহেব খেতাবের সাহায্যে।

গাড়ী থেকে নামতেই প্রথমে সাক্ষাৎ হল অক্ষয়দার সঙ্গে। বললেন—তোমাদের সঙ্গে যাওয়া হল না এই কথা বলতে এলাম। আমাকে কালই মাদ্রাজ পৌঁছতে হবে সুতরাং এরোপ্লেন ছাড়া গতি নেই এবং প্রিয় গুহ এক বিশেষ কাজে দিল্লী যাচ্ছে সেখান থেকে সোজা হাওয়ায় বাঙ্গালোর যাবে। শ্রীমতী গুহ আগেই বাঙ্গালোর গেছেন। তবে তুমি আমার ও গুহ'র বিছানাটা নিয়ে যাও।

দলভঙ্গ হওয়ার খবরে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। প্লাটফরমে প্রবেশ করে দেখি—তখনও কেউই আসেনি। গাড়ীর দরজায় লটকান কাগজ দেখে নিজেদের আসন খুঁজে নিতে দেরী হল না। যেমনটী চেয়েছিলাম—তেমনই ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের কামরাগুলি পাশাপাশি।

একে একে সকলে এসে উপস্থিত হলেন—সঙ্গে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত ভাবে বিছানাপত্র ও সুটকেস্। একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রীমান কালাচাঁদ—সঙ্গে অন্যান্য সব জিনিষ পত্রের সঙ্গে বিরাটকায় দুটী বিছানার বাণ্ডিল। আমাদের দলের সস্ত্রীক যাত্রীদের জন্য—দুটী "কুপে" কামরার ব্যবস্থা ছিল। অক্ষয়দা না যাওয়ায় তাঁর স্থান অধিকার করলেন মামা ও রায় সাহেব।

যথাসময়ে গাড়ী ছাড়ল। হাওড়া থেকে খড়্গপুর ৭২ মাইল—একটানা দৌড়। সময় লাগে একঘণ্টা ৫২ মিঃ। অঙ্কের হিসাবে গাড়ীর বেগ ঘণ্টায় ৪০ মাইলেরও কম। আজকের দিনে এই বেগ অতি সামান্য—বিশেষ করে এরোপ্লেনের গতির সঙ্গে তুলনা করলে। কিন্তু তবুও আমার কাছে ট্রেণে ভ্রমণ এরোপ্লেনে ভ্রমণের চেয়ে ভাল লাগে। ট্রেণে ভ্রমণের মধ্যে আছে—বৈচিত্র্য, মাটীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক। নদী, জল, অরণ্য, পথ, তাদের সঙ্গে একটি নিবিড় যোগাযোগ।

নিরবচ্ছিন্ন দু'ঘণ্টা চলার পর গাড়ী যখন থামল খড়্গপুরে তখন রাত পৌনে দশটা। ফেরীওয়ালাদের চা বিড়ি সিগ্রেটের কোলাহলে প্লাটফরম মুখরিত। পাশের কামরা থেকে মামা চীৎকার করে বললেন—সকাল সকাল শুয়ে পড়—ভোরবেলা চিল্কা দেখতে হবে। দশ মিনিট পরে গাড়ী ছেড়ে দিল—আবার দুঘণ্টার পাড়ী, বালেশ্বর। কালবিলম্ব না করে—যে যার শয্যাগ্রহণ করলেন—কখন চোখ বুজিয়েছি মনে নেই—ঘুম যখন ভাঙল তখন পাশের কামরা থেকে মামার চীৎকার কানে এল—উঠে পড়, উঠে পড়—চিল্কা দেখা যাচ্ছে।

শীতের সকাল, বিছানা ছেড়ে ওঠবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। আলস্য যথেষ্ট কিন্তু ঔৎসুক্যেরও অভাব ছিল না। ফলে আপোষ হ'ল জানালা খুলে বিছানায় শুয়ে থাকা। ভোরের পাতলা কুয়াসা ভেদ করে নারিকেল গাছের সার—বোঝা যাচ্ছে তারই ফাঁকে ফাঁকে চিল্কার জল ও পাহাড়।

মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশন

রেলের লাইন প্রায় ১৮ মাইল চিল্কার ধার দিয়ে চলেছে। বসতি ও নারিকেল গাছের আড়ালে হ্রদের নিরবচ্ছিন্ন দৃশ্য চোখে পড়ে না। বালুগাঁ, কালিকোটা ও রম্ভা এই তিনটী ষ্টেশন চিল্কার ধারে—এর মধ্যে মাত্র রম্ভা ষ্টেশনে গাড়ী থামে। নানা রকম উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা পড়ার পর চিল্কার দৃশ্য দেখলে হতাশ হতে হয়। হ্রদের ধারে অতি নোংরা এবং বেড়াবার জায়গার খুবই অভাব। বালুগাঁ ষ্টেশনের কাছে হ্রদের ধারে একটী ইনস্পেকসন বাংলো আছে। সেই জায়গাটী বেশ মনোরম।

সূর্য্যোদয় দেখার অবকাশ কলকাতায় মেলে না। ট্রেণে শুয়ে এ সুযোগ পাওয়া গেল। ট্রেণ মন্থর গতিতে চলে—৭.১৫ মিনিটে বারহামপুর ষ্টেশনে এসে থামল। এইখান থেকে সুরু গঞ্জাম জেলা। সমুদ্র ধারের স্বাস্থ্যনিবাস গোপালপুর যেতে হলে—এই খানে নামতে হয়।

টাইমটেবিল মিলিয়ে দেখা গেল—ট্রেণ আধ ঘণ্টা দেরী করেছে। দীর্ঘ পথের কথা স্মরণ করে মনকে প্রবোধ দেওয়া গেল—কালহ্যেয়ং নিরবধি, বিপুলাচ পৃথ্বী। অতএব চায়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক।

সুরু হল চায়ের পর্ব্ব। কলকাতায় সকালবেলা চায়ের কাপে চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে নিতে হয়। কাগজের হেডলাইন থেকেই দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। কিন্তু চলন্ত ট্রেণে বসে এ ব্যাপারে যেন কেমন একটা নিস্পৃহ ভাব জেগে উঠল। মনকে প্রবোধ দিলাম—কালকের কাগজ ত আজ এখানে মফঃস্বল সংস্করণরূপে আত্মপ্রকাশ কর্ব্বে। সুতরাং ও কাগজ পড়ে কি
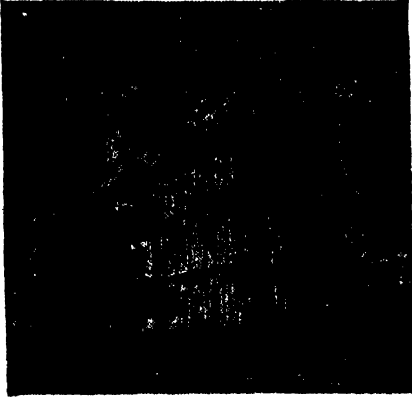
মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল অফিস

হবে। দু' একখানা স্থানীয় কাগজ অবশ্য চোখে পড়ল, কিন্তু তার ছাপার চেহারা থেকে সে কাগজ কেনার ইচ্ছা সম্বরণ করতে হল।

চায়ে চুমুক দিচ্ছি—এমন সময় উমাদেবী বললেন—গিরিশের কড়াপাকের সন্দেশ আছে—বিস্কুটের বদলে সেগুলির সদ্ব্যবহার করুন। ক্রমশ প্রকাশ পেল—আমাদের এই ভ্রাতৃজায়াটী শুধু সন্দেশ নয় নানা প্রকারের উপাদেয় ভক্ষ্য, যাকে মেওয়া বলা হয়, তা সঙ্গে নিয়ে চলেছেন—শুধু আমাদের রসনা তৃপ্তির জন্য।

রাজকীয় আলস্য সহকারে চাপান করা হচ্ছে, এমন সময় ট্রেনের খানাকামরা থেকে প্রাতরাশ এল। ট্রেণের গতির সঙ্গে আমাদের ক্ষুধারও যেন একটা বিশিষ্ট যোগ আছে। কলকাতায় সকালে চায়ের সঙ্গে বড় জোর একখানা বিস্কুট বা টোষ্ট খাওয়া চলে, কিন্তু ট্রেণে দেখা গেল—চা টোষ্ট, ডিম, কলা, সন্দেশ, মেওয়া যথেষ্ট পরিমাণে গলাধঃকরণ করেও, বারোটায়—মধ্যাহ্ন ভোজনে কারো কোনো রকম অরুচি নেই।

ট্রেণ তখন ভিজিয়ানাগ্রামে এসে পৌঁচেছে। ষ্টেশনটী বেশ বড়; মধ্যপ্রদেশের রায়পুর থেকে একটী লাইন এসে এইখানে মিলেছে। সাধারণ পারিপার্শ্বিক দৃশ্য—সুন্দর; দুধারে ঘন নারিকেল বন—মধ্যে মধ্যে ঘাট পর্ব্বতমালা।

এমনি দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে ট্রেণ এগিয়ে এসে—পূবদিকে ঘুরে গেল। পাহাড়ের চূড়া রইল বামে—দক্ষিণে প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র—বিগত যুদ্ধের প্রচুর উপকরণ রাখার গুদামঘর এখনও বর্ত্তমান।

ট্রেণের গতি মন্থরতর হয়ে অবশেষে ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে এসে থামল—আধঘণ্টা দেরীতে। তখন বেলা একটা। বেঙ্গল নাগপুর রেল লাইনের এইটী শেষ ষ্টেশন; ফলে ট্রেণের খানাকামরাখানি এখান থেকে কেটে দেয়। এর পর খানা যোগাড় করতে হয় ষ্টেশন থেকে। সে খানা যে কী রকম হবে সে সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মনে কিছু দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু অচিন্তনীয়ভাবে সে দুশ্চিন্তার নিরাকরণ হ'ল।

এঞ্জিন প্রভৃতি বদলাবার জন্য এখানে গাড়ীর স্থিতি ৪০ মিনিট। ঝাড়ুদার ডেকে কামরা সাফ্ করতে ব'লে আমরা প্লাটফরমে পাদচারণ শুরু করে দিলাম—এমন সময় লক্ষ্য কর্লাম, দুটী মহিলা আমাদের অনুপস্থিত বন্ধু অক্ষয় বসুর সন্ধান করছেন। আমাদের কাছে অক্ষয়-বাবু—হাওয়ায় উড়ে গেছেন শুনে তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তারপর জানালেন যে অক্ষয়দার চিঠিতে আমাদের দলের কথা পড়ে—তিনি আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের যাবতীয় আহার্য্য নিয়ে এসেছেন। অক্ষয়দার সঙ্গে তাঁর এক নাতনীর যাবার কথা ছিল—তার জন্য দুধও বাদ পড়েনি। দুধ নেওয়া সম্বন্ধে আমাদের একটু অমত ছিল—কিন্তু রায় সায়েব তাঁর ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় ভর করে বল্লেন—ওটা নিয়ে নাও, কখন দরকার লাগে বলা যায় না। বয়োজ্যেষ্ঠের অভিমত শিরোধার্য্য। উমাদেবী মহিলাদ্বয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলেন—মাতা ও কন্যা, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ইলাসেন। মহিলাদ্বয়কে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিদায় জানালাম, তাঁরা কিন্তু ফেরার পথে ওয়ালটেয়ারে নামবার নিমন্ত্রণ করে রাখলেন।

ট্রেণ আবার চলতে সুরু করতেই উমাদেবী বললেন—দুধটা গরম করে রাখা উচিত। কালাচাঁদ ষ্টোভ জ্বেলে এ কার্য্যে সহায়তা কর্লেন। কিছুক্ষণ বাদে শোনা গেল—দুধ নষ্ট হবার ভয়ে—রায় সাহেব ও মামা তার সদ্ব্যবহার করে ফেলেছেন।

সমুদ্রের উপকূল—শীতের চিহ্ন নেই। দুপুরে হাওয়ার তাপ বেশ গরম—কষ্টকর না হলেও মনোরম নয়। জানালার সার্সি তুলে দিয়ে আলস্যবিজড়িত নেত্রে বাহিরের দিকে চেয়ে আছি। ট্রেণের গতির সঙ্গে তাল রেখে দৃশ্যান্তর ঘটছে—সহসা চোখের সামনে ফুটে উঠল—এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—বাংলাদেশে রেল লাইনের দুপাশে দেখি ধানের ক্ষেত—এখানে দেখলাম লঙ্কার ক্ষেত মাইলের পর মাইল—যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু লঙ্কা আর লঙ্কা! মনে যা শঙ্কা জাগল তা আর ভাষায় প্রকাশ না করে তর্জ্জনি সঙ্কেতে বন্ধুদের দেখিয়ে দিলাম। তাঁরাও বিস্ময়ে হতবাক্।

পথে একটী ষ্টেশনে গাড়ী থামল—নামটা যেন জানা জানা। পিথাপুরম। মামা বললেন—এখানকার কলা খুব বিখ্যাত। বিনয়দা আর

দ্বিরুক্তি না করে—প্রায় এক কাঁদি কলা দু'টাকায় কিনে ফেললেন। সকালীয় চা যে কলা সহযোগে উপাদেয় হয়েছিল—তা বলা বাহুল্যমাত্র। কালাচাঁদ (আসলে গোরাচাঁদ বললে অন্যায় হয় না) উমাদেবীর আড়ালে আমার কানে কানে বললেন—এখানকার শাড়ীও খুব বিখ্যাত! হেসে বললাম—লক্ষ্মণ, ও নাম কোরো না উচ্চারণ।

পুঁটুলি পাকানো গোল গোল অক্ষরে ষ্টেশনের নাম ক্রমশঃ অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে এল। দ্রুতিক্রত বেগে ট্রেণ চলেছে। গাড়ির বাতি বই পড়ার পক্ষে যথেষ্ট হলেও ঝাকুনিতে পড়া দুরূহ। অগত্যা রেলের পাঠ্য আগাথা ক্রিষ্টির গোয়েন্দা কাহিনী ত্যাগ করতে হল। দেখি বিনয়দা দক্ষিণ ভারতের মানচিত্র ও ব্রাডশ খুলে বসে আছেন। তাঁর তিনকড়িদা (পশ্চিম বাংলার মুখ্য বাস্তুকার) দক্ষিণ ভারতের পথ ঘাটের মাপ নিরীক্ষণ কচ্ছেন।

কারো মুখে কোন কথা নেই। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে সাতটায় ট্রেন নিদাদাভলু ষ্টেশনে এসে থামল। এর মধ্যেই রাত

এগমোর ষ্টেশন

বেশ গভীর বলে মনে হচ্ছে। গার্ড এসে খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করে গেল। বিনয়দা একটা ডিনারের হুকুম দিলেন। আমরা ত অবাক—এত খাবার সঙ্গে আবার ডিনার কি হবে? বিনয়দা হেসে বললেন—দেখা যাবে। কিন্তু কি দেয় সেটা ত দেখা দরকার।

ডিনার যা দিল—তার পরিমাণ যে শুধু অল্প তা নয়, খেতেও বিশেষ সন্তোষজনক নয়।

রাত দশটায় বেজওয়াদা পার হয়ে যে যার শয্যায় আশ্রয় নিলাম। পরদিন প্রভাতে ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি ট্রেণ একটা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে—নাম সুলুরপেটা। ঘড়িতে তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। আর ঘন্টা দুই পরে নামতে হবে। উৎসাহিত বোধ করে জিনিসপত্র বাঁধা সুরু করা গেল।

গোছগাছ করার অবসরে জানালা দিয়ে দেখি ঝাউয়ের বনের ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্রের নীল জল। ভালই লাগল দেখতে।

ঠিক সাড়ে আটটায় মাদ্রাজ সেনট্রাল ষ্টেশনে ট্রেণ এসে দাঁড়াল। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের মাদ্রাজ শাখার কর্ণধার শ্রীঅনন্ত আচারী ও তাঁর সহকর্মী জিতেন্দ্র গোস্বামী আমাদের জন্য অপেক্ষমান। সঙ্গে সভক্তি অক্ষরদা। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গোস্বামী মহাশয় মালপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললেন—হিন্দুস্থানের মাদ্রাজ শাখার অফিসের সর্বোচ্চতালায়। গোস্বামী মহাশয় অতিথিসেবার যা ব্যবস্থা করেছিলেন—সে সম্বন্ধে কোনো উক্তিই অত্যুক্তি হবে না।

যাত্রার পূর্বে একটা খসড়া তৈরী করা হয়েছিল। মাদ্রাজে একদিন থাকা হবে—সহরটা ভাল করে দেখা যাবে। গোস্বামী মহাশয় পরামর্শ দিলেন—হাতে ৩৬ ঘণ্টা সময়—সহরের আশপাশ বিশেষ করে মহাবল্লীপুরম একান্ত দ্রষ্টব্য।

মহাবল্লীপুরমের দূরত্ব ৩৮ মাইল। প্রতি রবিবার সরকারী বাসের ব্যবস্থা আছে। সকালে গিয়ে বিকালে ফেরা যায়। কিন্তু রবিবার ত

মহাবল্লীপুরমের রথ

অনেক দূরের কথা। গোস্বামী মহাশয়কে গাড়ীর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হল।

সেদিনকার মতো মাদ্রাজ সহর ঘুরে বেড়ান হল—ট্রাম, বাস ও তিন চাকার ট্যাক্সি চড়ে। তিন চাকার ট্যাক্সি—মোটর বাইক ও রিক্সার সংমিশ্রণ। দুজনে চড়তে পারে। ভাড়া চার আনা মাইল।

মাদ্রাজ সহরটা মোটামুটি প্রদক্ষিণ করে দেখা গেল যে এর রাস্তাঘাট—আমাদের সহরের তুলনায়—অনেক সুপরিষ্কৃত। সাধারণ যানবাহনাদির ব্যবস্থাও বেশ সন্তোষজনক। ট্রাম অবশ্য কলকাতার ট্রামের থেকে অনেক নিকৃষ্ট। বাসগুলি সরকারী এবং বেশ উচ্চ শ্রেণীর। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে সাধারণ যান বাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় রাত সাড়ে আটটায়। রাত নটায় সমস্ত সহর নিস্তব্ধ। সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখি—সে স্থান জনবিরল—পরিত্যক্ত।

মাদ্রাজে সাধারণ যান বাহনের অন্তর্গত—বৈদ্যুতিক ট্রেণ, এর দৌড় ৮১ মাইল—দক্ষিণ ভারত রেলপথের "তামবরম্" ষ্টেশন পর্যন্ত। তিনখানি গাড়ী—দশ মিনিট অন্তর পাওয়া যায়।

কলকাতার তুলনায় মাদ্রাজের জনসংখ্যা কম এবং যান বাহনের আধিক্য বেশী নয়। তবে আমার মনে হয়—সরকারী আপিস মহল—ব্যবসা মহল—বাণিজ্যকেন্দ্র—সহরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত হওয়ায় পথ ঘাটের জনতার সমস্যা অপেক্ষাকৃত সরল। একটা ব্যাপার বিশেষ লক্ষনীয়—বাসের চলাচল। বাসগুলি শুধু নির্দ্দিষ্ট স্থানে থামে এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী বহন করে।

কুম নদী ও দুটো খাল সহরের ভিতরে থাকায় সহরের বিভিন্ন অংশে চলাচলের জন্য অনেকগুলি সেতু আছে। নদীতে বিশেষ জল নেই এবং খালের জলও খুব সুপরিষ্কৃত মনে হল না।

কলকাতার মতো মাদ্রাজেও দুটো ষ্টেশন—মাদ্রাজ সেন্ট্রাল—চওড়া

মহাবলীপুরমের মহাকাল মন্দির

মাপের রেলের প্রধান ষ্টেশন। আর এগমোর, মিটার মাপের রেলের জন্য—দক্ষিণ ভারত রেলপথের অন্তর্গত। বৈদ্যুতিক ট্রেণ এই এগমোর ষ্টেশনের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে।

হাতে সময় থাকলে এগমোর ষ্টেশন থেকে চিঙ্গলপুট ষ্টেশন পর্য্যন্ত ট্রেণে গিয়ে সেখান থেকে বাসে মহাবলীপুরম যাওয়া যায়। কিন্তু সময় সংক্ষেপ করতে হলে—মোটর ছাড়া উপায় নেই। অতএব পরদিন বৃহস্পতিবার—সকাল আটটায় দুখানি গাড়ীতে মহাবলীপুরম রওনা হওয়া গেল।

পথে পড়ে পক্ষীতীর্থ—চিঙ্গলপুট ষ্টেশনের কাছে। স্থির হল মহাবলীপুরম থেকে ফেরবার পথে দেখা যাবে। বিমলদা বল্লেন, যাবার পথে চিঙ্গলপুট ষ্টেশনে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থাটা করে চল।

মহাবলীপুরমে পৌঁছান গেল বেলা দশটায়। রোদ বেশ চড়া হলেও হাওয়া থাকায় নারিকেল গাছের ছায়ায় ঘুরতে মন্দ লাগেনি। গোটা পাহাড় কেটে রথের মতো সাতটী মন্দির—পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ও গণেশের নামে উৎসর্গীকৃত। এই রথগুলি দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের আদিম নিদর্শন বলে অনেকে মনে করেন। এই রথগুলির ধারে পাশে বৃষ, সিংহ ও হস্তীর মূর্ত্তি এক একটা গোটা পাথর কেটে তৈরী—শিল্প সৃষ্টি হিসাবে এগুলি অপূর্ব্ব।

সমুদ্রতীরে মহাকালের মন্দির—মন্দির ও মূর্ত্তি দুয়েরই অবস্থা ভগ্ন। সমুদ্রে স্নানের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।

উপকূলে প্রচুর পাথরের স্তূপ—সমুদ্রের ঢেউয়ের আছাড় খেয়েও মাথা জাগিয়ে আছে। তারই মধ্যে স্নান সেরে, মহাবলীপুরমের আর সব দ্রষ্টব্য দেখা গেল। প্রথম—মহিষমর্দ্দিনী গুহা, ৩৩ ফুট লম্বা ১৫ ফুট গভীর এখানকার বাতিঘরের দক্ষিণে। আর একটা প্রকাণ্ড ভাস্কর্য্য শিল্পের নমুনা পাওয়া যায় একটা পাহাড়ের গায়ে—৯৬ ফুট লম্বা ৪৩ ফুট উঁচু

পর্ব্বতগাত্রে ভাস্কর্য্য—অর্জ্জুনের তপস্যা—মহাবলীপুরম

চিত্রের বিষয় অর্জ্জুনের তপস্যা। এই ভাস্কর্য্য চিত্রের তলার দিকে ১৭ ফুট লম্বা দুটী প্রকাণ্ড হাতী, তার তলায় সাত মাথাওয়ালা বাসুকী। মহাবলীপুরমে আরও কয়েকটা গুহা আছে—যেগুলি দ্রষ্টব্য বলা যেতে পারে, কিন্তু পাছে পক্ষীতীর্থের পাখি এসে চলে যায় সেই ভয়ে আর দেরী করতে ভরসা হল না।

বারোটার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে আমরা পক্ষীতীর্থের সিঁড়ির গোড়ায় এসে পৌঁছালাম। জায়গাটীর স্থানীয় নামটী প্রকাণ্ড—অনেক কষ্টে মনে আছে—তিরুকালিকুন্দরাম। যাবার পথে একটী পাণ্ডার কাছে পাখীর আসবার সময়ের কথা জেনে গিয়েছিলাম। দেখি, তিনি আমাদের জন্য সিঁড়ির পাদমূলে অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখে বললেন—ঠিক সময়ে পৌঁচেছেন—তাড়াতাড়ি উপরে চলুন।

একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে সিঁড়ি চড়া সুরু করে দিলাম।

সঙ্গে দুটি মহিলা, দেখি তাঁরা দিব্য উঠে চলেছেন—হাজার হোক বাঙালীর মেয়ে ; ধর্ম্মের একটা টান আছে ত ! তার উপর একজনের নাম আবার ভক্তিময়ী।

সিঁড়ির সংখ্যা ঠিক মনে নেই ; সাড়ে সাতশ' কি আটশ' হবে। অবলীলাক্রমে না হলেও খুব বেশী কষ্ট না করেই উপরে হাজির হওয়া গেল। পাহাড়ের এক চূড়ার খানিকটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা আছে। দর্শনার্থীর সংখ্যা বড় কম নয়, প্রায় দু'শ। পুরোহিত এলেন—সঙ্গে একঘড়া জল এবং এক পাত্র চিঁড়া জাতীয় পদার্থ। সেই ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। মন্ত্রোচ্চারণ শেষ করে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তার লক্ষ্য অনুসরণ করে আমরা দেখতে পেলাম—বহু দূরে তিনটা সাদা রঙের পাখী।
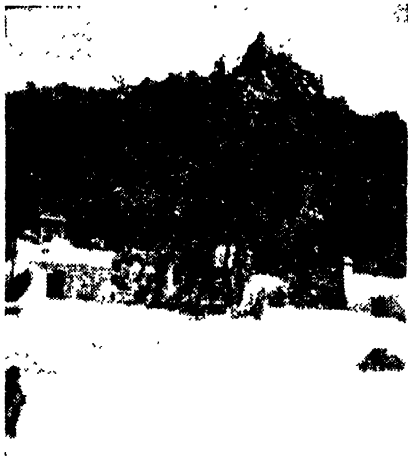
কিম্বদন্তী, এই যে পাখীগুলি অমর—এরা কন্যাকুমারিকায় স্নান করে এখানে এসে আহার করেন। এর সত্যতা সম্বন্ধে মন্দ লোকে সন্দেহ করতে পারে কিন্তু আমরা সে সব বিচার না করে দেখতে লাগলাম—পাখীগুলি কি করে। পুরোহিত মহাশয় পাখীগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য মধ্যে মধ্যে পাথরে বাটী ঠুকতে লাগলেন এবং পাখীগুলি চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে পাহাড়ের নীচে কোথাও আশ্রয় নিল। একটু পরে হঠাৎ নজরে এল যে মাত্র একটা পাখী দিব্য রাজকীয় ভাবে হেঁটে এসে পুরোহিতের হাত থেকে আহার্য্য গ্রহণ করল। পাখীটা চিল-জাতীয়। সঙ্গে যেকটা ক্যামেরা ছিল—মাত্র দশ ফুটের ব্যবধান থেকে তার ছবি তোলা হল।

পক্ষীতীর্থের পাদদেশে

তিনটীর মধ্যে মাত্র একটী পাখীই কিন্তু সেদিন খেয়ে গেল। একটু পরে লক্ষ্য করলাম—তিনটী পাখীই উড়ে চলে গেল। পুরোহিতঠাকুর তখন পাখীর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ হিসাবে বিলোতে শুরু করলেন।

আমরা সে স্থান ত্যাগ করে আরও ৫০ ফুট উপরে পাহাড়টীর সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থিত কালী মন্দিরে আরোহণ করলাম। মন্দিরটীর ভিতর অংশ হয়ত বহুদিনের—অন্ধকারে বিশেষ বোঝা যায় না। তবে বাহিরের অংশ সাম্প্রতিক—এখনও অনেক অংশে নির্ম্মাণকার্য্য চলেছে।

এই মন্দিরের চত্বর থেকে নীচের গ্রাম ও মন্দির সুন্দর দেখা যায়। মন্দিরটীর মধ্যে প্রকাণ্ড এক পুষ্করিণী চার দিকে চারটি সুদৃশ্য গোপুরম বা তোরণদ্বার। মন্দিরটীর অধিদেবতা কে এবং মন্দিরের শিল্পসৌন্দর্য্য কেমন তা জানবার কৌতূহল থাকলেও সেবারকার মত সে ইচ্ছা দমন করা হল- সন্ধ্যায় বাঙ্গালোর যাবার কথা স্মরণ করে।

চিঙ্গলপুট ষ্টেশনে এসে শোনা গেল—আমাদের কিছুক্ষণ দেরী হবে-খাদ্যদ্রব্য যথাসময়ে সংগৃহীত হয়ে ওঠে নি।

হাতে সময় পাওয়ায়—দু চার জন যাঁরা মহাবলীপুরমে স্নান করেন নি তাঁরা স্নান করার বাসনা প্রকাশ করলেন—কিন্তু স্নানের জায়গার অভাব থাকায় অগত্যা ইঞ্জিনে জল দেবার কল থেকে জল নিয়ে কোনো রকমে হাত মুখ ভিজানো গেল। প্রায় তিন কোয়ার্টার পরে আহার্য্য পাওয়া গেল

পক্ষীতীর্থের পাখী

পরিমাণ দেখে সকলেই হতাশ হয়ে পড়লেন। আগে হতে খবর দিয়ে এই ফল—খবর না দিয়ে গেলে উপবাস করতে হত।

মধ্যাহ্নভোজন শেষ হতে বেলা অপরাহ্ন। আর কালবিলম্ব না করে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করা হল।

রাত্রি নটায় বাঙ্গালোর মেল। গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যে অনায়াসে মালপত্র পাঠিয়ে ধীরে সুস্থে ট্রেণে এসে বসা গেল। বিদায় সম্ভাষণ করার সময় গোস্বামী মহাশয় আমাদের হাতে একতাড়া চিঠি দিয়ে বললেন—পারেন ত দক্ষিণ ভারতের প্রধান সহরগুলো দেখে নেবেন। প্রায় সব জায়গাতেই আমাদের আস্তানা আছে। আপনাদের সম্বন্ধে তাঁদের কাছে যে চিঠি লিখেছি এগুলি তারই নকল—প্রয়োজন বোধ করলে—ব্যবহার করবেন।

মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর [illegible] মাইল পথ। সকাল সাতটায় গন্তব্য স্থানে অবতরণ। সকাল সকাল শুয়ে পড়ার তাড়া নেই। সুতরাং

আলোচনা চলে—কত কম সময়ে, কী ভাবে দক্ষিণ ভারতের দ্রষ্টব্য সহর পরিদর্শন করা চলে।

ব্রাডশ, সর্ব্বভারতীয় রেলের টাইমটেবল, ভারতবর্ষের ম্যাপ এবং এরোপ্লেনের নির্ঘণ্ট হাতড়ে মোটামুটী রকমের একটা ছক তৈরী করা হল। তার মধ্যে যে খুঁত ছিলনা এমন কথা বলা যায় না, তবে সেগুলি অনেকাংশে মহীশূরের কর্ম্মসূচীর উপর নির্ভরশীল—তার উপর আমাদের কোনো হাত ছিল না। "দেশে কর্ম্ম বিধীয়তে" বলে তখনকার মতো নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পথে—কোলারের সোনার খনি—বাউরিংপেট ষ্টেশনে নামতে হয়। সোনার দুরাশা ত্যাগ করে আমরা বাঙ্গালোর ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে এসে নামলাম। ষ্টেশনটী খুব বড় নয়। নামতেই দেখি—একদল স্বেচ্ছাসেবক আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন—আমরা সেই দিনই মহীশূর যাব কিনা। বললাম—একটা দিন বাঙ্গালোরে কাটাতে চাই। ষ্টেশনের ক্যাণ্টিনে চায়ের অভাবে কফি খেয়ে, ট্যাক্সি করে একটা বাসস্থান নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করা গেল। সর্ব্বত্রই স্থানাভাব। কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর ল্যাভেণ্ডার হোটেলে আশ্রয় সংগ্রহ করা গেল।

উপরের মন্দির থেকে নীচের দৃশ্য

হোটেলের বাড়িটী পুরানো—সেকালের বাংলো ধরণের। কিন্তু ব্যবস্থাদি মন্দ নয়। স্নান সেরে বেশ সুষ্ঠুভাবে প্রাতর্ভোজন করা গেল। আহার্য্য দ্রব্যাদির পরিমাণ ও শ্রেণী উৎকৃষ্ট বলা যেতে পারে। এইবার সহর পরিদর্শনের কথা উঠল। মহিলাদের ইচ্ছা এখানকার বাজার ও দোকান পরিদর্শন। ডক্টরদা তাঁদের পথপ্রদর্শক হলেন—সাথী হলেন—কালাচাঁদমামা ও রায়সাহেব। বাকী কজন বাহির হলেন—প্রিয় গুহের খোঁজে—বাঙ্গালোরে তার আমাদের দলে যোগ দেবার কথা।

এখানকার রাস্তাঘাটের সঙ্গে আমাদের কারো পরিচয় ছিল না। কিন্তু কলকাতার লোক হয়ে ঠিকানার পাত্তা পাব না, এমন হতে পারে না। পথের পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে ঠিকানা পাওয়া গেল। প্রথমে চড়লাম বাসে—তারপর তিন চাকার ট্যাক্সি। গুহকে আবিষ্কার করে জানলাম—তিনি মাত্র আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বাঙ্গালোর পৌঁচেছেন। অথচ তাঁর স্ত্রী সেই দিন সকালে মোটরে মহীশূর যাত্রা করেছেন। এমন দুর্ঘটনা অবশ্য বড়ই নৈরাশ্যজনক এবং সমবেদনাযোগ্য।

আমরা তখন বিধান দিলাম—গুহ সেইদিনই দুপুরের ট্রেণে মহীশূর যাত্রা করুন—স্ত্রীরও সাক্ষাৎ মিলবে এবং আমাদের জন্য পূর্ব্বাহ্নে বাসস্থানের ব্যবস্থা করবেন। ব্যবস্থাটা যে তাঁর মনঃপূত হল তা বলা বাহুল্য মাত্র।

হোটেলে ফিরে মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করা হল। আহার একটু গুরুতর রকমের হওয়ায় কিছুটা সময় বিশ্রাম করতে লেগে গেল। বৈকালীন চায়ের পর, মহিলারা যথারীতি বিপণি পরীক্ষায় বার হলেন। সকলেই মহিলাদের দলে যোগ দিলেন—শুধু দু'জন কর্ত্তব্য উদ্দেশে অন্যদিকে গমন করলেন—উদ্দেশ্য Air-India অফিসে গিয়ে ত্রিবান্দম যাবার কোনো রকম ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

মহাত্মা গান্ধী রোডে Air-India'র অফিস। আমাদের হোটেল থেকে খুব বেশী দূর নয়। কিন্তু বাসের বিভ্রাটে পৌঁছতে ৫টা বেজে গেল। তখন অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। নিরাশ হয়ে ফিরছি—দেখি টমাসকুকের অফিস খোলা। ভরসা করে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করা গেল। ম্যানেজার মিঃ মূর্ত্তি অতি অমায়িক ভদ্রলোক—বললেন—বাঙ্গালোর থেকে ত্রিবান্দম এবং মাদ্রাজ থেকে কলকাতা ফেরার ব্যবস্থা তাঁরা করে দেবেন। আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। আমাদের সুবিধার জন্য তারা সাময়িকভাবে একটা অফিস মহীশূরে খুলেছেন—সেখান থেকে আমরা সঠিক সমস্ত খবর পাব।

বাঙ্গালোর—চামরাজ টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট

অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে আমরা পদব্রজে সহর পরিদর্শনে মন দিলাম। সহরের ক্যাণ্টনমেণ্ট অংশটী বেশ সুন্দর—পিচমোড়া রাস্তা—দুধারে গাছপালা এবং চার পাশে জমি রেখে তার মধ্যে বাংলো ধাঁচের বাড়ী। সহরের সরকারী বাড়ীগুলির স্থাপত্যের বিশিষ্টতা না থাকলেও—রচিত উদ্যানের পরিবেষ্টনীতে সেগুলি সুন্দর মনে হয়।

আধুনিক স্থাপত্য অনুযায়ী কতকগুলি নতুন বাড়ী দেখা গেল—তার মধ্যে চামরাজ টেকনিক্যাল স্কুলের বাড়ীটী বেশ সুন্দর মনে হল।

রেল লাইনের এক অংশে অনেকগুলি এক ধরণের বাড়ী নির্ম্মিত হয়েছে—সেগুলিকে বাইরে থেকে সুদৃশ্য মনে হয়। সহরের জমিতে উঁচুনীচু পাহাড়ের ভাব থাকায়—নগর পরিকল্পনাটী অনেক অংশে বেশ মনোরম।

ক্যান্টনমেণ্ট ও পুরানো সহর দুই অংশেই দেখলাম—প্রচুর সংখ্যায় সিনেমার বাড়ী। কলকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে যেমন পাশাপাশি সিনেমা—এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। ইংরাজি, হিন্দি ও স্থানীয় ভাষায় ছবি দেখান হয়।

রাত আটটায় হোটেলে ফিরে দেখি—অপরদল তখনও ফেরে নি। অল্প পরে তাঁরা যখন ফিরলেন তখন লক্ষ্য করা গেল মহিলাদ্বয়ের হাতে কয়েকটী প্যাকেট—সেগুলি যে বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ী তাতে আমাদের কারো সন্দেহ ছিল না।

ইংরাজি কেতায় ঠিক সাড়ে আটটায় ডিনার। খাদ্যাদির পরিমাণ ও আস্বাদ উত্তম। সমাদর সহকারে আহার শেষ ক'রে, সাড়ে ৯টাতেই শয্যা গ্রহণ করা হ'ল। পরদিন সকাল ৭-৪০ মিনিটে মহীশূরের ট্রেণ।

ষ্টেশনে সাতটার সময় পৌঁছে দেখি—গাড়ীতে একান্ত স্থানাভাব। ভারতের বিভিন্ন স্থান—বোম্বাই, নাগপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কলকাতা, পাটনা, মাদ্রাজ, ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি সহর থেকে প্রতিনিধিদল এসেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীতে নিজেদের ছড়িয়ে নিয়ে যাত্রা সুরু করা গেল। মিটার মাপের গাড়ী, তার ওপর পথে যথেষ্ট চড়াই ও উৎরাই। সুতরাং গাড়ীর বেগ অপেক্ষাকৃত মন্থর। বাঙ্গালোর থেকে মহীশূর—৮৬ মাইল। ট্রেণে সময় লাগে পৌনে চার ঘণ্টা। দুধারে পথের দৃশ্য চমকপ্রদ না হলেও প্রীতিকর বলা চলে। ট্রেণ থেকে বাঙ্গালোর মহীশূর রাজপথ চোখে পড়ে—সুন্দর পিচমোড়া রাস্তা—মোটর চলাচলের পক্ষে খুবই সুগম।

পথে কাবেরী নদীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। নদীগর্ভ প্রস্তর সঙ্কুল বিখ্যাত কৃষ্ণরাজসাগর ও শিবসমুদ্রম্ বাঁধের ফলে নদীতে জল চলে নিয়ন্ত্রিত ভাবে। এই নদীটী মহীশূর রাজ্যের বিদ্যুৎসম্পদের অন্যতম কেন্দ্র। কাবেরী নদীর সেতু পার হলেই শ্রীরঙ্গপত্তনম ষ্টেশন। তার পশ্চাতে মন্দির—নদীর ধারে পাহাড় কয়েকটা গুহা আছে

ঠিক সাড়ে এগারোটায় মহীশূর ষ্টেশনে নামা গেল; অভ্যর্থনার সুবন্দোবস্ত ছিল। রাজসরকার থেকে অতিথিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছিল। এমন কি মহীশূরের মহারাজের বিখ্যাত অতিথি ভবন—ললিতামহল—যা সেকালে রাজপ্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত হ'ত—বাঙ্গলার সংসদের কার্য্যকরী সভার সদস্যদের জন্য রক্ষিত হয়েছিল। স্থানীয় কেন্দ্রের কর্ম্মসচিব আমাদের পরিচয় নিয়ে যে ভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন জানিয়ে দিলেন। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী আমাদের দলটী তিন ভাগ হয়ে যায়। সুতরাং প্রিয় গুহ পূর্ব্বাহ্নে এসে যে ব্যবস্থা করেছিলেন আমরা তাই গ্রহণ করলাম। প্রিয় গুহ ষ্টেশনে এসেছিলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে হোটেলে চললাম। (ক্রমশঃ)

বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোস এম-এ, পি-এইচ-ডি, এফ-এন-আই

(পূর্বানুবৃত্তি)

যতদিন পূর্ণাঙ্গ পারিভাষিত সংকলনগ্রন্থ রচিত না হইতেছে, ততদিন ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কেই পারিভাষিক শব্দগুলির ব্যবহারে অনেকটা স্বাধীনতা দিতে হইবে। ইহাতে ইংরাজি ও বাংলার মিশ্রণে ভাষার কিঞ্চিৎ মর্য্যাদা হানি হইলেও ভবিষ্যতের কার্য অনেকখানি অগ্রসর হইয়া যাইবে।

প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক মহকুমায় (subdivision) অন্ততঃ একটি বিদ্যায়তন (College) হইবে। এইরূপ বিদ্যায়তন স্থাপনে বিলম্ব করা কর্তব্য নহে। অনতিবিলম্বে মহকুমার কর্তাকে সভাপতি করিয়া একটি সমিতি বা মণ্ডলী গঠন করিয়া কার্যারম্ভ করা কর্তব্য। প্রাথমিক সাহায্য সরকার করিবেন। পরে, ক্রমশ জনসাধারণ বিদ্যায়তনের অনেকখানি ভার লইবেন।

কোন মহকুমার অধিবাসী ছাত্রেরা যাহাতে বিশেষ কারণ ব্যতীত স্থানীয় বিদ্যায়তন ছাড়িয়া কলিকাতায় না আসে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন ছাত্র যে সকল বিষয় পড়িতে চায়, সেই সকল বিষয় পড়িবার ব্যবস্থা স্থানীয় বিদ্যায়তনে থাকিলে, সাধারণত সেই ছাত্রকে কলিকাতায় আসিতে বাধা দিতে হইবে।

কলিকাতায় ছাত্রসমাগম যাহাতে হ্রাস পায়, তাহার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

মফস্বলে বিদ্যায়তন স্থাপন করিতে এবং অট্টালিকা নির্মাণ করিতে যথেষ্ট অর্থের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে নির্মিত কাঁচা বা পাকা ভিত্তির উপর টালি বা অ্যাসবেসটসের ছাদবিশিষ্ট গৃহে কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে এই বিষয়গুলি অধ্যাপনা করিতে হইবে—বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং সহজ বিজ্ঞান।

এগার হইতে পনর, বা বার হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত এই স্তরের শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

ক্রীড়ানৈপুণ্য, সামরিক ব্যায়াম, হিন্দী ভাষা, প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় (optional) রূপে পরিগণিত হইতে পারে। তবে আবশ্যিক বিষয়গুলি

যাহাতে খুব ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে।

একত্রে অল্পসংখ্যক ছাত্র লইয়া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একত্র সমবেত ছাত্রের সংখ্যা যত বেশি হইবে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ততই ব্যাহত হইবে।

ঐচ্ছিক বিষয়ের সংখ্যা বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রাক্ (matric) পরীক্ষায় এইরূপ সংখ্যা (mark) দেওয়া যাইতে পারে:—বাংলা, ১৫০; সংস্কৃত, ১০০; ইংরাজি, ১০০; গণিত ১৫০; ইতিহাস ও ভূগোল, ১০০; সহজ বিজ্ঞান, ১০০।

বিষয়গুলির শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃত শিক্ষা ও শিক্ষার গভীরতার দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। কোন বিষয়েই ছাত্রের বয়সোচিত বুদ্ধি ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত ভার চাপান কর্তব্য নয়। তবে যেটুকু পড়াইতে হইবে, তাহার মধ্যে যেন ফাঁকি না থাকে। ফাঁকি দিয়া জগতের অন্য সব কাজই হাসিল করা যায়, কিন্তু জ্ঞানলাভ হয় না।

পাঠ্য পুস্তকগুলির আকার ছোট করিতে হইবে। কোন বিষয়ের পরীক্ষায় যত মার্ক আছে, অবশ্যপাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা তাহার দ্বিগুণের বেশি কখনও হওয়া উচিত নয়। শুধু ব্যাকরণ ও গণিতের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে।

যতগুলি পৃষ্ঠা পাঠ্য পুস্তকে থাকিবে এবং পড়ান হইবে, তাহা যেন ছাত্রদের সম্পূর্ণরূপে ও সুষ্ঠুরূপে অধিগত হয়।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এমন হইবে, যাহাতে শুধু কণ্ঠস্থ বিদ্যা দ্বারা তাহার সম্যক উত্তর দেওয়া সম্ভব না হয়।

পরীক্ষার জন্য একত্র সমবেত ছাত্রের সংখ্যা কখনও খুব বেশি হইবে না। ছাত্র সংখ্যা যত বেশি হইবে, পরীক্ষা গ্রহণে ততই বেশি বিশৃঙ্খলা হইবে এবং দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব হইবে।

ব্যাকরণশিক্ষা ব্যতীত ভাষা শিক্ষা করা যায় না, একথা মনে রাখিতে হইবে। Rapid Reading—জাতীয় অর্থহীন প্রচেষ্টায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। ব্যাকরণ শিক্ষায় শৈথিল্য করিলে চলিবে না। ব্যাকরণহীন শিক্ষা দ্বারা, 'পানি লে আও', 'প্যাক্ ইউ' ধরণের কথাভাষা কথঞ্চিৎ আয়ত্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ভাষাজ্ঞান জন্মে না। ব্যাকরণহীন ভাষা চরিত্রহীন মানুষের মতই হেয়।

এই স্তরের শিক্ষা দিবার জন্য কোন বিশেষ প্রকারের বাহ্যশিক্ষা বা training অপরিহার্য নয়। প্রত্যেকটি মানুষ যেমন জন্মাবধিই শিক্ষার্থী, তেমনি প্রত্যেকটি মানুষ জন্মাবধিই শিক্ষক। প্রতি গৃহেই বিশেষ training না পাইয়াও ভ্রাতা ভগিনীরা ছোটদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকে। শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত থাকিলে, শিক্ষাকার্যে ইচ্ছা থাকিলে এবং উপযুক্ত বেতন পাইলে অধিকাংশ শিক্ষকই শিক্ষাকার্যে সফলতা ও দক্ষতা দেখাইতে পারেন। বিশেষ প্রকারের training একেবারেই অনাবশ্যক তাহা নহে, তবে ইহা আপাতত অপরিহার্য নয় এবং এই training অভাবে শিক্ষা কার্য বিলম্বিত বা ব্যাহত হওয়া কর্তব্য নয়। আমাদের আর্থিক অবস্থা আরো ভাল না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বিশেষ বিশেষ trainingএর জন্য অর্থব্যয় সঙ্কুচিত হইলে ক্ষতি হইবে না।

বৎসর বৎসর পাঠ্য পুস্তকের অত্যধিক পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। শুধু আর্থিক ক্ষতির কথা নহে, এরূপ পরিবর্তন শিশুর ধারণা ও স্মৃতিশক্তি অতিশয় ব্যাহত করে। একখানি ব্যাকরণ বা একখানি গণিতের পুস্তক বহুদিন ধরিয়া নিয়মিত পাঠ করিলে পুস্তকের ভাব ও ভাষা শিশুর মনে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং স্মরণ রাখিতে সহজ হয়। ঘন ঘন পরিবর্তনে মনের মধ্যে সঞ্চিত ধারণা ও চিত্রগুলি মুছিয়া যায়, আবার নূতন করিয়া নূতন ভাষায় নূতন পুস্তকে মনোনিবেশ করিতে হয়। ইহা শিক্ষালাভের অতীব পরিপন্থী।

বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনার জন্য একটি 'বোর্ড' থাকিবে। এই বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বাধীনভাবে কাজ করিবে। তবে পাঠ্যাদিনির্বাচন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা থাকিবে।

এই প্রদেশে যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় হইবে, বোর্ডের সংখ্যাও ততগুলি হইবে। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় হইলে, প্রত্যেকটির একটি করিয়া বোর্ড হইবে।

এই সকল বোর্ডের অধীনে সাধারণ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় ব্যতীত বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। কর্মকারের কাজ, সূত্রধরের কাজ, দর্জির কাজ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার কাজ শিক্ষার জন্য বিবিধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সম্ভব হইলে এক একটি বিদ্যালয়েই বিবিধ প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই সকল বিদ্যালয়ের সহিত বিবিধ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা থাকিবে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন এইরূপ হইলে ভাল হয়—প্রধান শিক্ষক ৩০০ হইতে ৫০০ টাকা; সহযোগী প্রধান শিক্ষক ২০০ হইতে ২৫০ টাকা, অন্যান্য শিক্ষক, ১২৫ হইতে ২৫০ টাকা।

কোন শিক্ষক একটির বেশি গৃহশিক্ষকতা করিতে পারিবেন না।

প্রত্যেক জেলায় অন্তত একটি সম্পূর্ণ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থাকিবে।

যে গ্রামে বা সহরে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ৫০০ ছাত্র পাইবার সম্ভাবনা আছে, সেখানেই অবিলম্বে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কোন একটি বিদ্যালয়ে ৫০০ ছাত্রের বেশি না থাকিলেই ভাল হয়।

প্রত্যেক বিদ্যালয়কে সরকার সাহায্য দিবেন। সরকারী সাহায্য নাই, এরূপ কোন বিদ্যালয় থাকিতে পারিবে না।

উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সহিত মধ্য ও নিম্ন স্তর দুইটি সংযুক্ত থাকিবে। ৭।৮ বৎসর বয়স হইতে ১১।১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত মধ্য স্তরের শিক্ষাকাল ধরা যাইতে পারে।

এই মধ্য স্তরের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি উচ্চ স্তরের মতই হইবে। তবে ইহার মাত্রা ও পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প ও লঘু হইবে।

এই স্তরের শিক্ষকগণের বেতন ১২৫ টাকা হইতে ১৫০ টাকা হইবে।

যদি কোন স্থানে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সেখানে মধ্য বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে।

মধ্য বিদ্যালয়ের সহিত নিম্নস্তর সংযুক্ত থাকিবে।

যদি কোন গ্রামে বা নগরের কোন পল্লীতে উচ্চ বা মধ্য বিদ্যালয়

স্থাপন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, সেখানে নিম্ন বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে।

বাংলার কোন স্থানই এমন থাকিবে না, যেখানে উচ্চ, মধ্য বা নিম্ন, কোন প্রকারের বিদ্যালয়ই নাই।

নিম্নস্তরের শিক্ষা সর্বসাধারণের উপযোগী ন্যূনতম শিক্ষা বলিয়া মনে করিতে হইবে।

৫ বৎসর হইতে ৭।৮ বৎসর পর্যন্ত এই স্তরের শিক্ষা চলিবে।

এই স্তরের শিক্ষণীয় বিষয় এইরূপ হইবে—বাংলা ভাষা শিক্ষা আরম্ভ, হস্তলিপি, পাটিগণিত, ইতিহাস ও ভূগোল, দৈনন্দিন জীবনযাপনের স্বাস্থ্য ও নীতিসম্মত বিধি ও অভ্যাস।

বাংলা ভাষায় বর্ণপরিচয়ের পর সাধারণ রীতি অনুযায়ী সহজ গদ্য ও পদ্যের বই। ব্যাকরণের লিঙ্গাদি বিষয়ে সামান্য ইঙ্গিত।

পাটিগণিত আধুনিক ধরণে পড়িলেই হইবে। ধারাপাতের চিহ্নাবলী ব্যবহারের আবশ্যকতা নাই। আধুনিক যুগের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি এত বেশি প্রসারলাভ করিয়াছে, যে অনাবশ্যক সময় ব্যয় একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। ধারাপাতের বিবিধ চিহ্নাবলী ও তাহার ব্যবহার শিখিতে শিশুদের বহু সময় ব্যয়িত হয়। একই চিহ্ন বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া শিশুদের পক্ষে ঐগুলি সম্যক অভ্যাস করা খুব কঠিন। কাজ ক্ষেত্রেও ধারাপাতের এবং শুভঙ্করীর নিয়মগুলি পাটিগণিতের ঐকিক নিয়ম ও ত্রৈরাশিকের কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। ঐগুলির ব্যবহারও অতি সীমাবদ্ধ। সুতরাং ধারাপাত ও শুভঙ্করী একেবারে বাদ দিয়া প্রথম হইতেই শতকিয়া শিখিয়া, তারপর নামতা এবং তারপর যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি শেখানো যাইতে পারে। মিশ্র রাশিগুলিকে টাকা ৩।০১০, মণ ৩।৫৫/০ ইত্যাদি না লিখিয়া সোজাসুজি টা ৩.৭-০, মণ ৩.৩৫ ২, ইত্যাদি লিখিলেই চলিতে পারে। এইরূপ লেখাই বর্তমান যুগের উপযোগী।

ইতিহাস ও ভূগোল সাধারণ ভাবে ও সহজ ভাবে পড়াইতে হইবে। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িলেই চলিবে। সমগ্র পৃথিবীর সাধারণ ভূগোল সর্বাগ্রে পড়িতে হইবে। ইহা এমনভাবে পড়াইতে হইবে যে সমগ্র পৃথিবীর সাধারণ বৈচিত্র্যগুলি, যেমন দেশ, নদী, পর্বত, প্রধান নগর প্রভৃতির নাম ও অবস্থানগুলি মনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়।

নৈতিক ও স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় শিক্ষা শুধু পুস্তকের সাহায্যে দান করা সম্ভব ও সমীচীন নয়। সন্তান পালনের ন্যায় উহা ব্যক্তিগত উপদেশ, সাহচর্য ও নিয়ম পালনের সাহায্যে শিক্ষণীয়। এইজন্য নিম্নস্তরের শিক্ষকের দায়িত্ব এক হিসাবে উচ্চতর স্তরের শিক্ষক অপেক্ষা বেশি। তাহাকে অনেকটা পিতামাতার স্থান গ্রহণ করিতে হইবে।

নিম্নস্তরের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীগণের বেতন ৭৫ হইতে ১২৫ টাকা হইবে। ইঁহারা সুযোগ পাইলে একটি বা দুইটি গৃহশিক্ষকতার কাজ করিতে পারিবেন। দরিদ্র অথচ ভদ্রভাবে বাস করিবার অধিকার ও সামর্থ্য ইহাদিগকে দিতে হইবে।

নিম্নস্তরের শিক্ষাদান সম্পর্কে নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে বহু প্রকার থিওরী, স্কীম, আদর্শ প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছে। বহু দেশে বহু প্রকার বিদ্যালয় এই সকল থিওরী অনুসারে পরিচালিত হইতেছে। এই সকল উচ্চাদর্শে শিক্ষিত করিবার জন্য পিতামাতাকে এবং সরকারকে বহু অর্থব্যয় করিতে হইতেছে।

এই সকল থিওরী ও আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময়ে আমাদিগকে প্রথমেই আমাদের দেশের প্রকৃত ভৌগোলিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা ও পরিস্থিতির কথা মনে রাখিতে হইবে। শুধু ধনী দেশসমূহের আধুনিকতম মতবাদসমূহের চাকচিক্যে ভুলিয়া সময়াতিপাত করা বা বড় বড় স্কীম প্রস্তুত করা আপাতত সমীচীন হইবে না।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঁচ সের ওজনের ঝিঙা উৎপন্ন করিবার কাজটি অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে ঐরূপ প্রচেষ্টায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি উদ্ভিদগবেষণাগার স্থাপন করা অপেক্ষা নিতাই ও রামলালকে কলিকাতার উপকণ্ঠে একগণ্ডা জমির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাতে আধ সের বা এক পোয়া ওজনের ঝিঙা উৎপাদনের চেষ্টা করিলে দেশের উপকার বেশি হইবে। আমাদের ছেলেমেয়েকে প্রত্যহ ডাক্তারি পুস্তকে বিবৃত সারবস্তুসমন্বিত খাদ্যতালিকা অনুযায়ী বিবিধ ভোজ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলে তো ভালই হইত। কিন্তু আপাতত চেষ্টা চরিত্র করিয়া ডাল, ভাত, মাছের ঝোল, দুধ ও কিঞ্চিৎ ঘৃতাদির ব্যবস্থা করিতে পারিলেও পরম সন্তোষলাভ করা উচিত। ফারপোর কেক বা নিউজিল্যাণ্ডের টিনে ভরা সামনের জন্য অর্থব্যয় করিবার চিন্তা মনে না আনাই শ্রেয়।

বালশিক্ষার সম্পর্কেও অনেকের মনে একটা অতি আধুনিকতার মোহ আসিয়াছে। নানাপ্রকার থিওরী লইয়া অনেকে একটু বেশি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

শিশুকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাই মূল কথা। উদাহরণরূপে ইতিহাসের কথাই ধরা যাক। যে শিক্ষক নিজে ইতিহাস ভাল জানেন এবং পড়াইবার ইচ্ছা পোষণ করেন, তিনি শিশুকে ইতিহাস পড়াইতে নিশ্চয়ই পারিবেন। শিশু গাছতলায় বসিয়া পড়িবে, বা বারান্দায় বসিয়া পড়িবে, বা ঘরে বসিয়া পড়িবে, শতরঞ্চিতে বসিবে অথবা বেঞ্চতে বসিবে, উচ্চৈঃস্বরে পড়িবে বা নিম্নস্বরে পড়িবে, একসঙ্গে দুইজন পড়িবে বা তিনজন পড়িবে, ইতিহাসের বইতে ছবি থাকিবে কি না, থাকিলে সেগুলি একরঙা হইবে বা তিনরঙা হইবে, প্রভৃতি বিষয় প্রয়োজনীয় হইলেও, এই ধরণের বিষয়গুলি শিক্ষা করিবার জন্য দেশে বা বিদেশে অর্থব্যয় করিয়া বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত করিবার উৎসাহ আপাতত কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিলে ক্ষতি হইবে না।

পোলাও, কালিয়া, কেক, পুডিংএর উপাদেয়তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। থার্মোমিটার দ্বারা জলের তাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া শিশুকে স্নান করান বা ষ্টপ-ওয়াচ সাহায্যে ডিম সিদ্ধ করা অতীব হিতকারী বৈজ্ঞানিক পন্থা। কিন্তু যাহাদের দুই বেলা মোটা চাউলের ভাত ও মাছের ঝোলের সংস্থান এখনও হয় নাই, যাহাদের পিতামাতাকে অহর্নিশি কঠিন

পরিশ্রম করিয়া কোনপ্রকারে গৃহস্থালী সচল রাখিতে হয়, তাহাদের জন্য উপরোক্ত প্রকার বিলাসিতার আয়োজন আপাতত কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা অন্যায় হইবে না। শরীরের পক্ষে ভোজন ও ভোজনবিলাসে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি মনের পক্ষেও শিক্ষা ও শিক্ষা-বিলাসে একটা পার্থক্য আছে।

শিক্ষাদানের সহিত কিছু আনন্দদানের ব্যবস্থা অপ্রাসঙ্গিক নহে। কিন্তু মূলত শিক্ষা একটি সাধনা, একটি তপস্যা। বহু শ্রম, বহু ক্লেশ, বহু কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা শিক্ষালাভ করিতে হয়। উৎসাহবর্ধনের জন্য কিঞ্চিৎ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিবিধ প্রকার আমোদ-প্রমোদ এবং কলাচর্চার আধিক্য শিক্ষাসাধনার অনুকূল নহে। শিশুর পক্ষে দুষ্পাচ্যতা নিবারণের জন্য দুগ্ধে কিছু জল মিশ্রণ আবশ্যক হইলেও দুগ্ধ ও জল এক পদার্থ নহে। অত্যধিক জলমিশ্রণে দুগ্ধত্ব বিনষ্ট হয়। আনন্দের ভিতর দিয়া শিক্ষাদান ব্যাপারটি মূলত একটি শিক্ষা-বিলাস। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োজন হইলেও সাধারণত উহা নিতান্ত লঘুচিত্ততারই প্রশ্রয় দিয়া থাকে। রঙ্গমঞ্চের উপর তরুণ তরুণীর বিবিধ ভঙ্গীর ত্রিকোণ নৃত্যের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করিয়া ত্রিকোণমিতি শিক্ষা দেওয়া যায় না। অ, আ, ক, খ, শিখিতে বহু কাগজ, বহু পেন্সিল, বহু কলম, বহু কালি, বহু অনুনয় বিনয়, বহু ভর্ৎসনা আবশ্যক। অজগর তেড়ে আসিবার ছবি একান্ত অপরিহার্য নয়। ছাত্রসমাজের মনে যে লঘুচিত্ততার ঘুণ ধরিয়াছে এবং যাহার ফলে সাধারণ পরীক্ষায়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নপ্রকার প্রতিযোগিতায় ইহারা ক্রমশ পশ্চাৎপদ হইতেছে, তাহার প্রশ্রয় দিলে পরিণাম শুভ হইবে না।

বিদ্যালয়ের নিম্নস্তরে বালক ও বালিকারা একসঙ্গে পড়িতে পারে।

বিদ্যালয়ের মধ্যস্তরে ও উচ্চস্তরে এবং বিদ্যায়তনে (College) বালক ও বালিকারা একত্র পড়িবে না। এই স্তর গুলিতে পড়িবার সময়ে বালক বালিকাদিগের যে বয়স, সে বয়সে তাহাদের একত্র ঘনিষ্ঠতা আমাদের সামাজিক নীতিবোধের পক্ষে বিশেষ বাঞ্ছনীয় নয়। পাশ্চাত্যদেশে যুবকযুবতীর নৈতিক জীবনের যে আদর্শ প্রচলিত, আমাদের দেশে সে আদর্শ এখনও গৃহীত হয় নাই, হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নহে। এই বয়সে বিদ্যালয় বা বিদ্যায়তনের গৃহে ইহাদের মনে যে চঞ্চলতার উদ্ভব হয়, তাহাতে উহাদের নৈতিক ও বুদ্ধিগত জীবনের স্বাভাবিক উন্মেষ ব্যাহত হইবার আশঙ্কা থাকে। আমাদের দেশে যে সকল বিদ্যায়তনে সহশিক্ষা প্রচলিত, আমি যতদূর জানি, সেই সকল বিদ্যায়তনের কর্তৃপক্ষ কেহই সহশিক্ষা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন।

আন্ত স্তরে (matric) শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বালক ও বালিকাদের একপ্রকার হইলেই চলিবে। শুধু বর্তমান ব্যবস্থার মত কয়েকটি ঐচ্ছিক বিষয়ের পরিবর্তনের অনুমতি থাকিবে। যেমন, গণিতের পরিবর্তে স্বাস্থ্য-বিধি ইত্যাদি। ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে রন্ধন, সীবন, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

স্নাতকোত্তর (postgraduate) স্তরে যুবক যুবতীরা একত্র অধ্যয়ন করিতে পারে। তখন ইহাদের বুদ্ধি, দায়িত্বজ্ঞান ও সংযমশক্তি বৃদ্ধি পায়, সদসদ্‌বিচারের শক্তিও বাড়ে। এই স্তরে তাহারা অনেকটা স্বাধীনভাবে অধ্যয়নাদি করিতে পারে। স্থান, কাল, পাত্র অনুকূল হইলে বিবাহাদিও সংঘটিত হইতে পারে।

সংস্কৃত ভাষা সংস্কৃত সাহিত্য, প্রাচীন ও আধুনিক যাবতীয় প্রধান প্রধান ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতীয় দর্শন, প্রাচীন ও আধুনিক উভয়মতে শিক্ষা ও প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক বিষয়গুলির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সকল বিষয়ে যাঁহারা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবেন এবং কৃতিত্ব দেখাইবেন, তাঁহাদের উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদালাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদিগকে চাল-কলা-লোভী ব্যবসায়ী পুরোহিতগণের দলে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না।

(ক্রমশ)

বরষায়

হাসিরাশি দেবী

আজি ঊর্মি উতরোল তমসা-তীরে মম তন্দ্রাবিহীন রাতি জাগি,—
দূর সীমার সঙ্কেতে তুমি কি প্রিয়তম আমারে চলিয়াছ ডাকি?
মোর ধূলি বিলুণ্ঠিত আঁচল তলে ঢাকা বর্ণবিহীন ফুলদলে,
মধু মত্ত সমীরণ গন্ধ-রেণু খুঁজি সিক্ত হয় আঁখি জলে?
মেঘ মুক্ত আলোকের স্বপ্নপথ রাঙা তোমার চরণ রেখা বহি,
বাজু রেখার পরে পরে স্মৃতির আখরে কে লিখিয়া যায় রহি রহি!

মম বরষা ব্যথাতুরা, শ্রাবণ ঘন মেঘে বিজলী ঝলসিয়া যায়,—
ভাবি, তোমার বাতায়নে এখনও অকারণে হাওয়া কি করে হায়! হায়!!
মোর উদাসী আঁখিতারা সন্ধ্যাকালে তবু তোমারে খোঁজে বারবার,
কত পথ ও প্রান্তরে নিত্য মিশে যায় চিত্তভরা তাই হাহাকার।
তবু মৌন কথা মোর ব্যথার সুরে কাঁদে শূন্য-অভিমুখী আশাতে,
চির নীরব আকুলতা ছিন্ন-করি হও—মুখর,—কণ্ঠের ভাষাতে!

মোর মর্মমন্দির রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গি মূর্ত হও হে জ্যোতি মোর,—
ওই বাহিরে আঁধিয়ার!…ঊর্মিউতরোল!! আকাশে প্রলয়েরঘনঘোর!

কোন খেদ নেই

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

ভারত স্বাধীন হয়েছে। গ্রামে গ্রামে জেগেছে নব জীবনের সাড়া। আমাদের নগণ্য অঞ্চলেও দেখা দিয়েছে উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচনা। এমন সময়ে হঠাৎ জরুরী আহ্বান এল কয়েক দিনের জন্য গ্রামে যাবার। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদর মহকুমা হাকিম, সার্কেল অফিসার এবং আরও অনেকে গ্রামে আসছেন পল্লী মংগলের নানা দিক আলোচনা করতে। সংবাদ পেয়ে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অতীতে গ্রামই ছিল ভারতের প্রাণকেন্দ্র—একে ঘিরেই দেশে গড়ে উঠেছিল শ্রী ও শান্তি। যে ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছে গ্রামে, দেশের মৃত্তিকার সংগে যার নাড়ির যোগ আছে, পল্লীর পুনরুজ্জীবন সম্ভাবনায় উৎসাহিত না হয়ে সে পারে না। কিন্তু আমি বহুদিন গ্রাম-ছাড়া—বারো বছর একটানা কলকাতায় বাস করে স্বভাবটাও গিয়েছে একদম বদলে। কল্পনালোকে পল্লী-মা আজও রাণী হয়েই আছেন। তাঁকে সে সম্মানটুকু দিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করিনে। তবে সশরীরে তাঁর দরবারে হাজির হ'তে কেমন যেন ভয় করে। সাত মাইল পথ গরুর গাড়ীতে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা। গাড়োয়ানের সংগে চাষ-আবাদ ও মামলা-মোকদ্দমার কথা বলা, বার বার গ্রামে না যাওয়ার কৈফিয়ৎ দেওয়া, একাধিক গ্রাম্য বিবাদে মধ্যস্থতা করা, সবার উপর দুরন্ত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়া—এ সব ভাবলে আর যেতে ইচ্ছা করে না।

বিকালে লেকের ধারে বেড়াবার সময়ে বন্ধু মহলে প্রসংগক্রমে গ্রামের কথা উঠল। ব্যারিস্টার সেন কলকাতার আদিবাসী। তিনি অবজ্ঞাভরে বললেন—পাগল হ'লে না কি? বালিগঞ্জের এই বেতার-মুখর সন্ধ্যা ছেড়ে কোথায় আজ পাড়াগাঁয়ে মিটিং করতে যাবে? এটর্ণি মিত্তিরের দু পুরুষ কলকাতায় বাস। তিনি বিজ্ঞের মতো বললেন—যাঁরা গ্রামে বারো মাস বাস করেন তাঁদেরই উচিত অগ্রণী হওয়া। এ সব ব্যাপারে তোমার যাবার সার্থকতা আছে কি?

ডাক্তার বন্ধুর জীবন প্রভাত কেটেছে গ্রামে। তিনি সহানুভূতির সুরে বললেন—যেতে হবে বই কি। পল্লী-সংস্কারে শহরের নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে। ব্যারিস্টার সেন সহাস্যে বললেন—ভায়া যে দেখছি 'বিজয়া'র নরেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চাও। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হবে না। যৌবন যে পশ্চিমের দিকে অনেকখানি হেলে পড়েছে।

ডাক্তার বন্ধু ঈষৎ গম্ভীরভাবে বললেন—'বিজয়া'য় শরৎবাবু নিছক প্রেমের কাহিনী রচনা করেননি, পল্লী-সংস্কারের পথও দেখিয়েছেন।

গ্রামে যাবার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তি কয়েক দিন ধ'রে মনের গহনে আনাগোনা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। ডাক্তার বন্ধুর নির্দেশ মতো কিছু প্যালুড্রিন সংগে নিয়ে গ্রামে রওনা হলাম।

দুপুরে গ্রামে পৌছে দেখলাম যাঁদের আসার কথা ছিল তাঁরা এসে গিয়েছেন। বাকী দিনটা কাটল অভ্যর্থনায়, আলোচনায়, আবেদনে। অভ্যাগতেরা যখন 'জীপ' গাড়ীতে বিদায় নিলেন তখন চারিদিকে জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। পথ-শ্রান্ত দেহ, কর্ম-ক্লান্ত মন, নিস্তব্ধ গ্রাম, নিঃশব্দ প্রহর। নিদ্রা চোখে ঘনিয়ে এল।

ভোর বেলা পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙল। মুখ ধোয়া শেষ করতেই পল্লী মংগলের অধিনায়ক দে মশাই এসে হাজির। বললেন—চল হে, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

দে মশায়ের সংগে বেরিয়ে পড়লাম। পশ্চিম পাড়া পেরিয়েই চড়কতলার মাঠ। হেমন্তের প্রভাত। উষা সবে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর শেষ অশ্রুবিন্দু শালী ধানের শিষের উপর ঝলমল করছে? গাছের মাথাগুলো মৃদু বাতাসে দুলে দুলে আলোর দেবতাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। আকন্দডাঙার প্রান্তচারিণী ক্ষীণকায়া শাখা নদী বহে চলেছে সর্পিল ভংগিমায় যতদূর দৃষ্টি যায়—যেন পল্লী মায়ের শিল্পী মেয়ে খেয়ালের ছবি এঁকে এঁকে চলেছে অস্থির

অস্তিত্বের পটে। প্রকৃতি এখানে বিজ্ঞানের বন্দিনী নয়। এর মুক্ত রূপের মাধুরী সত্যিই কাজ ভুলিয়ে দেয়।

গ্রাম পরিক্রমা ক'রে ফিরছি। বেলা আন্দাজ দশটা হবে। মল্লিক পুকুরের পাশের রাস্তায় ফকির সরকারকে দেখলাম—মাছ ধরতে যাচ্ছে—হাতে কয়েকগাছা ছিপ। চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি—প্রথম দৃষ্টিতেই চেনা যায়। শুধু চুলে একটু পাক ধরেছে, আর মুখে ফুটে উঠেছে বয়সের দু একটি চিহ্ন। দে মশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম—ফকির সরকার না?

দে মশাই বললেন—হ্যাঁ, ঠিক চিনেছ। বেশ মানুষ আমাদের ফকির। সারা জীবনটা একভাবেই কাটিয়ে দিলে।

ফকির সরকারকে দেখে অকস্মাৎ মনে এল বিস্মৃত দিনের কথা। যৌবনে ফকিরের মস্ত বাতিক ছিল মাছধরা। সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন, সদানন্দ, মুক্ত পুরুষ। সকাল থেকেই সুরু হ'ত মাছ ধরার আয়োজন—ছিপে সুতো বড়শি পরানো, টোপ তৈরি করা, চারের উপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি। দিবা-নিদ্রা ফকিরের জন্মপত্রিকা বহির্ভূত—আহারান্তে হৃষ্টচিত্তে বেরিয়ে পড়ত মাছ ধরতে—মল্লিক পুকুরে, চক্রবর্তী পুকুরে কিংবা বাসুদেবপুরের বাঁওড়ে। যেদিন মাছ পেত সেদিন ফিরত হাসিমুখে, আর বাড়ী বাড়ী মাছ পাঠিয়ে দিয়ে হ'ত আনন্দে বিভোর। যেদিন শূন্য হাতে ফিরত সেদিন ভূরি ভূরি কারণ দেখাত বিফলতার—পাড়ার ছেলেগুলোর পিছু ডাকা, পথে মাকুন্দ ভোলা চাঁড়ালের সংগে দেখা, ডাইনে শেয়াল—আরও কত কি। ভাগ্য বিড়ম্বনা বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠত ফকির। কত মজার গল্প না করত। পাঁচ সেরা রুইটা ডাঙার কাছাকাছি এসে প্রচণ্ড লাফ দিয়ে সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে গেল। আন্দাজ চার সের একটা মিরগেল ধ'রে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখেছিল—একটা প্রকাণ্ড চিল তীরবেগে উড়ে এসে ঝুড়িটা ফেলে দিলে দূরে—অমনি তড়াক ক'রে মিরগেলটা লাফিয়ে পড়ল জলে। বর্ষাকালে গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিত। ঘরে ঘরে জ্বর—দিকে দিকে নিরানন্দের আবহাওয়া। ফকিরকে কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ধরত না। বন্যার জল যখন কলকল্লোলে পল্লীর কাছে এসে পড়ত তখন ফকিরের হৃদয় নেচে উঠত ময়ূরের মতো। যেখানে জল সেখানেই মাছ। মাছ ধরার জন্য তাকে আর দূরে যেতে হবে না। ছেলেবেলায় আমার ও আমার ভাগনে ধীরেনের মাছ ধরবার ও মাছ ধরা দেখবার খুব সখ ছিল। এই সূত্রে আমরা ফকির সরকারের বাড়ী যাতায়াত করতাম। ফকির আমাদের বড় ভালবাসত—অনেক সময়ে সংগে নিয়ে যেত মৎস্য শিকারে। আমরা ছিলাম একাধারে দর্শক, সহায়ক ও প্রচারক। কত দিন দুপুরে পাঠশালা পালিয়েছি—কতবার তিরস্কৃত হয়েছি গুরুজনের ও গুরুমশাইয়ের কাছে।

দে মশাইকে বললাম—ফকির সরকারের মাছ ধরার নেশা আজও যায়নি দেখছি।

দে মশাই বললেন—যাওয়া দূরের কথা, একেবারে পেয়ে বসেছে। সময় নেই অসময় নেই, বারো মাস তিরিশ দিন সে মাছ ধ'রে বেড়ায়—কিছুতেই তার ব্যতিক্রম ঘটেনা। শীত আসছে—এখন থেকেই একটু একটু আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। এ সময়ে মাছ সহজে বড়শি গেলে না—মাছ ধরতে হলে চাই অশেষ ধৈর্য ও অধ্যবসায়। এসব গুণের অভাব নেই ফকিরের। ছেলেটা মারা যাবার পর ভাবলাম তার নেশা কেটে যাবে। ফল হ'ল উলটো—কিছুদিন যেতে না যেতেই সে নেশায় মশগুল হয়ে পড়ল। অবশ্য সংসারে শোকতাপ ভুলে থাকতে পারলেই ভাল, কিন্তু সকলে তো তা পারে না।

পটল মারা গিয়েছে! শুনে বড় ব্যথা পেলাম। পাঠশালায় পটল ছিল আমার সহপাঠী। মাছ ধরা ব্যাপারে সে ছিল বাপের বিশ্বস্ত সহচর। তার কোঁকড়া চুল, টিকলো নাক, হাসি হাসি মুখ চোখের উপর ভেসে উঠল। কালের কুহেলিকা তাকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেনি। বিপুল বিশ্বের নামহারা নির্জনে কত অজানা বনকুসুম অকালে ঝরে যায়—কে তার খবর রাখে?

দে মশাই চলে গিয়েছেন। বাড়ী এসে কোন রকমে খাওয়া দাওয়া শেষ করেছি। মধ্যাহ্নটা অস্থিরভাবে বিছানায় কাটছে। মনটা এমনই ভারাক্রান্ত যে ইচ্ছা করে রাত্রেই কলকাতা রওনা হই। আবার ভাবি, ফকির সরকারের সংগে একবার দেখা করা উচিত। শোকের পর মানুষ সান্ত্বনা চায়। প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সন্তপ্ত হৃদয় ধীরে ধীরে আবার পৃথিবীর রস গ্রহণ করতে সুরু করে। আবার মনে হয়—গিয়ে কাজ নেই; পুত্রস্থানীয়ের

আবির্ভাবে পুত্রশোক সহসা উদ্‌বেল হয়ে উঠতে পারে। পল্লীর অতিপরিচিত পরিসরের মধ্যে শোক ভোলা শক্ত। শহরে জীবিতের ঘনজনতার মধ্যে মৃতের স্থান থাকে না। সে একেবারে তলিয়ে যায় চির বিলুপ্তির অন্ধকারে। গ্রামে মৃত হারায় না—প্রকৃতির সংগে মিশে গিয়ে বিস্মৃতিকে এড়িয়ে যায়। পল্লব-মর্মর, বিহঙ্গ-কাকলী, নদী-সৈকত, বন-বীথিকা ক্ষণে ক্ষণে তার অস্তিত্বের আভাস দেয়। এসব বিবেচনা ক'রে ফকির সরকারের সম্মুখীন হতে সাহস হয় না। শেষে কর্তব্য বোধ সংকোচের বিহ্বলতাকে অতিক্রম করলে। ফকির সরকারের বাড়ীর দিকে গেলাম।

হেমন্তের বেলা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সতীশ কর্মকারের দাওয়ায় দড়ি পাকানোর ধুম। রাসমণি ময়রাণীর দোকানে মুড়ি বাতাসার খদ্দেরের ভিড়। ফকির সরকারের আঙিনা আলো ক'রে আছে গাঁদার ঝাড়। একপাশে একটা রোঁয়া-ওঠা কুকুর পড়ন্ত রোদে শুয়ে ঝিমুচ্ছে। ফকির সরকার তুলসী তলায় বিশ্রাম করছিল। এগিয়ে গিয়ে বললাম—ফকিরদা, চিনতে পারো?

চমকে উঠে ফকির সরকার বললে—আরে, এ যে ছোট খোকাবাবু! আকাশ থেকে নামলে না কি? এসো এসো। এতকাল পরে কি মনে ক'রে?

অনেক দিনের পুরানো নামটা শুনে বড় ভাল লাগল। মনে হ'ল কত আপনার লোকের কাছে এসেছি।

একখানা পিঁড়ি পেতে দিয়ে বসতে ইঙ্গিত ক'রে বললে ফকির সরকার—বাড়ীতে আমি একা। পটলের মা অগ্রদ্বীপে বোনঝির বিয়েতে গিয়েছে। পটল থাকলে কত আহ্লাদ করত। সে তো আর নাই—গত শ্রাবণ মাসে সে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে।

ফকিরের কণ্ঠ বাষ্পাকুল হয়ে উঠল। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ভয় হ'ল এইবার নয়নে নামবে বাদল—সুরু হবে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের পালা। বাপের মন—ভুলে থাকা যে অসম্ভব। ধীরে ধীরে নত মস্তকে বললাম—আমি তো কিছুই জানতাম না ফকিরদা। আজ সকালে দে মশায়ের কাছে শুনলাম। বহুদিন পরে দেশে এসে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। এই দুঃসংবাদের জন্ত একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। শুনে অবধি মনটা ভেঙে গিয়েছে—কিছুই আর ভাল লাগছে না। সত্যি কথা বলতে কি তোমার কাছে এসেছি অনেক কুণ্ঠা কাটিয়ে।

মুখ তুলে চেয়ে দেখি ইতিমধ্যে ফকির আপনাকে সামলে নিয়েছে। শান্ত স্বরে বললে—দুঃখ ক'রে কি হবে ভাই? ভগবানের সন্তান—তাঁর কোলেই ফিরে গিয়েছে। তোমার আমার কি অধিকার আছে তাকে ধ'রে রাখবার? অবধূত দাসকে মনে পড়ে? লম্বা দাড়ি ছিল, আলখাল্লা প'রে থাকত, মন্দিরা বাজিয়ে গান করত। ভারি জ্ঞানের কথা বলত—"সংসারটা খেলা ঘর—মাটির খেলা ঘর। ওকে আঁকড়াতে যেও না—দুঃখ পাবে। ভাঙা গড়া চলবেই—যে কটা দিন আছ হাসিমুখে কাটিয়ে দাও।" আমি মুখ্যু মানুষ। তোমাদের মতো লেখাপড়া শিখিনি। অবধূতের উপদেশকেই সার ভেবেছি। থাক ওসব কথা, এখন কদিন আছ বলো।

—কাল সন্ধ্যা সাতটার গাড়ীতে ফিরতে হবে। অনেক কাজ পড়ে আছে।

—কালই ফিরবে? তবে ছাই মায়া বাড়াতে আসা কেন? * * * আচ্ছা, তোমার সেই ভাগনে—ধীরেন—হ্যাঁ, ধীরেনই তো—সে এখন কোথায়?

—ধীরেনকে তোমার মনে আছে?

—আছে বই কি। একবার সে একটা বড় রুই গেঁথেছিল বড়শিতে। কিছুতেই তুলতে পারছিল না—শেষে পটলের হাতে ছিপ রেখে আমার কাছে ছুটে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। আমি গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে খেলিয়ে তুললাম। সে কী আনন্দ! মনে হচ্ছে সেদিনের কথা—এখনও চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। * * * ধীরেন করে কি?

—সে কলকাতার পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট।

—বেশ বেশ। তা তোমাদের ছেলেবেলার সখ বুঝি আর নেই?

—সময়ও নেই সুযোগও নেই। কি করি বলো?

—কেন? দিনকয়েকের জন্তে এসো না এখানে? আমি সব বন্দোবস্ত করব। ধীরেনকেও নিয়ে এসো। চোর ডাকাতকে তো ঢের শাস্তি দিয়েছে—এখন শোল বোয়ালের বেয়াদবি একটু বন্ধ করুক। * * * ভাল কথা,

একটা খবর জিজ্ঞাসা করি। কলকাতায় মাছ ধরতে গেলে নাকি টাকা খরচ করতে হয়?—লাইসেন্স নিতে হয়?

—হ্যাঁ, কর্পোরেশনের লাইসেন্স নিতে হয়।

—ও বাবা, সে তো কম হাঙ্গামা নয়। ও জায়গায় আমাদের পোষায়না। রোদে পুড়ে জলে ভিজে কষ্ট ক'রে মাছ ধরব তার জন্যে অনুমতি নিতে হবে—সেলামী দিতে হবে! কী ভয়ানক জায়গা! তবে আর তোমাদের দোষ কি?

ফকির সরকারের সংগে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মনটা হালকা হয়ে গেল। যখন বাড়ী ফিরলাম তখন প্রায় এক প্রহর রাত। বোষ্টম-পাড়ার বাঁধানো বটতলায় বাউলরা গান ধরেছে :—

"পরিণাম হরি-নাম বিনে আর গতি নাই;
যদি সম্পদে বুঝিতে নার', বিপদে বুঝিবে ভাই।"

চোখে ঘুম আসেনা। নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখি আকাশে নক্ষত্রসভার সমারোহ—অনুভব করি অলোক-সুন্দরের প্রস্ফুট প্রকাশ।

পরদিন বেলা তিনটার সময় রেল স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করলাম। শিবমন্দির পিছনে ফেলে কালীতলা ডাইনে রেখে এসে পড়লাম গ্রামের বাইরে। অবারিত মাঠ আপনাকে দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে হারিয়ে ফেলেছে দূর চক্রবালে। আকাশ গাঙের ঢেউ এসে গায়ে লাগল। প্রকৃতির কী সজীব স্পর্শ! জীবনের কী অনির্বচনীয় অনুভূতি! রায়বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখি গ্রামে ঢুকবার মুখে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ফকির সরকার—হাতে মস্ত একটা মাছ। চিৎকার ক'রে বললাম—ফকিরদা, চললাম, নমস্কার।

ফকির সরকার গাড়ী দাঁড় করালে। গাড়োয়ানের হাতে মাছটা দিয়ে আমাকে বললে—এক যুগ পরে দেশে এসেছিলে। গিন্নী ঘরে নেই। তোমাকে কিছুই খাওয়াতে পারিনি। আজ ভাবলাম দেখি যদি একটা মাছ পাই। তাই তাড়াতাড়ি দুটো ভাত মুখে দিয়ে ছিপ নিয়ে বসেছিলাম আড়পাড়ার বিলে—ঠিক পুলটার নীচে। ওখানটায় খুব মাছ। শুভ ইচ্ছে নিয়ে বেরিয়ে ছিলাম—মিলেও গেল। বেশীক্ষণ বসতে হয়নি। এ গাঁয়ের খেলারাম বারুইয়ের বরজ থেকে গোটাকতক পান ছিঁড়ে নিয়ে মুখে গুঁজে দিয়েছি—মাছ ঠিক থাকবে। তাজা কালবাউস—ভারি মিষ্টি।

একটু থেমে গাড়োয়ানকে বললে ফকির সরকার—আর দেরি ক'রোনা, হাঁকিয়ে দাও, নইলে গাড়ী ধরতে পারবেনা।

তারপর আমার দিকে ফিরে সে বললে—মনে থাকে যেন ধীরেনকে সংগে নিয়ে আসতে হবে সামনের বর্ষায় মাছ ধরার মচ্ছবে।

জংগল মোড়লের গোয়ালবাড়ীর বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় ফকির সরকার। আঁকা-বাঁকা ছায়া-ঢাকা পথে চলে গাড়ী। বেথুয়াডহরির হাট থেকে ফেরে চাষী মজুরের দল। কুঠির পাড়ার ঘাটে কলস ভ'রে বাড়ী যায় পল্লীবধূরা; পথের ধারে ক্ষণেক থমকে দাঁড়ায়; ঈষৎ ঘোমটা খুলে চঞ্চল চোখে চেয়ে দেখে কলকাতার বাবুর স্যুটকেস, হোল্ড অল, ডে-লাইট, কাঠের ফ্রেমে বসানো জলের কুঁজো। তাদের অলক-আকুল মুখমণ্ডল দীপ্ত হয়ে ওঠে কৌতুহলে।

কুবিরনগরের কনককূলে সূর্য ডোবে! বন-নীল দিগন্তে ধূসর আঁচল মেলে সন্ধ্যা নেমে আসে। শুকপুকুরের মাঠে এদিকে ওদিকে শেয়াল ডাকে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় নিশাচর বাদুড়ের ঝাঁক। দূর গ্রামের দেবালয়ে কাঁসর বাজে। গরুর গাড়ীর ছইয়ের তলায় শুয়ে শুয়ে ভাবি ফকির সরকারের কথা।

আশ্চর্য মানুষ এই ফকির সরকার। বারো বছরে দেশে বহু বিবর্তন ঘটেছে—মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, গণ-আন্দোলন, নারী-জাগরণ, রাষ্ট্র-বিপ্লব, ধর্মবিরোধ, ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস, হিন্দুস্থান পাকিস্তানকে কেন্দ্র ক'রে তুমুল উত্তেজনা। রাষ্ট্রের সীমানা হয়েছে জীবন-মরণের সীমানা—ভৌগোলিক রেখা আঁকা হয়েছে নর-নারী শিশুর তপ্ত রক্ত দিয়ে। শরণার্থীর অন্তবিহীন আগমন নির্গমনে দেশের মাটি কম্পিত, শিহরিত, মূর্ছিত—সমাজ-জীবন বিব্রত, বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। এই কল্পনাতীত পরিবর্তন বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি ফকির সরকারকে। তার জীবনধারাটি আজও বহে চলেছে সেই একই পুরাতন খাতে—যেন বাংলার চিরপরিচিত রামপ্রসাদী সুর। প্রতিবেশীর বিদ্রূপে ভ্রূক্ষেপ করেনা, গৃহিণীর গঞ্জনা গায়ে

মাখেনা, সারা দুপুর কাটায় মাছ ধরায়—আশা নিরাশার আলোছায়ায়। দিন শেষে ঘরে এসে উজাড় ক'রে বিলিয়ে দেয় সমস্ত সঞ্চয়। রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখে 'শ্যাওলা-দীঘির শীতল অতল নীরে' রুই কাতলার রাজ্য। আবার নূতন প্রাতে সুরু হয় আত্মবিস্মৃতির নব অভিযান। মানুষ শাশ্বত ভিখারী—শুধু দেবতার কাছে নয়, মানুষের কাছেও। তাই তার এত দুঃখ, এত দৈন্য, এত অতৃপ্তি। চাওয়া-পাওয়ার হিসাব রাখেনা উদারহৃদয় ফকির। তার মতো সুখী কে?

জোনাকি-জ্বালা মাঠ আর তারা-ভরা আকাশ ভাষাহীন ঔৎসুক্যে প্রতীক্ষা করছে মিলনের লগ্ন। সেই পবিত্র নির্জনতা ভংগ ক'রে হুস হুস শব্দে ছুটে চলে লালগোলা প্যাসেঞ্জার। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আমি একা। কে যেন আমার কানে কানে বলে—মূর্খ মুসাফিরের দল শান্তির আশায় বৃথাই ঘুরে বেড়ায় দেশ দেশান্তরে। শান্তি অন্তরের ধন—বাহির বিশ্বে মেলেনা তার সন্ধান। যেখানে কামনার কলুষ সেখানে ফোটেনা শান্তির শতদল। কিছুই কামনা করেনা ফকির সরকার। তাই তার কোন খেদ নেই।

কলকাতায় ফিরেছি। প্যালুড্রিনের গুণে হয়তো ম্যালেরিয়ায় ধরবেনা। যদিই বা ধরে তাতেও তেমন ক্ষতি নেই। কিন্তু অখ্যাত পল্লীর এক অবজ্ঞাত জীবন থেকে সংগ্রহ করেছি যে দুর্লভ জ্ঞান তা যদি মাথা কুটে মরে ভোগসর্বস্ব রাজধানীর পাষাণ প্রাচীরে, তবে ক্ষতি হবে অপরিসীম।

দ্বিজেন্দ্র নাট্য পরিক্রমা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(৩)

চন্দ্রগুপ্ত

সাজাহান সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আছে তাহার সবগুলিই চন্দ্রগুপ্তেও আছে। (১) এই নাটকেও নাকি ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই (২) ইহার মধ্যেও স্থান কাল ও ক্রিয়ার ঐক্য নাই (৩) ইহার মধ্যেও উপকাহিনীর প্রাচুর্য্যে মূল নাটকটি চাপা পড়িয়াছে (৪) ইহাও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন নাটকের সমষ্টি মাত্র। চাণক্য ও তাহার কন্যার কাহিনী, চন্দ্রগুপ্ত ও মৌর্য্যবংশ প্রতিষ্ঠার কাহিনী, সেল্যুকাস্ ও আন্টিগোনাসের কাহিনী এবং মলয়রাজকুমারী ছায়ার প্রেমের কাহিনী—এই চারটি পরস্পর নিরপেক্ষ কাহিনী চন্দ্রগুপ্ত নাটকে একত্র গ্রথিত করা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন (৫) এই নাটকটিরও নামকরণ ঠিক হয় নাই, ইহার নাম চন্দ্রগুপ্ত না হইয়া চাণক্য নাটক হওয়া উচিত ছিল, (৬) ইহার মধ্যেও সংলাপের কৃত্রিমতা আছে, ইত্যাদি।

শুধু তাই নয়, সাজাহান নাটকে যে সমস্ত অভিযোগ নাই এমন কতকগুলি অভিযোগ ইহার সম্বন্ধে আছে।

প্রথমতঃ ইহার মধ্যে নন্দ রাজাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার একটি দৃশ্য দেওয়া হইয়াছে। নাটকের মধ্যে ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা অত্যন্ত গ্রাম্যিক, ইহাতে সাহিত্যরসের হানি হয়। গ্রীক নাটক ও সংস্কৃত নাটকের বিচারে ভয়াবহ বা নৃশংস দৃশ্যের অবতারণা বাস্তবিকই দোষের ব্যাপার। তবে সেক্সপিয়ার প্রভৃতি অনেক নাট্যকারের উৎকৃষ্ট নাটকেও এই জাতীয় দৃশ্য আছে।

চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ হইতেছে চন্দ্রগুপ্তের সহিত হেলেনের মিলন লইয়া। শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ বলিয়াছেন "হেলেন এবং চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধটিকে ভালভাবে পরিষ্কার ও পরিস্ফুট করা হয় নাই...তাহার আত্মদান যেন হৃদয় বৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি নহে— ও যেন একটি রাজনৈতিক চাল...ছায়ার প্রেম উপেক্ষিত হইল এক গভীরতর প্রেমের খাতিরে নয়—নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরে"।

কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহাতে নাটকের ঐতিহাসিক রস ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দিগ্বিজয়ী চন্দ্রগুপ্তের জীবনে এই প্রেমটিকে মুখ্য ভাবে দেখান নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়, ভারতের একটি গৌরব—তাহার ইতিহাস আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া আত্মবিস্মৃত পরাধীন জাতির বুকে আশার সঞ্চার করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি দেখাইয়াছেন সেদিন ভারতের বীর সন্তানের পদপ্রান্তে প্রাণপ্রতিম কন্যা 'হেলেন'কে অর্ঘ্য হিসাবে উপচার দিয়া গর্ব্বোদ্ধত গ্রীক সেনাপতি কি ভাবে সন্ধি ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সার্দ্ধ দ্বি শতাব্দীর অধীনতা পীড়নে পিষ্ট হৃত-সর্ব্বস্ব মৃতকল্প আত্মবিস্মৃত জাতির নিকট হেলেনের এই আত্মদানের কাহিনী সামান্য সম্পদ নহে। ইহা সেদিন আমাদের মনে

আর একটি অবদান। তাঁহার জাহানারা, হেলেন, নূরজাহান, মহামায়া হইতে আরম্ভ করিয়া শান্তা সুশীলা পর্য্যন্ত অনেকেই বঙ্গ সাহিত্যে প্রায় নূতন; ইহারা সেই নারীরই স্বগোত্রীরা যাহারা দৃপ্ত গর্ব্বে বলিতে পারে—"পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি নহি, অবহেলা করি,

পুষিয়া রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি"।

বাংলা সাহিত্যে ও সমাজে আমরা অবলা সরলা ননীবালাজাতীয়া নারী অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু জাহানারা মহামায়াজাতীয়া নারীর অভাব আমাদের মধ্যে ছিল এবং দ্বিজেন্দ্রলাল সে অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন।

আবার যে দ্বিজেন্দ্রলাল জাহানারা নূরজাহান মহামায়া প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনিই আবার "পিয়ারার" মত প্রাণ রসে উচ্ছ্বল, দয়িত প্রেমে ভরপুর, স্নিগ্ধ পরিহাস-রসিকা প্রেয়সী নারীও সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙ্গালী নারী যদি প্রবলা না হয় তাহা হইলে হয়ত অবলা এবং "অবোলা" হয়, তাহারা বিষাদে ম্লান হইয়া যায়, দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়ে, সামান্য ভয়ে তাহাদের হাসি নিভিয়া যায়, সঙ্গীত থামিয়া যায়। কিন্তু পিয়ারা সে জাতীয়া নারী নহে; জীবনের দুঃখকে সে হাসির আঘাতে উড়াইয়া দেয় এবং আসন্ন বিপদের অবসাদকে সঙ্গীত দিয়া দূরে সরাইয়া রাখে, সেই জন্য শোকের অশ্রুবিন্দুও প্রভাত শিশিরের মত ঝল্‌মল্‌ করিয়া তাহার দুঃখকেও রমণীয় করিয়া তুলে।

নাটকে মনের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বিজেন্দ্র যে ভাবে ফুটাইয়াছেন তৎপূর্ব্বে কেহ কেহ সেরূপ পারেন নাই। শাজাহান, আওরঙ্গজেব, চাণক্য, নূরজাহান, সূর্য্যমল প্রভৃতির চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন ভাবের অন্তর্দ্বন্দ্ব আমাদের মুগ্ধ এবং অভিভূত করে।

দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান হইতেছে তাঁহার সঙ্গীত।* কিন্তু এ দিক দিয়াও তিনি উপেক্ষার অপমান সহ্য করিতেছেন, "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র"। কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করিবার জন্য যে চেষ্টা করা হইতেছে, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন প্রভৃতির সঙ্গীতের জন্য সে চেষ্টা আজও করা হয় নাই।

গিরিশ যুগের আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মভাবের প্রভাব দেশের পক্ষে একদিন হয়ত প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু একটা দৃপ্ত যুক্তিবাদ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি না থাকিলে আধুনিকতা দানা বাঁধিতে পারে না। এই আধুনিকতার আমদানীও দ্বিজেন্দ্রলালই করিয়াছেন। তাঁহার "দারা" "শক্তসিংহ" "কালীচরণ" "চাণক্য" প্রভৃতি "সংশয়শীল নাস্তিকের চরিত্র"; কিন্তু তাঁহার এই নাস্তিকগুলিও "মনুষ্যত্ব ধর্ম্মে পূত আস্তিকের গুরু" ছিল। শাস্ত্রের মহিমা স্বীকার না করিলেও মনুষ্যত্বের মহিমায় তাহারা সমুজ্জ্বল ছিল এবং "বার্ণাড্ শ" যেমন ধর্ম্ম না মানিয়াও ধার্ম্মিক এবং শাস্ত্রীয় নীতির বিরোধিতা করিয়াও আমাদের ধার্ম্মিক হইবার জন্যই পরোক্ষভাবে প্রেরণা দিয়া থাকেন, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনি নীতি-বাগীশ না হইয়াও নীতি-নিষ্ঠ এবং তাঁহার 'দারা' প্রভৃতিও তাহাদের জীবনের ব্যর্থতা ও দুঃখের ভিতর দিয়াও আমাদের নীতিপরায়ণ হইবারই প্রেরণা দেয়। তাহাদের অনেককে দেখিয়াই বলিতে ইচ্ছা করে—

"উচ্ছৃঙ্খল নহ তুমি বিমুক্ত শৃঙ্খলে
অধৃষ্য অপাপ-বিদ্ধ আপনার বলে"—

আধুনিকতার বোধ হয় ইহার চেয়ে বড় আদর্শ নাই!

আগুন নিয়ে খেলা?

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

পাঁচ-কুড়ি-এক বছর বয়স ঠাকুরদাদা অন্নদার।
এখনো তাঁর চোখের পাতায় মরণ-ঘন-অন্ধকার—
আসেনি—তাই ভাবেন বসি' ভাঙা-ঘরের বারান্দায়,
কেন ওরা যায় ছেড়ে গ্রাম—নাই কেহ মোর ডাইনে-বাঁয়।

মরণ হলে কে আমাকে 'দোহার ঘাটে' যাবে নিয়ে?
কেই বা দেবে মুখে আগুন? ভাগ্যে আমার হ'লো কিএ?
কোথায় গেল পড়শীরা সব? ডাক্‌লে কারো নাই সাড়া!
সঙ্গী আমার ঘেঁয়ো-কুকুর—দেখ্‌ছে না কেউ সেই ছাড়া।
শিউলী-মালা গলায়-দোলা, কোথায় আমার নাতিনী রে!
এখনো যে চিবিয়ে খেতে পারি আমি গুড়-চিড়ে।

আমার ক'নে হবি ব'লে, কইলি কথা কানে কানে—
তোর বিরহেই মরবো, যদি মরণ আমার চরণ টানে।
সবাই আমায় দিলি ফাঁকি, একলা দাদু কাঁদছে হায়—
মুখ যে তোদের দেখ্‌বো না আর—সেই দুঃখে বুক ফেটে যায়।
এমন আগুন জ্বালিয়ে দিল—কে আমার সোনার দেশে?
সাত পুরুষের ভিটের, জীবন চোখের জলেই কাট্‌লো শেষে!

এক ভগবান! তুই কে ব'লে—মসজিদে আর মন্দিরে?
কে শিখালো ধর্ম্ম-নামে মানুষ মারার ফন্দিরে?
আগুন নিয়ে এই খেলাতে—সবাই কেন পুড়বি হায়!
নিবিয়ে দেরে—নিবিয়ে দেরে—ঠাকুরদাদাও বাঁচ্‌তে চায়।

বার্গসঁ (১৮৫৯—১৯৪১)

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

১৮৫৯ সালে প্যারী নগরে বার্গসঁর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন ইহুদী, মাতা ফরাসী। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং পাঠ্যাবস্থায় বহু পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র-পাঠে মনোনিবেশ করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি নর্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং সেখান হইতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হইয়া দর্শনের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ১৮৮৮ সালে তাঁহার Time and Free Will এবং ১৮৯৬ সালে Matter and Memory প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ সালে তিনি নর্মাল বিদ্যালয়ের এবং ১৯০০ সালে College de Franceএর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৭ সালে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Creative Evolution প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ-প্রকাশের পরে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়। ১৯১৪ সালে পোপ তাঁহার গ্রন্থাবলীর পাঠ নিষিদ্ধ করেন। ঐ বৎসরই তিনি French Academyর সভ্য নির্ব্বাচিত হন। বার্গসঁর বক্তৃতা শুনিতে অসংখ্য লোক সমাগত হইত। তাঁহার রচনাবলীর সৌন্দর্য্য, যুক্তির পারিপাট্য এবং অসাধারণ কল্পনাশক্তির প্রভাবে তাঁহার দর্শন অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান শতাব্দীর দার্শনিকদিগের মধ্যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

গত বিশ্বযুদ্ধে হিট্‌লার ফ্রান্স অধিকার করিবার পরে, ফ্রান্সের যাবতীয় য়িহুদী অধ্যাপক হিট্‌লার-প্রতিষ্ঠিত গবর্মেণ্ট-কর্ত্তৃক পদত্যাগ করিতে আদিষ্ট হন। এই আদেশ হইতে বার্গসঁকে অব্যাহতি দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু বার্গসঁ এই অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। তিনি তাঁহার সমধর্ম্মীদিগের উপর অনুষ্ঠিত অবিচার স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়া College de Franceএর অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪১ সালে ৮২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

পাঠ্যাবস্থায় বার্গসঁ জড়বাদী ছিলেন। মানবজীবনের কোনও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন না এবং ভবিষ্যতের জন্য আশা করিবার কিছুও দেখিতে পাইতেন না। জগতে সমস্তই অন্ধ-শক্তির ক্রিয়া ও যদৃচ্ছার ফল বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার সমপাঠিগণ তাঁহাকে "নাস্তিক" বলিত। তিনি তাঁহার ক্লাশের গ্রন্থরক্ষক ছিলেন। গ্রন্থাগারে পুস্তকসকল বিশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত দেখিয়া একদিন অধ্যাপক তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, গ্রন্থরক্ষকের আত্মা তোমার এরূপ বিশৃঙ্খলা সহ্য করে কিরূপে? তখন তাঁহার সমপাঠিগণ একসঙ্গে চিৎকার করিয়া বলিয়াছিল "বার্গসঁর আত্মা নাই।"

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়া বার্গসঁ কিছুকাল Clermont-Ferrandএ অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। প্যারিসের জন-কোলাহল হইতে দূরে এইখানে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাসকালে তাঁহার মত ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যখন তিনি প্যারিসে ফিরিয়া আসেন, তখন তিনি জড়বাদের মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

নব্যদর্শনের ইতিহাস জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। জড়বাদিগণ জড়শক্তিকে জগতের মূলতত্ত্ব এবং সংবেদন, অনুভূতি, প্রত্যয় প্রভৃতি মানসিক পদার্থকে জড় হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, মনোবিজ্ঞানকে শারীর বিজ্ঞানে এবং শারীর বিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে
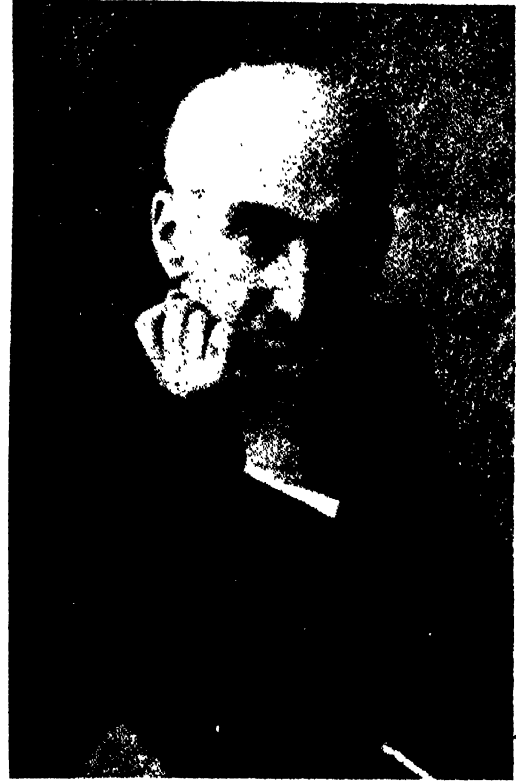
বার্গসঁ

পরিণত করিয়াছেন। জ্ঞানের বিষয় (object) হইতে গবেষণা আরম্ভ করিয়া এবং বিষয়কে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, তাঁহারা জ্ঞানকে জড়ীয় ব্যাপার এবং যান্ত্রিক নিয়মের অধীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যদিকে অধ্যাত্মবাদিগণ চিন্তা (thought) হইতে গবেষণা আরম্ভ করিয়া চিন্তার বিষয়কে মনের বিকারে পরিণত করিয়াছেন। দেকার্ত "আমি" হইতেই তাঁহার দর্শনের আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের দ্বারা নিত্য নূতন সত্য ও যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে লোকের মন

বহির্মুখী হইয়া পড়িয়াছে এবং জড়জগৎকে ঐকান্তিক ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রাণকে জড়শক্তি বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং সমস্ত মানসিক ব্যাপারকে প্রাকৃতিক ব্যাপারের উপজাত (by-product) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বার্গস জড়বাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া প্রাণকেই জগতের মূলতত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বার্গস প্রথমে হারবার্ট স্পেনসারের দর্শনের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু পরিশেষে স্পেন্সারের মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন। শত চেষ্টাতেও বৈজ্ঞানিকগণ প্রাণহীন দ্রব্য হইতে কোনও জীবন্ত বস্তুর উৎপাদনে সক্ষম হন নাই; প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের কল্পনা কোনও বাস্তবভিত্তি আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই। চিন্তার সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ অবিসংবাদিত হইলেও, সেই সম্বন্ধের প্রকৃতি কি, তাহাও তাঁহারা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। মন যদি জড়ই হয় এবং প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়া স্নায়ু-যন্ত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থার অ-বশ্য ফল-মাত্র হয়, তাহা হইলে সংবিদের দ্বারা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? হাক্সলি সংবিদকে অতিরিক্ত সমুৎপাদ (Epi-Phenomenon) অথবা উপজাত (by-product) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহা যদি সত্য হয়, তবে যাহার কোনও প্রয়োজন নাই, মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত সেই অনাবশ্যক আলোক-শিখা কেন এতদিনেও নির্ব্বাপিত হইয়া যায় নাই? জড়বাদ-মতে জগতের কোথাও স্বাধীনতা নাই। জাগতিক যাবতীয় ব্যাপারই অখণ্ডনীয় নিয়ম-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এই নিয়তিবাদ (determinism) কি স্বাধীন ইচ্ছা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত? বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত যদি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্ত-কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের মধ্যে যদি কোনও জীবন্ত এবং স্বাধীন শক্তির ক্রিয়া না থাকে, তাহা হইলে আদিম নীহারিকাকেই তাহার পরবর্ত্তী সমস্ত যুগের প্রত্যেক ঘটনার সমগ্র কারণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তাহাকেই সেক্সপিয়ারের অমর নাটকাবলীর প্রত্যেক পংক্তির একমাত্র কারণ বলিতে হইবে। মনে করিতে হইবে হ্যামলেট ও ওথেলোর প্রত্যেক উক্তি সেই অন্ধকারময় অতীতে সুদূর নক্ষত্রলোকে ঐ অপরিজ্ঞাত নীহারিকা-কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। মানবের বিশ্বাসের উপর এই দাবী নিতান্তই অত্যধিক। বাইবেলে যে সমস্ত অপ্রাকৃত ব্যাপার লিপিবদ্ধ আছে, তাহাদের অপেক্ষাও ইহা অধিকতর অবিশ্বাস্য। তবুও বর্ত্তমান অবিশ্বাসী যুগের অবিশ্বাসিগণ ইহা বিশ্বাস করিয়াছিল! বার্গস বলিয়াছেন ইহা অত্যাশ্চর্য্য!

অভিব্যক্তিবাদের সমালোচনা

হেরাক্লিটাস জগতে পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পান নাই। তিনি বলিয়াছিলেন "প্রত্যেক বস্তুই পরিবর্ত্তন।" বার্গস এই মত গ্রহণ করিয়া জগতের মূল তত্ত্বের অন্বেষণ করিয়াছিলেন। এই তত্ত্বের সন্ধানে তিনি প্রাণ-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রচলিত অভিব্যক্তিবাদ বর্জন করিয়া নূতন ভাবে অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ডারউইন এবং লা-মার্কের মতভেদ আছে। ডারুইনের মতে এক শ্রেণীর জীব হইতে অন্য শ্রেণীর (species) উদ্ভবের কারণ আকস্মিক পরিবর্ত্তন। এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে গুলি পরিবেশের উপযোগী তাহারা টিকিয়া যায় এবং সন্তানে সংক্রমিত হয়। ইহা সম্পূর্ণ যাদৃচ্ছিক ব্যাপার, ইহার মধ্যে কোনও উদ্দেশ্যের অথবা পরিচালক শক্তির ক্রিয়া নাই। কিন্তু লামার্কের মতে পরিবেশের সহিত উপযোগই (adaptation) অভিব্যক্তির নিয়ামক। পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেক শ্রেণীর জীব নূতন পরিবেশের সহিত আপনাদের উপযোগ-বিধানের চেষ্টা করে। যাহারা আবশ্যকীয় উপযোগ-বিধানে সমর্থ হয়, তাহারা টিকিয়া থাকে; যাহারা অসমর্থ হয়, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। উভয় মতের কোনটিই এই ব্যাপারের মধ্যে উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। উভয়েই অভিব্যক্তিকে যান্ত্রিক উপায়ে সংঘটিত বলিয়া গণ্য করে। বার্গস এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি উদ্ভিদও জীবের মধ্যে এমন বহু ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন, এই মত দ্বারা যাহাদের ব্যাখ্যা করা যায় না। অনেক সময় পরিবেশের মধ্যে কোনও পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও, উদ্ভিদও জন্তুদিগের মধ্যে হঠাৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়। এই পরিবর্ত্তনকে mutation বলে। এই পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা ডারুইন অথবা লা-মার্কের মতে হয় না। পতঙ্গদিগের যে রূপান্তর ঘটে, তাহাও এই মত-দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

পরিবেশের সহিত উপযোগ-বিধানই যদি অভিব্যক্তির নিয়ামক হইত, তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই অভিব্যক্তির গতি স্তম্ভিত হইয়া যাইত। জীব-জগতের উচ্চস্তরে অবস্থিত প্রাণী যে ভাবে আপনাকে রক্ষা করিয়া টিকিয়া আছে, নিম্নস্তরে অবস্থিত প্রাণীও তদ্রূপ। সুতরাং বলিতে হয়, উভয়েই স্বকীয় পরিবেশের সহিত তুল্যরূপে উপযোগ-বিধান করিতে সক্ষম হইয়াছে। তবুও অভিব্যক্তির গতি অব্যাহত রহিয়াছে কেন? তবুও উপযোগ-বিধানে কৃতকার্য্য হইবার পরেও, প্রাণ কেন আপনাকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া ক্রমশঃ অধিকতর বিপন্মুখী করিয়া ফেলিয়াছে? কেন তাহার গতির নিবৃত্তি হয় নাই? ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না, যে প্রাণের মধ্যে এমন এক প্রেরণা (impulse) আছে, যাহার লক্ষ্য ক্রমশঃ অধিকতর কার্য্যকারিতা-লাভ, এবং সেই লক্ষ্যাভিমুখী হইয়া প্রাণ ক্রমাগত অধিকতর বিপদের সম্মুখীন হইতেছে? এই প্রেরণাকে বার্গস Elan vital (জীবনী প্রেরণা) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রেরণা প্রাণে অনুস্যূত, ইহা দ্বারাই প্রাণ চালিত হয়; প্রকৃত পক্ষে Elan vitalই প্রাণ। ইহাই অভিব্যক্তির চালক শক্তি। ইহাকে স্বীকার না করিলে অভিব্যক্তি কেন হয় এবং কি প্রকারে হয়, তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না। অভিব্যক্তি যে সকল বক্র পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়, উপযোগ-দ্বারা তাহাদের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু পথ বক্র হইলেও মোটামুটি যে দিকে অভিব্যক্তি অগ্রসর হয়, তাহারও যেমন ব্যাখ্যা করা যায় না, তেমনি অভিব্যক্তি আদবেই কেন অগ্রসর হয়, তাহারও ব্যাখ্যা করা যায় না। এই বিশ্ব এক জীবনীশক্তির সৃষ্টি ও প্রকাশিত রূপ এবং অনবরত পরিবর্ত্তিত হইয়া বিকশিত হওয়াই এই শক্তির স্বরূপ, ইহা স্বীকার না করিলে প্রাণ-বিজ্ঞানের বহু তথ্যের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না।

জড় ও চৈতন্য

মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াও বার্গস ঐ একই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। "সমবর্ত্তিতা বাদ" (Parallelist Theory) অনুসারে, দেহে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, সংবিদে তাহাদের অনুরূপ পরিবর্ত্তনের উদ্ভব হয়। দেহ ও মনের মধ্যে পরিপূর্ণ সমবর্ত্তিতা বর্ত্তমান, তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও, ইহা সত্য যে সকল মানসিক ঘটনাই দৈহিক অবস্থার প্রতিফলন। অনেকে আবার মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে মস্তিষ্কের পরস্পর সংবদ্ধ স্নায়ু-সমষ্টিই মন। কাহারও কাহারও মতে মন একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম জড়পদার্থ ; চিত্রে দেবতাদিগের মস্তকের চতুষ্পার্শ্বের জ্যোতি-র্মণ্ডলের (halo) মত এই পদার্থও মস্তিষ্ক বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। মনের মধ্যে যাহা সংঘটিত হয় তাহা পূর্ব্বে মস্তিষ্কের মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারের ফল। মানসিক ব্যাপার সকল সময়েই সর্ব্ব-প্রকারেই জড়ীয় ব্যাপার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই মত খণ্ডনের জন্য বার্গস এমন অনেক ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার সহিত এই মতের সামঞ্জস্য নাই। পরীক্ষা-দ্বারা দেখা গিয়াছে, যে মস্তিষ্কের যে যে অংশের ক্রিয়া ব্যতীত মানসিক ক্রিয়ার উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা মস্তিষ্ক হইতে বিদূরিত করিবার পরেও মানসিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয় নাই। মানসিক ক্রিয়া যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়ারই ফল হইত, তাহা হইলে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তনে মানসিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইত। "সমবর্ত্তিতা" মতে অব-চেতন মানসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা হয় না। বার্গসঁর মতে মানসিক ক্রিয়া-কর্ত্তৃক মস্তিষ্কের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত এবং পরিপ্লাবিত হয়। মস্তিষ্ক যেমন সংবিদ্ নহে, তেমনি সচেতন মানসিক ক্রিয়ার উৎপত্তির কারণও তাহার মধ্যে নাই। মস্তিষ্ক সংবিদের করণ মাত্র (organ) ; যে বিন্দুতে চৈতন্য জড়ে প্রবেশ করে, মস্তিষ্কই সেই বিন্দু। চৈতন্য-কর্ত্তৃকই মস্তিষ্কের অভিব্যক্তি হইয়াছে, কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য। কর্ম্মের সহিত সেই সকল প্রয়োজনের সম্বন্ধ।

চৈতন্য (সংবিদ) যদি মস্তিষ্ক-নিরপেক্ষ হয় এবং স্বকীয় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই যদি কেবল মস্তিষ্কের ব্যবহার করে, তাহা হইলে চৈতন্য নিজে কি? বার্গস বলেন Elan vitalই চৈতন্য। "কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে আমাদের মধ্যে চৈতন্য মস্তিষ্কের সহিত অব্যবহিতভাবে সম্বদ্ধ। সুতরাং যে সকল জীবের মস্তিষ্ক আছে, তাহাদের চৈতন্যও আছে এবং যাহাদের মস্তিষ্ক নাই, তাহাদের চৈতন্যও নাই বলিতে হইবে। এই যুক্তির ভুল বাহির করা কঠিন নহে। আমরা যদি বলি আমাদের খাদ্য পরিপাকের সহিত পাকস্থলীর যখন অব্যবহিত সম্বন্ধ, তখন যে সকল জীবের পাকস্থলী আছে, তাহারাই কেবল পরিপাক করিতে সক্ষম। তাহা হইলে আমাদের উক্তি যেমন সত্য হইবে না, উপরোক্ত উক্তিও তেমনি সত্য নহে। পরিপাকের জন্য পাকস্থলী অপরিহার্য্য নহে, পরিপাকের জন্য পৃথক করণেরই কোনও প্রয়োজন নাই। এমিবা প্রোটোপ্লাজমের অবিভক্ত পিণ্ডমাত্র হইয়াও পরিপাক করিয়া থাকে। সত্য কথা হইতেছে এই, যে কোনও জীবদেহের জটিলতা ও পূর্ণতার পরিমাণ অনুসারে তাহার মধ্যে শ্রম বিভাগের ব্যবস্থা হয়। বিশেষ বিশেষ করণকে বিশেষ বিশেষ কাজ দেওয়া হয়, পরিপাকের কাজ পাকস্থলীতে সীমাবদ্ধ হয়।...ইহার ফলে পরিপাক শুধু পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ভাবে সমাধান হয়...। মানুষের সংবিদ যে মস্তিষ্কের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চৈতন্যের পক্ষে মস্তিষ্ক অপরিহার্য্য বলা যায় না। জীবজগতের যত নিম্নস্তরে যাওয়া যায় ততই স্নায়ু-কেন্দ্রসকল সরলতর এবং পরস্পর পৃথক হইতে দেখা যায়। অবশেষে তাহাদিগের আর চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা দেহের মধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়। তাহাদিগকে পৃথক ভাবে পাওয়া যায় না। জীবজগতের শীর্ষদেশে যদি সাতিশয় জটিল স্নায়ুকেন্দ্রের সহিত সংবিদ্ সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা হইলে স্নায়ু যন্ত্রের সহিত ইহা নিম্নতম জীবেও যে সংশ্লিষ্ট, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে স্নায়ু পদার্থ যখন অবিভক্ত জৈব দেহের মধ্যে লুপ্ত থাকে, তখনও সেখানে চৈতন্যের অস্তিত্ব থাকে—যদিও তাহা সকলশরীরে ব্যাপ্ত এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা প্রাপ্ত তবুও অস্তিত্বহীন নহে। প্রত্যেক জীবন্ত বস্তু, যে সচেতন তাহা মনে করিতে কোনও যুক্তির বাধা নাই। তত্ত্ব হিসাবে প্রাণ ও চৈতন্য সমব্যাপী" (Co-extensive)

প্রাণ প্রেরণা (Elan Vital)

Elan Vitalএর স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের সংবিদের স্বরূপ কি প্রথমে তাহার আলোচনা আবশ্যক। সংবিদ্ বলিতে মানসিক অবস্থার পারম্পর্য্য বুঝাইতে পারে। মনের প্রত্যেক অবস্থা এক একটী স্বতন্ত্র বস্তু, সূত্রে যেমন মণিগণ গাঁথা থাকে, তেমনি "আমি"-রূপসূত্রে মানসিক অবস্থা সকল গাঁথা আছে—ইহা মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই ধারণার ভুল বাহির হইয়া পড়ে। আমরা মনে করি, মনের এক অবস্থার স্থলে অবস্থান্তরের উদ্ভব হয় ; কিন্তু যতক্ষণ প্রত্যেক অবস্থা থাকে, ততক্ষণও যে তাহা স্থির নহে, তখনও যে তাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। কোনও এক নিশ্চল বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় ধরা যাক্। বস্তুটির কোনও পরিবর্ত্তন না হইতে পারে। একই স্থান হইতে বস্তুর একই দিক হইতে আমি বস্তুর দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারি। আমার দৃষ্টি-কোণেরও কোনও পরিবর্ত্তন না হইতে পারে, আলোকের মধ্যেও কোনও পরিবর্ত্তন না ঘটিতে পারে ; তবুও বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমার সেই বস্তুর যে জ্ঞান হইতেছে, তাহা তাহার পূর্ব্বমুহূর্ত্তের জ্ঞান হইতে ভিন্ন, কেননা সে জ্ঞান দীর্ঘতর কাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। ঐ জ্ঞানের সহিত আমার স্মৃতি জড়িত ; অতীতের কিয়দংশ স্মৃতি-দ্বারা বর্ত্তমানে আনীত। অতীত মুহূর্ত্তের জ্ঞান কেবলমাত্র সেই মুহূর্ত্তের জ্ঞান, কিন্তু বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের জ্ঞানের মধ্যে অতীত মুহূর্ত্তের জ্ঞানের স্মৃতি বিজড়িত। আমাদের মানসিক অবস্থা যেমন কালের পথে অগ্রসর হইতেছে, তেমনই তন্মধ্যে অনবরত সঞ্চিত কালের (accumulated duration) প্রবেশের ফলে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। বাহ্যবস্তুর জ্ঞান-সম্বন্ধে

যাহা সত্য, আমাদের কামনা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহা অধিকতর সত্য। সুতরাং বলিতে হয়, যে আমরা অবিচ্ছেদে পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছু নহি। "এমন কোনও অনুভূতি প্রত্যয় অথবা ইচ্ছা নাই, যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। যদি কোনও মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন স্তম্ভিত হয়, তাহা হইলে তাহার স্থিতিকালও স্তম্ভিত হয়, তাহার প্রবাহ রুদ্ধ হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যাহাকে আমরা একই অবস্থা বলি এবং যাহাকে বলি অবস্থান্তর, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও পার্থক্য নাই। যখন আমরা একই অবস্থায় আছি মনে করি, তখনও প্রতি পলে প্রতি অনুপলে পরিবর্ত্তিত হইতেছি; এই পরিবর্ত্তনের পরিমাণ যখন বর্দ্ধিত হইয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখনই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, মনে করি। মনের মধ্যে বহু বিভিন্ন অবস্থাশ্রেণীর অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করি। কেননা বহুবার আমাদের মনোযোগ মনের পরিবর্ত্তনের দিকে আকৃষ্ট হয়। এই জন্যই আমরা মনে করি যে এই সকল পরিবর্ত্তন-সত্ত্বেও আমরা স্বতন্ত্রভাবে অবিচ্ছেদে বর্ত্তমান থাকি (Endure)। এই সকল পরিবর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তাহাদের অনুভবকর্ত্তা এক "আমি"র আমরা কল্পনা করি এবং এই "আমি" এই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে টিকিয়া থাকে (endures) মনে করি। কিন্তু কোনও অপরিবর্ত্তমান মানসিক অবস্থার সহিত যেমন আমাদের পরিচয় নাই, তেমনি কোনও অপরিবর্ত্তমান "অহমে"র সাক্ষাৎও কখনও আমরা পাই না। পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তিত কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, কেননা এমন কোনও বস্তুই নাই, যাহা পরিবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং আমরা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া যে টিকিয়া থাকি, তাহা নহে; পরিবর্ত্তন দ্বারাই আমরা টিকিয়া থাকি। আমাদের জীবন, যাহা আমরা অনুভব করি—আমাদের জীবনের অন্তরতম সত্তা—পরিবর্ত্তন-মাত্র। যদি আমাদের বিভিন্ন অবস্থা এবং তাহাদের সংযোজনকারী এক নিশ্চল "অহম"ই আমাদের সত্তা হইত, তাহা হইলে আমাদের কোনও "স্থিতিকাল" (duration) থাকিত না। কেননা যে অহমের কোনও পরিবর্ত্তন নাই, তাহার যেমন স্থিতিকাল নাই, তেমনি যে মানসিক অবস্থা অন্য অবস্থা-কর্ত্তৃক স্থানচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহারও "স্থিতিকাল" নাই। সুতরাং পরিবর্ত্তন হইতে পৃথক কোনও "অহম্" নাই। পরিবর্ত্তন হইতে ভিন্ন এমন কোনও বস্তুই নাই, যাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আছে কেবল পরিবর্ত্তন।

মানুষ যেমন পরিবর্ত্তন মাত্র, বিশ্বও তেমনি। বিশ্ব পরিবর্ত্তন অথবা "ভবনের" অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। তাহার অন্তরালে অপরিবর্ত্তিত কোনও বস্তুই পাওয়া যায় না; মানবীয় চৈতন্যের মধ্যে যেমন অপরিবর্ত্তিত কিছুই পাওয়া যায় না। নিশ্চল অবস্থাসমূহের শ্রেণী বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা যেমন অবিচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তন প্রবাহ মাত্র, তেমনি বাহ্য জগতেও পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। যাহাকে আমরা দ্রব্য বলি, গুণের আধার বলিয়া মনে করি, তাহাও পরিবর্ত্তনের শ্রেণী মাত্র। প্রত্যেক বস্তুর বিশ্লেষণে পাওয়া যায় কেবল গতি; সেই গতিকে স্পন্দনই বলি, অথবা ইথারের তরঙ্গই বলি, অথবা ইলেক্ট্রন, অথবা অণুই (particles) বলি, এমন কোনও নিশ্চল বস্তু পাওয়া যায় না, যাহার মধ্যে এই সকল সংঘটিত হয় বলা যায়। সুতরাং বিশ্বের মধ্যেও পরিবর্ত্তন হইতে ভিন্ন পরিবর্ত্তমান বস্তুর অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ এমন কিছু নাই, যাহার সম্বন্ধে বলা যায়, যে তাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কেননা পরিবর্ত্তনেরই কেবল অস্তিত্ব আছে, বস্তু বলিয়া কিছু নাই। এই বিশ্ব পরিবর্ত্তনের অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ অথবা তরঙ্গ। অভিব্যক্তি এই প্রবাহ অথবা তরঙ্গের গতি-মাত্র। অসীম বিশ্বের মধ্যে কোনও স্থলে এক কেন্দ্র হইতে জড় জীবন ও নানা জগৎ নিঃসৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই কেন্দ্র কোনও বস্তু নহে। তাহা প্রাণের—Elan Vital-এর অফুরন্ত, আদি-অন্ত-হীন উৎপ্লাবন। এই প্রাণ অনবরত সৃষ্টি করিতে করিতে অভিব্যক্ত হইতেছে। ইহাই জগতে অনুস্যূত ও সৃষ্টিশীল তত্ত্ব। অভিব্যক্তি এই Elan Vitalএরই অভিব্যক্তি। নিত্য নূতন সৃষ্টিতেই Elan Vital অভিব্যক্ত। (ক্রমশঃ)

বিশ্ব-বাণী

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

রিক্ত পাত্র কাঙালের;—বসুন্ধরা নিয়েছে গ্রাসিয়া,
যা' কিছু সঞ্চয় ছিল ভবিষ্যৎ জীবনের লাগি'
গোপন বেদনা ক্ষত ব্যথা-ক্ষুব্ধ আঁধার নাশিয়া—
নূতন আলোর রেখা আরবার উঠিবে কি জাগি'?
বিশ্ব-বার্ত্তা ব'য়ে ব'য়ে কত যুগ-যুগান্তর চলে,
আলোর নিশানা কত পূর্ব্বপ্রান্তে চকিতে মিলায়,
মাটী গর্ভে মর্ম্মভেদী অঙ্কুরের দাবানল জ্বলে,
ইতিহাস কোনদিন চিহ্ন তার রাখেনি পাতায়।

তবু জেগে ওঠে কভু বনস্পতি আকাশ ভেদিয়া,
আপন গরিমা-দীপ্ত যৌবনের করিয়া ঘোষণা,—
বিঘ্ন-বাধা, ঝঞ্ঝা বায়ু, দুর্গমেরে চলে সে ছেদিয়া,
প্রতিভার জয়ধ্বনি দিগন্তের প্রান্তে যায় শোনা।
কলুষিত ধরণীর আর্ত্তশ্বাস উঠেছে আকাশে,
দানবের হুহুঙ্কারে বজ্রবাহু হ'য়ে আসে ক্ষীণ,—
এই মহালগনেই বিশ্ববাণী বাজুক্ আভাসে,
আসুক্ প্রলয়-বিশ্বে সুন্দরের নব-জন্মদিন॥

ওলন্দাজের দেশে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

নেদারল্যাণ্ডের রাণী কুইন উইলহেলমিনা। আমস্টারডাম সহরের মাঝে রাজ-প্রাসাদ, সহরের অন্য অংশ হ'তে নির্জন পল্লীতে বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি অনেক সময় সহরের বাহিরে নিরালায় বাগান বাড়িতে বাস করেন। আমস্টারডাম পৌঁছিবার পথে সে অনাড়ম্বর প্রাসাদ দেখেছিলাম। লোকের সঙ্গে আলাপ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইংলণ্ডের প্রজা মাত্রেই দেশের রাজাকে নিকট-আত্মীয়ের মত ভালবাসে। রাজ-পুত্র, রাজ-কুমারীদের ধনী ও নির্ধন, অনিবার্য্য একতার নিত্য বিলাসের প্রতীক বিবেচনা করে। নেদারল্যাণ্ডের রাজ্ঞীর প্রতি ওলন্দাজের প্রীতিও ঐরূপ স্পষ্ট। "আমাদের রাণী মহীয়সী"—এ উক্তি সাধারণ। তাঁর জন্মদিনে দেখলাম—সহরের সর্বত্র বৈজয়ন্তীর সমারোহ। প্রত্যেক গৃহে হলাণ্ডের তিন-রঙা জাতীয় পতাকা, রাজ্ঞীর নিশান এবং বিবিধ বর্ণের বস্ত্র শোভা। ইংলণ্ডের ফেস্টিভল অফ ব্রিটেনেও দোকানপাট পতাকাশোভিত হয়েছিল। সুখের কি দুঃখের বিষয় জানি না, সকল প্রতিষ্ঠানে এবং বহু দোকানে ভারতের তিন-রঙা পতাকা স্থান পেয়েছিল—উপনিবেশ পতাকার সঙ্গে। সর্বাধিক বিস্ময়ের ব্যাপার, দক্ষিণ আফ্রিকার দূতাবাসেও ভারতের নিশান সসম্মানে পত পত শব্দে উড়ছিল। বোধ হয় ডাঃ মালান এ সমাচার অবগত ছিল না। বলছিলাম হলাণ্ডের রাণীর কথা। তিনি ওলন্দাজের জাতীয় ভাবনা এবং স্বদেশপ্রীতি বিকাশে মানস-বিলাসের দেবীরূপে সমাদৃত।

হলাণ্ডে আমস্টারডাম ও হেগের চিত্র-সংগ্রহ-শালা ওলন্দাজের গর্বের সামগ্রী। দক্ষিণ য়ুরোপের চিত্রকলার পুনর্জন্মের সঙ্গেই উত্তর য়ুরোপে ডাচ্ ও ফ্লেমিস্ চিত্রকরদের অভিনব রূপ-সৃষ্টি শিল্পামোদীকে আনন্দ দান করেছিল। আজ হলাণ্ড ও বেলজিয়মের শাসনতন্ত্র পৃথক। কিন্তু দক্ষিণ ফ্ল্যাণ্ডার্স এবং উত্তর ফ্লেমিস্ বেলজিয়মের কৃষ্টি ও জীবনধারা এক। তাই ফ্লেমিস্ চিত্রকরদের ওলন্দাজ আপনার জন ভাবে। তাদের প্রসিদ্ধ চিত্রাবলী বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডের ন্যাশনাল গ্যালারিতে দেখেছি এবং শুনেছি যে বহু চিত্র বিচিত্রসংখ্যক ডলারের মূল্যে ক্রয় করে আমেরিকার ধনী নিজের দেশের বিভিন্ন চিত্র-শালা সুশোভিত করেছে।

বেলজিয়মের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমি ঘেন্ট ও আন্‌ভোয়ার্প সংগ্রহশালার কথা বলব। কিন্তু জনকতক জগদ্বিখ্যাত ফ্লেমিস চিত্রকরের উল্লেখ এখানে অবান্তর হবে না।

পনেরো ষোলো শতকে যখন ইটালীতে চিত্র ও ভাস্কর্য্য নব-জীবন লাভ করলে, শিল্পের বিষয়বস্তু হ'ল খৃষ্টীয় ধর্মের ইতিহাস এবং সেণ্টদের জীবনলীলা। কিন্তু মাদোনা ইটালীয় সুন্দরশ্রী কুমারীর প্রতিকৃতি। শিশু যীশুও ইটালীয়। হলাণ্ড বেলজিয়ম ঐ সময় যখন শিল্পোন্নতিতে মনোনিবেশ করলে তখন তাদের শিল্পীরা মাত্র বাইবেলে অনুসন্ধান করলে না শিল্পের বিষয়বস্তু। এরা স্বভাবের সোজা চিত্র কলার সাহায্যে পটে চিরস্থায়ী করবার উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল। কিন্তু মাদোনা বা যীশুকে পরিত্যাগ করতে পারলে না। মাতৃমূর্ত্তি হ'ল নরডীক্ নারীর অনুরূপ। আমি লণ্ডনে ফ্লেমিস ও ডাচপল্লীতে বাইবেলের আখ্যান-বস্তু আঁকা কতকগুলি চিত্র দেখেছি। রুবেনের চিত্র, ভ্যান ডীকের ভ্যান দারগীস্ট, ভ্যান বারমারের মহিলা চিত্র, ডি বিণ্টের শস্যক্ষেত্র অতি সুন্দর। ভ্যান এয়েকের ভারজিন লুভ মিউজিয়মে দেখেছি। ইটালীর বহু চিত্রকর পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাইবেল প্রসঙ্গ নিয়ে ছবি এঁকেচেন। দুই ধারার পার্থক্য বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

মা ও ছেলে

ফ্লেমিস চিত্রকরেরা সাধারণতঃ ঘেণ্ট এবং ব্রুজেসে ছবি আঁকতেন। রেনেসাঁ বা নব জীবনের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের মধ্যে প্রথমে বলতে হয় রুবেনের কথা। ভ্যান এয়েকরা (Van Eyck) দুই ভাই চিত্রজগতে প্রসিদ্ধ। এঁরা পনেরো শতকের লোক। ভ্যান দার বিদেন (Van Der Weyden) আর একজন ঐ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্পীদের কর্মক্ষেত্র হ'ল আনভোয়ার্প। ওলন্দাজ শিল্পীরাও ঐ ক্ষেত্রে এসে শিল্প সাধনা করতেন। আমস্টারডামে পবিত্র শিশু ও যীশু-জননীর এক অপূর্ব সুন্দর চিত্র আছে। শিল্প নবজীবন রস পান করেছে।

তবু "কানু ছাড়া গীত নাই" তার অনুরূপ মাদোনা ও যীশু ছাড়া ছবির আখ্যান বস্তু নাই, সেদিনের চিত্রকর এ সংস্কারের হাত এড়াতে পারেন নি। শিল্পী মৎসীস (Matsys) ছিলেন জ্যান ভ্যান এয়েইকের শিষ্য।

মৎসীসের এই মাদনা চিত্র নিবিষ্টচিত্তে দেখলেই ইতালীয় ও ডাচ-ফ্লেমিস শিল্পধারার পার্থক্য বোঝা যায়। ওলন্দাজ চিত্রকর ফ্র্যানদারস নেদারল্যাণ্ডের পারিবারিক জীবন ও গৃহসজ্জাকে চিত্রের পৃষ্ঠপট করতে চায় নিশ্চয়ই স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায়। উত্তর য়ুরোপের সুন্দরীর সোনালী রঙের কেশ, দীঘল মূর্তি এবং শ্বেতবর্ণ দেহ। লাটিনজাতীয় নারীর গোলাপী রঙ, কৃষ্ণ কেশ, উন্নত বক্ষ, গুরু নিতম্ব। উত্তর য়ুরোপ তার নারীর রূপ দক্ষিণের সুন্দর রূপ হ'তে শ্রেষ্ঠ ভাবে। তাই এই চিত্রের পটভূমিতে ওলন্দাজ ঘরের আসবাবপত্র, চিত্রিত যবনিকা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে এবং মূর্তি উত্তরের আদর্শের অনুরূপ। দক্ষিণ য়ুরোপে গাছপালা, ফল ফুল, লতাপাতা প্রচুর। কিন্তু উত্তর য়ুরোপ প্রকৃতিকে সাধ্য-সাধনা ক'রে, বহু পরিশ্রমে নিজের দেহকে ফলে ফুলে সাজায়। তাই আজিও ও দেশকে ওরা সযত্নে সবুজ করে রাখে। ওলন্দাজের দেশের তুলিপ ফুল-কমল জগদ্বিখ্যাত। মৎসিসের চিত্রে একটি জানালা খোলা, তার ভিতর দিয়ে উপবনের শোভা দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাংলা দেশের ছবিতে এ ধারা নাই। কিন্তু মোগল ও রাজপুত চিত্রে অমন পটভূমির বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। কারণও স্পষ্ট। দুর্লভের সমাদর অধিক।

শস্যক্ষেত্রে

ষোলো শতকের ডাচ ফ্লেমিস শিল্পপ্রথার সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট রুবেন্স (১৫৭৭-১৬৪০ খৃঃ অব্দ) এবং রেমব্রাণ্টের (১৬০৬-১৬৬৯) নাম। রুবেন প্রায় ৩০০ প্রসিদ্ধ চিত্র সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলি এখন য়ুরোপে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। তাঁর নিজের আঁকা ছবিও ঐ সব শিল্পশালায় বিক্ষিপ্ত। আমেরিকায় এদের সম্মান যথেষ্ট।

রুবেনের শিষ্য ভ্যান ডাইকের (১৫৯৯-১৬৪১ খৃঃঅব্দ) নাম ইংলণ্ডে বিশেষ সমাদৃত, কারণ তিনি তথায় রাজা প্রথম চার্লসের চিত্র-শিল্পী ছিলেন। তাঁর অঙ্কিত চিত্র ইংরাজ শিল্প সংগ্রহশালাগুলিতে এবং উনড্‌সার প্রভৃতি দুর্গে দেখেছি। তিনি নাইট উপাধি পেয়েছিলেন ইংলণ্ডে। রেমব্রাণ্টের বহু চিত্র আমেরিকায় বহুমূল্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজ চিত্রকর—ষ্টীন্, হুক্, ভার বরফ্, দাউ, জ্যান জেরার্ড বারমীর প্রভৃতির বহু প্রশংসা শুনলাম ওলন্দাজ মহিলাদের মুখে। এরা খাস্ ওলন্দাজ। কিন্তু সংগ্রহশালায় তাদের বিশেষ সম্পদ দেখলাম না, কারণ বহু চিত্র—মার্কিণের ধনকুবেররা আমেরিকায় স্থানান্তরিত করেছে। হেগের সংগ্রহশালায় এঁদের কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে।

অপেক্ষাকৃত অভিনবদিগের মধ্যে দেখলাম ভ্যান গঘের (Von Gogh) প্রশংসায় আধুনিক নরনারী শতমুখ। ভ্যান গঘ্ উত্তর ব্রাবণ্টে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন ইংলণ্ডে শিক্ষক ছিলেন। পরে দেশে ফেরেন। বহু কষ্ট ও বিপদের মাঝে তিনি শিল্প সাধনার মহান উচ্চাশা বর্জ্জন করেন নাই। তাঁর বিদ্রোহ ছিল ক্ল্যাশিকাল চিত্রের বিরুদ্ধে। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তিনি কলা বিদ্যায় মনোনিবেশ করেন। বাইবেল, রাজারাণী, ডিউক-ডাচেস, সুদৃশ উপবন ও সজ্জিত প্রাসাদ শিল্প-শোভার সার, এই সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত না করলে, শিল্পের শাপ ও পাশ মুক্তি অসম্ভব। উচ্চ মধ্য-শ্রেণীর লোকরাই বা চিত্রের আদর্শ হবে কেন? অর্দ্ধেক আলো অর্দ্ধেক ছায়া; কালোপটভূমি হ'তে সুসজ্জিত মানুষের শান্ত মুখ ভেসে ওঠায় তো দরিদ্রের ভাঙ্গা মন, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি এবং দৈনিকজীবনের কুরুক্ষেত্রের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই তিনি দিনের পর দিন কৃষি-ক্ষেত্রের ধারে বসে কৃষক-নারীর পরিশ্রম-ভার-নত দেহের রূপ অধ্যয়ন করতেন, কারখানা হ'তে ক্লিষ্ট, বাঁকা, মোটা বস্ত্রের সাজে সজ্জিত শ্রমিকের দেহের চিত্রে মনের ভাব ফোটাবার উপায়-ভাবতেন। তিনি গতি দেখতেন জলে, স্থলে, জীবে এবং উদ্ভিদে। তাঁর চিত্রে মতি ও গতির ভাব ফুটিয়েছে নিঃসন্দেহ।

আমরা যখন আমষ্টারডামে, তখন রেক চিত্র-সংগ্রহ-শালায় ভ্যান গঘের চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছিল। বহু প্রাচীর পত্র সে সমাচার সরবরাহ করছিল। বিদেশীকে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান দেবার মানসে বহু নরনারী সে প্রদর্শনীর উল্লেখ করলেন। তাঁদের দেশ ছেড়ে যাবার পূর্বে যেন ভ্যান গঘের চিত্র প্রদর্শনী দেখে যাই, এ-অনুরোধ বহু মুখে শুনলাম। একজন মহিলা

বল্লেন—শিল্পী বহুদিন পাগলা-গারদে ছিলেন কিন্তু তাঁর সকল কাজে অন্তরের বোধ ফোটাবার ক্ষমতা ছিল অসীম্।

পুত্রবধূ চিত্রিতা ভ্যান গঘের গুণ-মুগ্ধ। সে মোহের কারণ তাঁর রূপ-সৃষ্টি না বিচিত্র জীবন-কাহিনী? অবশ্য বহু পরিপ্রশ্নের দ্বারা তার মনোভাব বিশ্লেষণ করতে পারলাম না। ইম্প্রেসনিজম চায়-মনের পটে চিত্রের সাহায্যে একটা প্রচ্ছন্ন ভাব ফোটাতে—সংবেদনের ভাবের প্রতি এ প্রথার লক্ষ্য অধিক। ভ্যান গঘের বহু চিত্র দেখলাম—খুঁটিনাটি হাত পা পোষাক পরিচ্ছদের স্পষ্ট রেখার বালাই নাই, অথচ ছবি দেখলে বোঝা যায় চিত্রের গতিশীল আখ্যান বস্তু। কতকগুলি ছবি শ্রমিকের কষ্ট জীবনের। এক দল বেদনা-ক্লিষ্ট শ্রমিক মোটা জামা চাপা দিয়ে কারখানা হতে বাহিরে আসিছে। সত্যই গতি আছে, ভারসাম্য আছে, সহানুভূতির ভাব জাগাবার রেখা-সম্পদ প্রচুর।

মা লক্ষ্মী তুষ্ট হ'লেন না। বল্লেন—বাবা এমনভাবে গতি ও ভাব ফোটান অত্যন্ত দক্ষতার প্রয়োজন। নাইবা হ'ল এরা পরিশ্রমী।

বল্লাম—কিন্তু পুরাতন পন্থা হতে বড় পরিশ্রম এবং সূক্ষ্ম শিল্প-দৃষ্টি আবশ্যক। ভাবতো যামিনী গাঙ্গুলি মশায়ের হিমালয়ের ছবি বা তোমার মার তৈল-চিত্র। শিল্পী যদি নিজের ভাবে মসগুল হয়, সে ভাব পরের মনে জাগবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? পুরাতন শিল্পী স্পষ্ট ক'রে রূপের সূক্ষ্ম রেখা দেখিয়ে দেয়। নবীনের টেকনিক জানলে দ্রষ্টার মন জানতে পারে।

অসম্ভব। যেমন যুগে যুগে জীবন ধারার পার্থক্য থাকে, তেমনি রূপ রুচিও বিভিন্ন কালে পরিবর্তিত হয়। যাক্ এ তর্ক। কিন্তু শেষে যে রূপ সৃষ্টি দেখলাম তার সৌন্দর্য্যে চিত্রিতা দেবীর তো কথা নাই, তাঁর
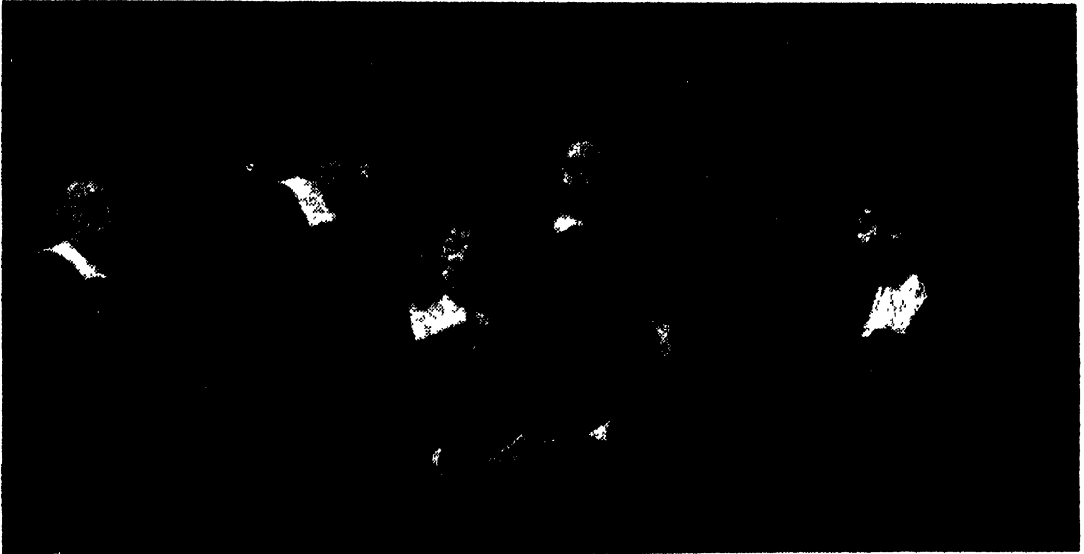
বিচারকমণ্ডলী

ইম্প্রেসনিজম্, কিউবিজম প্রভৃতি নবীন শিল্প ধারা। চিরদিন মানবজাতি প্রকৃতি ও জীবদেহের সৌন্দর্য্যকে স্মরণীয় করবার জন্য লালায়িত। আমার মনে হয় এই সংস্কার শিল্পের প্রেরণা। আদিম নর ও শিশু ছবি আঁকে। কিন্তু সাধনা অল্প তাই রূপ-সৃষ্টি প্রাণবন্ত নয়। এক কথায় কোনো শিল্প প্রবাহের সমালোচনা অবিধেয়। শিল্পের প্রথা ভাষার মত। কিন্তু সত্য গোপনও ততোধিক অন্যায়। সুতরাং যখন বল্লাম—হ্যাঁ মা তা বেশ। এ ধরণের ছবির মধ্যে অবশ্য ভ্যান গঘের সাফল্য পর্য্যাপ্ত। কিন্তু আমরা সে কালের লোক, আমাদের র‍্যাফেল, মুরিল্লো, বারনিনি বা অজন্তা যেমন ভাল লাগে, এ শ্রেণীর চিত্র বুড়ো হৃদয়কে তেমন সুখ দিতে পারে না। শিল্পী একাধারে দার্শনিক, কবি এবং চিত্রকর। এ নবীন ব্যাপারে তুলির চেয়ে ভাব প্রবণতার প্রকোপ অধিক তাই সাফল্যের দুরাশা বহুক্ষেত্রে নিরাশার জনক।

ন'বছরের কন্যা শমিতা এমন কি দু'বছরের লালীও মোহিত হল না। কতক-গুলা তার বেঁকিয়ে একটা সৃষ্টি প্রায় ৪ ফুট উঁচু—দু ফুট ব্যাস। ধূপ জ্বালা-বার ঐ রকম ছোট তারের যন্ত্র ধর্মতলার মোড়ে বিক্রী হয়। প্রধান সোপানবলীর মাথায় সেটা ঝুলছে। কিন্তু ধূপ-কাটি বা মমবাতি বসাবার খাঁজ নাই। একজন প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কি? কোট ঝোলাবার যন্ত্র! ভারি সূক্ষ্ম তার। ভার সহিবে কেন?

সে হাসি চেপে বল্লে—আমেরিকার নবীন শিল্পের নিদর্শন।

ব্যাপার কি? শুনলাম সেটা প্রকাণ্ড ওকগাছ। ভাবতে হবে তার পাতা ঝরে গেছে—তবু সে বনের রাজা।

অতখানি ভাববার মত মেধা আমার কোনো দিন ছিল না তাকে সে সমাচার দিলাম। শেষে এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রহরী বল্লে—আমি শিল্পী নই স্যার, এটা ননসেন্স।

যেহেতু আমেরিকার শিল্প তাকে না রাখলে ধন-কুবেরের জাতি অপ্রসন্ন হবে।

এই আমেরিকা-তোষণ নীতি আজ য়ুরোপের সর্বত্র দেদীপ্যমান। আমরা হল্যাণ্ডের রাজধানীতে যে সর্বাঙ্গ-সুন্দর হোটেলটিতে বাস করছিলাম তার নাম আমেরিকান হোটেল। ডলার সর্বত্র চলে। আমেরিকার সঙ্গে স্মৃতি-তোরণ স্তম্ভ, অট্টালিকা আছে মৃত মার্কিণ সেনার। আমেরিকার অর্থ-সাহায্যে হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ বহু ইমারত গাঁথছে, একথার সত্য মিথ্যা জানিনা—কিন্তু হলাণ্ড, বেলজিয়মের প্রত্যেক সহরের সহরতলী যে সৌধ-মালায় সু-সজ্জিত হ'চ্চে, স্বচক্ষে তা দেখলাম। ও দেশের ভদ্রলোকেরা বলেন, আমরা গরীব জাতি। কিন্তু লক্ষণ দেখে

'ডেলফ্‌ট'-এর দৃশ্য—হল্যাণ্ড

বাণিজ্য করবার জন্য ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম লালায়িত। সে ব্যগ্রতা এ কথা য়ুরোপ-প্রসিদ্ধ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বড় জাতের বাস-ভূমি। তারাও প্রচ্ছন্নভাবে মার্কিণের গুণগ্রাহী। প্যারিসে উইলসনের নামে রাস্তা আছে, ওয়াসিংটনের মূর্ত্তি আছে। দেশের সর্বত্র সুবৃক্ষ মনে হয় দেশ সমৃদ্ধ। তবে সে সমৃদ্ধির আশীর্বাদ মুষ্টিমেয় ধন-কুবের ভোগ করে কিনা এ কথা বলা শক্ত। কলিকাতা অবশ্য ঐশ্বর্য্যের প্রদর্শন-শালা, তবে আমাদের বুভুক্ষার জন্য বোধ হয় দায়ী-বিধাতা।

(আগামী বারে সমাপ্য)

দেবতার বর্ণ ও বাহন

শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ

অতি প্রাচীনকাল থেকে আমরা শুনে আস্‌ছি তেত্রিশ কোটি দেবতা। দেবতা সংখ্যায় ঠিক তেত্রিশ কোটি না হ'লেও নিতান্ত কম নয়। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা নাম কর্‌তে পারি—সরস্বতী, ব্রহ্মা, সাবিত্রী, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, গণেশ, ষষ্ঠী, কার্ত্তিক, মনসা, শীতলা, কালী প্রভৃতির। ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপালগণকেও দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়। আবার গ্রহরাজ সূর্য্যও দেবতা পদবাচ্য। "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ।" এই উদ্ধৃত বাক্যটী আমরা পাই নারায়ণের ধ্যানে। দেবতা শব্দের মর্মার্থ কি বলা কঠিন, কিন্তু তার প্রকৃতিগত অর্থের অনুসন্ধানে জানা যায়, যিনি ইচ্ছামত ক্রীড়াশীল তিনি দেবতা। দিব্‌-ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অন্-প্রত্যয়যোগে দেব শব্দ ব্যুৎপন্ন এবং দেবতার ব্যুৎপত্তি দেবশব্দের উত্তর স্বার্থে তা-প্রত্যয়যোগে। দিব্‌-ধাতুর অর্থ ইচ্ছা, ক্রীড়া ও গতি। অতএব যিনি স্বেচ্ছায় গতিশীল বা ক্রীড়াবিলাসী তিনি দেবতা। দেবতাগণের স্থান স্বর্গ। এই স্বর্গের লক্ষণ ঋষিগণ করেছেন, "শীতোষ্ণ বৃষ্টি তেজাংসি জায়ন্তে তানি বৈ সদা। আলয়ঃ সুকৃতানাঞ্চ স্বর্লোকঃ স উদাহৃতঃ।"

আবার অন্যত্র পাওয়া যায়, "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্। অভি-লাষোপনীতঞ্চ যৎ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥" লক্ষণ দুটির সমন্বয় করলে দেখা যায় যে, শীত, উষ্ণতা, বৃষ্টিও তেজঃ প্রকৃতি পদার্থসকল ইচ্ছামাত্র যে লোকে অনুকূল ভাবে ভোগ করা যায় এবং সেগুলি কখনও সুখ ভিন্ন দুঃখ দেয় না এবং সেই সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়—সেই লোককে স্বর্গলোক বলে। অতএব দেখা যায়, স্বর্গ ভোগের স্থান, কর্মের স্থান নয়। সে স্থানের অধি-বাসিগণের ইচ্ছা কখনও ব্যাহত হয় না। মর্ত্তবাসীদের মত তাঁদের স্থূল ইন্দ্রিয় বা গর্ভজাত শরীর নেই। তা হ'লে স্বেচ্ছামত ভোগে তাঁদের ব্যাঘাত ঘটত, ফলে দাঁড়ায়, ঈশ্বরের বা জীবের সাত্ত্বিক ভাবগুলিই দেবতা। শ্রীভগবদ্গীতায় আছে—সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ লঘুও প্রকাশক। লঘু শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম এবং প্রকাশকের অর্থ জ্যোতির্ময়। সত্ত্বগুণে লঘুত্ব এবং দীপ্তি বিদ্যমান হওয়ায় এবং সাংখ্যদর্শন মতে বুদ্ধিতত্ত্ব সত্ত্বসার থেকে নির্মিত হওয়ায় বুদ্ধির সাত্ত্বিক ভাবগুলিকেই দেবতা বলা একেবারে অসঙ্গত নয়। বুদ্ধির সাত্ত্বিক ভাবগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হ'লেও তাদের দীপ্তি ও ক্রীড়া আমরা দেখতে পাই জড়ের মধ্যে। তাই আমরা দেবতাগণকে জড়ের আবেষ্টনের মধ্যে নামিয়ে তাঁদের এক একটা রূপও আকৃতি দিয়ে আমরা সন্তুষ্ট হই। বিভিন্ন সাত্ত্বিকভাব বিভিন্ন রূপের ও গুণের সৃষ্টি করে জড়ের মধ্য দিয়ে। এই রূপ (বর্ণ) ও গুণের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। ঋষিগণ বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন বর্ণ ও গুণের নির্দেশ করে দিয়েছেন। তাঁদের বিশেষ বিশেষ বাহনের উল্লেখও আমরা বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে পাই। দেবতার বর্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্ব্বে আমাদের জানা উচিত—বর্ণ কি এবং কয়ভাগে বিভক্ত। আমরা জগতে যে বর্ণ বৈচিত্র্য দেখি, তা নির্ভর কচ্ছে সূর্য্যালোকের উপরে। সূর্য্যালোকের মোটামুটিভাবে আছে সাতটী বর্ণ। তাদের নাম বেগুনি (Violet) গাঢ় নীল (Indigo), নীল (Blue), হরিৎ (Green), পীত (Yellow), নারঙ (Orange), লোহিত (Red)। প্রবাদ আছে যে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে Newton (নিউটন) একটা Prism বা ত্রিকোণ কাচের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে সূর্য্যের আলোকে এই সাতটী বর্ণের সত্তা আমরা দেখ্‌তে পাই। এটা যে শুধু Newtonএর আবিষ্কার তা নয়, তাঁর বহু পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ সূর্য্যের নাম রেখেছিলেন সপ্তাশ্ববাহন ও সপ্তসপ্তি প্রভৃতি। সপ্তি শব্দের অর্থ "ঘোটক"। এই সপ্ত ঘোটকই সূর্য্যের উল্লিখিত সপ্তবর্ণ। বর্ণের সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার উপর নির্ভর কচ্ছে বিভিন্ন গুণও কার্য্য। সাতটী বর্ণের সমবায়ে যে শুক্লবর্ণ, তার গুণ সরলতা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা। শুক্ল শব্দের ব্যুৎপত্তি শুচ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে লক-প্রত্যয়যোগে। শুচ্ ধাতুর অর্থ পবিত্র হওয়া। সমস্ত বর্ণ হৃদয়ে ধারণ করলেও শুক্ল বর্ণের শুক্লতা বা শুদ্ধতা নষ্ট হয় না। শুক্ল বর্ণের জীবে আমরা দেখ্‌তে পাই সরলতা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য অঞ্চলের মনুষ্যগণের বর্ণ শুক্ল এবং তাঁরা সরল, সত্যবাদী ও পবিত্র। মিথ্যাচার, চৌর্য্য, প্রতারণা তাঁদের অন্তরে স্থান পায় না। শিশুর হাসির সরলতা যেন তাঁদের মুখে মাখানো রয়েছে। যখন বিপন্ন হ'লেও তাঁরা সত্য পথ ত্যাগ করেন না। শরীরের শুক্ল বর্ণ তাঁদের চরিত্রের শুক্লতারই অনুকরণ করছে। তাঁদের সত্য বাণী—যার নামান্তর ব্রহ্মবিদ্যা, তারই আজ আমরা ঘরে ঘরে পূজা করছি বাগ্‌দেবী সরস্বতীর আকারে। ঋষিগণ তাঁর রূপ দিয়েছেন শুক্ল অথবা পবিত্রতার বর্ণ। শুধু যে তিনিই শুক্লবর্ণা তা নয়, তাঁর শ্বেতপদ্মাসন, শ্বেত পুষ্পমালা, তাঁর শ্বেত বস্ত্র, শ্বেত বীণা, এমন কি তাঁর বাহন শ্বেত হংস পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর পবিত্রতা ও ব্রহ্মবিদ্যার। বাণী জ্ঞানময়ী, তাঁর জ্ঞানে মিশ্রণ বা অপবিত্রতা নেই। সে জ্ঞান নিত্যশুদ্ধ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" সত্য ব্রহ্ম এবং বিদ্যা তাঁর জ্যোতিঃ তাই বিদ্যা শুক্লবর্ণা। ব্রহ্মবিদ্যার আড়ম্বরের ঘটা নেই, তাই ব্রহ্মরূপিণী বাগ্‌দেবীর শরীরে বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখা যায় না। আমরা শুনতে পাই—সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছিল—"ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহ, জন, তপঃ সত্য" এই সপ্ত ব্যাহৃতী—সপ্ত ব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঃ ঋষি। সপ্ত ব্যাহৃতির ঋষি প্রজাপতি বা সৃষ্টিকর্ত্তা। আবার অন্যত্র শুনা যায় "তদাত্মনাপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" অর্থাৎ এই বিশ্বের মধ্যে তিনি প্রবেশ করে নাম ও রূপের সৃষ্টি করেন। নামরূপের সৃষ্টিই জগৎ সৃষ্টি, এটা আমরা বেশ বুঝতে পারি। অনন্তশায়ী মহাবিষ্ণু কর্ষিত শঙ্খ ধ্বনিতে ব্যোমপদার্থের (Ether) যে কম্পন হয়—তাতে সৃষ্ট হয় রূপও শব্দ। ব্যোমের সূক্ষ্মাংশ কম্পিত হ'য়ে সৃষ্টি করল রূপ বা আলোক এবং স্থূলাংশ হ'তে ব্যাকৃত হইয়া শব্দ বা নাম। এই শব্দ বা ব্রহ্মবাণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রূপ বৈচিত্র্যময় হ'লেও তখন ছিল শুক্ল। তাই দেবী বাণী শুক্লবর্ণা। তিনি সর্ব্বশুক্লা। তাঁর বাহন হংসও শুক্লা—হন ধাতু হ'তে হংস শব্দের ব্যুৎপত্তি। হন্ ধাতুর অর্থ হত্যা। যে অসত্য ও অজ্ঞানকে হত্যা ক'রে গ্রহণ করে সত্য ও জ্ঞান সেই হংস। প্রবাদ আছে যে হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হ'তে জল পরিত্যাগ করে দুগ্ধ গ্রহণ করে। বিদ্যারও কার্য্য অসার ত্যাগ ক'রে সার গ্রহণ করা। এই সাদৃশ্য থাকায় হংসকে বিদ্যা বা সরস্বতীর বাহন বলা একেবারে অসঙ্গত নয়। এখন আমরা দেখলাম যে ব্রহ্মার বা জীবের মুখনিঃসৃত সত্যবাণী—যা থেকে আমরা পাই সত্য জ্ঞান—তিনিই সরস্বতী। সেই সরস্বতী বা সত্যেরই পূজা যাঁরা করেন, তাঁরা সরল ও সাধু এবং সেই জন্যই তাঁরা ব্রহ্মলাভে সমর্থ।

মানবের চরিত্রের শুক্লতা শুধু যে দেহে প্রতিফলিত হয়, তা নয়। হস্ত রেখাতেও আমরা দেখতে পাই তার প্রতিবিম্ব। সামুদ্রিক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণ বলেন হস্ত রেখার শুক্লবর্ণ সূচনা করে প্রকৃতির সরলতা ও পবিত্রতার। তাঁদের অর্থাৎ শুক্লরেখ মানবগণের হৃদয়ের দৃঢ়তা না থাকায়, তাঁরা কৌশলী ও কূটনীতিজ্ঞ লোকের নিকটে প্রতারিত হন বটে, কিন্তু এই সরলতা পরিণামে তাঁদের জয়মাল্যে ভূষিত করে। শুক্ল-বর্ণের পরিচয় যতদূর সম্ভব দেওয়া হ'ল, পরে অন্যান্য বর্ণের আলোচনা করা যাবে।

(পূর্বানুসরণ)

বীণাপাণি হাসিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন, "মাঝে মাঝে একটু রাগের ভান না করলে আপনাকে কাছে পাওয়া যায় না। ভাবী যুগের চার্ব্বাকের ছবি আঁকবে ভাবীযুগের কবি। সেই কবির কাছেই নিয়ে যাব আপনাকে"

"কোথায় আছেন তিনি—"

"ভবিষ্যৎ লোকে। সেখানে তিনি যে গল্পটা লিখবেন সেইটেই আপনি দেখে আসবেন মাঝে মাঝে গিয়ে"

"বেশ"

"তুমি যে ভবিষ্যৎ লোকের কথা ভেবেছ কত দূরে সেটা"

"বেশী দূরে নয়"

"অর্থাৎ স্বৈরচরদের তখনও প্রাধান্য হয় নি?"

"না, কিন্তু অনেক কিছু হয়েছে"

"কি রকম"

"সে দেখবেন তখন"

পিতামহ হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে বীণাপাণির মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশ তাঁহার দেহ হইতে একটা স্বচ্ছ সবুজ আলো বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। সেই আলো দেখিতে দেখিতে বীণাপাণির সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল পিতামহের অন্তরোৎসারিত প্রেম যেন সবুজ আলোর রূপ ধরিয়া বীণাপাণিকে আলিঙ্গন করিতেছে। ক্রমশঃ দেবী বীণাপাণিও যেন সম্মোহিত হইয়া চিত্রাপিতবৎ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর পিতামহ বলিলেন, "সরো, একটা সত্যি কথা আমাকে বলবে?"

"কি বলুন"

"তোমার কি বিশ্বাস সত্যি আমি আছি?"

"হঠাৎ এ কথা মনে হওয়ার মানে?"

"চার্ব্বাকদের যুক্তি-টুক্তি শুনে মাঝে মাঝে আমার নিজেরই সন্দেহ হয় যে আমি বোধ হয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হয় যে ওই চার্ব্বাকদের বুদ্ধি যখন তুমিই জোগাচ্ছ, তখন তোমারও ধারণা বোধ হয় যে আমি নেই। আমরা পরস্পরকে বোধ হয় ঠকিয়ে চলেছি, আমরা কেউ বোধ হয় নেই—কিন্তু মনে করছি যে আছি"

বীণাপাণির মুখমণ্ডল এক অদ্ভুতভাবে প্রভাবিত হইল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "ওই মনে করাটাই যে থাকা। অস্তিত্বের আর কি প্রমাণ আছে বলুন—"

"তবে ওরা যে বলছে—"

"ওরা বলছে না, ওদের আমরা বলাচ্ছি, ওদের যুক্তির নিকষে আত্মপ্রকাশ করছি আমরা"

পিতামহ পুনরায় আবেগভরে বীণাপাণিকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"তোমাকে ঠকাবার জো নেই। একটু আগে ঠিক এই কথাই আমি নিজে বিশুকে বলছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল আছে দেখে খুশি হলাম। যাক আমরা আছি তাহলে! আচ্ছা শ্রীমান চার্ব্বাককে মড়ার কাছে হাজির করেছ কেন বল দেখি? অমন বিরাট দেহ মড়া পেলেই বা কোথা থেকে তুমি"

"আমি তো ওকে মড়ার কাছে নিয়ে যাই নি। ওর অবচেতন লোকের কৌতূহলই ওকে মড়ার কাছে নিয়ে গেছে। তার মনে হয়েছে মানুষই যখন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তখন সৃষ্টিকর্ত্তার কিছু খবর ওর মধ্যেই পাওয়া যাবে। এ খবর পাওয়া মাত্রই আমি ওদের অবচেতন লোকে শবদেহ শুইয়ে দিয়েছি একটা। কালকূটের অবচেতন লোকেও ঠিক ওই একই ঘটনা ঘটেছে কি না, সে-ও আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—"

"অত বড় মড়া তুমি পেলে কোথায়—"

বীণাপাণি হাসিয়া বলিলেন, "ওটি আমার প্রণয়ী দানব ক্ষিপ্রজঙ্ঘ, আমার অনুরোধে মড়া সেজে শুয়ে আছে—"

"বল কি! প্রণয়ী জোটালে কবে আবার"

বীণাপাণি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "রোজই জুটছে। অর্থাৎ আপনিই নানারূপে এসে জুটছেন আমার কাছে!"

"বাজে কথা। আমি দানব ক্ষিপ্রজঙ্ঘ হতে যাব কোন দুঃখে"

বলিয়াই পিতামহ হাসিয়া ফেলিলেন এবং বীণাপাণির থুতনি ধরিয়া বলিলেন, "কত রঙ্গই যে জান! আচ্ছা কালকূটের ব্যাপারটা কি বল তো। ও হঠাৎ ক্ষেপল কেন"

"ও প্রমাণ করতে চায় যে বর্ণমালিনী কারো চেয়ে খাটো নয়, অন্তত মেঘমালতীর চেয়ে নয়"

পিতামহ বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, "মেঘমালতী আবার কে"

"কিছুদিন আগে আপনিই তো মেঘরাগ এবং মালতী ফুলের সম্মিলনে ওই অপ্সরীটিকে সৃষ্টি করেছেন!"

পিতামহ অধিকতর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন. "হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে। কিন্তু সৃষ্টি করবামাত্রই তো ইন্দির তাকে শচী দেবীর সখী করে' নিয়েছে, মানে গ্রাস করে' বসে আছে; সে পাতালে গেল কি করে"

"আপনারই চক্রান্তে"

"আমার?"

"ভ্রমর সেজে আপনি যান নি তার কাছে?"

পিতামহের মুখমণ্ডল পুনরায় হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"তুমি কি করে' টের পেলে বল দিকি?"

"কি মুশকিল, সেই ভ্রমরের কণ্ঠে যে গান ছিল তাতে আমিই তো সুর দিয়েছি। একটা কথা কিন্তু বুঝিনি, মেঘমালতীকে পাতালে পাঠালেন কেন। আপনার মনের ভাবকে আমি সুরে গেঁথে তাকে জানালাম বটে যে 'ওগো মেঘমালতী পাতালপুরীতে প্রবালশাখায় সোনার চাঁপা ফুটে আছে তোমারি অপেক্ষায়, তুমি যাও সেখানে, তাকে তুলে এনে তোমার কবরী অলঙ্কৃত কর—কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না কেন তাকে পাতালে যেতে বলছেন—"

"কালকূটকে তাতাবার জন্যে—?"

"তাতে লাভ"

"কাব্য জমবে। মেঘমালতী শুদ্ধ ভাষায় কিন্তু বেশ ধাতানি দিয়েছিল ছোড়াকে। মনে আছে তোমার কথাগুলো—"

"আছে বই কি। কথাগুলো যে আমারই তৈরি। মেঘমালতী বলেছিল, 'আমি সেই শচীদেবীর সহচরী যিনি ইন্দ্রাণী, যিনি অনন্যা, আমি স্বর্গের অপ্সরী, আমি দেবভোগ্যা। তোমার স্পর্শ পর্য্যন্ত আমি সহ্য করতে পারব না। নাগকন্যা বর্ণমালিনীকে নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক'। আপনার মনের ভাবকেই আমি ভাষা দিয়েছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারিনি কেন আপনার মনে এ ভাব জাগছে"

"সত্যি পারনি?"

"না"

"আমি প্রত্যেকের হৃদয়ে ধাক্কা মেরে বেড়াচ্ছি কোথাও সাড়া মেলে কি না। অধিকাংশই নিঃসাড়। কালকূট, চার্ব্বাক দুজনেই কিন্তু সাড়া দিয়েছে, এইবার ওরা কি করে' দেখা যাক। তুমি বলছ—চার্ব্বাক আর কালকূট দুজনের অবচেতনলোকেই কামনা-মায়ানদী আছে, শবদেহও আছে?"

"আহা, নিজে যেন কিছু জানেন না"

"তোমার মুখ থেকে শুনলে বেশ নতুন নতুন ঠেকে। ক্ষিপ্রজঙ্ঘ তো এখন মড়া সেজে শুয়ে আছে, তারপর ওরা যখন গিয়ে খোচাখুঁচি শুরু করবে তখন ও কি করবে"

"দেখতেই পাবেন"

"দানবটিকে পাকড়ালে কোথায়"

"আপনারই খেলা-ঘরে, আপনারই প্রেরণায় সৃষ্টি করেছি ওই স্বৈরচরকে। প্রথমে ছিল ও একটি মশা, আমার কানের কাছে এসে গুণগুণ করত আর মনে মনে ভাবত—আহা আমি যদি দৈত্য হতাম একে বাহুপাশে বাঁধতে পারতাম। আপনারই মন্ত্রে দিলাম ওকে দৈত্য করে এবং নিজে হয়ে গেলাম মশা। ও তখন আমাকে ধরবার জন্যে ছুটোছুটি করতে লাগল, আর আমি ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে লাগলাম। এই সময়ে আপনি আমাকে স্মরণ করলেন চার্ব্বাক আর কালকূটের

জন্ত। ওদের অবচেতনলোকে আমি গিয়ে আবিষ্কার করলাম শবদেহ। তখন মশকরূপে ক্ষিপ্রজন্তের কানে কানে বললাম—তুমি ওদের অবচেতনলোকে গিয়ে মড়ার মতো শুয়ে থাক, তাহলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে”

“ও বাবা, এতকাণ্ড করেছ তুমি, কিচ্ছু তো জানি না”

পিতামহ বেশীক্ষণ কিন্তু ভান করিয়া থাকিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, “আমিই যে মশা সেজে তোমার কানের কাছে গুনগুন করছিলাম তা তুমি টের পেয়েছিলে ?”

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বীণাপাণি সহাস্যে উত্তর দিলেন, “না, তা কি আর পেয়েছিলাম !”

“নিজে পট করে' মশা হয়ে গিয়ে কিন্তু ভারী মুশকিলে ফেলেছিলে আমাকে। তোমাকে এঁটে ওঠা শক্ত”

সহসা এক সুমিষ্ট মাদকগন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পিতামহ বলিলেন, “ডাক এসেছে। এবার যেতে হবে”

“কার ডাক”

“পারিজাতের। ইন্দ্রিরের বাগানে কাল এক পারিজাত কুঁড়িকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম যে তুমি ফুটলেই আমি আসব। আমাকে খবর দিও। খবর এসে গেছে, দুজনেই যাই চল”

“পারিজাতকুঞ্জে কখন গিয়েছিলেন ?”

“গভীর রাত্রে, শিশিরের রূপ ধরে'। তুমি তখন তারায় তারায় আলোর গান গাইছিলে। চল, যাই”

“চলুন। চার্ব্বাক আর কালকূট কিন্তু শবের কাছাকাছি এসে পড়েছে”

“আসুক না, আমাদের আর কতক্ষণ লাগবে। প্রজাপতির রূপ ধরে যাই চল”

“চলুন”

দুইটি রঙীন প্রজাপতি বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

৬

চার্ব্বাক এবং কালকূট উভয়েই বিরাট শবদেহটিকে নীরবে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। বিস্ময়ে কাহারও মুখ দিয়া একটি কথা সরিতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে কালকূট চার্ব্বাকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমার মনে হচ্ছে এমনভাবে পরিক্রমা করলে কোনও লাভ হবে না। এর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। শবদেহের বহিরঙ্গে তো ব্রহ্মার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি না। আপনি পাচ্ছেন কি ?”

“না, আমিও পাচ্ছি না। আমার এ-ও মনে হচ্ছে যে শবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করেও যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলেও ব্রহ্মার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাব না। আমার কৌতূহল আমাকে ভুল পথে চালিত করেছে। ব্রহ্মা কোথাও যদি থাকেন জীবন্ত পরিবেশের মধ্যেই থাকবেন, মৃতদেহের মধ্যে তাঁকে সম্ভবত পাওয়া যাবে না। যা মৃত তার মধ্যে কেবল মৃত্যুই থাকা সম্ভব, জীবনের সন্ধান তার মধ্যে মিলবে কি ?”

“মৃত্যুর মধ্যেই কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা একদিন জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। পরীক্ষিতের সর্পযজ্ঞরূপ মৃত্যু যখন তাঁদের কবলিত করেছিল, তখন সেই মৃত্যুর মধ্যেই তাঁরা বাঁচবার মন্ত্রলাভ করেছিলেন। সুতরাং এ মৃতদেহ মৃত বলেই তাকে তুচ্ছ করতে পারি না। হয় তো সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এর মধ্যেই আত্মগোপন করে' আছেন। এ শবদেহকে ছিন্ন ভিন্ন করেই দেখতে হবে”

“বেশ দেখুন। কিন্তু ছিন্নভিন্ন করবেন কি করে' ? আপনার কাছে কি কোনও অস্ত্র আছে ?”

“আছে”

কালকূট কটিদেশ হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন।

চার্ব্বাক বলিলেন, “আচ্ছা, আপনি কার প্ররোচনায় এই শবদেহ লক্ষ্য করে' এসেছেন ? আমি তো এসেছিলাম আমার কৌতূহলের নির্দ্দেশে। আপনি ?”

“আমার নির্দ্দেশ আমার অন্তরের মধ্যেই ছিল। বাল্যকালে আমি একবার সর্পদেহ ধারণ করে' পৃথিবী পরিভ্রমণ করছিলাম। সেই সময় একদিন এক চণ্ডাল আমার পিঠে পা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে দংশন করি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। চণ্ডালের যে মৃত্যু হবে তা আমি প্রত্যাশা করিনি। সুতরাং আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। অভিভূত হয়ে পাশের এক ঝোপে বসে' লক্ষ্য করতে লাগলাম চণ্ডালের গতি কি হয়। কিছুক্ষণ

পরে। চণ্ডাল-পত্নী হাহাকার করতে করতে এসে হাজির হল, চণ্ডালের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরাও এল। চণ্ডালকে তুলে নিয়ে গেল তারা। আমিও কৌতূহলবশত তাদের অনুসরণ করলাম। দেখলাম, তারা চণ্ডালকে নিয়ে গিয়ে এক নদীতে নিক্ষেপ করলে। শুনলাম, সর্পাহত ব্যক্তিকে না কি দগ্ধ করতে নেই। সে না কি সম্পূর্ণ মরে না, হয় তো আবার বেঁচেও উঠতে পারে এই জন্য তাকে দগ্ধ করা নিয়ম নয়। চণ্ডালকে নদীতে নিক্ষেপ করে' সবাই চলে গেল—আমি কিন্তু যেতে পারলাম না, নদীর তীরের এক ঝোঁপের মধ্যে বসে' আমি সেই ভাসমান শবের দিকে চেয়ে রইলাম। গ্রন্থকার যেভাবে তার প্রথম গ্রন্থের দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে আমিও তেমনি মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইলাম আমার প্রথম কীর্ত্তির দিকে। নদীতীরেই যে শ্মশান ছিল তা আমি জানতাম না। কিছুক্ষণ পরেই লেলিহান অগ্নিশিখায় অন্ধকার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। জ্বলন্ত চিতা পূর্ব্বে আর কখনও দেখিনি। ভীত হয়ে আরও দূরে সরে' গেলাম। কিছুক্ষণ পরে চিতার আগুন নিবে গেল। শ্মশান কিন্তু অন্ধকার হল না। দেখলাম মশাল হস্তে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে কি যেন অন্বেষণ করে' বেড়াচ্ছে। তার প্রদীপ্ত চক্ষু, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, কপালে সিন্দুর-তিলক, এক হস্তে মশাল, আর এক হস্তে ত্রিশূল। আমি আরও ভীত হয়ে আরও দূরে সরে' গেলাম। আমার কৌতূহল কিন্তু নিবৃত্ত হল না। একটি বৃক্ষে আরোহণ করে' আমি সেই মশালধারী ব্যক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে যা দেখলাম তা' সত্যিই অপ্রত্যাশিত। দেখলাম সেই দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্ত্তি নদী থেকে সেই চণ্ডালের শবকে টেনে তুলছে, টেনে তুলে কাঁধে করে' নিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছে। শ্মশানের মধ্যস্থলে বিরাট একটি বটবৃক্ষ ছিল, সবিস্ময়ে দেখলাম কাপালিক শবদেহকে নিয়ে সেই বটবৃক্ষের তলদেশে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি আর থাকতে পারলাম না, গাছ থেকে নেমে পড়লাম। বটবৃক্ষের সমীপস্থ হয়ে যা দেখলাম তা আরও অপ্রত্যাশিত। দেখলাম সেই ভীষণদর্শন কাপালিক চণ্ডাল-শবের উপর ধ্যানস্থ হয়ে বসে' আছেন। শবের মাথার দিকে মশাল জ্বলছে, আর পায়ের দিকে পোঁতা আছে সেই ত্রিশূলটা। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। বটবৃক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন শাখাপল্লবকে প্রকম্পিত করে' মধ্যে মধ্যে একটা কর্কশকণ্ঠ পেচক চীৎকার করছে শুধু। আর কোনও শব্দ নেই। আমিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই বটবৃক্ষের অন্ধকারে প্রবেশ করলাম এবং অন্ধকারে আত্মগোপন করে' বসে রইলাম। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, সহসা কলহাস্যে সচকিত হয়ে দেখলাম চণ্ডালের শবদেহ থেকে অসংখ্য রূপসী নির্গত হচ্ছে, পচা মাংস-পিণ্ড থেকে যেমন কীট নির্গত হয়, তেমনি সেই শবদেহ থেকে রূপসী নির্গত হচ্ছে। দেখতে দেখতে রূপসীর হাট বসে গেল সেই কাপালিককে ঘিরে। তারা কেউ হাসছে, কেউ গান গাইছে, কেউ নৃত্য করছে, কেউ নানা দেহভঙ্গী করে' কাপালিকের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। সে রকম রূপসী আমি জীবনে কখনও দেখিনি, বিভিন্ন বর্ণের আলোক-শিখা যেন কোন মায়ামন্ত্রবলে মানবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল সেদিন। আমি স্বচক্ষে দেখলাম তারা সেই শবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে বহির্গত হচ্ছে আবার সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মনে হোল ওই শবদেহ যেন অনন্ত রূপের আকর, অনন্ত সম্ভাবনার লীলাক্ষেত্র। কারণ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে' সেই রূপসীরা যখন কাপালিকের তপোভঙ্গ করতে পারলে না, তখন মরীচিকাবৎ তারা অন্তর্দ্ধান করলে সহসা। যে অন্ধকার তাদের কলহাস্যে ছন্দিত হচ্ছিল সে অন্ধকার হঠাৎ নিঃশব্দ হয়ে গেল। সেই কর্কশকণ্ঠ পেচকও নিঃশব্দ হয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্য। আমিও অভিভূত হয়ে বসে' রইলাম। আমার মনে হতে লাগল যে আমার বিষই হয় তো ওই চণ্ডালকে অনন্ত সম্ভাবনাময় করে' তুলেছে। অদ্ভুত একটা আত্মপ্রসাদে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল।...

(ক্রমশঃ)

খাদ্য-সমস্যা—

ভারত রাষ্ট্রে খাদ্য-সমস্যার কোনরূপ সমাধান হয় নাই। গত ৪ঠা অক্টোবর ভারতীয় পার্লামেণ্টে অর্থ সচিব দেশমুখ বলিয়াছেন—

আমেরিকার নিকট হইতে যে ২০ লক্ষ মণ গম ঋণ হিসাবে ভারত সরকার লইয়াছেন, তাহাতে মোট লোকশান প্রায় ২৫ কোটি টাকা হইবে।

আমদানীর ব্যয় ধরিয়াই গমের জন্য দিতে হইয়াছে—প্রায় ২২ টাকা মণ এবং রেশনে উহা ১৬ হইতে ১৭ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হইয়াছে। সুতরাং মণপ্রতি প্রায় ৫ টাকা লোকশান দিতে হইয়াছে।

আমেরিকাকে মূল্য বাবদ ৯৫ কোটি টাকা দিতে হইবে। ঐ টাকায় শতকরা বার্ষিক ২ টাকা ৮ আনা সুদ দিতে হইবে এবং ঋণ ৩৫ বৎসরে পরিশোধ্য।

আমরা জানি, জার্ম্মানী যুদ্ধে পরাজিত হইবার পরে তাহার দেয় টাকা—অক্ষমতার অজুহতে—দেয় নাই। ভারত সরকারের যে সেরূপ কোন অভিপ্রায় থাকিতে পারে, এমন মনে করিবার কারণ নাই।

আর কেবল যে ঐ ঋণই ভারত সরকারকে পরিশোধ করিতে হইবে, তাহাও নহে। আমরা জানি, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চাষের জমী উন্নয়নের জন্য কলকব্জা ক্রয় জন্য ভারত সরকার এক কোটি ডলার আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ঋণের সুদ শতকরা বার্ষিক ২ টাকা ৮ আনা এবং ইহা ৭ বৎসরে পরিশোধ্য। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতেই ইহার পরিশোধকাল আরম্ভ হইবে। জানা গিয়াছে, যে কাজের জন্য এই ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল, সে কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার কৈফিয়ৎ কে দিবে?

বিদেশ হইতে খাদ্য-শস্য আনায় যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার সহিত এ দেশে খাদ্যোপকরণ-বৃদ্ধির আন্দোলনের ব্যয় যোগ করিতে হয়।

এখন কথা—এইরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাষ্ট্র কত দিন চলিতে পারে?, অথচ খাদ্যবিষয়ে যে দেশ স্বাবলম্বী নহে, তাহার বিপদের অন্ত নাই। যে কোন মুহূর্ত্তে তাহার খাদ্য সরবরাহের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। সেই জন্য রাষ্ট্রকে খাদ্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করা রাষ্ট্রের কার্য্য-পরিচালকদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ভারত রাষ্ট্রের পরিচালকগণ যে সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

নানা স্থানে যে এখনও অনেক চাষের যোগ্য জমী "পতিত" আছে এবং তাহা "উঠিত" করা সহজসাধ্য, তাহাও বলা যায়। অনেক স্থানেই জল-নিকাশের বা সেচের ব্যবস্থা প্রয়োজন। কোন কোন স্থানে অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করিলে অধিক জমীতে চাষ হয়। কিন্তু সে সকল দিকে অধিক মনোযোগ না দিয়া সরকার বহুব্যয়সাধ্য বিরাট পরিকল্পনায় অধিক অবহিত। সেরূপ পরিকল্পনাও যে বিশেষ বিচার বিবেচনা করিয়া আরম্ভ করা হয় নাই—তাহা নানা ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে। দামোদর পরিকল্পনায় যে টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল—ইতোমধ্যেই ঘোষণা করা হইয়াছে, ব্যয় তাহার দ্বিগুণ হইবে। শেষ কোথায় হইবে তাহাও বলা যায় না। যে সকল বিশেষজ্ঞকে এই পরিকল্পনার জন্য বিদেশ হইতে বহু অর্থব্যয়ে আনয়ন করা হইয়াছে, তাঁহারাও সে সকল বিষয়ে এক-মত নহেন। বিশেষজ্ঞ মরগ্যান দামোদর পরিকল্পনায় সাফল্যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিশেষজ্ঞ স্যাভেজ তাহা করেন নাই। অথচ এই সকল পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য; সুতরাং এই সকল পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার পূর্ব্বে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন প্রয়োজন। আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনায় ব্যয়ও অল্প, সে সকলের সাফল্যও সুনিশ্চিত।

কৃষির জমীতে সার দিয়া তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি, সেচের ব্যবস্থা ও উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার—এই সকলের দ্বারা যে জমীতে খাদ্যশস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকলে উৎপন্ন শস্যাদির পরিমাণ বর্দ্ধিত করা সহজসাধ্য। যাহা সহজসাধ্য প্রথমে তাহাতে অবহিত হওয়াই কর্ত্তব্য। সরকার যদি উৎকৃষ্ট বীজ বর্দ্ধিত করিবার ব্যবস্থা করেন, তবে অনেক উপকার হয়

খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে পরবশ্যতা যে ভয়াবহ তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রথম জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড তাহা "ঠেকিয়া শিখিয়াছিল" এবং সেই জন্যই দ্বিতীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াই আপনার খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

সরকারের হিসাব, ভারত রাষ্ট্রে খাদ্যের অভাব শতকরা দশভাগ। যদি সেই হিসাব নির্ভরযোগ্য হয়, তবে সেই অভাব দূর করা কষ্টসাধ্য

হইতে পারে না। আবশ্যক ব্যবস্থা ও আন্তরিক চেষ্টায় সে অভাব সহজেই দূর করা যায়। ভারত সরকার যে সকল বিদেশী বিশেষজ্ঞের মত লইয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন—যে জমীতে চাষ হইতেছে, তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে অবহিত হওয়া প্রয়োজন এবং তাহাই সহজসাধ্য। সে মত সমীচীন এবং সেই মতানুবর্ত্তী হইয়া কাজ করাই প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য।

যতদিন খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস না হইবে, ততদিন নিত্য-ব্যবহার্য্য আর কোন দ্রব্যেরই মূল্য হ্রাস হইবে না এবং ততদিন যেমন আমাদিগের পরমুখাপেক্ষিতা দূর হইবে না, তেমনই, অভাবহেতু, দেশে অসন্তোষ বিবর্দ্ধিত হইয়া অশান্তির উদ্ভব করিতে থাকিবে। অসন্তোষ-জনিত অবস্থা যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহার পরিচয় আমরা নানা ক্ষেত্রে পাইয়াছি ও পাইতেছি। সে অবস্থা জাতির ও রাষ্ট্রের উন্নতির সহায় না হইয়া শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

খাদ্যশস্যের মত পরিপূরক খাদ্যোপকরণেরও উৎপাদন-বৃদ্ধি প্রয়োজন। পরিপূরক খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধিও দুঃসাধ্য নহে।

কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহযোগ আকৃষ্ট করাও প্রয়োজন; আর বিজ্ঞানের দ্বারা যে ফললাভ করা যায়, তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার সর্ব্বক্ষেত্রেই উপকারী।

সাগরে মৎস্য—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একাধিক কর্ম্মচারীকে বিদেশে পাঠাইয়া বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাগরে মাছ ধরিবার জন্য দুইখানি জাহাজ কিনিয়া আনিয়াছেন। সেই দুখানি জাহাজ এখনও বিদেশী নাবিকদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইতোমধ্যে একবার জাহাজের "ঠাণ্ডা ঘর" বিকল হওয়ায় মাছ পচিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে জাহাজ দুইখানি বার্ষিক সংস্কার করিতে দেওয়া হয়। কোন কোন সংবাদপত্রে সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে বিবৃতি প্রচারিত হয়, জাহাজগুলি চলিতেছে। তবে তাহাতে স্বীকার করা হয়—মাসিক ব্যয় ৩৪ হাজার টাকা হইলেও সেপ্টেম্বর মাসে দুই বারে মাত্র ৬৫৭ ও ৬৩০—মোট ১২,৮৭ মণ মাছ আসিয়াছিল। ব্যয়ের তুলনায় আয় যে অল্প তাহা বলা বাহুল্য। সেই জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বিবৃতিতে নির্ভর করিয়া মন্তব্য করেন—সরকারকে জাহাজ কিনিতে যে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে এবং জাহাজ দুইখানির জন্য মাসে যে ৩৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়—তাহা বিবেচনা করিলে কি মনে হয় না—এই টাকা যদি প্রদেশমধ্যে (বাঁধ, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে) ব্যয়িত হইত, তবে কি ফল ভাল হইত না? এই কথায় সরকারের মৎস্য বিভাগের সেক্রেটারী যাহা বলিয়াছেন, তাহার নির্গলিতার্থ—লাভের জন্য সরকার এ কাজ করেন নাই—পরীক্ষার জন্য সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমানে মৎস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা সরকারের উদ্দেশ্য নহে—ভবিষ্যতে বৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহ, কোথায় কখন কিরূপ মাছ পাওয়া যায় তাহা নির্দ্ধারণ, কিরূপ জাহাজ ব্যবহার্য্য—এই সকল বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্যই সরকার সমুদ্রে মৎস্যসংগ্রহের এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এতদিন যে সমুদ্রে মাছ ধরা হয় নাই, তাহাতে মনে করা যায়—সমুদ্রের মৎস্য-সম্পদ অফুরন্ত। সুতরাং যখন সব তথ্য সংগৃহীত হইবে, আশা করা যায়, তখন সরকারের সাহায্যে ব্যবসায়ীরা এই কাজে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং পরীক্ষামূলক-ভাবে যে কাজ সরকার করিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। যিনি জাহাজ ক্রয় হইতে বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিচালন পর্য্যন্ত সকল কাজের ভার লইয়া চাকরী করিতেছেন, তাঁহার এই যুক্তি অবশ্য বিস্ময়কর নহে। কিন্তু কাঁথীর উপকূলে যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহার ফলে লোকের মনে যদি সন্দেহের উদ্ভব হয়, তবে তাহাতে কি তিনি বিস্মিত হইবেন? তাহারও পূর্ব্বে ডক্টর সুন্দরলাল হোরার ধানের ক্ষেতে মাছের চাষেও অনেক টাকা অপব্যয় হইয়াছিল এবং সরকারের "গোল্ডেন ক্রাউন" জাহাজে সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহের ব্যর্থ প্রচেষ্টা তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। নদী নালা পুষ্করিণীতে উপযুক্তরূপে মাছের চাষ করিলে যে মাছের অভাব দূর হইতে পারে না—এ মত বিচারসহ কি না, সন্দেহ। আমেরিকায় যে ভাবে সরকার মাছের ডিম সংগ্রহ করিয়া ফুটাইয়া লইয়া পোনা—বিমান হইতেও নদীতে ছাড়িয়া দেন, সে ভাবে কোন চেষ্টা কি এ দেশে করা হইয়াছে? বলা বাহুল্য, "মিঠাজলের" মাছ—সমুদ্রে যায় না—তাহা নদী নালায় বর্দ্ধিত হয়। পুষ্করিণীতে ও বাঁধে, বিলে ও ভেড়ীতে মাছ দ্রুত বর্দ্ধিত হয়। জাপানে যে ভাবে মাছের চাষ করা হয়, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পরীক্ষার প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু যে পরীক্ষা করিবে—পরীক্ষা তাহার পক্ষে, ব্যয়হেতু, বিত্তব্যয়ী হইলে, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া অসঙ্গত; কারণ, পরীক্ষা সকল ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত হয় না। দেখা গিয়াছে—ভারত সরকার ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে পাটের চাষের পরীক্ষা করিতে যাইয়া ৮ শত একর জমীতে—৬৫ হাজার ২ শত ২৭ টাকার বীজ দিয়া (?) ও ১৯ হাজার টাকা চাষের জন্য ব্যয় করিয়া মোট ৮০ মণ পাট পাইয়াছেন! তথায় পাট চাষ সম্ভব কি না, তাহা কি অল্প জমীতে পরীক্ষা করিলে হইত না। পরীক্ষা যত অল্পব্যয়সাধ্য হয়, ততই ভাল।

এই প্রসঙ্গে আমরা এ দেশে ও বিদেশে কয়টি পরীক্ষার কথা বলিব—

(১) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে স্থানীয় জার্সি গাভীকে ভারত হইতে তথায় নীত লাল সিন্ধী বৃষের দ্বারা যে বৎসতরী উৎপন্ন করা হইয়াছে, তাহা তথায় উষ্ণপ্রধান স্থানের উপযোগী হইবে। ঐরূপ প্রথম কয়টি গাভীর গড় দুগ্ধও অধিক হইয়াছে।

(২) কলিকাতার উত্তরাংশে ব্যবসায়ী শৈলেন্দ্র দত্ত (তাঁহার জন্ম ডোভার রোডস্থ ভবনের সংলগ্ন জমীতে) গমের, পাটের ও ধানের চাষ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীখণ্ডে—করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ সে সংবাদ রাখেন কি না, আমরা বলিতে পারি না।

(৩) আজ অনেকেই জানেন, প্রিন্স ক্রোপট্কিন যেমন কারাগারে সামান্য জমীতে পরীক্ষা করিয়া বহুলোৎপাদিকা কৃষির আবিষ্কার করিয়া-

ছিলেন ও মিচুরিন যেমন রুশিয়ার সাইবেরিয়ায় নানাবিধ ফলের গাছ করিয়াছেন, তেমনই কলিকাতার উপকণ্ঠে—গোড়াল গ্রামে—শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁটের সহিত মিলনফলে যে পালম উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহা য়ুরোপেও আদর লাভ করিয়াছে।

এ দেশে যাঁহারা পরীক্ষা করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন, সরকারের বিভাগসমূহের—সর্ব্বজ্ঞ কর্ম্মকর্ত্তারা কি তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন না? তাঁহারা যদি সে সুযোগ গ্রহণ করিতেন, তবে যেমন ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে পাট উৎপন্ন করিতে বহু টাকা অপব্যয়িত হইত না, তেমনই বোধ হয়, সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহের জন্য বহু লক্ষ টাকার জাহাজ ক্রয় করিয়া প্রতি মাসে ৩৪ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া প্রভূত ক্ষতিই বরণ করিতে হইত না।

সরকারী চাকরী কমিশন—

ভারত রাষ্ট্রের সরকারী চাকরী কমিশনের প্রথম বার্ষিক বিবরণ ভারতীয় পার্লামেন্টে পেশ করা হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ:—

(১) দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নের লিখিত উত্তরে—পরীক্ষার্থীরা মুখস্থ বিদ্যারই পরিচয় দেয়—বিষয় বুঝিবার ও মানসিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে না।

এই অবস্থা যে দুশ্চিন্তার বিষয়, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কমিশন যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা কোন বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে নহে—পরন্তু ভারত রাষ্ট্রের সকল বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রযোজ্য। শিক্ষার মান যে পরিমাণে খর্ব্ব হয়, মানসিক শক্তি-বিকাশ সেই পরিমাণে হ্রাস পায় এবং সেই পরিমাণে মৌলিক গবেষণার অভাব ঘটে। আজ কাল ভারতীয় ছাত্রগণকে প্রায়ই বিদেশে উপাধি লাভের জন্য যাইতে দেখা যায়। সে সকল দেশে সাধারণ উপাধিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কি না, তাহা বিবেচ্য। আর বিদেশ হইতে যে ছাত্ররা এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে "উচ্চ শিক্ষা" লাভার্থ আসে না—তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা যে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পক্ষে গৌরবজনক নহে, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। সেই জন্য কেহ কেহ প্রস্তাব করেন, এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ উপাধি সহজলভ্য করিয়া অসাধারণ উপাধি-পরীক্ষায় প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক। দেশে যখন প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ছিল না, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আদর্শ খর্ব্ব করিবার যদি কোন কারণ থাকিয়া থাকে, তবে আজ আর সে কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্ব-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। উপাধি লাভের জন্য ছাত্রদিগের অকারণ অত্যধিক আগ্রহ সময় সময় দুর্নীতির কারণও হয়। সে আগ্রহ যাহাতে অসংযত ও অকারণ না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখাও যে প্রয়োজন, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য।

(২) মন্ত্রীরাও যে চাকরী প্রদানে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া থাকেন, কমিশন তাহা বলিয়াছেন। ব্যবস্থা ছিল, অস্থায়ী চাকরীতে লোক নিয়োগের জন্য কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। মন্ত্রীরাও সরকারের বিভাগসমূহ সেই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণে সর্ব্বদাই তৎপর থাকেন। যে সকল চাকরী এক বৎসরের জন্য নহে—পরে স্থায়ী হইবে, সে সকলেও তাঁহারা আপনাদিগের লোক নিয়োগের জন্য লোককে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিয়া কমিশনের অনুমোদন এড়াইয়া পরে ঐরূপ নিয়োগ "পাকা" করিয়াছেন। ইহাতে কমিশন স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। যোগ্যতা দেখিয়া চাকরীতে লোক নিয়োগই কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করায় সরকারের ক্ষতি অনিবার্য্য হয়। অথচ মন্ত্রীরা ও বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা আপনাদিগের জন্য অথবা দল রক্ষার জন্য—কমিশনের অনুমোদন হইতে অব্যাহতি লাভের ছল সন্ধান করেন!

অল্পদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে প্রচার বিভাগে কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে ঐরূপ দৃষ্টান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সচিবগণ সে সকল প্রশ্ন এড়াইয়া গিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক চাকরী কমিশনও সচিবদিগের সম্বন্ধে কতকগুলি গুরু অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন—সচিবসঙ্ঘ কমিশনের বিবরণ পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

ভারত রাষ্ট্রের কমিশন প্রস্তাব করিয়াছেন, অস্থায়ী চাকরীর নিয়োগেও কমিশনের সহিত পরামর্শ করিতে মন্ত্রীদিগকে ও বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা করা হউক। যোগ্যতাই যদি নিয়োগে লক্ষ্য করিবার বিষয় হয়, তবে কমিশনকে নিয়োগ সম্বন্ধে পরামর্শ না করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। ছয়টি ক্ষেত্রে যে সরকার কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, তাহাও কমিশন উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) যে সকল চাকরীতে বিশেষ গুণ বা শিক্ষার পরিচয় প্রয়োজন, সে সকল সম্বন্ধে কমিশনের বক্তব্য—সেরূপ ১২০ জন প্রার্থীও পাওয়া যায় নাই! বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে সেরূপ লোক যে বেতন পাইয়া থাকেন, তদপেক্ষা অধিক বেতন দিতে চাহিলেও যে তাঁহারা সরকারী চাকরীর জন্য প্রার্থী হইতে চাহেন না, তাহার কোন কারণ অবশ্যই আছে। সে কারণ কি? সরকারী চাকরীতে "আত্মবিক্রয়ের" সম্ভাবনা এবং হীনতা স্বীকার ও স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগের অভাব কি কারণ হইতে পারে না? যতদিন উপযুক্ত লোক সরকারী চাকরীতে আকৃষ্ট না হইবেন, ততদিন সরকারী চাকরীতে যোগ্যতার অভাব অনিবার্য্য হইবে। কমিশন বলেন, ঐরূপ উপযুক্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে সরকারী চাকরী গ্রহণে প্ররোচিত করিতে হইবে। সে বিষয়ে কমিশনের চেষ্টা কিরূপ ফলবতী হইয়াছে, জানা যায় না। আমাদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কি সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে?

আলোচ্য বৎসরে কমিশন ২৫টি পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ২৪৬৮০ জন হইলেও কার্য্যকালে মাত্র ১৮৩৪২ জন পরীক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং ৬ হাজার আবেদনকারী (বোধ হয় পরীক্ষার নির্দিষ্ট "ফী" দিয়াও) কেন পরীক্ষা দেন নাই, তাহাও বিবেচ্য।

দেখা যায়, একটি পরীক্ষায় ২৭৯৭ জন পরীক্ষা দিলেও মাত্র ৮০২ জনকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করা হয় এবং ২৪০ জনকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

কমিশনের বিবরণে মনে হয়, সকল ব্যাপারে নানারূপ অসঙ্গতি ও

অনাচার থাকিতেও পারে এবং সে সকল দূর না হইলে কমিশন নিয়োগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে ; আর তাহা হইলে "দায় কি ওয়াস্তে" কমিশনের দ্বারা প্রকৃত কার্য্য হইবে না।

সচিবদিগের সফরের ব্যয়—

পশ্চিমবঙ্গের সচিবগণ ও তাঁহাদিগের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীরাও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১১ মাসে ভাতা ও মোটরযানের বাবদে কে কত টাকা লইয়াছেন, তাহার হিসাব এইরূপ :—

	সফরের ব্যয়	মোটরযানের জন্য
বিধানচন্দ্র রায়	৬২৯১	৩০০০
নলিনীরঞ্জন সরকার	০	৩০০০
রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৪২৬	৩০০০
বিমলচন্দ্র সিংহ	০	৩৩৭৸০
নীহারেন্দু দত্তমজুমদার	৩২২১৶	৩০০০
কালীপদ মুখোপাধ্যায়	২৬৫১৵	০
হেমচন্দ্র নস্কর	২৭৬৯	৩০০০
ভূপতি মজুমদার	২০৫৯৶	০
নিকুঞ্জবিহারী মাইতি	৬৫১৵	৩০০০
যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা	৯৪৫	০
রফীউদ্দীন আমেদ	২৬৬৩৶	১৯৬৭৷৶০
প্রফুল্লচন্দ্র সেন	২৩১১	৩০০০
শ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণ	২৯৮৯	৩০০০

জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, নলিনীরঞ্জন অসুস্থ এবং একদিনও দপ্তরখানায় না আসিয়াও কেন মোটরযান বাবদে ৩০০০ টাকা পাইলেন? তাহাতে বিধানচন্দ্র রায় উত্তর দেন—নিয়ম আছে, সচিব ৩০০০ টাকা ঐ বাবদে পাইতে পারেন। অর্থাৎ তিনি একদিনও দপ্তরখানায় না আসিতে পারিলেও তাঁহার যেমন ঐ টাকা লইতে দ্বিধা বোধ হয় নাই, সরকারেরও তেমনই সেই টাকা দিতে সঙ্কোচ হয় নাই।

বিমলচন্দ্র সিংহ ঐ ১১ মাসের মধ্যে মাত্র ৬০ দিন কলিকাতায় ছিলেন (অবশিষ্ট কাল চিকিৎসার্থ বিদেশে কাটিয়াছে)। কেন যে তিনি ৩০০০ টাকাই লয়েন নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

কালীপদ মুখোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার ও যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা মোটর গাড়ী কিনিয়া "বাজে খরচ" করেন নাই। তাঁহারা সরকারী গাড়ীই চড়িয়া বেড়াইয়াছেন।

নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণ সরকারী গাড়ীও ব্যবহার করিয়াছেন, ৩০০০ টাকা হিসাবেও লইয়াছেন—অর্থাৎ গাছেরও পাড়িয়াছেন, তলারও কুড়াইয়াছেন।

রফীউদ্দীন আমেদ ৫ঠা জুলাই চাকরীতে বহাল হইলেও—২৭৬৩ টাকা ১২ আনা সফরের জন্য এবং ৭৭ দিন সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিলেও গাড়ীর বাবদে ১৯৬৭ টাকা ১২ আনা লইয়াছেন।

আর লইয়াছেন—

(১) চীফ হুইপ সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে ১২৭৪ টাকা ৯ আনা সফরের জন্য।

(২) রজনীকান্ত প্রামাণিক পরবর্ত্তী ১১ মাসে সফরের জন্য ১৫৬৩ টাকা ৬ আনা।

(৩) নিশাপতি মাঝি—পরবর্ত্তী ১১ মাসে সফরের জন্য ১৪১৫ টাকা ১০ আনা ইত্যাদি। ব্যয়ের বহর বটে।

যে সচিব একদিনও দপ্তরখানায় আসিতে পারেন নাই, তিনিও ৩০০০ টাকা লইয়াছেন, আর যে কয়জন সচিব সরকারী গাড়ী ব্যবহার করিয়াছেন (নীহারেন্দু ১৪১ দিন, নিকুঞ্জ ২৫৪ দিন, প্রফুল্ল ৩০৪ দিন, শ্যামাপ্রসাদ ২৭৯ দিন) তাঁহারাও প্রত্যেকে ৩০০০ টাকা লইয়াছেন।

সফরের ভাতাও অবশ্য, ব্যয় হউক আর না হউক, নিয়মানুসারে যাহা পাওয়া যায়, তাহা লওয়া হইয়াছে।

ইহাই কি বর্ত্তমান নিয়মে দেশের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করা বলিয়া বিবেচনা করা হইতে পারে?

ভাগীরথীর ভাগ্যলিপি—

পশ্চিম বঙ্গের সেচ-সচিব ভূপতি মজুমদার ঘোষণা করিয়াছেন—পলিতে ভাগীরথী "মজিয়া" যাইতেছে এবং আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে অল্প দিনেই ভাগীরথী "মরিয়া" যাইবে ও কলিকাতা বন্দর ত্যাগ করিতে হইবে। এ আশঙ্কা নূতন নহে, এই আবিষ্কারও মৌলিক। ভাগীরথীর ক্রমাবনতির সুযোগ লইয়া বহুদিন পূর্ব্বে একদল চতুর লোক মাতলায় পোর্ট ক্যানিং স্থাপনা করিয়া লাভবান হইয়াছিলেন। তাহার পরে হার্টল রিপোর্টে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছিল এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম উইলকক্স পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সরকারকে সতর্কতাবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি যে প্রস্তাব তখন করিয়াছিলেন, আজ ভূপতিবাবু তাহাই করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন—বর্ষার সময় কয় সপ্তাহ ব্যতীত আর সকল সময় গঙ্গার সহিত ভাগীরথীর যোগ থাকে না—মুর্শিদাবাদে ফারাক্কায় বাঁধ দিয়া গঙ্গার জল ভাগীরথীতে আনিবার ব্যবস্থা না করিলে উপায় নাই। সার উইলিয়ম উইলকক্স তখন বলিয়াছিলেন—

"The Calcutta Port Trust spend their time and money on the Hooghly. They would show wisdom if they spent some of both on the head of the Bhagirathi."

কারণ, গঙ্গার জলধারা নিয়ন্ত্রিত করিলে ও ঐ বাঁধ নির্ম্মিত হইলে ভাগীরথীতে (হুগলী নদীতে) সমগ্র বৎসর জল থাকিবে—তাহার স্রোতও স্থায়ী হইবে।

গঙ্গার ধারা খাত পরিবর্ত্তন করার পর হইতেই ভাগীরথীর দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে এবং ভৈরব, কপোতাক্ষী প্রভৃতি নদনদী মরণোন্মুখ হইয়াছে। আমাদিগের বিদেশী শাসকরা সে অবস্থার প্রতিকার করেন

নাই। তাঁহারা কলিকাতা বন্দর রক্ষায় মাত্র অবহিত ছিলেন এবং সেই জন্যই কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট মাটি কাটিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত নদী জাহাজের আগমন-নির্গমনের উপযুক্ত রাখিতেই প্রবৃত্ত ছিলেন। কিন্তু আজ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। ভূপতিবাবু বলিয়াছেন, কেন্দ্রী সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য বিবেচনার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। তাহাতে ইতোমধ্যেই ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে—আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে সেই চেষ্টার ফল—রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে, আশা করা যায়। সরকারের কাজে টাকা অনেক ব্যয় হয়, কিন্তু ব্যয় দেখিয়া ফল বিচার করা অনেক ক্ষেত্রেই সুবিবেচনার কাজ হয় না। যাঁহারা জঙ্গীপুর হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত নদীর অবস্থা—গ্রীষ্মকালে—লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা আতঙ্কানুভব না করিয়া পারেন না। সার উইলিয়ম উইলকক্স যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা কি বর্ত্তমান সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন?

শীঘ্রই প্রতীকার না হইলে অবস্থা জটিল হইবে—ভূপতিবাবুর সহিত এ বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু শীঘ্র প্রতীকার করিতে সরকার কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা দেখিবার বিষয়। চারি বৎসর যে উপকরণ সংগ্রহে গিয়াছে, তাহাও বিস্ময়ের বিষয়।

ভূপতিবাবু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ভাগীরথীর জলের লবণাক্ততা কলিকাতা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু সুন্দরবনে বাঁধের জন্য নদীর জোয়ারের জল—যাহাকে spill area বলে তাহাতে ব্যাপ্ত হইতে না পায়া কি তাহার অন্যতম কারণ নহে? স্রোতের বেগ-হ্রাস অবশ্য তাহার অন্যতম কারণ।

অবস্থার গুরুত্ব ও জটিলতা সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতীকারে সরকার কি তৎপরতা দেখাইবেন না? দামোদর পরিকল্পনা অপেক্ষাও যে এই পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অধিক প্রয়োজন, তাহা সরকার নিশ্চয়ই বুঝেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন—

নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে গত ৩১শে আশ্বিন দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে দুইটি অসামান্য ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) অধিবেশনের পূর্ব্বদিন প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত ও সজ্জিত মণ্ডপ ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং পরদিন অনাবৃত স্থানেই অধিবেশন হয়।

(২) পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনকে কংগ্রেসের "রাষ্ট্রপতি" পদত্যাগে বাধ্য করিয়া যিনি সেই পদ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই—ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুই সভাপতিত্ব করেন। ইহার পূর্ব্বে কখন কোন "রাষ্ট্রপতি" অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নাই। অবশ্য ইতঃপূর্ব্বে কোন প্রধান মন্ত্রীও কংগ্রেসের "রাষ্ট্রপতি" হয়েন নাই। অবস্থা অস্বাভাবিক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া জওহরলাল যেমন প্রধান মন্ত্রী হইয়াও কংগ্রেসের "রাষ্ট্রপতি" হইতে দ্বিধানুভব করেন নাই, তেমনই তিনি "রাষ্ট্রপতি" হইয়াও অধিবেশনে সভাপতি হইতে দ্বিধানুভব করেন নাই।

সরকার ও কংগ্রেস অভিন্ন হইয়া গেল এবং ঘোষিত হইল—মীরাবাঈ যেমন বলিয়াছিলেন—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোন পুরুষ নাই, তেমনই ভারতরাষ্ট্রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ব্যতীত নেতা নাই।

সেই অবস্থায় কংগ্রেস যদি একমত হইয়া জওহরলালের সরকারের সকল কার্য্য, সকল মত ও নীতির সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া থাকেন ও জওহরলালের প্রতি অবিচলিত আস্থা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। সেই জন্যই কংগ্রেসে কোনরূপ মতান্তর দেখা যায় নাই।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বেই যুক্ত-প্রদেশের রফী আমেদ কিদোয়াই মন্ত্রীর পদ ও কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কৃষক-প্রজা-মজদুর দলে যোগ দিয়া আবার কংগ্রেসে ফিরিয়া গিয়াছিলেন—মন্ত্রিপদ পায়েন নাই; আর অনুন্নত দলের নেতা ডক্টর আম্বেদকার মতভেদহেতু এবং হিন্দু কোড বিধিবদ্ধ না হওয়ায় মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পদত্যাগকালে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগের কারণ ব্যক্ত করিয়া যেমন বিবৃতি দিয়াছিলেন (ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী পদত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিবৃতি দেন নাই) ডক্টর আম্বেদকার তেমনই বিবৃতি দিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় পার্লামেন্টের সহকারী সভাপতি পদাধিকারে তাঁহার বিবৃতি পূর্ব্বাহ্নে পেশ করিতে বলায় ডক্টর আম্বেদকার তাহা নিয়মবিরুদ্ধ এই মত প্রকাশ করিয়া পার্লামেন্ট কক্ষ ত্যাগ করেন এবং আপনার বিবৃতি, প্রকাশজন্য, সংবাদপত্রের প্রতীক্ষমান প্রতিনিধিদিগকে প্রদান করেন।

জওহরলাল নেহরুর অভিভাষণে অনেক কথা থাকিলেও নূতন কোন কথা ছিল না; হয়ত বলিবার নূতন কোন কথাও নাই। তিনি বলিয়াছিলেন:—

"কংগ্রেসকে যদি প্রাণবন্ত প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান থাকিয়া লোককে পথিপ্রদর্শন করিতে ও লোকসেবার কার্য্য অব্যাহত রাখিতে হয়, তবে কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করিয়া বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী করিতে হইবে।"

তবে কি মনে করিতে হইবে, কংগ্রেসে গত চার বৎসরে পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা হয় নাই এবং সে কাজ জওহরলালই করিতে পারিবেন?

তিনি আরও বলিয়াছেন—

"যাহারা কংগ্রেসের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিও লাভ করিতে চাহে, কংগ্রেসে তাহাদিগের স্থান নাই।"

যদি তাহাই হয়, তবে কংগ্রেসী দল হইতেই মন্ত্রিনিয়োগ ও কংগ্রেসীদিগকেই "পারমিট," চাকরী প্রভৃতি লাভজনক অধিকার দেওয়া হয় কেন?

আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইংরেজের শাসনকালে কোন কোন ইংরেজের এ দেশে—অলাতঙ্কের মত—হাতাতঙ্ক রোগ দেখা যাইত, তাঁহারা এ দেশের লোকের হস্ত ব্যবহার সহ্য করিতে পারিতেন না;

তেমনই পণ্ডিত জওহরলালের সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইতেছে। তিনি কংগ্রেসাতিরিক্ত সকল রাজনীতিক দলে সাম্প্রদায়িকতার বিভীষিকা দেখিতেছেন। ভারতরাষ্ট্র ধর্ম্মনিরপেক্ষ এবং কোন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানই সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করে না। ভারতবর্ষ যে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়াছে এবং পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ ব্যক্তিদিগের সম্মতিতেই তাহা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহার যে বিষময় ফল হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতার শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িক নহে, সে সকলেও সাম্প্রদায়িকতা আরোপ করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, তিনি যে নির্ব্বাচনে পরাভূত হইবার ভয়ে "হিন্দু কোড" বিধিবদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছেন, তাহা নহে। তবে সে কথা আজ বলার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না।

পণ্ডিত জওহরলালের অভিভাষণ যদিও ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছিল, তথাপি তিনি হিন্দীতেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং লিখিত অভিভাষণে ছিল না এমন অনেক কথাই বলিয়াছিলেন।

কংগ্রেস যেভাবে নেহরু-মন্ত্রিমণ্ডলের সকল কার্য্য ও নীতি অবিচারিতচিত্তে সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা করা যায়—কংগ্রেসের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজন আছে কি? না—সরকারের প্রচার বিভাগ বা কার্য্যকারী হিসাবে কংগ্রেসকে সরকারের সাহায্য দিয়া রক্ষা করা সরকারের পক্ষে প্রয়োজন? সরকারের সহিত মতভেদ হওয়ায় যে পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহাতে অনেকে মনে করেন—কংগ্রেসের পক্ষে স্বাধীন মত পোষণ করা সরকার ও সরকারের দল সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন। পুরুষোত্তমদাস বলিয়াছিলেন—সরকারই কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মানিতে বাধ্য—কংগ্রেস সরকারের নির্দ্দেশানুবর্ত্তী হইবে না। তিনি পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগের পুনর্ব্বসতির সুব্যবস্থা এখনও হইতেছে না। এই অবস্থা যে পরিতাপের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে এক দিন শিয়ালদহ ষ্টেশনে ১৪১ জন নবাগত লইয়া ১৩৫৫ জনকে ষ্টেশনে অসহায় অবস্থায় দেখা গিয়াছিল। গত ২রা অক্টোবর যাহারা শিয়ালদহে আসিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় ৪২টি পরিবারের প্রায় ২০০ লোকের বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের অভিযোগ, প্রায় চারি মাস পূর্ব্বে ইহাদিগকে উল্টাডাঙ্গা ক্যাম্প হইতে এই আশ্বাস দিয়া মালদহে প্রেরণ করা হইয়াছিল যে, তথায় তাহাদিগকে প্রত্যেক পরিবারের জন্য ১৫ বিঘা চাষের জমী ও ঋণ হিসাবে ১২০০ টাকা দেওয়া হইবে। অথচ তাহাদিগকে মালদহে না পাঠাইয়া দিনাজপুরে পাঠান হয় এবং তথায় তাহাদিগকে ভারতরাষ্ট্রত্যাগকারী মুসলমানদিগের খালি বাড়ীতে থাকিতে দেওয়া হয়—টাকা বা জমী কিছুই দেওয়া হয় না। প্রথম ২ মাস তাহাদিগকে কিছু অর্থ সাহায্য দিয়া তৃতীয় মাসে তাহা বন্ধ করা হয়। তদবধি তাহারা ভিক্ষালব্ধ সাহায্যে নির্ভর করিয়া জলজ শাক, ঝিনুক প্রভৃতি খাইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে অনাহারে এবং অপুষ্টাহারজনিত ও অন্যান্য রোগে তাহাদের কতকগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে অবস্থা জানাইয়া কোনরূপ প্রতীকার হয় নাই।

আমরা আশা করি, তাহারা যে স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল, সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এই কারণ দর্শাইয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে সরকারের আর কোন কর্ত্তব্য নাই, এইরূপ কথা না বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাদিগের অভিযোগ সম্বন্ধে আবশ্যক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগের ব্যবস্থার ত্রুটি থাকিলে তাহা সংশোধন করিবেন। অর্থাৎ—

(১) তাহাদিগকে মালদহে পাঠান হইবে বলিয়া দিনাজপুরে পাঠান হইয়াছিল কি না;

(২) তাহাদিগকে পরিবার পিছু ১৫ বিঘা চাষের জমী ও ১২০০ টাকা ঋণ দেওয়া হইবে বলা হইয়াছিল কি না এবং বলা হইয়া থাকিলে সে প্রতিশ্রুতি পালিত হইয়াছিল কি না;

(৩) তাহাদিগের নাম করিয়া কোন টাকা কোনরূপে অপব্যয়িত হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে সে টাকা কে বা কাহারা লইয়াছে;

এই সকল দেখা আমরা প্রয়োজন মনে করি।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। ২৪পরগণা বারাসত মহকুমায় গোচুরিয়ার কতকগুলি পরিবার যে গ্রাম স্থাপন করিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রপাল তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা যে জমীতে গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন এবং সে কথা সরকারকে জানানও হইয়াছে। কিন্তু জমীর মালিক ঐ স্থানে তাঁহাদিগকে থাকিতে দিতে অসম্মত হইয়াছেন। কোন বা কোন কোন সচিবও নাকি এই ব্যাপারের বিষয় জানেন।

উহারই নিকটবর্ত্তী কোন জমীতে চাকরাগাটার স্থানীয় "ওয়েলফেয়ার কমিটীর" ব্যবস্থায় যাঁহারা জমী লইয়া পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এখন স্থানভ্রষ্ট করিবার জন্য জমীর অধিকারী মুসলমান যে চেষ্টা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা আজও করেন নাই। একখণ্ড জমী সরকার রিকুইজিশন করিবেন—"গেজেটে" ঘোষণা করার পরে আর কিছুই করেন নাই। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী সরকার পক্ষ হইতে জানান হয়—"We shall take necessary steps to regularise possession where the Subdivisional Officer had encouraged refugees to settle on land." সরকার সে প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন কি?

মহম্মদ আলী জিন্না যখন দেশ—সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে—বিভক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি অধিবাসীবিনিময় করিতে বলিয়াছিলেন। মুসলমানাতিরিক্ত নেতারা তাহাতে অসম্মত হইয়াছিলেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখেও গান্ধীজী বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের মিশনকে বলিয়াছিলেন—

"Pakistan which connotes division of India will be a sin."

কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তীরা তাঁহার পরে ঐরূপ বিভাগেই সম্মত হইয়াছিলেন এবং যেমন দেশের লোকের মত না লইয়াই সম্মত হইয়াছিলেন, তেমনই পাকিস্তানে ত্যক্ত মুসলমানাতিরিক্তদিগের সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে দায়িত্ব তাঁহারা পালন করিতে পারিতেছেন না। তাহা পালন করা যে সহজসাধ্য নহে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহা পালন না করাও অন্যায়। সেই জন্য সরকারকে লোক যদি দোষী বলে, তবে তাহা অসঙ্গত হয় না।

এ বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগেরও কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা যদি পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করাই সিদ্ধান্ত করেন, তবে সে বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া যে ভাবেই হউক পুনরায় কার্য্যারম্ভ করুন। অর্থাৎ যাহাকে "দুই নৌকায় পা রাখা" বলে—তাহা করিলে চলিবে না। তাহা হইলে তাঁহারা সরকারকে—ত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকারের সহিত বিনিময়ের বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে বলিতে পারেন। আর তাহা হইলে তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে বলিতে পারেন—পাকিস্তান তথায় মুসলমানাতিরিক্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করিবে, ভারত রাষ্ট্র পাকিস্তানের সহিত সম্পর্কসম্পন্ন মুসলমানদিগের সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে কি না, তাহা ভারতরাষ্ট্রের জনগণের ও সরকারের পক্ষে বিবেচনার বিষয় হইতে পারিবে।

কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গ—

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন করাচীতে বলিয়াছেন—তিনি ভারতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর বন্ধুত্বব্যঞ্জক পত্রের সেইরূপ উত্তরই দিয়াছেন; কিন্তু—

ঐ ভাব কার্য্যকরী করিবার একমাত্র উপায়—কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান। সবই কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভর করিবে।

অর্থাৎ যাহাই কেন বলা—যতক্ষণ কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের দাবী স্বীকৃত না হইবে, ততক্ষণ প্রকৃত বন্ধুত্ব হইতে পারে না।

দিল্লীতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যা কাশ্মীর-সমস্যা অপেক্ষাও জটিল, কঠিন ও অবিলম্বে সমাধান করা প্রয়োজন। সে সমস্যার সমাধান না হইলে সমগ্র দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে।"

তিনি বলিয়াছেন, খাজা নাজিমুদ্দীন (পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া) পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যা বিশেষরূপ অবগত আছেন; তথাপি তিনি যে তাঁহার নীতি সম্বন্ধীয় প্রথম বক্তৃতায় সে সমস্যার উল্লেখও করেন নাই, তাহা দুঃখের বিষয়।

আমাদিগের মনে হয়, খাজা নাজিমুদ্দীন ইচ্ছা করিয়াই—তাঁহার বক্তৃতায় পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যার উল্লেখও করেন নাই। সে বিষয়ে পাকিস্তানের-নীতি তিনি অপরিবর্ত্তিতই রাখিতে চাহেন—অর্থাৎ ইস্লামিক রাষ্ট্রে হিন্দুরা যে ব্যবহার পাইতেছে, তাহাই পাইবে।

সুতরাং বন্ধুত্বের আশা আকাশ-কুসুম, কি না, তাহা কি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও তাঁহার দলীয় ব্যক্তিরা এখনও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন ও বিবেচনা করিয়া কার্য্যপন্থা স্থির করিবেন?

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাবস্থা—

ভারত সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী মুন্সী বলিয়াছেন—অনাবৃষ্টিতে গুজরাটের কতকাংশে অবস্থা দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-সচিব প্রফুল্লচন্দ্র সেন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে—

(১) লোকের দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি অনিবার্য্য

(২) লোকের ধান্য ও চাউল মজুদ রাখিবার আগ্রহ জন্মিবার কারণ আছে

(৩) চোরাকারবারীরা লাভের উপায় চিন্তা করিবে, এমন আশঙ্কাও করা যায়।

তিনি বলিয়াছেন:—

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে যে চাউলের প্রয়োজন, তদপেক্ষা ১৩ লক্ষ টন অল্প উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর মাত্র ৪ লক্ষ টন চাউল কম ছিল। সুতরাং অবস্থা ভয়াবহ। গত বৎসরের তুলনায় এ বার আশুধান্য শতকরা ১৬ ভাগ ও আমন ধান্য শতকরা ৩০ ভাগ কম হইবে। অতএব যাহা নষ্ট হইবে তাহা বাদ দিলেও মাত্র ৩৯ লক্ষ টন চাউল পাওয়া যাইবে।

এ বৎসর যে জমীতে ধান্যের চাষ হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কমিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের গড় ধরিলে প্রতি বৎসর ১৩ লক্ষ ৪১ হাজার একর জমীতে চাষ হইয়াছে; গত বৎসর ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ৩শত একর চাষ হয় —এ বার মাত্র ১০ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯শত একরে চাষ হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জিলায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জমীতে চাষ হইয়াছে। ফসলের ফলনও কম।

চাষের জমীর পরিমাণ হ্রাসের কারণ—

(১) বৃষ্টির অল্পতা;

(২) আশু ধান্যের জমীতে পাটের চাষ।

এই হিসাব অনুসারে এ বার পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি হইবে, ভাবিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করেন, বর্ত্তমান বৎসরের শেষেই ভারত রাষ্ট্র পাট সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারিবে। ভারত রাষ্ট্রে পাটের প্রয়োজন (অর্থাৎ পাটকল চালু রাখিতে প্রয়োজন) ৫০ লক্ষ গাঁইট পাট। এ বার—ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ৪৭ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে, এমন আশা করা যায়। তাহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই নাকি ২২ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে ৩লক্ষ ৫২ হাজার একর জমীতে পাটের চাষ হইয়াছিল—এ বার হইয়াছে ৯ লক্ষ ১২ হাজার একরে।

এই ৯ লক্ষ ১২ হাজার একরের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ জমী

(১) "পতিত" ছিল—"উঠিত" করা হইয়াছে এবং,

(২) কত জমীতে পূর্ব্বে আশু ধান্যের চাষ হইত, এ বার পাটের চাষ করা হইয়াছে

তাহা সরকারী বিবৃতিতে জানা যায় নাই।

পাট-বাঙ্গালার অর্থাগমের উপায়—সুতরাং পাট চাষে—লোকের খাদ্য হানির সম্ভাবনা যতই কেন থাকুক না—আপত্তি, সাধারণভাবে, করা যায় না। কিন্তু যে স্থানে খাদ্যোপকরণের অভাবে লোককে অপূর্ণাহারে থাকিয়া—অকাল মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে হয়, সে স্থানে খাদ্য শস্যের পরিবর্ত্তে পাটের চাষ সমর্থন করা যায় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিবেই।

আবশ্যক বৃষ্টির অভাবে যে অনেক ক্ষেত্রে ধান্যের চাষের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু গত ৪ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে সেচ-ব্যবস্থার কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা কি জানা যাইবে?

যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুঝিয়াছেন—এ বার অবস্থা ভয়াবহ, তখন কি তাঁহারা ইতোমধ্যেই পরিপূরক খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে অবহিত হইবেন?

দিল্লী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সচিবের এই আতঙ্ক-জনক বিবৃতি প্রচার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর—

আমাদিগের সতীর্থ—অজাতশত্রু, পণ্ডিত ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর-পদ ত্যাগ করিয়া কেন্দ্রি মন্ত্রীমণ্ডলে যোগ দিয়াছেন। তিনি পণ্ডিত জওহরলালেরই মত কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ও এলাহাবাদবাসী। নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে যখন রাজাগোপালাচারি অবসর গ্রহণ করিলেন ও ডক্টর আম্বেদকার পদত্যাগ করিলেন, তখন জওহরলালের পক্ষে তিনি যাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারেন, সেইরূপ মন্ত্রী গ্রহণ করাই স্বাভাবিক।

ডক্টর হরেন্দ্রকুমার ভারতীয় খৃষ্টান। ইনি শিক্ষক ও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিসম্পন্ন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঁহার বিরাট দান ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ইহাকে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছে। প্রৌঢ়াবস্থায় পুত্র ও পত্নীকে হারাইয়া ইনি যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার গৃহিণীপনা ও শিষ্টাচার, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদিগের নিকট তাঁহাকে সমাদৃত করিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে হরেন্দ্রকুমার নবাগত নহেন। তিনি ব্যবস্থা পরিষদে ও কেন্দ্রী পরিষদে সদস্য থাকিয়া কাজ করিয়াছেন এবং ভূতপূর্ব্ব কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীতে সহকারী সভাপতিরূপে সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে তিনি যখনই কাজ করিয়াছেন, তখনই নিরপেক্ষতার ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। তিনিই প্রথম সংখ্যালঘিষ্ট সম্প্রদায়ের বিশেষ নির্ব্বাচনের বিরোধিতা করিয়া জাতীয়তার পরিচয় দেন। জনগণের জন্য কংগ্রেস কি করিয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি যে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গবেষণার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অবদান তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে। হরেন্দ্রকুমার যে প্রকৃতির লোক তাহাতে তিনি সচিবের কার্য্য অপেক্ষা গভর্ণরের কার্য্যেরই অধিক উপযোগী। তাঁহার নিয়োগ উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগই হইয়াছে। হরেন্দ্রকুমার নিঃসন্তান। ইনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং শিক্ষাবিস্তারে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন।

রাজনীতি ও অশোভন ব্যবহার—

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উক্তি সম্বন্ধে অবহিত। তিনি কিছুদিন হইতে সাম্প্রদায়িকতা বিভীষিকাগ্রস্ত! বহু লোককে ও প্রতিষ্ঠানকে সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বলিয়া কেবল মনে করেন না—ঘোষণাও করেন। অথচ যাঁহাদিগের সম্মতিতে ও আগ্রহে দেশ সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়াছে, তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম। সম্প্রতি তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ দেশে রাজনীতিক আন্দোলন ও আলোচনা অশোভন ব্যবহারদুষ্ট হইতেছে! এই অশোভন বা অশিষ্ট ব্যবহার তাঁহার দলের কি বিরোধীদলের লোকরা করিয়াছেন, তিনি যেমন তাহাও বলেন নাই, তেমনই আবার তাহার কোন দৃষ্টান্তও উপস্থাপিত করেন নাই। সুতরাং তাঁহার অভিযোগ কতদূর বিচারসহ, তাহা বলা যায় না। অশোভনতার রূপও অনেক এবং ইংলণ্ডে নির্ব্বাচনে ভোট সংগ্রহের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হয়, সে সকলই যে এ দেশে শোভন বলা যায় বা শোভন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—এমন নহে। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এ দেশে রাজনীতিক ব্যাপারে কাহারও ব্যক্তিগত জীবনের বা চরিত্রের অপ্রকাশ্য অংশ অপ্রকাশিতই রাখা হয়। য়ুরোপে ও আমেরিকায় সকল সময়ে তাহা হয় না। জওহরলালের জানা উচিত—

"Use every man after his desert and who should scape whipping?"

এ দেশে রাজনীতি-চর্চ্চায় বা রাজনীতিক ব্যাপারে কোথায় কাহারা অশোভন ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা জওহরলাল বলিবেন কি? যদি তিনি তাহা বলিতে না পারেন, তবে প্রমাণাভাবে তাঁহার অভিযোগ, সাধারণ ভাবে, উপস্থাপিত করা তাঁহার মত পদাধিকারীর পক্ষে একান্তই অশোভন। অশিষ্টাচারের সমর্থন কেহই করেন না। কিন্তু অশিষ্টাচারের অভিযোগ অকারণে উপস্থাপিত করাও কোনরূপে সমর্থনীয় নহে।

লিয়াকৎ আলি খাঁর হত্যা—

রাওয়ালপিণ্ডীতে মসলেম লীগের এক সভায় বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খাঁন আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। গত ২৯শে আশ্বিন (১৬ই অক্টোবর) এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই ঘটনায় মনে হয়, যাঁহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালন করেন, তাঁহারা অনেক সময় অপ্রত্যাশিত দিক হইতে বিপন্ন হইয়া থাকেন। আর মনে হয়, পাকিস্তানের অধিবাসীদিগকে ধর্ম্মের উত্তেজনার সাহায্যে রাষ্ট্র-সচেতন করিবার চেষ্টা হইলেও তথায় অসন্তোষের কারণ যে নাই এমন নহে। পাকিস্তানেও যে অসন্তোষ আছে, তাহার প্রমাণ, রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্য ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে সামরিক কর্ম্মচারী কয়-

জনের বিচার, আর সম্প্রতি পাকিস্তান স্রষ্টা মহম্মদ আলী জিন্নার ভগিনী ফতেমা জিন্নার বেতার বক্তৃতা। সে বক্তৃতা যাহাতে শ্রোতারা শুনিতে না পারেন সে চেষ্টা পাকিস্তানের বেতার বিভাগ করিয়াছিলেন।

সভায় সমবেত জনতা হত্যাকারীকে ঘটনাস্থলেই হত্যা করায় হত্যা ব্যাপারের কারণাদি আবিষ্কারে বিলম্ব হইতেছে—হয়ত সে কারণ কখনই জানা যাইবে না।

মৃত্যুকালে লিয়াকৎ আলীর বয়স ৫৬ বৎসর ছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তাঁহার জন্ম, জমীদার দেশমুদ্দোলা শমশের জং নবাব রুস্তম আলী খাঁনের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা ইরাণ হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদে শিক্ষা লাভের পর ইংলণ্ডে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের পর ব্যারিষ্টার হইয়া ভারতে ফিরিয়া ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মসলেম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন। দেশ বিভাগ পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহম্মদ আলী জিন্না তাঁহাকে বিশেষ আদর করেন এবং পাকিস্তানের সৃষ্টি হইলে তিনি স্বয়ং বড়লাট হইয়া লিয়াকৎ আলীকে সে রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান মন্ত্রী করেন। তাহার পূর্ব্বে ভারতে সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডলে তিনি অর্থ-সদস্য ছিলেন এবং তিনি যে বাজেট পেশ করেন, তাহাতে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল।

দেশ বিভাগের পরে তিনি পাকিস্তানের পক্ষ হইতে কাশ্মীর দাবী করিয়া আসিয়াছেন।

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু হত্যার পরে তিনি ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর সহিত এপ্রিল মাসে যে চুক্তি সম্পাদন করেন, তাহাই দিল্লী চুক্তি নামে অভিহিত।

লিয়াকৎ আলী খাঁনের হত্যায় ভারত রাষ্ট্রে যথারীতি শোক প্রকাশ করা হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রে যে প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল দিল্লী চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং সেই চুক্তির ফলে যিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই চারুচন্দ্র বিশ্বাস ঘটনার একইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

জওহরলাল বলিয়াছেন—

"All of us should now try to hush the voice of controversy and dispute and blaming of each other as far as we can......"

বিশ্বাস মহাশয় বলিয়াছেন—

"The voice of controversy must be hushed in the presence of death......"

লিয়াকৎ আলী খাঁনের মৃত্যুতে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন সে রাষ্ট্রে প্রধান মন্ত্রী ও পাকিস্তানের অর্থ-সচিব গোলাম মহম্মদ গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

পাকিস্তানের ভারত রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতির যে কোন পরিবর্ত্তন হইবে এমন মনে করিবার কারণ নাই। খাজা নাজিমুদ্দীন যে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকার নবাব পরিবারের লোক তাহা সকলেই জানেন। বাঙ্গালাই পূর্ব্বে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল এবং তাঁহার নিয়োগে "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছেন—ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত পরিচালকদিগের সম্বন্ধ—

"Cordial and friendly".

বৃটেনে পার্লামেণ্টে সদস্য-নির্ব্বাচন—

বৃটেনের পার্লামেণ্টে নূতন সদস্য-নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতিক দলের অবস্থা ছিল ;—

শ্রমিক দল.........৩১৪ জন
রক্ষণশীল......... ২৯৮ „
উদারনীতিক দল...৯ „
অন্যান্য............৪ „

যুদ্ধের পরে যে নির্ব্বাচন হয়, তাহাতে প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের পরাভব ঘটিয়াছিল। এ বার আবার রক্ষণশীল দলের জয় হইয়াছে—শ্রমিকদলের সদস্যদিগের মধ্যে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প হইয়াছে। রক্ষণশীল দলের নেতা চার্চ্চিলকেই— নিয়মানুসারে—রাজা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার ভার দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চার্চ্চিল যে লয়েড্ জর্জ্জের মত বৃটেনকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইলেও যুদ্ধে জয়ের পরে লোকমত তাঁহাকেই বিতাড়িত করিয়াছিল। ভারতচন্দ্র বলিয়াছিলেন—বড়র ভালবাসা "বালির বাঁধ" —তাহার কার্য্য—"ক্ষণে হাতে দড়ি—ক্ষণেকে বাঁদ।" জনমত সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেনের জনগণ "রক্ষাকর্ত্তা" লয়েড জর্জ্জকে বিতাড়িত করিয়াছিল— তাহারাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে "জয়ত্রাতা" চার্চ্চিলকে বিতাড়িত করিয়াছিল—আবার তাঁহাকেই বরণ করিয়াছে। চার্চ্চিল উগ্র সাম্রাজ্যবাদী। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ প্রায় নামশেষ। চার্চ্চিল যে তাহা পুনর্গঠিত করিতে পারিবেন, সে সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই মনে হয়, তিনি যে বৃটেনের আন্তর্জ্জাতিক নীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন করিবেন, তাহা মনে হয় না। তবে স্বরাষ্ট্রনীতিতে তিনি কিছু পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। ইংরেজ জাতি স্বভাবতঃ রক্ষণশীল। সেই জন্য দশ জন কম্যুনিষ্ট প্রার্থীর এক জনও নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই এবং নির্ব্বাচন-কেন্দ্রের ভোটের এক-অষ্টমাংশও না পাওয়ায় প্রত্যেকেরই জমার টাকা (১৫০ পাউণ্ড) বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

ইরাণ—

ইরাণ তাহার তৈল-সম্পদ জাতীয় সম্পত্তি করিবার চেষ্টা করায় বৃটেন প্রথমে ছলে ও কৌশলে তাহাতে আপনার অধিকার রক্ষার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া বলপ্রয়োগের ভয় দেখাইয়াছিল ; কিন্তু অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তখন নিরস্ত হইয়াছে। বৃটেন এখন জাতিসঙ্ঘে সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু সকল দেশ যখন প্রকৃত শান্তিকামী হয়, কেবল তখনই সেরূপ চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে। সকল দেশ যদি প্রকৃত শান্তিকামী ও স্বার্থান্বেষী না হইয়া স্বার্থত্যাগেও সম্মত হইত

তবে কি কখন সন্ধির চুক্তি সবল কর্ত্তৃক মূল্যহীন ছেঁড়া কাগজ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত? আবার যে সকল দেশ পরস্পরকে সাহায্য করিবার চুক্তিতে বদ্ধ হয়, তাহারাও যে সকল সময় পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারে, তাহা নহে। দেখা গিয়াছে, ফ্রান্স জেকোশ্লোভাকিয়াকে আক্রমণে আপনাকে আক্রান্ত মনে করিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়াও সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই—এমন কি সে বিষয়ে রুশিয়ার সাহায্য গ্রহণেও সম্মত হয় নাই। দেখা গিয়াছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটেন রুশিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলেও য়ুরোপে দ্বিতীয় রণক্ষেত্রে জার্ম্মানীকে আক্রমণ করে নাই। ইরাণের ব্যাপারে আমেরিকাও বৃটেনকে সাহায্য করিবে কিনা এবং সাহায্য করিলে রুশিয়া ইরাণকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে কি না বুঝিতে না পারিয়াই বৃটেন রণতরী সজ্জিত করিয়াও ইরাণকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। চীনও সেই কারণে আক্রমণ হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়াছে। বৃটেনের অবস্থা দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, সে ইরাণকে তৈলসম্পদে তাহার অধিকারে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতে সাহস করিবে না। প্রাচী আর দুর্ব্বল নহে। যদি প্রাচীর দেশসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তবে যে যে কোন মুহূর্ত্তে য়ুরোপ বা আমেরিকা—অথবা য়ুরোপ ও আমেরিকা বিপন্ন হইতে পারে, তাহা বুঝিতে আজ আর কাহারও বিলম্ব হয় না। পরস্পরের ভয়েই হয়ত বিশ্বে শান্তিরক্ষা করিবে।

কোরিয়া—

কোরিয়ায় যুদ্ধ-নিবৃত্তি হয় নাই। অবস্থা বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিতেছেন—আমেরিকা কোরিয়ার ব্যাপারে অনধিকারচর্চ্চা—অর্থাৎ অযথা হস্তক্ষেপ করাতেই সে যুদ্ধের অবসান হইতেছে না। আমেরিকা যে এক পক্ষকে সর্ব্ববিধ সাহায্য দিয়া—ইন্ধন যোগ করিয়া—যুদ্ধের অনলকুণ্ড প্রজ্বলিত রাখিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চীন কম্যুনিষ্ট হইয়াছে। একদিন নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, চীন নিদ্রাগত—উহাকে জাগাইও না—ও জাগিলে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করিবে। চীন জাগিয়াছে—আজ প্রতীচীর শক্তিপুঞ্জ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আর তাহার জন্মগত অধিকারে বঞ্চিত রাখিতে পারিতেছে না। জাপান যুদ্ধে দুর্ব্বল। এই সময় কোরিয়াকে যদি প্রভাবাধীন রাখা যায়, তাহা হইলে প্রাচীতে ক্ষমতা কতকটা রক্ষা করিবার আশায় শ্বেতাঙ্গ শক্তিপুঞ্জ যে চেষ্টা করিতেছে, তাহা সফল হইতেও পারে। আজ শ্বেতাঙ্গ শক্তিপুঞ্জের সহিত পীত ও কৃষ্ণবর্ণ জাতিসমূহের সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। রুশিয়া যে মতবাদের প্রভাবে আজ নূতন শক্তিতে শক্তিশালী সেই মতবাদই চীন গ্রহণ করিয়াছে। আজ চীন তিব্বতকেও তাহার প্রভাবাধীন করিয়া ভারতের সীমান্তে উপস্থিত। ও দিকে ইরাণে "নব অভ্যুদয়"—দেখা যাইতেছে। এই সকল বিবেচনা করিলে কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকার হস্তক্ষেপের কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বৃটেন যে এই ব্যাপারে আমেরিকার অনুগামী তাহাও দেখা গিয়াছে। এই কারণেই অনেকের আশঙ্কা হইয়াছিল, কোরিয়ার যুদ্ধই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণতি লাভ করিবে। সে আশঙ্কার কারণ এখনও দূর হয় নাই বটে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে, হয়ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃত আরম্ভ কোরিয়ায় না হইয়া মিশরে হইবে।

মিশর—

সে আজ অনেকদিনের কথা—লর্ড ডাফরিন বলিয়াছিলেন, মিশর সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে—তথায় মেমনের মূর্ত্তি হইতে অরুণ-কিরণপাতের যেমন গীতধ্বনি শুনা যায়, তেমনই মিশরের অজ্ঞ জনগণ নূতন অবস্থায় মূক হইতে বাচাল হইতেছে। যতদিন মিশরের জনগণ অজ্ঞ ছিল, ততদিন সে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের খেলিবার পুতুল ছিল; সেই খেলানা লইয়া ফ্রান্সে ও বৃটেনে বিবাদ হইয়া গিয়াছে। তখন মিশর তুর্কীর অধীন প্রদেশ—মিশরের শাসক "খদিব" অর্থাৎ তুর্কীর কর্ম্মচারী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ বিশ্বাসঘাতক "খদিবকে" স্বাধীন "রাজা" স্বীকার করিয়া তাঁহাকে তুর্কীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের পক্ষভুক্ত করেন। মিশরীরা কিন্তু সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের পূর্ব্ব-ব্যবহার বিস্মৃত হয় নাই। তাহারা বুঝিয়াছিল, তাহারা স্বাধীনতা পায় নাই। সেই জন্যই তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সুয়েজ খাল তাহারা তাহাদিগের অধীনতার প্রতীক বলিয়া মনে করিত। কারণ, য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ মিশরের স্বাধীনতা মুখে স্বীকার করিলেও মিশরের সুয়েজ খালে কর্তৃত্ব ত্যাগ করে নাই এবং তথায় বৃটিশ সেনাবল রক্ষিত ছিল। মিশরবাসীদিগের এই স্বাধীনতার বাসনা জগলুল পাশা প্রমুখ জননায়কদিগের নেতৃত্বে আত্মপ্রকাশ করিলে ইংরেজ তাহা দমন করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। এ বার সেই সুয়েজখালের নিকটেই ইংরেজের সহিত মিশরের সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ইরাণে ইংরেজ যুদ্ধ করিতে পারে নাই মিশরে করিতেছে। মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহার আশা সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়। সুয়েজ খাল প্রাচীর সহিত প্রতীচীর জলপথে সংযোগ রক্ষা করিতেছে। সেইজন্য তাহাতে বৃটেনের স্বার্থ অত্যন্ত অধিক। ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৫৮
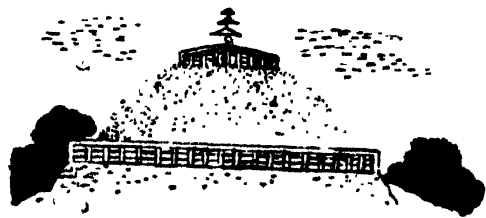
স্রোত-হারা

শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র

ছন্দে গাঁথা যে জীবন মুক্তধারা নির্ঝরের সম,
নির্মল চঞ্চল স্রোত বহে যেত অবিরাম মম।
গতিপথে পথে তা'র মুখর নূপুর কার বাজে
অঞ্জলী দিই ঢালি দুইকূল অপরূপ সাজে।
তন্দ্রাহারা দুই চক্ষে অজস্র রূপের ছবি জাগে,
যাহা দেখি মুগ্ধ হিয়া মাধুর্য্য আনন্দ অনুরাগে।
যা পেয়েছি উপছিয়া মোর প্রাণ পাত্র পূর্ণ করি,
সবারে সঁপিয়া দিছি কিছু তা'র রাখি নাই ধরি।
আমার সে অকৃপণ অন্তরের অযাচিত দান
কেহ তা'রে নিলে কিনা ভালবেসে দিলে কিনা মান
ফিরিয়া দেখিনি চেয়ে আপনার পরিপূর্ণতায়,
চ'লেছি দুর্ব্বার বেগে দুইকূল উপছিয়া যায়।
যা দিয়েছি মূল্য তা'র কোনদিন লই নাই বুঝি,
উজাড় করিয়া দিছি, বিনিময় মনে নাহি খুঁজি।
যে মহাসিন্ধুর ডাক, উত্তাল ভৈরব কলরোল
আজ এই মরাগাঙ্গে, তালে তালে দিয়ে যায় দোল
জীবনে জোয়ার জাগে, যেতে চাই আজ তার পানে
ফিরে আসি রুদ্ধশ্বাসে বিদীর্ণ ভাঁটার টানে টানে।
মরা নদী শুষ্ক হিয়া, তবু তারি মাঝে আজ জাগে,
উষসীর আবছায়া ভোরের রঙ্গিন অনুরাগে।
অসীমের ডাক শুনে ভাঙ্গি পাষাণের রুদ্ধকারা
উন্মত্ত প্রপাত বারি, সকল বন্ধন বাধাহারা।
যে নির্ঝর বাহিরিল বন্ধুর উপল পথ বেয়ে,
সিন্ধুর ইঙ্গিত শুনি উদ্বেগ উচ্ছল গান গেয়ে।
আজ সে কি গতিহারা, হোক তবে অবসান তা'র,
পুরাতন লুপ্ত হোক নূতনেরে সঁপি সব ভার
হিসাব নিকাশে তার নাই কিছু নাই ভুল, ভ্রান্তি,
শান্ত হয়ে আসে স্রোত নেমে আসে সুগভীর শ্রান্তি।

স্বাগত হে অনাগত, খরস্রোতে এস এস নামি
পুরাতনী পথ দাও, ঘুমাও ঘুমাও যাও থামি।
ধূসর উষর কূলে, ফণীমনসার গাছ দোলে
ফোটে ফুল অপরূপ ধন্য করি কাঁটা, তার কোলে—
পূজা উপচারে তার জানি নাই কোন অধিকার,
বরণ মালায় আর বাসর রাত্রির উপহার ;
কোন ঠাঁই নাই হোক্ বিকাশ সার্থক তবু মানি
নীরব প্রকাশ মোর মৌন জীবনের মনে জানি।
আকাশ আভাস বক্ষে অনন্ত অসীম রূপরাশি,
রবির আশীষ প্রাতে নিশীথে চন্দ্রের সুধাহাসি।
সুযুপ্ত আতপ্ত ভালে পরশন বুলায় বাতাস,
মুছে নিক্ ব্যথা ভার বহি মৃদু সুরভি নিঃশ্বাস।
গোধূলির স্বর্ণরাগে রাত্রির বিরাম অঙ্কপরে ;
রজনীগন্ধার গন্ধে অন্ধকারে বিরতির তরে।
প্রকৃতি বিলায়ে যায় দু'করে বৈভব রাশি তা'র,
সর্ব্বসহা ধরিত্রীর শ্যাম অঙ্ক বহে সর্ব্বভার।
দূরে ঘন বনানীর শ্যামল কুন্তলরাশি দোলে,
মর্ম্মরে লতিকা তরু, বিহঙ্গ সঙ্গীতে মন ভোলে।
রূপ সে অরূপে মিশে, অপরূপ রূপায়ন মরি,
অরূপে লখিতে চাহি দু'নয়ন নিমীলিত করি।
অধরা দিবে কি ধরা আবেশ শিথিল বাহুবন্ধে,
অচিন চিনায়ে লবে নব তানে সুরে লয়ে ছন্দে।
অজানা লইবে ডাকি অসীম পথের সাথী হ'য়ে,
বাজায়ে সংকেত বেণু ভালবেসে হাতে ধরি লয়ে।
কান পেতে শোনো শোনো নূপুরের ধ্বনি যায় শোনা,
ছয়ঋতু সাথে তার ধীরে করে তীরে আনাগোনা।
নয়নে আসুক সুপ্তি নিশ্চিন্ত বিরামভরা শান্তি
নিরলস স্রোতধারা গতিহারা লভে চির ক্লান্তি।

রাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চ্চা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিগত ৯ই জুন আমরা বার্ণপুর আগমনী সাহিত্য সভা সম্মিলনীর অধি-বেশনে গিয়াছিলাম। সভার কর্ত্তৃপক্ষ সাহিত্য, কিশোর-সাহিত্য ও বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মূল সভাপতি ছিলেন—স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক ও গবেষক শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, আর কিশোর সাহিত্য শাখায় আমাকে পৌরোহিত্য করিতে হইয়াছিল। বিজ্ঞান শাখার সভাপতি গোপালবাবুর বিজ্ঞান সম্বন্ধে অভিভাষণ অতি তথ্যপূর্ণ এবং উপাদেয় হইয়াছিল। বিজ্ঞান-প্রসঙ্গে সেন্টপলস্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত গৌরদাস মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী ভাষণ দেন, কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন "বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ব্বে সেরূপভাবে কেহ আলোচনা করেন নাই"—এবং এজন্য তাঁহার মন্তব্য স্থানে স্থানে অযৌক্তিক ও অপ্রামাণিকভাবে কঠোর হইয়া-ছিল। গৌরদাসবাবু বাঙ্গলা দেশে বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞানের আলোচনা চান—পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রচারিত হয় সে সম্বন্ধেই ছিল তাঁর বক্তব্য—কিন্তু তাঁর অভিযোগ সত্য নয়, সে কথাই এখানে বলিব। পূর্ব্বাচার্য্যগণের কৃতিত্ব ও দান অস্বীকার করা শ্রেয়ঃ নহে ও সঙ্গত নহে।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আলোচনা আরম্ভ হয় এবং বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিকপত্র ও বিবিধ গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হইয়াছিল। আর সেকালের অধিকাংশ মাসিকপত্রেই বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ থাকিত, চিত্র থাকিত এবং সঙ্গে সঙ্গে সরল ভাষায় বক্তব্য বিষয় বুঝাইবার চেষ্টাও ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের ইতিহাস ও দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস প্রভৃতির সঙ্কলন-কর্ত্তা শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের যে তালিকা সংকলন করিয়াছেন তাহা হইতে দেখিতে পাই যে ১২২৫ সালে (১২ই এপ্রিল—১৮৬৮) শ্রীরামপুর হইতে "দিগ্দর্শন" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। তাহার সম্পাদক ছিলেন—জে. সি. মার্শম্যান, ঐ পত্রিকায়, বিজ্ঞান, দর্শন ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ থাকিত। এখানে কয়েকখানি পত্রিকার উল্লেখ করিলাম। বিস্তারিত পরিচয় এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

বোধ বিকাশিনী—(পাক্ষিক) প্রকাশকাল ১লা আশ্বিন ১২৭৫, প্রথম সংখ্যার সূচী···ঈশ্বর-স্তব, ভূমিকা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিজ্ঞানঘটিত প্রশ্নোত্তর! সাহিত্য-সংগ্রহ নামক একখানি মাসিক পত্র (আশ্বিন ১২২৭) (সেপ্টেম্বর—১৮৭০) ইহাতেও বিবিধ সংস্কৃত, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদির সহিত বিজ্ঞান, শিল্প, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। সুলভ সমাচার (সাপ্তাহিক) কাগজখানি অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১৫ই নভেম্বর ১৮৭০) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভা হইতে প্রকাশিত হয়। সুলভ সমাচারের মূল্য ছিল এক পয়সা।........"হিত-উপদেশ, নানা সংবাদ,...... সাধারণের পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্যক, চাল ডাল প্রভৃতির দর এবং বিজ্ঞানের মূল সত্যসকল যতদূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে ইহাতে সেইরূপ ভাবে সচিত্র ও সুন্দর, অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইত। সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পন (মাসিক বৈশাখ ১২৮৯, মে ১৮৮২) এই মাসিক পত্র ও সমালোচনের সম্পাদক ছিলেন—প্রাণানন্দ কবিভূষণ; ইহা ৫নং দ্বারকনাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত হইত। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পাদক ১ম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন: "বর্ত্তমান ভারতবর্ষের এই বিজ্ঞানচর্চ্চায় প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কেহই ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। শীঘ্রও যে কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, আমরা ইহার সোপানমাত্র গঠনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য এই, অপেক্ষাকৃত কৃতবিদ্য ও কৃতচিত্ত লোকেরা আমাদের এই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যাহা হউক, আমাদের কল্পিত সোপান বিজ্ঞান-দর্পন নামে আখ্যাত হইল এবং ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাষায় গ্রথিত ও
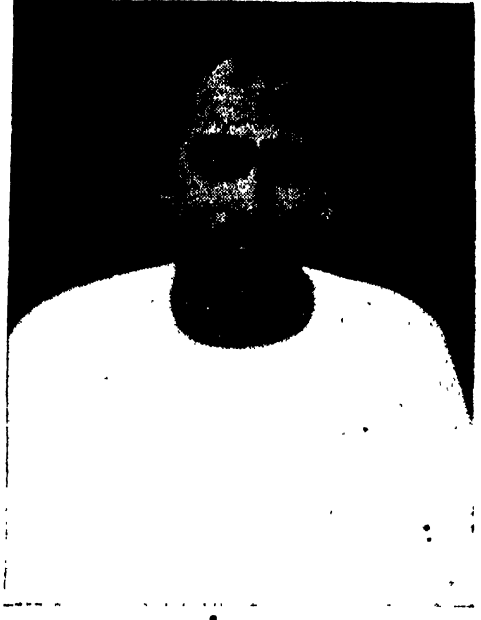
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এম-ডি (বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠাকালে)

সমালোচিত বিজ্ঞান শাস্ত্র সকলের সরল বাঙ্গালায় অনুবাদ মাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে। সেই অনুবাদিত বিষয় যাহাতে বিশদ বা অনায়াসেই হৃৎপ্রতীত হইতে পারে, তজ্জন্য চিত্রাদি প্রভৃতি উপায় সকলও অবলম্বিত হইবে। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য যে, বিজ্ঞান বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কৃতশ্রম ও কৃতকৃত্য বহুদর্শী ব্যক্তিগণই ইহার লেখকপদে মনোনীত হইয়াছেন।"

"বিজ্ঞান দর্পনে" শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের "পাথুরিয়া কয়লা," কালীবর বেদান্তবাগীশের "বার্ত্তাশাস্ত্র বা জীবিকা তত্ত্ব" প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

"রামধনু"—(সাপ্তাহিক) জুন ১৮৮২। এই সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র ঢাকা কলেজের লেবরেটারি এসিস্‌টেন্ট শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এই পত্রিকাতে শিল্পবিজ্ঞানাদির বিষয় লিখিত হইত। আমরা শৈশবে এই পত্রিকাখানি পরম সমাদরের সহিত পড়িতাম এবং

বিজ্ঞান দর্পণ প্রকাশকালে শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

লিখিত প্রবন্ধ অনুসারে হাতে কলমে পরীক্ষা করিতে মনোযোগী হইয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। সুরভি (সাপ্তাহিক) ১ আশ্বিন ১২৮৯ (ইং ১৮৮২)—আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এই পত্রিকার কার্য্য সম্পাদিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ...শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক। —সুরভি যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সুরভি পত্রিকাখানি কিছুকাল পরে 'পতাকা'র সহিত মিলিত হইয়া 'সুরভি ও পতাকা' নাম ধারণ করে।

সখা (মাসিক) জানুয়ারী ১৮৮৩। প্রমোদাচরণ সেন বালকবালিকাগণের জ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত এই সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। আড়াই বৎসর কাগজখানি চালাইবার পর ১৮৮৫ সনের ২১শে জুন, ২৭ বৎসর বয়সে প্রমোদাচরণের মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী জুলাই মাস হইতে পণ্ডিত "শিবনাথ শাস্ত্রী" সখার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ৪র্থ বর্ষের (ইং ১৮৮৬) পর অন্নদাচরণ সেন পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে "সখা" ভুবনমোহন রায় পরিচালিত সাথীর সহিত মিলিত হইয়া "সখা ও সাথী" নাম ধারণ করে। "সখা" "সখা ও সাথী" পত্রে সুন্দর সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছবিসহ প্রাঞ্জল ভাষায় বালক বালিকাদের বুঝিবার উপযোগী করিয়া প্রকাশিত হইত। আমার কাছে 'সখা ও সাথীর' কিছু কিছু সংগ্রহ আছে। "মুকুল" নামক শিশু ও বালকবালিকাগণের পত্রিকায় অতি মিষ্ট ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত
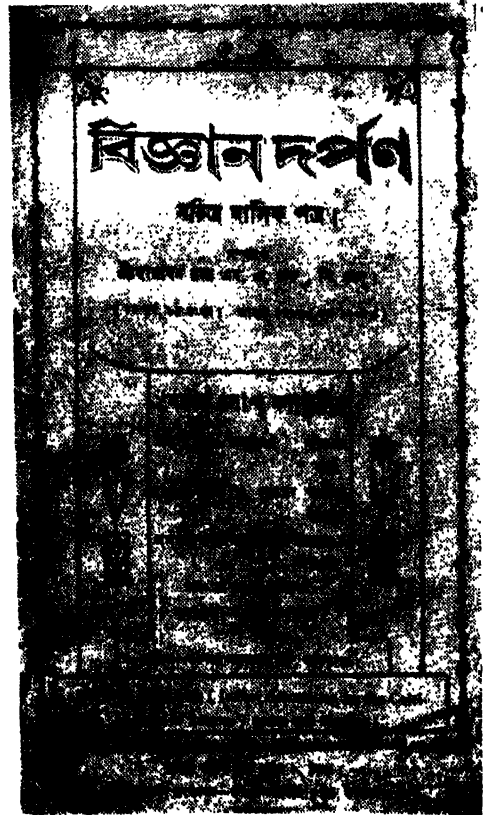
বিজ্ঞান দর্পণের মলাট (প্রথম বৎসর)

হইত। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র সেই পত্রে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে অতি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সন্দেশের কথা সকলেই জানেন।

সুদূর মফঃস্বল হইতে যে সমুদয় মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত তাহাতেও বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে শ্রীযুক্ত শিবদয়াল ত্রিবেদীর সম্পাদনায় ১২৮৫ (ইং ১৮৭৮) আর্য্য-প্রদীপ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল—সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনার্থে যাহাতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (মাসিক) ১২৭৯ বৈশাখ (১২ এপ্রিল ১৮৭২)। সত্য সত্যই সে যুগে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনব প্রাণ ও আনন্দ আনিয়া দিল। সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের লেখায় ইহার পৃষ্ঠা শোভিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনে" ইতিহাস, বিজ্ঞান, উপন্যাস, পুরাতত্ত্ব, গল্প, ভাষাতত্ত্ব, ভ্রমণ—প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। তিনি নিজেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। সে সকল চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ এখনও স্কুলপাঠ্যগ্রন্থে সমাদরে সঙ্কলিত হইয়া থাকে।

সেকালে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা শ্রীকৃষ্ণ দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইত। ইহাতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করিতেছি যে,—"জ্ঞানাঙ্কুর" একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা ছিল ; তাহাতে যেমন সুন্দর সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তেমনি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা" উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা 'বনফুল', 'প্রলাপ' ও প্রথম পদ্যরচনা স্থান পাইয়াছিল।

ঢাকার সুবিখ্যাত লেখক—কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধব' পত্রিকা আষাঢ় ১২৮১ (জুন ১৮৭৪) সালে প্রকাশিত হয়। বান্ধব কালীপ্রসন্নের অতুলনীয় কীর্ত্তি। 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বিজ্ঞানের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার 'বান্ধব' পত্রেও বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনের' ন্যায় বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই, প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা হইয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে।

১২৯৭ সালে 'জন্মভূমি' নামে একখানি মাসিকপত্র স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইত। এই যোগেন্দ্রবাবুই ছিলেন "বঙ্গবাসী" নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক। যোগেন্দ্রবাবু সম্পাদিত 'জন্মভূমি' পত্রে ভূতত্ত্ব, বিজ্ঞানের বিবিধ প্রবন্ধ, পাথুরে কয়লা, স্বর্ণ, গ্যাস, লৌহ প্রভৃতি বিবিধ খনিজদ্রব্য সম্বন্ধে সুলিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক ছিলেন—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী কালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করেন। বিদ্যাকল্পদ্রুম সম্পাদন করেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জ্ঞানবৃক্ষ' নামে খণ্ডে খণ্ডে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইত—আমরা উহার চতুর্থ খণ্ড দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। সম্ভবতঃ 'জ্ঞানবৃক্ষ' প্রকাশ করিতেন খৃষ্টীয় মিশনারীরা। এই গ্রন্থে বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, বাইবেলের গল্প, গ্রহণের কথা, মেঘধনুর বিবর, ধূমকেতুর বিবর, প্রভৃতি বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে পাঠক ও পাঠিকাগণ জানিতে পারিতেছেন—বাঙ্গলা সাহিত্যে সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচনা হইত। "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকাতেও বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান বিষয়ে যেরূপ আলোচনা হইয়াছিল তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। ১২৯৮-৯৯ সালে শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক 'সাধনা' মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। তাহার লেখক ছিলেন—দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি। ঐ পত্রে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক সংবাদ লিখিতেন। সে সমুদয় প্রবন্ধ ছিল যেমন সুলিখিত তেমনি চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রনাথ কবি হইলেও ছিলেন বৈজ্ঞানিক, তাঁহার প্রবন্ধ ও কবিতায় তাহা পরিস্ফুট। সেই বৈজ্ঞানিক প্রেরণাই তাঁহাকে ভবিষ্যতে "বিশ্বপরিচয়" লিখিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সেকালের সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য'

বিজ্ঞান দর্পণের মলাট (দ্বিতীয় বৎসর)

পত্রেও নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। আজ সেকথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এক তরুণ কিশোর বিজ্ঞান দর্পণ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সেই কিশোরের নাম—নরেন্দ্রনাথ বসু। নরেন্দ্রনাথ সে সময়ে বিজ্ঞান সভার একজন ছাত্র ও রাসায়নিক বিশ্লেষক ছিলেন। পত্রিকাখানির সম্বন্ধে আমরা এইবার আলোচনা করিব।

বিজ্ঞান সভার ইতিহাস—অনেকেরই এখন স্মৃতির বহির্ভূত। আমাদের দেশে যাহাতে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা হয়, সেই সম্বন্ধে ১৮৬৯

খৃষ্টাব্দে চিকিৎসা বিষয়ক একখানি মাসিকপত্রে ডাক্তার ৺মহেন্দ্রলাল সরকার এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার ইহাই প্রথম সূচনা। তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সেজন্য পর বৎসর তিনি তিনটি প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাবের মর্ম্ম এইরূপ।

(১) এদেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার নিমিত্ত কলিকাতায় একটি সভা স্থাপিত হউক, এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাহার সহিত সংযোগে সভা সংস্থাপিত হউক। (২) নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতে যে সমুদয় প্রাচীন পুস্তক আছে, তাহাও প্রকাশিত করা এ সভার আর একটি উদ্দেশ্য হইবে। (৩) এই সভার নিমিত্ত গৃহ, নানারূপ যন্ত্র ও কার্য্য সম্পাদনের লিখিত লোকের আবশ্যক। ইহার জন্য অর্থের প্রয়োজন। চাঁদা স্বরূপ সেই অর্থ সাধারণের নিকট গৃহীত হউক।

মহেন্দ্রলাল সরকার এবং দেশবাসীর অনুকূল সহযোগিতায় অবশেষে ১৮৭৬ সালের জানুয়ারী মাসের ১৬ তারিখে, উদ্যোগীগণ ও উপস্থিত সভ্যগণ একবাক্য হইয়া ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা সংস্থাপন করিলেন। সভা দ্বারা কি কি কার্য্য সম্পাদিত হইবে ও কোন্ কোন্ ব্যক্তি ইহার কার্য্যকরীরূপে কার্য্য করিবেন, এই অধিবেশনে সে সমুদয়ও স্থির হইল।

"বিজ্ঞান সভা এইরূপে সংস্থাপিত হইল। বিজ্ঞান সভা এবং ইহার সমুদয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য সাধারণের পক্ষ হইতে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন। ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহারাই সভার সম্পত্তির অধিকারী ও তাঁহারা সেই সভার তত্ত্বাবধান করিতেছেন।" * * এককালীন দান ও মাসিক চাঁদা স্বরূপ কার্য্যাধ্যক্ষগণ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। বিজ্ঞানাগারের বাটী খরিদ, পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ, যন্ত্র ও পুস্তক ক্রয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে কার্য্যাধ্যক্ষগণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত এখনও সভার দেড় লক্ষ টাকার অধিক মূলধন জমা আছে। * * সভার সম্পত্তির মূল্য এক্ষণে প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা। ইহা হইতেছে ১৯০৯ সালের কথা।

তরুণ নরেন্দ্রনাথ 'বিজ্ঞান দর্পণ' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন—মাঘ ১৩১৫, জানুয়ারী ১৯০৯। সূচনায় নরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন :—"বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সকলের মনে এক নব ভাবের উদয় হইয়াছে যে ভারতের উন্নতি সাধন করিতে হইবে, কিন্তু কিসে যে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে সে বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারিতেছি না। স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে আধুনিক জ্ঞান-সঞ্চয় অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি কখনও উন্নত হইতে পারে না। বিজ্ঞান শিক্ষার বলেই আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ এত উন্নত হইয়াছে এবং জাপান শীঘ্র শীঘ্র উন্নত হইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রকে যে ভাবে কৃষিকার্য্যে ও কারুকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া অন্যান্য দেশের লোক প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইতেছেন, আমাদিগকে এক্ষণে সেই জ্ঞান অধিকার করিতে হইবে। * * প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার ৺মহেন্দ্র-লাল সরকার মহাশয় স্থির বুঝিয়াছিলেন যে দেশবাসী সাধারণের মনে বিজ্ঞান-শিক্ষার বীজ বপনই ভারতের উন্নতির প্রধান উপায়। তাঁহার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি কিরূপ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সভা" সে বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেশবাসীর মনে যাহাতে বিজ্ঞানের আদর বৃদ্ধি পায় সেজন্য সকলের সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ৺সরকার মহাশয়ের প্রদর্শিত পথই যে ভারতের উন্নতি বিধানের প্রধান পথ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।" "...সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার করিতে হইলে, বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ প্রধান উপায়। সর্ব্বজ্ঞানময় পরম পিতা পরমেশ্বরের অভয় পদ স্মরণ করিয়া সাধারণের মনে বিজ্ঞান শিক্ষার আদর বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞান দর্পণ মাসিক-পত্র প্রকাশ করা হইল। দেশবাসী ইহাকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন জানিনা, ইহা যদি 'পাঠকের মনে বিজ্ঞানশিক্ষার

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হল

(ভ্রমক্রমে এই ছবিটি গত আশ্বিন সংখ্যায় অন্য একটি প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল।)

বীজ বপন করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।'

পত্রিকাখানির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল সর্বত্র ১৲ এক টাকা। কার্য্যাধ্যক্ষ "বিজ্ঞান দর্পণ"—৪নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

প্রথম সংখ্যার সূচী এখানে দিলাম: বিষয়—সূচনা, উদ্দেশ্য, শিলাবৃষ্টি নিবারক ব্যোমযান, বিজ্ঞানসভার ইতিহাস, এলুমিনিয়ম ধাতু এবং উহার প্রয়োজনীয়তা, রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস, জীবনীশক্তির মৌলিক উপাদান, বিবিধ, ম্যালেরিয়া। প্রথম বর্ষে অনেক প্রসিদ্ধ লেখক ইহাতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—শরৎচন্দ্র রায়, প্রবোধচন্দ্র বসু, অমৃতলাল সরকার, নরেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার মিত্র, সম্পাদক হারাধন রায়, সত্যরঞ্জন সেন, মন্মথলাল সরকার, আশুতোষ দে, শরৎচন্দ্র দে, 'বিজ্ঞান দর্পণের' সম্পাদক ছিলেন শ্রীহারাধন রায়, এম-এ. এফ-সি-এস। কার্য্যাধ্যক্ষ 'বিজ্ঞান দর্পণ'—ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা। ২১০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। প্রথম বর্ষ (১৯০৯ জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর; ১৩১৫ মাঘ হইতে ১৩১৬ পৌষ)। প্রথম বর্ষের প্রবন্ধের মধ্যে—বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য—আলোকচিত্রণ, উত্তর মেরু, উদ্ভিদের জ্বর, এলুমিনিয়ম ধাতু এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা, খাদ্যে ভেজাল, খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ, গঠন যন্ত্র, জীবনীশক্তির মৌলিক উপাদান, তড়িৎ, তাপ, ভূমিকম্পের পূর্ব্বাভাষ, বিজ্ঞানসভার ইতিহাস, বিদ্যুৎপরিচালক দণ্ড, বৈজ্ঞানিক উন্নতির পরিণাম, ভূমিকম্প, সৌরশক্তি, রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস, রেডিয়াম, হীরক, হেলির ধূমকেতু প্রভৃতি। ২য় বর্ষ বৈশাখ ১৩১৭, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

আমরা 'বিজ্ঞান দর্পণের' দ্বিতীয় বৎসরের ৪র্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই চারিটি সংখ্যায় যে সমুদয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার বিষয়ও উল্লেখ করিলাম, এই চারি সংখ্যায় ছিল ফাদার ই লাফোঁর জীবনী, ক্লোরিণ, গ্রাফাইন, ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ, সার, চিনি, প্রাচীনতা ও নবীনতা, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, তাপ, এড়ি রেশম, বিবিধ, ম্যালেরিয়া, মানব, কাচ ছিদ্র, ক্লোরিনের সহিত অম্লজানের যৌগিক, মক্ষিপাশ, বৈদ্যুতিক দীপ, কাগজের নৌকা, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি প্রবন্ধ। লেখক ছিলেন—সম্পাদক হারাধন রায়, নরেন্দ্রনাথ বসু, শরৎচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র দে, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, সত্যরঞ্জন সেন, সুকুমার মিত্র প্রভৃতি। পূর্ব্বতন লেখকগণ ব্যতীত লালমোহন ঘোষাল, মন্মথনাথ সরকার, আশুতোষ দে, মন্মথধন রায়, প্রণবপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি।

হারাধনবাবু সম্পাদক ছিলেন এবং এই পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতেন, কিন্তু যে তরুণ কিশোর অন্তরালে থাকিয়া ইহার জন্য প্রবন্ধও গ্রাহক সংগ্রহ করিতেন, মুদ্রণ ও প্রচারের ব্যবস্থা করিতেন এবং আর্থিক সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই তরুণ বয়সেই এই পত্রিকার প্রচার কল্পে ও উন্নতির জন্য, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় হইতে আরম্ভ করিয়া সেকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের দুয়ারে দুয়ারে হানা দিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়াছেন এবং বিজ্ঞান দর্পণের যিনি ছিলেন সর্বময় পরিচালক এবং যিনি সেই তরুণ বয়সেই বিজ্ঞান সভার আজীবন সদস্য হইয়াছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথ বসুর নাম বিজ্ঞান প্রচার বিষয়ে অনেকেরই অজ্ঞাত। নরেন্দ্রবাবু বিজ্ঞান সভার ছাত্র ও গবেষক ছিলেন। অনেকে হয়ত জানেন না, নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান-সভার গবেষণাগারে গবেষণা করিতেন, যেমন করিতেন বিজ্ঞান সভার ছাত্রগণ, তেমন ছিলেন নরেন্দ্রনাথবসু মহাশয়। নরেনবাবু বিজ্ঞান দর্পণে যে সমুদয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে প্রথম বর্ষে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ছিল—সূচনা, বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনী এইরূপ বিস্তারিত-ভাবে তৎকালে আর কেহ লেখেন নাই—এখনও লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। ঐ জীবনীতে ডাক্তার সরকার কিরূপে বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহার কথাও আছে। ইহা পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। তিনি পশুচিত্তে ভূমিকম্পের পূর্ব্বাভাষ, দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায়
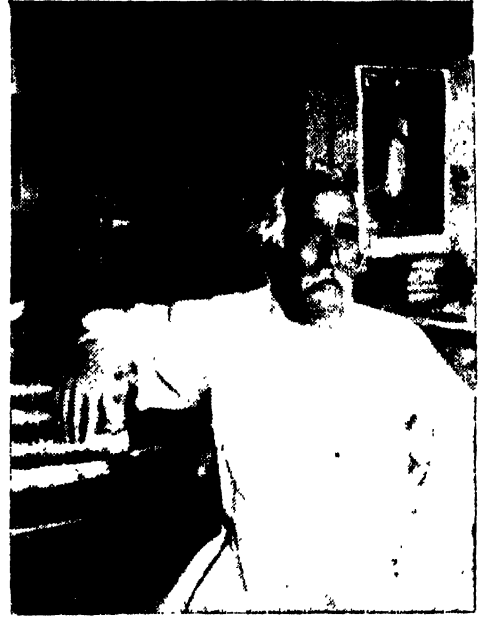
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার (বৃদ্ধ বয়সে)

"নববর্ষ সম্ভাষণ", ফাদার লাফোঁ, এড়িরেশম, কৃত্রিম রেশম, দর্শন প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 'বিজ্ঞান দর্পণ' কি প্রবন্ধগৌরবে, কি চিত্রে, কি মুদ্রণ-পারিপাট্যে সর্ববিষয়ে চিত্তাকর্ষক ছিল। নরেন্দ্রবাবু দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার "নববর্ষ সম্ভাষণে" লিখিয়াছিলেন, "সকল বিজ্ঞানের আদি যিনি, সকল বিজ্ঞানের অন্ত যিনি, যাঁহার অসীম জ্ঞানসমুদ্রের বিন্দুমাত্র বারিলাভে বৈজ্ঞানিকগণ জগতে নিত্য নিত্য নব তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হইতেছেন, সেই সর্বজ্ঞানময় পরম পিতা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে 'বিজ্ঞান দর্পণ' পূর্ণ এক বৎসর কাল নানা বাধাবিঘ্ন ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা ভোগ করিয়াও নববেশে, বর্দ্ধিত কলেবরে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল'। * *

কিন্তু আমাদের দেশে, নব্য ভারতের প্রধান অংশ, আধুনিক উচ্চ শিক্ষার আবাসস্থল, বঙ্গদেশে একখানা মাত্র বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্যক প্রচার

সংশোধিত হইল না, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? * * * পরিতাপের বিষয় বলিয়াই 'বিজ্ঞান দর্পণ' অকালে সে সময়কার একমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ে পত্রিকাখানি দেড় বৎসর কাল মাত্র চলিয়া উঠিয়া গিয়াছিল।

এই পত্রিকাখানির কথা কেহ বড় একটা জানেন না, কিংবা প্রবন্ধ ইত্যাদিতে উল্লেখও করেন না,—"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে সময়ের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক ও খ্যাতনামা ব্যক্তি যেমন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রসায়নবিদ্ পণ্ডিত চুনীলাল বসু এবং বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় মনীষী ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হইয়াও নরেন্দ্রনাথকে ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। কাজেই বিজ্ঞান দর্পণের আয়ু হইয়াছিল অল্পকালস্থায়ী। আমাদের যতদূর মনে পড়ে কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্বিংশ অধিবেশনে (এপ্রিল ১৯৪৭) বিজ্ঞান শাখার সভাপতি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

তাঁহার (পুস্তিকাকারে মুদ্রিত) ভাষণে বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গলাভাষা বর্ত্তমানে পৃথিবীর অন্যতম ভাষারূপে গণ্য। বাঙ্গলাভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যাও অল্প নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলাভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন পত্রিকা নাই।"

অতি আনন্দের কথা যে, তাঁহার এই দুঃখ প্রকাশের বৎসর কালের মধ্যেই (১৯৪৮, জানুয়ারী), কলিকাতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে পত্রিকাখানি বিজ্ঞানানুরাগী বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেও সক্ষম হইয়াছে। অধুনা-স্বর্গত ডক্টর নিয়োগী তাঁহার জীবিত কালের মধ্যেই এই পত্রিকাখানির প্রকাশ দেখিয়া আনন্দলাভ করিয়া গিয়াছেন।

ডক্টর নিয়োগী তাঁহার ভাষণে আরও বলিয়াছিলেন—"বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে (১৯০৯) ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার (সায়েন্স এসোসিয়েশন) ছাত্রগণ বিজ্ঞান-দর্পণ নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক ছিলেন। পত্রিকাখানি মাত্র দেড় বৎসর চলিয়াছিল।"

অভিভাষণটী পাঠ করার পর হইতেই আমি "বিজ্ঞান দর্পণ" পত্রিকা একবার দেখিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। সম্প্রতি ৪২ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "বিজ্ঞান-দর্পণ" পত্রিকার সকল সংখ্যা দেখিবার আমার সুযোগ লাভ ঘটিয়াছে। আমি উক্ত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, বর্ত্তমানের সুপরিচিত প্রবীণ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসুর নিকট হইতে আবশ্যক সংবাদও সংগ্রহ করিয়াছি।

নরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—"স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৮ অব্দের শেষের দিকের কথা। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার (Indian Association for the Cultivation of Science) রসায়ন বিভাগের (Commercial Analysis Department) প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর চতুর্দ্দশজন নিয়মিত ছাত্র মিলিয়া আমরা স্থির করিলাম যে, দেশবাসীর মনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার জন্য একখানি বাংলা মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে হইবে। বিজ্ঞানসভার কর্তৃপক্ষকে আমাদের সঙ্কল্পের কথা জানাইতে তাঁহারা কোন উৎসাহ দিলেন না বা নিষেধও করিলেন না। দুই তিন মাস ধরিয়া জল্পনা-কল্পনা ও তোড়-যোড়ের পর ১৯০৯ জানুয়ারী মাসে (মাঘ ১৩১৫ সাল) "বিজ্ঞান-দর্পণ" পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হইল। অন্তরের প্রবল স্বাদেশিকতা, মাতৃভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং অদম্য উৎসাহ মাত্রই আমার সম্বল ছিল। এতবড় দায়িত্ব লইবার শক্তি যে তখনও আমার হয় নাই, তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরই বুঝিতে পারিলাম—আমাকেই সব ভার লইতে হইবে, আর কোন সহপাঠীর নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা অতি কম। আমি ছাত্রবন্ধুদের সকলের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম—তখনও আমার বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হয় নাই।"

বাঙ্গলায় সাহিত্য সম্মেলনেও বিজ্ঞান শাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী, ডি, এন, মল্লিক ও অপর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ সম্মেলনে বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাষায় অতি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সে কথা কি আমরা অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিস্মৃত হইলাম!

আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে বক্তব্য এই যে যাঁহারা কোনরূপ গবেষণা বা অনুসন্ধান না করিয়া বাঙ্গলাভাষাও সাহিত্যে বিজ্ঞান চর্চ্চা হয় নাই, গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় নাই, এইরূপ অমূলক মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য এখানে সংক্ষেপে এবিষয়ে আলোচনা করিলাম।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিগত অর্দ্ধশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কি কি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা

সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির হইতে প্রকাশিত—"সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা"গুলি যদি কেহ পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন—উহাতে যেমন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলিত হইয়াছে, তেমনি বহু খ্যাতনামা লেখকের লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—এসব বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যে কোন বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি যদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইত প্রকাশিত এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত পরিষৎ পরিচালনার ৮৪ পৃষ্ঠা হইতে ৮৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে কত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন বিজ্ঞানের উপাসক, তিনি কেমন করিয়া হঠাৎ মত না বদলাইয়া ফেলিয়া উপন্যাস ও গল্প লিখিতে সুরু করিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হইয়াছিল—১৩১৮ সনের বৈশাখ মাসের ১-৩ দিন। সেই চতুর্থ বার্ষিক সম্মিলনের মূল সভাপতি হইয়াছিলেন—বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁহার অভিভাষণের নাম ছিল বিজ্ঞান সাহিত্য। সেই অমূল্য প্রবন্ধ হইতে সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিলাম, আশা করি প্রত্যেক সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক উহা স্মরণ রাখিবেন :—"বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই—কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্ব্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্ম সম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাহির করিতে পারে না; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে "যেন" যোগ করিয়া দিতে হয়।"

"বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্ব্বদা আত্ম সম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক যেখানে না মেলে, সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।"

উপসংহারে তিনি বলিয়াছিলেন :—"সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের নিজের মধ্যে কাজ করিতেছে। আমাদের জীবনে আমাদের যে জাতীয় সত্তা লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনী শক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তোলা আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্থান বেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।"

সেই আমাদের সৃজন শক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্য পরিষদে আজ মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। এই পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথ পার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবন দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয় উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার স্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।"

আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান যুগের তরুণ বৈজ্ঞানিকগণ যদি বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের এই বাণী অন্তর মধ্যে গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য পরিষদ মন্দিরে প্রবেশ করেন তবে তাঁহারাও ধন্য হইবেন—জাতিও ধন্য হইবে। আর এককথা নরেন্দ্রবাবু যদি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সমুদয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, পত্রিকা ও বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক যে সমুদয় গ্রন্থ, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সংকলন করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করেন, তবে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

নূতন গভর্ণর—

পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর বা রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন ও তাঁহার স্থানে ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় নূতন গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া গত ১লা নভেম্বর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্য, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাপ্রণালী, শিক্ষাবিস্তারে বিরাট দান, বাংলার

সস্ত্রীক ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ফটো—তারক দাস

প্রতি তাঁহার প্রীতি, অসাধারণ বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি প্রভৃতির জন্য সর্বজনপরিচিত। তাঁহার বর্তমান বয়স ৭৫ বৎসর; ১৮৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি রিপন কলিজিয়েট স্কুল, রিপন কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভের পর ১৮৯৮ সালে এম-এ পাশ করেন ও সিটি কলেজের অধ্যাপক হন। ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তথায় কাজ করিয়া তিনি ৩ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন—পরে ১৯১৮ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত তিনি কলেজসমূহের পরিদর্শকের কাজ করেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এচডি ডিগ্রিও লাভ করেন। ১৯০৪ সালে তাঁহার একমাত্র কন্যা ও ১৯১৯ সালে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি কয়েক লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। তিনি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি, নিখিল ভারতীয় খৃষ্টান সমিতি প্রভৃতির সভাপতিরূপেও দীর্ঘকাল সমাজ-সেবার কাজ করেন। ১৯৩৭ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে গণ-পরিষদের সদস্য হইয়া তাহার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এতাবৎ তিনি ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্যরূপে কাজ করিতেছিলেন। ১৯৩৭ হইতে তিনি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের প্রধান সম্পাদক পদে কাজ করিতেছেন। কলেজে অধ্যাপনা-কালে তিনি পাটকল ও কয়লা খনির শ্রমিকদিগের মধ্যে মাদকতা বর্জনের আন্দোলনে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর

স্বর্গত সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র অস্থায়ীভাবে কয়েক মাস গভর্ণরের কাজ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অধ্যাপক হরেন্দ্র-কুমার স্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ায় এবং তাঁহার জনপ্রিয়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

পশ্চিম বাংলার নূতন রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়
ফটো—তারক দাস

তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, সততা, পবিত্র জীবনযাপন প্রথা প্রভৃতি গুণ তাঁহাকে যে উচ্চ সম্মান দান করিয়াছে, সেজন্য সকলেই গৌরব বোধ করিতেছে।

কংগ্রেসের বাণী—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে 'কংগ্রেস সন্দেশ' নামক যে পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীজহরলাল নেহরু 'কংগ্রেসের বাণী' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন —"এখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, এখন কংগ্রেসের বাণী কি? আগের আমলে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপরই জোর দিয়া আসিতেছিলাম এবং তাহা সঙ্গতই হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষে স্বাধীনতার অর্থ রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইতেও বড়। স্বাধীনতার অর্থ আমাদের নিকট ঐক্য এবং আমাদের পশ্চাদপদ ভ্রাতাভগ্নীদের সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতি বিধান। উহার অর্থ সাম্প্রদায়িক এবং অন্যান্য যে সমস্ত ব্যাপার আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহার অবসান ঘটাইয়া পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, ইহাই এখনও কংগ্রেসের বাণী।"

শ্রীজহরলাল নেহরুর দান—

খাসি জাতিদের মধ্যে সমাজসেবা কার্য্য করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু আসাম চেরাপুঞ্জি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শুদ্ধবোধানন্দকে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে নেহরুজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সমাজ-সেবা কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতে সমাজসেবা কার্য্যে যতগুলি প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত, তন্মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শুধু সর্ব-বৃহৎ নহে—সকল বিষয়ে সুষ্ঠু কার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রীনেহরু সরকারী কার্য্যে তাঁহাদের সহযোগিতা গ্রহণ করিলে সরকারের সুনাম বৃদ্ধি পাইবে এবং কার্য্যও উৎকৃষ্টতর-ভাবে সম্পাদিত হইবে। শ্রীনেহরুর এই দানে তাঁহাকে আমরা অভিনন্দিত করি।

ধান্যের ক্রয়মূল্য বৃদ্ধি—

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে গভর্ণমেণ্ট যে ধান্য ক্রয় করিবেন, তাহার মূল্য কৃষকদিগকে মণ-করা সাড়ে ৭ টাকা স্থলে সাড়ে ৮ টাকা দেওয়া হইবে। সরকার কর্তৃক ধান্য ক্রয়ের মূল্য বৃদ্ধির জন্য বহু দিন হইতে আন্দোলন চলিতেছিল—কাজেই এই ব্যবস্থায় সকলে সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে চাউলের বিক্রয় মূল্য না বাড়িয়া সরকারের মধ্যস্থ বিভাগের খরচ কমানো হয়, তাহার ব্যবস্থা হইলে লোক উপকৃত হইবে। এ বিষয়ে আমরা খাদ্য-মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করি।

কাশ্মীর গণ পরিষদ—

গত ১৭ই অক্টোবর কাশ্মীরের গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচন শেষ হইয়াছে—৭৫টি আসনই ন্যাশনাল কনফারেন্সের সদস্যগণ অধিকার করিয়াছেন। গণ-

পরিষদে ৪৯জন মুসলমান, ২২জন হিন্দু (তন্মধ্যে ৪জন হরিজন ও ২জন মহিলা), ৩জন শিখ ও ১জন বৌদ্ধ আছেন। লাডাখের লামাই বৌদ্ধ সদস্য। রাজ্যের সকল মন্ত্রী ও ভারতীয় পার্লামেন্টের ৪জন কাশ্মীরী সদস্যই নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন। এ বৎসর ১০শে এপ্রিল গণ-পরিষদ গঠনের প্রস্তাব ঘোষণা করা হইয়াছিল। কাশ্মীরের এই জয় জনমতের জয়।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্সিষ্টিটিউট-

গত ৩১শে আগষ্ট হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১১ দিন কলিকাতা ইউনিভাসিটি ইনিষ্টিটিউটের হীরক জুবিলী উৎসব হইয়াছিল। ইনিষ্টিটিউটের বর্তমান সভাপতি, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জুবিলী কমিটীর সভাপতি শ্রীরাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও জুবিলী কমিটীর সাধারণ

বিদায়ী গভর্ণরকে কলিকাতা মহিলা সমিতির সম্বর্ধনা ফটো—তারক দাস

সম্পাদক শ্রীপ্রশান্তকুমার বসুর চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে প্রথম দিনে একটি শিল্পকলা প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহার পর পুনর্মিলন উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, বিজ্ঞান-আলোচনা, সাহিত্য-সভা, সঙ্গীত-জলসা, ফুটবল খেলা, ষ্টীমার ভ্রমণ প্রভৃতির মধ্য দিয়া উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। নরনারায়ণ ও চন্দ্রগুপ্ত নাটক অভিনয়ও হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের কথা সম্বলিত একখানি সুমুদ্রিত সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। স্বর্গত গুরুদাস-বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী তাহার বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক সুকুমার ভট্টাচার্য্য ১৮৯১ হইতে ১৯৫১ পর্য্যন্ত ৬০ বৎসরের কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা দেশের সুধী ও পণ্ডিত সমাজ ছাত্র-

বিলাতে নির্বাচনের ফল—

বিলাতে নির্বাচন শেষ হইয়াছে—শ্রমিক দল ২৯৩টি মাত্র আসন লাভ করিয়াছেন—ইহা পূর্বের অপেক্ষা ২০ কম। রক্ষণশীল দল ৩১৮টি আসন পাইয়াছেন—পূর্ব অপেক্ষা ২৩টি অধিক। উদারনীতিক দল ৫টি ও অন্যান্য দল ২টি আসন পাইয়াছেন। সেজন্য শ্রমিকদলীয় প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এটলীকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে ও রক্ষণশীল দলের নেতা মিঃ চার্চিল আবার প্রধান মন্ত্রীপদ লাভ করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। ইহার ফলে পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই ভবিষ্যৎ দেখিবার জন্য সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিবে।

কল্যাণের নিমিত্ত এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তাহাকে পালন করিয়াছেন। ইনিষ্টিটিউটের ইতিহাস বাংলার তথা কলিকাতার সংস্কৃতির ইতিহাস। ইহার সহিত সম্বন্ধ রাখেন নাই, এমন কৃতী ছাত্রের সংখ্যা অল্পই বলিতে হয়। সেজন্য যাঁহারা উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া সকলকে প্রতিষ্ঠানের কথা জানিতে ও পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলিত হইতে সুযোগ দিয়াছেন, তাঁহারা সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

অষ্ট্রেলিয়ার গম দান—

রাষ্ট্র সংঘের অষ্ট্রেলিয়া শাখার পক্ষ হইতে ভারতকে বিনামূল্যে গম দান করা হইয়াছে। ঐ গম ভারতের রাষ্ট্র সংঘের প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত গত ২২শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে আনুষ্ঠানিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের ফুড কমিশনার মিঃ এ-ডি-খানকে সমর্পণ করিয়াছেন। এই দান উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী বৃদ্ধি করিবে।

গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ—

কলিকাতাস্থ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলটিকে গত ২৯শে সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে উন্নীত করা হইয়াছে ও কুটীর শিল্প শিক্ষাদান বিভাগ খোলা হইয়াছে। সে জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ১৯৫১-৫২ সালে দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন—ভারত গভর্ণমেণ্ট ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা দিয়াছেন। ভারতের সকল স্থানের বিশিষ্ট শিল্পীদের তথায় আনিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে। কলিকাতার এই কলা-শিল্প শিক্ষালয়টিকে এখন কাজের লোক তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা হইল। তাহার ফলে বাঙ্গালার কুটীর শিল্পের প্রচার ও প্রসার ব্যবস্থা হইলেই কলেজ প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে।

পাক প্রধান-মন্ত্রী হত্যা—

গত ১৬ই অক্টোবর রাওলপিণ্ডিতে স্থানীয় মুসলেম লীগের এক জনসভায় বক্তৃতা কালে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খাকে এক দুর্বৃত্ত বুকে ২টি গুলী মারে। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রিভলভার সমেত আততায়ীকে ধরিয়া ফেলিয়া সমবেত জনতা সেই স্থানেই তাহাকে হত্যা করিয়াছে। আক্রমণকারীর নাম সৈয়দ আকবর, সে উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের হাজারা জেলার অধিবাসী। ১৭ই অক্টোবর বিকালে করাচীতে তাঁহার দেহ কবর দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রের একজন প্রধান মন্ত্রীকে এই ভাবে হত্যা করায় পৃথিবীব্যাপী অশান্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

কলিকাতা জাতিপুঞ্জ সমিতির সম্পাদক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের নিকট হইতে ফুড্ কমিশনার শ্রী এ ডি খান অষ্ট্রেলিয়ার প্রতীক দান গ্রহণ করিতেছেন

ইটালী হইতে চাউল আমদানী—

মাদ্রাজের খাদ্যমন্ত্রী মিঃ রচি ভিক্টোরিয়া সম্প্রতি ইটালী দেশে গমন করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে ফিরিয়া ৩১শে অক্টোবর তিনি জানাইয়াছেন—ভারতের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য ইটালীর গভর্ণমেণ্ট কম দামে যতটা সম্ভব অধিক চাউল দিতে সম্মত হইয়াছেন। শীঘ্রই একলক্ষ টন

চাউল আসিবে। ভারতীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সী সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য ইটালী যাইবেন। কিন্তু এই ভাবে কতদিন বিদেশী খাদ্য আমদানী করা হইবে? সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বং আত্মবশং সুখং। আমরা কি আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে অবহিত হইব না?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে গত ৫ই আশ্বিন তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে
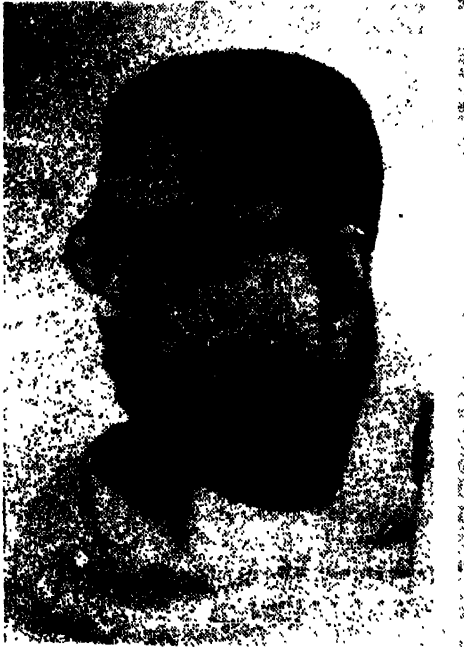
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস ব্রজেন্দ্রবাবুর একখানি সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায়, সাময়িক পত্র, রচিত ও অভিনীত নাটক সন্ধানে, এবং উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সাধকদের জীবন ও কীর্তি নির্ধারণে তাঁহার পরিশ্রম-সাধ্য গবেষণা যে উপকরণ জোগাইয়াছে কোনও একক ব্যক্তির দ্বারা এদেশে তাহা ঘটে নাই। বহু অজ্ঞাত বিষয়ের তিনি প্রথম সন্ধানী। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদীর দৃষ্টি লইয়া তিনিই সর্বপ্রথম কাজ করিয়াছেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' তাঁহার বিপুল কীর্তি। তৎসঙ্গে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' ও 'বাংলা সাময়িক পত্র'—এই মোট তিনখানি গ্রন্থের জন্মদাতা হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' তাঁহার আর এক বিপুল কীর্তি। আমরা তাঁহার কার্য্যের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলুন।

খাদ্য উৎপাদনে সেনাবাহিনী—

ভারতের পূর্বাঞ্চলের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক লেফ্টেনাণ্ট-জেনারেল ঠাকুর মাথু সিং তাঁহার অধীন সকল সৈন্যদলকে বর্তমান বৎসরে অধিক খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ তৎপর হইতে নির্দেশ দিয়াছেন। সমর বিভাগের অধীন যাবতীয় ভূমি কি ভাবে চাষ করা হইবে তাহা নির্দেশ নামায় বলা হইয়াছে। তিনি প্রত্যেককে সপ্তাহে অন্তত ৮ ঘণ্টা খাদ্য উৎপাদন কার্য্যে ব্যয় করিতে অনুরোধ করেন। অধীন সৈন্যদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপনের জন্য অফিসারগণকেও তিনি এই কার্য্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সৈন্য বিভাগের মত পুলিস বিভাগের কর্ম্মীদিগকে এই কার্য্যে অবহিত হইতে বলা প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্বে কারখানার মালিকদিগকে খাদ্যোৎপাদন বিষয়ে উৎসাহের সহিত কাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। ভারতীয় পার্লামেণ্টেও কারখানার মালিকদিগকে খাদ্য-উৎপাদনে সাহায্য করিতে বলা হইয়াছে। তাঁহাদের অর্থ, জমী ও লোকের অভাব নাই। তাঁহারা অবহিত হইলে পরিপূরক খাদ্য হিসাবে দেশে প্রচুর ফল, শাক-সবজী প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে।

চীন ও তিব্বতের পথে সড়ক—

আসামের উত্তরপূর্ব সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তিব্বতের রিমা সহর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ৫শত মাইল দীর্ঘ চামদো-লাসা সড়ক নির্মিত হওয়ায় চীনের সিকাং প্রদেশের সহিত তিব্বতের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিকূল অবস্থা ও আবহাওয়া সত্বেও ২০ হাজার শ্রমিক লইয়া চীনা এঞ্জিনিয়ারগণ এই কার্য্য অতি অল্প সময়ের

মধ্যে শেষ করিয়াছেন—ঐ সড়ক দিয়া মোটর চলাচল করিবে। ভারত ও তিব্বতের সীমান্তবর্তী ম্যাকমেহন লাইন এলাকা দিয়া সড়কটী গিয়াছে। এই পথ নির্মিত হওয়ায় বিরলবসতিপূর্ণ বিপুল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ভারত-সীমান্তবর্তী জেউলে চাষোপযোগী বিস্তীর্ণ এলাকা উভয় দেশের কল্যাণজনক কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে। চীনা রেলপথগুলিকে ভারত সীমান্ত পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত করারও ব্যবস্থা হইতেছে। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে নূতন পথ হইয়া কৃষিশিল্পাদির উন্নতি ও লোকবসতির ব্যবস্থা হইলে জনবহুল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ ও চীন দেশ উভয়েই উপকৃত হইতে পারিবে। বিজ্ঞান ধ্বংসের কার্য্যে প্রযুক্ত না হইয়া সৃষ্টিরক্ষার কাজ করিলে তবে তাহার প্রয়োগ সার্থক হয়।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর বিহারের পাটনা সহরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন ও শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মূল-সভাপতি হইবেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন সাহিত্য শাখা, শ্রীদিলীপকুমার রায় ললিতকলা শাখা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান শাখা, ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার বৃহত্তর বঙ্গ শাখা, অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ইতিহাস-শাখা, শ্রীসুধীরকুমার সরকার শিশু-শাখা ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী ভারতীয় সাহিত্য শাখায় সভাপতিত্ব করিবেন। পাটনার ব্যারিষ্টার শ্রীপি-আর-দাশ ও বিচারপতি শ্রীএস-কে-দাশ অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্ম সভাপতি এবং শ্রীরমাপতি গুপ্ত ও শ্রীঅরুণচন্দ্র রায় যুগ্ম-সম্পাদক হইয়াছেন। পাটনা, একজিবিসন রোড, লাল কুঠীতে কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর এই সাহিত্য সম্মিলনে শুধু সাহিত্যের কথা নহে, প্রবাসী বাঙ্গালীর সকল সমস্যার কথা আলোচিত হইলে বাঙ্গালী জাতি উন্নতি লাভ করিবে।

ইতিহাসে নূতন ডক্টর—

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার ফেলো শ্রীসুনীলচন্দ্র রায় এম-এ 'কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-ফিল ডিগ্রী পাইয়াছেন। ডক্টর রায় হুগলীর খ্যাতনামা আইন-ব্যবসায়ী শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র।

আয়রনম্যান শ্রীনীরদকুমার সরকার—

আয়রনম্যান শ্রীনীরদকুমার সরকার একজন বিশিষ্ট ব্যায়াম শিক্ষক, পরিচালক, সংগঠক ও প্রচারক। ইনি বাঙ্গলার বহু স্থানে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও বহু
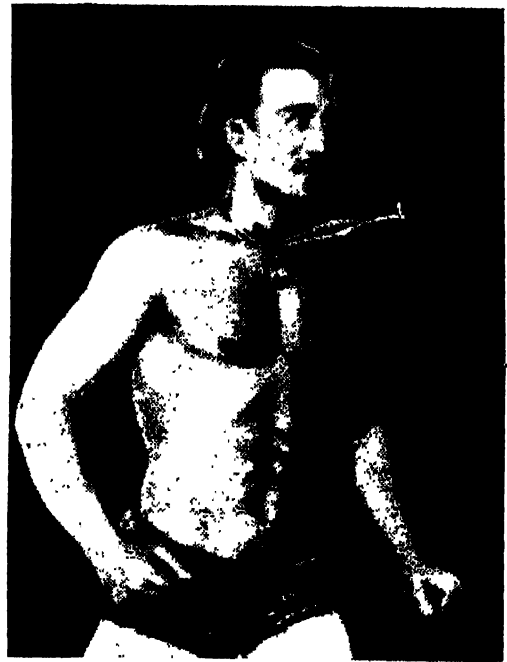
শ্রীনীরদ সরকার

ব্যায়ামাগার পরিচালনা করিতেছেন। ইনি নিজ আবিষ্কৃত নানাপ্রকার অভিনব ও লোমহর্ষণ খেলা দেখাইয়া বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য-পদক এবং খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নীরদবাবুর শক্তিপূর্ণ ক্রীড়াকৌশল দেখিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলার মহাশয় তাঁহাকে একটি স্বর্ণ-পদক ও আয়রনম্যান উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার প্রদর্শিত খেলাগুলির মধ্যে মাথায় ডাব বা ইটভাঙ্গা, মাথায় আঘাত করিয়া লোহা বাঁকানো, রামদার উপর খেলা, ছোট শিশুর বুকে দাঁড়ানো, চক্ষুর দ্বারা লোহার রড বাঁকানো, গলায় ধারাল বর্শা রাখিয়া লোহার

রড বাঁকানো, ফাঁসি ঝোলা, গলার উপর গরুর গাড়ী চালানো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নীরদবাবু যোগ-ব্যায়ামেও বিশেষ পারদর্শী। তিনি "শরীর ও শক্তি" "সরল যোগব্যায়াম" প্রভৃতি কয়েকটি পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। নীরদবাবু ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার জোকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বর্তমান বয়স ৪৩।

সঙ্গীত সাধক জয়কৃষ্ণ সম্বর্দ্ধনা—

বাণী মন্দির সাহিত্য ও সঙ্গীত সমাজ এবং তরুণ সংঘের উদ্যোগে গত ৫ই আশ্বিন ২৫৯ আপার চিৎপুর রোডে সঙ্গীত সাধক শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যালকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে।

সংগীত সাধক শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আজীবন সঙ্গীত-সাধনার জন্য জয়কৃষ্ণবাবুকে অভিনন্দন-পত্র ও মাল্যদান করা হইলে বহু খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ তাঁহাদের সুমধুর সঙ্গীতে সকলকে তৃপ্ত করেন। বিভিন্ন বক্তা তাঁহাদের বক্তৃতায় বলেন—জয়কৃষ্ণ শুধু বড় সঙ্গীতজ্ঞ নহেন, বহু সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ। সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছাড়াও অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, ডক্টর শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন ও জয়কৃষ্ণবাবু তাহার উপযুক্ত উত্তর দান করেন। অনুষ্ঠানটি বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

যক্ষ্মা রোগ নিবারণ চেষ্টা—

নয়া দিল্লীর ২০ তালকাটরা রোড হইতে ভারতীয় যক্ষ্মা-নিবারণ সমিতি গত ১৯৫০-৫১ সালে টিকিট বিক্রয় করিয়া সমগ্র ভারতে যক্ষ্মা-নিবারণ কার্য্যের জন্য ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। এ বৎসরও গত ২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিবস হইতে অর্থ সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ২৬শে জানুয়ারী (১৯৫২) তাহা শেষ হইবে। ভারতে যে ভাবে দ্রুত যক্ষ্মারোগ প্রসারিত হইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য সকলেরই এই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য দান করা কর্তব্য।

হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা—

সকলেই জানেন, কলিকাতাস্থ ভারত সেবাশ্রম সংঘের একদল সন্ন্যাসী কর্ম্মী পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও দক্ষিণ আমেরিকায় নানাস্থানে ঘুরিয়া সে সকল স্থানের ভারতীয় প্রবাসীদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা নানাস্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠাও করিতেছেন। যাহাতে প্রতি পল্লীতে কোন হিন্দু গৃহস্থের বাটীতে একটি করিয়া প্রার্থনা-স্থান স্থাপিত হয়, সেজন্য তাঁহারা ভারতের অধিবাসীদের নিকট নিম্নলিখিত জিনিষগুলি সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শিব, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ বা লক্ষ্মীর পাথর বা পিতলের মূর্তি, পঞ্চপ্রদীপ, সন্ধ্যা দেওয়ার প্রদীপ, বাজাইবার শঙ্খ ও ছোট ইংরাজি গীতা—প্রত্যেক জিনিষ দুই হাজার করিয়া। ঐগুলি পাইলে অন্তত ২ হাজার গৃহে তাঁহারা প্রার্থনা স্থান বা মন্দির স্থাপন করিতে পারিবেন। আমাদের বিশ্বাস, ভারত হইতে এই সকল সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা হইবে।

মিঃ আবদুল হামিদ চৌধুরী—

মিঃ আবদুল হামিদ চৌধুরী ভারতে পাকিস্তানের ডেপুটী হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়া ১০ই অক্টোবর কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মৈমনসিংহ নাগবাড়ীর

জমীদার। ১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সদস্য হইয়া ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৭ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও এক বৎসর উহার সভাপতি ছিলেন। তিনি গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর পাকিস্তানে সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগে যোগদান করিয়াছেন।

তথায় ২৩৫টি বালক বাস করে, তন্মধ্যে ৪২জনের বয়স ১০ বৎসর অপেক্ষা কম। নূতন ছাত্রাবাসে ৩৫টি ছাত্র বাস করিতে পারিবে; তাহার নির্মাণ ব্যয়ের দুই তৃতীয়াংশ ৩৫৭৪৪ টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বসতি বিভাগ মিশনকে দান করিয়াছেন। আশ্রমে একটি মাধ্যমিক

কলিকাতায় ভারত-সভায় নব-নির্বাচিত কর্ম্মীবৃন্দ

বালকাশ্রমে শিবানন্দ ছাত্রাবাস—

গত ১৬ই আশ্বিন বুধবার সকালে ২৪পরগণা রহড়া গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বালকাশ্রমে শিবানন্দ ছাত্রাবাস নামে একটি নূতন গৃহের উদ্বোধন হইয়াছে। রাজ্যপাল ডক্টর কাটজু তাহাতে পৌরোহিত্য করেন। বসুমতীর স্বত্বাধিকারী স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী তাঁহাদের পরলোকগত পুত্র রামচন্দ্র ও কন্যা প্রীতির স্মৃতিতে রহড়ায় তাঁহাদের কতকগুলি বাটী ও বহু লক্ষ টাকা দান করায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন নিরাশ্রয় বালকগণের জন্যই এই আশ্রম স্থাপন করেন। ১৯৪৩ সালে ২৫টি বালক লইয়া কাজ আরম্ভ হয়, এখন

বিদ্যালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি শিল্প বিদ্যালয় আছে। গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১০টি ছাত্রের মধ্যে ৯জন পাশ করিয়াছে—তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ৪জন। ভূতপূর্ব্ব রাজ্যপাল ডক্টর কাটজু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—যে সব ছেলে আশ্রমে বাস করে, তাহারা যে অনাথ এই মনোভাব যেন কিছুতেই তাহাদের আচ্ছন্ন না করিতে পারে। মিশনের সন্ন্যাসীরা যে সেবার আদর্শে আশ্রম পরিচালনা করিতেছেন, ছেলেরা যেন যাইবার সময় সেই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যায়—ইহা তিনি আশা করেন। আমরা দেশের সকল চিন্তাশীল ও সহৃদয় অধিবাসীকে এই আশ্রম দর্শন করিতে ও ইহার কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করি।

দ্বারমণ্ডল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

সেই রাত্রে কোলাহল শুনিয়া এবং রাত্রির অন্ধকার শূন্যমণ্ডলে আগুনের ছটা দেখিয়া অরুণার প্রথমেই দেবকী সেনের কথা মনে হইয়াছিল। দেবকী সেনের চোখের কোণে সে বনস্পতির বীজের মত ওই আগুনের প্রথম অগ্নিকণা দেখিয়াছিল। ভুল তাহার হয় নাই। দেবকী সেনই বটে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া সে দীর্ঘদিন এই জংসন শহরে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে—বোধ করি এই দিনটির জন্যই তাকাইয়া আছে সে ফৈজল্লা মিঞার প্রকাণ্ড বড় বাড়ীটার দিকে। ইটের নিরন্ধ্র দেওয়াল ভেদ করিয়া খুঁজিয়াছে তাহার বিধবা বোনকে।

সে যখন আন্দামানে ছিল—তখনই সে হারাইয়া গিয়াছে। উনিশ শো পঁয়ত্রিশ সালের ডিসেম্বরের শেষ রাত্রে পূর্ব্ববঙ্গের এক পল্লীগ্রামের মাথার উপরের নিশীথ রাত্রির আকাশ তাহার সাক্ষী। মানুষেরা কেহ কিছু বলিতে পারে নাই। সন্ধ্যার সময় তাহার বোন সুমিত্রাকে সকলে দেখিয়াছিল, কিন্তু পরদিন সকালে আর কেহ তাহাকে দেখে নাই। শুধু দেখা গিয়াছিল ঘরের একটা দেওয়ালের খানিকটা কাটা। দরজাটা খোলা, ঘরের ভিতরের সমস্ত কিছু বিপর্যস্ত। অনুমান করিতে কাহারও এতটুকু সংশয় হয় নাই, দ্বিধা হয় নাই যে—এই ধরণের পাপানুষ্ঠানের চিরাচরিত পদ্ধতিতে গভীর রাত্রে দেওয়াল কাটিয়া ঘরে ঢুকিয়া মুখে কাপড় গুঁজিয়া সুমিত্রাকে দুর্বৃত্তেরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এমন পাপের পর অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষিতা হতভাগিনীর অচেতন দেহটাও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে কিন্তু সুমিত্রাকে পাওয়া যায় নাই।

রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইয়া দেবকী সেন যেন ধ্যানযোগে—ওই নক্ষত্রলোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া প্রত্যক্ষদর্শীর ইতিহাস জানিয়াছে, নক্ষত্রেরাই তাহাকে যেন সে দিনের কথা বলিয়াছে। বলিয়াছে সুমিত্রা মনে মনে—ডাকিয়াছিল তাহার দাদাকে—দেবকীকে। ভারতবর্ষ উদ্ধারের ব্রত লইয়া আন্দামানের কারাকক্ষে শুইয়াও দেবকী তখন বড় বড় তত্ত্ব চিন্তা করিতেছিল। জাতিহীন শ্রেণীহীন সমাজ—স্বাধীন ভারতবর্ষ—সমৃদ্ধ দেশ—আক্রোশহীন কলুষহীন একপ্রাণ এক বিরাট জাতি—সে কি অপরূপ সুখস্বপ্ন! সুমিত্রা তাহার পর ভগবানকে ডাকিয়াছিল। তাহার পর অন্ধকার চৈতন্যহীনতার মধ্যে নিঃশেষে তলাইয়া গিয়াছিল। রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইয়া দেবকীর কানে আজও সেই কাহিনী কেহ যেন ফিস ফিস্ করিয়া বলিয়া যায়। সে পাগল হইয়া উঠে।

আন্দামান হইতে ফিরিয়া সে কিছুদিন পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। কোথায় সুমিত্রা! গ্রামে—গ্রামে দীনহীন পাগলের মত ঘুরিত—প্রত্যাশা করিত—কোন দুরধিগম্য পল্লীগ্রামের এক গৃহাঙ্গনে তাহাকে বন্দিনী অবস্থায় দেখিতে পাইবে। মাস ছয়েক ঘুরিবার পর সে সন্ধান পাইল—সুমিত্রার। একজন মুসলমানই তাহাকে সন্ধান দিয়াছিল। বলিয়াছিল—এ কাজ স্থানীয় মুসলমান হিন্দু বদমায়েসদের দ্বারায় সংঘটিত হয় নাই। এ কাজের মূলে ছিল—ওই ফৈজুল্লা মিঞা; দূর পাঞ্জাব বা সিন্ধু কোন দেশে তাহার বাড়ী—কেহ জানে না। এদেশে আসিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়াছে। ফৈজুল্লাই একদিন ব্যবসার কাজে তাহাদের গ্রামে আসিয়া সুমিত্রাকে দেখিয়াছিল। তাহার পরই এই ঘটনা ঘটিয়াছে এবং ফৈজুল্লা সাহেব এ অঞ্চল হইতে তাহার ব্যবসাকেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বড় কেন্দ্রে বসবাস করিতেছে। ক্রমে সন্ধান করিয়া এই ধারণা দেবকী সেনের মনে দৃঢ়বদ্ধ হওয়ায়—সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এই জংসন শহরে ফৈজুল্লাকে আবিষ্কার করিয়াছে এবং এমনি একটি দিন আসিবে, এই দেশের ইতিহাস—আঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রতিঘাতের মত—এমনি একটি

দিন অনিবার্য্য গতিতে আনিয়া দিবে—এই বিশ্বাস লইয়া এইখানে আজ সে আট বৎসর বসিয়া আছে। নামটা সে পাল্টায় নাই—কিন্তু তাহার দেশ—তাহার অন্য পরিচয় কাহাকেও বলে নাই। একদিন শুধু একজনের কাছে—অরুণার কাছে বলিয়াছিল।

তাই অরুণার অনুমানে ভুল হইল না। নিশীথ রাত্রে ওই কোলাহলের মধ্যেও দেবকী সেনের কণ্ঠস্বর চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না, ভুল হইল না। ওই আগুনের ছটার মধ্যে দেবকী সেনের চোখের কোণের বহ্নিকণা এবং হাতের মশালের আগুনের প্রতিচ্ছটা সে মুহূর্ত্তে আবিষ্কার করিল।

*　　　*　　　*

বাজারের একটা তে-রাস্তার মোড়ের উপর ফৈজুল্লার বাড়ী। নিচে এ জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মনিহারীর দোকান। যে কোন সময়ে অন্তত লক্ষ টাকার মাল তাহার দোকানে মজুত থাকে। এ জেলার এবং পার্শ্ববর্ত্তী একটা জেলার ছোট দোকানদারেরা ফৈজুল্লার দোকান হইতেই মাল কিনিয়া কারবার করে। ফৈজুল্লার দোকান হইতেই পিছনে একটা দিক ক্রমশ পুরাপুরি মুসলমান অধ্যুষিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনটা রাস্তার একটা রাস্তার দুইটা দিক ইতিমধ্যেই তাহাই হইয়া উঠিয়াছে। আর একটা রাস্তার একদিকে সে অভিযান চলিতেছিল। এদিক দিয়া দেখিলেই যেন মনে হয়—ইহার পিছনে একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা ছিল বা আছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা অন্যরূপ। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার দিক দিয়াও প্রধান। এখানে সংখ্যালঘু মুসলমানেরা ঘন সন্নিবদ্ধ হইয়া বাস না-করিয়া স্বস্তি পায় না। স্বসম্প্রদায় প্রীতি এবং ইতিহাসের ঘাত প্রতিঘাত সম্ভূত বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ঠিক দুইটা দলে ভাগ করিয়া—দাবা বোড়ের ছকের মত আপনা হইতেই সাজাইয়া তুলিয়াছিল—এবং তুলিতেছিল। গোটা ভারতবর্ষের ছকেই এমনি ধারার সন্নিবেশ সাজিয়া উঠিতেছিল। তাহারই প্রতিফলন অংসনেও পড়িয়াছিল। উনিশ শো ছে-চল্লিশ সালে—খেলার ধারাটা অকস্মাৎ পৃথিবীর ছকের খেলার প্রভাবে এমনই দাঁড়াইল যে, সংঘাত আসিল অবশ্যম্ভাবী-রূপে। দেবকী সেন পাইয়া গেল—তাহার বহু প্রতীক্ষার দিন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত দুই পক্ষ দুই সীমানায় দাঁড়াইয়া পরস্পরের দিকে হিংস্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুই চারিটা চোরাগোপ্তা মারও চলিতেছিল। ছুরি, লাঠী।

রাত্রে—প্রথম আগুন জ্বলিল।

আগুন জ্বলিয়াছিল—মুসলমান পল্লীর প্রান্তেই প্রথম।

পল্লীর প্রান্তে কয়েক ঘর হিন্দুস্থানী বসতি ছিল। এ শহরে তাহারাও আগন্তুক। এখানে তাহারা নানা ব্যবসায় করে। ঘর কয়েক জুতা সেলাইয়ের ব্যবসা ক'রে, ঘর দুয়েক আছে—তাহারা ছোলা মটর ভাজে মুড়ি ভাজে, অর্থাৎ ভুজাভুজির দোকান করে, এক ঘর ছাগল পুষিয়া দুধ বিক্রী করে, ঘর দুই তিন ঘোড়ার সহিস কোচম্যানের কাজ করে। আগুন লাগিল—প্রথম এই পাড়ায়। জন দুই খুনও হইল।

খবরটা বিদ্যুতের মত ছড়াইয়া পড়িল।

একটা মানুষই যদি প্রাণের আতঙ্কে চীৎকার করে—তবে সেই চীৎকারেই আকাশ চিরিয়া যায়। এ একটা পাড়ায় প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন মানুষ প্রাণের আতঙ্কে যে চীৎকার করিল—সে চীৎকার মুহূর্ত্তে শহরটার সকল কোলাহল ছাপাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ তাহারা ছাদে উঠিয়া দেখিল শহরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে আগুন জ্বলিয়াছে। একদল মানুষ বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল পথের উপর। পথে পথে তখন খবর ছুটিয়া চলিয়া আসিতেছে—আগুন, চামার পাড়ায় সহিস পাড়ায় আগুন। দশ পনের জনকে কেটেছে।

শাঁখ বাজিয়া উঠিল চারিদিকে।

জনতা জমিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হঠাৎ একটা দীর্ঘকায় মানুষ হাঁক মারিয়া সামনে লাফ দিয়া পড়িল।

—দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ভেড়ার পাল যত! বলিয়াই সে একটা হাঁক মারিয়া উঠিল—ডাকাতের হাঁক—লাঠীয়ালের হাঁক—আ—বা—বা—বা—বা!

রামভল্লা সে। কাপড় সাঁটিয়া হাতে চার হাত পাকা বাঁশের লাঠী লইয়া সে যেন একটা দৈত্যের মত পিছনের অন্ধকার হইতে সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া আবির্ভূত হইল।

—রাম—এই রাম!—রাম।

ডাকিল রামের বর্তমান মনিব জীবন দে। জংসনের বাঙালী হিন্দু ব্যবসায়ীদের অবিসম্বাদী নেতা। রাম এই মুহূর্তে মনিবের কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল না—সে পিছু ডাকায় প্রচণ্ড ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—কে? কে রে শুয়ারের বাচ্চা?

জীবন ভড়কাইয়া গেল; তবুও সে কোন মতে সাহস সঞ্চয় করিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—আমি।

—কে? বিচিত্র দৃষ্টিতে রাম তাহার দিকে চাহিল। চিনিতে যেন চোখ চাহিতেছিল না।

জীবনই বলিল—কি? হ'ল কি তোর? আমাকে চিনতে পারছিস না? ক্ষেপে গেলি না কি?

এবার রাম তাহাকে চিনিয়া বলিল—দে মশায়!

—হ্যাঁ।

—এস। এগিয়ে চল। সহিস পাড়া জ্বলছে—চামারদের ঘর জ্বলছে। খুন করছে। দেখছ না?

—দাঁড়া। পুলিশে খবর দিয়েছি পুলিশ আসছে।

—আঃ। একটা চীৎকার করিয়া উঠিল রাম। পুলিশ কি করিবে? কি হইবে? পুলিশের সাহায্যে যাহারা মারখাইয়া সেই মারখাওয়ার প্রতিবিধান করে—রাম সে দলের মানুষ নয়। সে জীবন দেকে মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিল—পুলিশ! পুলিশ! যাও—যাও—ঘরে খিল দাও গে যাও।

ঠিক এই মুহূর্তে একখানা তলোয়ার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল দেবকী সেন। সে সাজিয়া আসিয়াছে। হাতে তলোয়ার—কাঁধে দড়ির মালায় ঝোলানো রিভলবার! রাম এবং বঙ্কি এক সঙ্গে মরণোল্লাসে মাতিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া ধ্বনি দিয়া ছুটিয়া চলিল।

দেবকী ধ্বনি দিল—বন্দেমাতরম্!

রামভল্লা ও ধ্বনিতে যোগ দিতে পারিল না—সে আ—বা—বা—বা—করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পর সে ধ্বনি দিয়া উঠিল—কালী মায়ীকি জয়।

জনতাটা গোটা যেন জমাট হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। ছুটিয়া চলিল জনতা তেরাস্তার দিকে। ও দিকে মুসলমান জনতাও চীৎকার করিতেছিল—আল্লা হো-আকবর!

ফৈজুল্লার ছাদ হইতে বন্দুকের গুলি ছুটিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পাচশোসাতশো উন্মত্ত মানুষের সে অভিযান যেন বাঁধ ভাঙা নদীর জলরাশির মত প্রচণ্ড বেগ-শক্তি সম্পন্ন। সংখ্যায় অল্প মুসলমান জনতার প্রতিরোধ ভাসিয়া গেল।

তারপর কোথা দিয়া কি হইল—সে নির্ণয় কেহ করিতে পারে না। মুসলমান পল্লী জ্বলিয়া উঠিল। চীৎকার উঠিল।

কে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—ফৈজুল্লা পালাচ্ছে মোটরে চেপে।

দেবকী সেন ছুটিল।

রামও ছুটিল। ফৈজুল্লার উপরে তাহারও প্রচণ্ড ক্রোধ। অহেতুক। কিন্তু ক্রোধটা সত্য। তাহার পিছনে একদল লোক।

সত্য সংবাদ। ফৈজুল্লার বাড়ীর পিছনের দিকে সরু একটা গলি পথে মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মোটরটায় ষ্টার্ট দেওয়া হইয়াছে। জনতা পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। একজন মানুষকে চাপা দিয়া গাড়ী চালাইয়া যাওয়া যায় কিন্তু এ একটা জনতা—তাহার উপর পথটা সংকীর্ণ। দেবকী সেন হাঁকিয়া বলিল—কাঠ ফেলে দাও পথের উপর।

ফেলিয়া দিবার দরকার হইল না। গাড়ীটা থামিয়া গেল। গাড়ী খুলিয়া নামিল ফৈজুল্লা। হাতে তাহার বন্দুক। তাহার সঙ্গে তিনটি মেয়ে। গুটি চারেক শিশু। ফৈজুল্লা দাঁড়াইয়াছে সে লড়িয়া মরিবে। ইরাণ তুরাণ হইতে যাহারা একদা পাহাড় ডিঙাইয়া আসিয়া হিন্দুস্তান জয় করিয়াছিল—সে তাহাদের বংশধর। সে ভীরু নয়। একদিন যাহাদের তাহারা জয় করিয়াছিল—আজ আবার তাহাদের কাছেই মাথা হেঁট করিতে হইবে বলিয়াই সে মৃত্যু ধ্রুব জানিয়াও—সহস্রের বিরুদ্ধে শত জনের নেতৃত্ব লইয়া লড়িতে উদ্যত হইয়াছে। নিজে সে পলাইতেছিল না, মেয়েদের পাঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। এইটুকু শুধু নিজে বন্দুক লইয়া তাহাদের পার করিয়া দিয়া—আবার ফিরিয়া আসিবার সংকল্প করিয়াছিল।

সে বন্দুক হাতে দাঁড়াইল।

দেবকী সেন তেলোয়ার বাঁ হাতে ধরিয়া—রিভলভার খুলিয়া লইল।

অকস্মাৎ তিনটি মেয়ের একজন বোরখা খুলিয়া জনতার দিকে চাহিয়া বলিল—আমাদের মারবেন মারুন—আমাদের এই ছেলেদের—এই শিশুদের—।

সে আর বলিতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

সন্তোষ ট্রফি ফাইনাল ঃ

(প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ)

প্রায় বারো হাজার দর্শকের সামনে ৩০শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গলা আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় বোম্বাইকে এক গোলে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে। এইবার নিয়ে বাঙ্গলা পর পর চারবার এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করলো, তাছাড়া যতোবার সন্তোষ ট্রফি খেলা হয়েছে বাঙ্গলা প্রতিবারই ফাইনালে খেলেছে। ফাইনাল খেলা খুব দর্শনীয় হয় নি। বোম্বাই বাঙ্গলার তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল টীম, অতি কষ্টে তারা সব সময় গোল বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিলো। আমাদের ফরোয়ার্ড লাইনের খেলা হতাশজনক, গোলের সামনে গিয়ে গোল কিপারকে বল হাতে তুলে দিয়েছে নয়তো পোষ্টের বাইর দিকে বল মেরেছে। মেওয়ালালের খেলা সমালোচনার বাইরে। গুহ ঠাকুরতার একটি দর্শনীয় কিক পোষ্টে লেগে ফিরে আসে। দুই আউট নন্দী ও ভেঙ্কটেস অন্যদের তুলনায় ভালো। হাফে রায় প্রশংসনীয় খেলেছেন, ব্যাকে মান্নার তুলনা নেই। সঞ্জীবকে কোন শক্ত বল ধরতে হয় নি। এবারের সব চেয়ে দর্শনীয় খেলা বাঙ্গলা ও সার্ভিস একাদশের খেলা হ'য়েছে। গোলে এন্টনীর ভালো খেলা হয়েছে এবং সার্ভিস দলের ভাগ্য বিপরীত থাকায় তারা এক গোলে হেরে যায়—খেলা ড্র হওয়া উচিত ছিলো। সার্ভিস দলের গোলকিপার ও ব্যাকের বোঝাপড়ার ভুলে গোলটি হয়। অবশ্য এতে নন্দীর কৃতিত্ব ছিলো খুব যদিও ধনরাজ গোল করেন। সার্ভিস দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড ধন বাহাদুর ও লেফ্‌ট-আউট পুরণ বাহাদুরের খেলা দর্শনীয়। এরা দু'জনেই অলিম্পিক টীমে স্থান পাবার যোগ্য। এরা দুজনেই Far Eastern টীমে স্থান পেয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় জয়লাভের পুরস্কার স্বরূপ সন্তোষ ট্রফি এ পর্যন্ত এই তিনটি প্রদেশ পেয়েছে—বাঙ্গলা (১৯৪১, ১৯৪৫, ১৯৪৭, ১৯৪৯, ১৯৫০ ও ১৯৫১), দিল্লী (১৯৪৪) এবং মহীশূর (১৯৪৬)। বাঙ্গলা প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৪১ সাল থেকে প্রতি বছরই ফাইনালে উঠেছে। ১৯৪২, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৮ সালে খেলা হয় নি।

ফাইনাল খেলায় দুই দলের খেলোয়াড় :

বাঙ্গলা ঃ সঞ্জীব, (রাজস্থান), ব্যোমকেশ বসু (ইষ্টবেঙ্গল) ও শৈলেন মান্না (মোহনবাগান) অধিনায়ক ; লতিফ (মহঃ স্পোর্টিং), চন্দন সিং ও এস রায় (ইষ্টবেঙ্গল), ভেঙ্কটেস (ইষ্টবেঙ্গল), রুনু গুহঠাকুরতা (মোহনবাগান), সাহু মেওয়ালাল (ই, আই, আর), এস সত্তার (মোহনবাগান) ও এস নন্দী (ই, আই, আর)।

বোম্বাই : গুরপ্রসাদ ; বৈদ্য ও প্যাপেনণ শঙ্কর, কৃষণ ; ও কেনী, পেরুমল, পবব, ফেরারো, টমাস ও ভাগিদ।

আগামী অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দল ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক খেলার পরই এ, আই, এফ, এ ২৮জন খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশিত ক'রেছেন যাদের ভেতর থেকে ১৯৫২ সালের অলিম্পিকের টীম গঠন করা হবে। খেলোয়াড়দের নাম দেখে মনে হয় আন্তঃপ্রাদেশিক খেলার ওপর ভিত্তি ক'রে খেলোয়াড়দের বাছাই করা হয় নি। এমন অনেক খেলোয়াড় তালিকাভুক্ত হয়েছেন যাঁদের খেলা

কালীঘাটের খেলারও প্রশংসা করিতে হয়, আরও এই কারণে যে, কালীঘাট দলে সকলেই ছিলেন বাঙ্গালী খেলোয়াড়। ইতিপূর্ব্বে একই বছরে আই-এফ এ শীল্ড এবং ডুরাণ্ড কাপ তিনটি গোরাদল পেয়েছে।

এম সি সি দলের ভারত সফর ঃ

সুদীর্ঘকাল পর এম সি সি দল ভারত সফরে এসেছে। ইতিপূর্ব্বে এম সি সি দল ভারতবর্ষে দু'বার খেলে গেছে, ১৯২৫-২৬ এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে। বর্ত্তমান সফরে দলের ষোল জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এই (চাষ্টি) রোডস অসুস্থতার কারণে ২টো ম্যাচে ৩টে ইনিংস খেলে স্বদেশে ফিরে গেছেন। রোডস একজন চৌকস খেলোয়াড়, লেগ-ব্রেক ও গুগলি বোলার। তার অভাব দলের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ। তাঁর শূন্য স্থানে অপর একজন খেলোয়াড়ের প্রয়োজন ইংলণ্ডে জানানো হয়েছে। প্রথম টেষ্ট ম্যাচের আগে পর্য্যন্ত এম সি সি দল ৬টি ম্যাচ খেলে অপরাজেয় আছে। এম সি সি দলের পক্ষে তিন জন সেঞ্চুরী করেছেন,—টম গ্রেভনি ২টি—১০১ (বঃ সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ১০১ (বনাম সার্ভিসেস একাদশ); জন রবার্টসন ২টি—১৩১ (বনাম হোলকার) এবং ১০৫ (বনাম উত্তর ভারত) এবং ক্র্যাঙ্কলসন ১৩৮ (বনাম উত্তর ভারত) ১।১১।৫১

সাহিত্য-সংবাদ

নীরেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "চীনের ড্রাগন" (৬ষ্ঠ সং)—৩
শ্রীজওহরলাল নেহরু প্রণীত "বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ"—১২॥০
শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সংগ্রহ ও সঞ্চয়" (১ম)—॥০
ঋষি দাস প্রণীত জীবনী গ্রন্থ "ছোটদের আইনষ্টাইন"—১৷০, "ছোটদের নিউটন"—১৷০
বিধুভূষণ বসু প্রণীত উপন্যাস "পরিণাম"—২৲, "পৌত্রান্ত"—২
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বাবলা"—১৷০
শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত ছেলেদের নাটক "জাগো রে বীরে"—॥৵০
শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মেদ মেদুর"—৩৷০
শ্রীআনন্দ প্রণীত কিশোর উপন্যাস "সবুজ বনে দুরন্ত ঝড়"—১৷০
শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "নব যৌবন"—১॥০
শ্রীঅমিয়কুমার বাগচী প্রণীত "পতিতা"—২৲
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "বে-আইনী"—১৸০
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "আমাদের বাপুজী"—১৷০, "মুক্তি সংগ্রাম"—২৸০
শ্রীগদাধর নিয়োগী প্রণীত কিশোর পাঠ্য গল্প গ্রন্থ "গল্প বীথিকা"—১৸০
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র প্রণীত "আসামের অরণ্যচারী"—১৷০
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত "ভারতের মুক্তি-সন্ধানী"—২॥০
শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "নবজীবনের পথে হায়দরাবাদ"—১॥০
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "গোকির ছেলেবেলার কথা"—১॥০, "মানচুসেনের অ্যাডভেঞ্চার"—৸০
শ্রীভূতনাথ ভৌমিক প্রণীত "ডোমিনিয়ন ভারতের পথরেখা"—২৲
নব প্রকাশন-প্রকাশিত "দেশ বিদেশের লেখা"—৩৲
নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত নাটক "বঙ্গেবর্গী" (২০শ সং)—২॥০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "নারীর মূল্য" (২য় সং)—২৲, "কাশীনাথ" (১০ম সং)—২॥০
দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "গৃহশ্রী" (১৬শ সং)—৩॥০
নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "পলাশির যুদ্ধ" (১৯শ সং)—২৷০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত নাটক "সাজাহান" (২৭শ সং)—২॥০
কানাইলাল গোস্বামী প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "তটিনীর তটে"—১॥০
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মহাজাতি সংঘ"—৪
শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী-সম্পাদিত "ছোটদের বঙ্কিম"—১৷০
লিলি দেবী প্রণীত উপন্যাস "পূর্ণচ্ছেদ"—২
শ্রীশক্তিকিঙ্কর পাল প্রণীত "শান্তি ও শ্রী'র পথে পল্লী"—১॥০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "একটি রঙ-করা মুখ"—২৲
নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত "অডিসির গল্প"—১৷০
শ্রীবিধুভূষণ দাসগুপ্ত প্রণীত "রাষ্ট্রভাষা-প্রবেশ"—১॥০
শ্রীরাধারমণ দাস-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "রাজমোহন" (১ম)—২৲
প্রতিমা ঘোষ প্রণীত বিদেশ ভ্রমণের কাহিনী "মেঘে ও মাটিতে"—৩৲
তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্য"—৩৸০
শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীগীতা"—৫৲

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন ঃ—

২৫শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে সকল ষাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাওয়া যাইবে, পৌষ সংখ্যা তাঁহাদের ভিঃ পিঃতে পাঠানো হইবে। ছয় মাসের জন্য গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মণিঅর্ডার করিলে ৪৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে ৪।৵০ আনা লাগিবে। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত